

অ পু

GIFTED BY
RAJA RAMMOHI L ROY
LIBRARY FOUNDATION.

পথের পাঁচালী

অপরাজিত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

কাজল

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, স্ত্রীমোচরণ ঘোষ কলিট | কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রণ - - - - -

প্রকাশক : ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১২, শ্রীমাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

অজয় বর্ধন

দীপ্তি প্রিন্টার্স

৪, রামনারায়ণ মতিলাল রোড,

কলিকাতা ৭০০ ০১৪

নিম্দিপুৰ গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হরিহর রায়েৰ ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী। হরিহর সাধারণ জীবনযাত্রার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চারি ঘর শিল্প সেবকের বার্ষিক প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিদাভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।

পূৰ্ণ দিন ছিল একাদশী। হরিহরের দরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাকুরণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চূপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবাব পর হইতে মুখে পুরিবার পূৰ্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গুঁড়ি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশঃ স্নায়মান কীলার জাম্বাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাকুরণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুঁকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর অন্তে দুটো রেখে দেলাম না?—ওই ছাথো।

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক পিতি, তুই থা—

দুটো পাকা বড় বীচ-কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙিয়া ইন্দির ঠাকুরণ তাহার হাতে দিল। এবার খুঁকীর চোখ-মুখ উজ্জল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, আবার ওখানে গিয়া ধরা দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে।

ইন্দির ঠাকুরণ বলিল, থাক বৌ—আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করছে ন'। থাক বসে—

তবুও তাহার মা শাসনের স্বরে বলিল, না, কেনই বা থাবার সময় ওরকম বসে থাকবে? ওসব আমি পছন্দ করি নে, চলে আয় বলছি উঠে—

খুঁকী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাকুরণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের। মামার বাড়ীর সম্পর্কে কি রকমের বোন। হরিহর রায়েৰ পূৰ্বপুরুষের আদি বাড়ী ছিল পাশের গ্রাম যশড়া-বিষ্ণুপুর। হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় মহাশয় অল্প বয়সে প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পরে অত্যন্ত ক্লান্তের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে দ্বিতীয় বার তাঁহার বিবাহ দিবার দিক পিতৃদেবের কোন লক্ষ্যই নাই। বৃহৎ খানেক কোন রকমে চক্কলজায় কাটাইয়া দেওয়ার পরও যখন পিতার সেদিকে কোন উত্তম দেখা গেল না, তখন রামচাঁদ ময়ীয়া হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাক্রম অল্প ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। ছপুবকলা কোথাও কিনা নাই,

সহজ মাছুষ রামচাঁদ আহাৰাদি কৰিয়া বিছানায় ছটকট কৰিতেছেন—কেহ নিকটে বলিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে রামচাঁদ স্বৰ ধৰিতেন—তাহার আর কে আছে, কে-ই বা আর তাঁহাকে দেখিবে—এখন তাঁহার মাথা ধরিলেই বা কি—ইত্যাদি। ফলে এই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে রামচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্পদিন পরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইলে যশড়া-বিষ্ণুপুরের বাস উঠাইয়া রামচাঁদ স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস শুরু করেন। ইহা তাঁহার অল্পবয়সের কথা—রামচাঁদ এ গ্রামে আসিবার পরে শব্তরের যত্নে টোলে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং কালে এ অঞ্চলের মধ্যে ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে কোন বিষয়কৰ্ম কোনদিন তিনি করেন নাই, কবীর উপযুক্ত তিনি ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহের কারণ আছে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস তাঁহার স্ত্রী-পুত্র শব্তর-বাড়ীতেই থাকিত। তিনি নিজে পাড়ার পতিব্রাহ্ম মুখুয়ার পাশায় আড্ডায় অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দুইবেলা ভোজনের সময় শব্তরবাড়ী হাজির হইতেন মাত্র; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—পণ্ডিতমশায়, ঘোঁটা ছেলেটা আছে, আখেরটা তো দেখতে হবে? রামচাঁদ বলিতেন—কোন জাবনা নেই ভায়া, ব্রজো চক্কোস্তির ধানের ময়াই-এর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দু-পুরুষ হেসে-খেলে কাটবে। পরে তিনি ছক্কা ও পুঞ্জড়ির জোড কিভাবে মিলাইলে বিপক্ষের ঘর ভাঙিতে পারিবেন, তাহাই একমনে ভাবিতেন।

ব্রজ চক্রবর্তীর ধানের ময়াই-এর নিত্যতা সৰ্বদে তাঁহার আস্থা যে কতটা বে-আন্যাজী ধরণের হইয়াছিল, তাহা শব্তরের মৃত্যুর পরে রামচাঁদেব বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। এ গ্রামে তাঁহার জমিজমাও ছিল না, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু নয়। দুই চারিটি শিল্প-সেবক এদিক-ওদিক জুটিয়াছিল, তাহাদেব দ্বারা কোন বকমে সংসার চালাইয়া পুত্রটিকে মানুষ কৰিতে থাকেন। তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার বিবাহ তাঁহার শব্তরবাড়ীতেই হয়। তাহারাও এখানেই বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও রামচাঁদের অনেক সাহায্য হইত। জ্ঞাতি-ভ্রাতার পুত্র নীলমণি রায় কমিসেরিয়েটে চাকরী কৰিতেন, কিছু কৰ্ম উপলক্ষ্যে তাঁহাকে বরাবর বিদেশে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি শেষকালে এখানকার বাস একরূপ উঠাইয়া বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া কৰ্মস্থলে চলিয়া যান। এখন তাঁহাদের ভিটাতে কেহ নাই।

শোনা যায় পূৰ্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাকুরণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ কৰিতেন। এক-আধ বারি কাটাইয়া, পথের থরচ ও কৌলীন্দ্ৰ-সন্মান আদায় কৰিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আকিয়া পরবর্তী নম্বরের শব্তরবাড়ী অভিমুখে তলপি-বাহক সহ যওনা হইতেন। কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাকুরণ ভাল মনে কৰিতেই পারে না। বাশ-মায়ের মৃত্যুর পর ভাই-এর আশ্রয়ে দু-চুঠা অন্ন পাইয়া আসিতেছিল, কালক্রমে সে চাইও অন্ন বয়সে দ্বারা গেল। হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প দিনেই এ ভিটাতে বাড়ী তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাকুরণের এ

সংসারে প্রবেশ। সে সকল আজকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। শাঁখারীপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখ্যো নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সেসব গাছ আবার বৃদ্ধ হইতেও চলিল। কত ভিটার নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতী চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কাল-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার কত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জনসন্ টম্‌সন্ সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।

শুধু ইন্দির ঠাকরুণ এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপ-ছিপে চেতারার হাঙ্গমখা তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বুকা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে সাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? বেহারী? না, ও, তুমি রাজু...

এই ভিটারই কি কম পরিবর্তনটা ইন্দির ঠাকরুণের চোখের উপর ঝটিয়া গেল। ঐ ব্রজ চক্রবর্তীও যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা-ব দিন গ্রামস্থল লোক সেখানে পাত পাড়িত। বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে। তখন কি ছিল ঐ বকম দাঁশবন। পৌষপার্বণের দিন ওই ঢেঁকীশালে একমণ চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্ত—চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাকরুণ সেসব এখনও দেখিতে পায় যে। ঐ রায়বাড়ীর মেজবৌ লোকজন সঙ্গে করিয়া চাল কুটাইতে আসিয়াছেন, ঢেঁকীতে দমাদম পাড পড়িতেছে, সোনার বাউটি রাঙা-হাতে একবার সাম্নে সবিয়া আসিলেছে আবার পিছাইয়া যাইতেছে, জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, তেমনি স্বভাবচরিত্র। নতুন যখন ইন্দির ঠাকরুণ বিধবা হইল, তখন প্রাতি ষাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জলখাবার গোছাইয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কোথায় গেল কে। সেকালের আর কেহ বাঁচিয়া নাই যার সঙ্গে স্বথঃখেব ঢুটে কথা কয়।

তারপর এ সংসারে অশ্রুদ্বাদাতা রামচাঁদ মারা গেলেন, তার ছেলে হরিহর তো হইল সেদিন। ঘাটেব পথে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইত, মুখ্যোদেব তেঁতুল গাছে ডাঁশ। তেঁতুল খাইতে গিয়া পড়িয়া হাত ভাঙিয়া দুই-তিন মাস শয্যাগত ছিল; সেদিনের কথা। ধুমধাম করিয়া অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হইল—পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসরের নববিবাহিতা পত্নীকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া গেল। আট দশ বছর প্রায় কোন খোজ-খবর ছিল না—কালেভদ্রে এক-আধখানা চিঠি দিত, কখনো কখনো হুঁপাট টাকা বুড়ীর নাকে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইত। এই বাড়ী আগু'য়া কত কটে.

কতদিন না খাইয়া, প্রতিবেশীর দুয়ারে চাহিয়া চিন্তিয়া তাহার দিন গিয়াছে।

অনেকদিন পরে হরিহর আজ ছয় সাত বৎসর আসিয়া ঘর সংসার পাতিয়াছে, তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে—সেও প্রায় ছয় বৎসরেরটি হইতে চলিল। বুড়ী ভাবিয়াছিল এতদিনে সেই ছেলেবেলার ঘর-সংসার আবার বজায় হইল। তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনে সে অল্প সুখ চাহে নাই, অল্প প্রকার সুখদুঃখের ধারণাও সে কবিতে অক্ষম—আটশব-অভ্যন্ত জীবনযাত্রার পুরাতন পথে যদি গতির মোড়টা ঘুরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সে খুশী, তাহার কাছে সেটাই চরম সুখের কাহিনী।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পাবে না— তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিবেশ্বরী। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিবেশ্বরী বুড়াপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার কিরিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ বছরের নিভিয়া-যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃ হৃদয়ে মেয়েটাকে সুখের বিপর অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—একমুহূর্তে সচাকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে-চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

কিন্তু যাহা সে ভাবিয়াছিল তাহা হয় নাই। হরিহরের বৌ দেখিতে টুকটুকে সুন্দরী হইলে কি হইবে, ভারী ঝগড়াটে, তাকে তো দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, কি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজিয়া মেলে না, বসিয়া বসিয়া অল্পশব্দ করিতেছে!

সে খুঁটিনাটি লইয়া বুড়ীর সঙ্গে দু'বেলা ঝগড়া বাধায়। অনেকটা ঝগড়া চলিবার পর বুড়ী নিজস্ব একটি পিতলের ঘটা কাঁখে ও ডান হাতে একটা কাপড়ের গুটুলি বুলাইয়া বলিত—চল্লাম নতুন বো, আর যদি কখনো এ বাড়ীর ঝাটি মাড়াই, তবে আমার—। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া বুড়ী মনের দুখে বাঁশবাগানে সারাদিন বসিয়া কাটাইত। বৈকালের দিকে সন্ধান পাইয়া হরিহরের ছোট্ট মেয়েটা তাহার কাছে গিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত—ওঠ, পিতিমা, মাকে বলবো আলু তোকে বন্ধে না, আগ্ন পিতিমা। তাহার হাত ধরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ী বাড়ী ফিরিত। সন্ধ্যা সুখ ফিরাইয়া লিত, ঐ এলেন! যাবেন আর কোথায়! যাবার কি আর চুলো আছে এই ছাড়া? ..তেজটুকু আছে এদিকে ষোল আনা।

এ রকম উহার বাড়ী আসার বৎসর-থানেকের মধ্যেই আরও হইয়াছে—বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং মাকে মাকে প্রায়ই হয়।

হরিহরের পূর্বের ভিটায় খড়ের ঘরখানা অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতে বুড়ী থাকে। একটা বাঁশের আলনায় থান-দুই বয়লা ছেঁড়া থান। ছেঁড়া জায়গাটার দুই প্রান্ত একসঙ্গে করিয়া গেরো বাঁধা। বুড়ী আজকাল হুঁচে হুঁচে পরাইতে পারে না বলিয়া কাপড় সেলাই করিবার সুবিধা নাই, বেনী ছিঁড়িয়া গেলে গেরো বাঁধে। একপাশে একখানা ছেঁড়া

মাছ ও কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথা। একটা পুঁটুলিতে বাজোর ছেঁড়া কাপড় বীধা। মনে হয় কাঁথা বুনিবার উপকরণ স্বরূপ সেগুলি বহুদিন হইতে সম্বন্ধে সঞ্চিত আছে, কখনও দরকার হয় নাই, বর্তমানে দরকার হইলেও কাঁথা বুনিবার মত চোখের তেজ আর তাহার নাই। তবুও সেগুলি পরম যত্নে তোলা থাকে, ভাদমাসের বদ্যার পর গৌণ কুটিলে বুড়ী সেগুলো খুলিয়া মাঝে মাঝে উঠানে রৌদ্রে দেয়। বেতের পেটরাটার মধ্যে একটা পুঁটুলি বীধা কতকগুলি ছেঁড়া লালপাড শাড়ী—সেগুলি তাহার মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর, একটা পিতলের চাদরের ঘটি, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির গাড। পিতলের ঘটিতে চালভাজা ভরা থাকে, বাত্রে হামানদিস্তা দিয়া গুঁড়া কবিত্তা তাই মাঝে মাঝে খায়। মাটির গাডগুলার কোনটাতে একটুখানি তেল, কোনটাতে একটু তুন, কোনটাতে সামান্য একটু খেজুরের গুড়। সর্বজয়ার কাছে চাহিলে সব সময় মেলে না বলিয়া বুড়ী সংসার হইতে লুকাইয়া আনিয়া সেগুলি বিবাহের বেতের পেটরাটার মধ্যে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়া দেয়।

সর্বজয়া এ ঘরে আসে কচিং কালেভদ্রে কখনো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ এ গল্প ও গল্প শুনিবার পর থকী বলে—পিত্তি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল তো। গ্রামের একঘর গৃহস্থবাড়ীতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাত্তি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্বে বচাব বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, থকী চাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাকুরের মুখস্থ ছিল। অল্পবয়সে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাকুর কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেকদিন সে এককম ধৈর্যশীল শ্রোতা পায় নাই, পাছে মরিচা পড়িয়া যায়, এইজন্য তাহার জন্য সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও বলিতে টাপকলিতে একটা কথা শুনে,

বাপার ঘরে চোর ঢুকেছে—

এই পর্যন্ত বলিয়া সে হাসি-হাসি মুখে প্রতীকার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। থকী উৎসাহের সঙ্গে বলে—চলো বীধা এক—মিনসে।—‘মি’ অক্ষরটার উপর অকারণ জোর দিয়া ছোট্ট মাথাটি সামনে তাল রাখিবার ভাবে ঠুকাইয়া পদটার উচ্চারণ শেষ করে। ভারি আমোদ লাগে থকীর।

তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ পনেরো দিন বলা হয় নাই—কিন্তু থকী ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক বাত্রে তাহার মা থাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী-বংশ চৌধুরীরা নিজের ভূমিদান করিয়া যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণকে সেকালে গ্রামে বাস করাইয়া ছিলেন, হরিহর পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাহাদের মধ্যে একজন।

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতেৱ দল প্রায়ই গোয়ালা বাগ্‌দী বাউরী জেগীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান,— লাঠি এবং সড়কী চালানোতে হুনিপূর্ণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ-বাড়ী লুণ্ঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সম্বন্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষ সঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীক রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কাঁচা প্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরণের। পথ-চলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহারা তাহার কাছে অর্থাবেষণ করিত—মারিয়া কেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে, দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। পুকুরের মধ্যে লাস গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েৱা পরবর্তী শিকার উপর দিয়া এতদূর পোয়াইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় কিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বটগাছ আজও আছে। সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষাদের লাঙলের কালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুও উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী ত্রিপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কাতিক মাসে। শেব. কস্তার বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির

হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে বন্ধন আহাঙ্গা করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচকোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁহাদের অনিদিষ্ট ছিল না, কিন্তু আশঙ্ক্য করিতে বিরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাভাড়া মাঠের মধ্যে স্মৃষ্কে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথম আশ্রয়ের মাধ্যম এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ অপরে বালক,—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়-পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিকুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীকু রায়ও নাকি সেদিনের দলের মধ্যে স্মৃষ্ক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ তাঁহার হাতে-পায়ে পড়িয়া অস্ত্রত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতিমিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্ক্য অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অন্তর্গত আশঙ্ক্য কারণ আছে। দস্যুর অহঙ্কারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠ্যাঙা হেমন্তরাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্রামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীকু বাটা চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশী দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বালুলা ১২০৮ সাল। বীকু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুবেব নীচেব বড় নোনা গাঙ্গু পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবাব পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন-চারেকের পথ আসিলেই গ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যুষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই পরে দস্যুর দিকে ধলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহানায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের জোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। একস্থানে মাঝিয়া ও অন্যস্থানে বীকু রায়ের জী রন্ধন চুড়াইয়াছিলেন।

সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুইদিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষতঃ পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্ চক্ করিতেছিল। ত-ত হাওয়ায় চরের কাশফুলের বাশি আকাশ, জ্যোৎস্না, মোহনাব জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দু একজন মাঝি বন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা ষ্ণাট শব্দ, একটা ভযাত কণ্ঠ একবার অশ্রুট নীৎকাব করিয়া উঠিয়াই তখনি থামিয়া যাইবার শব্দ। কোতুহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা গুঁম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চবের সেদিকটা জনহীন কিছুই কাহারও চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীকু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীকু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রক্তনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নার চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদেব মুখ শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনা গাঙ সমূহের অভিজ্ঞতায় তাহা বুঝিতে পারিল কাশবনের আড়ালে বাগির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল—ভাড়া হইতে বীকু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকাব লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইচ্ছামতীয় নিজন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীকু রায় ঠেকিয়া শিথিলেন যে, সে অদৃশ্য ধর্মানধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের জামাঘাসের দামে প্রতারণিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বাড়ী আসিয়া বীকু রায় আর বেলুদিন বাচেন নাই। এইরূপে তাহার বংশে এক অভূত অপারেন্দ্র সপ্তপাত হইল। নিজের বংশ লোপ পাইলেও তাঁহার ভাইয়ের বংশাবলী ছিল কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না, দাবালক হইবার পূর্বেই কোন-না-কোন রোগে মারা যাইত। সকলে বলিল, বংশে ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহর রায়ের মাতা তারকেশ্বর দর্শনে গিয়া এক দয়ালু কান্ধে কান্দাকাটা করিয়া একটি মাতলি পান। মাতলির গুণেই হোক, বা ব্রহ্মশাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়ার ফলেই হোক, এত বয়সেও হরিহর আজও বাঁচিয়া আছে।

দিনকতক পরে।

খুকী সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাতীতে তাহার পিসিমা নাই, অল্প দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কি ঝগড়া-কাঁটি হওয়ার পর বাগ কবিতা দব গ্রামে কোন্ এক আশ্রয়বাড়ীতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন বড় অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোন লোক নাই। সম্প্রতি মা কাল হইতে আঁতুড় ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সে কখন খায় কখন শোয় তাহা কেহ বড় দেখে না।

খুকী শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জল কাঁদিল। রোজ রাতে সে কাঁদে। তাহার পর খানিক রাতে কাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ুনীর মা দাই রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, পাড়ার নেড়ার ঠাকুরমা, আরও কে কে উপস্থিত আছেন। সকলেই যেন ব্যস্ত উদ্বিগ্ন। খানিকটা জাগিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

বীশবনে হাওয়া লাগিয়া শিবশিব শব্দ হইতেছে, আঁতুড় ঘরে আলো জলিতেছে ও কাহারা কথাবার্তা কহিতেছে। দাওয়ায় জোৎস্না পড়িয়াছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল। খানিক রাতে ঘুমের ঘোরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও গোলমাল শুনিয়া আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা খর হইতে বাতির হট্টয়া আঁতুড় ঘরের দিকে দৌড়াইয়া ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে যাইতেছে—কেমন আছে খড়ী? কি হয়েছে? আঁতুড় ঘরের ভিতর হইতে কেমন দরংের গলার আওয়াজ সে শুনিতে পাইল। গলার আওয়াজটা তাহার মায়ের। অন্ধকারের মধ্যে ঘূমেব ঘেঁরে ঘেঁরে কিছু বুঝিতে না পারিয়া চূপ কবিতা খানিকক্ষণ বসিয়া বহিল। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছিল। মা ও-রকম করিতেছে কেন? কি হইয়াছে মায়ের?

সে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে জানে না—কোথায় যেন বিভ্রান ছানার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চট্ কবিতা তাহার মনে পড়িল পিসিমার ঘরের দাওয়ায় ভাঙা উল্লনের মধ্যে মেনী বিভ্রালের ছানাগুলো সে বৈকালবেলা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—ছোট তুলতুলে ছানা কয়টি, এখনও চোখ ফুটে নাই। ভাবিল—ঐ যাঃ—ওদের হলো বেড়ালটা এসে বাচ্চাগুলোকে সব খেয়ে ফেললে...ঠিক।

ঘুমচোখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারের মধ্যে পিসিমার দাওয়ায় গিয়া উল্লনের মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিল বাচ্চা কয়টি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। হলো বেড়ালের কোন চিহ্ন নাই কোনও দিকে। পরে সে অবাক হইয়া আসিয়া

ভইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বপ্নের ঘোরে আবার কিন্তু কোথায় বিভালছানা ভাকিতেছিল।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়ুনীর মা দাই বলিল, ও খুকী, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েছে দেখবা না? ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেষ্টামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল—কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হয়েলো, কালপূর্বের পীরের দরগাঘ সিঙ্গি দেবানে—বডডো রক্ষে করেছেন রাত্তিরে।

খুকী ৩৭ দৌড়ে ছুটিয়া আতুড ঘরের দ্বারে গিয়া উকি মারিল। তাহার মা আতুডের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাচের বড পুতুলের চেয়ে কিছু বড জীব কাঁধার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে। শুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভাল দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিটমিট কবিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাতজটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে ঈষৎ ক্ষীণ স্বরে কাদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পবে খুকী বুকিল রাত্তিতে বিভালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি। অবিকল বিভালছানার ডাক—দূর হইতে শুনিলে কিছু বুকিবার জো নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত ক্ষুদ্রে ভাইটির জন্ত দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেডাব ঠাকুরমা ও কুড়ুনীর মা দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছামত্রেও আতুড ঘবে ঢুকিতে পারিল না।

মা আতুড হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট্ট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকী কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যাদিনের কথা, পিসিমার কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যায়। এই রকম কত ছড়া যে পিসিমা বলিত! খোকা দেখিতে পাডার লোক ভাঙিয়া আসে। সকলে দেখিয়া বলে, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে, কি মাখার চুল, কি রং! বলাবলি করিতে করিতে যায়—কি হাসি দেখেচ ন-দি?

খুকী কেবল ভাবে, তাহাব পিসিমা এ-বার যদি আসিয়া দেখিত। সবাই দেখিতেছে, আর তাদের পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া—আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না? সে ছেলেমানুষ হইলেও একটু বুকিয়াছে যে, এ বাড়ীতে বাব' কি মা কেহ পিসিমাকে ভালবাসে না, তাহাকে আনিবার জন্ত কেহ গা করিবে না। দিন-রাত পিসির ঘরের দিকে চাহিলে মন কেমন করে, ঘরের কবাটটা এক একদিন খোলাই পড়িয়া থাকে। দাঁড়িয়া চাম্চিকার নাদি জমিয়াছে। উঠানে সে-রকম আর কাঁট পড়ে না, এখানে শেঙড়ার চারা, ওখানে কচু গাছ—পিসিমা বুকি হইতে দিত। খুকীর বড বড চোখ জলে ভরিয়া যায়—সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকী কি করিয়া ভোলে?

সেদিন হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়া ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক থেকে একটা খটা আর পুঁটলি হাতে করে আসছে—এই চকোন্তি মশারদের বাড়ীতে ঢুকে বসে আছে, যাও দুগ্গাকে

পাঠিয়ে দাও, হাত ধরে ভেকে আনুক, তাহ'লে বাগ পড়বে এখন—

হরি পালিতেবই বাড়ী বসিয়া বুড়ী তখন পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের
ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল।

‘ও পিতি !

বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া
আসিয়াছে। বুড়ী বাগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে
দুর্গা কাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল—
উঠানে ঝি-বউ ষাণ্মারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল।
প্রবীণা হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন—নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর-জন্মে
মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই তোমার আবার কিবে এসেছে—

বাড়ী আসিলে খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ী হাসিয়া কাদিয়া সারা হইল।
কতদিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে।

বুড়ী সকালে উঠিয়া মহা খুশিতে ভিতর উঠানে কাঁট দেয়, আগাছার জঙ্গল
পরিষ্কার কর। দুর্গার মনে হয় এতদিনে আবার সংসারট' যেন ঠিকমত
চলিতেছে, এতদিন যেন কেমন ঠিক ছিল না।

দুপুরে আহাৰ কবিয়া বুড়ী খিড়কীর পিছনে বাঁশবনের পথের উপর বসিয়া
কঞ্চি কাটে। সেদিক আর নদীর ধার পর্যন্ত লোকজনের বাস নাই, নদী
অবশ্য খুব নিকটে নয়, প্রায় একপোয়' পথ—এই সমস্তট' শুধু বড় বড় আম-
বাগান ও নুপসি বাঁশবন ও অন্যান্য জঙ্গল। কঞ্চি কাটার সময় দুর্গা আসিয়া
কাছে বসে, আবোল-তাবোল বকে। ছোট এক বোঝা কাটা কঞ্চি জড়ো
হইলে দুর্গা মেসুরাল বহিয়া বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া আসে। কঞ্চি কাটিতে
কাটিতে মধ্যাহ্নের অলস আমেজে শীতল বাঁশবনের ছায়ায় বুড়ীর নানা কথা
মনে আসে।

সেই কতকাল আগেকার কথা সব !

সেই তিনি বার-তিনেক আসিয়াছিলেন—সপ্তের মত মনে পড়ে। একবার
তিনি পুঁটুনিব মধ্যে কি খাবার আনিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরী তখন দুই বৎসরের।
সকলে বলিল, ওলা—চিনির ডেলার মত। ঘটার জলে গুলিয়া সেও একটু
খাইয়াছিল ; সেই একজন লোক আসিল—পুরোনো সেই পেয়াবা গাছটার
কাছে ঠিক সন্ধ্যার সময় আসিয়া দাঁড়াইল, শব্দবাবড়ীর দেশ হইতে আসিয়াছে,
একখানা চিঠি। চিঠি পড়িবার লোক নাই, ভাই গোলোকও পূর্ব বৎসর মারা
গিয়াছে—ব্রজ কাকার চণ্ডীমণ্ডপে পাশার আড্ডায় সে নিজের পণ্ডরখানা লইয়া
গেল। সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে হয়—ন জোঠা, মেজ জোঠা, ব্রজ কাকা,
ও-পাড়ার পতিত রায়ের ভাই যছ বায়, আর ছিল গোলোকের সম্বন্ধী ভজহারি।
পস্তর পড়িলেন মেজ জোঠা। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে-
আনলে এ চিঠি রে ইন্দির ? তাহার পর ইন্দির ঠাকুরপকে বাড়ী আসিয়া:

তখনই হাতের নোয়া ও প্রথম যৌবনের সাধের জিনিস বাপ-মায়ের দেওয়া রুশার পৈছেছোড়া খুলিয়া রাখিয়া কপালের সিন্দূর মুছিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিত হইল। কত কালের কথা—সে সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, তবু যেন মনে হয় সেদিনের।

নিবারণের কথা মনে হয়—নিবারণ, নিবারণ। এজ কাকার ছেলে নিবারণ। সেরে বৎসবেব বালক, কি টকটকে গায়েব বৎ, কি চুল। ঐ যে চণ্ডীমণ্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জরবোগে শয্যাগত হইয়া যায় যায় হইয়াও দুই-তিন-দিন বহিল। আতা, বালক সর্বদা জল জল করিত, কিন্তু ঈশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়া ছিলেন—মোরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুষানো হইতেছিল। নিবারণ চতুর্থ দিন রাত্রে মাঝে গেল : মৃত্যুর একটু আগেও সেই জল জল তার মুখে বুলি—তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই। সেই ছেলে মাঝা যাওয়ার পর পাঁচদিনের মধ্যে বড় খুড়ীর মুখে কেউ জল দেওয়াইতে পারে নাই—পাঁচদিনের পর ভাস্কর রামচাঁদ চকোত্তি নিজে ত্রাতবধুর ঘরে গিয়া হাত ছোড় করিয়া বলিলেন, তুই চলে গেলে আমার কি দশা হবে? এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাব মা? বড় খুড়ী বনিয়াদী ধনী ঘরের মেয়ে ছিলেন—জগদ্ধাত্রীর মত কপ, অমন কপসী বধু এ অঞ্চলে ছিল না। স্বামীর পাদোদক না খাইয়া কখনও জল খান নাই—সেকালের গৃহিণী, বন্ধন কবিতা আশ্রয় পরিজনকে খাওয়াইয়া নিজে তৃতীয় প্রহরে সামান্য আহার করিতেন। দান-খ্যানে, অন্নবিতরণে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। লোককে রাখিয়া খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাই ভাস্করের কথায় মনের কোন কোমল স্থানে বৃষ্টি লাগিল। তাহার পর তিনি উঠিয়াছিলেন ও জলগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বেশীদিন বাঁচেন নাই, পুত্রের মৃত্যুর দেড় বৎসবের মধ্যেই তিনিও পৃথিবীর অঙ্গসংগম করেন।

একটু জল দে মা—একটুকু দে—

জল খেতে নেই, ডিঃ বাবা—কবরেজ মশায় যে বারণ করেচেন—জল খায় না—

একটুকু দে—এ, টোঁকু খাই মা—পায়ে পড়ি

দুপুরের পাখপাখালির ডাকে স্তব্ধ পঞ্চাশ বছরের পার হইতে বাঁশের ঘর মরু শব্দ কানে ভাসিয়া আসে।

খুকী বলে—পিতা, তোর ঘুম নেগেচে? আয় শুবি চল।

হাতের দা-খানা রাখিয়া বুড়ী বলে—ওই জাখো, আবার পোড়া ঝিমুনি রেয়েচে—অবেলায় এখন আর শোবো না মা—এইগুলো সাঁজ করে রাখি—নিয়ে যায় দিনি ঐ বড় আগালেভা?...

থোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা-রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নীচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন-তখন সে সেই দু'খানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে—বোমা, তোমাৎ থোকাক হাঙ্গিটি বায়না কর। থোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি শুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা থোকন আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো—আবার কালকের জন্মে একটু বেখে দাঁও। মাত্র দুটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে। মনে স্তম্ভ থাকিলে মুখে বলে জে—জে—জে এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না—না—না—না ও বিশ্বে রকমের চীৎকার করিয়া কাঁদিতে শুরু করে। যাহা সামনে পায়, তাহারই উপর ঐ নতুন দাঁত দু'খানির জোর প্রয়োগ করিয়া দেখে—মাটির ঢেলা, এক টুকরা কাঠ, মায়ের আঁচল; দুধ খাওয়াইতে বসিলে এক এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিক্ক-খানাকে মহা আনন্দে নতুন দাঁত দু'খানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধবে। তাহার মা ঝিল্ ঝিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—ওকি, হারে ও থোকা, ঝিক্কখানাকে কামড়ে ধলি কেন?—ছাড় ছাড়—ওরে করিস কি—দু'খানা দাঁত তো তোর মোটে সম্বল—ভেঙ্গে গেলে তখন হাসবি কি করে তুনি? থোকা তবু ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতিকষ্টে ঝিক্কখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

থোকাক উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাঁওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাঁধাবি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে থোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তাহার মা নিজের কাজ করে। থোকা কাটবার মধ্যে ভুনানি-হওয়া ফোজদারী মামলার আসামীর মত আটক থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃষ্ট ঐকান্তিকের নিকট দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলে, কখনো বাঁধারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিলে—মায়ের ভিজে কাপড়ের শব্দ পাইতেই থোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া এক মুগ হাসিয়া বাঁধারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তার মা বলে—একি ওমা এই কাজল পরিণে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়ীচাঁছা পাখী সেজে বসে আছে? দেখি, এদিকে, আয়। জোর করিয়া নাকমুখ বগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া থোকাক রান্না মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া বাগের সহিত বলে জে—জে—জে—জে, তাহার মা শোনে না।

হাঁহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই থোকা ঝল্‌ঝল্‌ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইতে যায়। এক একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্বজনা

—বলে—খোকন বলে টু—উ—উ ? দোলো ভো খোকা ? দোলো দোলো খোকন
দোলো—। খোকা অবনি বসিয়া পড়িয়া সামনে শিছনে বেজায় ছলিতে থাকে
ও মনের স্বখে ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া গান ধবে—

(গীত)

জে—এ—এ—জে—জে—জে—এ—এ—ই

জে—জে—জে—জে—এ

জে—জে—জে—জে—জে—জে

তার মা বলে, আচ্ছা ধামো, আব ছলো না খোকা, হয়েচে, হয়েচে, খুব
হয়েচে। কখনো কখনো কাজ করিতে কবিত্তে সৰ্বজ্ঞা কান পাতিয়া শুনিতে,
খোকান বেড়ার ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিতেছে ন—যেন সে চূপ করিয়া
গিয়াছে। তাহার বুক ধডাস্ কবিয়া উঠিত—শোনে নিয়ে গেল ন' তো ? সে
ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা শাজি-উপুড়-করা এক বাশ চাপা ঘুলেব ম' মাটির
উপব বে-ক'য়দায় ছোট্ট হাতখানি বাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক
হইতে নালসে পিঁপড়ে, মাছি ও হুডহুডি পিঁপড়ের দল মতামোতে ছুটিয়া
আসিতেছে, খোকান পাতলা পাতলা বাড়া ঠোট দুটা ঘুমেব ঘোরে নেন একটু
একটু কাঁপিতেছে, ঘুমেব ঘোবে সে যেন মাঝে মাঝে কোঁক গিলিয়া জোরে
জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে—যেন জাগিয়া উঠিল, আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া
পড়িতেছে যে নিঃশ্বাসের শব্দটিও পাওয়া যাইতেছে না।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের পাশ
বাগানের ধারে নির্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অংশীন আনন্দ গতি ও
আবোধ কলহাস্তে মুখরিত থাকে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মাতুষ কবিয়া তোলে যুগে যুগে মাঝেব গৌরব গাথা
তাই সকল জনমনের বাতায় বাজত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম ?
সে নিঃশ্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শেখবতাদশা, চাদ
ছানিয়া-গড়া মুখ, আদ আদ আবোল তাবোল বকনির দাম কে দেয় ? এই
তার ঐশ্বর্য, সবই বদলে সে সেবা নেয়, প্রিক্ত হাতে ভিক্ষকের মত নেয় না।

এক একদিন যখন হরিহর বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত
আছে—সৰ্বজ্ঞা চলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো, ছেলোটাকে একটু ধরো না ?
মেয়েটা কোথায় বেরিয়েচে—ঠাকুরঝি গিয়েচে ঘাটে—ধর দিকি একটু—।
আমি নাইবো না, ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাকলেই হবে ? হরিহর বলে—উহ,
ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সৰ্বজ্ঞা রাগিয়া
ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র নিখিতে নিখিতে
হঠাৎ দেখে ছেলে তার চট্টিজতার পাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে ! হরিহর
জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ, ঢাথো বাঁধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আছি
একটা কাজ নিয়ে।

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখী আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার

মুখের দিকে চ'রা অবাক হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে—
—জে—জে—জে—

হরিহরের বিবক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হয়।

অনেকদিন আগের এক গল্পের কথা মনে পড়ে।

নতুন পশ্চিম হইতে আসিয়া সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শস্ত্রবাহী
দীকে আনিতে গিয়াছিল। তপ্তরের পর শস্ত্রবাহীর গ্রামের ঘাটে নৌকা
পৌছিল। বিবাহের পরে একটাবার মাত্র সে এখানে আসিয়াছিল, পঞ্চাট
মনে ছিল না। নাককে জিজ্ঞাসা করিয়া সে শস্ত্রবাহীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।
‘তাহার ডাকাডাকি’—‘কেটি গোরাঙ্গী ছিপছিপে চেহারার তরুণী কে
দাকিতেছে দেখিবার মত বাহিরের দরজায় দাঁড়াইল এবং তাহার সহিত
চোখাচোখি করিয়া সেখানে হঠাৎ চট করিয়া সরিয়া বাতীর মধ্যে ঢুকিয়া
পড়িল—‘স্বপ্নের ভাবিতে লাগিল, মেয়েটি কে? তাহার স্বামী নয় তো? সে
কি এত বড় হইয়াছে?’

বাহিরে সন্ধান মিলিল। সর্বজ্ঞা দাদিয়া হইতে রক্ষিত তাহার মায়ের
একখান ‘বাল্য’ মটকা শাড়ী পরিয়া অনেক ব্যস্তে ঘরে আসিল। হরিহর
চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দশ বৎসর আগেকার সে বালিকাপত্নীর কিছুই
আগ এই স্তম্ভের তরুণীতে নাই—কে যেন তাড়িয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছে।
মুখে সে কচিভাবটুকু আর নেই বটে, কিন্তু তাহার স্থানে যে মৌল্য ফুটিয়াছে
তা যেন খুব স্তম্ভ নহে হরিহরের সেটুকু বুঝিতে দেবি হইল না। হাত-
পায়ের গমন, গতিভঙ্গি সবই নিখুঁত ও নতুন।

যেন ঢুকিয়া সর্বজ্ঞা প্রথমটা প্তমত থাইয়া গেল। যদিও সে বড় হইয়াছে,
এ পর্যন্ত স্বামীকে সহিত দেখা একরূপ ঘটে নাই বলিলেই চলে। নববিবাহিতার
সে লজ্জাটুকু তাহাকে যেন নতুন করিয়া পাইয় বসিল। হরিহরই প্রথম কথা
কহিল। বাব ডানহাতখানা নিজের হাতে মধ্য হইয়া বিছানায় বসাইয়া
বলিল—ব'সো এখানে ভাল আছে?

সবসম্মুখ হইয়াছিল। লজ্জাটুকু যেন কিছু কটিয়া গেল। বলিল—এতদিন
পরে বুঝি মনে পড়লো? আচ্ছা কি ব'লে এতদিন ডুব মেরে ছিলে? পরে
সে হাসিয়া বলিল—কেন কি দোষ করেছিলাম বলো তো?

জীবন কথাবাতায় অজ্ঞ-পাড়াগায়ের টান ও ভক্তিটুকু হরিহরের নতুন ও ভারি
মিষ্ট বলিয়া মনে হইল। পরে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল স্ত্রী হাতে কেবল গাছ-
কয়েক কড় ও কাচের চুড়ি ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। গরীব ঘরের মেয়ে,
দিবার কেহ নাই, এতদিন থবর না লইয়া ভারি অন্ডায় করিয়াছে সে!
সর্বজ্ঞাও চাহিয়া স্বামীকে দেখিতেছিল। আজ সারাদিন সে চারি-পাঁচ
বার আড়াল হইতে উকি মারিয়া দেখিয়াছে—স্বাস্থ্যময় যৌবন হরিহরের
সুগঠিত শরীরের প্রতি অন্ধ যে বীরের ভক্তি আনিয়া দিয়াছে, তাহা বাংলা
দেশের পল্লীতে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাপ-মায়ের কথাবার্তায় আজ সে

ভুলিয়াছে তাহার স্বামী পশ্চিম হইতে নাকি খুব লেখাপড়া শিখিয়া আনিয়াছে, টাকাকড়ির দিক্ হইতেও হু'পয়সা না আনিয়াছে এমন নয়। এতদিনে তাহার হৃৎকম্প ঘুচিল, ভগবান বোধহয় এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সকলেই বলিত স্বামী তাহার সম্মানী হইয়া গিয়াছে,—আর কখনো ফিরিবে না। মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস না করিলেও স্বামী পুনরাগমন এককাল তাহাব কাছে দরশন মতই চোঁকাছে। কত রাত্রি হৃচ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়াছে গ্রামেব বিবাহ উপনয়নের উৎসবে ভাল কবিতা যোগ দিতে পাবে নাই,—সকলেই আশা বলে, গায়ে পড়িয়া সহাতভূতি জানায়; অভিমানে তাহাব চোখে জল আসিত—অনাবিল যৌবনেব সোনারী করুনা এতদিন শুধু আড়ালে আবডালে নিজের রাত্রিতে চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বসিয়া বসিয়া কতদিন ভাবিত—এই তো সংসারের অবস্থা, যদি সত্যসত্যই স্বামী ফিরিয়া না আসে, তবে বাপ-মায়ের মৃত্যুর পরে কোথায় দাঁড়াইবে—কে আশ্রয় দিবে?

এতদিনে কিনারা মিলিল।

হরিহর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আমাকে যখন তুমি ওবেলা দরজার বাইরে দেখলে—তখন চিনতে পেরেছিলে? সত্যি কথা বোলো কিন্তু—

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—নাঃ, তা চিন্তে কেন। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তারপর তখুনি—

আন্দাজে—

আন্দাজে নয় গো, আন্দাজে নয়—সত্যি-সত্যি। দেখলে না, তখুনি মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম? তাবপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি বলতো, আমায় চিনতে পেরেছিলে? বল তো গা ছুয়ে?

নানা কেজো-অকেজো কথাবার্তায় রাত বাড়িতে লাগিল। পরলোকগত দাদার কথা উঠিতে সর্বজয়ার চোখের জল আর বাধ মানে না। হরিহর জিজ্ঞাসা করিল—বীনার বিয়ে কোথায় হ'ল? ছোট শালীর নাম জানিত না, আজই শব্দের মুখে ভুলিয়াছে।

তার বিয়ে শাল কড়ুলে বিনোদপুর—ওই যে বড় গাঙ, কি বলে? মধুমতী।—সেই মধুমতীর ধারে—

একটা প্রহর বারবার সর্বজয়ার মনে আসিতে লাগিল—স্বামী তাহাকে লইয়া যাইবে তো? না, দেখাশুনা কবিতা আবার চলিয়া যাইবে সেই কান্ট পয়া? বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া সে কথাটা কিন্তু কোন রূপেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—তাহার মনের ভিতর কে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিল—না নিয়ে যাক্ গে—আবার তা নিয়ে বলা, কেন এত ছোট গতে যাওয়া?

হরিহর স্নানস্ত্রের সমাধান নিজ হইতেই করিল। বলিল—কাল চল তোমাকে বাড়ী লিয়ে যাই—নিশ্চিন্দপুরে—

সর্বজয়ার বুকে মড়াস করিয়া যেন ঢেকীর পাড় পড়িল—সামলাইয়া লইয়া মুখে বলিল—কালট কেন ? এ্যাঁদিন পরে এলে—হুঁদিন থাকো না কেন ?... বাবা মা কি তোমায় এখনি ছেড়ে দেবেন ? পরন্তু আবার আমার বকুলকুলের বাড়ী তোমায় নেমতন্ন করে গিয়েছে—

—কে তোমার বকুলফুল ? ..

—এই গাঁয়েই বাড়ী—এ-পাড়ায়, আবার ও-পাড়াতে বিয়ে হয়েছে। পরে সে আবার হাসিয়া বলিল, কাল সকালে তোমাকে দেখতে আসবে বলে.১৫ যে—

কথাবাতার স্রোত একভাবেই চলিল—রাত্রি গভীর হইল। বাড়ীর ধারেই সজনে গাছে রাতজাগা পাখী অদ্ভুত রব করিয়া ডাকিতেছিল। হরিহরের মনে হইল বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহ-বাগ্ন গৃহকোণ যখন তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনা-সজ্জা সাজাইয়া বৃথা প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিসের সন্ধানই সে তখন পশ্চিমের অস্ত্রবর অপরিচিত মরু-পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের গায় ঘুরিয়া মরিতেছিল যে !

বাতজাগা পাখীটা একঘেয়ে ডাকিতেছিল, বাহিরের জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে স্নান হইয়া আসিতেছে। এক হিসাবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল, সম্মুখে তাহাদের নবজীবনের যে পথ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে চলিয়া গেল—আজ রাতটি হইতেই তাহার শুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে ! কে জানে জীবন-গম্ভীর কোন্ সাজি সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের সে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পাথেরূপে ?

হুইজনেরই মনে বোধ হয় অনেকটা অস্পষ্টরূপে একই ভাব জাগিতেছিল। হুইজনেরই চূপ করিয়া জানালার বাহিরের ফাঁকে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

তার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন কোথায় ছিল এই শিশুর পাক্তা ?

পথের পাঁচালী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাকুরণ করিয়া আসিয়াছে ছয় সাত মাস হইল, সর্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই। আজকাল তাহার আরও মনে হয় যে ঐ বুড়ী ডাইনী সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে। হিংসা তো হয়ই, রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে। হুঁবেলা কথায় কথায় বুড়ীকে সময় থাকিতে পথ হেঁচিবান উপদেশ ইন্দিতে জানাইয়া দেয়। সে পথ কোন্ দিকে—জান হইয়া অবশি আজ পর্যন্ত সত্তর বৎসরের মধ্যে বুড়ী তাহার সন্ধান পায় নাই, এতকাল পরে কোথায় তাহা মিলিবে, ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।

বর্ষার শেষদিকে বুড়ী অবশেষে এক যুক্তি ঠাণ্ডাইল। ছয় কোশ দূরে জাগরহাটিতে তাহার জামাইবাড়ী। তাহার জামাই চন্দ্র মজুমদার বাঁচিয়া আছেন। জামাইয়ের অবস্থা বেশ ভাল, সম্পন্ন গৃহস্থ, অবশ্য মেয়ে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জামাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে—আজ পর্য্যন্ত ছত্রিশ বৎসরের আগের কথা—তাহার পর আর কখনও দেখাশোনা বা খবরাখবর লেন-দেন হয় নাই। তবুও যদি সেখানে যাওয়া যায়, জামাই একটু আশ্রয় দিতে কি গবরাজী হইবে?

সন্ধ্যার পূর্বে জাগরহাটি গ্রামে ঢুকিয়া একখানা বড় চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে গাড়োয়ান গাড়ী দাড করাইল। গাড়োয়ানের ডাক হাঁকে একজন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক আসিয়া বলিল—কোথাকার গাড়ী? তাহার পিছনে পিছনে একজন বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিতে কবিত্তে বাতির হইলেন—কে রাধু? জিজ্ঞেস করো কোথা থেকে আসছেন?

বুড়ী চিনিল—কিন্তু অবাক হইয়া রহিল—এই সেই তাহার জামাই চন্দ্র। চব্বিশ বৎসর পূর্বের সে সবল দোহার-গডন হুচেহারা ছেলেটির সঙ্গে এই পুরুষের প্রবীণ ব্যক্তির মনে মনে তুলনা করিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কেমন এক বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে-উৎপন্ন—না-হাসি না-দুঃখ—গোছের মনের ভাবে সে বিশ্বলের মত ডাক ছাড়িয়া কাদিয়া উঠিল। অনেকদিন পরে মেয়ের নাম ধরিয়া কাদিল।

বিশ্ববিমুচ চন্দ্র মজুমদার প্রথমটা আকাশ-পাতাল হাতড়াইতেছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিলেন ও আসিয়া শান্তডীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন। একটু সামলাইয়া বুড়ী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া ভাণ্ডালায় বলিল—তোমার কাছে এসেছি বাবাজী এতদিন পরে—একটুখানি আচ্ছয়ের জন্তি—আর কড়া দিনই বাচবে। কেউ নেই আর ত্রিভুবনে—এই বয়সে দুটো ভাত কাপড়ের জন্তি—

মজুমদার মহাশয় বডছেলেকে গাড়ীর দ্রব্যাদি নামাইতে বলিলেন ও ছেলেও সঙ্গে শান্তডীকে বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা মেয়ে ও বড় পুত্রবধু সংসারের গৃহিণী। আরও তিনটি পুত্রবধু আছে। নাতি-নাতনীও তিন চারিটি।

ভালগাছের গুঁড়ির খুঁটি ও আড়াবাঁধা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইখানা দাওয়া-উঁচু আঁটচালা ঘর জিনিসপত্র, সিন্দুকতোরঙ্গে বোকাই, পা ফেলিবার স্থানান্তর। মজুমদার মহাশয়ের বিধবা মেয়েটির নাম হৈমবতী। খুব ভাল মেয়ে—সে নিজের হাতে ফল কাটিয়া জল খাবার সাজাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া কাছে বসাইয়া থাণ্ডাইল। একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলিল—দিদিয়া, আমায় কখনো দেখেননি, না? কখনো তো এদিকে পায়ের ধূলা স্নান্নি এর আগে! আক কেটে দেবো দিদিয়া? দাঁত আছে? পাশের স্বাস্থ্যকে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যাবেলা ভাত খাইতে বলিয়া হৈ চৈ করিতেছে।

হার উপর যেন কাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলি ইংগা, তিন কাল গিয়েচে—একালে তো ঠেকেচ, যার বসে থাই তার পয়সার তো কটু দুখ-দরদ করে চলতে হয়? নোনা গিয়েচ কিনতে? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা কাল নানা খাব্যাব? শখের পয়সা নিজে থেকে নিয়ে দাওগে যাও, বের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না।

বুড়ীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—তা দে বো—পাকা নোনাডা, তা ভাবনাম নিহ খোশ কড়া দিনটো বাচবো? তা দিয়ে দে ডটো পয়সা—

সর্বজ্ঞা চতুর্গুণ চীৎকার করিয়া বলিল—বড় পয়সা সস্তা দেখেচ কিনা? ফির ঘটি-বাটি আছে বিক্রী করে দাও গিয়ে পয়সা—

পরে সে ঘড়া লইয়া খিড়কী দুয়ার দিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া গেল।

এ খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—আমার নাকে খং কানে খং, জিনিস চেষ্টা এমন হয়রান তো কখনো হইনি। তোমায় বলি ইন্দির পিসি, নিজের মোটাই যদি না ছিল তবে তোমার কাল নোনাটা আনা ভাল হয়নি বাপু, ও রকম ধারে জিনিসপত্র আর এনো না। তা তোমাদের ঝগড়া তোমরা কর, আমি গরিব লোক এ বেলা আসবো, আমার পয়সা ডটো বাপু ফেলে দিও—

দাসীর পিছু পিছু থকী বাড়ীর বাহিরের উঠান পর্যন্ত আসিল। বলিতে বলিতে আসিল—পিসীমা বুড়ো মানুষ, একটা নোনা এনেচে তা বুঝি বকে? এগেতে ইচ্ছে হয় না, ইং দাসীপিসি? বেশ নোনা, আমার আধখানা কাল দিয়েছে—তোমার বাড়ী বাকি গাছ আছে পিসি?—পরে সে ভাকিয়া কহিল—শোনো না দাসী পিসি, আমি একটা পয়সা দেবো এখন, পুতুলের বাস্কে আছে, মা ঘবে চাবি দিয়ে ঘাটে গেল, এলে শুকিয়ে দেবো এখন, মা'কে বোলো না যেন পিসি।

দুপুরের কিছু পক্ষ ইন্দির বুড়ী বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোট একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটলি, ডানহাতে পিতলের চানরের ঘটিটা ঝুলানো, বগলে একটা পুরানো মাদুর, মাদুরের পাড ছিঁড়িয়া কাটিগুলি ঝুলিতেছে।

থকী বলিল, ও পিসি, যাসনে—ও পিসি কোথায় ঘাবি? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল। ভুই চলে গেলে আমি কান্দবো পিসি—ঠিক—

সর্বজ্ঞা ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যাব খেলে, তার একটা মজল তো দেখতে হয়, অনর্থ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যাণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো?—এ বকম কুচক্র মন না হ'লে কি আর এই দশা হয়?

বুড়ী ফিরিল না। থকী কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্যন্ত সন্তোষে গেল।

বুড়ী গিয়া গ্রামের ও-পাড়ায় নবীন ঘোষালের বাড়ী উঠিল। নবীন ঘোষালের বউ সব শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, এমন তো কখনো শুনিনি, হ্যাঁগা বুড়ী ? তা থাকো তুমি এইখানেই থাকো। মাস-দুই সেখানে থাকার পর বুড়ী সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি ঘোষালের বাড়ী ও তথা হইতে পূর্ণ চক্রবর্তীর বাড়ী আশ্রয় লইল। প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রথম আপ্যায়নের হুজুতাটুকু কিছুদিন পর উবিয়া যাওয়ার পরে বাড়ীর লোকে নানা রকমে বিরক্তি প্রকাশ করিত। পরামর্শ দিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেরিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে। বুড়ী আরও দু'এক বাড়ী ঘুরিল, সব সময়ই তাহার ভরণ্য ছিল বাড়ী হইতে আর কেহ না হয়, অন্তত হরিহর ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু তিন মাস হইয়া গেল, কেহই আগ্রহ করিয়া ডাকিতে আসিল না। দুর্গাও আসে নাই। বুড়ী জানে ওপাড়া হইতে এ-পাড়া অনেক দূরে, ছোট মেয়ে এতদূরে আসিতে পারে না। সে আশায় আশায় ও-পাড়ায় দু'একবাব গেল, খুঁকীর সঙ্গে দেখা হইল না।

বারো মাস লোকের বাড়ী আশ্রয় হয় না। পূব পাড়ার চিত্তে গয়নানীর চাল ধরখানি পড়িয়া ছিল—মাস দুই পরে সকলে মিলিয়া সেই ধরখানি বুড়ীর জন্য ঠিক করিয়া দিল এবং ঠিক করিল পাড়া হইতে সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ধরখানা নিত্যন্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেয়াল, পাড়া হইতে দূরে একটা ষাঁশবনের মধ্যে। লোকের মুখে শুনিত সবজয়া নাকি বলিয়াছে—ভেজ দেখুক পাঁচজনে। এ বাড়ী আর না, আমার বাছাদের মুখের দিকে যে তাকায়নি—তাকে আর আমার দোরের মাথা গলাতে হবে না, ভাগ্যে পড়ে মরুক গিয়ে। যাহাদের সাহায্য করিবার কথা ছিল, তাহারা প্রথম দিনক এক খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগাইল, ক্রমে কিন্তু তাহাদের আগ্রহ কমিয়া গেল। বুড়ী ভাবে, কেন সেদিন অত রাগ করে চলে এলাম ? বৌ বারণ কলে, খুঁকী কত কাঁদলে, হাতে ধরে টানাটানি কলে—। নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখে চোখের জলে দুই তোবড়ানো গাল ভাসিয়া যায়। বলে—শেষ কালভা এত দুঃখ ছিল অদেয়ে—আজ যদি মেয়েভাও থাকতো—

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড় গৌন্দের ভেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে, গোসাঁই পাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।

রোজ্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ীর বোজ সন্ধ্যার পর একটু একটু জর হয়। সে মাহুর পাতিয়া দাওয়ায় চূপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে ষাটীর ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জরের তুষায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

পিসিমা ! বুড়ী কাঁধা কেলিয়া লাকাইয়া উঠিল, দাওয়ার পৈঠায় খুঁকী ভঠিভেছে, পিছনে তাহাদের পাড়ার বেহারী চক্কির মেয়ে রাজী। খুঁকীর পরনে

কর্পা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোটলা-পুটলি বাঁধা। বুড়ীর মূখ দিয়ে বেনী কথা বাহির হইল না। প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাতাকে জব্বন্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।

—বলিসনে কাউকে পিসি, কেউ যেন টের পায় না, চড়ক দেখে সন্দেহে বেলী চুপি চুপি এলাম, রাজীও এল আমার সঙ্গে, চড়কের মেলা থেকে এই গাথ, তোর জন্ত সব এনেচি—

খুকী পুঁটলি খুলিল।

মুড়কি পিসিমা, তোর জন্তে ত'পরসার মুড়কি আর ত'টো কদমা, আর খোকার জন্তে একটা কাঠের পুতুল—। বড়ী ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। জিনিসগুলো নাড়িতে নাড়িতে বলিল—দেখি দেখি, ও আমার মানিক, কত জিনিস এনেচে গ্যাথো! রাজবাণী হও, গরিব পিসির ওপর এত দয়া! দেখি খোকার কাঠের পুতুলডা! বাঃ দিকি পুতুল—কভা পরমা দিলে?...

এক ঘোঁক কথাবার্তার পরে খুকী বলিল—পিসি, তোর গা যে বড্ড গরম? সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে, তাই বলি একটু শুয়ে থাকি—

ছেলেমানুষ হইলেও দুর্গা পিসিমার রোদ্রে ঘুরিবার কারণ বুঝিল। ডঃখে ও অনাহারে শীর্ণ পিসিমার গায়ে সে সম্মেহে হাত বুলাইয়া বলিল, তুই অবিশ্রিত করে বাড়ী যাস্—সন্ধ্যা বেলী গল্প শুন্তে পাইনে কিছু না—কাল যাবি—কেমন তো?

বুড়ী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, বৌ বুঝি তোকে কিছু বলে দিয়েছে আজ?

রাজী বলিল—খুড়ীমা তো কিছু বলে দেয়নি পিসিমা, ওকে তো এখানে খুড়ীমা আসতে দেয় না। আমরা বসে বকে, তবে ভূমি যেও পিসিমা। তুমি একটুখানি বসো, তাহলে খুড়ীমা আর কিছু বলবে না—

খুকী বলিল—কাল তুই ঠিক যাস্ পিসি, মা কিছু বলবে না—তা'হলে এখন বাড়ী যাই পিসি, কাউকে যেন বলিসনে? কাল সকালে ঠিক যাস্ কিন্তু—

সকালে উঠিয়া বুড়ী দেখিল শরীরটা একটু হাল্কা। একটু বেলা হইলে ছোট পুঁটলিতে ছেঁড়া খোঁড়া কাপড় ত'খানা ও ময়লা গামছাখানা বাঁধিয়া বুড়ী বাড়ীর দিকে চলিল। পথে গোপী বোষ্টমের বৌ বলিল, দিদি ঠাকরুণ, তা বাড়ী যাচ্ছ বুঝি? বৌদিদির রাগ চলে গিয়েচে বুঝি!

বুড়ী একগাল হাসিল, বলিল, কাল দুর্গা যে সন্ধ্যাবেলা ডাকতে গিয়েছিল, কত কান্দলে, বসে মা বলেচে—চ' পিসি বাড়ী চ'—তা আমি বললাম—আজ তুই যা, কাল সকালে বেলাডা হোক, আমি বাড়ী গিয়ে উঠবো—মেয়ের আমার কত কান্না, যেতে কি চায়!... তাই সকালে যাচ্ছি—

বুড়ী বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল কেহ বাড়ী নাই। কাল সাঝারাত জ্বর-ভোগের পর এতটা পথ রোদ্রে দুর্বলশরীরে আসিয়া বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,

পুঁটুলিটা নামাইয়া সে নিজের ঘরের দাওয়ার পৈঠায় বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই খিডকী দোর ঠেলিয়া সর্বজয়া স্নান করিয়া নদী হইতে ফিরিল।
এদিকে চোখ পড়িলে বুড়ীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নিবাক
হইয়া একটুখানি দাঁড়াইল। বুড়ী হাসিয়া বলিল—ও বো, ভাল আছিস?
এই আলাম এ্যাদিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়সে—
তাই বলি—

সবজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—তুমি এ বাড়ী কি মনে করে?

তাহার ভাবভঙ্গী ও গলার স্বরে, বুড়ীর হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল
না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল—এ বাড়ী আব তোমার
জায়গা কিছুতেই হবে না—সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েছি—ফের
কোন মুখে এয়েচ?—

বুড়ী কাঠের মত হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না!
পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল—ও বো, অমন করে বলসনে—
একটুখানি ঠাই দে আমারে—কোথায় যাব আর শেষকালভা বন্ দিকিনি—তবু
এই ভিটেটোতে—

জাও, আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না, ভিটের কল্যাণ ভেবে তোমার
তো ঘুম নেই, যাও একুনি বিদেয় হও, নৈলে আমি অনর্থ বাধাবো—

বাপার একপ দাঁড়াইবে বুড়ী বোধ হয় আদৌ প্রত্যাশা করে নাই।
জন্মগত বান্ধি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে
চায়, বুড়ী সেইরূপ মুঠা আঁকড়াইবায় আশ্রয় খুঁজিতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক
ওদিক চাহিল—আজ তাহার কেমন মনে হইল যে, বহুদিনের আশ্রয় সত্য সত্য
তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার
উপায় নাই।

সর্বজয়া বলিল—যাও আর বসে থেকে না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে
যাচ্ছে, আমার কাজকর্ম আছে, এখানে তোমার জায়গা কোনো রকমে দিতে
পারবো না—

বুড়ি পুঁটুলি লইয়া অতিকষ্টে আবার উঠিল। বাহির দরজার কাছে যাইতে
তাহার পদ পড়িল তাহার উঠান কাঁটের কাঁটাগাছটা পাঁচিলের কোণে ঠেস
দেওয়ানে। আছে, আজ তিন চারি মাস তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই। এই
ভিটার ঘাসটুকু, ঐ রূত যত্নে পোতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় কাঁটাগাছটা,
খুঁকী, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা—তার সস্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া
সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই। চিরকালের মত তাহার। আজ দূরে
সরিয়া যাইতেছে!

সন্মতলা দিয়া পুঁটুলি বগলে যাইতে পিছন হইতে রায়বাড়ীর গিন্নী বলিল
—ঠাক'মা, ফিরে যাচ্ছ কোথায়? বাড়ী যাবে না? উত্তর না পাইয়া বলিল
—ঠাক'মা, আজকাল কানের মাথা একেবারে খেয়েছে।

বৈকালে ও-পাড়া হইয়া কে আসিয়া বলিল—ও মা ঠাকুর, তোমাদের বুড়ী বোধ হয় মরে যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে উপুর থেকে শুয়ে আছে, রোদ্দুরে ফিবে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি—একবার গিয়ে দেখে এন—দাদাঠাকুর বাড়ী নেই ? একবার পাঠিয়ে দেও না।

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পায়ে ঈন্দির ঠাকুর মরিচ-ছিল একপা সত্য। হরিহরের বাড়ী হঠাতে ফিরিতে ফিরিতে তাহার গা কেমন করে, রোদ্রে আর আগাঠে না পাবিয়া এখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বৃকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পবে বেশী বেলায় অবস্থা খাবাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিত-পাড়ার অনেকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে—তা রোদ্দুরে বেরুলেই বা কেন ? সোজা রোদ্দুরটা পড়েচে আজ ? কেহ বলিতেছে—এখনি সামলে উঠবে এখন, ভিঝ্মি লেগেছে বোধ হয়—

বিশু পালিত বলিল—ভিঝ্মি নয়। বুড়ী আর বাঁচবে না ; হরিজ্যোষ্ঠা বোধ হয় বাড়ী নেই, খবর তো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদূরে আসে কে ?

ওনিতে পাইয়া দীঘ চক্রবর্তীর বড় ছেলে ফণী বাপার কি দেখিতে আসিল। সকলে বলিল—দাও দাদাঠাকুর, ভাগিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি। আথো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয় ?

ফণী-হাতের বৈচিক্যার্থে লাঠিটা বিশুপালিতের হাতে দিয়া বুড়ীর মুখের কাছে বলিল। কুণী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল—পিসিমা !

বুড়ী চোখ মেলিয়া ফাল্ ফাল্ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল, নাতার মুখে কোন উত্তর শুনা গেল না। ফণী আবার ডাকি—কেমন আছেন পিসিমা ? শরীর কি অস্থখ মনে হচ্ছে ? পরে সে গঙ্গাজলটুকু মুখে তালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল—আর একবার দাও দাদাঠাকুর—

আর খানিকক্ষণ পরে ফণী বুড়ীর চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল-হুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাকুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দীপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।

আত্ম-অঁতির ভেঁপু

পথের পাঁচালী

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাকুরের মৃত্যুর পর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝোপে-ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দীপুরের কয়েকজন লোক স্বরস্বতীপুজার বৈকালে গ্রামের বাঁহিরের মাঠে

নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাইতেছিল ।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভূষণো গোয়ালার দরুন কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিবেচো নাকি ?

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কথা বলা হইল তাহাকে দোখলে দশ বৎসর পূর্বের সে হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না । এখন যে মধ্যবয়সী, পুরাদস্তুর সংসারী, ছেলেকেদের বাপ হরিহর খাজনা সাধিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোবে, পৈতৃক আমলের শিষ্ট-সেবকের ঘরগুলি সম্বান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায়, হাটেমাঠে জমির ঘরামির সঙ্গে ঝিঙে-পটনের দরদস্তুর করিয়া ঘোবে, তাহার সঙ্গে আগেকার সে অবাধগতি, মুক্তপ্রাণ, ভবঘুরে যুবক হরিহরের কোন মিল নাই । ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের মে-জীবন অনেক দূরের হইয়া গিয়াছে—সেই চূণার দর্গের চণ্ডা প্রাচীরে বসিয়া বসিয়া দূর পাহাড়েব সূর্যাস্ত দেখা, কেদারের পথে তেজপাতার বনে রাত-কাটানো, শাহ্ কাশেম সুলেমানীর দরগার বাগান হইতে টক কমলা লেবু ছিঁড়িয়া খাওয়া, গলিত-রোপাদারার মত স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হিমশীতল স্বর্ণনদী অলকানন্দা, দশাশ্বমেধ ঘাটের জলের ধারের বাণা—একটু একটু মনে পড়ে, যেন অনেকদিন আগেকার দেখা স্বপ্ন ।

হরিহর মায়াসূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিদিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল ? ও থোকা, থোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আডাল হইতে একটি ছয় সাত বছরের ফুটফুটে স্কন্দর, ছিপ্‌ছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল । হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরি মদ্যো ? নাও এগিয়ে চলো—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা ? বড় বড় কান ?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্ত-শিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল ।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের স্বরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে ? বড় বড় কান ?—

হরিহর বলিল—কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনি । সেই বেরিয়ে অব্ধি শুরু করেচো এটা কি, ওটা কি—কি গেল বনের মধ্যে ? কি আমি দেখেচি ? নাও এগিয়ে চলো দিকি ।

বালক বাবার কথায় আগে চলিল ।

নবীন পালিত বলিল, বরং এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বয়সার বিলে একদিন চলো যাওয়া যাক—পূব-পাড়ার নেপাল পাড়ুই বাচ্‌ দিচ্ছে, রোজ দেড়মণ ডুম্বণ এইরকম পড়চে—পাঁচ-সেরের নীচে মাছ নেই । শুনলাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মনিখানে অঠৈ জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বকনা বাছুরের ডাক—বুঝ্‌লে ?

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাতিয়া রহিল ।

—অনেক-কেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছো তো মধ্যখানে জল যেন কালো শিউগোলা, পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি—যন্তক্ষণ ফর্সা না হোলো ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপরে সকলে বসে ঠক ঠক করে কাপতে লাগলো—

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—
—ঐ যাচ্ছে বাবা, ছাথো বাবা, ঐ গেল বাবা, বড বড কান, ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল,—উছ উছ উছ—কাঁটা কাঁটা, কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া থপ্ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল—
—আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লৈ দেখচি তুমি, একশ' বাব বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঔ জন্তেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জল মুখ উচু করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা ?

হারহর বলিল—কি তা কি আমি দেখেচি।—শুঁওর-টুওর হবে—নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

শুঁওর না বাবা, ছোট্ট যে। পবে সে নীচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইন্তে গেল।

চল চল—হ্যাঁ—আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি।

নবীন পালিত বলিল—ও হোলো খরগোশ, খোকা, খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই। বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ বকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোশ।—জীবন্ত। একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়—ছবি না, কাঁচের পুতুল না—একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ।—এই বকম ভাঁটগাছ পৈটিগাছের ঝোপে।—জল-মাটির তৈরী নখর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোন মতেই ভাবিয়া উঠর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারের বাবলা ও জীণ্ডল গাছের আড়ালে একটা বড ইটের পাঁজার মত জিনিস নজরে পড়ে, এটা পুরানো কালের নীলকুঠির জালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীলকুঠির নিকটে এই নিচ্চিন্দ্রিপুর বেঙ্গল ইণ্ডিগো কনসার্বেনের হেডকুঠি ছিল, এ অঞ্চলের চৌদ্দটা কুঠির উপর নিচ্চিন্দ্রিপুর কুঠির ম্যানেজার জন্ লারম'ব দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত। এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জালাঘর সাহেবের কুঠি আশিস, জঙ্গলাকীর্ণ ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে প্রবলপ্রভাউ লারম'ব

সাহেবের নামে এক সময় এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আজকাল দু'একজন অতিবৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্যন্ত কেহ জানে না।

মাঠের ঝোপঝাপগুলো উলুখড, বনকলমী, সৌদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলোর মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতবে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাটা ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের অংলোর দিকে মুখ উচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পডন্ত বেলার চাষায় স্নিগ্ধ বনভূমির শামলতা, পাখীর ডাক, চারিদারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য, রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দারিদ্রের আশ্রয় খুজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কাপণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্ধজালে মাঠ, নদী, বন মায়ায়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের ভূমিতে শাকআলুর চাষ করিয়া কল্প লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। একজন বলিল, কুঠির ইটগুলো নাকি বিক্রী হবে স্তনছিলাম, নবাবগঞ্জের মতি দাঁ নাকি দরদস্তুর কচ্ছে। মতি দাঁর কথায়, সে ব্যক্তি সামান্ত অবস্থা হইতে কল্পে ধনবান হইয়াছে সে কথা আশিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্ম্যাতা, আষাডুর বাজারে কুণ্ডদের গোলাদারী দোকান পুড়িয়া যাটবার কথা, গ্রামের দীন্ত গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতির বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদে আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখী কৈ বাবা ?

এই দেখো এখন, বাবা লাগাছে এগুনি এসে বসবে—

বালক মুখ উচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাব লাগাছেব মাথার দিকে চাতিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নীচু নীচু কুলগাছেব অনেক কুল পাতিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুপদৃষ্টিতে সেদিকে চাতিয়া চাতিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোট গাছে কুল হয় ? তাহাদের পাড়ায় যে কুলেব গাছ আছে, তাহা খুব উচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে ত্রবিদ্যা করিতে পারে না। ভারী আকণ্ঠীটা ডাই হাতে আকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথোর জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টমান্য হইয়া পড়ে—এ সে টের পায়। খবর পাইয়া মা আশিয়া বাড়ী ধরিয়া লইয়া যায়, বলে—ওমা আমার কি হবে। এমন দুই ছেলে হয়েছে তুমি ? এই সেদিন উঠলে জর থেকে, আজ অমনি কুলতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। একটুখানি পিছন ফিরেচি, আর অমনি এসে দেখি বাড়ী নেই। কটা কুল খেয়েচি, দেখি মুখ দেখি ?

সে বলে, কুল খাইনি তো মা, তলায় একটাও কুল পড়ে নেই, আমি বৃষ্টি শাড়িতে পারি ?

পরে সে ছোট্টকে মুখটি মায়ের মুখের অভ্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া হা

সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাঁড়ায় উপর
গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে।
তাক্ ঠিক হইতেছে কিনা।

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—
ও অপু—। সে এতক্ষণ বাড়ী ছিল না, কোথা হইতে এষ্টমাত্র আসিল।
তাহার স্তর একটি মতকশামিষিত। মাহুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু
কনের পুতুলের মত লক্ষ্মীর চূপড়ীর কড়িগুলি তাডাতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল।
পরে বলিল—কি বে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল—আয় এদিকে—শোন—

দুর্গার বয়স দশ-এগার বৎসর হইল। গডন পাতলা পাতলা, রঙ অপূর
মত অতটা দর্শ্য নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়,
মাথার চুল কক্ষ—বাতাসে উড়িবে, মুখের গডন মন্দ নয়, অপূর মত চোখগুলি
বেশ ভাগর ভাগর। অপু গোয়াক হইতে নামিয়া কাছে পেল, বলিল—কিরে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল,
হাতকড়ি ক'ন আম কাটা। স্তর নীচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসে
নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু হুন নিয়ে আসতে পারিস?
আমের কুশী জারাবো—

অপু আশ্রমের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলি বে দিদি?

দুর্গা বলিল—পুটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন্
দিকি একটু হুন আর তেল?

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাড ছুঁলে মা মারবে যে?
আমার কাপড় যে বাসি?

তুই যা না শিগ্গির কবে, মা'র আসতে এখন তের দেবী—স্বার কাচতে
গিয়েচে—শিগ্গির বা—

অপু বলিল—নাবকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে চলে নিয়ে আসবো
—তুই খিডকী দোরে গিয়ে তাত্ মা আসচে কিনা। দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল,
তেল টেল যেন মেজ্জেতে ঢালিস্নে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে—তুই
তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে
মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,—বলিল, নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?

—অতগুলো বুঝি হোল? এই তো—ভারি বেশী—যা আচ্ছা নে আর
কুখানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েছে রে, একটা লছা আন্তে পারিস? আর
একখানা দেবো তা'হলে—

—লক্ষ্য কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপ' রেখে জায়, আমি যে নাগাল পাইনে?

তবে থাক্গে যাক—আবার ওবেলা আনবো এখন—পুলিদের ভোবার ধারের আমগাছটার গুঁটি মা ধরেছে—দুপুরের বোদে তলায় ঝরে পড়ে—

হুর্গাদের বাড়ীর চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্রাতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্না লইয়া নিজ শিলালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত্ত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ী নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুয়ার বাড়ী।

হরিহরের বাড়ীটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের ঘোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটিব ও কালমেঘ গাছেব বন গজাইয়াছে—ঘরের দোর-জানালাব কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাধা আছে।

খিড়কী দোর বন্ধ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল—দুগ্গা ও দুগ্গা—

হুর্গা বলিল—মা ভাকচে, যা দেখে আয়—ওথানা খেয়ে যা—মুখে যে ত্বনের শুভো লেগে আছে, মুছে ফাল্—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও হুর্গার এখন উত্তর দিবার স্মরণ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনে অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অণু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাপণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে কোষ সম্বন্ধে সচেতনতা-সূচক হাসি হাসিল। হুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া ভেরেঙা-কচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফাল্ না বাদর—জুন লেগ রয়েছে যে—

পরে দু' নিরীহমুখে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেকনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি যদি কোন দিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে—অন্ত বড় মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে ছুঁথান। কব্বা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টোটো টোকলা মেমে বেড়াচ্ছেন—সে বাদর কোথায়?

অণু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েছে।

ষোড়শো ষোড়শো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু... একটুখানি হাঁপ জিরোতে দাও। তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ। ও দুগ্গা, জাখতো

বাছুরটা ঠাক পাডচে কেন ?

খানিকটা পরে সর্বজয়া বাম্বাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু নাকাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এটু আঠা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিষের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কচিত হুয়ে বলিল—চাল ভাষা আর নেই মা ?

অপু খাটতে খাইতে বলিল—উঃ, চিবোনো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে—

দুর্গার একটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথে বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি ?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাত্মক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই কের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি ?

দুর্গা নিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিগোস করো না ? আমি—এই তো এখন কাঠালতলায় ঝড়িয়ে—তুমি যখন ডাকলে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই হুহিভে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা—ভেকে ভেকে সারা হোল—কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা ক'রে এলে কি বাঁচে ? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পঙ্কস্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে হুম্ করিয়া নির্ধাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষীছাড়া বাদর ! পরে মুখ ভাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোনো দিন আম দেবো খেও—ছাই—বো—এই ওবেলাই পাটলিদের কাঁকুডভলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েচে, মিস্তি যেন শুড়—দেবো তোমায় ? খেও এখন ? হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ?

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা বায়ের বাড়ীতে গৌমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখচিনে ?

সর্বজয়া বলিল—অপু তো ঘুমুচ্ছে।

দুর্গা বুঝি—

সে সেই খেয়ে বেরিয়েচে—সে বাড়ী থাকে কখন ? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পক ! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে—কোথায় কার বাগানে, কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে—এই চিন্তি মাসের বোদুর কের ভাষোনা। এই জরে পড়লো বলে—অত বড় মেয়ে বলে বোঝাবো কত ? কথা শোনে, না কানে নেয় ?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল—আজ দশমবায় তাগাদার জগে গেছলাম, বললে ? একজন লোক, বেশ মাংসের, পাঁচটা ছয়টা গালা বাড়ীতে, বেশ পয়সাওলা লোক—আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বলে—দাদাঠাকুর, আমায় চিনতে পাচ্ছেন ? আমি বললাম—না বাপু, আমি তো কৈ—? বলে—আপনার কর্তা থাকতে তখন পূজা আচ্ছায় সব সময়ই তিনি আসতেন, পায়ে ধুলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুলা লোক, এবার আমরা বাড়ীতে মস্তর নেবো ভাবচি—তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি—পনিই কেন মস্তরটা দেন না ? তা আমি তাদের বলেচি আজ আর কো' কথা বলবো না, ঘুরে এসে দু-এক দিনে—বললে ?

সর্বজন্মা ভালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বা'টি মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল—হ্যাগো তা মন্দ কি ? দাঁড় না ওদেখ মস্তর ? কি জাত ? হরিহর স্বর নামাইয়া বলিল—বলো না কাউকে।—সমোপ। মোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব—

আমি আবার কাকে বলতে যাবো ? না হোক সে সমোপ, নাম গয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্ছে—ঐ রায়বান্ডার আটটা টাকা ভরসা, তাও দু' মাস অন্তর তবে ছায়—আর এদিকে রাজার দেনা। কাল যাচের ... দেয় ঠাকুর বললে—বোমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা দার দিইনে—তবে তুমি অনেক করে বলে বলে দিলাম—আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না। এদিকে রাধা বোষ্টমের বোতো ছিঁড়ে যাচ্ছে, চ'বেল' তাগাদা আরম্ভ কবেছে ! ছেলেটার কাপড় নেই—তিনি জায়গায় দেলাই, বাছা আমার তই পবে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়—আমার এমন হয়েছে যে হেঁকে করে একদিকে বেরিয়ে যায়—

আর একটা কথা ওরা বলছিল, বললে ? বলছিল গাঁয়ে তো বানুন নেই আপনি যদি এ গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা জমি দিয়ে বাস করান। গাঁয়ে এক ঘর বানুন বাস করানো আমাদের বড় ইচ্ছে। তা কিছু দানের জমি-টমি দিতেও রাজী—পয়সার তো অভাব নেই। আজকাল চাষাদের ধরে নন্দী বাধা—ভদ্রর লোকেরই হয়ে পড়েছে হা ভাত ঘো ভাত—

আগ্রহে সর্বজন্মের কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল—এতখনি। তা তুমি রাজী হ'লে না কেন ? বললেই হোত যে আচ্ছা আমরা আসবো। ও-রকম একটা বড় মাস্তুরের আশ্রয়—এ গাঁয়ে তোমার আছে কি ? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাক—

হরিহর হাসিয়া বলিল—পাগল ! তুমি কি রাজী হ'তে আছে। ছোটলোক, ভাববে ঠাকুরের হাঁড়ি দেখিচি শিকের উঠেচে—উহ, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়—তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে—আর এখন ওঠ, বুঝেই কি ওঠা চলে ? সব ব্যাটা এসে বলবে টাকা দাঁও, নৈলে যেতে দেবো না—দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়—

এই সময়ে যেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের
 ঘরের আড়াল হইতে মতর্কতার সহিত একবার ঊকি মারিল এবং অপর
 পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া শুধারের পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির-বাটীর
 রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উগা বন্ধ
 আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অদৃশ্য, রৌদ্রের তাতে পা পুড়িয়া যায়,
 কাজেই সে স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে
 কোঁটখা তত্বের নখ বাঁধা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কি কতকগুলো যত্ন
 করিয়া সে আসিয়াছিল এই জ্ঞাত যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায়
 এবং মা পুখ হয় থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লটবে।
 কিন্তু বাবাব, বিশেষত মা'র সামনে সমুখ দুয়ার দিয়া বাডী ঢুকিতে তাহার সাহস
 হইল না।

সে নামিয়া সে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না
 পা... বাহ্যভাবে এদিকে এদিকে চাহিতে লাগিল। পরে দেখানেই
 দানের পড়িয়া ও চলেদ খুঁট থলিয়া কতকগুলি শুকনো রডা ফলের বীচি বাহির
 করিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুণিতে আরম্ভ
 করিল, এক—দুই—তিন—চার—ছাব্বিশটা হইল। পরে সে দুই তিনটা
 করিয়া বীচি হাতের উল্টো পিঠে বসাইয়া উচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে
 হাতের সোজা পিঠ পাকিয়া দ্বিভিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—
 অপেক্ষে এইগুলো দেবে—আর এইগুলো পুতুলের বাস্কে রেখে দেবো—কেমন
 বীচিগুলো মনে ১০০ ১০০ কচ্ছে—অজুই গাছ থেকে পড়েছে, ভ্যাগিয়াস আগে
 গেনাম, নৈলে সব গরুতে খেয়ে ফেলে দিতো, ওদের ৫ ডী গাইটা একেবারে
 ব্রাক্স, সব জায়গায় বাবে, সেবাব কতকগুলো এনেছিল আর এইগুলো নিয়ে
 অনেকগুলো হোল।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বীচি আবার সমস্তে আঁচলের খুঁটে বাধিল।
 পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া কক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মতখুশির
 সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

পথের পাঁচালী

নবম পরিচ্ছেদ

অপূর্বের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বখ গাছ ছিল। কেবল তাহার
 মাথাটা উহাদের দালানেব জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপূ
 মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে ততবার
 তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়—
 কোন্ দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—
 মার মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্রদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিশ্বয়মাখা আনন্দের

ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রংএর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়িটা—কুঠির মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝাইতে পারিত না, বালিতে পারিত না কাংকোণ, কিক্ত এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাহত—এবং সবাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এহ কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া কোলিয়াছে—ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্ত তাহার মন কেমন কায় উঠিত, যেখানে সে যাহতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমান মায়ের কাছে বাহবাব জগ মন আগু হইয়া পাড়ত। কত যে এ রকম হইয়াছে। আকাশেব গায়ে অনেক দূরে একটা চিল ডাউয়া যাইতেছে—কমে ছে দ্র—ছোদ্র—ছোদ্র হইয়া নীচুদের তালগাছের ডু ম, খাটা পিছনে ফেলি, দূর আকাশে এমে মিলিয়া যাইতেছে—চাংয়া দোংতে দেখিতে যেমন উড্ডত চিলটা দৃষ্টপথের বাহির হইয়া যাহত, অমান সে চোখ নামাহিয়া লইয়া বাহির-বাটা হহতে এক দৌড়ে বাগাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকাহরত মাকে জড়াইয়া ধরত। মা বাত—ত্যাথো ত্যাথো ছেলেব কাও ত্যাথো—ছাড—ছাড—দেখাছস্ সবুড়ী হাত। ছাডো মানিক আমার, সে না আমার, তোমার জগে এহ ত্যাথো চিংড়িমাছ ভাজা—তুমি যে চিংড়িমাছ ভালোবাসো? ইয়া, তুহুমি করে না—ছাডো—

আহা!দির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনে, কখনে জানালায় ধারে আচল পাতিয়া শুইয়া ছোড়া কাশীদামী মহাভারতখানা সুর করিয়া পাড়ত। বাড়ীর ধারে নারিকেল গাছটাতো শঙ্খচিল ডাকত, অপু নিকটে বাসিয়া হাতের লেখা ক-থ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত। দুর্গাকে তাহার মা বলিত, একটা পান সেজে দে তো দগ্গা। অপু বলিত মা, সেই ঘুটে কুড়োনের গল্পটা? তাহার মা বলে—ঘুটে কুড়োনের কোন গল্প বল তো—ওহ সেই হরিশোডের? সে তো অন্নদামঙ্গলে আছে, এতে তো নেই? পরে পান মুখে দিয়া সুর করিয়া পড়িতে থাকত—

রাজা বলে শুন শুন মূনির নন্দন।

কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন ॥

সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধুদেশে ঘর।

দেবদ্বিজ হিংসা সদা অতি—

অপু অমনি মায়ের মুখের কাছে হাতখানি পাতিয়া বলিত, আমায় একটু পান? মা চিবানো পান নিজের মুখ হইতে ছেলের প্রশারিত হাতের উপর রাখিয়া বলিত—এঃ, বড্ড তেতো—এই খয়েরগুলোর দোষ, রোজ হাতে বারণ করি ও-খয়ের যেন আনে না, তবুও—

জানালায় বাহিরে বাসবনের, দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া-বেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে ভয় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন

একটা মমতা হয়। বধের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—এক হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র, অসহায়, নিপন্ন কর্ণে অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীক্ষ্ণ ছুড়িয়া তাঁহাকে মাঝিয়া ফেলিলেন। মায়ের মুখে এটি অংশ শুনিতে শুনিতে তুংখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না—চোখ চাপাইয়া তাহা নবম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত—সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্নেহ তুংখে চোখের জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহা নবনোবাজ্ঞো নব অন্তর্ভুতির সজীবত্ব লইয়া পবিত্রিত হইতে লাগিল। জীবন-পথের যেদিক মাতৃস্নেহ চোখের জলে, দীনতায় মৃত্যুতে, আশাতত বার্থতায়, বেদনায় করুণ—পুরোনো বইখানার ডেড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট স্বরে, বোদভরা দুপুরের মায়া-অন্ধলি-নির্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত। বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বখ গাছটার দিকে এক একদিন চাহিয়া দেখে—হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোয়া ধোয়া অস্পষ্ট, নয় তো বৈকালের রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে...সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাথানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ঐ অশ্বখ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে বধের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে...রোজই তোলে—রোজই তোলে—মহাবীর, কিঙ্ক চিরদিনের রূপার পাত্র কর্ণ।... বিজয়ী বীর অর্জুন নহে—যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, বধের উপর হইতে বাণ ছুড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল; বিজয়ী কর্ণ—যে, মাতৃস্নেহ চিরকালের চোখেব জলে জাগিয়া রহিল, মাতৃস্নেহ বেদনায় অন্তর্ভুক্তিতে সহচর হইয়া বিবাজ করিল—সে।

এক একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাথারি কিংবা 'হাল্কা' কোন গাছের ডালকে অন্তরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাগবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর হোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন কবলেন কি, একেবারে তুশোটা বাণ দিলে মেয়ে। তারপর—ওঃ—সে কি যুদ্ধ। কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল! (এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মার মুখে কালীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর তো অর্জুন করলেন কি, ঢাল তরোয়াল নিয়ে বধ থেকে লাঙ্কিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! দুর্ধোদন এলেন—ভীষ্ম এলেন—

বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেছে—আর কিছু দেখা গেল না।...
 মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন,
 কিন্তু যুদ্ধ-মাংসের দোহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বৃষিতে পারিতেন,
 যশোলাভের পথ ক্রমশই বিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাজ্ঞা
 নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অঙ্গচালনা করিতে
 পারিতেন কি ?...

গ্রীষ্মকালের দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি !

নীলমণি বায়ের ভিটাব দিকে জঙ্গলের ধায়ে মেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে
 শ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছেন—কপিশ্বজ রথ একেবারে তাঁহার খাড়ের
 উপরে, গাওবী-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র,
 কুকসৈন্তদলে হাহাকাঙ্ক উঠিয়াছে—এমন সময়ে শেওড়া বনের ওদিক হইতে
 হঠাৎ কে কোঁতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ও কিরে অপু ! অপু চমকিয়া
 উঠিয়া আকর্ণ টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি
 জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থিল্ থিল্ করিয়া হাসিতেছে।
 অপু চাহিতেই বলিল—হ্যারে পাগলা, আপন মনে কি বক্চিস বিড়্ বিড়্
 করে, আর হাত পা নাডছিস ? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে ভাই-এর
 কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল !...কোথাকাব একটা পাগল, কি,
 বক্ছিলি যে আপন মনে ?

অপু লজ্জিতমুখে বার বাব বলিতে লাগিল—যাঃ...বক্ছিলাম বৃষ্টি ?...
 আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে—

পরে সে অপূর হাতে ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া
 হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস ?...কত নোনা পেকেচে ?
 ...এখন কি করে পাড়া যায় বল্ দিকি ?

অপু বলিল—উঃ অনেক রে দিদি !—একটা কফি দিয়ে পাড়া যায় না ?

দুর্গা—তুই এক কাজ কর, ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে থেকে আকৃষিটা নিয়ে
 আয় দিকি ! আকৃষি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিকি, আমি আনচি—

অপু আকৃষি আনিলে দুজনে মিলিয়া বচ চেষ্টা করিয়াও চার পাঁচটার বেশী
 ফল পড়িতে পারিল না—খুব উঁচু গাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা
 আকৃষি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল্ আজ এইগুলো নিয়ে
 যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনবো—মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে।
 দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আকৃষিটা নে। নোলক পর্ব্বি ?

একটা নীচু ঝোপের মাধায় ওড়্‌কলমীলভায় শাদা শাদা ফুলের কুঁড়ি, দুর্গা
 হাতের ফলগুলো নামাইয়া নিকটে ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল ? বলিল—
 এদিকে সঙ্গে আয়, নোলক পর্ব্বি—

তাহার দিদি ওড়্‌কলমী ফুলের নোলক পরিতে ভালবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে! অপু কিন্তু মনে মনে নোলক-পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা, বগে, নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছু বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কপটা, আমটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস ছুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপখ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে। কাজেই অন্তায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মত যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে তুর্গা অপু'র নাকে কুঁড়ি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল—তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভাল করিয়া কিরাইয়া বলিল—দেখি কেমন দেখাচ্ছে? বাঃ বেশ হয়েছে—চল্‌ মাকে দেখাইগে—অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

—চল্‌ না—থলে ফেলিস্নে যেন—বেশ হয়েছে—

বাড়ী আসিয়া তুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

তুর্গা বলিল—ঐ লিচু-জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁড়রের মত রাগা—

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ছাথো মা—

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—ও মা! ও আবার কে রে?—কে চিন্তে তো পারচি নে—

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফাল্‌ কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল! —বলিল—ঐ দিদি পরিয়ে দিয়েচে—

তুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্‌ রে অপু, ঐ কোথায় ভুগভুগী বাজছে, চল্‌ বাদর খেলাতে এসেছে ঠিক, শীগগির আয়—

আগে আগে তুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু বাটীর বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাঢ়িয়া, বাদর নয়, ও-পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাধায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ও-পাড়ায তাহার দোকান, তা ছাড়া সে আবার গুড়ের ও ধানব বাবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়তো মাধায় করিয়া হাটে হাটে আলু পটল, কখনও পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়তো সে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া জাত-বাবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আবার পাথুরে চুন মাধায় করিয়া বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছ ছাড়া এমন কোনো জিনিস নাই, ফরা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহরা, লোকে

আজ হইতেই মুড়কী সন্দেশ কিনিয়া রাখিবে। চিনাবাস হরিহর রায়ের দয়ার দিয়া গেলেও বাড়ী ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ীর লোক কখনো কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি ?

অপু দ্বিধা মুখে দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গিয়া মাথার চাঙ্গারী নামাইল—ই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিঘিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ীতে পাঁচ ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুয্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কত্রী।

মেজ-বো-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ-বো একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কী, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্ত লইলেন। ভুবন মুখুয্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্তও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ বো নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।—

চিনিবাস চাঙ্গারী মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্ধ বাড়ী চলিল। দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল দেখিগে, টুন্টদের বাড়ী—

ইহারা সদব দরজা পার হইতেই সেজ-বো মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু, ছুঁড়িটার যে কী ছাংলা স্বভাব—নিজেব বাড়ী আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না, লোকের দোর দোর—যেমন মা তেরনি ছা—

ইহাদের বাড়ীর বাতির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার স্বরে বলিল—চিনিবাসের এ সি তো খাবাব। বাবার কাছ থেকে দেখিস্ রথের সময় চারটে পরমা নেবো—তুই চুটো, আমি চুটো। তুই আমি মুড়কী কিনে খাবো—

থানিকটা পরে ভাবিয়া ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের আর কতদিন আছে রে দিদি ?

সর্বজনা ভবন মুখ্যদোর বাড়ীর কয়া হঠাৎ জল তুলিয়া আনিল, পিছনে
পিছনে অপু মায়ের ঝাঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও বাড়ী হইতে আসিল।
সর্বজনা বডা নামাঠিয়া বাথিয়া বলিল—তা তুই পেছনে পেছনে অমন করে
গুরতলাগলি কেন এত দিকি? ঘরকন্নার কাজকর্ম আরবো তবে তো ঘাটে
যাবো? কাজ কর্তে দিবি না—না?

অপু বলিল—না মোক কাজ তুমি এ বেলা করো এখন মা, তুমি যাও
বাটে। পরে মায়ের সহায়ত্বে গার্কসের আশায় অনীষ করত্বরে কটিল—
আচ্ছা আমার খিদে কি পায় না? আজ চারদিন যে খাইনি।

—খাওনি মোক কথা কি? বোদ্ধবে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আর বাধিয়ে
বসবে, এমি কথা কানে নাও নাকি তোমরা? ছিষ্টর কাজ করবো তবে তো
ঘাটে যাবো। বসে তো নেই? যা, ও রকম তুই করিস নে—তোমাদের
এরমাত্র মত কাজ করবার সাদি আমার নেই, যা—

অপু মায়ের ঝাঁচল আরও জোর কবিয়া মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল—
কখনো তোমার কাজ কর্তে দেবো না। রোজই তো কাজ করো, একদিন বুঝি
বাদ যাবে না? এছাড়া ঘাটে যাও—না, আমি শুনবো না করো দিকি কেমন
কাজ করবে

সর্বজনা পায়ের দিক চাতিয়া হাসিয়া বলিল—ও রকম তুই করো না, ছিঃ
—এই যে গ নো নো আর কেউখানি মব্ব করো—ঘাটে যাবো, ছুটে এসে
নামার ভান চড়ি দেব—তুই করে কি? ছাড় আঁচল, ক'খানা পলতার
বডা ভাজা খানি মব্ব দিকি?

ঘণ্টাখানেক পর অপু মো উৎসাহের সহিত খাইতে বসিল।

দাম তুলিয়া সে বস করি। আত্মকথানি খাশি সব্বি ফেলিয়া, পরে
আরও এক গ্রাম বাতয়া কিছু ভাত পাত্রেব নীচে ছড়াইয়া বাকী জলটুকু শেষ
করে তাম্বুত বসিল।

এক খাচ্ছস মোক সেক্ষণে ভাত ভাত ক'র ইপাচ্ছিলে—পলতার
বড—পলতার বড—এই সবই মোক বাথনি, খেলি কি তবে?

সর্বজনা একটাটি মোক ভাত মাখি। পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি ই
কব—নোমার কপাখান—মণ্ডা না মোঠাই না, তুটো ভাত আর ভাত—তা
ছেলের দশ দেলে হয় অসে—রোজ ভাত বেতে বসে মুখ কাঁচুম'চু—বঁ চবে
কি খেয়ে? বাঁচত কি এসে? আমায় জ্বালাতে এসে বঁ তো নয়—ও-
রকম মুখ ঘুরিও না ছিঃ—ই কবে লক্ষী—দেখি এই দলাটা হ'লেই খোয়ে গেল
—আবার ওবেলা টুটুদের বাড়ী মনসার ভাসান হবে। তুই জানিস নে বুঝি?
ঈগিরি খেয়ে নিয়ে চলো। আমরা সব—

দুর্গা বাড়ী ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধূলা
কপালের সামনে এক-গোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উচু হইয়া
আছে। সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে—পাড়ায় সমবয়সী ছেলেমেয়ের

তাহার বড় একটা খেলাধুলা নাই—কোথায় কোন্ কোণে বৈচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন্ গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন্ বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্ট—এ সব তাহার নখদর্পণে? পথে চলিতে চলিতে সে সবদা পথেব দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—কোথাও কাচপোক' বসিয়া আছে কি না। যদি কোথাও কটিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ খেলাঘবের বেগুন করিবার জন্ত তাহা তুলিতে বাঁধিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপরা লইয়া ছুঁড়িয়া পবীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা যমুনা খেলায় কোন্ খানায় ভাল তাক হয়—পরীক্ষায় যে-খানা ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সে সময়ে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্বদাই সে পুতুলের বাস্তু ও খেলাঘবের সরঞ্জাম লইয়া মহাবাস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়েব দিকে চাহিল। সবজয়া বলিল—এলে। এসো, ভাত তৈরী। থেয়ে আমার উদ্ধার করো—তারপর আবার কোনদিকে বেরতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে ছাথো গে ষান্দ সঁজুতি করচে, শিবপূজা করচে—আর অতবড় ধাড়ী মেয়ে—দিনরাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন ঐট বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েছে, এখন এল বাড়ী—মাথাটার ছিপি ছাথো না। না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিকুণী ছোঁয়ানো—কে বলবে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন ঢলে কি বাগ্‌দীদের কেউ—বিষেও হবে ঐ ঢলে-বাগ্‌দীদের বাড়ীতেই—আঁচলে ওগুলো কী ধনদৌলত বাঁধা—খোল্—

দুর্গা ভয়ে ভয়ে আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে কহিল—ওই গায় কাকাদের বাড়ীর সামনে কালকাস্তুরে গাছে—পরে ঢোক গিলিয়া কহিল—এই অনেক বেনেবো তাই—

বেনে-বো এর কথায় হৃদয় গল না এমন পাশাপা জীবও জগতে অনেক আছে। সর্বজয়া তেলে-বেগুনে জলিয়া কহিল—তোর বেনেবোয়ের নিকুচি করেছে, যত ছাই আর ভস্মো রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুবচেন—আজ টান্ মেরে তোমার পুতুলের বাস্তু ঐ বাঁশতলার ভোবায় যদি না ফেলি তবে—

সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন যখন বাড়ীর সেজ-ঠাকুর পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুঙ ও দেওরের ছেলে সত্, তাহাদের পিছনে আর চার পাঁচটি চেনেমেয়ে সম্মুখে দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সেজ-ঠাকুর কোনো দিকে না চাহিয়া বা বাড়ীর কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন হন করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের চেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কৈ নিয়ে আয়—বের কর পুতুলের বাস্তু, দেখি—

এ বাড়ির কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই টুঙ ও সত্, চক্‌নে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাস্তুটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুঙ বাস্তু খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর একছড়া পুঁতির মালা

বাহির করিয়া বলিল—এই জাখো মা, আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেলতে গিয়েছিল, সেদিন চুনি করে এনেচে।

সতু বাজের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমার গুটি বাহির করিয়া বলিল—এই জাখো জ্যোতিমা আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

বাণপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ীর সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুঁজিয়া বলিল—কি, কি খুঁজিয়া? কি হয়েছে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

—এই জাখো না কি হয়েছে, কীর্তিখানা জাখো না একবার—তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টম্বুর পুতুলের বাস্ক থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে—মেয়ে কদিন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বললে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্গাদিদিব বাজের মধ্যে দেখে এলাম—জাখো একবার কাণ্ড—তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর—চোরের বেহন্দ চোর—আর ওই জাখো মা—বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেখি নয় না—চুনি করে নিয়ে এসে বাজের লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিতভায়ে আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনিচিস্ এই মালা ওদের বাড়ী থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজ-বো বলিলেন—না জানলে কি আর মিথ্যে করে বলচি নাকি! বলি এই আম কটা জাখো না? সোনামুখীর আম চেন না নাকি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না সেজখুড়ী, আপনার কথা মিথ্যে তা তো বলিনি। আমি ওকে জিগোস করচি।

সেজ-ঠাকুরপা হাত নাড়িয়া ঝাঁঝেব সহিত বলিলেন—জিগোস কলো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্ছি—এই বয়েসে যখন চুরি বিত্তে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে। চল বে সতু—নে আমার গুটিগুলো পেড়ে নে—বাগানের আমগুলো লম্বিছাড়া ছুঁড়ীর জালায় যদি চোখে দেখবার জো আছে। টম্বু, মালা নিইচিই তো?

সর্বজয়ার কি জানি কেমন একটু বাগ হইল—ঝগড়াতে সে কিছু পিছু হটবার পাত্র নয়, বলিল—পুঁতির মালায় কথা জানিনে সেজ-খুড়ী, কিন্তু আমার গুটিগুলো সেগুলো পেড়েছে কি তলা থেকে কুড়িয়ে এনেচে, তার গায়ে তো নাম লেখা নেই সেজখুড়ী—আর ছেলেমানুষ যদি ধরো এনেই থাকে—

সেই-ঠাকুরপা অস্বস্তি হইয়া বলিলেন—বলি কথাগুলো তো বেশ কেটে কেটে বলচো? বলি আমার গুটিতে নাম লেখা না-হয় নেই-ই তোমাদের

কোন বাগান থেকে এগুলো এসেচে তা বলতে পার ? বলি টাকাগুলোতেও তো নাম লেখা ছিল না—তা তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলে ? আজ এক বছরের ওপর হয়ে গ্যালো, আর দেবো কাল দেবো—আসবো এখন এমন—টাকা দিয়ে দিও—ও আমি আর বাখতে পারবো না—টাকার জোগাড় করে রেখো বলে দিচ্ছি ।

দলবল সহ সেজ ঠাকুরদেবজার বাহির হইয়া গেলেন । সর্বজয়া স্তনিত পাইল পথে কাহাব কথার উত্তরে তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন—ওই এ-বাড়ীর ছুঁড়ীটা, টুকুর বাক্স থেকে এই-পুঁতির মালাছড়াটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে কবেচে কি নিজের বাস্কে লুকিয়ে রেখেচে—আর জাখো না এই আম-গুলো—পাশেই বাগান, যত ইচ্ছে পাড়লেই হোল—তাই বলতে গেলাম, তা আমায় আবার কেটে কেটে বলচে—(এখানে সেজ-বো সর্বজয়ার কথা বলিবার ভঙ্গী নকল করিলেন)—তা—এনেচে ছেলেমানুষ—ও রকম এনেই থাকে—ওতে কি তোমাদের নাম লেখা আছে নাকি ? (স্বর নীচু করিয়া) মা-ই কি কম চোর নাকি, যেহেতু শিকে কি আর অমনি হয়েছে ? বাড়ীস্থদ্ধ সব চোর—

অপমানে চোখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল । সে ফিরিয়া দুর্গার রুদ্ধ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ভাল-ভাত মাখা হাতেই ঢুড়-মাড় করিয়া তাঁহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চডের উপর চড মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—অ'পদ্-বালাই একটা কোণেকে এসে লাটেছে—মলেও আপদ চুকে যায়—মরেও না যে বাঁচি—তাড় জুড়োয়—বেহা বাড়ী থেকে, দূর হয়ে যা—যা এখুনি বেরে—

দুর্গা মার খাইতে খাইতে ভয়ে খিডকী-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল । তাহার ছেঁড়া রুদ্ধ চুলের গোছা ভ-এক গাছা সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল ।

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত বাপার দেখিতেছিল । দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে হতার আগে কোনও দিন দেখে নাই—কিন্তু আমার গুটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে । কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুকুর বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখীর তলায় আম ক'টা পড়িয়াছিল, দিদি কড়াইয়া লইল, সে জানে । কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে—ও অপু, এবার সেই আমার গুটিগুলো জারাবো, কেমন তো । কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ী উপস্থিত থাকার দরুন উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই । দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আশ্বস্তি এভাবে লটয়া গেল, তাহার উপর আবার দিদি একপভাবে মারও খাইল । দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল । যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুদ্ধ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে—তখনই কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়—কেমন যেন মনে হয়, দিদি কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—

উহার সাথে কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে—সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অণু মায়ের ভয়ে ধরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেনা একটু পড়িলে সে টুণ্ডের বাড়ী, পটুন্দিদের বাড়ী, নেড়াদের বাড়ী—একে একে সকল বাড়ী খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই। রাজকুই পানিতের দ্বী ঘাট হঠাৎ জল লইয়া আসিতেছিলেন—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিমা, আম'র দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি,—মা তাকে অ'জ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পানিরেচে দেখেচো জ্যোতিমা?

বাড়ীর পাশের পথ দিয়া যাহতে যাইতে ভাবিল—বাঁশ-বাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কি-দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেহ নাই! তাহার মা বোধহয় ঘাটে কি অ'জ কোথাও গিয়াছে। বাড়ীতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সমুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় খুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুকনো কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজঝোলা হলদে পাখী আসিয়া বসিয়াছে। রোজই যক্ষ্মার কিছু পূর্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ঐ কঞ্চিখানার উপর বসে—রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কি পাখী চারিদিকের বনে কিচ্‌ কিচ্‌ করিতেছে। নীলমণি রায়েদের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। অণু রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অ'থ গাছটার মাথার দিকটায় চাহিয়া দেখিল—একটু-একটু রাঙা বোদ গাছের মাথায় এখন মাথানো, মগডালে একটা কি সাদা ম'ত হুলিতেছে, হয় বক, নয় কাহার ঘুড়ি ছিড়িয়া আটকাইয়া ঝুলিতেছে—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন ছায়া আর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। চারিদিক নির্জন...কেহ কোনোদিকে নাই...নীলমণি রায়ের পোড়ো ভিটার কচুঝাড়ের কালে ঘনসবুজ নতুন নতুন পাতা চক্‌ চক্‌ করিতেছে। তাহার মন হঠাৎ হ-হ করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ী আসে নাই, খায় নাই—কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখ্যের বাড়ীর ছেনেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে! রাণু তাহাকে দোখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অণু এসেচে...ও আমাদের দিকে হবে, আয় রে অণু।

অণু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি খেলবো না রাণুদি—দিদিকে দেখেচো?

রাণু জিজ্ঞাসা করিল,—হুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি! বকুলভলায় নেই তো?

বকুলভলায় কথা তাহার মনেই হয় নাই! সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে

বটে! ভুবন মুখোয়ার বাড়ী হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুলগাছটা অনেক-দূর পর্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ধুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই যদি... কোনোদিকে গাছপালার আড়ালে থাকে। সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি। দিদি?

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলো বক পাখা ঝটপট করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরেব দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলা হইতে একটু দূরে ডোবার ধারে তেরুর গাছ আছে, এখন ডাশা খেলুকের সময়, সেখানেও তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাসবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না। বকুলগাছের গুড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই-একবার চীৎকার করিয়া ডাকিল—দাদা-শেখুদা বনে কি জন্ত তাহার গলাব মাডা পাইয়া খসখস শব্দ করিয়া ডোবাব দিকে পলাইল।

বাড়ীর পথে নিবিতে ক্রিমে হঠাৎ সে ধমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাব গাছটা। একা সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের শাখার পথ দিয়া যাওয়া! সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। কেন যে তাহার এই গাছটার নীচে নিশা যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোন কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়া ভয় অত্যন্ত বেশী করে। এত দেরী পর্যন্ত সে কোনোদিন বাড়ীর বাহিরে থাকে নাই—আজ তাহার সে খেয়াল হইল না। মন বাস্তব ও অসম্ভব ন! থাকিলে সে কখনই এ পথে আসিত না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ী যাইবার আর একটা পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পটুলিদের বাড়ীর উঠান দিয়া গেলে গাবতলায় এ অজানা বিভীষিকার হাণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পটুলির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বোয়াকে ছেনেলিদের নইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পটুলির মা রান্নাঘরে ব্যস্তিত্বেন। উঠানের মাচাতলায় দিব জেনেনী দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পরমা ভাগাদা করিতেছে

অপু বি —দিদিকে গুজতে গিয়েছিলাম ঠাকুমা—বকুলতলা থেকে আসতে—

ঠাকুমা বলিলেন—ভুগ্গা এই তো বাড়ী গেল। এই কতক্ষণ যাচ্ছে—ছুটে যা দিকি—বোধহয় এখনো বাড়ী গিয়ে পৌঁছয়নি—

সে একে দৌড়ে বাড়ীর দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পটুলির বোন রাজী চোঁচাইয়া বলিল—কাল সকালে আসিস অপু—আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেচি। ঢেঁকশালের পেছনে নিমতলায়—ভুগ্গাকে বলিস—

তাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া হঠাৎ সে ধমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—ভুগ্গা অপর্যবে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর দরজা দিয়া দৌড়াইয়া বাহির

হইতেছে—পিছনে পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে মারিতে মারিতে ভাড়া করিয়া ছুটিয়া আনিয়াছে। দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হঠাৎ বাবমানা মেয়ের পিছনে চোঁচাইয়া বলিল—যাও, বেগেও—একেবারে জয়ের ম. যাও—আর কক্ষনো বাড়ী যেন ঢুকতে না হয়—বানাই, আপদ চুক বাক—একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।

ছাতিমতলায় গামের ক্ষণ। অপূর্ণ সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মত আদর ও ভাবী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়ীতে ঢুকিয়া মাটির দলীপতা বোয়াকে দাব হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ঢুকিতে তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আবার কোথা? পথস্থ কোথায় ছিলে তুমি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো?

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে কোথায় কোথায় ছিল? উপর বেলা দিদি কি খাইল? সে কি আবার কোন মিনিচ চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিছ ভয়ে কোন কথা না বলিয়া সে কলের পাতার মত মায়ের কথা মত কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদপ টুঙ্গাই নিজেব ছোট বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িলে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ—কিছু দপ্তরের দুখানা মোটা মোটা ভাবী উৎসাহী কি বই, কবিরাজী ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা ছেঁড়া দাক্তবায়ের পাঠ্যনীতি, একখানা ১৩০০ সালের পুরাতন পাঞ্জি প্রভৃতি। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি যোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি পড়িতে পারিলেও বেজে একবার করিয়া খলিয়া দেখে।

সে দিন মন দাক্তবায়ের দিকে চাইয়া সে কি ভাবিল। পবে আর একবার প্রদপ পড়িয়া দিদি প. ছেঁড়া দাক্তবায়ের পাঠ্যনীতি খুলিয়া অল্পমনস্কভাবে পাতা পড়িতেছে, এমন সময়ে সর্বজয়া এক বাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল—মা, খেয়ে ন. দিদি।

অপূর্ণ একটু না করিয়া বাটি উঠাইয়া দুধ চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অল্পদিন হইল এ. সর্বজয়া দুধ খাইতে তাহাকে সজী করানো খুব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে বাটি মুখ হইতে নামাইল। সর্বজয়া বলিল—ক'ক? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো—ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাচবে কি খেয়ে—

অপূর্ণ বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া বহিয়াছে কিং চুমুক দিতেছে না... তাহার বাটিহীন হাতটা কাপিতেছে পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি হোল যে? কি হয়েছে, জিভ কামড়ে ফেলেছিল?

অপূর্ণ মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাধ না মানিয়া ভুকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—দিদির জন্তে বড্ড মন কেমন করছে!...

সর্বজয়া অল্পকণ মাত্র চূপ করিয়া বসিয়া পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শাস্ত্রহরে বলিতে লাগিল—কৈদো না, অমন করে কৈদো না,—ঐ পটলিদের কি নেড়াদের বাড়ী বসে আছে—কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুই স্নেহে নাকি? সেই দুপুর বেলা বেকল—সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না—না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় গুপাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, একুনি ভাকতে পাঠাচ্ছি—কৈদো না অমন করে—আবার দর আসবে—তি ।

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বাকী দুপটু খাওয়াইবার জন্য বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল—হাঁ কণো দিকি, পদ্মী, সোনা, উনি এনেই ডেকে আনবেন এখন—একবারে পাগল—কোথেকে একটা পাগল এসে জয়েছে—আর এক চুমক—হ্যাঁ—

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরের তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপু পাশে তাহার মংঘের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনও রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসেন নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। বাবা বাড়ী আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ী আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া দাওয়া সারিয়া আসিয়া চূপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, মা কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দেশে বেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েছে?

দুর্গার মুখে কোন কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আমার উপর রাগ করেচিস, দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আঙুলে আঙুলে বলিল—না বৈকি! তবে সত্য কি করে টের পেলো যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উদ্দেশ্যনায় উঠিয়া বসিল। না—সত্যি আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোমার বাক্সে আছে—কাল সত্য বিকেল বেলা এসেছিল, ওর সেই বড় বাগা ভাঁটাটা নিয়ে আমবা খেলছিলাম—তারপর, বুঝলি দিদি, সত্য তোমার পুতুলের বাক্স খুলে কি দেখছিল—আমি বললাম, তাই, তুমি দিদির বাক্সে হাত দিও না—দিদি আমাকে বকে—সেই সময় দেখেচে—

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেছে—দুট বেরিয়েছিল, এখনও কন্ কন্ কচ্ছে, এইখানে এই ডাখ্ হাত দিয়ে! এই—

এইখানে, তাই ত রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু শিদিয়ের ভেল
লাগিয়ে দেব দিদি?

খাকগে—কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাব বুখ্‌লি? কারবালা
যা পেকেছে। এই এই এত বড় বড়, কাউকে যেন বলিসনে। তুই আর আমি
চুপি চুপি যাবো—আমি আজ দুপুর বেলা ছুটো পেড়ে খেয়েচি—মিষ্টি যেন গুড়—

পথের পাচালী

একাদশ পরিচ্ছেদ

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া
কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা
মায়ের তরে নকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানের পৈপেতনার পুণিপুঙ্কুরের
ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে
ছোলা মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল—ভিজে মাটিতে সেগুলির স্বকুর বাতির হইয়াছে
—চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুতিয়া ধারে পিটুলি গোলার অলপনা
দিতেছে—পদ্মলতা,—পাখী, ধানের শীষ, নতুন গুঠা সূর্য।

দুর্গা বলিল,—দাঁড়া, মস্তুরটা বলে চল একজায়গায় যাব।

—কোথা রে, দিদি—

—চল না, নিয়ে যাবো এখন, দেখিস এখন—। পরে আত্মবক্ষিক বিধি—
অন্তর্ধান সাক্ষ্য করিয়া সে এক-নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

পুণিপুঙ্কুর পুষ্পমালা কে পুজে রে দুকুর বেলা?

আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন্ ভাগ্যবতী—

অপু দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বিজ্রপের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল—ইঃ!

দুর্গা ছড়া খামাইয়া ঈষৎ লজ্জা মিশানো হাসির সঙ্গে বলিল—তুই ও-রকম
কচিস কেন? যা এখান থেকে—তোর এখানে কি?—যা।

অপু হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল—আমি
সতী লীলাবতী ভাই বোন্ ভাগ্যবতী, হি হি—ভাই বোন্ ভাগ্যবতী—হি হি—

দুর্গা বলিল, তোমার বড় ইয়ে হয়েছে, না? মাকে বলে তোমার ভাগ্যচানো
বার করবো এখন—

ব্রতান্তর্ধান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল গড়ের পুঙ্কুরে অনেক পানফল হ'য়ে
আছে—ভোঁদার যা বলছিল, চল নিয়ে আসি—

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে চারিধারে বীশবন ও আগাছা এবং প্রাচীন
আমকাঠালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূরে
গভীর বন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুঙ্কুরটা।
কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারদের বাড়ীর চতুর্দিকে যে গড়খাই
ছিল তাহার অন্ত অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে—কেবল এই ক্ষতচাত্তে

আমোদ্যল জল থাকে, ইহাৰাই নাই থকৈ পুহুৰ। বজুৰদাৰদেৱ শাকীৰ কোন চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌছিয়া তাহাৰা দেখিল পুহুৰে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনাৰাৰ ধৰে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূৰে। দুৰ্গা বলিল—অপু, একটা বাঁশেৰ কক্ষি গাথ তো খুঁজে—তাই দিয়ে টেনে টেনে আনবো। পৰে সে পুহুৰধাৰেৰ কোপেৰ শেঙড়া গাছ হইতে পাকা শেঙড়ৰ ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনেৰ মধ্যো কক্ষি খুঁজিতে খুঁজিতে দোথতে পাইয়া বলিল—ও দিদি, এ ফল খাস্নি!—দূৰ—আশ্চাওড়ৰ ফল কি খায় বে? ও তো পাখীতে খায়—

দুৰ্গা পাকা ফল টিগিয়া বীজ বাহিৰ কৰিতে কৰিতে খানেক খায় দিদি—গাথ দিদি খেয়ে—মিষ্টি যেন শুড়—কে বলেচে খানেক? এ মি তো কত খেইচি।

অপু কক্ষি-কড়ানো ৰাখিয়া দিদিৰ কাছে আসিয়া বসিল। এনে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিদি, দিদি—

পৰে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু কৰিয়া বলিল—এটু এটু তেতো যে দিদি—

—তা এটু তেতো থাকবে না? তা থাক, কেমন মিষ্টি বল দিদি—কথা শেষ কৰিয়া দুৰ্গা খুব খুশিৰ সহিত গোটা কতক পাকা ফল মুখেৰ মৰো পুৰিল।

জমিয়া পৰ্যন্ত ইহাৰা কখনো কোনো ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অৰ্থচ পৃথিৱীতে ইহাৰা নতন আসিয়াছে, জিহা ইহাদেৰ নতন—এটা পৃথিৱীৰ নানা ৰস, বিশেষত মিষ্ট ৰস আনন্দ কৰিবাৰ জন্য লাগতি। দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পৰিতৃপ্ত লাভ কৰিবাৰ স্বেযোগ ইহাদেৰ ঘটে ন—বিশ্বৰ অনন্ত-সম্পদেৰ মধ্যো তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টৰস আতৰণবত এই সব লক্ষ দৰিদ্ৰ ধৰেৰ বালক-বালিকাদেৰ জন্য তাই কৰুণাময়ী বনদেবীৰা বনেৰ তুচ্ছ ফল ফল মিষ্টি মধুতে ভৰাইয়া ৰাখেন।

ধানিকটা পৰে দুৰ্গা পুহুৰেৰ জলে একটু নামিয়া বলিল—কত ভাল ফল রয়েছে অপু। দাঁড়া তুল্চি! জলে আৰও নামিয়া সে দুইটা ফুলেৰ লতা ধৰিয়া টানিল—গাঙৰ ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—ধব্ব অপু। অপু বলিল—পানফল তো খুব জলে—ওখানে কি ক'ৰে যাবি দিদি? দুৰ্গা একটা কক্ষি দিয়া দূৰ জলেৰ পানফলেৰ গাছগুলা টানিবাৰ চেষ্টা কৰিয়া পাৰিল না। বলিল—বড্ড গড়ানো পুহুৰ বে—গড়িয়ে যাছি ডুবু জলে—নাগাল পাই কি ক'ৰে? তুই এক কাজ কৰ, পেছন থেকে আমাৰ আঁচল ধৰে টেনে ৰাখ দিদি, আমি কক্ষি দিয়ে পানফলেৰ এ কাঁকটা টেনে আনি।

বনেৰ মধ্যো হল্বে কি একটা পাখী ময়নাকাঁটা পাছেৰ ভালেৰ আগায় বসিয়া পাছা নাচাইয়া জাৰি শিৰ দিতেছিল। অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কি পাখী বে দিদি?

—পাকী-টাঙ্কি এখন থাক—ধর দিকি বেশ ক’রে আঁচলটা টেনে, গড়িয়ে
যাবো—জোর ক’রে—

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রহিল। দুর্গা পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর
যায় কক্ষি আগাইয়া দিল। কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে
না—আরও একটুখানি নামিয়া আঙুলের আগায় যাত্র কক্ষিখানাকে ধরিয়া
টানিবার চেষ্টা করিল। অপু টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর
কুলাইতছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে আঁচল
ঢিলা ২ এমতে দুর্গা জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল কিন্তু তখনই সামলাইয়া হাসিয়া
বলিল—দর, তুই যদি কোনো কাজের ছেলে—ধব ফের। অতিকষ্টে একটা
পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল—দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল
কতগুলো পানফল ধরিয়াছে। পরে ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—বড্ড কচি,
এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধব তো। অপু আবার পিছন হইতে
টানিয়া ধরিয়া রহিল। খানিকটা থাকিবার পর সে দিদির ঝুঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে
টানের চোটে আবার ড-এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল—
পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল, দূর।

ভাববোনের কলহাস্ত্রে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুর প্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান
মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল—এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে ?
গাবের ঢেঁকী কোথাকার !

খানিকটা পবে দুর্গা জলে নামিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেছে,
অপু ডাঙায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শেওড়া গাছের
দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চৈচাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, তুখ কি এখানে।
... পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কি তুলিতে লাগিল !

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি রে ? পবে সেও উঠিয়া ভাইয়ের কাছে
আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটি খুঁড়িয়া কি একটা বাহির করিয়া কৌচার কাপড় দিয়া
মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আল্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া
বলিল—তুখ দিকি, চক্চক কচ্ছে—কি জিনিস রে ?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল—গোলমত একদিক ছুঁচোলো পল-কাটাকাটী
চকচকে কি একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে
উন্টাইয়া পান্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহাৎ রুম্বচুলে-ঘেরা মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল। সে
ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপি-চুপি
বলিল—অপু, এটা বোধ হয় হীরে ! চূপ কর, চৈচাসনে। পরে ভয়ে-ভয়ে
আর একবার চারদিকে চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি ভাবায়

অজ্ঞাত নয় বটে—মাগের মুখে, দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার
হীরাযুক্তার অলঙ্কারের ঘট। সে অনেকবার শুনিয়াছে; কিন্তু হীরা জিনিসটা
কি রকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে
হইত হীরা দেখিতে মাছের ডিমের মত, হৃদয়ে হৃদয়ে, তবে নয় নয়—শক্ত। ...

সর্বজন্ম বাড়ী ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল—ছেলেমেয়ে বাড়ীর
ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা, চুপি চুপি
বলিল—মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের গুহুরে পানফল
ভুলতে গিয়াছিলাম মা। সেখানে জল্লের মধ্যে এঁটে পোতা ছিল।

অপু বলিল—আমি দেখে দাদকে বললাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মাগের হাতে দিয়া বলিল—ত্যাগো
দিকি কি এটা মা?

সর্বজন্ম উন্টাইয়া পান্টাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপি চুপি বলিল—মা,
এটা ঠিক হীরে—নয়?

সর্বজন্মরও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট নহে। সে
সন্ধিস্থত্রে জিজ্ঞাসা করিল—তুই কি ক'রে জানলি হীরে?

দুর্গা বলিল—মজুমদারেরা বড়লোক ছিলো তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে
কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল—পিসি গল্প করতো। এটা একেবারে
গুহুরের ধারে বনের মধ্যে পোতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চক্‌চক্‌ করছিল,—এ
ঠিক মা হীরে।

সর্বজন্ম বলিল—আগে উনি আসুন, ওকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আত্মাদের সহিত ভাইকে বলিল—হীরে যদি
হয়, তবে দেখিস্ আমরা বড়মাহুয হয়ে যাবো।

অপু না বুঝিয়া বোকার মত হিহি করিয়া হাসিল,

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে জিনিসটা বাহির করিয়া সর্বজন্ম ভাল করিয়া
দেখিতে লাগিল। গোলমত, ধারকাটা ও পলতোলা, এক মুখ ছুঁগোলো—
যেন সিন্দুর কোটার ঢাকনির উপরটা। বেশ চক্‌চকে। সর্বজন্মর মনে হইল
যেন অনেক রকম বস্তু সে ইহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। তবে কাচ যেন নয়—
ইহা ঠিক! এরকম ধরণের কাচ সে কখনো দেখিয়াছে বলিয়া তো মনে হয়
না। ইহাও তাহার সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, তাহার
মনের এক কোণে নানা সন্দেহের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুশাশা ভয়ে ভয়ে
একটু উকি মারিল—সত্যিই যদি হীরে হয় তা হোলো?

হীরক সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা পরম্পরায় কিংবা শাপের মাধ্যম যদি জাতীয়
ছিল। কাহিনীর কথা মাত্র, বাস্তব জগতে বড় একটা দেখা যায় না; আর
যদি বা দেখা যায়, তবে ছুনিয়ার ঐশ্বর্য বোধহয় এক টুকরা হীরার বদলে পাওয়া
বাইতে পারে।

, থানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ী ঢুকিল।

সর্বজয়া বলিল—ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো ! ত্যাখো তো এটা কি !
হরিহর তাতে লইয়া বলিল—কোথায় পেলো ?

—দুগ্‌গা গডের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিল. কুড়িয়ে পেয়েছে । কি
বলো দিকি ?

হরিহর খানিকটা উন্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখিয়া বলিল—কাচ, না হয়, পাথর-
টাথর হবে—এস্টুক জিনিস. ঠিক বুঝতে পাবচি নে ।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল—কাচ হইলে
তা'র স্বামী কি চিনতে পারিত না ? পবে সে চূপিচূপি, যেন পাছে স্বামী
বিকঙ্কযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল—হীরে নয় তো ? দুগ্‌গা বলছিলো
মজুমদার বাড়ীর গড়ে তো কত লোক কত কি কুড়িয়ে পেয়েচে ? যদি
হীরে হয় !

—হ্যা. হীরে যদি পথেঘাটে পাওয়া যেতো তবে আর ভাবনা কি ছিল ?
তুমিও যেমন !...তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ । পরক্ষণেই কিন্তু
মনে হইল—হয়ত হইতেও পারে । বলা যায় কি ! মজুমদারেরা বড় লোক
ছিল । বিচিত্র কি যে হয়ত তাহাদেরই গহনায়-টহনায় কোনো কালে বসানো
ছিল, কি কবিতা মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে । কথায় বলে, কপালে না
থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের
মত ঘটবে ?

সে বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলী-বাড়ী দেখিয়ে আনি ।

রা'দিতে রা'দিতে সর্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল—দোহাই
ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায় । এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের—
বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর !

তাহার বৃকের মধ্যে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতেছিল ।

খানিকটা-পরে দুর্গা বাড়ী আসিয়া আগ্রহের স্বরে বলিল—বাবা এখনও
বাড়ী ফেরে নি, হ্যা মা ?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বলিল—হুঃ, তখনই আমি বলায় এ
কিছুই নয় । গাঙ্গুলী মশায়ের আমাই সত্যাবা কল্‌কাতা থেকে এসেছেন—
তিনি দেখে বলেন, এ একরকম বেলোয়ারী কাচ—ঝাড়-লঠনে বুলোনো থাকে ।
রাস্তাঘাটে যদি হীরে-জহবং পাওয়া যেত তা হোলে...তুমিও যেমন !

পথের পাঁচালী

ছাদশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখমাসের দিন । প্রায় দুপুর বেলা ।

সর্বজয়া বাটনা বাটিতে বাটিতে ডান হাতের কাছে রক্ষিত একটা ফুলের
সাজিতে (অনেকদিন হইতে ফুলের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই, মশলা
রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়) মশলা খুঁজতে গিয়া বলিল—আবার

‘জিয়ে-বরিতেব পুটুলিটা কোথায় নিয়ে পালালি ? বড় জালাতন কচ্চিস্ অণু—স্বাধতে দিবিনে ? তারপব একটু পরেই বোলো এখন—মা কিদে পেয়েছে ! অণুর দেখা নাই ।

—দিয়ে যা বাপ আমার, কান্দী আমার—কেন জালাতন কচ্চিস্ বল্ দিকি ? দেখচিস্ বেলা হ’য়ে যাচ্ছে ?

অণু রান্নাঘরের ভিতর হইতে দুয়ারের পাশ দিয়া ঈষৎ উকি মারিল, মায়ের চোখ মেদিকে পড়িতেই তাহার দুইমির হাসি ভরা টুকটুকে মুখখানা মায়কের খোলার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার মত তৎক্ষণাৎ আবার দুয়ারের আড়ালে আবৃত্ত হইয়া গেল । সর্বজয়া বলিল—ত্যাখ দিকি কাণ্ড—কেন বাপু দিক করিস্ ছুপ্তুর বেলা ? দিয়ে যা—

অণু পুনরায় হাসিমুখে ঈষৎ উকি মারিল ।

—এ আমি দেখতে পেয়েছি—আব লুকুতে হবে না, দিয়ে যা—

সর্বজয়া ছেলেকে ভালরূপেই চিনিত । যখন অণু ছোট্ট-খোকা দেউবছরেরটি তখন দেখিতে সে এখনকার চেয়েও টুকটুকে ফর্সা ছিল । সর্বজয়ার মনে আছে, সে তাহার ডাগর চোখ-হুটিতে বেশ করিয়া কাজল পরাইয়া কপালের মাঝখানে একটা টিপ পরাইয়া দিত ও তাহার মাথায় একটা নীল ধংএর কমলাবের ঘুটিওয়ালা পশমের টুপি পরাইয়া, কোলে করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বাহিরের বকে দাঁড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে স্তর টানিয়া টানিয়া বসিত—

আয়রে পাখী—ই—ই লেজঝোলা,

আমার থোকনকে নিয়ে—এ—এ—গাছে তোলা

খোকা ট্যাপা-ট্যাপা ফুলো-ফুলো পালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ণ দম্ভহীন-মাডি বাহির করিয়া আল্ফন্দে আটখানা হইয়া মল-পর্য্যাসম্ভবরূপ ছোট্ট পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া বসিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত । সর্বজয়া হাসিমুখে বলিত—ওমা, খোকা আবার কোথায় লুকোলো ? তাইতো, দেখতে তো পাচ্চিনে । ও খোকা ! পরে সে ঘাড়ের দিকে মুখ ফিরাইতেই শিশু আবার হাসিয়া মুখ লায়নের দিকে ফিরাইত এবং নির্বোধের মত হাসিয়া মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইত । কতই সর্বজয়া বলিত—ওমা, কৈ আমার খোকা কৈ—আবার কোথায় গেলো—কৈ দেখি—কতই শিশুর খেলা চলিত । বারবার সামনে পিছনে ফিরিয়া সর্বজয়ার ঘাড়ে ব্যথা হইলেও শিশুর খেলা শেষ হইত না । সে তখন একেবারে আনন্দের টাটকা, নতুন সংসারে আসিয়াছে । জগতের অসুদৃশ্য আনন্দ-জগতের এক অণুর সন্ধান পাইয়া তাহার অবোধ মন তখন সেইটাকে লইয়াই জোড়ীর মত বারবার আনন্দ করিয়া সাদ মিটাইতে পারিতেছে না—তখন তাহাকে ধামায় এমন সাধ্য তাহার মায়ের কোথায় ? খানিকক্ষণ এরূপ করিতে করিতে তাহার ক্ষুদ্র শরীরে শক্তির ভাণ্ডার জুগাইয়া আসিত, সে হঠাৎ যেন অজ্ঞান হইয়া হাই তুলিতে থাকিত—সর্বজয়া ছোট্ট হাঁ-টির সামনে তুড়ি দিয়া

বলিড—বাট বাট—এই জাথো দেয়ালা ক'রে ক'রে এইবার বাছার আমার খুঁম আসচে। পরে সে মুখ-নয়নে শিশু-পুঞ্জের টিপ-কাজল-পর্য্য কচি-মুখের দিকে চাহিয়া বলিত—কত বড়ই জানে সনকু আমার—তবুও তো এই যেটের দেড় বছরের! হঠাৎ সে আকুল চুখনে থোকার রাঙা-গাল দু'টি ভরাইয়া ফেলিত। কিন্তু মায়ের এই গাঢ় আদরের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই শিশুর নিজাতুর আখিপাতা ঢুলিয়া আসিত; সর্বজয়া থোকার মাথাটা আন্তে আন্তে নিজের কঁধে রাখিয়া বলিত—ওমা, সন্দেবেলা জাথো ঘুমিনে পডলো! এই ভানচি সন্দেটা উৎকলে দুধ খাইয়ে তবে ঘুম পাড়াবো—জাথো কাণ্ড। ..

সর্বজয়া জানিত—ছেলে আট বছরের হইলে কি হইবে সেই ছেলেবেলাকার মত মায়ের সহিত লুকোচুরি খেলিবার সাধ এখনও মিটে নাই।

এখন সব স্থানে সে লুকায় যেখান হইতে অন্ধও তাহাকে বাহির করিতে পারে; কিন্তু সর্বজয়া দেখিয়াও দেখে না—এক জায়গায় বসিয়াই এদিকে ওদিকে চায়, বলে—তাই তো! কোথায় গেল? দেখতে তো পাচ্চিনে!... অপু ভাবে—মাকে কেমন ঠকাইতে পারা যায়! মায়ের সহিত এ খেলা করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ। সর্বজয়া জানে যে, খেলায় যোগ দিবার ভান করিলে এইরূপ সারাদিন চলিতে পারে, কাজেই সে ধমক দিয়া কহিল—তা হোলে কিন্তু থাকলো প'ড়ে রান্নাবান্না। অপু, তুমি ঐ রকম করো খেতে চাইলে তখন মজাটা—

অপু হাণিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মশলার পুঁটলি মায়ের সামনে রাখিয়া দিল।

তাহা? মা বলিল, যা একটু খেলা করগে যা বাইবে। দেখ্গে যা দিকি তোর দিদি কোপাষ আছে। গাবতলায় দাঁড়িয়ে একটু হাঁক দিয়ে ডাক দিকি। তার আজ নাইবার দিন—হতচ্ছাড়া মেয়ের নাগাল পাওখ'র জো আছে? যা তো, লক্ষ্মী ছেলে—

কিন্তু এখানে মাতৃ-আদেশ পালন করিয়া স্থপুত্র হইবার কোনো চেষ্টা তাহার দেখা গেল না। সে বাটনা-বাটা-বত মায়ের পিছনে গিয়া কি করিতে লাগিল।

হ-উ-উ-উ-উম্—

সর্বজয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল অপু বড়ি দেওয়ার জন্ত চালের বাতায় রক্ষিত একটা পুরানো চট আনিয়া মূড়ি দিয়া মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে।

—জাথো জাথো, ছেলের কাণ্ড জাথো একবার। ও লক্ষ্মীছাড়া, ওতে যে সাত-বাজার ধুলো। ফ্যাল ফ্যাল—সাপ মাকড় আছে না কি আছে ওর মধ্যে—আজ কদিন থেকে তোলা রয়েছে।

—হ-উ-উ-উ-উম্—(পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর স্বরে)

নাঃ, বল্লে যদি কথা শোনে—বাবা আমার, সোনা আমার, ওখানা ফাল্—আমার বাটনার হাত—দুইমি কোরো না, ছিঃ!

থগ্গে-মোড়া মূর্তিটা হামাগুড়ি দিয়া এবার দুই কদম আগাইয়া আসিল।

সর্বজয়া বলিল, ছুঁবি ছুঁবি—ছুঁও না মানিক আমার—ওঃ, ভয়ে একেবারে কাঁঠ হয়ে গিইচি—ভাবি ভয় হয়েছে আমার !

অণু হি-হি করিয়া হাসিয়া থলেখানা খুলিয়া এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল, মুখ, চোখের চুক, কান ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। মুখ কাঁচু-মাঁচু করিয়া সে সামনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কিচ কিচ করিতেছে।

—ওমা আমার কি হবে ! হাঁরে হতভাগা, ধূলা মেখে যে একেবারে ভূত লেজেচিস ? উঃ—ওই পুরোনো থলেটার ধূলা ! একেবারে পাগল !

ধূলিধূসবিত অবোধ পুত্রের প্রতি করুণা ও মমতায় সর্বজয়ার বুক ভরিয়া আসিল ; কিন্তু অণুর পরণে বাসি কাপড়—নাহিয়া-ধুইয়া ছোঁয়া চলে না বলিয়া বলিল—ঐ গামছাখানা নে, ঐ দিয়ে ধূলাগুলো আগে ঝেড়ে ফ্যাল। ছেলে যেন কি একটা !

খানিকটা পরে ছেলেকে রান্নাঘরে পাহারার জন্ত বসাইয়া সে জল আনিতে বাহির হইয়া যাইতেছে, দেখে দরজা দিয়া দুর্গা বাড়ী ঢুকিতেছে। মুখ রৌদ্রে রাঙা, মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, অথচ ধূলামাখা পায়ে আলতা পরা। একেবারে মায়ের সামনে পড়াতে আঁচলে-বাঁধা আম্র দেখাইয়া টোক গিলিয়া কহিল—এই পুণিপুকুরের জন্তে ছোঁলার গাছ আনতে গেলাম রাজীদের বাড়ী, আমি পেড়ে এনেচি, ভাগ হচ্ছে, তাই রাজীর শিসিয়া দিলে।

—আহা, মেয়ের দশা ত্যাখো, গায়ে খড়ি উড়চে, মাথার চুল দেখলে গায়ে জর আসে,—পুণিপুকুরের জন্তে ভেবে তো তোমার রক্তিরে ঘুম নেই !—পরে মেয়ের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল—ফের বুঝি লক্ষ্মীর চুবড়ির থেকে আলতা বের করে পরা হয়েছে ?

দুর্গা আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া উস্‌কোখুস্‌কো চুল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল—লক্ষ্মীর চুবড়ির আলতা বৈকি ! আমি সেদিন হাটে বাবাকে দিয়ে আলতা আনালাম এক পয়সার, তার দরুন ভ'পাতা আলতা আমার পুতুলের বাস্কে ছিল না বুঝি ?—

হরিহর কলকে হাতে রান্নাঘরের দাওয়ার আগুন লইতে আসিল।

সর্বজয়া বলিল—ঘটায় ঘটায় তোমাকে আগুন দি কোথা থেকে ? হুঁদরী কাঠের বন্দোবস্ত ক'রে রেখেচো কিনা একেবারে। বাঁশের চেলায় আগুন কতক্ষণ থাকে যে আবার ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাওয়ার আগুন যোগাব ? পরে আগুন তুলিবার জন্ত রক্ষিত একটা ভাঙা পিতলের হাতাতে খানিকটা আগুন উঠাইয়া বিরক্তমুখে সামনে ধরিল। পরে স্তব্ধ করিয়া বলিল—কি হোল ?

—এক বকস ছিল তো সবই ঠিক, বাড়ীসুদ্ধ সবাই মজুর নেবার কথাই হয়েছিল ; কিন্তু একটু মৃদিল হ'য়ে যাচ্ছে। মহেশ বিশ্বেশের দত্তরবাড়ীর বিষয়-আশয় নিয়ে কি গোলমাল বেধেছে, বিশেষ মশায় গিয়েচে সেখানে চলে—সেই আসল মালিক কিনা। তাই আবার একটু পিছিয়ে গেল ; আবার এদিকেও তো অকাল পড়চে আবার মাস থেকে।

—আর সেই যে বাসের জায়গা দেবে, বাস করাবে বলেছিল, তার কি হোল ?

—এই নিয়ে একটু মুন্সিল বেধে গেল কিনা ! ধরো যদি মস্তুর নেওয়া পিছিয়ে যায়, তবে ও কথা আর কি করে ওঠাই ?

সর্বজয়া খুব আশায় ছিল, সংবাদ শুনিয়া আশাভঙ্গ হইয়া পড়িল। বলিল, তা ওখানে না হয়, অত্ন কোনো জায়গায় ত্যাখো না ? বিদেশে মান আছে, এখানে কেউ পোঁছে ? এই ত্যাখো আম-কাঁটালের সময় একটা আম-কাঁটাল ঘরে নেই—মেয়েটা কাদের বাড়ী থেকে আজ দু'টো আধপচা আম নিয়ে এল।

—পরে সে উদ্দেশে বাড়ীর পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—এই ঘরের দোর থেকে বুড়ি বুড়ি আম পেড়ে নিয়ে যায়—বাছারা আমার চেয়ে চেয়ে ত্যাখে, —এ কি কম কষ্ট ?

বাগানের কথার উল্লেখে হরিহর বলিল—উঃ, ও কি কম ধড়িঝাজ নাকি ? বছরে পঁচিশ-টাকা খাজনা ফেলে-ঝেলে হোতো, তাই কিনা লিখে নিলে পাঁচ টাকায় ! আমি গিয়ে এত করে বললাম, কাকা, আমার ছেলেটা মেয়েটা আছে, ও বাগানে আম-জাম কুড়িয়ে মাস্তুর হচ্ছে। আমার তো আর কোথাও কিছু নেই। আর ধরুন আমাদের জাতির বাগান—আপনার তো ঈশ্বর ইচ্ছে কোনো অভাব নেই, দু'টো অতবড় বাগান রয়েছে, আম জাম নারিকেল সুপুরি—আপনার অভাব কি ? বাগানখানা গিয়ে ছেড়ে দিন গে যান। তা বললে কি জানো ? বললে নীলমণি দাদা বৈতে থাকতে ওর কাছে নাকি তিনশো-টাকা ধার করেছিল, তাই এমনি করে শোধ করে নিলে। শোন কথা ! নীলমণিদার বড় অভাব ছিল কিনা, তাই তিনশো টাকার ভুলে গিয়েচে ভুবন মুখুয্যের কাছে হাত পাততে ! বৌদিকে ভালমাস্তুর পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিলে আর কি।

—ভালমাস্তুর তো কত ! সেও নাকি বলেছে যে জাতি মস্তুর—ওর হাতে বাগান থাকলে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না, ফল-পাকুড় এমনিই থাকে, তার চেয়ে কিছু কম জমাতেও যদি বন্দোবস্ত হয়, খাজনাটা তো পাওয়া যাবে।

হরিহর বলিল—খাজনা কি আর আমি দিতাম না ? বাগান জমা দেবে, তাই কি আমর জানতে দিলে ? বৌদিককে লুচি-মোহনভোগ থাইয়ে হাত ক'রে চুপি চুপি লিখিয়ে নিলে !...

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপূদের বাড়ীর সামনের বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতো বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধূলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাতির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়াইল—অপুও বিদীর পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—

শীত্ৰগিৰ ছোট, তুই বয়স সিঁহুৰকোটো-তলায় থাক, আমি যাই সোনামুখী-তলায়—দোড়ো—দোড়ো। খুলায় চাৰিদিনিক ভৱিষ্য গিয়াছে—বড় বড় গাছেৰ ডাল ৰঙে বাকিয়া গাছ নেডা নেডা দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে—বাগানে শুকনা ডাল, কুটা, বাশেৰ খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুকনা বাশপাতা ছুঁচালো আগাটা উচুকি তুলিয়া ঘূৰিতে ঘূৰিতে আকাশে উঠিতেছে—কুশিয়া গাছেৰ ভঁৱাৰ মত পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ৰঙেৰ মূখে কোথা হইতে অজস্ৰ উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসেৰ শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী-তলায় পৌছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চীংকাৰ কৰিতে কৰিতে লাকাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল এই যে দিদি, ওই একটা পড়লো যে দিদি—ঐ আৰ একটা যে দিদি। চীংকাৰ যতটা কৰিতে লাগিল তাহাৰ অজ্ঞপাতে সে আৰ কুড়াইতে পাবিল না। ৰাড ঘোঁৰ ৰবে বাড়িয়া চলিরাছে। ৰঙেৰ শব্দে আম পডাৰ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদি বা শোনা যায় ঠিক কোন্ জায়গা বৰাবৰ শব্দটা হইল—তাহা ধৰিতে পাবা যায় না। দুৰ্গা আট নৱটা। আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণেৰ ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশিৰ সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই ছাখ্ দিদি, কত বড ছাখ্—ঐ একটা পড়লো—ওই ওদিকে—

এমন সময়ে হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুযোৰ বাডীৰ ছেলে-মেয়েৰা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল ও ভাই, ডগ্গাদি আৰ অপু আম কুড়ুছে—

দল আসিয়া সোনামুখী-তলায় পৌছিল। সতু বলিল—আমাদেৰ বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ কৰে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো?

পৰে দলেৰ দিকে চাহিয়া বলিল সোণামুখীৰ কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখচিস টুঙ? য'ও আমাদেৰ বাগান থেকে ডগ্গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

ৰাপু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস্ সতু? ওয়াও কুড়ক—আমণাও কুড়ুই।

—কুড়োবে বই কি। ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদেৰ বাগানে কেন আসবে ও? না, যাও ডগ্গাদি—আমাদেৰ তলায় থাকতে দেবো না।

অল্প সময় হইলে দুৰ্গা হয়ত সহজে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিত না—কিন্তু সেদিন ইহাদেৰই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মাত খাইয়া তাহাৰ পুনৰায় বিবাদ বাধাইবাব সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিয়া লইয়া সে একটু মনমত্তা ভাবে বলিল—অপু, আৰ বে, চল। পৰে তঠাং মূখে কৃত্ৰিম উজ্জাসেৰ ভাব আনিয়া বলিল—আমণা সেই জায়গায় যাই চল অপু,

এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল—বুলিভো?—এখানকার চেয়েও বড় বড় আম—তুই আমি স্বজ্ঞা করে কুড়োবো এখন—চলে আম—এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল। রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সত্য দাঁ! রাণুর মনে হুগাঁর চোখের চাহনি বড় দাঁ দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন আমগায় বড় বড় আম যে দিদি? পুঁটুদের সন্তোষার্থী-তলায়? কোন তলায় হুগাঁ তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড় বড় গাছ আছে—চল—। গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া হুঁড়ি পথে অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌঁছানো যায়। অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় বন-চালতা ময়না-কাঁটা বাঁড়া গাছের হুর্ভেগ জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এসব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মত মোটা মোটা অনেক কালের পুরানো গুলফ লতা এগাছে ওগাছে হুলিতেছে বড় বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভাল দেখা যায় না। তবুও খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা হুগাঁ গোটা, আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু—বৃষ্টি এল

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজ মাটির সৌন্দর্য সৌন্দর্য গন্ধ পাওয়া গেল—একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আম আমর এই গাছতলায় দাঁড়াই—এখানে বৃষ্টি পড়বে না—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াস্ফার করিয়া মূলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বড় বাড়িল—হুগাঁ যে গাছতলার দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়ত হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পূর্বে হাওয়ার ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ী হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি—বড় যে বৃষ্টি এল!

তুই আমার কাছে আম—হুগাঁ তাহাকে কাছে আনিয়া, আঁচল দিয়া ঢাকিয়া

কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে— এই ধরে গেল যখন— বিষ্টি হোল লাগলই
হোল—আমরা আবার সেনামুখী তলায় যাবো এখন, কেমন তা ?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুৰ পাভান্ন কৰম্‌চা,

হে বিষ্ণি ধ'য়ে যা—

কুড়—কুড়—কড়াং প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার মাথাট' যেন এদিক্
হইতে ওদিক্ পর্যন্ত চিরিয়া গেল—সেঁথের পলকের জন্য চারিগারে আলো হইয়া
উঠিল—সামনের গাছের মগডালে ধোলো ধোলো বন-ধুধুল ফল ঝড়ে হসিতহেছে।
অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি।

ভয় কি রে। বাম বাম বল—বাম বাম বাম—নেবুর পাতায় করমুচা হে
 বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমুচা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমুচা—

বৃষ্টির ঝাণটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—ওম্ ওম্-ওম্ ম্ ম্—চাঁপা—গম্ভীর ধ্বনি—একটা বিশাল মোটার রুম কে যেন আকাশের খাতব যেরেতে এদিক হইতে ওদিকে টানিয়া লইয়া বেড়াইভেছে—অপু শব্দিত হুয়ে বলিল—ঐ দিদি, আবার—

—ভয় নেই, ভয় কি ?—আর একটু স'রে আয়—এঃ, তোব মাথাটা ভিজে
যে একেবারে জুবড়ি হ'য়ে গিয়েছে—

চাকিধারে শুধু মূলধারে বস্তুপতনের হস-স স-স একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ-ও-ও-ও, বৌ-ও-ও-ও-ও এবং, ডালপালার ঝাপটের শব্দ—
 ঘেঘের ডাকে কান তাল দানিয়া যায়। এক একবার দুর্গাব মনে হঠাৎছিল
 সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড়-মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া উণ্ড হইয়া তাহাদের চাণা দিল
 বসি।

ଅମ୍ଭ ବଞ୍ଚିଲ—ନିନ୍ଦି, ବିଠି ଯଦି ଆର ନା ଥାଏ ?

হঠাৎ কটিকান্নুক অন্ধকারে আকাশের এ প্রান্ত হইতে লকলকে আলো জিহ্বা মেনিয়া নিদ্রার বিকট অর্দ্রান্তের বোল তুলিয়া এক লহমাৎ ও প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

কড় কড়-কড়াং ।

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টি ধোয়ার রাশি চিরিয়া ফাড়িয়া উড়াইয়া, ঠৈরবী প্রকৃতির উন্নতির স্বাক্ষরানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালকবালিকার চোখ কলসাইয়া তীব্র নীল বিদ্যাং খেলিয়া গেল।

অপু ভয়ে চোখ বুজিল ।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,—বান্ধ পড়িতেছে না কি।—
পাছের মাথায় বন ধুঁধুলের কল হলিতেছে।

সেই বড় লোহার কলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে যেন আবার
 ঐদিকে টানিয়া আনিতেছিল—

শীতে অপুর ঠক ঠক কবিতা দাঁড়ে দাঁত লাগিতেছিল—কুর্গা তাহাকে আরও

কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত অবস্থিতি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা, তে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—ভয়ে তাহার স্বর কাণিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশী বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি ঋনিককণ ধামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর চপ্‌ চপ্‌ শব্দ করিতে করিতে রাজকুমার পালিতের ঘেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেচিস্ ও দিকে ?

আশালতা বলিল—না খুঁজিয়া, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে ? তারপর হাসিয়া বলিল—কি ব্যাঙ-ডাকানি জল হয়ে গেল খুঁজিয়া !

—সেই ঝড়ের আগে দুজনে বেরিয়েচে আমি কুড়োতে যাই ব'লে, আর তে' ফেরিনি—এই ঝড়-বিষ্টি গেল, নন্দে হোল, ও মা কোথায় গেল তবে ?

সর্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিব ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কীর দরজা ঠেলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা খুনা নারিকেল-হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়ে বলিল—ওমা আমার কি হবে ! ভিজ্জে যে সব একেবারে পাঙ্কাত হইচিস্ ! কোথায় ছিলি বিষ্টির সময় ? ছেলের কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজ্জে একেবারে জ্বড়ি। পরে আল্লাদের সহিত বলিল—নারিকোল কোথা পেলি রে দুর্গা ?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ চুপ মা—সেজ্জেঠিয়া বাগানে যাচ্ছে—এই গেল—ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারিকোল গাছটা ? ওর তলায় প'ড়ে ছিল। আমরাও বেকজি সেজ্জ-জেঠিমাও ঢুকলো।

দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে—আমাকেও বোধ হয় দেখেছে। পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অঞ্চ চাপা স্বরে বলিতে লাগিল—একেবারে পাচ্ছে গোড়ায় প'ড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী-তলায় যদি আমি প'ড়ে থাকে তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা প'ড়ে রয়েছে। অপুকে বললাম—অপু, বাগলোটা নে—মার কাঁটার কষ্ট, কাঁটা হবে। তারপরই দেখি,—হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড়, না মা ?

অপু খুশির স্বরে হাত নাড়িয়া বলিল—আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট—
সর্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারিকোলটা। হেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেবো—

অপু অহযোগের স্বরে বলিল—তুমি বলো মা নারিকোল নেই, নারিকোল নেই,—এই তো হোল নারিকোল ! এইবার কিন্তু বড়া করে দিতে হবে ! আমি ছাড়বো না—কথ'খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোয়া জুঁই ফুলের মত স্বন্দর দেখাইতেছিল। ঠাণ্ডায় তাহাদের ঠোট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপটাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বলিল—আয় সব, কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিবে রোযাকে ওঠ সব—

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখ্যোর বাড়ী গেল।

ভুবন মুখ্যোর খিডকী-দোর পর্যন্ত যাইতেই সে স্তনিল সেজ্ঞঠাকুরণ বাড়ীর মধ্যে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিতেছেন।

—একটা মুঠো টাকা খরচ ক'বে তবে বাগান নেওয়া—মাগ্না তো নয়। তার কোনো কুটোটা—যদি হাষবেদের জন্তে ঘরে ঢুকবার জো আছে। ঐ ছুঁড়ীটা বান্ধিন বাগানে বসে আছে, কুটোগাছটা নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে—এতে মাগ্নীও শিক্ষে আছে এ ম'গী কি কম নাকি?—ও মা, ভাবলাম বিষ্টি খেমেছে যাই একবার বাগানট গিয়ে দেখে আসি—এই এত বড় নারকোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে ঢড়্ ঢড়্ দৌড়?—এত শত্রুতা যেন ভগবান সন্নি না করেন—উচ্ছন্ন যাস, উচ্ছন্ন যাস—এই ভস সন্দে বেলা বলচি, আর যেন নারকোল খেতে না হয়—একবার শীগ্গির যেন ছাতিমতলা-সই হন—

সর্বজয়া খিডকীর বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ণ-সিক্ত কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল, যদি গালাগাল ওদের লাগে!

বাবা—যে লোক! দাঁতে বিষ আছে! কি করি? কথাটা ভাবিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখ্যোবাড়ী ঢুকিল না—আশশেওড়া বনে, বাশঝাড়ের তলায় বর্ণগুক্ত সন্ধ্যায় জোনাকী জলিতেছে, পা যেন আর উঠিতে চাহে না—ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট বালতিটা ও বড়া কাঁখে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল—যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই—তাহলেও কি গাল লাগবে? তা কেন লাগবে—যার জিনিস তাকে তো ফেরত দেওয়া হ'ল, তা কখনো লাগে?

বাড়ীতে পা দিয়াই মেরেকে বলিল—তুগ্গা, নারকোলটা সতুদের বাড়ী দিয়ে আয় গিয়ে।

অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল—এখুনি?

হ্যাঁ,—এখুনি দিয়ে আয়। ওদের খিডকীর দোর খোলা আছে। চট্ ক'রে যা। ব'লে আর আমরা কুড়িয়ে পেটছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু আমাদের একটু দাঁড়াবে না, মা? বড় অন্ধকার হয়েছে, চল অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্রুতা ক'রে কুড়তে যারনি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই

ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে বর্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো।
তুমি ওদের ম্খে দিকে চেও। দোহাই ঠাকুর।

পথের পাঁচালী

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একথানা মূদীর দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাছলা ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিজ্ঞ কদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহার গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে শারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বে-পরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন, যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হাওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়ে যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়ে রোঁদ উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠ নীগুগিরু ক’রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেটু। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সন্ত-নিদ্রোথিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুট ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন এরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

থানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমার অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব’সে ব’সে খেও এখন, ওঠো লক্ষ্মী মানিক! মায়ের কথায় উত্তরে সে অবিশ্বাসের স্বরে বলিল—ইঃ! পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুকে বেলী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মার প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখনো আর বাড়ী আসুচিনে, দেখো!

ষাট ষাট, বাড়ী আসিবিনে কি। ওকথা বলতে নেই, হিঃ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিড়ো হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরী করবে, কত টাকা হবে

তোমার, কোনো ভয় নেই !—ওগো, তুমি গুরুমহাশয়কে ব'লে দিও যেন ওকে কিছু বলে না ।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোকে বাড়ী নিয়ে যাবো অণু, ব'সে ব'সে লেখো, গুরুমহাশয়ের কথা শুনো, দুইমি কোরো না যেন । খানিকটা পবে পিছন ফিরিয়া অণু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল । অকুল সমুদ্র ! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল । পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ গুজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কৃত্তর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক হুলিতেছে । তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাতা-পড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে । আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে । তাহার সামনে হুজন ছেলে বসিয়া প্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল । একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢায়া দিলাম, অল্প ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোলা, সঙ্গে সঙ্গে তার প্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়বস্ত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল । অণু নিজের প্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল ! কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলে—ক'নে, প্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে ? সম্মুখের সেই দুটি ছেলে অমনি প্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের স্রোদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই স'তে, ক'নের প্লেটটা নিয়ে আয় তো ! তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছো মারিয়া প্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল ।

—হ, এসব কি খেলা হচ্ছে প্লেটে ?—স'তে ধরে নিয়ে আয় তো হুজনকে কান ধ'রে নিয়ে আয় ।

যেভাবে বড় ছেলেটা ছো মারিয়া প্লেট লইয়া গেল, এবং যে ভাবে বিপন্ন-মুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে ষাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অণুর বদ্ব হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল । পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার কিক্ কিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল ।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে ? হাস্‌চো কেন থোকা, এটা কি নাট্যশালা ? অ্যা ? এটা নাট্যশালা নাকি ?

নাট্যশালা কি, অণু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল ।

স'তে, একখানা খান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড় দেখে ?

অণু ভয়ে আড়ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট

আনীতে হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য । বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে-যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন ।

পাঠশালা বসিত বৈকালে । সবস্বদ্ধ আট দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে । সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাত্র আনিয়া পাতিয়া বসে, অপূর মাত্র নাই, সে বাড়ী হইতে একথানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে । যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই ; চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে । পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান । অপরাহ্নের তাজা, গরম, রোস্ত বাতাবীলবু, গাব ও পেয়ারাতলী আমগাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে । নিকটে অল্প কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ ।

আট দশটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় ছলিয়া ও নানারূপ হুস করিয়া পড়া শৃঙ্খল করে ; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়,—এই ক্যাবেলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখচিস্ ? কান ম'লে ছিঁড়ে দেবো একেবারে ! হুট, তোমার ক'বার নেতি ভিজুতে হবে ? ফের যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচ—

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একথানা ভালপাতার চাটাই এর উপর বসিয়া থাকেন । মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে । বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীহু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন । পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প-শোনা অপূর অনেক বেশী ভাল লাগিত । রাজু রায় মহাশয় প্রথমে যৌবনে 'বাগিজো লম্বীর বাস' শ্রবণ করিয়া কি ভাবে আষাঢ়ের হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন । অপূ অবাক হইয়া শুনিত । বেশ কেমন নিজের ছোট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাজু নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের-ঝোল ভাত রাধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাম্ভরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া । বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাত্রে তিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ভোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর ! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে ।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ও পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্তাল মহাশয় যেদিন আসিতেন । যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার কথতা তাঁহার ছিল অসাধারণ । সান্তাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাড়িক-গ্রন্থ ছিলেন । কোথায় ঝরকা, কোথায় সাবিজী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা

আবার একা বেথিয়া ভাঁহার ভূমি হইত না, প্রাতিয়ারই স্বী-পুত্র নাইরা যাইতেই
এক খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিবা আশায়ে নিজের
চতুষ্পদে বসিয়া খেলো হাঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে, সাম্রাজ্য মহাশয়ের
মতন নিভাস্ত ঘরোয়া, সেকেন্দ্রে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বৃদ্ধি বেশী
আর নাই, শৈতৃক চতুষ্পদে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন
দেখা গে- দরজায় তালাবদ্ধ বাড়ীতে জনপ্রাণীর সাজা নাই। ব্যাপার কি ?
সাম্রাজ্য মশায় সপরিবারে বিদ্যাচল, না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন
আর দেখা নাই হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুকঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া
দেখিল, দুই গরুর গাড়ী বোকাই হইয়া সাম্রাজ্য মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে
প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু সমান উচু জলবিছুটি ও
অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা পা কেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া
উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রশ্ন, কি রকম আছে, বেশ জাল পেতে বসেচ যে !
ক'টা মাছি পড়লো ?

নামৃত-মুগ্ধ-রত অপূর মুখ অমনি অসীম আহলাদে উজ্জল হইয়া উঠিল।
সাম্রাজ্য মশায় যেখানে ভালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে
হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। স্নেট বই মুড়িয়া একপাশে
রাখিয়া দিত, যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াস্তার দরকার নাই ;
সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাগর ও উৎসুক চোখদুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন হৃদয়ের
সুধার আগ্রহে গিলিত।

কুটির মার্ঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্তাকুটির জোল বলে, ঐখানে
আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দ্র হাজরা কি
বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে
মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দ্র হাজরা দেখিল, এক জায়গায় যেন একটা
সিঁতলের হাড়ির কানামন্ত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে।
তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ী আসিয়া দেখে—এক হাড়ি সেকেন্দ্রে
আবলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দ্র হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া
বেড়াইল—এসব সাম্রাজ্য মশায়ের নিজের চোখে দেখা।

এক একদিন বেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিজী পাগড় আছে,
তাহাতে উঠিতে ভাঁহার স্বীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাতিগমায় পিণ্ড দিতে
গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাগতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায়
একটা খুব ভাল খাবার পাণ্ডা যায়, সাম্রাজ্য মশায় নাম বলিলেন—প্যাড়া।
নামটা শুনিয়া অপূর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে 'প্যাড়া' কিনিয়া
খাইবে।

আর একদিন সাম্রাজ্য মশায় একটা কোন্ জায়গায় গল্প করিতেছিলেন।
সে জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেঁতুলের

অঙ্কনের মধ্য দিয়া তাঁহারা লেখানে যান—সান্তাল মহাশয় যে জিনিসটা দেখিতে যান বার বার তাহার নাম বলিতেছিলেন—“চিকামসজিদ”। কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে তাঁহার কথাবার্তার ভাবে বুঝিয়াছিলো একটা জাড়া পুরানো বাড়ী। অঙ্ককার প্রায় হইয়া আসিয়াছিল—তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপূ বেশ কল্পনা করিতে পারে চাষিধারে অঙ্ককার তেঁতুল জঙ্গল, কেউ কোথাও নাই, ভাঙা পুরানো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অমনি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল—রাগদের পশ্চিমদিকের চোরাবুড়ীর মত অঙ্ককার ঘরটা।

৫ দেশে সান্তাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশব্দ-লায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত—আচ্ছা কোন ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ঈঙ্গিত ফলের নাম করিল সে মস্তুরের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি বুলিয়া আছে।

৬ রায় বলিতেন—ওসব মস্তুর-তন্তুরের খেলা আর কি! সে বার আমার এক মাথা—

দীঘু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মস্তুরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেভাড়ার বুধো গাডোয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকুট ভায়া তো খুন দেখেচো। কাঠের দড়ি-বাঁধা এক ধরনের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে-কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আসতো। একশ' বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়াছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কজির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েছে উনিশ কুড়ি বয়স, চাকদা' থেকে গঙ্গাচান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফিরছি। বুডো গাডোয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয়াব ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস ক'রেছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত ছিল, তা রাজকুট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমাহুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড় ভাবনা গেল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁ-খানা বসেচে?—ওই বরাবর এসে হোল কি জানো? জন-চারেক যণ্ডামাকোগোছের মিশ-কালো লোক এসে গাড়ীর পেছন দিকের বাঁশ ছদিক থেকে ধলে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে আর বা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধ'রে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুডো গাডোয়ান দেখি পি' পিট ক'রে পেছন দিকে চাইঠে। ইশারা ক'রে আমাদের কথা বলতে বারণ ক'রে দিলে। বেশ,

আছে ! এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল । বাজার দেখা যাচ্ছে, তখন সেই লোক ক'জন বলে—ওস্তাদজী, আমাদের বাট হয়েছে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও । বুধো গাড়োয়ান বলে—সে হবে না ব্যাটার। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাধিয়ে দোব । অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বলে—আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিসনি ! তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চ'লে গেল । আমার স্বচক্ষে দেখা । মস্তবের চোটে ওই যে ওরা বাশ এসে ধরেচে, ধ'রেই রয়েছে—আর ছাড়াবার সাধা নেই—চলেচে গাড়ীর সঙ্গে । একেবারে পেরেক-আটা হ'য়ে গিয়েচে । তা বুঝলে বাপু ? মস্তব-মস্তবের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত । পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের বাতাস আলো বীকা ভাবে আসিয়া পড়িত । কাঁঠালগাছের জগডুধর-গাছের ডালে কোলা গুলগুলতার টুনটুনি পাখী মুখ উচু করিয়া বলিয়া দোল খাইত । পাঠশালাঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোঁড়া বই-দস্তর, পাঠশালার মাটির স্বেদ, ও কড়া দা-কাট্রা তাহাদের ধোঁয়া, সবস্বচ্ছ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত ।

সে গ্রামের ছায়া-স্তরা মাটির পথে একটি মুক্ত গ্রামা বালকের ছবি আছে । বই-দস্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজিয়া গিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মস্ত নরম, চিকণ স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর স্নন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাধ ধরণের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন্ অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে । গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গভীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে বিবিয়া অপরিচয়ের অকুল জলধি ! তাহার শিশু মনে থৈ পায় না ।

ঐ যে বাগানের ওদিকে বাশবন—ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল—জুঝি বরাবর সোজা যদি ও পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও, তবে শাখারীপুকুরের পোড়ের মধ্যে অজানা গুলুধনের দেশে পড়িবে—বড় গাছের ডলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি থসিয়া পড়িয়াছে—কত মোহরস্তরা ইড়ি-কলসীর কানা বাতির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নীচে, কচু, গুল ও বন-কলসীর চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায় ।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল; যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা !

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অল্প কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্পওকথ হইল না, পড়াভ্যাস হইতেছিল—সে গিয়া বলিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সবর শুকনোহাশর বলিলেন—পেন্সেট নেও, শ্রুতিগিখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অণু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিষেধ কথা বলিতেছেন না, মুগ্ধ বলিতেছেন, সে যেমন দাণ্ডারায়ের পাঁচালী ছড়া মুগ্ধ বলে, তেমনি ।

তুনিতে তুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পব পব সে কখনো শোনে নাই । ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, স্বাকার-জড়ানো এক অপরিচিত শব্দ-সজ্জিত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দক্ষণ কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বার বার উকি মারিতেছিল ।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুগ্ধ স্মৃতিলিখন কোথায় আছে—

‘এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রভাব-গিরি । ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত সমীর-সঞ্চরমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকা-প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকিতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়...পাদদেশে প্রসন্ন-সলীলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া...’

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়—সেই যে বছর-হুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে । পথটার দু’ধারে যে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল । মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া সে কুল পায় নাই ।

তাহার বাবা বলিয়াছিল, ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর-দশঘর হ’য়ে সেই ধলচিত্তের থেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে !

ধলচিত্তের থেয়াঘাটে নয়, সে জানিত ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে ; রামায়ণ, মহাভাবতের দেশে ।

সেই অশঙ্ক-গছর সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা ।

স্মৃতিলিখন তুনিতে তুনিতে সেই হুই-বছর আগে-দেখা পথটার কথাই তার মনে হইয়া গেল ।

ঐ পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রভাব পর্বত ! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিঝিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল । কতদূরে সে প্রভাব-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমান মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে ?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে ।

কিন্তু সে বেতসীকটকিত ভট, বিচিঞ্জপুলিনা গোদাবরী, সে ডায়াল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা, সে অপূর্ব শৈলশ্রব, বায়াম্বেণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। বায়ীকি বা ভবভূতি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখী ডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মৃদুমতি গ্রাম্যবালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবী-পৃষ্ঠে বাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না শুধু এক অনতিজ্ঞ শৈশব-মানেই সে কল্পজগতের প্রস্তর-পর্বত তাহার সত্য-সকরমাণ মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অকস্ম আশন পাতিয়া বসিল।

পথের পাঁচালী

চতুর্থ পর্ব পল্লভেদ

দুর্গা ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। পাড়ার নানাস্থানে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। অন্নদা বায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া ভাবিল—একবার এখানে দেখে যাই, খুড়ীমার সঙ্গে দেখাটা হবে এখন—

অন্নদা বায়ের বাড়ী ঢুকিতেই একটা হৈ চৈ চীৎকার ও কান্নাকাটির কলবহ তাহার কানে পেল। বাড়ীর মধ্যে না ঢুকিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইল। রোয়াকের একপাশে দাঁড়াইয়া অন্নদা বায়ের বিধবা স্ত্রী সখী ঠাকুরণ চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছেন :—

—তাই কি মনে একটু ভয় আছে নাকি ? তের চের জাঁহাজ মেয়েমানুষ দেখিচি, এমন আর কখনো দেখিনি যে বাপু, পায়ে পড় করি—বলে ঐ যমের স্বত সোয়ামী, রাগলে হাড়ে মাসে এক রাখে না—তাই না হয় বাপু, একটু সন্কে চলি। সত্যিই তো, আজ তিন দিন ধরে বলচে ধানগুলো একটু রোদে দাও, শুগো ধানগুলো একটু রোদে দাও—কথা কি গেরাছি হয় নাকি ? না, কানে যায় ? কার কথা কে শোনে ? গেরস্ত ঘরের বো ধান ভানবে, কাজ করবে এই জানি—তা না, বাদিন পটের বিবি সেজে ব'সে আছে !—‘পটের বিবি’ জিনিসটি পরিস্ফুট করিবার জন্য উত্তমরূপে সাজিয়া যেরূপ ভাবে বলিয়া থাক। উচিত বলিয়া সন্ধীঠাকুরণের ধারণা তিনি এখানে তাহার অভিনয় করিলেন—এ তো বাপু কখনো কোথাও বাপের সঙ্গে দেখিনি, ভনিওনি—

দালানের মধ্য হইতে অন্নদা বায়ের পুত্রবধু নাকীসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—পটের বিবি হ'য়ে সেজে বসে থাকি নাকি। কাল যে দশ দেয় মুগের ডাল ভাজলাম সারা বিকেল ধ'রে ? দুপুর বেলা খেয়েই আরম্ভ করিচি, আর কখন পাঁচটার গাড়ী যাওয়ার শব্দ পেলাম তখনও খোলার তাতেই বসে আছি—দুখায়া ভাল ভাজা রে, ভাটা রে—ক'রে, অন্ধকার হয়ে গিয়েচে তখন উঠিচি—সে কি অবনি হয় ? পা-পতর ব্যথা হয়ে গেচে, বাস্তবিক বলি বুঝি জ্বর হোলো, অবনি পায়ে-হাতে ব্যথা—তা কি কেউ ভাবে ? তার ওপর সকালবেলা বিনি কোনো এই বার—কেন, সন্ধ্যায় কি বলে বলে খাই ?

এমন সময় অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুল এক হাতে একখানা কাঁচা বাঁশের পাভাসুদ্ধ ডগা ও আর এক হাতে দা লইয়া বাড়ী ঢুকিল। স্ত্রীর কান্নার শেষ অংশ শুনিতে পাইয়া গর্জন করিয়া কহিল—এখনও তোমার হয়নি—এখনও তোমার অদৃষ্টে বেস্তুর ঢুকখু আছে দেখচি—আমার রাগ বাড়িও না যেনা সকাল বেলা! আজ তিনদিন ধরে ধানগুলো রোদ্দুরে দেওয়ার জন্তে বলে বলে হয়রান—এই মেঘলা মেঘলা যাচ্ছে, এর পর ধানগুলো যদি কলিয়ে যায়, তবে তোমার কোন্ বাবা এসে সামলাবে? সারা বছরের পিণ্ডি জুটবে কোথেকে?

গোকুলের বোঁ চঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া তেজের সহিত জোর গলায় বলিয়া উঠিল—তুমি আমার বাবা তুলে গালাগালি করো না ব'লে দিচ্ছি—আমার বাবা কি করেছে তোমার, কেন তুমি বাবার নামে যখন তখন যা তা বলবে?

তাহার কথা শেষ হইতেই না হইতেই গোকুল হাতের বাঁশ নামাইয়া রাখিয়া দা হাতে এক লাফে রোয়াকের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া কহিল—তবে রে! আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন—তোমার বাপের বাড়ীর আবদার না ঘুচিয়ে আমি আজ—

একটা খুনোখুনি ব্যাপার বুঝি বা হয় দেখিয়া বাড়ীর কৃষাণ উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—কি করেন দা-ঠাকুর—কি করেন, খামুন খামুন—পরে সে রোয়াকে উঠিল—দুর্গাও ছুটিয়া আসিল—সখী ঠাকুরপও রোয়াক হইতে দালানের মধ্যে ঢুকিলেন—খুব একটা হৈ চৈ হইল। দালানের মধ্যে গোকুলের স্ত্রী স্বামীর উত্তত আক্রমণের সম্মুখে পিছাইয়া গিয়া মার ঠেকাইবার জন্ত দুই হাত তুলিয়া দেওয়ালের গায়ে প্রাণপণে ঠেস দিয়া জড়নজড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখে তাহার ভয়ের দৃষ্টি—কৃষাণ গিয়াই গোকুলের হাত হইতে দা-খানা কাড়িয়া লইল; পরে তাকে ধরিয়া দালানের বাহিরে আনিতে আনিতে বলিতে লাগিল—কি করেন, দা-ঠাকুর, খামুন—আঃ—আস্থন নেমে—

গোকুলের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেহ তেমন সবল নহে, বলিষ্ঠ কৃষাণের সহিত ম্যালেনিয়া-দুর্বল দেহ লইয়া হাত ছাড়াছাড়ির চেষ্টা করিতে গেলে দুর্বলতাটাই অধিকতর প্রকাশ হইয়া পড়িবে বুঝিয়া বলিতে বলিতে নামিল—ত্যাখো না—একটা ডোল ধান, বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়, ও কি আর রোয়া হবে? আজ তিনদিন ধরে বল্চি—আবার তেজ্ঞাভা দেখলে তো? তোমার তেজ্ঞা আমি—

দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু এ সময় খুড়ীয়ার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্তার সময় নহে বুঝিয়া সে একপ্রকার নিঃশব্দেই অন্নদা রায়ের বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচুবাড়ুয়ার বাড়ীর কাছে জামতলায় একজন লোক ষ্টী-বাটী সাবাইতে বসিয়াছে। কাঠের কয়লার হাপরে গনগনে আগুন, পাড়ার লোকের অনেক ঘটীবাটী জড় করা বেঁটে ধরণের লোকটা, পাকসিটে গড়নের চেহারা, বন্ধ

ক'ত বুঝিবার উপায় নাই, জিশও হইতে পারে, পকাশ ও হইতে পারে, গলায় দিকিষ্ট তুলসীর মালা, মুখের ডান দিকে একটা কাটা দাগ—হাতের কজিতে দড়ির মত শির বাহির হইয়া আছে ; পরণে আধময়লা ধুতি । পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া ঘটা-বাটি সারানো দেখিতেছে । দুর্গাও গেল । লোকটা বলিল—কি চাই থুকা ?

সে বলিল—কিছু না দেখবো ।

বাড়ী ফিরিয়া মা'র কাছে বলিল—আজ মা গোকুল কাকা খুড়ীমাকে যা মেরেছে সে কি বলবো—পরে সে আত্মপুৰ্বিক বর্ণনা করিল ।

সর্বজয়া বলিল—লৌয়ার-গোবিন্দ চাষা একটা বৈ তো নয় ! আহা ভালোমানুষ বোটা এমন হাতে আর এমন বাড়ীতে পড়েচে—ঠেঁড়া খেতে খেতেই জীবনটা গেল ।

আমাকে তো বড্ড ভালবাসে—যখন যা বাড়ীতে হবে, আমার জন্তে তুলে রেখে দেবে । খুড়ীমার কান্না দেখে এমন কষ্ট হ'ল মা ! সখী ঠাকুমা আবার এখন উল্টে খুড়ীমাকেই বকে—

সে তিন-চার দিন জামতলায় ঘটা-বাটি সারানো দেখিতে গেল । লোকটি তাহার বাড়ী, বাপের নাম সব খুঁটিমাটি জিজ্ঞাসা করে । বলিল—তোমাদের বাড়ীর জিনিসপত্তর সারাবে না ? নিয়ে এসো না থুকা ?

দুর্গা বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল—আমাদের ভাড়া ঘটা-গাডুগুলো দেবে মা, একজন বেশ ভালমানুষ লোক এসেছে—ওপাড়ার পথে জামতলায় বসে লারাজে—

লোকটি তার নাম বলে পিতম—জাতে নাকি কাসারী । হাপর জাপাইতে জলাইতে এক একবার সোজা হইয়া বসিয়া বলে—জয় রাধে । রাধে গোবিন্দ । সকাল বেলা তাহার কাছে পাড়ার অনেকে আসিয়া জোটে । সে চিমটা দিয়া হাপর হইতে আগুন উঠাইয়া অনবরত তামাক সাজিয়া ভত্রলোকদের হাতে দিচ্ছে—দিবার সময় মুখখানা বিনয়ে কাঁচুমাচু করিয়া ঘাড় একধারে কাৎ করিয়া বলে—হে, হে, তামাক ইচ্ছে করুন বাবাঠাকুর ! বাধারাগী-পদ ভবসা । নারকেলে: কথা, আর বলবেন না বাবাঠাকুর, আর বছর জট্টিমাংসে বলি দিই গোটাকতক চারা বসিয়ে । আধকাঠা-খানেক জমিতে ছগুণ চারা কিনে লাগিয়ে দিলাম—তা ব্যাডের উপজুতে—একেবারে মূলশেকড় টুলশেকড় সবহু... কটা টাকাই মাটি !

মুখ্যো মশায় সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, কোনো রকমে মিট কথায় ভুট করিয়া একটা পিড়লের ঘড়া বিনা-মূল্যে লারাইয়া লইবেন । তামাক খাইতে খাইতে পূর্ব কথার খেই ধরিয়া বলিলেন—এই তো গেল কাও বাপু—তা—এবারও তো ভেবেছিলুম কুড়িখানেক চারা বাড়ীর পেছনে—তা এমন ব্যালেব্রিয়া ধবুল—তোমাদের ওদিকে কি রকম হে কারিগর ? (তিনি সকাল হইতেই তাহাকে কারিগর বলিয়া ডাকিতেছেন) ।

পরিপূর্ণ—আজ্ঞে পরিপূর্ণ—ম্যালেরিয়ার কথা বলবেন না/বাবাঠাকুর—
হাড় জালিয়ে থেয়েচে—এই নিন্ আপনার ঘড়াটা, ছটা পয়সা দেবেন ।

মুখ্যো মশায় ঘড়াটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলেন—হ্যা ! এর জন্তে
আবার পয়সা—দিলে একটা জিনিষ ব্রাহ্মণকে সারিয়ে, অমনি কার্তিক মাসের
দিনটা—তার আবার—

পিতম তাড়াতাড়ি মুখ্যো মশায়ের হাতের ঘড়াটা ধরিয়া অত্যন্ত
অমাগ্নিকভাবে হাসিয়া বলে—আজ্ঞে না, মাপ করবেন বাবাঠাকুর, এমনি সারিয়ে
দিতে পারবো না । এখনো সকাল বেলা বউনি হয় নি । আজ্ঞে না—তা
পারবো না—ঘড়াটা রেখে যান—বাড়ী গিয়ে পহা কটা পাঠিয়ে দেবেন ।

দুর্গার মা বলে—দেখিস দিকি—ভাঙা বাসন-কোসন বদলে নতুন বাসন-
কোসন অনেক সময় ওরা দেয়—জিজ্ঞেস করিস তো ।

পিতম খুব রাজী । দুর্গা বাড়ী হইতে বহিয়া বহিয়া এক রাশ পুরানো গাড়ু,
ঘটা-বাটি, ঘড়া তাহার কাছে লইয়া গিয়া হাজির করে । অর্ধেক দিনটা সে
জামতলাতেই কাটায়—হাপর জালানো, বাং ঝাল করা বসিয়া বসিয়া দেখে ।
পিতম বসিয়াছে তাহাকে একটা পিতলের আংটি গড়াইয়া দিবে—ইহাও
বলিয়াছে যে, সারাইবার পয়সা তাহাদের লাগিবে না । সর্বজয়া শুনিয়া বলে—
আহা বড্ড ভাল লোকটা তো ? আসচে বুধবার অপুর জন্মবারটা, বলিস্—
তাকে আসতে—আমাদের এখানে ছ'টো ভাল ভাত পেবসাদ পেয়ে যাবে এখন—

বুধবার সকালে উঠিয়া দুর্গা জামতলায় গিয়া দেখিল লোকটা নাই । জিজ্ঞাসা
করিয়া শুনি পূর্বদিন সন্ধ্যার পর কোন্ সময়ে সে দোকান উঠাইয়া চলিয়া
গিয়াছে—তাপরের গর্ত ও পোড়া কয়লার রাশি ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন নাই ।
দুর্গা এখানে ওখানে খোঁজ করিল—এ'কে ও'কে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ জানে না
সে কোথায় গিয়াছে । ভয়ে দুর্গার মুখ শুকাইয়া গেল—মা শুনিলে কি বলিবে ।
সংসারের অর্ধেক বাসন তাহার কাছে যে ! সে দুর্গাকে বলিয়াছিল, ঝিকরহাটির
বাজারে তাহার কাঁসারির দোকান আছে সেখানে সে খবর পাঠাইয়াছে—
তাহার ভাই একদিনের মধ্যে নতুন বাসন লইয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া—
আসিলেই ভাঙা-চোরা বাসনগুলো সব বদলাইয়া দিবে । কোথায়ই বা সে—
আর কোথায়ই বা তাহার ভাই ! কোথায় সে যে গেল তাহা দুর্গা অনেক
খুঁজিয়াও পাইল না । কেবলমাত্র তাহাদেরই জিনিষ গিয়াছে—অল্প হ'শিয়ার
লোকের এক টুকরা পিতলও খোঁয়া যায় নাই ।

সারাদিনের পরে সন্ধ্যার সময় দুর্গা কীদো কীদো মুখে ব্রাকে সব বলিল ।
হরিহর বিদেশে—কেই বা খোঁজ করে, কেই বা দেখে । সর্বজয়া অবাক হইয়া
যায় ! বলে—একবার তোর বায় জোঠা মশায়কে গিয়ে বল তো ? ওমা এমন
কথা তো কখনো শুনি নি !...হরিহর বাড়ী আসিলে ঝিকরহাটির বাজারে খোঁজ
করা হইয়াছিল—পিতম নায়ক কোন লোকের সেখানে কাঁসারির দোকান নাই
বা উক্ত চেহায়ার কোনো লোকও সেখানে নাই ।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাত্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা শিহনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু? চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজি—বেরিও না যেন।...একুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার অন্ত ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে? এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে! সে যখন বাহির দরজায় পাই গিয়াছে, মা'র ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি।—ও অপু, বা রে, ঠাথো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ষাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাক্ষ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল,—চল অপু দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজি হইলে ছুটনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গুতা ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ী চল নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দেহ হ'য়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ ধমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের স্বরে বলিল—ও তাই অপু!

অপু সন্ধ্যার ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে হুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে। একথানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের স্বরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনী'র বাড়ী!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল... আতুরী ডাইনী'র বাড়ী!...সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহারা! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতার বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে রাহে তাহা খাইয়া কেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের যত

বিটিয়া যায়? কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোথের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুমি ও সব গল্প বলিসনে দিদি, আমার ভয় করে,—তুমি সেই কুঁচবরণ রাজকন্তার গল্পটা বল দিকি?

স্বাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীতে কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হির হইয়া গেল... বেড়ায় বাঁশের আগড়ের কাছে—অন্ত কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনীই—তাদের—এমন কি যেন তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!...

যাহার অস্ত্র এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপূর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরী বুড়ী হুড়ু কুঁচকাইয়া, তোবড়ানো গালটা আরও ভুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপূ দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরেই—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল! সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অপূর এত ভয় হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বললে—ভয় কি মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কি?...পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মূই কি ধ'রে নেবো থোকারা? এস মোর বাড়িতে এস—আমচুর দেবানি এস—

আমচুর! ডাইনী বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি!...ডাইনীর রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে এ-রকম কত গল্প তো সে মার মুখে শুনিয়াছে!

এখন সে কি করে! উপায়?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি, ও মোঙ্গ বাবারা? মূই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেবী

নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায়
পু—রি—ল। প্রতিমুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনি বুড়ী হাসিমুখ
বদলাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর
গল্পের মত ! বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অল্প
দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ
বুড়ীর মুখেও উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া
উঠিল, ও বুড়ী পিসি, আমার মা কাদবে, আমার আজ আর কিছু বোলো না—
আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে...বাড়ী, ঘর-দোর, গাছপালা, নীলু,
চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই...কেবল একমাত্র সে
আর আতুরী ভাইনীর ক্রুর দৃষ্টি মাথানো একজোড়া চোখ...আর অনেকদূরে
কোথার যেন মা আর তাহার চাল ভাজা খাওয়ার ডাক !...

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস যোগাইল,
একটা অস্পষ্ট আতঁবব করিয়া প্রাণতরে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট,
শেওড়া, বাঁচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে
দুই চোখ যায় ছুটিল—নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে।

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বৃক্ষিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাস্তিও
যাইনি, ধস্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে
সন্দেবেলা ? থোকাডা কাদের ?

অপু যখন বাড়ী আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বজ্ঞা সবে
উন্নত ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া
তাল চাঁড়িয়া রস বাহির করিতেছে। ছেলেকে দেখিয়া বলিল—কোথায় ছিল
বল দিকি ? সেই বেরিয়েচো বিকেলবেলা, কিছুট তো আজ খাবার খেলিনে—
খিদেতেটা পাগ না ?

মায়ের নিকট বলিবার জিনিস অপূর মনে তৃপ্তাকার হইয়া সকলেই এক-
সঙ্গে বাহিরে আলিবার জন্ত একপন্থাবে চেষ্টা পাইতেছিল যে, পরস্পরের
ঠেলাঠেলিতে পরস্পরের নির্গমপথ এককালীন রুদ্ধ হইয়া গিয়া অপুকে একেবারে
নির্ধাক করিয়া দিল। সে শুধু বলিল—আমি কি কাপড় ছাড়াবো মা ? আমার
এখানা ওবেলার কাপড়—

পরে সে বিশ্বাসের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চালভাজা দেওয়ার কোন
আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অভ্যস্ত
মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে দুর্গাকে
বলিল—দু'চায় থানা ভেজে দেখি, না হয়, বড় তক্তপোসের নীচেটায় তালের
গুড়ো আছে, আর দুটো নিয়ে আলিস এখন—পরে ছেলের দিকে চাহিয়া
বলিল, দাঁড়া অপু, তোকে গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

অপু বলিল—কেন মা, চাল-ছোলা ভাজা কৈ ?

—তা চাল ভাজা তুই খেলি কৈ? এতবার ডাকলাম, তুই বেরিয়ে চলে গেলি ঠাণ্ডা হয়ে গেল, দুর্গা খেয়ে ফেল্লে, তা এই বড়া তো হয়ে গেল বলে। ভাজবো আর দেবো।

অপু সেই বৈকালবেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসের ঘর নির্মাণ করিতেছিল, এক ফুঁয়ে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এই তাহার মা তাকে ভালবাসে! সে বৈকালবেলা বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে—মা না জানি কত দুঃখই করিতেছে তাহার জন্ম! অপু আমার এখনও কেন যে এলো না, তার জন্মে এত ক'রে ঘাট থেকে এসে ভাজা ভাজলাম, আহা সে দুটো খেলে না! হাঁ দায় পড়িয়াছে, তাহার জন্ম ভাবিয়া তো মায়ের ঘুম নাই—মা দিবা সেগুলি দিদির কাছে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—সে-ই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল।

দুর্গা বলিল—মা শীগ্গির শীগ্গির ভেজে নাও। বড় মেঘ করে আসছে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না—ঘরে যে জল পড়ে!—সেদিনকার মত হবে কিন্তু—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ঘিরিয়া ঘনাইয়া আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনের মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই,—এ সময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতূহল হয়—না জানি কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না! দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাঁওয়ার ধারে আসিয়া নীচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘাঙ্ককার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্বজয়া ধানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল—এই বাটিটা ক'রে দে তো দুর্গা। ওর খিদে পেয়েছে, বিকেল থেকে কিছু তো খায় নি! এই শেষ কথাই কাল হইল—এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের স্বরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়া হুজু বাটিটা উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—আমি খাবো না তো বড়া, কখনো খাবো না—যাও—

সর্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। গরীবের ঘরকন্না, কত কষ্টে যে কি যোগাড় করিতে হয় সে-ই জানে। আর হতভাগা ছেলেটা কিনা দু-দু'বার সেই কত কষ্টে সংগৃহীত মুখের জিনিস নষ্ট করিল! স্কাভে, বাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার আজ হয়েছে কি! তোমার অদৃষ্টে আজ ছাই লেগা আছে, খেও এখন তাই গরম গরম—

এবার অপু পাল। এ রকম কথা মার মুখে সে কখনো শোনে নাই। কোথায় সে চাহিতেছে, মা দুটো আদরের কথা বলিয়া শাস্তনা করিবে, না সন্ধ্যাবেলা এমন নিষ্ঠুর কথা। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা মা, আমি

‘চালভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না, না? আমি বিকেল থেকে ভাবছিলাম বুঝি? আমি কথখনো তোমাদের বাড়ী আর আসছিলাম—আমি ছাই খাবো, কেন আমি ছাই খাবো? আর দিদি বুঝি সব ভাল ভাল জিনিস খাবে? আমি আসবো না তোমার বাড়ী, কথখনো আসবো না—।

পরে সে আতুী বুড়ীর বাড়ী হইতে এইমাত্র যেক্রপ অন্ধকার, কাঁটাবন, আমবন না মানিয়া ছুটিয়াছিল, এখনও রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেইরূপ মরীয়ার মত ছুটিল। তাই-এর অভিমান ভরা দৃষ্টি, ফুলা চোঁট ও কথা বলিবার ধরণ দুর্গাব নিকট একরূপ শাস্ত্রকর ঠেকিল যে, সে হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।—হি হি—অপুটা একেবারে পাগল! ম’, কেমন বল্লে—পরে তাই-এর কথা বলিবার উক্তি নকল করিয়া বলিল—আমি চালভাজা খাইনি—হি হি—তাতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না? বাকা একেবারে মা—ও অপু, শুনে যা, ও অপু-উ-উ—

অপু ছুটিয়া পাঁচিলের পাশের পথ দিয়া পিছনের বাঁশবাগানের দিকে ছুটিল। আকাশে মেঘ তখনও ধমকিয়া আছে; বাঁশবনের তলাটা ঝোপে ঝাড়ে নির্জন বধাসঙ্ঘায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সহজ অবস্থায় একরূপ স্থানে এ-মহয় একা আসিবার কল্পনাই সে করিতে পারিত না কোনদিনও। কিন্তু বর্তমানে চারিধারের নির্জনতা ও অন্ধকার, বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিসের খড়খড় শব্দ, অদূরে সলুতেখাগী-আমগাছে ভূতের প্রবাদ প্রভৃতি বিস্তৃত হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—আমি কথখনো বাড়ী যাবো না তো! এ জন্যে আর বাড়ী যাবো না—

অভিমানের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাহার একটু গা ছমছম করিতে লাগিল—ভয়ে ভয়ে সে একবারে দূরের সলুতেখাগী-আমগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—এখন যদি একটা ভূতে আমার তুলে একেবারে মগডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়—মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরে—তাববে, কেন সন্দেবেলা ছাঁই থাও বল্লাম, তাইতো থোকা আমার রাগ ক’রে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাপার বেয়িয়ে চ’লে গেল, আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মা’র কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে ধানিকন্ধন প্রতিহিংসার আনন্দে উপভোগ করিল। পরে সেখান হইতে সে গিয়া পাঁচিলের পাশের পথে দাঁড়াইল। তাহার ভয় ভয় করিতেছিল—সম্মুখের বাঁশঝাড়ে একটা যেন অশ্লষ্ট শব্দ হইল, অপু একবার ভয়ে ভয়ে চোখ উচু করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মা ও দিদি রাগুদের বাড়ীর দিকে ডাকিতেছে—ও অপু-উ-উ! বাঁশঝাড়ে আবার যেন একটা শব্দ হইল। সে মনে মনে বড় অস্থিতি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুস্থল এই যে, তাহাকে খোশামোদ না করিলে সে নিজেই অত রাগের মাধ্যম বাড়ী গিয়া ঢুকিবে, সত্য সত্য এতটা আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য সে নয় নিশ্চয়ই। এবার তাহার দিদি রাগুদের বাড়ীর খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে যেন! সে ছুটিয়া দরজার সামনে পাঁচিলের কোণটাতে দাঁড়াইল।

হঠাৎ আসিতে আসিতে পাঁচিলের পাশে চোখ পড়িতেই দুর্গা চোঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, ওই দাঁড়িয়ে রয়েছে মা। ঐ আখো পাঁচিলের পাশে। পরে সে ছুটিয়া গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল। (ছুটিবার আবশ্যকতা ছিল না)—ওরে দুই, এখানে চপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাক। হয়েছে, আর আমি আর মা সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি, এই আখো।

তখনে মিলিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের পাঁচালী

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় হরিতর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ী থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুখটা, ঘিটা—ওর শরীফটা শাবুবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবদি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বহুলতলা, গোসাঁই বাগান, চালতেতলা, নদীর ধার—বডজোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খন্ডের মাঠে বাবলা গাছে হলুদ রংএর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-ঢালানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলে-ডিক্কি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে ঝাড় ঝাড় সৌদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে তুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক একদিন ওপারের সবুজ খন্ডের জমির শেষে নীল প্রকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি দিদি, আখ্ আখ্ ঐদিকে—পবে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে? ঐ গাছটার পিছনে? কেমন অনেকদূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাক্তিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুণিতে গুণিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামে পঞ্চটি বাকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়-দুর্গাপূর্বের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপূর্বের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে বেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা যেন লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সে-বার তাহাদের রাজী গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা আয়গা খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কাথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদিব সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কল'ইফন তুলিয় খাইএেছিল—তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জে পাকা রাস্তা খেজুর গুড় বোকাই গরুর গাড়ীর সারি পথ বাহিয়া কাঁচ কাঁচ করিতে করিতে আশ'পুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূর ঝাপসা মাঠের দিকে একদুটে চাহিয় কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—এক কাজ করুবি অপু, চলু যাই আমরা বেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি? অপু বিন্ময়ের স্বপ্নে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বেলের রাস্তা—সে যে অনেকদূর! সেখানে কি ক'রে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশী দূর বুঝি। কে বলেছে তোকে—ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল নিকটে হলে তে' দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চলু দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড় অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূরে গেলে আবার আসব কি ক'রে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিছু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরীয়া ভাবে বলিয়া উঠিল—চল যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন, হয়তো বেলের গাড়ী যাবে এখন—মাকে বলবো বাছুর খুঁজিতে ঘেরী হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নাশিয়া পড়িয়া দুপুর ঘোড়ে ভাই-বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জে গাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর শিছাইয়া পড়িল—ঘোয়ার মাঠ, জলসত্র-তলা, ঠাকুর-ঝি পুতুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে—একটা ছোট বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিছু—শিঠের ছাল ভুলবে। অপু একবার হাসিল—মরীয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন পণ্ডিতীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা উজ্জ্বল রক্ত শুখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিবাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড়

জল পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধান ক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, নৌতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরণের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে ছুঁতিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ী ফেরাই মন্সিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন ছপুৰ ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বহুনি খাইতে হইবে না।

দুই দুই শিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মত একটা উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ভাইনে বায়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া! সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির-টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে।

তাহার বাবা বলিল—ঐ ছাথো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদোড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইটিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ী যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তাহাে খবর যাইতেছে? কাহারো খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইষ্টিশান? এদিকে কি ইষ্টিশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ী কখন আসবে? আমি রেলগাড়ী দেখবো বাবা।

—রেলগাড়ী এখন কি ক’রে দেখবে?……সেই ছপুঁরের সময় রেলগাড়ী আসবে, এখনও ছুঁঘণ্টা দেরি!

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কত্থনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ও রকম কোরো না, ঐ জন্তে তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি ক’রে দেখবে? সেই ছপুঁর একটা অবধি ব’সে থাকতে হবে তা হোলে ঐ ঠায় বোধদূরে। চল আসবার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে খুঁসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ—তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ভাগ্য নবীন চোখ বিশ্বগ্রামী ক্ষুধায় চারিদিককে সিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে যাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই! আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইলাম, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অন্তর্ভুক্তিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আশ্বাদ করিলাম যে!

আমডোব! চোট্ট চাষাদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি! মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাহিরের মাঠ—বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে—উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে—নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

খলসেমাবির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বুটী-ধোত, ভাঙ্গের আকাশের স্থনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপকল্প বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রং-এর মেঘের পাশাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী—খোলা আকাশের সহিত এ রকম পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য অবগুঠন খুলিগ আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেবী হইল। তাহার বাবা বলিল—বড় ই! কথা ছেলে, যা দেখ তাতেই ই! ক'রে থাকো কেন অমন? জোরে ইাটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিল। শিশুর নাম লক্ষণ মহাজন, বেশ বড় চানী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহারা থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষণ মহাজনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল—জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুর পাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মত আপন মনে বকিতেছে। সে ঘাড় নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ী এসেছ, থাকা?

অপূর যত আরিভূরি তাহার মাগের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা। প্রথমটা অপূর মাধায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে লক্ষুচিত হয়ে বলিল—ওই ওদের বাড়ী—

বধুটি বলিল—বট্টঠাকুরদের বাড়ী? বট্টঠাকুরের গুরুমহাশয়ের ছেলে? ও! বধু সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী

পথক—সম্মুখ মহাজনের বাড়ী হইতে লামান্ন দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে ।

বধূর ব্যবহারে অপূর্ব লাজুকতা কাটিয়া গেল ! সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কোতুলকের দহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল । ওঃ কত কি জিনিস !...তাহাদের বাড়ীতে এ রকম জিনিস নাই । এরা খুব বড়লোক তো ! কড়ির আলনা, রং-বেরং এর সুলস্ত শিকা, পশমের পাখী, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলায় গাছ—আর কত কি ।—হু একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাত তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল ।

বধূ এতক্ষণ ভাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই—দেখিয়া মনে হইল যে, এখনও তারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছর ছেলের মত কচি । এমন সুন্দর সুবোধ চোখের ভাব সে আর কোন ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই—এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর নিষ্পাপ চোখ—অচেনা ছেলেটির উপর বধুব বড় মমতা হইল ।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যাকার রেলপথের কথাটি । খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিল । একটা বাটীতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায় । অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আব সে কখনো খায় নাই তো !—মোহনভোগে কিস্মিস দেওয়া কেন ? কৈ তাহার মায়ের তৈরী মোহনভোগে তো কিস্মিস থাকে না ? বাড়ীতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ ক'রে দিতে হবে ? তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা ওবেলা তোকে ক'রে দেবো—পরে সে শুধু স্নজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয় । অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না । আজ কিন্তু তাহার মনে হইল এ মোহনভোগে আব স্নায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাৎ !...সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল । হয়তো তাহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয় !—সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল, তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব—তাই তাহাদের বাড়ী ভাল খাওয়া দাওয়া হয় না ।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ী অপূর নিমন্ত্রণ হইল । হুপুর বেলা, সে-বাড়ীর একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল । গৃহের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা কবিয়া দিল । যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টকটকে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দ্বিবিষ মতো ! অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারী

চন্দ্রশূলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপূর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাটকাচেরা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুটির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপূ একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

সে রাত্রে শুইয়া অপূ শুধু অমলারই স্বপ্ন দেখিল। সে অমলার কোলে বেড়াইতেছে, অমলার কাছে বসিয়া আছে, অমলার সঙ্গে খেলা করিতেছে, অমলা তাহার পায়ের আঙুলে পটি বাঁধিয়া দিতেছে, সে ও অমলা এলরাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—অমলার হাসিভরা চোখমুখ ঘূমের ঘোরে সারারাত নিজের কাছে কাছে। ভোরে সে খুঁজিতে লাগিল অমলা কখন আসে। আরও সব ছেলেমেয়েরা আসিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল, ক্রমে বেশ বেলা হইল—কিন্তু অমলার দেখা নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে বধু খাবার খাইবার জন্ত ডাকিয়া পাঠাইল—রোজ সকালে বিকালে বধু নিজের হাতে খাবার তৈয়ারী করিয়া তাহাকে খাওয়াইত, খাওয়া শেষ করিয়া আলিবার সময় সে বধুকে জিজ্ঞাসা করিল—সকালে অমলাদিদি এসেছিল? না, সে আসে নাই। ক্রমে আরও বেলা হওয়াতে খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার বাবা তাহাকে বান করিবার জন্ত ডাকিল। তবুও কোথায় অমলা? অভিমান তাহার মন ছাপাইয়া উঠিল, বেশ, নাই বা আসিল? অমলার সহিত তাহার জন্মের মত আড়ি—আর যদি সে কখনো তাহার সহিত কথা কয়! বৈকালেও খেলা আরম্ভ হইল, সকলেই আসিল অমলা নাই। পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে খেলিতে আসিলেও অপূর মনে হইল, কাহার সহিত সে খেলিবে? কেহই উপযুক্ত খেলার साथী বলিয়া মনে হইল না। উৎসাহহীন ভাবে সে খানিকক্ষণ খেলা করিল, তবুও অমলার দেখা নাই।

পরদিন সকালে অমলা আসিল। অপূ কোনো কথা বলিল না। অমলা যেখানে বসে, সে তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না, অথচ মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া দেখে, সে যে বাগ করিয়া একরূপ করিতেছে, অমলা তাহা বুঝিয়াছে কিনা। অমলা সত্যই প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পরে সে যখন বুঝিল যে, কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয়, তখন সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খোকা কথা বলচো না কেন?—কি হয়েছে?

অপূ অডমত বোঝে না, সে অভিমানে ঠোট ফুলাইয়া বলিল—কি হয়েছে বকি। তা কিছু কি আর হয়েছে? কাল আসনি কেন?

অমলা অবাধ হইয়া বলিল—আসিনি, তাই কি?—সেইজন্তে বাগ করচে? অপূ ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, ঠিক তাই। অমলা বিলু বিলু করিয়া হাসিয়া

অপুকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল বাড়ীর ভিতর। সেখানে বধু সব ভনিয়া প্রথমটা হাসিয়া খুন হইল, পরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল,—তা হোলে অমলা, তোমার আর এখন বাড়ী যাওয়ার যো নেই তো দেখি—কি আর করবে, থোকা যখন তোমাকে ছাড়তে পারে না, তখন এখানেই থেকে যাও—আর না হয়—

বধুর কথাব শুনিতে অমলা কি জানি কি একটা ঠাওরাইয়া লজ্জিত প্রতিবাদের গুরে বলিল—আচ্ছা যাও বোদি—ও-রকম করলে কিন্তু ককনো মার তোমাদের বাড়ী—

খানিকক্ষণ পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেল। অমলা তাহাদের আলমাবি খুলিয়া কাঁচের বড় মেম-পুতুল, মোমের পাখী, গাছ আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সে-সব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস—একটা রবারের বাদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিটপিট করিবে—একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দুহাতে মৃগীবোগীর মত হঠাৎ হাত পা হুড়িয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে—সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া; রাণুদির কাকা তাহাদের বাড়ীর দালানের ষড়িতে যেমন দম দেয়, ঐরকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে খড়খড় করিয়া মেঝের উপর চলিতে থাকে—অনেক দূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি রকম ঘোড়া, বেশ বেশ তো। এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁতুরে একটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রং-এর একখানা ছোট রাংতার মত কি। অপু বলিল—ওটা কি? রাংতা? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন?—সোনার পাত দেখনি অপু? সোনার রং কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার ও-সব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুকনো নাটাকল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি ক'রে মার খায়!...তাহার দিদির বয়সী অন্ত কোন মেয়ের খেলনার ঐশ্বর্য কত বেশী, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি অত্যন্ত ককণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত—আর একটা রবারের বাদর...তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিটপিট করে...

বধুর কাছে একজোড়া পুরানো তাস ছিল; ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জড়ো করা

আছে মাজ—অপু সেগুলি লইয়া মাঝে-মাঝে নাড়ে চাড়ে। রাগদির বাড়ীতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাদের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেকা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজে ধরা লইয়া মারামারি হয়—বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাঝে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে বলে, ও কিছু খেলা জানে না, এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে বসে, এমন ভাব দেখায় যেন সে খুব পাকা খেলোয়াড়...খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু ধর' পড়ে। কেউ বলে, ও বৌ, একি? এখানে টেকা মেরে বসলে যে। দেখলে না ওহাতে রংয়ের গোলাম কাটলে?—তোমার চোখের সামনে যে? তাহার মা তাড়াতাড়ি অজ্ঞতা ঢাকিতে যায়, হাসিয়া বলে, তাই তো! বড় তো ভুল হ'য়ে গেছে, ও ঠাকুরঝি, মোটেই তো মনে নেই। পরে সে আবার খেলিতে থাকে, মুখ টিপিয়া হাসে, এর ওর দিকে চায়, এমন ভাবটা দেখায় যে তাহার কাছে সকলের হাতের তাসের খবরই আছে, এবার একটা কিছু না করিয়া সে ছাড়িবে না—কিন্তু খানিকটা পরে একজন অবাক হইয়া বলিয়া উঠে, একি বোমা, দেখি? ওমা আমার কি হবে! তোমার হাতে যে এমন বিস্তি ছিল, দেখাওনি? তাহার মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিজ্ঞের ভাব করিয়া বলে, আছে, ওর মধ্যে একটা কথা আছে! ইচ্ছে ক'রেই দেখাইনি—। সে আসলে বিস্তি কিসে হয় সব জানে না। তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে—ওর মধ্যে আবার কথাটা কি শুনি? এমন হাতটা নষ্ট কল্পে? দাঁও তুমি তাস সেজোবোঁকে দাঁও, তোমার আর খেলতে হবে না—ডের হয়েছে! তাহার মা অপমান ঢাকিতে গিয়া আবার হাসে—যেন কিছুই হয় নাই, সবই ঠাট্টা, উহার ঠাট্টা করিয়াই বলিতেছে, সেও সেই ভাবেই লইতেছে।

সে যদি এক জোড়া তাস পায় তবে সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা তাদের বাড়ীর বনের দিকের সেই জানালাটা—যেটার কবার্টগুলোর মধ্যে কি পোকায় কাটিয়া সরিয়ার মত গুঁড়া করিয়া দিয়াছে... নাড়া দিলে বুঝুঝু করিয়া বরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয়—জানালার ধারের বন হইতে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভাদুলী লতার কটু গন্ধ আসে, বোয়াকের কাণ্ডাঘের গাছের জঙ্গলে দিদির পরিচিত কাচপোকটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে আবার বসে—নির্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জানালাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে। কিসে কিসে বিস্তি হয় তাদের নাই-বা থাকিল জানা, তাদের খেলায় বিস্তি না দেখাইতে পারিলেও চলিবে—সেজ্ঞ কেহ কাহাকেও উঠাইয়া দিবে না, কোন অপমানের কথা বলিবে না, কোন হাসি-বিদ্রূপ করিবে না, যে যেরূপ পারে সেইরূপই খেলিবে। খেলা লইয়া কথা—নাই বা হইল বিস্তি দেখানো?

সন্ধ্যার পর বধূর ঘরে অপূর নিয়ন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আরোজনের ঘট দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা

যেকাবীতে আলাদা করিয়া ত্বন ও নেবু কেন ? ত্বন নেবু তো মা পাতেই দেয় !
প্রত্যেক তরকারির জন্তে আবার আলাদা আলাদা বাটি ।—তরকারিই বা কত !
অত বড় গল্‌দা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একাৰ জন্ত ?

লুচি । লুচি । তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার
দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায় কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটা-চচ্‌ড়ী
ও লাউছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জন-থাবার-থাওয়া শূন্য সকালে
বিকালে, অন্তমনস্ক মন হঠাৎ লুক, উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—যেখানে
গরম বোদে তপুৰ বেলা তাহাদের পাডার পাকা প্রাধুনি বীক রায় গম্‌ছা কাঁধে
ধুরিয়া বেড়ায়, সত্ত-তৈয়ারী বড় উত্তনের বড় লোটার কড়াই এ বি চাপানো
থাকে, লুচি-ভাজার অপূৰ্ব্ব স্বধাক্‌চি-স্বাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভাল কাপড়-
জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলি বাড়ীর বড় নাটমন্দির ও জনপাট-তলা
বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে সত্তরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের
ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে—সেই চৈত্র বৈশাখ মাসের রায়নবমী দোলের দিনটি—
তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলি বাড়ী । কিন্তু আজ সম্পূর্ণ
অপ্রত্যাশিত ভাবে সে হুদিনের উদয় হইল কি করিয়া । খাইতে বসিয়া বার
বার তাহার মনে হইতেছিল, আচ্‌চা, তাহার দিদি এ রকম খাইতে পায় নাই
কখনো ।

পরদিন সকালে আবার খেলা আরম্ভ হইল । অমলা আসিতেই অপু ছুটিয়া
গিয়া তাহার হাত ধরিল—আমি আর অমলাদি একদিকে, আর তোমরা সব
একদিকে—

খানিক খেলা হইবার পর অপুৰ মনে হইল অমলা তাহাকে দলে পাওয়ার
অপেক্ষা বিস্তকে দলে পাইতে বেশী ইচ্ছুক । ইহার প্রকৃত কারণ অপু জানিত
না—অপু একেবারে কাঁচা খেলুড়ে, তাহাকে দলে লওয়ার মানেই পরাজয়—
বিস্ত ডানপিটে ছেলে, তাহাকে দৌড়িয়া ধরা কি খেলায় হারানো সোজা নয় ।
একবার অমলা প্পটই বিরক্তি প্রকাশ করিল । অপু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে
লাগিল যাহাতে সে জেতে, যাহাতে অমলা সন্তুষ্ট হয়—কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্তেও
সে আবার হারিয়া গেল ।

সেবার দল গঠন করিবার সময় অমলা খুঁকিল বিস্তর দিকে ।

অপুৰ চোখ জলে ভরিয়া আসিল । খেলা তাহার কাছে হঠাৎ বড় বিস্তাধ
মনে হইল—অমলা বিস্তর দিকে ফিরিয়া সব কথা বলিতেছে, হাসিখুশি সবই
তাহায় সত্তে । খানিকটা পরে বিস্ত কি কাজে বাড়ী যাইতে চাহিলে অমলা
তাহাকে বাব বাব বলিল যে, সে যেন আবার আসে । অপুৰ মনে অত্যন্ত ঈর্ষা
হইল, সারা সকালটা একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল । পরে সে মনে মনে ভাবিল
—বিস্ত খেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে—গেলে খেলার খেলুড়ে কমে যাবে, তাই
অমলাদি ঐরকম বল্‌চে, আমি গেলে আমাকেও বল্‌বে ওর চেয়েও বেশী বল্‌বে ।
হঠাৎ সে চলিয়া যাইবার ভান করিয়া বলিল—বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই,

নাইবো। অমলা কোনো কথা বলিল না, কেবল কামারদের ছেড়ে নাড়ুগোপাল বলিল—আবার ও-বেলা এসো ভাই।

অপু খানিক দূর গিয়া একবার পিছনে চাহিল—তাহাকে বাদ দিয়া কাংরাও কোন ক্ষতি হয় নাই, পুরাদমে খেলা চলিতেছে, অমলা মহা-উৎসাহে খুটির কাছে বড়ী দাঁড়াইয়াছে—তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

‘‘পু আহত হইয়া অভিমানে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, কাংরাও সঙ্গে কোন কথা বলিল না।

ভাবি নো অমলাদি। না চাহিল তাহাকে—তাতেই বা কি ?

দিন দুই পরে হবিহর ছেলেকে নইয়া বাড়ী আসিল।

এই মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালরকম জমে নাই, অপূর বিদেশ-যাত্রার দিনকতক আগে দেশী-কুমড়ার শুকনো খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এখন আরও অনেক কুমড়ার খেলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছিমিছি এ নিয়ে ঝগড়া ক’রে তার কান ম’লে দিলাম ? আশ্বক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক।

বাড়ী আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস যে দেখিয়াছে এই কয়দিনে। রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ী যায়। মাটির আশা, পেঁপে, শসা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল। সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মুগাবোঁগার মত হাত পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খরুনী বাজাইতে শুরু করে। অমলাদি ? কতদূর যে সে গিয়াছিল, পদাঙ্কলে ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন্ গাঁয়ে পথের ধারের কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহার তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বস্তু করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া ছুঁ-চিঁড়ে-বাতাসা খাইতে দিয়াছিল। কোনটা ফেলিয়া সে কোনটার গল্প করে।

বেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়াগুলো দেখলি অপু ? তাব টাঙানো বুঝি ? খুব লম্বা ? রেলগাড়ী দেখতে পেলি ? গেল ?

না—রেলগাড়ী অপু দেখে নাই। এটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা-চার-পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ী দেখা যাইত—কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অজ্ঞানতাবে সদর

দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মত বৃক্ক আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পটা কড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং তদিক হইতে তট কি উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কাগজটি চক্ষের নিম্নে হইয়া গেল, কিছু ও ল কড়িয়া দেহের কি বৃক্কিবার পূর্ববর্তী।

অজ্ঞানিক পরেই অপ বাদী আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে পক্ষিয় পাড়িয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কি। এ যে আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়িল কে?

কানের আকস্মিকতায় ও বিপুল শব্দ প্রথমটা সে কিছু চাহর করিতে পারিল না। পরে একটা মাঝে ইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পানের দাগ এবং ও মিলিয়া নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল মা ছাড়া আর কেউ নয়। কখনো আন কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ী ঢুকিয়া সে দেখিল ম' বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্তমনে কাঠাল-বীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রা-দলের অভিমতের মত ভক্তিতে সামনের দিকে মুখি বালিশ উপরের মত বিনদিনে তীব্র মিষ্টত্বের কছিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট করে ছোটগুলো বৃক্কি বন-বাগান ঘেঁটে নিয়ে আনি।

দরজা পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল কি নিয়ে এসেচিস? কি হয়েছে?

—আমার বৃক্কি বন-বাগান কাটায়া আমার হাত পা ছেঁড়ে যাইনি বৃক্কি?

—কি বলে পাগলের মত? হয়েছে কি?

—কি হয়েছে। আমি এত কষ্ট করে টেলিগিরাপের তার টাংলায় আর ছিঁড় দেওয়া হয়েছে না?

তুমি যেন উদ্ভূষ্ট কাণ্ড ছাড়া তে এক দণ্ড ধাক্কা না বপু। পথের মাঝখানে কি টাংলায় হয়েছে—কি জানি টেলিগিরাপ কি কি-গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল—তখন কি করবো বলে—

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উ.। শিউসে হনুসীনতা। আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা শাককে ভালবাসে—অজ্ঞ যদিও তাহার সে প্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুড়িয়া গিয়াছে—বুড়ি মাকে একটা নিষ্ঠুর পাষণ্ডরূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জোঠার ভিটা, কোথায় পানিতদের বড় আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাসন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উচু ডাল হইতে দোলানো গুলগুলতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনি। এখনি বেল-বেল খেলা হইবে সব ঠিকঠাক, আর কি না—

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রুট, খুব একটা প্রাণ-বিধানো কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অজ্ঞ কিছু লেখিয়া গা পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না যাও—কখনো খাবো না—

তাহার মা বলিল—না খাবি না খাবি যা—ভাত খেয়ে একেবারে স্বাস্থ্য
ক'রে দেবেন কিনা ? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না—না খাবি যা,
দেখবো খিদে পেলে কে খেতে ছায় ।

বাস্ ! চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি তুমি আছ—সেই তাহার
মা কাঁঠাল-বাঁচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায় ? সে যেন কর্পরের মত উবিয়া
গেল ! কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ী ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে
পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিতহুবে ডাকিয়া
বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস্ অমন ক'রে, কি হয়েছে, ও অপু শোন—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যত সব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের,
হাড মাস কালি হয়ে গেল—কি এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আসছি,
ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি হবে ? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়েচি ? তাই
ছেলের রাগ—আমি ভাত খাবো না—না খাস্ যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে
স্বপ্নে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা !

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়—সে
অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল ।
সে শুকমুখে উদাস নয়নে ও পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের
গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল ।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিত তবে সে কখনই
মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু—সে আজ সকালে মাদের উপর
অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল । উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত
পর্যন্ত তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে । অপু বিশ্বাসের সহিত চাহিয়া চাহিয়া
দেখিতেছিল, কিছুই বাকী নাই, ঠিক যেন একেবারে সত্যিকার রেলরাস্তার
তার ।

সে সতুদের বাড়ী গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে
রেখেছি আবারে বাড়ীর উঠোনে, চল রেল রেল খেলা করি—আসবে ?

—তার কে টাঙিয়ে দিলে রে ?

—“মি নিজে টাঙালাম । দিদি ছোট্টা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল—তুই খেলুগে যা, আমি এখন যেতে পারবো না—

অপু মনে মনে বৃক্সিল, বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার যোগাড়
করা তাহার কর্তব্য নয় । কে তাহার কথা শুনিবে ? তবুও আর একবার সে
সতুর কাছে গেল । নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিকৃৎসাহভাবে
বলিল—চল না সতুদা, যাবে ? তুমি আমি আর দিদি খেলবো এখন ? পরে সে
প্রলোভনজনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের সঙ্গে এতগুলো বাতাবী নেবুর
পাতা তুলে এনে রেখেছি । সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল ।—
যাবে ?

সতু আসিতে চাহিল না । অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না

বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিতেছিল—এত করিয়া বলিতেও সতু-দা শুনিল না!

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাধিয়া জিনিস-পত্রের যোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশী রাখে—দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে-আলু ফলের আলু, রাধাশতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দোকান মাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল—চিনি কিসের করুবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাশতলার পথে সেই চিবিটায় ভাল বালি আছে—মা চাল-ভাজা ভাজবার জন্তে আনে। সেই বালি চল্ আনি গে—সাদা চক্ চক্ কচ্ছে—ঠিক একেবারে চিনি—

বাশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন, চটকা গাছের আগড়ালে একটা বড় লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুক্ রাঙা, বড় বড় স্থগোল কি ফল হুলিতেছে! অপু ও দুর্গা দুজনেই দোঁখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেঁচায় গোটা কয়েক ফল-স্থদ নীচের দিকে লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া ডলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপশি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে একপভাবে রক্ষিত হইল যে খরিদার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সদর দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়াইয়া গেল—ও সতু-দা, ছাথো না কি রকম দোকান হয়েছে, কেমন ফল ছাথো? আমি আর দিদি পেড়ে আনলাম—কি ফল বলো দিকি? জান?

সতু বলিল—ও তে! মাকাল ফল—আমাদের বাগানে ক-ত ছিল!...সতু আসতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতু-দা তাহাদের বাড়ীতে বড় একটা আসে না—তাছাড়া সতু-দা ছেলেদের দলের চাই। সে আমাদের খেলার ছেলেমাছুবিটুকু যেন ঘুটিয়া গেল!

অনেকক্ষণ পুরা মরহুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই আমাদের দুঃখ চাল দাও, খুব স্ক, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক থাকে—

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন, না?

দুর্গা মাথা হুলাইয়া বলিল—তা বৈকি? তোমরা তো হোলে কনোয়াজী—কাল সকালে এসে নকুঙো ক'রে নিয়ে যাবো—সতু-দা রাগুকে বলবে আজ রাস্তিরে যেন একটু চন্দন বেটে রাখে? কাল সকালে নিয়ে আসবো—

হুগার কথা ভাল করিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থ হস্তিত পণ্যের মধ্য হইতে কি একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও, ওরে দিদিরে—নিযে গেল রে—বলিয়া তাহার বিন্মিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চাঁৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল !

বিস্মিত দুর্গা ভাল করিয়া বাপাবট্টা কি বুঝাব আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল ফল তিনটিব একটিও নাই !

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল সতু গাবতলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপূর চেয়ে তিন চারি বৎসরের বেশী, তাহা ছাড়া সে অপূর মত ওরকম ছিপ্‌ছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়—বেশ জোরালা হাত-পা-ওয়ালা ও শক্ত—তাহাব সহিত ছুটিয়া অপূর পারিবার কথা নহে—তবুও যে ধবি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সতু ছুটিতেছে পরের জ্বা আশ্রয়্য করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নীচু হইয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণ ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চালতেন্তলার পথে গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা দৌড়াইয়া গিয়া অপূর কাছে পৌঁছিল। অপু একদম চোখ বুজিয়া একটু সামনের দিকে নীচু হইয়া বুঁকিয়া ভই হাতে চোখ রগড়াইতেছে। দুর্গা বলিল—কি হয়েছে রে অপু ?

অপু ভাল করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার স্বরে ঢ'হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল সতুদা চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেচে—দিদি—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপূর হাত নামাইয়া বলিল—সবু সবু, দেখি—ওরকম ক'রে চোখ রগড়াস নে, দেখি—

অপু তখনি তহাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল স্বরে বলিল—উহঁ ও দিদি—চোখে—শা কেমন কচ্ছে—আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েছে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম ক'রে চোখে হাত দিসনে—সবু—পরে সে কাপড় ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু চোখ মেনিয়া চাহিতে লাগিল—দুর্গা তাহার চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ দেখতে পাচ্ছিস ? আচ্ছা তুই বাড়ী যা আমি ওদের বাড়ী গিয়ে ওর মাকে আর ঠাকুমাকে সব ব'লে দিয়ে আসচি—রাগুকেও বলবো—আচ্ছা তুই ছেলে তো। তুই যা আমি আসছি এখ'খুনি—

রাগুদের খিড়্‌কি দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিছু যাইতে সাহস করিল না। সেজঠাক্কণকে সে ভয় করে। খানিকক্ষণ খিড়্‌কির কাছে

দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া সে বাড়ী কিয়ল। সদয় দয়জা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাদিতেছে। সে হিঁচকাটনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাদে না—রাগ করে বটে, কিন্তু কাদে না। চুপা বৃষ্টিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অতি সাধের ফলগুলি গেল...তাহা ছাড়া আবার চোখে ধূলা দিয়া একপ অপমান করিল! অপূর কান্না সে সহ করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—মাস্তানার স্তরে বলিল—কাদিস্ নে অপু আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্ছি—আয়—চোখে কি আর বাধা বাড়চে? দেখি কাপড়খানা বৃষ্টি ছিঁড়ে ফেলেচিস্?

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুর-বেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিষপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রং-এর সেকালের বেতের পাঁচটার, কড়ির আলনা, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বস্তু আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই, তাতে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি-কলসী আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সে অজ্ঞ।

সব-স্বল্প মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিষের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের কাঁপিটা ছিল ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জললে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের চণ্ডীরওণ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছ'য়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!

যখন একা ঘবে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাস্কাটা, বেতের কাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোসে যে ভালপাতার পুঁথির স্থপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাফিয়া দেখে। এক একদিন বনের ধারে জানালাটায় বসিয়া দুপুর বেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাত্ম্যরতনানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মত আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুদ্ধিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাছুলি বাড়ীর চণ্ডীরওণে বুদ্ধদের মজলিসে লইয়া যায়, স্বাম্যয়ণ কি

-পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার ভনিরে দাও তো ? বুকেরা খুব তারিফ করেন, দীর্ঘ চাটুযো বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দুখানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, সুনলে বিশেষ করবে না, এখনো ভাল ক’রে অক্ষর চিনলে না—বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে—ঐ যে-কদিন আমি আছি বে বাপু, চক্ষু বুজলেই লাঙলের মূঠো ধবুতে হবে। পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে মনে ভাবে—ওকি তোমাদের মত হবে ? কল্পে তো চিরকাল হৃদের কারবার !—হোলাশই বা গরীব, হাজার হোক পণ্ডিতবংশ তো বটে, বাবা মিথোই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেননি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায় ?

তাদের ঘরের জানালার কয়েক হাত দূরেই বাড়ীর পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের চেউয়ের মত ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে ওগাছে দোহুলামান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভায়ে যেখানে সৌন্দালি, বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বৃকে খঞ্জন পাখীর নাচ। বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কচুগুলের ঘন-সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপরাগ হইয়া গর্বদৃষ্ট প্রতিবেশীর আগত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছে, পাতাগুলি বিবর্ণ মৃত্যুপাতুর ডাঁটা গলিয়া আসিল—মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রোদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র স্বগন্ধ মাথানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্যবহন, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুটির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপূর কাছে এ বন অক্ষরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধু এইরকম তিস্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-ফুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফুল চাষিধারে। স্বর্ডি পথটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এ গাছের ও গাছের তলা দিয়া বন-কলমী, নাটা-কাঁটা, মনো-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্‌দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে—শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূলে দোপে, প্রাচীর শিরিষগাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আনে !

এই বন তার শ্রামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর দিদির মনে বুপাইয়া দিয়াছিল ! অগিয়া অবধি এই বন তাহাদের অপরিচিত, প্রতি পলের প্রতি মুহূর্তের নীরব আনন্দে তাহাদের শিপাহৃদয় কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষাসভেজ, ঘন সবুজ ঝোপের মাধ্যম নাটা-কাঁটার হৃগন্ধ ফুলের হলুদ রংএর শীষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়না কাঁটা ডালের

আগায় কাঠবিড়ালীর ন্যূনগতি আশা-যাওয়া, পত্রপুষ্পকলের সে প্রাচুর্য, সবাকার অপেক্ষা যখন ঘনবনের প্রান্তবর্তী, ঝোপঝাপের সঙ্গীহীন বাকা ডালে বনের কোনো অজানা পাখী বলিয়া থাকে, তখন তাহার মনের বিচিত্র, অপূর্ব, গভীর আনন্দরসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। সে যেন স্বপ্ন, যেন মায়া, চারিপাশ বিরিয়া পাখী গান গায়, খুরখুর করিয়া ঝরিয়া ফুল পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মন্দির, পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাণ্ড মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেইরকম ছিলেন! তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময়ে কি বিষয়ে সফল মনস্কাম হইয়া তাঁহার দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে কষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনো ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখে পুণ্ড্র মন্দির ডোবার পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী তিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘণ্টে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দাঁখলেন একটি সুন্দরী ঘোড়শা মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিবালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দম্বরমত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঠিক গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্ট স্বরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাউঠার মড়ক আদেশ হবে—বলে দিও চতুর্দশীর রাতে পঞ্চানন্দতলায় একশ আটটা কুয়ডো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারের শীত-সন্ধ্যায় কুয়াশায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন-কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানলার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটবার দেখতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলকের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা-পাড শাড়ী পরনে, হাতে গলায় মা-হুর্গার মত হার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও ?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুর বেলা, অনেক দূরের কোনো গাছের মাথার উপর হইতে গাঢ়-ঢিল টানিয়া টানিয়া ভাকে, যেন এই ছোট গ্রামখানিও অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটো-খাটো সুখ-দুঃখ শান্তি-দুঃখের উদ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের বোজ্রভরা, নীল-নিজ্জন আকাশপথে, এক উল্লাস, গৃহ-বিবাগী পথিক দেবতার স্বর্গের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়ে—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে নিজ্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহাব অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব সুশ্রুতি মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ বকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অহুভূত আনন্দের অশ্রুটি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বুঝা যাইবে না— একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন।

এই অপরাহ্নগুলির সঙ্গে, আজন্মসার্থী, সুপরিচিত, এই আনন্দ ভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত বহুসময়, স্বপ্ন-দেশের বাঁটা যে জড়ানো আছে। বাশঝাড়ের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায়, এক তরুণ বীরের উদারতার স্বেয়োগ পাইয়া কে প্রাণী একজন তাহার অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল শ্রাসিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে, পিটুলি গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়াদের কাছে ‘দুধ খেয়েছি’, ‘দুধ খেয়েছি’ বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে,—ঐ যে পোড়ার ভিটার বেলতলাটা—ওইখানেই তো শব্দশয্যা-শায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওঠে তীক্ষ্ণবাণে পৃথিবী ছুঁড়িয়া অর্জুন ভোগবতীধারা সিকন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে মরুযুতটের কুসুমিত কাননে যুগয়া করি * গিয়া রাজা দশরথ যুগভ্রমে যে জল-আহরণরত দরিদ্র বালককে বধ করেন—সে ষটিয়াছিল ওই রাণুদিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলার যে ভোবা—তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাতাগুলি সব হলুদে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে, ‘বীরাক্ষনা কাব্য’, কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভাল লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে :—

অদূরে দেখিল হৃদ, সে হৃদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি

ভয়উক ! দেখি উঠে উঠি কাদিয়া

এ কি কুশলন নাথ দেখাইলা যোরে ।

কলুইচণ্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামের উত্তর মাঠে যে পুণ্যনো, অজ্ঞা পুত্রের ধারে সে বনভোজন করিতে যায়—কেউ জানে না চাঁদের বনে ঘেরা সেই ছোট পুত্রটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হন । ঐ নির্জন মাঠের পুত্রটার মধ্যে সে ভয়উক, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোজ করে না । উত্তর মাঠের কলা-বেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, জনমানুষের চিহ্ন থাকে না কোনো দিকে—সোনাভাণ্ডার মাঠের পার্শ্বের অনাবিষ্কৃত, বসতিশূন্য অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন রাজার হাজার বচনের পুণ্যতন মনব-বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবকনামুখ অবোধ বালকের উল্লাসে কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ, অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্তমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয় । ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে !

তাহার বাবা বাড়ী নাই । বাড়ী থাকিলে তাহাকে এক মনে ঘরে বসিয়া দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয় । একেবারে বেলা শেষ হইয়া যায় তবুও ছুটি হয় না । তাহার মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে । আর কতক্ষণ বসিয়া শুভকরীর আরা মুখস্থ করিবে ? আর বুঝি সে খেলা করিবে না ! বেলা বুঝি আর আছে ? বাবার উপর তারি রাগ হয়, অভিমান হয় ।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটি হইয়া যায় । বই পড়ার কোনরকমে রূপ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুঁটিতে সে নাচিতে থাকে ।

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা...নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর... গুলক-লতার তার টাঙানো...খেজুর ডালের কাঁপ...বনের দিক হইতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়...রাঙা রোদটুকু জেঠামহাশয়দের পোড়ো ভিটার বাতাবীলেবুর গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে, চক্চকে বাদামী রং-এর তানাওয়াল জেড়ো পাখী বনকলমী কোণে উড়িয়া আসিয়া বসে...তাজা মাটির গন্ধ...ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুকাইবে সে কি আনন্দ !

সন্ধ্যার পর সর্বজনা ভাত চড়াইয়াছিল ! অপু দাওয়ায় মাহুর পাতিয়া বসিয়া আছে । খুব অন্ধকার একটানা ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে ।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—পূজোর আর কদিন আছে, মা ?

ভুর্গা ঝিঁঝিঁ পাতিয়া তরকারী কাটিতেছিল । বলিল,—আর বাইশ দিন আছে, না মা ?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে । তাহার বাবা বাড়ী আসিবে, অপূর, মায়ের,

তাহার অস্ত্র পুতুল, কাপড়, আলতা ।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অস্ত্র পাড়ায় গিয়া নিয়ন্ত্রণ খাইতে দেয় না । লুচি খাইতে কেমন তাগা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে । ফুটফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে বাশবনের আলোছায়ায় জাল-বুনানি পথ বাহিয়া সে আগে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপুজার খই-মুড়ি ভাজা আচল ভরিয়া লইয়া আসিত । বাড়ীতে বাড়ীতে শাক বাজে, পথে লুচি-ভাজার গন্ধ বাহির হয় হয়তো পাড়ায় কেউ পুজার শীতলের নৈবেদ্য একথানা তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয় । সেও অনেক খই-মুড়ি আনিত, তাহার মা দুইদিন ধর্ম্মীয় তাহাদের জলপান খাইতে দিত, নিজেও খাইত । সেবার সেজ ঠাকরুণ বলিয়াছিল—ভদ্র লোকের মেয়ে আবার চাখা লোকের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে খই-মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি ! ওসব দেখতে খারাপ ওরকম আর পাঠিও না বৌমা—সেই হইতে সে আর যায় না ।

দুর্গা বলিল—তাস খেলবে ?

—তা যা ও ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয় একটু খেলি—

দুর্গা বিপন্নমুখে অপূর দিকে চাছিল । অপূ হাসিয়া বলিল—চল আমি দাঁড়াচ্ছি—

তাহার মা বলিল—আহা হা, মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচি নে, সারাদিন বলে হেঁচ-মাটি ওপর ক'রে বেড়াবার সময় ভয় থাকে না, আর রাত্রিতে এ ঘর থেকে ওখর যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট ।

শিশুবাড়ী হইতে অপূব আনা সেই তাসজোড়াটা । তাস খেলায় তিন জনেরই কৃতিত্ব সমান । অপূ এখনও সব বং চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাস বিশুদ্ধদের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে, এটা কি বং, কইতন ছাথো না মা—

দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে । রাত্রিতে বাব্বা প্রায়ই হয় না, ওবেলার বাসি ভাত তরকারী থাকে । আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারী বাব্বা হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ । আজ যেন একটা উৎসবের দিন । অপূ বলে—তাস খেলতে খেলতে সেই গল্পটা বলো না মা, সেই স্ত্রীমল্লকার গল্পটা ?

হঠাৎ সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে । মায়ের গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের স্বরে বলে—সেই ছোড়াটা বলো না মা, সেই—স্ত্রীমল্লকা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ ।

দুর্গা বলে—খেলার সময় ছড়া বললে খেলা কি ক'রে হবে অপূ ? ওঠ—

সর্বজয়া বলিল—ডগ গা পাতালকোড় আজ কোথায় পেলি রে ?

—সেই যে গৌসাইদের বড় বাগানটা আছে ? সেই রাঙা গাই খুঁজতে একবার তুমি, আমি আর অপূ ? সেখানে অনেক ফুটেছিল, কেউ টের পায়নি মা, খুব বন কি না ? তা হোলে লোকে ভুলে নিয়ে যেতো—

অপূ বলিল, সেখানে গিইছিলি ? উঃ, সে যে বড় বন যে দ্বিদি !

সর্বজ্ঞা সন্নেহে বারবার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সেদিনকার সেই অপু—আর চাঁদ আর চাঁদ খোকনের কপালে টা-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বারবার কলের পুতুলের মত চাঁদের মত কপালখানি অজুলিবন্ধ হস্তের দিকে তুঁকাইয়া দিত, সে কি না আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার কাছে দুজটা বড় অভিনব ঠেকে। অপু খেলিতে না পারিলে বা আশা করিয়া পিটু জিত্তিতে না পারিলে কিংবা অপূর্ব হাতে খারাপ তাসগুলো নিজের হাতে ভাল ভাস আসিলে, বিপক্ষদের খেলোয়াড় হটয়াও তাহার মনে কষ্ট হইতেছিল।

দুর্গা বলিল—আজ কি হয়েছে জান মা—

অপু বলিল—যাঃ তা হ'লে তোর সঙ্গে আড়ি করবো, ব'লে ছাখ—

—করবে যা আড়ি—শোনো মা, ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদেব বাড়ী পোস্তদানা বোদ্ধের দিয়েচে, ও বলে, কি রাজীদি? রাজী বলে, যষ্টীমধু, খেয়ে ছাখ—ও খেয়ে এল মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝ্তেও পালে না যে পোস্ত—এমন বোকা—না মা?

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেট যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল ফলগুলা সতুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাদিয়া এক রাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল—কেমন, হ'লো এখন? বড় যে কাঁদুছিলি সকাল বেলা? সে সন্ধ্যায় কিসে যে বেশী আনন্দ পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলা হইতে কি, দিদির মুখের, বিশেষ করিয়া তাহার ভাগর চোখের মমতাবরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে—তাঁহা সে জানে না।

—ছকার খেলা, অপু, বুঝেহুঝে খেলিস—?—দুর্গা মহাশুশির সহিত তাস চড়াইয়া সাজাইতে লাগিল।

—কি ফলের গন্ধ বেকুচে, না দিদি?

তাহাদের মা বলিল, তাহাদের জেঠামশায়দের ভিটার পিছনে ছাতিম গাছ আছে, সেই ফলের গন্ধ। অপু ও দুর্গা দুজনেই আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—ই্যা মা, ওই ছাতিম তলায় একবার বাঘ এসেছিল বলেছিলে না? কিন্তু তাহার মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—ঐ যাঃ ভাত পুড়ে গেল, বরগন্ধ বেরিয়েচে—ভাতটা নামিয়ে, দাঁড়া বল্চি—

থাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল—পাতালকৌণ্ডের তরকারীটা কি স্বন্দর খেতে হয়েছে মা! তাহার মুখ স্বর্ণীয় তপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল—বাঃ! খেতে ঠিক মাংসের মত, না দিদি? পাতালকৌণ্ড এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি বাগের ছাতা, তাই তুলিনি—

উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাক্যে সর্বজ্ঞার বুক গর্বে ও তপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে? লোকের বাড়ীতে ভোজে বাঁধিতে ডাকে সেজ ঠাকুণকে, ভাকুক না দেখি একবার তাহাকে, রান্না কাহাকে বলে সেজঠাকুণকে সে—ই! সর্বজ্ঞা বলিল—অপূর্ব হাতে

জল ঢেলে দে হুগ্গা, ওকি ছেলের কাণ্ড! ঐ রাস্তার মাঝখানে মুখ ধোয় ?
যোজাই রাজে তুই ওই পথের ওপর—

কিন্তু অপু আর এক পাও নড়িতে চাহে না, সম্মুখে সেই ভাড়া পাঁচিলের
ফাঁকে, অন্ধকার বাঁশবন, ঝোপ জঙ্গলের অন্ধকারে ঝিঙের বোঁচর মত কালো
পোডো ভিটেবাড়ী আবও অজানা কত কি বিভীষিকা। সে বুকিতে পারে না
যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি, সেখানে পথের উপরে আঁচানোটাই কি এত
বেঈ।

তাহার পর সকলে 'গয়া ঘুমাইয়া পড়ে।' রাাত্র গভীর হয়, ছাতিম ফুলের
উগ্র স্ববাসে হেমপের আঁচ লাগা শিশিরদ্রব্ নৈশ বায়ু ভারয় যায়। মধ্য রাাত্র
বেগুনশাষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের স্নান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরশিক্ত গাছপালায়,
ভালে পাতাঃ ঐকটিক করে। আলো-আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্ত ঘুমন্ত
পরীর দেশের মত রহস্য-ভরা। শন শন করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া
সৌদালির ডাল ঢুলাইয়া, তেলাকুচো ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।

এক একদিন এই সময় অপুও ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

সেই দেবী যেন আসিয়াছেন, সেই গ্রামের বিন্মতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী
বিশালান্দী।

পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোঁয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা
শেওলা ভরা ঠাণ্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে,
তীরের প্রাচীন সপ্তপূর্ণ টাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী
দেবীর মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল-ফল নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার
লোকেরা কে তাঁহাকে জানে।

তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনও ভোলেন নাই।

গ্রাম নিম্ভতি হইয়া গৈলে অনেক রাাত্র। তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া
বেড়ান, বিহঙ্গ শিশুদের দেখাশুনা করেন, জ্যোৎস্না-রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট
ছোট্ট মোমাছিদের চাকগুলি বুনা তাঁওরা, নটকান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে
ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে,
নিভৃত বনের গাধ্য ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর
কোন বঁকে সূর্য শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল-পাপড়ি কলসী ফুলের দল ভিড়
পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডাল-পালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসার
চুনচুনি পাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

ভায় রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়
হৃগ্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ স্রী।

দিনের আলো ফুটিবার আগেই কিন্তু বনলক্ষী কোথায় মিলাইয়া যান, স্বরূপ
চক্রবর্তীর পর তাঁহাকে কেহ কোনোদিন দেখে নাই।

গ্রামের অন্নদা রায় মহাশয় সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

গ্রামে জরীপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। জরীপের বড় কর্ণচাৰী মাঠের মধ্যে নদীর ধায়ে আশিস খুলিয়াছেন, ছোটখাটো আমলাও সঙ্গে আসিয়াছে বিস্তর। গ্রামের সকল ভদ্রলোকেই কিছু জমিজমার মালিক, পিতৃপুরুষের অর্জিত এই সব সম্পত্তির নিরাপদ কালে জীবনভরগীর লগি কসিয়া পুঁতিয়া জুড়-পদাৰ্পণে ন্যাস উলমটান, গম্ভীর, নিক্কির অবস্থায় দিনগুলি একরূপ বেশই কাটিতেছিল, কিন্তু এবার সকলেই একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রায় হয়ত গ্রামের জমি নির্বিবাদে নিজের বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, যত দূর বিষার খাজনায় বারো বিঘা নিরুপদ্রবে দখল করিতেছে, এতদিন যাত্রা পূর্ণ শান্তিতে নিশ্চয় হইতেছিল, এইবার সে সকলের মধ্যে গোলমাল পৌঁছিল। বিপদ একরূপ সর্বজনীন হইলেও অন্নদা রায়ের বিপদ একটু অন্তঃকরণের বা একটু বৈশিষ্ট্যগত। তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা বহুদিন-যাবৎ পশ্চিম-প্রবাসী। এতদিন তিনি উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতির আম-কাঁঠালের বাগান ও জমি নির্বিঘ্নে ভোগ করিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ভরসা ছিল জরীপের সময় পারিয়া উঠিলে সবই, অন্ততঃপক্ষে কতকাংশ, নিজের বলিয়া লিখাইয়া লইবেন, কিন্তু কি জানি গ্রামের কে উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতিকে কি পত্র লিখিয়াছেন—ফলে অদ্ভুত দিন-দশেক হইল জ্ঞাতিব্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রটি জরীপের সময় বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করিতে আসিয়াছে।

মুখের গ্রাস তো গেলই, তাতা ছাড়া বিপদ আরও আছে। ঐ আত্মীয়ের অংশের ঘরগুলিই বাড়ীৰ মধ্যে ভাল, রায় মহাশয় গত বিশ বৎসর সেগুলি নিজে দখল করিয়া আসিতেছেন, সেগুলি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে—জ্যেষ্ঠপুত্রটি শৌধীন ধরণের কলেজের ছেলে, একখানিতে শোয়, একখানিতে পড়ানুনা করে—উপরের ঘরখানি হইলে নোংরা সিঁদুক, বন্ধকী মাল, কাগজপত্রাদি সবাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। নীচেব যে ঘরে পালিত-পাড়া হইতে সস্তাদরে কেনা কড়িবরগা রক্ষিত ছিল, সে ঘরও শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বৈকালবেলা। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়াব করেকটি লোক আসিয়াছেন—এই সময়েই পালা খেলার মজলিস্ বসে। কিন্তু অদ্ভুত এখনও কাজ মেটে নাই। অন্নদা রায় একে একে সমাগত খাতক-পত্র বিদায় করিতেছিলেন।

উঠানের ঘোঁরাকের ঠিক নীচেই একটি অল্পবয়সী কুবকবধু একটা ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া অনেকক্ষণ হইতে ঘোঁরাটা দিয়া বসিয়াছিল, সে এইবার তাহার পালা আসিয়াছে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় মাঝে মাঝে একটু নীচু করিয়া চশমার উপর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে? ভোর আবার কি?

কুবক-বধুটি আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল—মুই কিছু টাকার যোগাড় করিচি অনেক কষ্টে, মোর টাকাদা নেন্—আর গোলায় চাবিটা খুলে জান, বজ্র কষ্ট যাচ্ছে মনিব ঠাকুর, সে আর কি বলবো—

অন্নদা রায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, বলিলেন—হরি, নেও তো ওর টাকাটা গুণে ? খাতানামার দেখো তাবিখটা, হুদটা আর একবার হিসেব ক'রে দেখো—

কুবক-বধু আঁচলেব খুঁট হইতে টাকা বাহির করিয়া হরিহরের সম্মুখে রোয়াকের ধাবে রাখিয়া ছিল। হরিহর গুণিয়া বলিল—পাঁচ টাকা ?

রায় মহাশয় বলিলেন—আচ্ছা—জমা ক'রে নাও—তারপর ? আর টাকা কে ?

—ওই এখন ছান, তারপর দোব—মুই গতর খাটিয়ে শোধ করে তোলবো, —এখন ওই নিয়ে মোর গোলায় চাবিটা খুলে ছান, মোর মাতোরে দুটো খেইয়ে তো আগে বাঁচাই, তারপর ঘরদোর ফুটো হয়ে গিয়েছে, সে না হয়—।

এমন নিরুদ্বেগে কথা বলিতেছিল যেন গোলায় চাবি তাহার করতলগত হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।

রায় মহাশয় কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—ওঃ, ভারি যে দেখচি মান্নীর আকার, চল্লিশ টাকার কাছাকাছি হুদে আসলে বাকি—পাঁচ টাকা এনিচি, নিয়ে গোলা খুলে ছান। ছোট লোকেব কাণ্ডই আলাদা—যা এখন অসময়ে দিক্ করিস্ নে—

কুবক-বধু চণ্ডীমণ্ডপের অন্ন কাহারও অপরিচিতা নহে, দীপ্ত ভট্টাচার্যি চোখে ভাল দেখিতেন না, বলিলেন—কে ও অন্নদা ?

—ওই ওপাড়ার তমুরেজের বোঁ—দিন চারেক হোল তমুরেজ মায়া গিয়েছে না ? হুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকী, তাই মরবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবী দিয়ে রেখেচি, এখন গোলা খুলিয়ে ছান—হেন করুন—তেন করুন—

পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেলেও তমুরেজের বোঁ অত চমকিয়া উঠিত না। সে ব্যাপার এখন অনেকটা বুঝিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—
—ওকথা বলবেন না মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা নিমফল ছেল, ওবছর গড়িয়ে দিই নি। তাই ভোঁদা সেকরার দোকানে বিক্রী করলে পাঁচটা টাকা দেলে। ছেলেমানুষের জিনিস ব্যাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কি করি এখন দুটো খেইয়ে বাঁচি, ভাবলাম এর পর দিন দেন মালিক তো মোর বাছারে মুই আবার নিমফল গড়িয়ে দেবো ! তা দেন মনিব ঠাকুর চাবিটা দিয়ে—

—যা যা—এখন যা—এ সব টাকাকড়ির কাণ্ড কি নাকে কাঁদলেই মেটে ? তা মেটে না। সে তুই কি বুঝবি, থাকতো তোব সোয়ামী তো বুঝতো, যা এখন দিক্ করিসনি—ওই পাঁচ টাকা তোব নামে জমা রৈল—বাকী টাকা নিয়ে আয় তারপর দেখা যাবে—

অন্নদা রায় চশমা খুলিয়া ধাপের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া পড়িলেন ও

বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্ভোগ করিলেন। তম্বরেজের বৌ আকুল হুয়ে বলিয়া উঠিল—কনে যান ও মনিব ঠাকুর, মোর থোকার একটা উপায় ক'রে যান, ও রে মুই খাওয়াবো কি, এক পরসার মুড়ি কিনে দেবার যে পরসার নেই—মোর গোলা না খুলে ছান, মোর টাকা কড়া মোর ফেরৎ ছান—

রায় মহাশয় মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্ধে বেলা মার্গা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে—এক মুঠো টাকা জলে যাচ্ছে তার সঙ্গে খোজ নেই, গোলা খুলে দাও, টাকা ফেরৎ দাও—গোলায় আছে কি তোর? জোর শলি চাবেক বান, তাতে টাকা হবে? ও পাঁচ টাকাও উত্তল হ'য়ে রৈল, আমার টাকা দেখবো না। ওঁব ছেলে কি খাবে ব'লে ছাও—ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি? যা, পারিস তো নালিশ ক'রে খোলাগে যা—

রায় মহাশয় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে দীপ্ত ভট্টচার্যি বলিলেন—হ্যাঁগা বৌ, তম্বরেজ কদিন হ'লো—কৈ তা তো—

—বুধবারের দিন বাবা ঠাকুর, হাট থে ভাঙন মাছ আনলে, পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধলাম—ভাত দেলাম—সহজ মানুষ ভাত খেলে দিবা—খেয়ে বসে মোর শীত করচে, কাঁধা চাপা দিয়ে ছাও, দেলাম—ওমা পইতে তারা উঠতি না উঠতি মানুষ দেখি আর সাড়াশব্দ দেয় না, দুপুর হতি না হতি মোরে পথে বসিয়ে—মোর থোকারে পথে বসিয়ে—চোখের জলে তাহার গলা আটকাইয়া গেল। মিনতির হুয়ে বলিল—আপনারা এটু বলেন—ব'লে গোলার চাবিডা দিইয়ে ছান, সংসারের বড্ড কষ্ট হয়েচে—কৰ্জ কি মুই বাকী রাখবো—যে ক'রে হোক—

এই সময়ে নবাগত জ্ঞাপ্তিপুত্রটি আসিয়া পড়াতে কথাবাতা বন্ধ হইল। দিহু বলিলেন—এন হে নীরেন বাবাজী, মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি? এই তোমার বাপ ঠাকুরদার দেশ, বুঝলে হে, কি রকম দেখলে বন?

নীরেন একটু হাসিল। তাহার বয়স একুশ বাইশের বেশ নয়—বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুরুষ। কলিকাতার কলেজে আইন পড়ে অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির মানুষ—দেখিবার জন্য পিতা কতক প্রেরিত হইলেনও ব্যর্থকর্ম সে কিছুই দেখে না, বোঝেও না, দিন রাত নভেল পড়িয়া ও বন্দক ছুড়িয়া কাটায়। সঙ্গে একটি বন্দুক আনিয়াছে, শিকারের কোঁক শুব।

নীরেন উপরে নিজের ঘরে ঢুকিয়া গিয়া দেখিল, গোকুলের স্ত্রী স্বয়ং মেজেতে বসিয়া পড়িয়া মেজে হইতে কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে। দোবের কাছে যাইতেই তাহার নজর পড়িল, তাহার দামী বিলাতী অ'নোটো মেজেতে বসানো। উহার কাঁচের ডুমটা ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, সে মেজেতে কাঁ ছড়ানো। দোবের কাছে জুতার শব্দ পাইয়া গোকুলের স্ত্রী চমকাইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল, সে আঁচল পাতিয়া মেজে হইতে কাঁচের টুকবাঙলি খুঁটি খুঁটিয়া তুলিতেছিল,—ভাবে মনে হয় প্রতিদিনের মত ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আলোটি জালিতে গিয়াছিল, কি করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, এ

আলোর মালিক আসিবার পূর্বেই অপরাধের চিহ্নগুলি নিজেই তাড়াতাড়ি লরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিল হঠাৎ বামাল ধরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল। ক্ষতিকারিণীর লজ্জার ভারটা লঘু করিয়া দিবার জন্যই নীরেন হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে বৌদি, আলোটা ভেঙে ব'সে আছেন বুঝি? এই দেখুন ধরা প'ড়ে গেলেন, জানেন তো আইন পড়ি। আচ্ছা এখন একটু চা ক'রে নিয়ে আসুন তো বৌদি, চট করে, দেখি কেমন কাজের লোক। দাঁড়ান আলোটা জ্বলে নিই, ভাগিাস বাস্কে আর একটা ডুম আছে।

গোকুলের স্ত্রী সজ্জা স্বরে বলিল, দেশলাই আনবো ঠাকুরপো?

নীরেন কোতুকেব স্বরে বলিল—দেশলাই আনেন নি তবে আলো পেড়ে কি করছিলেন শুনি?

বধু এবার হাসিয়া ফেলিল, নিম্নস্বরে বলিল—ঝুল প'ড়ে রয়েছে, ভাবলুম একটু মুছে দিই, তা যেমন কাঁচটা নামাতে গেলাম কি জানি ও সব ইংরেজি কলের আলো—কথা শেষ না করিয়াই সে পুনরায় সজ্জা হাসিয়া নীচে পলাইল!

নীরেন দশ বারো দিন আসিয়াছে বটে, সম্পর্কে বৌদিদি হইলেও গোকুলের জীবন সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ হয় নাই। কাঁচ ভাঙার সন্ধ্যা হইতে কিছু উভয়ের মধ্যে নূতন পরিচয়ের সন্ধানটা কাটিয়া গেল। নীরেন অবস্রাপন্ন পিতার পুত্র, তাহার উপর বাংলাদেশের পাড়ারগ্নে এই প্রথম আসা, নিঃসঙ্গ আনন্দহীন প্রবাসে দিনগুলি কাটিতে চাহিতেছিল না। সমবয়সী বৌদির সহিত পরিচয়ের পথটা সহজ হইয়া যাওয়ার পর হইতে সকাল-সন্ধ্যায় চা-পানের সময়টি, সহজ আদান-প্রদানের মাধ্যমে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল!...

দুপুরে সেদিন দুর্গা বেড়াইতে আসিল। রান্নাঘরে দুয়ারে উকি মাঝিয়া বলিল—কি বাঁপচো ও খুড়ীমা? বধু বলিল—আয় মা আয়, একটু কাজ করে দিবি? একা আর পেয়ে উঠচিনে।... দুর্গা মাঝে মাঝে যখনই আসে, খুড়ীমার কার্যে সাহায্য করে। সে মাছ কুটিতে কুটিতে বলিল—হ্যাঁ খুড়ীমা, এ কাঁকড়া কোথায় পেলে? এ কাঁকড়া তো খায় না।

—কেন খাবে না রে, দূর। বিধু জ্বেলেনী ব'লে গেল এ কাঁকড়া সবাই খায়।

—হ্যাঁ খুড়ীমা, ওমা সেকি, একি তুমি কিন্নে?

—কিন্নামই তো, ওই অতগুলো পাঁচ-পয়সায় দিয়েচে বিধু।

দুর্গা কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা! এ কাঁকড়া আবার পয়সা দিয়ে কেনেই বা কে, খায়ই বা কে? ভালমানুষ পেয়ে বিধু ঠকিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সরলা খুড়ীমাটির উপর তাহার স্নেহ নিবিড়তর হইয়া উঠিল।

সেদিন নাকি গোকুল-কাকা খুড়ীমার মাথায় খড়মের বাড়ী মাঝিয়াছিল—স্বর্ণ গোয়ালিনী তাহাদের বাড়ী গল্প করে। সে-ও সেদিন নদীর ঘাটে স্নান

করিতে গিয়াছিল। খুড়ীমা জান করিতে আসিয়া মাথা ডুবাইয়া জান করিল না পাছে জালা করে। সেদিন ডুখে তাহান বুক ফাটিয়ে যাইতেছিল, কিন্তু কিছু বলে নাই পাছে খুড়ীমা অপ্রতিভ হয়— এক ঘাট পেয়েই সে মনে পজ্জা পায়। তবুও বায়-জ্যেষ্ঠি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—বোমা নাহলে ন। খুড়ীমা হাসিয়া উত্তর দিল—নাববো না আজ আর দিদিমা, শরীরটা ভাল নহ।

খুড়ীমা ভাবিয়াছিল তাহান ম'র খাওয়ার কণ বৃষ্টি কেত জানে। কিন্তু খুড়ীমা ঘাট হইতে উঠিয়া গেলেই বায় জ্যেষ্ঠি বলিল—দেখেচেন তাকে কি রকম মেয়েচে গোকুলো, মাথার চুলে রক্ত একেবারে আটা হয়ে এঁচে আছে।

বায়-জ্যেষ্ঠির ভারি অন্তায়। জানো তো বাপ, তবে অব্যবহার জিজ্ঞেস করাট বা কেন, আর সকলকে বলাই বা কেন?

মাছ ধুইয়া বাথিয়া চলিয়া যাইবার সময় দুর্গা ভয়ে ভয়ে বলিল—খুড়ীমা, তোমাদের চিঁড়ের ধান আছে? মা বলছিল অপু চিঁড়ে খেতে চেয়েছে, তা আমাদের তো এবার ধান কেনা হয়নি। গোকুলের বউ চুপি চুপি বলিল—আসিস্ এখন দুপুরের পর। দালানের দিকে ইসারায় দেখাইয়া কহিল—ঘুমলে আসিস্!

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমা, তোমাদের বাডী কে এসেছে, আমি একদিনও দেখিনি কিন্তু।

—ঠাকুরপোকে দেখিসনি? এখন নেই কোথায় বেরিয়েচে বিকেলবেলা আসিস্, দেখা হবে এখন। তারপর গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হলে কিন্তু দিব্যি মানায়।

দুর্গা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—দূর!

গোকুলের বউ আবার হাসিয়া বলিল—কেন রে দূর কেন? কেন আমাদের মেয়ে কি খারাপ? দেখি? সে দুর্গার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল—তাত্ তো এমন দুর্গা প্রেমীর মত সুন্দর মুখখানি? হোলই বা বাপের পরস্যা নেই।

দুর্গা কানুনি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া কহিল—যাও খুড়ীমা যেন কি পরে সে একপ্রকার ছুটিয়াই খিডকী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা, নৈলে দ্যাখো না দর!...

দুর্গা চলিয়া যাইতে না যাইতে স্বর্ণ গোয়ালিনী দধু হুহিতে আসিল। বধু স্বর হইতে বলিল—ও সন্ন আমার হাত জোড়া, বাছুরটা ওই বাইরের উঠানে পিটুলি-গাছে বাঁধা আছে—নিয়ে আয়, আর রোয়াকে ঘটিটা মাল্লা আছে তাত্।

সধী ঠাকুরগণের এতক্ষণে পূজাহিক সমাপ্ত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিকে স্থানীয় কালীমন্দিরের উদ্দেশে মুখ ফিরাইয়া প্রণাম করিতে করিতে টানিয়া টানিয়া আবৃত্তির স্বরে বলিতে লাগিলেন—দোহাই মা সিকেশ্বরী, দিন

দিও যা, ভবলমুদ্রার পাখ কোরো মা—মা রক্ষেকালী, রক্ষে কোরো, মা-গো ?

গোকুলের বউ রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল—ও পিসিমা, নারকোলের নাড়ু রেখে দিইচি, দুটো খেয়ে জল খান ।

হঠাৎ সখী ঠাকুরণ রোযাক হইতে ডাক দিলেন—বৌমা দেখে যাও তো এদিকে ।

স্বব স্নানিয়া গোকুলের বউ-এর প্রাণ উড়িয়া গেল । সখী ঠাকুরণকে সে যমের মত ভয় কবে । মায়াদয়া বিতরণ সম্বন্ধে ভগবান সখী ঠাকুরণের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে । রোয়াকের কোণে জডো-করা মাজা বাসনগুলির উপর খুঁকিয়া পড়িয়া, আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন—চাখো তো চক্ষু দিয়ে, দেখতে পাচ্ছো ? একেবারে স্পষ্ট জলের দাগ দেখলে তো ? এখান থেকে সন্ন ঘটি তুলে নিয়েচে, তাৎপর্য সেই শুদ্ধুরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আবার হেঁসেলে নিয়ে সাত-রাজ্যি জড়ানো হয়েচে ! যাঃ ! জাতজরো একেবারে গেল !

সখী ঠাকুরণ হতাশভাবে রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন । যেন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইলে ইহাৰ চেয়ে বেশী হতাশ হইতে পারিতেন না ।

—হা'ঘরে হাডহাভাবে ঘরের মেয়ে আনলেই অমনি হয়, ভদ্র লোকের রীতি শিখবেই বা কোথা থেকে—জানবেই বা কোথা থেকে ? বাসন মাজলি তা দেখলি নে এঁটো গেল কি রৈল ? তিনপহর বেলা হয়েচে ভাবলাম একটু জল মুখে দিই ! শুদ্ধুরের এঁটো, এখুনি নেয়ে মরতে হোত—ভাগ্যিস ঘটিটা ছুঁইনি !

গোকুলের বউ বিষমমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—কেন মস্তে সন্ন পোড়ার-মুখীকে ঘটি তুলে নিতে বললাম, নিজে দিলেই হোত ।

সখী ঠাকুরণ মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—ধিক্বী হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈলে যে ? যাও হাঁডিকুড়ি ফেলে দাও গিয়ে । বাসন-কোসন মেজে আনো ফের । রান্নাঘরে গোবর দিয়ে লেপে এসো । যত লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে জুটে সংসারটাকে ছারেখারে দিলে । সখী ঠাকুরণ রাগে গব্গব করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন বাহিরের খররোদ্দ তাঁহার সম্ব হইতেছিল না ।

হকুমত : সকল কাজ সারিতে বেলা একেবারে পড়িয়া গেল । নদীতে সে যখন পুনরায় স্নান করিতে গেল, তখন রোদ্দ্রে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে ।

ঘাটে বৈকালের ছায়া খুব ঘন, ওপারের বড় শিমূল গাছটায় বোদ চিক্ চিক্ করিতেছে । নদীর বাকে একখানা পাল-তোলা নৌকা দাঁড বাহিয়া বাক ঘুরিয়া যাইতেছে । হালের কাছে একজন লোক দাঁড়াইয়া কাপড় শুকাইতেছে, কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়াছে, বাতাসে নিশানের মত উড়িতেছে । মাঝনদীতে একটা কচ্ছপ মুখ তুলিয়া নিঃশ্বাস লইয়া আবার ডুবিয়া গেল—সোঁ-ও-ও-ও-চুস ।

নদীর জলের কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৃদয় গন্ত আসে, ছোট্ট নদী ;
ওপারের চরে একটা পানকোড়ি মাছ-ধরা বাঁশের দোয়াড়ির উপর বসিয়া
আছে ।

এইসময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে—

পানকোড়ি পানকোড়ি, ডাডায় ওঠোসে..

গোকুলের বউ খানিকক্ষণ পানকোড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল । মায়ের
মুখ মনে পড়ে । সংসারে আর কেহ নাই যে, মুখের দিকে চায় ! মায়ের কি
মরিবার বয়স হইয়াছিল ? গরীব পিতৃকুলে কেবল এক গাঁজাখোদ ভাই আছে,
সে কোথায় কখন থাকে—তার ঠিকানা নাই । গত বৎসর পূজার সময় এখানে
আসিয়া চারদিন ছিল । সে লুকাইয়া লুকাইয়া ভাইকে নিজের বাস্তু হইতে
যাহা সামান্য কিছু পুঁজি—সিকিটা ড্যানিটা বাহির করিয়া দিত । পরে একদিন
সে হঠাৎ এখান হইতে উধাও হয় । চলিয়া গেলে প্রকাশ পাইল যে, এক
কারুণি আলোয়ান-বিক্রেতার নিকট একখানি আলোয়ান ধারে কিনিয়া তাহার
খাতায় ভগ্নীপতির নাম লিখাইয়া দিয়াছে । তাহা লইয়া অনেক হৈ চৈ হইল ।
পিতৃকুলের অনেক সমালোচনা, অনেক অপমান । ভাইটির সেই হইতে আর
কোন সম্মান নাই ।

নিঃসহায় ছত্রছাড়া ভাইটার জন্য সম্ভাব্যবেলা কাজের দিকে মনটা হত করে ।
নির্জন মাঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা পথিক ভাইটা হস্ততো
দূরের কোন্ জনহীন আশ্রয় মেঠো-পথ বাহিয়া এক কোথায় চলিয়াছে, যাত্রা
মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, মুখের দিকে চাহিবার কোনো মাত্রা নাই ।

বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, চোখের জলে ছায়াভরা নদীর জল, মাঠ,
ঘাট, ওপারের শিমূল গাছটা, বাঁকের মোড়ে বড নৌকাখানা—সব কাপ্সা
হইয়া আসে ।

পথের পাঁচালী

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অপু সেদিন জেলপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল । বেলা দুইটা বা আড়াইটার
কম নয়, রোঁ অত্যন্ত প্রথর । প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ী গেল ।
তিনকড়ির ছেলে বন্ধা পেয়াবাতলায় বাথারী টাচিতেছিল, অপু বলিল—এই
কড়ি খেলবি ! খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বন্ধা বলিল তাহাকে এখন নৌকায়
যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে ! সেখান হইতে সে গেল
রামচরণ জেলের বাড়ী । রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল ; অপু
বলিল—হৃদয় বাড়ী আছে ? রামচরণ বলিল—হৃদয় কেন ঠাকুর ? কড়ি খেলা
বুঝি ? এখন যাও, হৃদয় বাড়ী নেই ।

ঠিক দুপুরবেলায় ঘুরিয়া অপু'র মুখ রাঙা হইয়া গেল । আরও কয়েকস্থানে
বিফলমনোরণ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবু'রাম পাড়ুইয়ের বাড়ীর নিকটবর্তী

উঁটুলতলার কাছে আসিয়া তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উঁটুলতলায় কড়িখেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাঠায় ছেলে, কেবল ব্রাহ্মণ-পাডার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপূর সঙ্গে পটুর ভেয়ান আলাপ নাই। কারণ পটুর যে পাডায় বাড়ী, অপূরের বাড়ী হইতে তাহা অনেক দূর। অপূর চেয়ে পটু কিছু ছোট; অপূর মনে আছে, প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরুশশাঙ্ক, ঐশালায় ভর্তি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শাস্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল।...অপূ তাহার কাছে গিয়া বলিল—কটা কড়ি পটু কড়ির গঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা হুতার বুনানি ছোট্ট গঁজেটি—তাহার অত্যন্ত সখের জিনিস। বলিল, সতেরোটা এনেছি—সাতটা সোনা-গঁজে; হেরে গেলে আরও আনবো।...পরে সে গঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল—কেমন দেখচিস? গঁজেটায় একপণ কড়ি ধরে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়ি খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে; সেইজন্যই সে দ্বিগুণের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মাক্সমারে পটু উপর হইতে টুক করিয়া বড় কড়ি দিয়া তাক ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, অমনি পটুর মুখ অসীম আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া-পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বার বার গঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্তি হইতে আর কত বাকী।

কয়েকজন জেলের ছেলে কি পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল—আর এক হাত তফাৎ থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ বেশী।

পটু বলিল—বা রে, তা কেন, টিপ বেশী থাকাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেত না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল—এ বেশী কড়ি আমি কোনদিন জিতিনি; আজ আর খেল্চি নে,—খেলে কি আর এই কড়ি বাড়ী নিয়ে যেতে পারবো? আবার একহাত বেশী! সব হেরে যাব। হঠাৎ সে কড়ির ছোট্ট খলিটি হাতে লইয়া বলিল—আমি এক হাত বেশী নিয়ে খেলবো না, আমি বাড়ী যাচ্ছি।...পরে জেলদের ভাবভঙ্গী ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির খলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি?...সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর খলিস্থ হাতটা চাপিয়া ধরিল! পটু হাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না; বিষমমুখে বলিল—বা রে, ছেড়ে দাও না আমার হাত!—পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল; সে

পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্ত ইহাদের চেষ্টা। পড়িয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ বুঝিতে পারিবে! হাত হইতে কড়ির থলিটি অনেকক্ষণ কোন ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর হৃদশয় একটু খুশী যে না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সেও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায়ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—ছেলেমানুষ ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও—ছাড়ো! পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতের ঘুষি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না; তারপর ঠেলাঠেলিতে সে-ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপুকেও সেদিন বেদম প্রহার খাইতে হইত নিশ্চয়ই, কারণ তাহার মেরেলি ধরণের হাতে-পায়ে কোন জোর ছিল না; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নীরেন এই পথে আসিয়া পড়াতে বিপক্ষদল সরিয়া পড়িল। পটুর লাগিয়াছিল খুব বেনী; নীরেন তাহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। একটু সামলাইয়া লইয়াই সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—ছড়ানো কড়িগুলার হুঁ-একটি ছাড়া বাকীগুলি অদৃশ্য, মায় কড়ির থলিটি পর্যন্ত। পরে সে অপূর কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অপুদা, তোমার বেনী লাগেনি তো?

এতদরে ঠিক দুপুর বেলা জেলের ছেলেদের দলে মিশিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্ত নীরেন হুঁজনকে বকিল। সময় কাটাইবার জন্ত নীরেন পাড়ার ছেলেদের লইয়া অন্নদা বায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হইতে পড়িবার জন্ত হুঁজনকেই বাব বাব বলিল। পটু চলিতে চলিতে শুধুই ভাবিতেছিল—কেমন সুন্দর কড়ির গঁজোটা আমার, সেদিন অত ক'রে ছিবাসের কাছে চেয়ে নিলাম—গেল! আমি যদি কড়ি জিতে আর না খেলি তা ওদের কি? সে তো আমার ইচ্ছে।

বাড়ী ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল—দাদি, শিউলিতলায় গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা-কড়ি রেখে গিইছি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে হুঁখণ্ড ক'রে রেখেচিল?

দুর্গা সেণানাকে ভাড়াইয়াছিল ঠিকই।—আহা, জারি তো একখানা বাঁকা কড়ি! তোর যত পাগলামি—বাঁশবাগানে কড়ি আর মিলবে না বুঝি? কড়ির ভাঙ্গি অমিল কিনা!

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—অমিল না তো কি? তুই এনে ১০ দিকি ওইরকম একখানা কড়ি। আমি বুকে পেতে নিয়ে আসবো, আর তুই সব ভেঙেচুয়ে

—বাক্ষি—বেশ ভো !

তার চোখে জল আসিয়া গেল ।

দুর্গা বলিল—দেবো এনে যত চাস্, কান্না কিসের !

বাঁকা-কক্ষি অপূৰ জীবনে এক অভূত জিনিস ! একথানা শুকনো হাঙা, গোড়ার দিক মোটা আগার দিক সরু, বাঁকা কক্ষি হাতে করিলেই অপূৰ মন পুলকে শিহবিয়া ওঠে মনে অভূত সব কল্পনা জাগে । একথানা বাঁকা-কক্ষি হাতে করিয়া এক একদিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপনমনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়, কখনো রাজপুত্র, কখনো তাহার কন্যাদোকানী, কখনো ভ্রমণকারী, কখনো বা সেনাপতি, কখনো মহাভারতের অৰ্জুন কল্পনা কবে ও আপনমনে বিড় বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহার শীৰ্ষে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেইসব ঘটনা বলিয়া যায় । কক্ষি যত মনের মত হাঙা হইবে ও পরিমাণ-মত বাঁকা হইবে তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে ; কিন্তু সে বকম কক্ষি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপূ তাহা বোঝে । কত খুঁজিয়া তবে একথানা মেলে ।

অপূ যে বাঁকা-কক্ষি হাতে এ বকম করিয়া বেড়ায়, এ কথা কেউ না বুঝিতে পারে অপূর সেদিকে অভ্যস্ত চোখ । এরূপ অবস্থায় লোক তাহাকে আপনমনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় পারতপক্ষে জনসমাগমপূৰ্ণ স্থানে অথবা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সেসব দিকে না গিয়া নদীর ধারে—নিৰ্জন বাঁশবনের পথে—নিজেদের বাড়ীর পিছনে তেঁতুলতলায় ঘোবে । এ অবস্থায় তাহাকে কেহ না দেখে, সেদিকে তাহার অভ্যস্ত সতর্ক দৃষ্টি । কচিং যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখন সে জিভ কাটিয়া হাতেব কক্ষিখানা ফেলিয়া দেয়—পাছে কেহ কিছু মনে করে—এজগৎ তাহার ভারি লজ্জা ।

কেবল জানে তাহার দিদি । তাহাকে এ অবস্থায় ড'একবার দেখিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে ? তাই সে বাঁকা-কক্ষির কথা দিদির স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল । অগ্ন লোক হইলে, লজ্জায় অপূ কখনই একবার উল্লেখ করিতে পাবিত না, যদিও কেহই জানে না অপূর সহিত বাঁকা-কক্ষির ও বহুমুখ্য সম্পর্ক, তবুও অপূর মনে হয় সকলেই সে কথা জানে, বলিলেই সকলে তাহাকে পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিবে । কে বুঝিবে—একথানা বাঁকা কক্ষি হাতে পাইলে, সে না খাইয়া-দাইয়া নদীর ধারে কি কোন জনহীন বনের পথে কি অপূৰ আনন্দেই সারাদিন একা-একা কাটাইয়া দিতে পারে ।

দিদিকে অহরোধ করিয়াছিল—মাকে যেন এসব বলিস্নে দিদি ! দুর্গা বলে নাই । সে জানে, অপূ একটা পাগল ! ভারি মমতা হয় ওর উপর, ছোট বোকা বোকা আহুবে ভাইটা—এসব মাকে বলিয়া কি হইবে ?...

মধুসংক্রান্তির ত্রয়োদশ পূৰ্বদিন সৰ্বজয়া ছেলেকে বলিল—কাল ভোদেব মাঠার

মশায়কে নেমস্তম্ব ক'রে আসিস—বলিস দুপুর-বেলা এখানে খেতে ।

মোট। চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, ডুম্বরের হুস্তনি, ষোড়ের ঘণ্ট, চিংড়ি মাছেব ঝোল, কলার বড়া ও পায়েস ।

দুর্গাকে তাহার মা পরিবেশন-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে । নিতান্ত আনাড়ি,—ভয়ে ভয়ে এমন সন্তর্পণে সে ডালের বাটি নিমন্ত্রিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল—যেন তাহার ভয় হইতেছে এখনি কেহ বকিয়া উঠিবে । অত মোটা চালের ভাত নীরেনের খাদ্য অভ্যাস নাই ; এত কম তৈল ঘূতের রান্না তরকারি কি করিয়া লোকে খায় তাহা সে জানে না । পায়েস পানসে—জল-মিশানো দুধের তৈরী, একবার মুখে 'দয়'ই প'য়ে ভোজনের উৎসাহ তাহার অর্ধেক কমিয়া গেল । অপু মগা খশি ও উৎসাহ-সহকারে খাইতেছিল ; এত সুখান্ন তাহাদের বাড়ীতে হ'একদিন মাত্র হইয়াছে—আজ তাহার স্বর্ণীয় উৎসবের দিন ।—আপনি আর একটু পায়েস নিন্ মাষ্টার মশায় । নিজে সে এটা-ওটা বার বার দিদির কাছে চাহিয়া লইতেছিল ।

বাড়ী ফিরিলে গোকুলের বউ হাসিমুখে বলিল—দুর্গা—দুর্গাকে পছন্দ হয় ঠাকুরপো ? দিবি দেখতে-সুন্দতে ! আতা ! বড় গরীবের মেয়ে, বাপের পয়সা নেই । কার হাতে যে পড়বে !—সারাজীবন প'ড়ে প'ড়ে ভুগ'বে । তা তুমি ওকে বিয়ে কর না কেন ঠাকুরপো, তোমাদেরই পালটি ঘর—মেয়েও দিবি । ভাইবোনের দু'জনেরই কেমন পুতুল-পুতুল গড়ন !...

জরীপের তাঁবু হইতে ফিরিতে গিয়া নীরেন সেদিন গ্রামের পিছনের আম-বাগানের পথ ধরিয়াছিল । একটা বনে-ঘেরা সরু পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিল বাগানের ভিতর হইতে একটি মেয়ে সম্মুখের পথের উপর আসিয়া উঠিতেছে, সে চিনিল—অপুর বোন দুর্গা । জিজ্ঞাসা করিল—কি খুকী, তোমাদের বাগান বুঝি এইটে ?

দুর্গা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইল, কিছু বলিল না ।

পরে সে পথের পাশে দাঁড়াইয়া নীরেনকে পথ ছাড়িয়া দিতে গেল । নীরেন বলিল—না না খুকী, তুমি চল আগে আগে । তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হোল । এদিকে একটা পুকুরের ধারে গিয়ে পড়েছিলাম, তারপর পথ খুঁজে ছয়রান । যে বন তোমাদের দেশে !

দুর্গা যাইতে যাইতে হঠাৎ খামিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নীরেনের মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল । সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে কিসের ফল গোটাকতক পথের উপর পড়িয়া গেল ।

নীরেন বলিল—কি যেন পড়ে গেল খুকী ! কিসের ফল ওগুলো ?

দুর্গা নীচু হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে সঙ্কুচিতভাবে বলিল—ও কিছু না, মেটে আলু ।

মেটে আলু ? খেতে ভাল লাগে বুঝি ? কিসের ফল ওগুলো ?

এ প্রশ্ন দুর্গার কাছে অভ্যস্ত কৌতুককর ঠেকিল । একটি পাঁচ বছরের

ছেলে যা জানে, চশমা-পরা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানে না। সে বলিল—
এ ফল তো খায় না, এ তো তেতো।

তবে তুমি যে—

দুর্গা! সন্জ্জহরে বলিল—আমি নিয়ে যাচ্ছি এমনি—খেলবার জন্তে।
একথা তাহাও মনে ছিল যে, এই চশমা পরা ছেলেটির সঙ্গেই মেদিন খুড়ীয়া
ঠাট্টাচ্ছ তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। তাহার ভারী কোতুল
হইতেছিল, ছেলেটিকে সে ভাল করিয়া দেখে। কিন্তু মধুসংক্রান্তির ত্রতের
দিনও তাহা সে পারে নাই, আজও পারিল না।

—অপুকে বলো কাল সকালে যেন বই নিয়ে যায়—বলবে তো?

দুর্গা চিন্তিতে চলিতে সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল।

আর একটু গিয়া পাশের একটা পথ দেখাইয়া বলিল—এই পথ দিয়ে গেলে
আপনার খুব সাজা হবে।

নীরেন বলিল,—আচ্ছা, আমি চিনে যাব এখন, তোমাকে একটু এগিয়ে
দিই, তুমি একলা যেতে পারবে?

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল—ঐ তো আমাদের বাড়ী একটু এগিয়ে
গিয়েই, আমি তো এইটুকু একলা যাবো এখন। আপনি আর—

দুর্গাকে ইহার আগে নীরেন কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই,—চোখ দুটির
অমন সুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপূর মধ্যে। যেন পল্লী-
প্রান্তের নিভৃত চূত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় স্ত্যাম্বিত্য ভাগর চোখ দুটির মধ্যে
অর্দ্রসুগন্ধ রহিয়াছে। প্রভাত এতদূর হয় নাই, বারিশেষের অলস অন্ধকার
এখনও জড়াইয়া। তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে,—কত
সুগন্ধ আখির জাগরণ, কত কুমারীর ঘাণ যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের
অমৃত উৎসব—জানালায় জানালায় ধূপগন্ধ।

দুর্গা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কেমন যেন উসখুস করিতে লাগিল। নীরেনের
মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিতে পারিতেছে না। সে বলিল—না
খুকী, তোমাকে আর একটু এগিয়ে দিই? চল, তোমাদের বাড়ীর সামনে
দিয়ই যাই।

দুর্গা ইতস্তত করিতে লাগিল, পরে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নীরেনের
মনে হইল এইবার সে কথা বলিবে। পরক্ষণে কিন্তু দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া তাহার
লহিত যাইতে হইবে না জানাইয়া দিয়া, বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা। ছাদে কাপড় তুলিতে আসিয়া গোকুলের বউ নীরেনের
ঘরের দ্বারে উঁকি দিয়া দেখিল। গরমে নীরেন বিছানায় শুইয়া খানিকটা
এপাশ ওপাশ করিবার পর, নিজের আশায় অলাঞ্জলি দিয়া, যেষ্টেতে বাহুর
পাতিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিতেছিল।

গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—যুঝোও নি যে ঠাকুরপো? আমি ভাবলাম

ঠাকুরপো বুঝিয়ে পড়েছে বুঝি। আজ ষোড়শ ঘণ্টা যে বড় খেলে না—পাভেই রেখে এলে, সেদিন তো সব খেয়েছিলে ?

আম্বন বৌদি। মোচার ঘণ্টা খাবো কি ? বাগানে কাণ্ড সব ; যে ঝাল তাতে খেতে ব'সে কি চোখে দেখতে পাই—কোনটা ঘণ্টা, কোনটা কি ?

গোকুলের বউ ঘরের দুয়ারের গব্বাটে মাথাটা হেলাইয়া ঠেস দিয়া, অভ্যস্তভাবে মুখের নীচ দিকটা আঁচল দিয়া চাপিয়া দাঁড়াইল।

—ইস ঠাকুরপো বড় শতবে চাল দিচ্ছ যে। ওইটুকু ঝাল আন তোমাদের সেখানে কেউ খায় না—না ?

—প করবেন বৌদি এতে যদি 'ওইটুকু' হয়, তবে আপনারদের বেনাটা একবার খেয়ে না দেখে আমি এখান থেকে যাবি না। যা থাকে কপালে—যাহা বাহার তাঁহা তিহার। দিন একদিন চক্ষুজ্জ্বার মায়া কাটয়ে যত খুশি লভ।

—ওমা আমার কি হবে। চক্ষুজ্জ্বার ভয়েই শিল-নোড়ার পাট তুলে দিয়ে চূপ ক'রে ব'সে আছি না কি ঠাকুরপো ? শোনো কথা ঠাকুরপে ব—বলে কি না সঁতা বাহার হামির চোটে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। খানিকটা পরে সামান্যইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা তোমাদের সেখানে গরম কেমন ঠাকুরপো ?

—সেখানে, কোথায় ? কলকাতায় না পশ্চিমে ? পশ্চিমের গরম কি একম সে এখান থেকে কি বুঝতে পারবেন। সে বাংলাদেশ থেকে বোঝা যাবে না। বোম্বে মাসের দিনে রাত্রে কি কেউ ঘরের মধ্যে শুতে পারে ? ছাদে বিকেলে জল ধ'রে ছাদ ঠাণ্ডা ক'রে রেখে তাইতে রাতে শুতে হয়।

—আচ্ছা তোমরা যেখানে থাক — গান থেকে কত দূর ?

—এখান থেকে রেল প্রায় দুদিনের রাস্তা। আজ সকালের পাড়ীতে মাঝের পাড়া স্টেশনে চড়লে কাল চপুর-রাতে পৌছোনো যায়।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, শুনিচি নাকি গয়াকাশীর দিকে পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে—সত্যি ?

সত্যি। অনেক বড় বড় পাহাড়, ওপরে জঙ্গল—তার ভেতর দিয়ে যখন রেলগাড়ী যায়—একবারে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না, পাড়ীর মধ্যে আলো জ্বলে দিতে হয়।

গোকুলের বউ উৎসুকভাবে বলিল—আচ্ছা, ভেঙে পড়ে না ?

—ভেঙে পড়বে কেন বৌদি ? বড় বড় এঞ্জিনিয়ারে সুড়ঙ্গ তৈরী করেছে, কত টাকা খরচ করেছে, ভাঙলেই হোল। একি আপনাদের রায়পাড়ার খাটের ধাপ যে হ'বেলা ভাঙে ?

এঞ্জিনিয়ার কোন জিনিস গোকুলের বউ তাহা বুঝিতে পারিল না। বলিল—পাহাড়টা মাটির না পাথরের ?

মাটিরও আছে, পাথরেরও আছে। নাঃ বৌদি, আপনি একেবারে

পাড়াগেয়ে। আচ্ছা, আপনি বেলগাড়ীতে কতদূর গিয়েছেন ?

গোকুলের বউ আবার কোতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। চোখ প্রায় বুজিয়া যুথ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বলিল—ওঃ, ভারি দূর গিইচি, একেবারে কানী গয়া মক্কা গিইচি! সেই ওবছর পিসশাস্ত্রী আর মতুর মার সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখতে গিইছিলাম। সেই আমার জন্মের মধ্যে কখন—বেলগাড়ীতে চড়া !

এই মেয়েটি অল্পকণের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তাহার চাষিপাশে এমন একটা হাসি-কোতুকের জাল বুনিতে পারে—যাহা নীরেনের ভারি ভাল লাগে। যে ধরণের লোকের মনের মধ্যে আনন্দের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে, কারণে-অকারণে যার অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস মনের পাত্র উপচাইয়া পড়িয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া তোলে, এই পরীবৃষ্টি সেই দলের একজন। আজকাল নীরেন মনে মনে ইহারই আগমনের প্রতীক্ষা করে—না আসিলে নিরাশ হয়, এমন-কি যেন একটু গোপন অভিমানও হইয়া থাকে।

—আচ্ছা, বৌদি, আপনাদের সবাই চলুন একবার পশ্চিমে, সব বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

—এবাড়ীর লোকে বেড়াতে যাবে পশ্চিমে। তুমিও যেমন ঠাকুরপো ! তাহলে উত্তর মাঠের বেগুন-ক্ষেতে চৌকী দেবে কে ?

কথার শেষে সে আর একদফা ব্যঙ্গমিশ্রিত কোতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া নীচু স্বরে বলিল—ত্যাখো, ঠাকুরপো, একটা কথা রাখবে।

—কি কথা বলুন আগে।

—যদি রাখো তো বলি।

—ও সাদা কাগজে সই করা আমার ছায়া হবে না, বৌদি ! জানেন তো আইন পড়ি। আগে কথাটা শুনবো, তারপর কথার উত্তর দেবো।

গোকুলের বউ দয়ার ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে আসিল। কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল—এই মাক্‌ড়ী দু'টো রেখে আমায় পাঁচটা টাকা দেবে ?

নীরেন বিস্ময়ের স্তরে বলিল—কেন বলুন তো ?

—সে এখন বোলবো না। দেবে ঠাকুরপো ?

আগে বলুন টাকা দিয়ে কি হবে ? নৈলে কিন্তু—

গোকুলের বৌ নিঃস্বরে বলিল—আমি এক জায়গায় পাঠাবো। ত্যাখো তো এই চিঠিখানার ওপরের ঠিকানাটা ইংরাজীতে কি লেখা আছে !

নীরেন পড়িয়া বলিল—আপনার ভাই, না বৌদি ?

—চূপ চূপ, এ বাড়ীর কাউকে বোলো না যেন ! পাঁচটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, কোথায় পাবো ঠাকুরপো, কি রকম পরাধীন জানো তো ? তাই ভাবলাম এই মাক্‌ড়ী দু'টো—টাকা-পাঁচটা দাও গিয়ে ঠাকুরপো—হতভাগা

‘ছোড়াটার কি কেউ আছে ভূ-ভারতে?...গোকুলের বউ-এর গলার স্বর চোখের জলে ভারী হইয়া উঠিল।

নীরেন বলিল—টাকা আমি দেবো বৌদি, পাঁচটা হয়, দশটা হয় আপনি যখন হোক শোধ দেবেন, কিন্তু মাকড়ী আমি নিতে পারবো না—

গোকুলের বউ কৌতূকের ভঙ্গীতে ঘাড় ঢলাইয়া হাসিমুখে বলিল তা হবে না ঠাকুরপো, বাঃ বেশ তো তুমি! তারপর আমি তোমার ঋণ রেখে ম’রে যাই আর তুমি—সে হবে না, ও তোমায় নিতেই হবে। আচ্ছা যাই ঠাকুরপো নীচে অনেক কাজ প’ড়ে রয়েছে—

সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সিঁড়ি কাছ পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিম্নস্বরে বলিল—টাকার কথা কিন্তু কাউকে বোলো না যেন ঠাকুরপো! কাউকে না—বুঝলে?

দুর্গা কাঁধের তলা হইতে অত্যন্ত শূণ্য সহিত ডাকিল—অপু, ও অপু!

অপু জাগিয়াই ছিল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন কথা বলে নাই। বলিল—দিদি, জানালাটা বন্ধ ক’বে দিবি? বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে—

দুর্গা উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—বাঁপুর দিদির বিষে কবে জানিস? আর কিছু বেশী দেবী নেই। খুব ষটা হবে, ইংরিজি বাজনা আসবে। দেখেচিস তুই ইংরিজি বাজনা?

—ঠ্যাঁ সব মাথায় টুপি প’রে বাজায়, এই বড বড ঝাশি—মস্ত বস্ত ঢাক আমি দেখিচি—আর একরকম ঝাশি বাজায়, কালো কালো, অত বড় নয়, ফুলোট ঝাশি বলে—এমন চমৎকার বাজে। ফুলোট ঝাশি শুনেচিস?

দুর্গা আর একটা কথা ভাবিতেছিল।

কাল সে বৈকালে ওপাড়ার খুড়ীয়ার কাছে বেড়াইতে যায়। একথা দেখা পৰ খুড়ীয়া জিজ্ঞাসা কবিল, তুগ্গা তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর কোথায় দেখা হয়েছিল রে?

সে বলিল—কেন খুড়ীয়া? পরে সে দিনের কথা বলিল। কৌতূকের স্বরে বলিল, পথ হারিয়ে খুড়ীয়া ওতেই—একেবাবে পড়ের পুকুর—সেই বনের মধ্যে—

খুড়ীয়া হাসিয়া বলিল—আমি কাল ঠাকুরপোকে বলছিলাম তোর কথা—বলছিলাম—গরীবের মেয়ে ঠাকুরপো। কিছু দেবার-খোবার সাখা তো নেই বাপের—বড্ড ভাল মেয়ে—যেন একালেরই মেয়ে না—তা ওকে নাওগে না? তাই ঠাকুরপো তোর কথা-টখা জিগোস করছিল—স্নেহ, ঘাটের পথে সেদিন কোথায় দেখা হোল—পথ ভুলে ঠাকুরপো কোথায় গিয়ে পড়েছিল—এই সব। তারপর আমি আজ তিনদিন ধ’রে ভাবছি ষত্ন-ঠাকুরকে দিয়ে তোর বাবাকে বলাবো। ঠাকুরপোর যেন মত আছে মনে হোল, তাকে যেন মনে লেগেচে—

দুর্গা গোঁসাল হইতে বাছুর বাহির করিয়া বোত্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অস্ত্রহীন বাতীর কাজ তবু ত ঘাটোক কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতে

ছিল না। এক একদিন, তাহার এরকম মনের ভাব হয় ; সেদিন সে কিছুতেই বাড়ীর গভীতে আটকাইয়া থাকিতে পারে না—কে তাহাকে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আজ যেন হাওয়াটা কেমন হৃদয়, সকালটা না-পরশ-না-ঠাঙা, কেমন যেন মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় নেবুফলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।

বাড়ীর বাহির হইয়া সে রাণুদের বাড়ী গেল। ভুবন মুখ্যে অবস্থাপন্ন হুহু, এই তাৎ প্রথম মেয়ের বিবাহ, খুব ঘটাই করিয়াই বিবাহ হইবে। বাজি-ওয়ালা আসিয়া বাজর দরদস্তুর করিতেছে। সতীনাথ এ-অফলের বিখ্যাত রত্ননটোঁকি বাজিয়ে, তাহারও বায়না হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষ্যে নানাস্থান হইতে হুটুঘের দল আসিতে শুরু করিয়াছে। তাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ীর উঠান পরগরম।

দুর্গার মনে ভারি আনন্দ হইল,—আর দিনকতক পরে ইহাদের বাড়ীতে কত বাজি পুড়িবে। সে কোনো বাজি কখনও দেখে নাই, কেবল একবার পাজুলী বাড়ীর ফুলদোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল হস করিয়া আকাশে উঠিয়া একেবারে যেন মেঘের গায়ে গিয়া ঠেকে। সেখান হইতে আবার পড়িয়া যায়, এমন চমৎকার দেখায়! অপুর বলে হাউই বাজি।

দুপুরের পর মা দালানে আচল বিছাইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িলে সে স্নড়ৎ করিয়া পুনরায় বাড়ীর বাহির হইল। কান্ডনের মাঝামাঝি, রোদ্দের তেজ চড়িয়াছে, একটানা তপ্ত হাওয়ায় রাণুদের বাগানের বড় নিমগাছটার হৃদে পাতাগুলো ঘুরিতে ঘুরিতে ঝরিয়া পড়িতেছে—কেহ কোনদিকে নাই, নেড়াদের বাড়ীর দিকে কে যেন একটা টিন বাজাইতেছে। বু-উ উ-উ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কাঁচপোকা! দুর্গা নিজের অনেকটা অজ্ঞাতনামে তাড়াতাড়ি আচল মূঠার মধ্যে পাকাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

কাঁচপোকা নয়, হৃদর্শন পোকা।

তাহার মূঠার আচল আপনা আপনি খুলিয়া গেল—আগ্রহের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল। সামনের পথের উপর বসিয়াছে, পাখার উপর খেত ও বস্ত্র চন্দনের ছিটার মত বিলু বিলু দাগ।

হৃদর্শন পোকা—ঠিক পোকা নয়—ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কথা—তাহার মায় মুখে, আরও অনেকর মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পণে হুলার উপর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একেবারে কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকায় কাছে লইয়া গিয়া বার বার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—হৃদর্শন, হৃতালাভালি রেখো হৃদর্শন, হৃতালাভালি রেখো...হৃদর্শন, হৃতালাভালি রেখো (অবিকল এই রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভালো রেখো, মাকে ভালো রেখো, বাবাকে ভালো রেখো, ওপাড়ার খুড়ীমাকে ভালো রেখো—পরে একটু ভাবিয়া ইচ্ছাকৃত করিয়া—বলিল—নীয়েনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিষে-

যেন ওখানেই হয় স্বপ্নের বাণুদিগ্দিব মত বাজিবাজনা হয় ।

ভাস্কর অর্ঘ্যের আঁতিল্যে পোকাটা ধূলায় উপর বিপর্যয়ে চক্ৰাকারে ঘূর্ণিতছিল, দুর্গা মনের সাম মিটাটয়া প্রার্পনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সন্তিত পাশ কাটাটয়া গেল ।

পাড়ার ভিত্তরকার পথে পথে মাথার উপর প্রথম কাল্লনের সুনীল, এমন কি অনেকটা ময়রকণী বং-এর আকাশ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে ।

শেওড়া বনের মাঝখান দিয়া নদীর ঘাটের সরু পথ । স্বর্ডিপথের ঢধারেই আম বাগান । তপ্ত বাতাস আশ্র-বউলের মিষ্ট গন্ধে, বনে বনে যৌমাছি ও কাঁচপোকাকার গুঞ্জনরবে, চায়াগহন আমবনে কোকিলের ডাকে, স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে ।

বাগানগুলি পার হইয়া চড়কতলার মাঠ । বাসে-ভরা মাঠে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে । দুর্গা ঝোপের মধ্যে সৈয়াকুল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল—সৈয়াকুল এখন আর বড় থাকে না, শীতের শেষেই ঝরিয়া যায় । ওই উঁচু টিবিতে ঝোপের মধ্যে একটা গাছে অনেক সৈয়াকুল সেদিন ও ত সে খাইয়া গিয়াছে কিন্তু এখন আর নাহি, সব ঝরিয়া গিয়াছে, পোলমরিচের মত শুকনা সৈয়াকুল ঘন ঝোপের তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে ! এক ঝাঁক শালিক পাখী ঝোপের মধ্যে কিচ্, কিচ্, করিতেছিল, দুর্গা নিকটে যাইতে উড়িয়া গেল ।

তাহার মনে খুশির আবার একটা প্রবল ঢেউ আসিল । উৎসবের নৈকট্য, রাগের দিদির বাসরে রাত জাগ ও গান শুনিবার আশা—

খুশিতে তাহার ঠোঁট হইল সে মাঠের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ছুটিয়া বেডায় । একবার সে হাত ছুটা ছড়াইয়া ডানার মত লম্বা করিয়া দিয়া খানিকটা ঘুরপাক খাইয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল ।

শরীর তো হালকা জিনিস—হাত ছড়াইয়া ডানার মত বাতাস কাটিতে কাটিতে বহি যাওয়া যাইত ।

শুধু শব্দ করিবার আনন্দে সে শুকনা ঝরাপাতার বাশির উপর ইচ্ছা করিয়া ছোরে ছোরে পা ফেলিয়া মচ্, মচ্, শব্দ করিতে করিতে চলিল । পাতা ভাঙ্গিয়া গিয়া শুকনা শুকনা ধূলা মিশানো, খানিকটা সোঁদা সোঁদা খানিকটা তিক্ত গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গেল ।

সামনে একটু দূরে সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইবার কাঁচা সড়ক । একথানা গরুর গাড়ী কাঁচ, কাঁচ, শব্দে মাঠের পথের দিকে যাইতেছে । টাইকা কাটা ককির ঘেরা বাঁধিয়া তাহার উপর কাঁধা ও ছেঁড়া লাল নক্সা-পাড কাশড ঘিরিয়া ছই তৈয়ারী করিয়াছে । ছই-এর মধ্যে কাহাদের একটা ছোট মেয়ে একঘেয়ে, একটানা ছেলেমাছবি ধরণে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে—কোন গায়ের চাষাদেব মেয়ে বোধহয় বাপের বাড়ী হইতে শবুর বাড়ী চলিয়াছে ।

দুর্গা অবাক হইয়া একদৃষ্টে গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া বহিল ।

বিয়ের পর মা, বাবা, অপু—সব ছাড়িয়া এই বকম কোথায় কতদূর চলিছে

বাইতে হইবে হয়ত—যখন তখন সেখান হইতে তাহার আসিতে দিবে কি ? সে এতক্ষণ একথা ভাবিয়া দেখে নাই—এই বাগান, বাসকচুলের ঝাড়, বাড়ী পাইটা, উঠানের কাঁঠালতলাটা যাহা সে এত ভালবাসে, এই শুকনা পাতার গন্ধ, ঘাটের পথ—এইসব ছাড়িয়া যাইতে হইবে চিরকালের, চিরকালের অন্ত । ছই-এর মথোর ছোট্ট মেয়েটা বোধহয় সেই দুঃখেই কাঁদিতেছে ।

কাঁচা লড়কটা ছাড়াইয়া আর একটা ছোট্ট পোড়ো মাঠ পার হইলেই নদী ।

ওপারে জেলেরা কি মাছ ধরিতেছে ? থয়রা ? এপারে আসিলে দু'শয়সার মাছ কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইত । অপু থয়রা মাছ খাইতে বড় ভালবাসে !

বাড়ী ফিরিয়া সম্ভার পর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুতুলের বাক্স গুছাইল । ঘরের মেঝেতে তাহার মা তেল পুরিতে গিয়া অনেকটা কেরোসিন তেল ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার গন্ধ বাহির হইতেছে, হাওয়াটা যেন একটু গরম । পুতুল গুছানো প্রায় শেষ হইয়াছে, অপু আসিয়া বলিল—তুই বুকি আমার বাক্স থেকে ছোট্ট আসিখানা বের ক'রে নিয়েছিস দিদি ?

—হঁ—আসি তো আমার—আমিই তো আগে দেখতে পেয়েছিলাম, তক্তপোশের নীচে পড়েছিল । যাও, আমি আসি আমার বাক্সে রাখবো । বেটাছেলে আবার আসি নিয়ে কি হবে ?

—বা রে তোমার আসি বই কি ? ও-পাড়ার খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে মা তো কি বেতোতে আসি এনেছিল, আমি তো আগেই মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম । না দিদি, দাও—

কথা শেষ করিয়াই সে দিদির পুতুলের বাক্সের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে আসি খুঁজিতে লাগিল ।

দুর্গা ভাইয়ের গালে এক চড় লাগাইয়া দিয়া বলিল—ছুট কোথাকার—আমি পুতুল গুছিয়ে রাখছি আর উনি তা গুল পা গুল করচেন—যা আমার বাক্সে হাত দিতে হবে না তোমার—দেবো না আমি আসি ।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অপু কাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার কক্ষচুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল । ন'রা-আটকানো গলায় বলিতে লাগিল—কেন তুমি আমাকে মারবে ? আমার লাগে না বুকি ?—দাও আমার—মাকে বোলে দেবো—লক্ষীর চূপড়ি থেকে আলতা চুরি কোরেচ—

আলতা চুরির কথায় দুর্গা ফেলিয়া গেল । ভাই-এর কান ধরিয়া তাহাকে কাঁকনি দিয়া উপরি উপরি পটাপট কয়েকটা চড় দিতে দিতে বলিল—আলতা নিইচি ?—আমি আলতা নিইচি ? লক্ষীছাড়া তুই বান্দর ! আর তুমি যে লক্ষীর চূপড়ির গা থেকে কড়িগুলো খুলে লুকিয়ে রেখেচ, মাকে ব'লে দেবো না ?

চীৎকার, কান্না ও মারামারির শব্দ শুনিয়া সর্বজয়া ছুটিয়া আসিল ।

ভক্তকণে দুর্গা অপূর কান ধরিয়া তাহাকে মাটিতে প্রায় শোয়াইয়া ফেলে—অপুও প্রাণপণে দুর্গার চুলের পোছা হুটি পাকাইয়া টানিয়া একপা

ধরিয়া আছে যে, দুর্গার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাট।

অপুর লাগিয়াছিল বেশী। সে কাদিতে কাদিতে বলিল—ত্যাগো না! আমার আর্সিখানা বাক্স থেকে বের ক'রে নিজের বাক্সে রেখে দিয়েচে—দ্বি-
না—এমন চমক মেয়েচে গালে—

দুর্গা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না মা, ত্যাগো না আমার পুতুলের ব
গোছাচ্ছি, ও এসে সেগুলো সব—

সর্বজয়া আসিয়া মেয়ের পিঠের উপর দুম্ দুম্ করিয়া সজোরে কয়েকটি কি
বসাইয়া দিয়া বলিল—খাডী মেয়ে—কেন তুই ওর গায় হাত দিবি যখন তখন
—ওতে আর তোতে অনেক তফাৎ জানিস?—আর্সি—আর্সি তোমার কো
পিণ্ডিতে লাগবে শুনি? কথায় কথায় উনি যান ওকে ভেঙে মার্চে। মর্দ
আর কি। পুতুলের বাক্স—বোসো—

কথা শেষ না করিয়াই সে মেয়ের গুছানো পুতুলের বাক্স উঠাইয়া এক টা
মারিয়া বাহির উঠানে ছু ডিয়া ফেলিয়া দিল।

—খাডী মেয়ের কোন কাজ নেই, কেবল খাওয়া আর পাড়ায় পাড়ায় টে
টো ক'রে বেড়ানো—আর কেবল পুতুলের বাক্স আর পুতুলের বাক্স। ওম
টেনে একুনি বাঁশ-বাগানে ফেলে দিয়ে আসচি। দিচ্ছি তোমার খেলা ঘুচি
একেবারে—

দুর্গার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পুতুলের বাক্স তাহার প্রাণ দিনে
মধ্যে দশবার সে পুতুলের বাক্স গোছায়—পুতুল রাত্তা ছোপানো কাপড়
আলতা, কত কঠোর সংগ্রহ করা নাটাকল, টিনেমোড়া আর্সিখান, পাখীর বাস,
—সব স্বাক্ষর উঠানের মধ্যে কোথায় কি ছড়াইয়া পড়িল। মা যে ত'হার
পুতুলের বাক্স একরূপ নির্মমভাবে ফেলিয়া দিতে পারে একথা সে ভাবিতে পারিত
না। কত কঠোর কত জায়গা হইতে জোগাড় করা কত জিনিস উহার মধ্যে?

কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া সে কেমন অবাক হইয়া রহিল।

অপুর কাছেও বোধহয় শাস্তিটা কিছু বেশী কঠোর বলিয়া ঠেকিল। সে
আর কোনো কথা না বলিয়া চুপচাপ গিয়া শুইয়া পড়িল।

বাঁদী অনেক হইয়াছে মেঝেকে কেবোসিন কেলের গন্ধ বাহির হইতেছে,
খাবার মধ্যে বাঁশ-বনের মশা বিন বিন্ করিতেছে। খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া
দুর্গা গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভাঙা জানালা দিয়া ফাস্তন জোয়ার আলো বিছানায় পড়িয়াছে, পোড়ো
ভিটার দিক হইতে ভূর ভূর করিয়া লেবু ফুলের গন্ধ আসিতেছে।

একবার তাহার মনে হইল উঠিয়া গিয়া পুতুলের বাক্সটা ও ছড়ানে
জিনিসগুলো তুলিয়া আনে—কাল সকালে কি আর পাওয়া যাইবে? কত কঠো
জিনিসগুলো! কিন্তু সাহস পাইল না। আনিতে গেলে মা যদি আবার মা

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল হঠাৎ সে গায়ের উপর কাহার হাত
করিল। অপু ভয়ে ভয়ে ডাকিল—দিদি? দুর্গা কোনো জবাব দিবার

‘পু বালিশে মূখ ও জিয়া হাউ হাউ করিয়া কঁাদিয়া উঠিল—আমি আর করবো—আমার ওপর রাগ করিস্নে দিদি—তোর পায়ে পড়ি। কান্নার আবেগে হার গলা আটকাইয়া যাটতে লাগিল।

দুর্গা প্রথমটা বিস্মিত হইল—পরে সে উঠিয়া বসিয়া ভায়ের কান্না থামাইবার ঠা করিতে লাগিল।—কঁাদিস্নে চুপ, চুপ, মা শুনতে পেলো আবার আমায় কবে, চুপ কঁাদতে নেই—আচ্ছা আমি রাগ করবো না, কেঁদো না ছিঃ—চুপ—তাহার ভয় হইতেছিল অপূর কান্না শুনিলে মা আবার হয়তো তাহাকেই পরিবে।

অনেক করিয়া সে ভাইয়ের কান্না থামাইল। পরে ভাইয়া ভাইয়া তাহাকে ধান গল্প, বিশেষত রাগুর দিদির বিয়ের গল্প বলিতে লাগিল। একথা-ওকথার পর অল্প দিদির গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল—একটা কথা বলবো দিদি ?—তোর সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের বিয়ে হবে—

দুর্গার লজ্জা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত কৌতূহলও হইল ; কিন্তু ছোট ছাইএর কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তা বলিতে তাহার সঙ্কোচ হওয়াতে সে শব্দ করিয়া রহিল।

অপু আবার বলিল—খুড়ীয়া বলছিল রাগুর মায়ের কাছে আজ বিকালে। মাষ্টার মশায়ের নাকি অমত নেই—

কৌতূহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল—হ্যাঁ—বলছিল—যাঃ—তোর সব যেমন কথা—

অপু প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল,—সত্যি বল্চি দিদি, তোর গা ছুঁয়ে লুচি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই তো কথা উঠল। বাবাকে দিয়ে পস্তর লেখাবে সেই মাষ্টার মশায়ের বাবা যেখানে থাকেন সেখানে—

—মা জানে ?

—আমি এসে মাকে জিগোস করবো ভাবলাম—ভুলে গিইচি। জিগোস করবো দিদি ? মা বোধ হয় শোনে নি ; কাল খুড়ীয়া মাকে ডেকে নিয়ে বল্বে লুছিল—

পরে সে বলিল—তুই কত রেলগাড়ী চড়বি দেখিস, মাষ্টার মশাইয়া থাকেন ঠান থেকে অনেক দূর—রেল যেতে হয়—

দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।

সে রেলগাড়ীর ছবি দেখিয়াছে—অপূর একখানা বইয়ের মধ্যে আছে। সে লম্বা, অনেকগুলো চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া ওড়ে। রেলগাড়ীখানা আগাগোড়া লোহার, চাকাও তাই—গরুর পাড়ীর মত কাঠের চাকা নয়। রেল লাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ী নাই, কিতে পারে না, পুড়িয়া যায়। রেলগাড়ী যখন চলে তখন তাহার নল হতে আগুন বাহির হয় কিনা ! সে ভাইএর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—কেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। তাহার পর দুজনেই চুপ করিয়া ঘুমাইবার

যোগাড় কৰিল। ঘূমাইতে গিয়া একটা কথা বার বার দুৰ্গাৰ মনে চইতেছিল—
—ঠাকুৰ স্বদৰ্শন তাহাৰ কথা শুনিয়াছেন! আজই তো স্বদৰ্শনৰ কাচে সে
—ঠাকুৰেৰ বডু দয়া—মা তো ঠিক কথা বুলে!

অপু বলিল—লীলাদিৰ জন্তে কেমন চমৎকাৰ শাড়ী কেনা হয়েচে, আজ
লীলাদিৰ কাকা বিয়ের জন্তে কিনে এনেচে বাণাঘাট থেকে, সেজ জেঠিমা বলে
—বালুচের শাড়ী—

দুৰ্গা হাসিমুখে বলিল—একটা ছড়া জানিস?...শিসি বলতো,
বালুচের বালুৰ চরে একটা কথা কই—
মোষের পেটে ময়র ছানা দেখে এলায় সই।

পথের পাঁচালী

অষ্টবিংশ পৰিচ্ছেদ

অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—তাহাৰ দিক্‌কেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপূৰে সে যখন তাহাৰ বাবাবৰ বই-বোকাটো কাঠেৰ
শিকুকা লুকাইয়া থলিয়াছিল, শিকুকাৰ মধ্যৰ একখানা বইএৰ মধ্যটো এই
অদ্ভুত কথাটোৰ সন্ধান পাইয়াছে।

উঠানেৰ উপৰ বাঁশঝাড়ৰ ছায়া তখন পূৰ্ব-পশ্চিমে দীৰ্ঘ হয় নাই, ঠিক-
দুপূৰে সোনাডাঙাৰ তেপান্তৰ মাঠেৰ সেই প্ৰাচীন অখণ্ড গাছৰ ছায়াৰ মত এক
জায়গায় একবাশ ছায়া জমাট বাধিয়াছিল।

একদিন সে দুপূৰবেলা বাপেৰ অনুপস্থিতিতে ঘৰেৰ দরজা বন্ধ কৰিয়া চুপি
চুপি বইএৰ বাসুটা লুকাইয়া থলিল। অধীৰ আগ্ৰহেৰ সহিত সে এ-বই
ও-বই থলিয়া থলিয়া খানিকটা কৰিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা কৰিয়া বই-
এৰ মধ্য ভাল গল্প লেখা আছে কিনা দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়েৰ
মলাট থলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'স্ব-দৰ্শন-সংগ্ৰহ'! ইহাৰ অৰ্থ কি,
বইখানা কোন বিষয়েৰ তাহা সে বিকুৰ্বিসৰ্গে বুজিল না! বইখানা থলিতেই
একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবৰ্ণ মাৰ্বেল কাগজেৰ নীচে হইতে বাহিৰ
হইয়া উদ্ভৰ্বাসে যদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকেৰ
কাছে লইয়া গিয়া ভাৰ লইল, কেমন পুৰানো গন্ধ! মেটে বস্ত্ৰেৰ পুৰ পুৰ
পাতাগুলিৰ এই গন্ধটা তাহাৰ বড় ভাল লাগে—গন্ধটায় কেবলই বাবাবৰ কথা
মনে কৰাইয়া দেয়। যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহাৰ
বাবাবৰ কথা মনে পড়ে।

যতান্ত পুৰানো মাৰ্বেল কাগজেৰ বাঁধাই কৰা মলাটেৰ নানাস্থানে চটা
উঠিয়া গিয়াছে। এই পুৰানো বইএৰ উপৰই তাহাৰ প্ৰধান মোহ। সেইজন্ত
সে বইখানা বালিশেৰ তলায় লুকাইয়া বাধিয়া অত্যান্ত বই তুলিয়া বাসু বন্ধ
কৰিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত

কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মাছুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এক কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন,—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পূরিয়া মাছুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবর ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাস্কেটের মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস্ দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীলু, কহু পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়, উত্তর ঘাটে উচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য। এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ী নাই শুধু তাহার বাবারই আছে : হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ শুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ—লগ্ন—সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা। এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সহজে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্ত ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে গায়া মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা যোগাৎ করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন অপু, মজা দেখবি আর। পরে সে একমুঠা পাতের ভাত লইয়া বাড়ীর খড়্‌কিদোরের বাশবাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো—তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাঁইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চূপ করিয়া থাকে যেন কি অপূর্ণ হস্তপূরীর দুয়ার খনই তাহাদের চোখের সামনে খুলিয়া যায়। হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে—ওই এসেছে। কাথেকে এলো দেখলি?—খুশিতে সে হি হি করে হাসে।

বোজ বোজ ঐ কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় গরী—তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চূপ। ভাত মাটিতে মাঝিয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে, আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে চিপ্‌চিপ্‌ করে, মনে মনে ভাবে—আজ ভুলো আসবে না বোধ হয়, দেখি ইকি কোথেকে আসে। আজ কি আর শুনতে পেয়েছে!—

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিম্নে বনজঙ্গলের লতা পাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির !

অমনি তুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের শ্রোত বহিয়া যায় ! বিশ্বয় ও কৌতুকে তাহার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায় । মনে মনে ভাবে—ঠিক স্তনুতে পায় তো, আসে কোথেকে ! আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ভেকে দেখবো দিকি, তাও স্তনুতে পাবে ?

এই আশ্রয় উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও যোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্ত কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে ।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আছে তাহা খুঁজিয়া পায় নাই । দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে আসে নাই । অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে ।

অবশেষে সন্ধান মিলিল । হীকু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গন্ধ বাধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে তেল-তামাক আনিতে যায় । অপু দিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোয়া কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস ? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেবো ।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের খলি হইতে দুইটা কালো রংএর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই ছাখ ঠাকুর এনেচি । অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দেখি । পরে আহ্লাদের সহিত উন্টাইয়া পাণ্টাইয়া বলিল—শকুনির ডিম ? ঠিক তো ? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল । ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগ্‌ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না ।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল । বলিল, দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি ? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব । এই এত বড় বড় সোনারগেটে—দেখবি ? দেখাবো ?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপূর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল । সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না । অনেক দরদস্তবের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল । অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুইটি লইল । তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল । এই কড়িগুলো অপূর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্টার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অল্প সময় ; কিন্তু আকাশে উড়িবার আশ্রয়ের কাছে কি আর বেগুন-বাঁচি-খেলা !

ভিন্নটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফু-দেওয়া রবারের বেলুনের মত হাডা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গ সঙ্গে যেন একটু সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ চিন না। ভিন্ন হাতে পাওয়ায় পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল, খুব অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেভারের জামগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড় : হবে নো। সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? আমার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছেন সেখানে? নদীর ওপারে? শালিক পাখী ময়না পাখী বত ও-ই আকাশের গারে তারটা যেখানে উঠিয়াছে?

সেই দিনই কি তাহার পবদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্ত ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকে হাড়ি-কলসীর পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরার ভাল ছাতভাইতে ছাতভাইতে কি যেন ঠক করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাড়িরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের ভূটো বড় বড় ভিন্ন এখানে। ও, প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে গিয়েচে—দেখেচো কি পাখী ভিন্ন পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা।

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাতে খাইল না। কান্না হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনো শুনিনি—শুনেনা সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ভিন্ন নিয়ে নাকি মাহুতের উড্ডে পারে—ওই ওদের বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটা বদ-মাহুতের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে সে কোথেকে ভূটো কাগের না কিসের ভিন্ন এনে বলেচে—এই নেও শকুনের ভিন্ন। তাই নাকি আবার চাব পরমা দিয়ে কিনেচে তাব কাছে। ছেলেটা যে কি বোকা সে আর তোমার কাছে কি বলবো সেজ ঠাকুরঝি—কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি।

কিন্তু বেচারী সর্বজ্ঞা কি করিয়া জানিবে? সকলেই তো 'সর্ব দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই বা সকলেই কিছু পারদের গুণ ও জানে না।

আকাশে নাতা হইলে তো সকলেই উড়িত।

পথের পাঁচালী

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক দিন হইতে প্রায়ের বুদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপূর বড় ভাব। গাজুলী পাড়ার গৌরবর্ণ, দিবাকান্তি, সদানন্দ বুদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল জালবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাজুলীদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপূর বাল্যকাল হইতে হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত—সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপূ গিয়া বুদ্ধের নিকট

হাজির হয়, ডাক দেয়,—দাদু আছো? বুদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া লতাপাতার চাটাইখানা দাওয়ার পাতিয়া দিয়া বলেন—এসো দাদাভাই এসো বসো বসো—

অগ্ৰস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—কিন্তু এই মরল শাস্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃশব্দোচ্চৈশ্বর্যে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মত বনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা! নরোত্তম দাসের কে? নাই, বুদ্ধ একাই থাকেন—এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা বায়ের অপেক্ষাও বড়—কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জগুই অপূর কেমন যেন মনে হয় তার মতীথ, এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অগ্ৰস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া জ্যাঠা ছেলে বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমি আমার গৌর,—তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন—ওই রকম ভাবমাখানো চোখ ছিল তাঁরও—

অগ্ৰস্থানে এক কথায় অপূর হয়ত লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে—দাদু এ' হোলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বুদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চক্রিকা'খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোটে দু'খানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বুদ্ধ বলেন, আমি সববার সময়ের বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

তাঁহার এক শিষ্য মাঝে মাঝে পদ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে আসিত। বুদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিতেন, পদ বেঁবেচো বেশ করেছেচো, ওসব আমায় শুনিও না বাপু, পদকর্তা ছিলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—উঁ দেব পর ওসব আবার কানে বাজে—ওসব গিয়ে অন্ন জায়গায় শোনাও।

সহজ, সামান্ত, অনাড়ম্বর জীবনের গতি-পথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসঙ্গিতা মুক্তির দ্বারা বহিতে থাকে, অপূর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে! তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, পাখী, পাছপালার সাহচর্যের মত অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আনিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল!

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে এক গাশি মুচুকুন্ড চাপা ফুল গুড়াইয়া আনে। সেগুলি সে বিছানায় রাখিয়া দেয়। তাহার পর লজ্জায় আলো জালিলেই বাবাব আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘটাখানেকের

বেশী কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানার শুইয়া পড়ে,—আর অমনি আজকার দিনের সকল খেলা-ধূলা সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচুকুন্দ-চাপার গন্ধ তাহার ক্রান্ত দেহমনকে খেলাধূলায় অতীত কণগুলির জন্ত বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ভ্রাণ লয়।

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চুইভাতি করবি অপু?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে ফুলুই চণ্ডীর ব্রতের বন-ভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়। তাহার মাও যায কিন্তু তাহাকে লইয়া যায় না। সেখানে সব নিজেই নিজের জিনিসপত্র। অত চাল ডাল তাহাদের নাই। আর বন-ভোজনে গিয়া সকলে বাহির করে কত কি জিনিস, ডাল চাল, ডাল, ঘি দুধ—তাহার মা বাহির করে শুধু মোটা চাল, মটরের-ডাল-বাটা, আর দুই একটা বেগুন। পাশে বসিয়া ভুবন মুখুযোদের সেজ ঠাকুরের ছেলেমেয়েরা নতুন আখের গুড়ের পাটালি দিয়া দুধ ও কলা মাখিয়া ভাত খায়, নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্ত তাহার মায়ের মন কেমন করে।

তাহার অপুও ওই-রকম দুধ কলা দিয়া পাটালি মাখিয়া ভাত খাইতে ভালবাসে।

শান্ত মাঠের ধারের বনে রাঙা সন্ধ্যা নামে, বাশবনের পথে ফিরিতে শুধু ছেলের মুখই মনে পড়ে।

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার গুধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে তাখ তেঁতুলতলায় মা আসচে কিনা—আমি চাল বের ক'রে নিয়ে আসি লীগগির ক'রে—

একটা ভাল নারিকেলের মালায় দুই-পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিন্মা করিয়া বলিল—লীগগির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু—সেইখানে রেখে আর, দেখিস্ যেন গরু-টকতে খেয়ে ফেলে না—

এমন সময় মাতোর মা তাহার ছোট ছেলেকে পিছনে লইয়া খিড়কীর দোর দিয়া উঠানে ঢুকিল। দুর্গা বলিল—এদিকে কোথেকে তমব্রজের বো।

মাতোর মায়ের বয়সও খুব বেশী নয়, দেখিতেও মন্দ ছিল না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই কষ্টে পড়িয়া মলিন ও লোঁচ হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—কুঠির মাঠে গিয়েছিলাম কাঠ কুড়তি—বুঁইচের মালা নেবা?

দুর্গা তো বন বাগান খুঁজিয়া নিজেই কত বৈটফল প্রায়ই তুলিয়া আনে, বাড় নাড়াইয়া বলিল—সে কিনবে না।

মাতোর মা বলিল—মেও না দিদি ঠাকুরোণ, বেশ মিষ্টি বুঁইচ, মধুখালির বলির ধারে যে তুলেলাম—কৌচড় হইতে একগোছা মালা বাহির করিয়া

দেখাইয়া বলিল—দেখো কত বড় বড় ! কাঠ নিয়ে বাজারে যেতি, বিক্রী কর্তি, পয়সা পেতি বড় বেলা হয়ে যাবে, মাতোরে শুভক্ষণ এক পয়সার মুড়ি কিনে দেভাম । নেও, পয়সায় দুগাছি দেবানি—

দুর্গা রাজি হইল না, বলিল—অপু, ঘটিতে একপাল-খানিক চালভাজা আছে, নিয়ে এসে মাতোর হাতে দেতো ! উহারা খিড়কী দোর দিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেলে দুজনে জিনিসপত্র লইয়া চলিল ।

চারিদিক বনে ঘেরা । বাহির হইতে দেখা যায় না । খেলাঘরের মাটির ছোবার মত ছোট্ট একটা ঝাড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই গাথু অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর কল নিয়ে এসেচি এক জায়গা থেকে । পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো...

অপু মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে । এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন । অপূর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারী রান্না হইবে, না খেলাঘরের বনভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সে রকম হইবে,—ধুলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁটাল পাতার লুনি ।

কিছু বড় সুন্দর বেলাটি । বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের ! চারিদিকে বনঝোপ, শুদিকে তেলাকুচা লতার তুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে সেগুড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধ-পোড়া কটা দুর্বাঘাসের উপর থলুনা পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপ-ঝাপের আড়ালে নিভৃত নিঝালা স্থানটি ! প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবি লেবু গাছটার কয়দিনের ফুয়াসায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও ঝোপা ঝোপা সাদা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে ।

দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধ-সন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে । আসন্ন বিরহের কোন বিষাদে এই কত প্রিয় গাঁবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের ঝাশবন, ভায়া-ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে । তাহার অপু—তাহার সোনার থোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হ হ করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে ।

আর যদি সে না ফেরে—যদি নিত্য পিসির মত হয় ?

এই ভিটাতেই নিত্য পিসি ছিল, বিবাহ হইয়া কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে ফিরিয়া আসে নাই ! অনেককাল আগের কথা—ছেলেবেলা হইতে গল্প শুনিয়া আসিতেছে ! সকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল মুশিদাবাদ জেলায়, সে কতদূরে ? কোথায় ? কেহ আর তাহার খোজ-খবর করে না, আছে কি নাই, কেহ জানে না । বাপকে নিত্য পিসি

আর দেখে নাই ; থাকে আর দেখে নাই, ভাই-বোনকেও না । সব একে একে
 বরিয়্য গিয়াছে । যাগো, মাহুষ কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয় । কেন তাহার
 খোঁজ কেহ যে করে নাই ! কতদিন সে নির্জনে এই নিতম পিসির কথা
 ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে । আজ যদি হঠাৎ সে ফিরিয়া আসে—এই
 ঘোর অজল-ভরা জনশূন্য বাপের ভিটা দেখিয়া কি ভাবিবে ?

তাহারও যদি ঐ রকম হয় ? ঐ তাহার বাবাকে, মাকে, অপুকে ছাড়িয়া—
 আর কখনো দেখা হইবে না—কখনো না—কখনো না—এই তাদের বাড়ী,
 পাবতলা, বাটের পথ ?

ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে, দরকার নাই । কি জানি কেন আজকাল
 তাহাব মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে । একটা এমন কিছু
 জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে, যাহা আর কখনো আসে নাই । দিন রাতে,
 খেলা-ধুলার কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে একথা তাহার প্রায়ই মনে হয় ঠিক
 সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে
 উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে .. আসিতেছে ..
 শীঘ্রই আসিতেছে

চডুই-ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল ।
 দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তে ডেকে অপু । একটু পরে
 অপু'র পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু
 হাসিয়া যেন কতকটা সম্মের হুরে বলিল—কি হচ্ছে দুর্গা দিদি ?

দুর্গা বলিল—আয় না বিনি, চডুই-ভাতি কচ্চি—বোস্—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্রতির মেয়ে—পরবে আধময়না শাড়ী,
 হাতে সৰু সৰু কাঁচের চুম্বি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা । তাহার
 বাপ যুগীর বাবু'ন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাদের নিয়ন্ত্রণ হয় না,
 গ্রামের একপাশে নিতান্ত সম্ভূচিত ভাবে বাস করে । অবস্থাও ভাল নয় ।
 বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব । বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে
 যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের স্রত আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা
 তাহাকে সে উৎসবের আঙ্গীকার স্বীকার করিবে কি না করিবে এক্ষণ
 একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ
 পাইতেছিল ।

দুর্গা বলিল—বিনি, আর হুটো শুকনো কাঠ ত্যাখতো—আগুনটা জগচে
 না ভাল—

বিনি শুধন কাঠ আনিতে ছুটিল এক একটু পরে একবোকা শুকনা বেলের
 ভাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দু'গা দিদি—না আর
 আনবো ?—দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেছে—ও-ও তো এখানে থাকে—আর
 হুটো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জল হইয়া উঠিল ।
 খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল । আগ্রহের হুরে জিজ্ঞাসা করিল—

কি কি তরকারী দুগ্গা দিদি ?

ভাত নামাইয়া দুর্গা ছোঁবাতে তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে । খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোঁবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মত বং হচ্ছে দেখচিস্ অপু । ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন-ভাজা, না ?

অপুও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয় । তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেনি না যে তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা, সম্ভবপর হইবে ! তাহার পব দু'জনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন ভাজা, আর কিছু না । অপু গ্রাম মুখে তুলিবার সময় দুর্গা মেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সঙ্গে দিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েছে রে বেগুন ভাজা ?

অপু বলে,—বেশ হয়েছে দিদি, কিন্তু তন হয়নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অত একেবারে বাহ্য দিষ্টাছে লবণের বালাই রাখে নাই । কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষো মেটে-আলুর ফল ও পানসে আধ-পোড়া বেগুন ভাজা দিয়া চুড়ুই-ভাতির ভাত খাইতে বসিল । দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিশ্বয়মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল । এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনা আতাপাতার বাশের মধ্যে, খেজুরভলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত-তরকারী খাওয়া ।

খাইতে খাইতে দুর্গা অপু'র দিকে চাহিয়া হিহি করিয়া খুশির হাসি হাসিল । খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন । বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্গাদি ? মেটে আলুর কল ভাতে মেখে নিতাম ।

দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আর একটু তেল—

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মগ্নিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ । অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন্ ওপারে বিসর্জিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে দুঃখহুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নতুন ।

আনন্দ ! আনন্দ ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল জুয়ারমৌলি গিরিসঙ্কটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ । আজকের আনন্দ ! সামান্ত সামান্ত, ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ ।

অপু বলিল—মাকে কি বলবি দিদি ? আবার ওবেলা ভাত খাবি ?

—দূর, মাকে কখনো বলি । সন্দের পর দেখিস্ খিদে পাবে এখন—

যুগীয় বায়ুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ষটিতে করিয়া জল

থাইতে দেয় ; তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয় ! বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপূর ঘাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো অপূ ? জল তেঁটা শেষেছে ।

অপূ বলিল—নাও না বিনি দি, তুমি নিয়ে চুষুক দিয়ে থাও না !

তবু যেন বিনির সাহস হয় না । দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে থা না ।

থাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর-একদিন বনভোজন করবো—কেমন তো ? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখো দেবো ?

অপূ বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা ? মাতোব মা কাঠ কড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারি চোর—

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল ।

অপূর বুক চিপ্ চিপ্ করিতেছিল । ঐ ঘুলঘুলিটার ওপাশে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে, তাহার মধ্যে অপূ লুকাইয়া চুকটের বাস রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে !

নেড়াদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তাহার এক বন্ধু আসিয়াছিল । কলিকাতার কাছে কোথায় বাড়ী । খুব বাবু, খুব চুকট খায় । এই একবার থাইল, আবার এই থাইতেছে । অপূর মনে মনে অভ্যস্ত হইয়াছিল সেও একবার চুকট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে । সে নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিশ যুগীর দোকান হইতে তিন পয়সায় রাঙা কাগজে মোড়া দশটি চুকট কিনিয়া আনে । সেদিন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা সিগারেট ধরাইয়া থাইয়াছিল—ভাল লাগে নাট, ভেতো, ভেতো, কেমন একটা কাজ—ছ'টান থাইয়া সে আর থাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বাকী চারটি চুকট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট সংগৃহীত একটি খালি চুকটের বাসে সে-কয়টি সে ওই পোড়োভাটার জঙ্গলে ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে । প্রথম চুকট ঐবার দিন চুকট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বৃকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল, পাছে মুখের গন্ধ মা টের পায় । পাকাবুল অনেক করিয়া থাইয়া নিঃস্বের মুখের ছাই হাত পাতিয়া ধরিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া ভবে সে সেদিন পুনর্বীর মহুশ-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল । যায় বুদ্ধি আজ বামালবুদ্ধি ধরা পড়িয়া ।

কিন্তু দ্বিধির পাঁচিলের ওপাশে যাইবার দরকার হয় না । এপিঠেই কাজ সারা হইয়া যায় ।

কথাটা সর্বজয়া ঘাটে গিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে শুনি।

আজ কয়েকদিন হইতে নীরেনের সঙ্গে অন্নদা রায়ের, বিশেষ করিয়া তাহার ছেলে গোব্বলের মনান্তর চলিতেছিল। কাল দুপুর বেলা নাকি খুব ঝগড়া ও চোঁচামেচি বাধে। ফলে কাল রাত্রেই নীরেন জিনিসপত্র লইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অন্নদা রায়ের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর দীঘ্‌ড়ীর স্ত্রী হরিশ্চন্দ্র বলিতেছিলেন—সত্যি মিথ্যে জানিনে, ক’দিন থেকে তো নানা রকম কথা শুনতে পাচ্ছি—আমি বাপু বিশ্বাস করিনে বোঁটা তেমন নয়। আবার নাকি শুনলাম নীরেন লুকিয়ে টাকা দিয়েছে, বোঁ নাকি টাকা কোথায় পাঠিয়েছিল, নীরেনের হাতের লেখা রসিদ ফিরে এসে গোব্বলের হাতে পড়েছে, এই সব।

—যাব বাপু, সে সব পরের কুছ শুনে কি হবে? নীরেন শুনলাম বলেচে—আপনারা সকলে মিলে একজনের উপর অত্যাচার কর্তে পারেন, তাতে দোষ হয় না?—আপনারা যা ভাবেন ভাবুন, বোঁ ঠাকুর একবার হুকুম করুন আমি ঠেকে এই দণ্ডে আমার হারাণো মায়ের মত মাধার্য ক’রে নিয়ে যাবো—তারপর আপনারা যা করবার করবেন। তারপর খুব চৈ চৈ খানিকক্ষণ হোল—সন্দের আগেই সে গয়লাপাড়া থেকে একখানা গাড়ী ভেকে আনলে জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল।

সর্বজয়া কথাটি শুনিয়া বড় দমিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্ত্রীকে দিয়া অন্নদা রায়কে নীরেনের পিতার নিকট এ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নীরেনকে আরও দুইবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কারয়াছিল—ছেলেটিকে তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র তাহাকে অনেকবার বুঝাইয়াছে নীরেনের পিতা বড় লোক—তাহাদের ঘরে তিনি কি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন? সর্বজয়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই, তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন সাহস পাইয়াছে—এ বিবাহের যোগাযোগ যেন দুরাশা নয়, ইহা ঘটিবে। হরিশ্চন্দ্র মনে মনে বিগ্রাস না করিলেও স্ত্রীর অনুরোধে অন্নদা রায়কে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছিল বটে। কিন্তু এখন যে বড় বিপদ ঘটিল।

ইতিমধ্যে একদিন পথে দুর্গার সঙ্গে গোব্বলের বউয়ের দেখা হইল। সে চুপি চুপি দুর্গাকে অনেক কথা বলিল, নীরেন কেন চলিয়া গেল তাহাবই ইতিহাস বলিতে বলিতে তাহাব চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—এই রকম কাঁটালানি খেয়েই দিন যাবে—কেউ নেই দুর্গা—তাই কি ভাইটা মাঝে? কোথাও যে দুদিন জুড়ুবো সে আসিয়া নেই—

সহানুভূতিতে দুর্গার বুক ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খুড়ীয়ার কলহের বিকছে তীব্র প্রতিবাদ ও তাহার হৃদয়ে সাধনাসূচক নানা কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনে

মধ্যে জোট পাকাইয়া উঠিল। লব কথা শুছাইয়া বলিতে না পারিয়া শুধু বলিল,
ওই সখী ঠাকুরমা যা লোক। বলুক গে না, সে করবে কি? কেঁদো না খুড়ী
মা লক্ষ্মীটি, আমি যোজ্ঞ যাবো তোমার কাছে—

স্বৰ্গজয়া শুনিয়া আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বোমা কি বজ্র টেজে দুর্গা?...
তা নীরেনের কথা কিছু হোল না কি?

দুর্গা লজ্জিত স্বরে বলিল—তুমি কাল জিগোস্ কোরো না ঘাটে? আমি
জানি নে—

অপু একবার জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমার কাছে কি শুনলি, মাষ্টার মশায় আর
আম্বলেন না?

দুর্গা ধমক দিয়া কহিল—তা আমি কি জানি—যাঃ—

পডন্ত বোদে ছায়াডরা পথটি কেমন যেন মন-কেমন-কবা-করা। সে তাহার
ভাই-এর জন্ত। এ রকম তাহার হয়, কতবার হইয়াছে, বেশীক্ষণ ধরিয়া সে যদি
বাড়ী না থাকে, কি ভাইকে না দেখে, ভাইয়ের রাশি রাশি কান্ননিক দুঃখের
কথা মনে হইয়া মনের মধ্যে কেমন করে।

তাহার অমন দুখে-আলতা রংএর সোনার পুতুলের মত ভাইটা ময়লা-
আধেঁড়া-মত একখানা কাপড় পরিয়া বাড়ীর দরজার সামনে আপনমনে একা
একা কড়ি চালিয়া বেগুন-বাঁচি খেলিতেছে। তাহার কাছে পরস্যা চায় এটা
ওটা কিনিতে, সে দিতে পারে না—ভারী কষ্ট হয় মনে—

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ী রাণুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া
গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলে মেয়েও
অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তার নাম
টুনি। তার বাপও আসিয়াছিলেন। আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে
কিছুদিনের জন্ত এখানে রাখিয়া কর্মস্থানে গিয়াছেন। ঘণ্টাখানেক পরে, সেজ
ঠাকুরণ এ ঘরে কি কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাঁহার কানে
গেল। সেজ ঠাকুরণ দালানে আসিয়া বলিলেন—কি রে হাসি, কি?

টুনির মা উত্তেজিতভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিসের তলা
হাত ডাইতেছে, উকি মারিতেছে, তোষক উন্টাইয়া ফেলিতেছে; বলিল—এই
একটু আগে আমার সেই সেই সোনার সিঁহুরের কোটোটা এই বিছানার পাশে
এইখানটায় রেখেছি, থোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠল, উনি বাড়ী থেকে এলেন—
আর তুলতে মনে নেই—কোথায় গেল আর তো পাচ্ছি নে?—

সেজ ঠাকুরণ বলিলেন—ওমা সে কি? হাতে করে নিয়ে যাস্নি তো?

না দিদিমা, এইখানে রেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এইখানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষন চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কোটার সন্ধান
নাই। সেজ ঠাকুরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ বাড়ীর
ছেলে-মেয়ে ছিল, তারপর খাবার খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার

খাইভে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ ঠাকুরের ছোট মেয়ে টেঁপি চুপি চুপি বলিল—আমরা যেই খাবার খেতে গেলাম দুগ্গাদি তখন দেখি যে খিড়কীর দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাস্তুর আবার এসেচে—

সেজ ঠাকুর চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, পরে কক্ষত্রে দুর্গাকে বলিলেন—কোঁটো দিয়ে দে দুগ্গা, কোথায় রেখেছি বুল্—বার ক'ব্ এখ'নি বুল্চি—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ ঠাকুরের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিব যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভাল বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই—একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধবাত্তে সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল, বিশেষতঃ দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ চেহারা বলিয়া দুর্গাকে সে পছন্দ করে—সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? সে বলিল—ও নেয়নি বোধহয় সেজদি—ও কেন—

সেজ ঠাকুর বলিলেন—তুমি চূপ ক'রে থাকো না! তুমি ওর কি জানো, নিয়েচে কি না নিয়েচে আমি জানি ভাল ক'রে—

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস্ বেব ক'রে দে, নয়তো কোথায় আছে বুল্—আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি, কেন মিথো—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি তো জানিনি কাকীমা—আমি তো—

সেজ ঠাকুর বলিলেন—বল্লেই আমি শুনবো? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেচি। আচ্ছা, ভাল কথায় বুল্চি কোথায় রেখেচিস্ দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে দাও ত কিছু বোল্বে না—আমার জিনিস পেলেই হোল—

পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—ভদ্রলোকের মেয়ে চুরি করে কোথাও শুনি নি তো কখনো। এই পাড়াতেই বাড়ী নাকি?

সেজ ঠাকুর বলিলেন—তুমি ভাল কথায় কেউ নও! দেখবে তুমি মজাটা একবার? তুমি আমার বাড়ীর জিনিস নিয়ে হজম কর্তে গিয়েচো—একি ফা তা পেয়েচ বুল্চি?—তোমায় আমি আজ—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা বুল্ এখনও কোথায় রেখেচিস্? বুল্বে নে? না তুমি জানো না, তুমি খুকী—তুমি কিছু জানো না—ঈগ্‌গির বুল্, নৈলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌বো এখনি! বুল্ ঈগ্‌গির—বুল্ এখনো বুল্চি—

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখ্‌চো না ওই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ—দিয়ে দাও

এখনি মিটে গেল,—কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুকনো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকীমা, ওরা সব চ'লে গেল আমিও তো—কথা বলিবার সময় সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেজ ঠাকুরণের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চোর—

টোঁপি বলিল—বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার যো নেই কাকীমা—

শেষোক্ত কথাতেই বোধহয় সেজ ঠাকুরণের কোন বাথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে যে পাজি, নচ্ছার, চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর কাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সঙ্গেসঙ্গে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল্ কোথায় রেখেচিস্—বল্ এখনি—বল্ শীগ্গির বল্।

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ ঠাকুরণের হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি—করেন কি সেজদি—থাকগে আমার কোঁটো—ওরকম ক'রে মারেন কেন?—ছেড়ে দিন—থাক্, হয়েছে, ছাড়ুন, ছিঃ! টুনি মার দেখিয়া কাদিয়া উঠিল। পূর্বোক্ত কুটুস্থিনী বলিলেন...এঃ রক্ত পড়ছে যে।

দুর্গার নাক দিয়া ঝব্ ঝব্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন, শীগ্গির একটু জল নিয়ে আর টোঁপি—বোয়াকের বালুভিতে আছে জাখ্—

টেঁচামেচি ও হৈ চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ীর কামারদের ঝি-বোরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল? রাগুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে কামার-বাড়ী বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—তিনিও আসিলেন!

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে কাঁ কাঁ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া দেখিল।

জল আসিলে রাগুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রাগুর মা বলিলেন—অমন ক'রে কি মাঝে সেজদি?... রোগা স্নেহটা—ছিঃ—

—তোমরা ওকে চেনোনি এখনো। চোরের মার ছাড়া ওষুদ নেই এই ব'লে দিলুঝ—মারের এখন হয়েছে কি—না পাওয়া গেলে ছাড়বো না কি? হরি স্বায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর—

বাগুর মা বলিলেন—হয়েচে, এখন একটু লাম্বলাতে দেও সেজদি—যে কাণ্ড
করেচো।

টুনির মা বলিল—ওমা এত হবে জানলে কে কোটো? কথা বলতো ?
চাইনে আমার কোটো—স্বকে ছেড়ে দ'ও সেজ দি—

সেজ ঠাকুরণ এত সহজে ছাড়িলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু জনমত
উহার বিকল্পে বায় দিতে লাগিল। কাজেই তিনি আসামীয়ে ছাড়িয়া দিতে
বাধ্য হইলেন।

বাগুর মা তাকে ধরিয়া এদিকের দরজা খুলিয়া খিডকী' উঠানে বাতির
করিয়া দিলেন। বলিলেন—খুব ক্ষেণে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলি যা
হোক। যা আস্তে আস্তে যা—টে'পি খিডকীটা ভাল ক'রে খুলে দে—

দুর্গা দিশাহারা ভাবে খিডকী দিয়া বাতির হইয়া গেল, মেয়েছেলেও যাহারা
উপস্থিত ছিল—সকলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল—ভবুও তো স্বীকার কল্লো না—কি রকম দেখে' একবার ?
চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোটা জল পড়লো না—

বাগুর মা বলিল—জল পড়বে কি ভয়েই শুকিয়ে গিয়েচে। চোখে কি
আর জল আছে ? ওই-রকম ক'রে মারে সেজদি ?

পথের পাঁচালী

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামে ব'রাযারী চড়কপজার সময় আসিল। গ্রামের বৈজনাথ মজুন্দার চান্দার
খাতা হানে বাড়ী বাড়ী চাঁদ আদায় করিতে আসিলেন। হবিচর বলিল না
খুড়ো, এবার অ'স'র এক টাকা চাঁদা পরাট' অনেয়া হয়েছে—এক টাক দেবার
কি আমার অবস্থা ?

বৈজনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল। এ রকম
দলটি এ অঞ্চলে কেউ সজেও দেখেনি। এবার পানপাড়ার ব'জাবে মহেশ
সেকরা'ব বানক কেতনের দল গাইবে—না'ন সঙ্গে প'ল' ন'দ' স'ই ই—

বৈজনাথ এমন ভাবে দখাইলেন যেন নিশ্চিন্দীপু'ব' সিংহের জীবন-মরণ এই
প্রানিযোগিতার ন'ন'ন'ন' উপর নির্ভর করিতেছে।

অপু একটা কঞ্চি ব'নিতে টানিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, পাক' কঞ্চি ব'বা,
শোমার খুব ভালো' ক'ম' হবে ডোবার ধারের বাঁশতলায় পড়েছিল কুড়িয়ে
আনলাম—পরে সে হা'সিম'থ সেটা কতকটা উচু করিয়া তুলি' দেখ ইয়' বলিল,
হবে না বাবা তোমার কলম ? কেমন পাঁকা, না ?

চড়কের আর বেশী দেরি নাই। বাড়ী বাড়ী গাজনের সন্ন্যাসী ন'চিতে
বাতির হইয়াছে। দুর্গা ও অপূর আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদের
পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্ত অন্ত গৃহস্থবাড়ী হইতে
পুরানো কাপড় দেয়, চাল পরস' দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয়—তাহারা কিছুই

“তিনে পাঁচের না ছোটো চাল ছাড়া—এজন্য তাহাদের বাড়ীতে এ দল কোনো
 বাবই আসে না। দশ বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্বদ্বারে
 নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটে ভাঙে—
 এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সে গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা
 হইবে না। দীর্ঘ ধাবে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবাব পূর্ব হইতেই ঠিক
 করিয়াছে। পাড়ার ছেন্দেব সঙ্গে দল বানিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া
 জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চডকতলাটাতে
 একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে—
 চডকতলার মাঠের শেওড়াবন ও অগ্ন্যাক্ত জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে।
 সেখানে ভুবন মৃগ্যোর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রাণী, পুঁটি, টুঙ্গ—
 এদের বাড়ীতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মত টো টো করিয়া যেখানে সেখানে
 বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহার চডকতলা পর্যন্ত
 আসিয়াছে।

টুঙ্গ বলিল—আজ রাতে সরিসিরা শ্মশান আগাতে যাবে—

রাণী বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে
 বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। শাকে আবার বাঁচাবে, তানপর
 মড়ার মৃগু নিয়ে আসবে—ছড়া বলতে বলতে আসবে—এ সব মস্তুর আছে—

দুর্গা বলিল—আমি জানি এদের ছড়া শুনিবি বোলবো?

স্বগ্গো থেকে এলো রথ

নামলো খেতুতলে

চক্ৰিশ, কুটী বাণবংশ শিবের সঙ্গে চলে—

সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি

শিব শিব বলরে ভাই ঢাকে গাণ কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্ঠবিহারের পুতুল হয়েছে
 নীলুদা? দাম্ভ কুমোরের বাড়ী দেখে এলাম—দেখিসনি রাণু?

পুঁটি বলিল—সন্তিকার মড়ার মৃগু বাণুদি?

—নয় তা কি? অনেক বাহ্নে যদি আসিস্তো দেখতে পাবি। চল
 তাই আমরা এ ডী গাই—আজ রাতটা ভালো নয়—আয়রে অপু, দুগ্গাদি
 আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় বাণুদি? কি আজ হবে রাতে?

রাণী বলিল—সে সব কথা বলতে নেই—তুই আয় বাড়ী। অপু গেল না
 কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল।—তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার
 অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ী ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী
 নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশানের ও মড়ার মৃগুর গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয়
 করিতেছে। মোড়ের বাশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটুগছ

বাহির হইতেছে। সে ক্ষতপদে চলিতে লাগিল, আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপুজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাউতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল— কিসের গন্ধ বেরিয়েচে ঠাকুমা ?

বুড়ী বলিল—আজ গুঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা ? তারই গন্ধ আর কি—

অপু বলিল—কারা ঠাকুমা ?

কারা! স্বাবাব—শিবের দলবল, সন্দেহ বেলী গুর নাম করিতে নেই—রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধাবে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শুল্কানের গন্ধ, শিবের অন্তরঃ ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজ্ঞানার অন্তর্ভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের স্বরে বলিল— আমি কি ক'রে যাবো ঠাকুমা।

বুড়ী বকিষা উঠিল—তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে ? .. এসো আমার সঙ্গে। নীল পুজোর থালাখানা দিয়ে আসি তারপর এগিয়ে দেবো'খন—ধন্নি যা হোক—

বারোয়ারী তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁশের সামিয়ানা টাংনো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়ীতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে, বৈকালের আশাশ্রয় থাকে। অপূর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। গাত্রে অপূর ঘুম হয় না, বাঁধভাঙা বস্ত্রের স্রোতের মত কোঁতুল ও খুশির যে কী প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছটকট করে। এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে। যাত্রা হবে। যাত্রা হবে।

ম'গেদ বাবণ আছে অত বড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়ে কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া বাজলক্ষ্মীর কাছে আসব-সন্ধ্যা ও বাঁশের গায়ে কুল'নে' লাল নীল কাগজের অভিনবত্ব সহজে গল্প করে, অপূর মনে হয়, যে পঞ্চাননতলায় সে 'দু'বেল' ক'ডিখেল' কবে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্ত স্থানটাতে আজ বা'ক'ল নীলমণি হাজরার দলেব যাত্রার মত একটা অভূতপূর্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটবে, এও কি সম্ভব ? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

ঠাঁও শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চল্কাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে।

কুমার-পাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে ঠা'ড'ইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ী তাহার চোখে পড়িল। ম'জের বাস্ক বোঝাই—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ খানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুণিয়া খুশির স্বরে বলিল—অপুদা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসব, যাবি ? মাজের গাড়ীগুলোর পেছনে চলার নোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা ছাতে! পটু একজন

দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধহয় স্বামী সাজে, না অপু?।

আকাশ বাতাসের স্বং একেবারে বদলাইয়া গেল—অপু মহা উৎসাহে বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুণগুণ করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানতে পারিয়াছে, তাই এত ক্ষুধা। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ী বাবা! এ রকম দল!—

হরিহর শিষ্যবাড়ী বিলি করার জন্ত বালিব কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিশ্বযেব হুরে বলে—কিসের সাজ রে থোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এতবড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত রূপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কীদো কীদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারী তলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্ছে আর আমি এখন বুঝি ব'সে ব'সে পড়বো! এখুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো, এখন ব'সে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হ'লে তোল বাজাবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে। তখন না হয় যেও এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্ত বাড়ী আসিয়া ছেলেকে চোখ-ছাড়া করতে মন চায় না। অভিমানে রাগে অপুও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্না-ভরা গলায় আবার শুভকরী গুণ করে—মাস মাহিনা যাব যত, দিন তার পড়ে ক'ন?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা ব'সবে। ওবেলা অপু মাথের কাছে ঘাইয়া কীদো কীদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী অল্পপরিচয় বর্ণনা করে। সর্বজনা আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে। বছরকারের দিনটা—তোমার ন মাস বাড়ীতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তঞ্চালদ্বার ঠাকুর হয়ে উঠবে কি না।

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারী তলায় কাটে। সকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে বাড়ীতে খাবার থাইতে আসিল। বাবা পোরকে ব'সিয়া কবচ লিখিতেছে। অজ্ঞান এ সময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে দিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খলি রাখিবার জন্ত নানা রকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে, থোকা চট করে শিলেটে লিখে আনো দিকি, ঐ: ভুত বাপু! অপু সব অদ্ভুত ধরনের কথা শুনিয়া হাসিয়া খন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে বাবা এইটে হ'য়ে গেলে আমি কিছ চ'লে যাবো। তাহার বাবা বলে—যেও এখন, যেও এখন থোকা—আচ্চা চট করে লিখে আনো দিকি—আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুও মনে হইল, বাহির হইতে কি একটা প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জন

ছায়া-ভয়া বৈকালে বাঁশখন ঘেরা বাড়ীতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এস পড়তে বসো—অমনি চারিদিক হঠাৎ একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদে হটগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না, এ হয় না! এ হয় না! যাত্রা যে বসে বসে ১০০ কোন উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায়, নিরীহ, দুর্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পরন্তু মুখে উচ্চারণ করে। বাবার জন্ত অপূর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বলনা আমিও দেখতে যাবো। অপু বলে—মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে? চিক দিয়ে ঘিরে দিয়েচে সেইখানে বসবো? মা বলে—এখন থাক, আমি, ওই ওদের বাড়ীর মেয়েরা যাবে, তাদের সঙ্গে যাবো,—আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোঘারী তলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন অপু! পরে সে কাছে আসিয়া হাসিহাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দহাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—তু' পয়সার মুড়কী কিনে খাস, নয়তো যদি নিচু বিকি হয় তো কিনে খাস। ইহার দিনমাত্তক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোর পুতুলের বাস্কে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর? অপু দাঁদর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—নিচু খাবে—কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জান হাসি হাসিল। কৈফিয়তের স্বরে বলে—বোষ্টমদের ব'গ'নে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে, দু-ঝড়-ই-ই—এক পয়সায় ছটা, এট এত বড় বড়, একবারে সিঁড়রের মত রাঙা! সতু কিন্লে, সাধন কিন্লে—পরে একটু খামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আছে দিদি? দুর্গার পুতুলের বাস্কে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চডক দেখিব'র নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মত ভাইট', মুখের অবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার তারি মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুর্গা একটা কাজ কর তো। রাগুদের বাগানে থেকে দুটো সাদা গন্ধভেদালি পাতা খুঁজি নিয়ে আয় তো—অপু'র শরীবটা অস্বক করেছে, একটু ঝোল করে দোব।

মায়ের কথায় সে একছুটে রাগুদের বাগানে যায়—বাগানে মাছুষ সমান উঁচু ঘন আগাচার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের স্রুখে মাথা ঢলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটি ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—

নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে হুথ নেইকো মনে—

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজ্জার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে। ভাল বেহালাদার, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখনও সে ভাল জিনিস শোনে না—উদাস-করুণ হবে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে মনে হয়, বাবা এখনও বসিয়া বাড়ীতে সেই কি লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জ্বরির সাজ-পোষাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে রাজা মন্ত্রী দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না। সবাই তো আসবে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকী নাই! বাবা কেন এখনো? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি। কি সব সাজ! কি সব চেহারা!..

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো? তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে কিব্বিয়া বলে—বাবা দিদি এসেছে? চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া হ্রীপুর লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁচুনে সুরে বেহালায় সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বত্ৰুণ জমাইয়া রাখিবার জন্য জ্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া ধামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোন বনবাসগমনোত্তর রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকেব সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ সেনাপতি বাগে এমন কাঁপেন যে মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হঠাৎ যায; এমন তো সে কখনো দেখে নাই।

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রাণী। খন নিবিড় বনে ৩৩ রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা তাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ নাই যে তাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য কল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার স্মৃতিদেহ—সুধার ভাঙনায় বিষকল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাগী রে— শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিকরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী। ...যায় বৃষ্টি
ঝাড়গুলো গুড়ো হয়ে, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ ঢুটি বা যায়। রব
ওঠে—ঝাড় সামলে ঝাড় সামলে। কিন্তু অভূত যুদ্ধকৌশল—সব ঝাড়াইয়া চলে
—যন্ত্র বিচিত্রকেতু।

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার কসরৎ-এর সময়
অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুম পাচ্ছে বাড়ী মাঝে থোকা? ঘুম।
সর্বনাশ। না সে বাড়ী যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—
এই ঢুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে থেও, আমি বাড়ী গেলাম। অপূর
ইচ্ছা হ়। সে একপয়সার পান কিনিয়া থাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত
কিসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে, অবাক। সেনাপতি বিচিত্রকেতু
চাতিয়ারন্দ অবস্থায় বার্ডমাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তীতাকে ঘিরিয়া রথ-
যাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। রাজকুমার অজয় কোথা হইতে
আসিয়া বিচিত্রকেতুর কন্ডুই এ হাত দিয়া বলিল—একপয়সার পান খাওয়াও
না কিশোরীদা। রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল
না— হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—মাঃ তত পয়সা নেই—ওবেলা সারানখানা যে
দুজনে মাথলে আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—খাওয়াও না
কিশোরীদা? আমি বৃষ্টি কখনো কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত
ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপূর সময়সীমী হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড় সুন্দর।
অপু যুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড় ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে।
হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়—একটু লজ্জার সঙ্গে—পান
খাবে? অজয় একটু অবাক হয়ে, বলে—তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এস না।
দুজনে ভাব হইয়া যায়। তার বলিলে ভুল হয়। অপু যুদ্ধ, অতিভূত হইয়া
যায়। ইহাকেই সে এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র
অজয়কে। তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া, শৈশবের শত
স্বপ্নময়ী যুদ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, মুখ,
এই গলার স্বর। ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের
বাড়ী কোথায় ভাই? আমাকে একজনের বাড়ী খেতে দিয়েছে, বজ্র বেলার
খেতে দেয়। তোমাদের বাড়ীতে খায় কে?

খুলিতে অপূর সারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়ীতে
একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম তোলক বাজাচ্ছে—তুমি কাল খেকে যেও,
আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—তোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়ীতে আগে
খেতে, সেখানে থাকে—

খানিকক্ষণ ছুঁজনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি
যাই ভাই, শেষ দিনে আমার গান আছে—আমার পাঁচ কেমন লাগতে
তোমার?

শেষ রাজে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ী আসে। পথে আসিতে আসিতে যে-যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রার একটো হইতেছে। বাড়িতে তাহার দিদি বলে—ও অপু, কেমন যাত্রা শুনি?—অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল। কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মহা খুশির সহিত সে বলে—কাল থেকে, অজয় যে সেজেছিল মা, সে আমাদের বাড়ী খেতে আসবে—

তাহার মা বলে—হুজনে খাবে?—হুজনকে কোথেকে—

অপু বলে,—তা না, একজন তো চ'লে যাবে, শুধু অজয় খাবে—

দুর্গা বলে—কেমন যাত্রা রে অপু? এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্লো যখন সেই রাজকন্তা ম'রে গেল। অপুর তো রাজে ঘুমের ঘোরে চারি-ধারে যেন বেহালা সজীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—শেষ রাজে ঘুমাইয়াছে, তপ্তিব সন্ধে ঘুম হয় নাই, সূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে ছুঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-টোল মন্দিরার ঐকতান বাজনা তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরে বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিক দেশের মহারাণী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বহুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে, রাজকন্তা ইন্দুলেখা যেন মাথানো। কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্তা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়, ঐ রকম গায়ের রং, অমনি বড় বড় চোখ, অমনি সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল।

ইন্দুলেখা তাহার সঁকল করুণা, স্নেহ, মাধুরী লইয়া কোন্ সেকালের দেশের অতীত জীবনের পরে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতশ্রেণী ছোট তাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল তাহাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া একা নির্জন বনের মধ্যে ঝরাইয়া গেল—সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাটাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

দুপুরবেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা হুজনকে এক জায়গায় থাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় নইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক হাসী তাহাকে স্নান করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছর খানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজন্মের ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশী কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—মা ওকে সেই কালকের গানটা

পাইতে বল না—সেই 'কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্ডারে প্রাণপ্রিয় প্রাণ-সাথীরে'—

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাতিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল, সর্বজন্মের চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, আশা এমন ছেলের মা নাই ! তাহার পর সে আরও গান গাতিল। সর্বজন্ম বলিল—বিকলে মুড়ি ভাজ্জবো, তখন এসে অবিস্তি করে মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা কসো না যেন—যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ীর মত, বুঝলে ?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, 'ভাই তোমার তো গলা বড় মিষ্টি—একটা গান গাও না ?...অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাগড়টী লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন যাত্রাদলের ছেলে—এর কাছে তার গান গাওয়া ? নদীর ধারে বড় শিশুগাছটার তলায় চপা-চলতির পথ হইতে কিছুদূরে বাঁশ-ঝোপের আড়ালে ঢুকনে বসে। অপু অনেক কণ্ঠে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান ধরে—

শ্রীচরণে ভণ্ড একবার গা তোল হে অনন্ত—দাস্ত রায়েব পাঁচালীর গান বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক হইয়া যায়, বলে—এমন গলা ভাই ? তা তুমি গান গাও না কেন ?...আব একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—খেয়ার আশে বসে রে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে লিখিয়া আসিয়া গাতিত, সুরটা বড় ভাল লাগায় অপু তাহাও কাছ হইতে লিখিয়াছিল—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহার ডুকনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল—এমন গলা থাকলে যে কোনো দলে ঢুকলে পনেরো টাকা করে মাইনে সেধে দেবে বলি তোমাথ—এর ওপর একটু যদি শেখো !

বাড়ীতে কেহ না থাকিলে দিদির সামনে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে ? গান হবে ?...দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাশ্রয় হোক, আজ একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলেব নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কি বলিয়া উত্তর করিবে ঠাণ্ডা করিতে পারিল না।

বলিল—তোমার ঐ গানটা আমায় শোনাও না ?—তারপর দুইজনে গলা মিলাইয়া সে গানটা গাতিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ্ ছপ্ করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নীচে জলের ধারে একজন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল—কি খুঁজছো ভাই ! অপু বলিল—ব্যাঙাচি খুঁজচি, ছিপে মাছ ধরবো—তাহার পর বলিল—আজ্ঞা ভাই, তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন ?...যেও না কোথাও, থাকবে ?...

এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার স্বর! তাহার উপর অপূর্য কাছে সে সেই রাজপুত্র অজয়। কোন বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে—চিরজন্মের বন্ধু। আর তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়!

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড় মারে। সে আন্ততঃ পালের দলে যাইবে—সেখানে খুব স্বস্থ, বোজ বাক্সে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাবী দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপূরের বাড়ী আসিবে ও সে-সময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার এখনি আসর হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি ‘পরশুরামের দর্প-সংহার’ হয় তবে আমি নিয়তি সাজবো, দেখো কেমন একটা গান আছে—

আরও তিনদিন যাত্রা হইল। গ্রামস্থল লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথেঘাটে মাঠে গায়ের মাঝি নৌকা বহিতে বহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ী ভাকাইয়া যাহার যে গান ভাল লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান ফরমাসেস করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপূ আরও তিন চারটা গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল, তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভাল গান গাহিতে পারে। অপূ বহু সাধাসাধনার পর নিজের বিছা ভাল করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রং-এর ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসবে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল—এস না থোকা, দলে আসবে? অপূর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল! আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এস চলো তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপূর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রার দলে কাজ করা যে যন্তঃস্রষ্ট্রজীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়! সে গোপনে অজয়কে বলিল, আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাদের কি সাজতে দেবে? অজয় বলিল—এখন এই সখী ঢকী, কি বালকের পাট এই বকর, তারপর ভাল ক’রে শিখলে—

অপূ সখী সাজিতে চায় না—জ্বরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া জলোয়ার বুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের দ্রব লক্ষ্য। অজয় তাহাকে চুপি চুপি কণ্ঠি-পাখরের রং-একটা-ছোকরাকে দেখাইয়া কহিল, এই যে দেখচো, এর নাম বিষ্টু তেলি। আমার সঙ্গে মোটে বনে না, আমার নিজের পয়সায় দেশলাই কিনে

বালিশের তলায় রেখে শুই, দেশলাই উঠিয়ে নেয় চুকট খেতে, আর দেখ না। আমি বলি, আমার বাজ্রে ভয় করে, দেশলাইটা দাও। অঙ্ককারে মন ছম্ ছম্ করে, তাই সেদিন চেয়েছিলাম ব'লে এমনি ণাব'ড়া একটা মেরেচে! নাচে ভালো ব'লে অধিকারী বড় খাতির করে, কিছু বলবারও যো নেই—

দিনপাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহার বগুনা হইল। অজয় বাড়ীর ছেলের মত যখন তখন আসিত ঘাইত, এই কয় দিনে সে যেন অপূর্বই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপূর্বই বয়সী ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপূর্ব মত যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গন্ধা-ঘমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশী খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে কোথায় জাখে, কোথায় শোয়, কি খায়, 'আহা' বলিবার কেহ নাই, গৃহ-সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধ হয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অশ্রুত্যাশিতভাবে আজ তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মত সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটলি খুলিয়া কষ্টে সজ্জিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার স্বরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একথানা ভাল কাপড়—

সর্বজয়া বলিল—না বাবা, না—তুমি মুখে বললে এই খুব হোল, টাকা দিতে হবে, না, তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-খাওয়া ক'রে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে উহাদের বাড়ীর দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল দিদির বিয়ের সময় অবজ্ঞা করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাঁবতলার ছায়ায় ছায়ায় তাহার স্বকুমার বালকমুষ্টি ভাঁটশেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ, আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের বোজ্জগার নিজে করতে। অপূর্ব আমার যদি ঐরকম হোত—মাগো!...

তাহার বিচার স্থখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্বজন্মও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ভাকাইয়া একটা ভাল চাকুরী দিবে (কাহারো চাকুরী দেয় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্র-বক্ষে মত অম্পষ্ট)। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অর্দ্ধরাত্রির মাথায় কোনো জ্বরির পোশাক-পরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগ-পত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোন মণি-খচিত মায়াশ্রাসাদ আকাশ বাহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাড়া ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল; আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া। কিন্তু হয় কৈ?...

জীবন বড় মধুময় শুধু এইজন্য যে, মাধুর্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সব সময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারো আস্বাদ, জীবনে অক্ষয় হোক তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

হরিহর বাড়ী হইতে গিয়াছে প্রায় দুই তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্র অনেক দিন পাঠায় নাই। দুর্গা অস্থিত ভুগিতেছে একটু বেশী, খায় দায় অস্থির হয়, হুঁদিন একটু ভাল থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

সর্বজন্ম মেয়ের বিবাহের জন্ত স্বামীকে প্রারথি তাগাদা দেয়। স্বামীকে দিয়া দুই-তিন থানা পত্র নীরেন্দ্রের পিতা রাজেশ্বর বাবুর নিকট লিখিয়াছে সেদিকের আশা সে এখনও ছাড়ে নাই। হরিহর বলে, তুমি কি খেপ্‌লা না কি? ও সকল বড় লোকের কাণ্ড, রাজেশ্বর কাকা কি আর আমাদের পুছবেন? তবুও সর্বজন্ম ছাড়ে না; বলে, লেখো না, আর একথানা লিখেই রাখো না—নীরেন ত পছন্দই ক'রে গিয়েছেন।

দুই এক মাস চলিয়া যায়, বিশেষ কোন উত্তর আসে না, আবার সে স্বামীকে পত্র লিখিবার জন্ত তাগাদা দিতে শুরু করে।

এবার হরিহর যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্তত বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই!

পাড়ার একপাশে নিকানো পুছানো ছোট খড়ের ঘর দু' তিন থানা। গোয়ালে হঠপুট দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা ভরা বিচানী, গোলা ভরা ধান! মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ায় উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখী ডাকে—নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্রামা। অপূ সকালে উঠিয়া কড় মাটির-ভাঁড়ে-দোয়া একপাত্র তাজা সফেন কালো গাইএর দুধের সঙ্গে

গরম ঝড়ের ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা মার্লেরিয়ায় ভোগে না। সকলেই জানে, সকলেই খাতির করে, আনিয়া পায়ের ধূলা নয়। গরীব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

...শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই, সর্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয়, এতকাল পরে সত্য-সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

কেন এতদিন হয় নাই? কেন এতকাল পরে? সেই ছেলেবেলাকার দিনে জামতলায় সজনেতলায় ঘুরিবার সময় হইতে সৈজুতির আলপনা আকার মধের সঙ্গে এ সাধ যে তাহার মনে জড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আলতা-পর্য্য পায়ের দাগ আঁকা আধিনায় শব্দের বাড়ীর ঘর-সংসার পাতাইবে। এরকম ভাড়া পূবানো কোঠা পাঁশবন কে চাহিয়াছিল?

দুর্গা একটা ছোট মানকচু কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধণা দিয়া বসিয়া থাকে। তার মা বলে, তোর হোল কি ঢগ্‌গা? আজ কি ব'লে ভাত খাবি? কাল সন্ধ্যা বেলাও তো জ্বর এগেছে? দুর্গা বলে, তা হোক্‌ মা, সে জ্বর বুঝি—একটু তো মোটে শীত করলো?...তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে ছোটো ভাত—। তাহার মা বলে—মাঃ, অস্থখ হোয়ে তোর খাই খাই বড় বেড়েছে। আজ কাল যদি ভাল থাকিস্‌ তো পরশু বৎ দেবো।

অনেক কাকুতি মিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভাল আছি আজ আর জ্বর আসবে না আমার—ওবেলা দুখানা কুটি আর আলুভাজা খাবো। একটু পরে তাই উঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ। তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এমনি তো হাই গুঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে শীত কবে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সাহিত ইহার সম্পর্ক কি?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন ছ-ত করে, তাবে—জ্বর জ্বর ভেবে এরকম হচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বর হয় নি—

বাড়া বোদ শেওলাধরা ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া বন হয়। দুর্গার মনে হয় অগ্নমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর-বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেখরাত্রে পিছনে সেজঠাকুরদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পায় পটু করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হাটিয়া; বাঁ পা থানা যেখানে রাখিল, সে বাঁ পায়েও পটু করিয়া আর একটা!...সকাল বেলা দেখা গেল,

পাছে রাখে উহারা কেহ ভাল ফুড়াইয়া নয়, একজন্ত সত্ৰ তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেলকাটা পুতিয়া রাখিয়াছে।

আর একদিন যা আশ্চর্য ব্যাপার !

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়ো বাঙাল মুসলমান একটা বড় রং-চং করা কাচ বসানো টিনের বাস্ক লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ওপাড়ার জীবন চৌধুরীর উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল। দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাস্কের গায়ে একটা চোঙের মধ্যে চোখ দিয়া কি সব দেখিতেছিল।

বুড়ো মুসলমানটি বাস্ক বাজাইয়া স্থর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা বোজা দেখো, হাতী বাঘকা লড়াই দেখো ! এক একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাহাকে মশা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞেস করিতেছিল, কি দেখলি রে ওর মধ্যে ? সব সত্যিকারের ?

উঃ। সে কি অপূর্ণ ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহার বলিতে পারে না। কি সে সব !

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়ো মুসলমানটি বলিল, দেখবে না খুকী ?...দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—আমার কাছে পয়সা নাই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকী, দেখে যাও—পয়সা লাগবে না—

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল, নাঃ—কিন্তু আগ্রহে কৌতুহলে তাহার বকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল—এসো এসো, দোষ কি ?...এসো, ছাথো—

দুর্গা উজ্জলমুখে পায়ে পায়ে বাস্কের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্য দিয়ে তাকাও দিকি খুকী ?

দুর্গা মাথার উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পূর্বের দশ মিনিটের কথাই সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায় ? কত সাহেব, মেম, ঘর-বাড়ী, যুদ্ধ, সে সব কথা বলিতে পারে না। কি জিনিসই সে দেখিয়াছিল !

অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনও দিন আসে নাই।

গল্প ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়।

আজকাল বাবা বাড়ী নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই দপ্তরে ষ্ণ ধরিবার যোগাড় হইয়াছে। সকাল বেলা সেই যে সে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে থাইবার সময়।

তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেছে—তোমার লেখাপড়া একেবারে
ছিকেক উঠলো? এবার বাড়ী এলে সব কথা বলে দেবো, দেখো এখন তুমি—

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্পর লটয়া বসে। বইগুলো খুব চাপিদিকে ছড়ায়। মাকে
বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো—

পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রোদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে
খয়ের-ভিজানো কালি, চক্ চক্ করে—অপু মহা খুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া
ধাকে—ভাবে আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে—ওঃ কী চক্ চক্ করছে
ছাথো একবার! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড একখণ্ড খয়ের লইয়া
কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুকাইতে দিয়া কতটা আচ্ছন্ন
করে দেখিবার জ্ঞান কোতুলকের সহিত সেদিকে চাহিয়া ধাকে। মনে হয়
—আচ্ছা, যদি আর একটু দি?

একদিন মা'র কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে
খোজ নেই, কেবল ডালা ডালা খয়েরের রোজ দরকার—রেখে দে খয়ের—

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি?...
আমি বুঝি এমনি এমনি—

—না, খয়ের নৈলে কালি হবে কেন? এইসব রাজ্যের ছেলে আর
লেখাপড়া কচ্ছে না—তাদের সের সের খয়ের রোজ যোগানো রয়েছে যে
দোকানে! যাঃ—

অপু বসিয়া বসিয়া একথানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা
সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে
যান, রাজপুত্র নীলাধর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন,
ধোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারী বনতটের নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু
বলিয়া একটি জটিল চবিত্ত সৃষ্ট হইবার অল্প পরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক
দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে
রাজপুত্রী অম্বাব নারদের বরে পুনর্জীবন-প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবন-
কেতুর সহিত তাহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় ঘাঁহারা বলেন যে, গত বৈশাখ
মাসে দেখা যাত্রাব পালা হইতে এক ন্যুমণ্ডলি ছাড়া মূলতঃ কোন অংশই পৃথক
নহে, বা সেই হইতেই ইহা হুবহু লওয়া, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অতীতের
কোনো এক নীবব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নির্জন বাসকক্ষের স্তিমিত-দীপশযায়
এক প্রাচীন কবির নীলমেঘের মত দৃশ্যমান ময়ূর-নির্নাদিত দূব বনভূমির স্বপ্ন
যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের বর্ণনে অন্তর্প্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই
বা কি? সে বিস্তৃত শুভ-যামিনীর বন্দনা মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার
বৎসর পরিয়া করিয়া আসিতেছে।

আগুন দিয়াই আগুন জালানো যায়, ছাই-এর টিপিতে মশাল গুঁজিয়া কে
কোথায় মশাল জালে?

দগ্ধরে একথানা বই আছে,—বইখানার নাম চন্দ্রিমলা, লেখা আছে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরাতন বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্ত বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে একথানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা পড়িয়া থাকে। বইখানাতে যাহাদের গল্প আছে সে ঐ রকম হইতে চায়। হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাপড়ের অভাবে চামড়ার পাতে ভোতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত, মেঘপালক ডুবালা ইত্যন্ততঃ সঞ্চরণশীল মেঘদলকে যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিৎ পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ঐ রকম হইতে চায়। ‘বীজগণিত’ কি জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মত। সে এই হাতের লেখা নিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভকরী এসব তাহার ভাল লাগে না। ঐ রকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে ‘ভূচিৎ’ (জিনিসটা কি?) পাতিয়া পড়িবে, বড় বড় বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ঐ রকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সে সব জিনিস? কোথায় বা ‘ভূচিৎ’, কোথায় বা ‘বীজগণিত’, কোথাও বা লাটিন ব্যাকরণ?—এখানে শুধু কড়ি কষার আখ্যা, আর তৃতীয় নাম্ভা।

মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?

পথের পাঁচালী

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিস বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠার ভূয়ো গল্প হইতে শুরু হইয়া পুরীর কোন্ মন্দিরের মাধায় পাঁচ মণ ভারী চুপক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি—আরব্য উপম্বাসের গল্পের মত নানা আজগুবি কাহিনীর বর্ণনা চলিতেছিল। শ্রোতাদের কাহারও উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, এরকম আজগুবি গল্প ছাড়িয়া কাহারও বাড়ী যাইতে মন সরিতেছিল না। ভূগোল হইতে শব্দই গল্পের দ্বারা আসিয়া জ্যোতিবে পৌছিল। দীপ্ত চৌধুরী বাগ্বেতছিলেন—ভৃগু সংহিতার মত অমন বই তো আর নেই। তুমি যাও, শুধু জয়বাশিটা গিয়ে দিয়ে দাও, তোমার বাবার নাম, কোন্ কুলে জন্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দেবে—তুমি মিলিয়ে নাও—গ্রহ ও রাশিচক্রের যত একম ইচ্ছে হয়—তা সব দেওয়া আছে কি না! মায় তোমার পূর্বজন্ম পর্যন্ত—

সকলে সাংগ্ৰহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাখিয়া বলিলেন—না ওঠা যাক, এর পর আর যাওয়া যাবে না—দেখচো না কাণ্ডখানা? একটা বড় ঝটকা টটকা না হলে ঝাঁচি, গতিক বড় খারাপ চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার অশনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে

চারিধার ধোয়া ধোয়া ।

হরিহর মোটে পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাট, টাকাও নাট । সেট অনেক দিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয় ভাবে আজ ঠিক খরচ আসবে । ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে নেডাস ব' দেহতে পাসনে, ডাকবান্ধটার কাছে ব'সে থাকবি—পিওন যেমন আসবে অ অমনি জিগোস করবি—

অপু বলে—বা, আমি বুঝি ব'সে থাকি নে ? কালও তো এলো পুঁটি চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিগোস করে এস দিদি পুঁটিকে ? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি ক'রে এল ? আমি থাকিনি বৈ কি ।

বর্ষা রীতিমত নামিয়াছে । অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে ! সাধু কর্মকারের ঘরের চালা হইতে গোলা পায়বার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিসে আসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া ছাথে । আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে । বিজ্ঞান চম্কাইলে মনে মনে ভাবে—দেবতা কি বকম নলপাচ্ছে দেখচো, এইবার ঠিক ডাকবে—পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে ।

বাড়ী ফিরিয়া ছাথে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড়ো করিয়াছে ।

অপু বলে—কোথেকে আনলে মা ? উঃ কত ।

দুর্গা হাসিয়া বলে কত—। উঃ-উঃ । তোমার শো ব'সে ব'সে বড় সুবিধে । ওই ওদের ভোবার জামতল থেকে—এই এতটা এক হাঁটু জল । যাও দিকি ?

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত বোয়ের সঙ্গে দেখা হয় । সর্বজয় কাপড়ের ভিতর হইতে কামার একখানা রেকাবী বাহির করিয়া বলে, এই ছাথে জিনিদখানা, খুব ভালো—ভাব না, কিছু না, ফুল কামা । তুমি বলেছিলে, ত'ই বলি যাই নিয়ে—এ সে জিনিদ নয়, এ আমাব বিঘের দমন—এখন এ জিনিদ আর মেনে না—

অনেক দবদস্তুরের পর নাপিত বো নগদ একটি আধুনি আঁচল হইতে খুলিয়া দিয়া রেকাবিখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয় । কাউকে যেন না প্রকাশ করে—সর্বজয় এ অন্তর্গোপ বার বাব করে ।

তুই একদিনের ঘনৌত বর্ষা নামিল । ভ-ভ পূবে হাওয়া, খান্‌ডোবা সব থৈ-থৈ করিতেছে—পথে থাটে একহাঁটু জল, দিন বাত সৈঁ সৈঁ, বাশবনে ঝড় বাধে—বাশেব মাথা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ঝাঁক নাই—মাঝে মাঝে আগেশ্বর চেয়েও অশ্রুকার করিয়া আসে—কালো কালো মেঘের রাশ ভ-ভ উড়িয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দব আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন্ কৌশলী সেনানায়কের চালনা

জলজল-আকাশ একাকারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্য-সৈন্ত বাহিনীর পর বাহিনী, অশ্বোহিনীর পর অশ্বোহিনী, অদৃশ্য রথী মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে—প্রজলন্ত অত্যাগ্র দেববজ্র আশুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমুর এদিক্-ওদিক পৰ্শস্ত ছিড়িয়া ফাড়িয়া এই ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তবীক্ষ অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে।

মহাঝড়।

দিন বাত সৌ-সৌ শব্দ—নদীর জল বাড়ে—কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল। নদী-নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে—গুরু-বাহুর গাছের তলে, বাশবনে, বাড়ীর ছাঁচতলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখী-পাখালির শব্দ নাই কোনোদিকে। চার-পাঁচদিন সমান ভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণ।—অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল—আমাদের বাশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখবি? দুর্গা কাঁধা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল—না উঠিয়াই বলিল—কতখানি জল এসেচে রে? অপু বলে, তোর জর সারুলে কাল দেখে আসিস। তেঁতুলতলার পথে হাঁটু জল। জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায় রে?

ঘরে একটা দানা নেই—দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে,—তা হবে না মা, আমার খিদে পায় না বুঝি—আমি দুটি ভাত খাবো—হঁ-উ—

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মাগিক আমার—এ রকম কি করে। অনেক ক’রে চালভাজা মেখে দেবো এখন—রাঁধবো কেমন ক’রে, দেখচিস নে কি রকম সঁওটা করছে? উত্তনের মধ্যে এক উত্তন জল যে? পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই ছাথো একটা কইমাছ বাশতলায় কানে হেঁটে দেখি বেডাচ্ছে—বানের জল পেলে সব উঠে আসছে গাঙ থেকে—বয়োজ পোতাব ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে কি না। তাই সব উঠে আসচে—

দুর্গা কাঁধা ফেলিয়া ওঠে—অবাক হইয়া যায়। বলে, দেখি মা মাছটা? হ্যাঁ মা কইমাছ বুঝি কানে হেঁটে বেডায়? আর আছে? অপু এখন বৃষ্টিমাণায় ছুটিয়া যায় আর কি—অনেক কষ্টে তাহার মা তাকে ধামায়।

দুর্গা বলে—একটু জর সারলে কাল সকালে চল অপু, তুই আর আমি বাশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসবো এখন। পরে সে অবাক হইয়া ভাবে—বাশবাগানে মাছ। কি ক’রে নে? বাঃ তো!—মা কি আর ভাল ক’রে খুঁজচে। খুঁজলে আরও দেখানে আছে—দেখতে পেলাম না কি রকম কইমাছ কানে হাটে—কাল সকালে দেখবো—সকালে জর সেয়ে যাবে।

চারিদিকের বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে জয়োদশীর অন্ধকারে চারিবার একাকার। দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই

এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে। সর্বজন্ম ভাবে—আজ যদি এখনি একথানা পল্লব আসে নীরেন বাবাজীর? কি জানি, তা কি আর হ'তে পারে না? নীরেন তো পছন্দই ব'রে গিয়েছেন—কি জানি কি হোল অদেটে! নাঃ, সেসব কি আর আমার অদেটে হবে? তুমিও যেমন। তা হোলে আর ভাবনা ছিল কি?

ওদিকে ভাইবোনে তুমুল ভর্ক বাবিয়া যায়! অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসে—ঠাণ্ডা ঠাণ্ডায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে—মা—কি? সেহ—শামলকা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েছেন দেশ—

অপু বলে—দর—ই' মা তাই? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েছেন দেশ? কখাটা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায হাসে।

সর্বজন্মার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মত বেঁধে। মনে মনে ভাবে—সাতটা নয় পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে—কি অদেটে যে ক'রে এসেছিলাম—তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে—ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কি না শুধু দুটো ভাত—নিনকিয়া! আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর, 'টানির সংসার—অপু মানুষ হোলে আর এ হুঃখ থাকবে না—ভগবান তাকে মানুষ ক'রে তোলেন যেন।

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দপুরে ঘর কবিত্তে আসিয়াছিল, তখন এক বৎসর এই রকম অবিভ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এ • বাড়িয়াছিল যে ঘাটের পথে মুখ্যোবাগানের কাছে বড় বোঝাই নৌকা পল্লব আসিয়াছিল।

অপু বলে—কত বড় নৌকো মা?

—১২২ সেই যে গোটাদের চেনে নৌকো, মাজিমাটির নৌকো মাঝে মাঝে খসে দেয়। চিস্তে—অ • বড়—

১২৩ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চাণ্ডীদিব বিত্তনি কর্তে জানো?

ম'নক ব'রে সর্বজন্মার ঘুম ভাঙিয়া যায় অপু ডাকিতেছে—মা, ওমা ওঠো অ মা'র গায়ে জল পড়ল—

সর্বজন্ম উঠিয়া অ'নে চ'লে—বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে—ছুটা ছল দিয়া ঘরের মধ্যে আস পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়।

মা আমার জন্যে শুভি আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া ছাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ সপ করিতেছে। ডাকিয়া ব'লে—চল—ও দুর্গা শুনিস? একটু ব'ল দিকি? বিছানাটা সরিয়ে নি ও দুর্গা—শীগগির, ক'বাবে ভিজি গেল যে সব?

চেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজন্মার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত—এখন ব'য়া তাহার মন ছম্ ছম্ করে—ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটবে কিছু ঘটবেন। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে মানুষবেই বা কি

হোল ? কেন পস্তরও আসে না—টাকা মরুকগে যাক। এরকম তো কোনবার হয় না ? তাঁর শরীরটা ভাল আছে তো ? মা সিদ্ধেশ্বরী স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভাল খবর এনে দাও মা।

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্ত একটু বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়া বাটির বাহির হইয়া দেখিল বাশবনের মধ্যে ছোট ডোবাটা জলে ভরি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাহতোছিল, সর্বজয়া, ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা শোন—পরে সজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলেছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর চেনের জন্তে—তা নিবি ?

নিবারণের মা বলিল—আছে ? দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেনেয়ে সজে ক'রে এখন আসবো এখন—নতুন আছে মা-ঠাকুরণ, না পুরোনো ?

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না—একখুনি দেখবি ? একটু পুরোনো কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয়নি—ধোয়া তোলা আছে—পরে একটু খামিয়া বলিল—তোরা আজকাল চাল ভান্ছি'স নে ?

নিবারণের মা বলিল—এই বাদলায় কি ধান তুকোয় মা-ঠাকুরণ ? খাবার ব'লে দুটোখানি রেখে দিই'চি অমনি—

সর্বজয়া বলিল—এক কাজ কর না—তাই গিয়ে আমার আধকাঠা খানেক আজ দিয়ে যাবি ? একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির স্বরে বলিল—বিস্তীর্ণ জন্তে বাজার থেকে চাল আনবার লোক পাচ্ছি নে—টাকা নিয়ে বেডাচ্ছি, না কেউ যদি রাজি হয়—বড় মন্ডিলে পড়ি'চি মা।

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল,—বলিল—আসবো এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালি'ব ভাত কি আপনারা খেতে পাববেন মা-ঠাকুরণ ? বড় মাটা—

নিমছাল দিক দূর্গা আর থাইতে পাবে না। তাহা'র অস্থখ কেতাবেই আছে। ঔষধ নাই, পথা নাই, ডাক্তার নাই, বৈজ্ঞ নাই। বলে—এক প'নার বিস্কুট আনি'য়ে দেবে মা, নোন্তা, মুখে বেশ লাগে ?

সাবু নাই জোটে না, তার বিস্কুট।

বৈক্য বলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও গেল বেলী করিয়া আসে—ঘোর বগলমুখের নির্জন, জলে থৈ থৈ, ও ও প'ন হাওয়া বওয়া, মেঘ অন্ধকারে একাকার ভাস-সফা। আবার সেইসকল কালো কালো পঁজা তুলোর মতো মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে। এ সঙ্গে কান পাতা যায় না। দরজা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট তক্ত কবিতা গোক—ছেঁড়া গলে ছেঁড়া কাপড়-গোঁজা ভাঙা কবাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেলী ব্রাহ্মে সকলে ঘুমাইলে বেলী বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হস হস জলের শব্দ ; ক্রুদ্ধ

দৈত্যের মত গর্জমান একটানা গাঁ গোঁ রবে ঝড়ের দমকা বাড়ীতে বাধিতেছে ! জীর্ণ কোঠাখানা এক একবারের দমকায় যেন ধর ধর করিয়া কাঁপে । ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায় গ্রামের একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গইয়া নিঃসহায় । মন মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি তাকে খেতি নেই—এদের কি করি ? এই রাস্তিবে যাই বা কোথায় ? মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে—আচ্ছা যদি কোঠা পড়ে, তবে দালানের দেওয়ালটা বোধ হয় আগে পড়বে—যেমন শব্দ হবে অমনি পানচালার দোর দিয়ে দেৱ টেনে বার করে নেবো—

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না—কয়দিন সে গুলশাক কচুশাক দিহ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে—নিজে উপবাসের পর উপবাস দিচ্চা ছেলে-মেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাওয়া ছিল গাওয়াইতেছে—শরীর ভাবনায় অনাচারে তরুন, মাথার মধ্যে কেমন করে ।

ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ, অনেক রাত্রে ঝড় বাড়িল । বাহিরে কি ঝটকা আসিল । উপায় । একবার বড় একটা দমকায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সম্ভবপূর্বে দালানের দ্বার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল । বৃষ্টির ছাটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল—হু হু একটানা হাওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের ঝড়ব শব্দ ঢাকিয়া গিয়াছে—বাহিরে কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে মেঘে আকাশে-বাতাসে গাছপালায় সব একাকার । ঝড়বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না ।

এই হিংস্র অন্ধকার ও ক্রুর ঝটিকাময়ী রজনীর আত্মা যেন প্রলয়দেবের দূতরূপে ভীম ভৈরব বেগে সৃষ্টি গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে—অন্ধকারে রাতে, গাছপালায়, আকাশে, মাটিতে তাহার গতিবেগ বাধিয়া শব্দ উঠিতেছে—সু-ই-শ সু-উ-উ-ই-শ, সু-উ-উ-উ-ই-শ এই শব্দের প্রথমার্শেব দিকে বিশ্ব-গ্রামী দুন্টা যেন পিছু হটয়া বলসঞ্চয় করিতেছে—সু-উ-উ এবং শেষের অংশটায় পৃথিবীর উচ্চ নীচ তাবৎ বায়ুস্তর আলোড়ন, মনন করিয়া বায়ুস্তরের বিশাল তুলন তুলিয়া তাহার সমস্ত আত্মরিকতার বলে সর্বজ্ঞাদের জীর্ণ কোঠাটার পিছনে দাক্ষা দিচ্ছে হু-ই-শ । কোঠা তুলিয়া তুলিয়া উঠিতেছে, আর থাকে না । ইশার মধ্যে যেন কোন অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রমভ্রান্তি নাই—যেন দৃঢ়, অভ্যস্ত, স্পষ্টানীবদ্ধ ভাবেব কতবাক্য । বিশ্বটাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভাব যে লইয়াছে, যুগে যুগে একমুখ কত হাঙ্গামা সৃষ্টিকে বিদ্রোহ করিয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তারাবাজির মত ছাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে যে মহাশক্তিমান ধ্বংসদূত—এ তার অভ্যস্ত কার্য—এতে তার অধীরতা টানততা সাজে না ।

আতঙ্কে সর্বজ্ঞা দোব বন্ধ করিয়া দিল—আচ্ছা, যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে ? মানুষ কি অত কোনো জানোয়ার ? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই—মাগো । জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে । হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপূর গা জলে ভিজিয়া স্নাতা হইয়া যাইতেছে—

সে কি করে? আর কত রাত আছে?—সে বিছনো ছাতড়াইয়া দেশলাই
 ঝুঁজিয়া কেবোসিনের ডিবাটা জ্বলে। ডাকে—ও অপু ওঠ, তো? শুচিস,
 ও অপু? ওঠ, দিকি। দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্গা। বড্ড
 জল পড়ছে—একটু স’রে পাশ ঘের দিকি—

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে।
 হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্বজ্ঞা তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া
 বাহিরের দিকে উকি মারিয়া দেখিল—বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা
 দেখাইতেছে—রাষ্ট্রাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে!... তাঁহার বুক কাঁপিয়া
 ওঠে—এইবার বৃষ্টি পুরানো কোঠাটা—? কে আছে, কাহাকে সে এখন
 ডাকে? মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকের রাতটা কোনো একমে কাটিয়ে
 দাও, হে ঠাকুর ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় খামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও
 অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখ্যোর স্ত্রী গোয়ালে গরুর অবস্থা
 দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় থিড়কীদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর
 খুলিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—নতুন বো! সর্বজ্ঞা বাস্তবাবে বলিল—ন’ দি,
 একবার বট্টাকুরকে ডাকো দিকি? একবার শৌগ্গির আমাদের বাড়ীতে
 আসতে বলো—দুগ্গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখ্যোর স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্গা? কেন কি হয়েছে
 দুগ্গার?

সর্বজ্ঞা বলিল—ক’দিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্ছে আবার যাচ্ছে—
 ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্ধ্য থেকে জ্বর বড্ড বেশী—তার উপর কাল রাতে কি
 রকম কাণ্ড তো জানই—একবার শৌগ্গির বট্টাকুরকে—

তাঁহার বিশ্রান্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা
 চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখ্যোর স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বো—দাড়াও আমি
 এখুনি ঢেকে দিচ্ছি—চল আমি যাচ্ছি—কাল আবার রাস্তিরে গোয়ালের
 চালখানা পড়ে গেল, বাবা কাল রাস্তিরের মত কাণ্ড আমি তো কখনো দেখি
 নি—শেষরাত্রে সব উঠে গরুটকু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কি না। দাঁড়াও
 আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি মুখ্যো, তাঁহার বড্ড ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে
 অপুদের বাড়ীতে আসিলেন। রাত্রের অন্ধকারে সেই দৈত্যটা যেন সারা
 গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া দিয়া আকাশ-পথে অন্তর্হিত হইয়াছে—
 ভাঙা গাছের ডাল, পাতা, চালের খড়, কাঁচা বাঁশপাতা, বাঁশের কঞ্চিতে পথ
 ঢাকিয়া দিয়াছে—ঝড়ের বাঁশ শুইয়া পথ আটকাইয়া রাখিয়াছে। ফণি বলিল
 —দেখেচেন বাবা কাণ্ডখানা? সেই নবাবগঞ্জের পাকারাস্তা থেকে বিলিতি
 চটকা গাছটার পাতা উড়িয়ে এনেচে!... নীলমণি মুখ্যোর ছোট ছেলে একটা
 মরা চড়ুই পাখী বাঁশপাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

দুর্গার বিছানার পাশে অণু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখ্যো ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বাবা অণু।—অণুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কি সব বন্ধ ছিল জ্যেষ্ঠা মশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা? ...জরটা একটু বেশী, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—ফনি, তুমি একবার চট ক'রে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ভাস্কর্যের কাছে—একেবারে ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, মাড়া শব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ, ঘরদোরের অবস্থা তো বড় খারাপ? জল প'ড়ে কান রাত্রে ভেসে গিয়েছে—তা বোমার লজ্জার কারণই বা কি—আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হোত? হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হোল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এইরকম ঘরদোর, সারানোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে কি যে করচে, তাও জানিনে—চিরকালটা ওর সমান গেল—

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায়? আহা রোগা মেয়েটা কাল সারাবাত ভিজছে—একটু জল গরম করতে দাও—ওই জানালাটা খুলে দাও তো ফনি!

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ভাস্কর আসিলেন—দেখিয়া শুনিয়া ঐষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে, বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই। জ্বব বেশী হইয়াছে, মাথায় নিয়মিতভারে জলপটি দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় ঝামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখ্যো দু'বেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড়-বৃষ্টি ঝামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ভাস্কর সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অণু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল—ও দিদি শুনিছিস, কেমন আছিস, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। চোট নড়িতেছে, কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অণু মুখের কাছে কান লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁচিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকাঠে উঠিয়া গেলে অণু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে?

অণু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে—রোদ্ধুর উঠেছে আজ দেখিচিস দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্ধুর রয়েছে—

খানিকক্ষণ ছুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে যৌত্র
ওঠাতে অপূর ভারি আত্মদ হইয়াছে। সে জানলার বাহিরে যৌত্রালোকিত
গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন অপূ—একটা কথা শোন—

—কি রে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমায় একদিন তুই বেলগাড়ী দেখাবি?

—দেখাবো এখন—তুই সেরে উঠলে বাবাকে ব'লে আমরা সব একদিন
গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ী ক'রে—

সারা দিন-রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনও কালে হইয়াছিল মনে
হয় না। চারিদিকে দারুণ শরতের যৌত্র।

সকাল দশটাব সময় নীলমণি মুখ্যে অনেকদিন পরে নদী স্নান করিতে
ঘাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উদ্বেজিত স্বর তাঁর কানে
গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শীগগির—অপূদের বাড়ীর দিক থেকে
যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্ছে—

ব্যাপার কি দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়ের উপর খুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে—ও দুগ্গা চা দিকি—ওমা
ভাল ক'রে চা দিকি—ও দুগ্গা—

নীলমণি মুখ্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে—সারা সেরা সব
দিকি—আহা কি সব বাতাসটা বন্ধ ক'রে দাঁড়াও?

সর্বজয়া ভাস্কর সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া
গিয়া চাঁৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কি হোল, মেয়ে অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি
আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত
নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতাত্মগতিক
পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায়
জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইলে—বলিলেন—ম্যালেরিয়ার শেষ
স্টেজটা আর কি—খুব জরের পর যেমন বিরাম হয়েছে আর অমনি হাটফেল
ক'রে—ঠিক এরকম একটা case হ'য়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধঘন্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

পথের পাঁচালী

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহর বাড়ীর চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর

যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় তাহার পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সেখানে গিয়াছিল। গোয়াড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর সে সন্ধান পাইল যে, শহরে উকিল কি জমিদারের বাড়ীতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ী হইতে পঞ্চথরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুৰাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হইল না।

সে পড়িল মহাবিপদে—অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন নাই—থোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল, পয়সা ফুৰাইয়া গেলে সেখানে হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবগত অভাবগস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিনামূল্যে থাকিতে ও থাইতে দেওয়া হয়! অভাব জানাইয়া হরিসভায় একটা কুঠুরির একপাশে থাকিবার স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা, অনেকগুলি নিষ্কর্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা করে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ হৈ করিয়া কাটায়, এমন কি গভীর রাত্রিতে এক একদিন এমন ধরণের স্ত্রীলোকের যাতায়াত দেখা যাইতে লাগিল যাহাদের ঠিক হরিমন্দির-দর্শন-প্রার্থিনী ভক্তমহিলা বলিয়া মনে হয় না।

অতিকষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরের বড় বড় উকীল ও ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিছানাটা টানিয়া লইয়া কে একজন অজ্ঞাতকুললীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে ইহা লইয়া গাঁজাখোর সম্প্রদায়ের সহিত তাহার একটু বচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহার হরিসভার সেক্রেটারীর কাছে গিয়া কি নাগাইল তাহাবাই জানে সেক্রেটারী ১ নং নিজ বাড়ীতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাঁহাদের হরিসভায় তিনদিনের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অল্পত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইল।

থোড়ে নদীর বায়ে অল্প একটু নির্জন স্থানে পুঁটুলিটি নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাত-মুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই—সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া গ্রামাধিপতি গান করিয়াছিল—গোনার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়—সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাড়াইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না—মাত্র দিন-দশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। অল্প প্রায় দুই মাসের উপর হইয়া গেল—এ পর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই, এতদিন কি করিয়া তাহাদের চলিতেছে! 'অপু বাড়ী হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে—

তাহার অন্ত একথানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্ত। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালবাসে—মাঝে মাঝে সে যে বাপের বাগ্ন-দপ্তর হইতে লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে, বাগ্নের ভিতর আনাড়ি হাতের হেলাগোছা করা থাকে—কোন্ বই বাবা বাগ্নের কোণায় রাখে, ছেলে তাহা জানে না—উন্টাপান্টা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে—হরিহর বাড়ী ফিরিয়া বাগ্ন খুলিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কীতি।

তাহার বাড়ী হইতে আসিবার পূর্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একথানা বটতলার গজ পদ্মপুরাণ পড়িবার জন্ত লইয়া আসে—অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল—বোজ বোজ পড়ে—কুচুনী পাড়ায় শিবুঠাকুরের মাছ দ্রিহিতে যাওয়ার কথাটা পড়িতে তাহার ভাবি আয়োদ—হরিহর বলে—বইখানা ছাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্ছে যে। অবশেষে একথানা পদ্মপুরাণ তাকে কিনিয়া দিতে হইবে—এই সর্তে বাবাকে রাজী করাইয়া তবে সে বই ফেরৎ দেয়। আসিবার সময় বার বার বলিয়াছে—সেই বই একথানা এনো কিন্তু বাবা, এবার অবিশ্রি অবিশ্রি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একথানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভাল দেখিয়া আনতা লইয়া যাইবার জন্ত। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা, কি করিয়া বাড়ীতে সংসার চলিতেছে সেই না এখন সমস্তা? সন্ধ্যার পর পূর্বপরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে রাত্রের মত আশ্রয় লইল। ভাল ঘুম হইল না—বিছানায় শুইয়া বাড়ীতে কি করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে লক্ষ্যহীন ভাবে পথের একস্থানে দাঁড়াইল। রাস্তার ওপারে একটা লাল ঈটের লোহার ফটক-ওয়াল বাড়ী। অনেকক্ষণ চাহিয়া তাহার কেমন মনে হইল এই বাড়ীতে গিয়া তুংখ জানাইলে তাহার একটা উপায় হইবে। কলের পুতুলের মত সে ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সাজানো বৈঠকখানা, মার্বেলপাথরের ধাপে স্তরে স্তরে বসানো ফুলের টব, পাথরের পুতুল, পাম, দাঁরজায় ঢুকিবার স্থানে পা-পোষ পাতা। একজন প্রোট ভদ্রলোক বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন। অপরিচিত লোক দেখিয়া কাগজ পাশে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি দরকার?

হরিহর বিনীতভাবে বলিল,—আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টান্ট করি—তাছাড়া ভাগবৎ কি গীতাপাঠও—

প্রোট ভদ্রলোকটি ভাল করিয়া কথা না শুনিয়াই তাহার সময় অত্যন্ত মূল্যবান, বাজে কথা শুনিবার সময় নিতান্ত সংক্ষেপে জানাইয়া দিবার ভাবে বলিলেন না, এখানে ওসব কিছু এখন স্থবিধে হবে না, অন্ত জায়গায় দেখুন।

হরিহর মরীয়াভাবে বলিল—আজ্ঞে নতুন শহরে এসেছি, একেবারে কিছু হাতে নেই—বড় বিপদে পড়িছি, কদিন ধরে কেবলই—

প্রোট লোকটি তাড়াতাড়ি বিন্দায় করিবার ভঙ্গীতে ঠেস দেওয়ার তাকিয়াটা

উঠাইয়া একটা কি তুলিয়া লইয়া হরিহরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—এই
নিন্, যান, অস্ত্র কিছু হবে-টেবে না, নিন্।

সেটা যে জেগীর মুদ্রাই হউক, সেইটাই অস্ত্র স্বরে দিতে আসিলে হরিহর
লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিত না—এরূপ সে বহুস্থানে লইয়াছেও ; কিন্তু সে
বিনীত ভাবে বলিল—আজ্ঞে ও আপনি রাখুন, আমি এমনি কারুর কাছে
নিইনি...আমি শাস্ত্র পাঠ-টাট্ করি—তাছাড়া কারুর কাছে—আচ্ছা থাক—

একটু শুভযোগ বোধ হয় ঘটয়াছিল। রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই
একদিন একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরেও কাছে একটা গ্রামে একজন বাক্ষস
মহাজন গৃহ-দেবতার পূজা-পাঠ করিবার জন্ত একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে, যে
বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে হরিহর
সেখানে গেল—বাড়ীর কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর
দিলেন, আদর আপ্যায়নের কোন ক্রটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ী যাইবার
সময় বাড়ীর কর্তা দশটাকা প্রণামী ও যাতায়াতের গাড়ীভাড়া দিলেন,
গোয়াড়ীতে রক্ষিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও
পাঁচটি টাকা প্রণামী পাওয়া গেল।

আকাশে-বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্ঘেঘ আকাশের দিকে চাহিলে
মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সবুজ লতাপাতায়, পথিকের চরণ-ভঙ্গীতে
কেমন একটা আনন্দ মাথানো। রেলপথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ীর
বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে বাড়ীর কথা মনে হয়।

একদল শান্তিপুত্রের ব্যবসায়ী লোক পূজার পূর্বে কাপড়ের গাঁট ক্রয় করিতে
কলিকাতায় গিয়াছিল, চুর্ণীঘাটের, খেয়ার নৌকায় উঠিয়া কলরব করিতেছে—
সর্বত্র একটা উৎসবের উল্লাস। রাণাঘাটের বাজারে সে দ্বী ও পুত্রকতার জন্ত
কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালবাসে, তাহার জন্ত বাছিয়া
একখানা ভাল কাপড়, ভাল দেখিয়া আলতা কয়েক পাতা। অপূর ‘পদ্মপুরাণ’
অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা ‘সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা
কালকেতুর উপাখ্যান’ ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালীর টুকটাক
দু-একটা জিনিস—সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল একটা কাঠের চাকী-বেলুনের কথা,
তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাটিতে হাটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া
পৌছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে
হন্ হন্ করিয়া উদ্ভিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর দিকে
চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ ছাথো কাণ্ডখানা,
বাশ-ঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচিলের ওপর, ভুবন কাকা কাটাবেনও
না—মুন্সিল হয়েছে আচ্ছা—পরে সে বাড়ীর উঠানে ঢুকিয়া অভয়াসমত আগ্রহের
স্বরে ডাকিল—ও অণু—

তাহার গলায় স্বর শুনিয়া সর্বজয়া স্বর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল,—বাড়ীর সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল?
বাড়ী নেই বুঝি?

সর্বজয়া শাস্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো—ঘরে এসো। জীব অদৃষ্টপূর্ব শাস্তভাবে হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্ধায় বেগে অতৃদিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে, দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের ‘সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান’ ও টিনের রেলগাড়ীটা দেখাইয়া তাহাদের তাক লাগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ ঠাঠালের চাকী-বেলুন এনেচি এবার—পরে কিছু নিরাশালিশ্রিত সতৃষ্ণনয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কৈ—অপু, দুগ্গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে—

সর্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ফুকারিয়া কাদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্গা কি আর আছে গো—যা যে আমাদের কাকি দিয়ে চ’লে গিয়েচে—এতদিন কোথায় ছিলে।

গাঙ্গুলী বাড়ীর পূজা অনেক কালের। একদিন গ্রামে অতি বড় দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদি বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট সময়ে কুমার আসিয়া প্রতিমা গড়ায়, পোটো চালচিত্র করে, মালাকার সাজ যোগায়, বারাসে মণ্ডুখালির দ’ হইতে বউরীরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে।

ঈশমালির দীলু মানাইদার অত্ন অত্ন বৎসরের মত বস্ত্রনচৌকি বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে—আমর হেমন্ত পতুর স্নেহ-অভ্যর্থনা,—নব ধাতুগুচ্ছের, নব আগন্ধক শেফালিদলের, হিমালয়ের পাব হইতে উড়িয়া আসা পখিক পাখী জামার, শিশির-স্নিগ্ধ মৃণাল-ফোটা হেমন্তসঙ্কার।

নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানি অগোচরলো চুলে-ঘেরা ছোট মুখে সনির্বন্ধ গোপন অত্মবোধ দুয়ারের পাশের বাতানে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়া কেমন অগ্ন্যমস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা গিয়েচে বাবা—

গাঙ্গুলী বাড়ীর প্রাঙ্গণ উৎসববেশে সজ্জিত হাসিমুখে ছেলেমেয়েতে ভরিয়া গিয়াচে। অপু চাহিয়া দেখিল মতু ও তাহার ভাই কেমন কমলালেবু রং-এর জামা গায়ে দিয়াছে—সবুজ শাড়ী পরিয়া ও দিবিয়া চুল বাধিয়া রাগু-দিদিকে যা মানাইয়াছে। গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়ে স্ননয়নী খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুল ও জিয়া আর পাঁচ ছয়টি মেয়ের সঙ্গে পূজার দালানে দাঁড়াইয়া খুব গল্প করিতেছে ও হাসিতেছে। স্ননয়নী বাদে বাকী মেয়েদের সে চেনে না, বোধহয় অত্ন জায়গা

হইতে উহাদের বাড়ী, পূজার সময় আসিয়া থাকিবে—শহরের যেয়ে বোধহয়, যেমন সাজগোজ, তেমনি দেখিতে! অপু একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে কে চোচাইয়া বলিতেছে—বড় সামিয়ানাটা আনবার ব্যবস্থা এখনও হোল না? বাঃ—তোমাদের যা কাজকর্ম, দেখো এরপর মজাটা। তারপর ব্রাহ্মণ খেতে বসবে পাঁচটায়?

পথের পাঁচালী

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে খিতে দিন কাটিয়া গেল! শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পব হইতেই সর্বজয়া অনববত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানা স্থানে চেষ্টার কোন ক্রটি করে নাই। কিন্তু কোন স্থানেই কোন সুবিধা হয় নাই। সে আশা সর্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছে। মধ্য গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতিবাতা নীলমণি রায়েব বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন ও নিজেদের ভিটা জঙ্গলাবৃত্ত শস্য যাওয়াতে ভুবন মুখুয়ার বাটীতে উঠিয়াছেন। হরিহর নিজের বাটীতে বৌদিদিক আনিয়া রাখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল, কিন্তু নীলমণি রায়েব স্ত্রী রাজী হন নাই। এখানে বতমানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোট ছেলে সুনীল। বড় ছেলে স্বরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে এখানে আসিতে পারিবে না। অতসীর বয়স বছর চৌদ্দ, সুনীলের বয়স আট বৎসর। সুনীল দেখিতে তত ভাল নয়, কিন্তু অতসী বেশ সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা চলে না। তাহা হইলেও বরাবর ইহাবা লাহোরে কাটাইয়াছে নীলমণি রাখ সেখানে কমিসারিয়েটে চাকরী করিতেন, সেখানেই ইহাদের জন্ম, সেখানেই লালিত-পালিত, কাজেই পশ্চিমপ্রদেশ-গুলত নিটোল স্বাস্থ্য ইহাদের প্রতি অঙ্গে।

ইহাবা এখানে প্রথম আসিলে সর্বজয়া বডমানুষ জা'য়ের সঙ্গে মেশামেশি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানীর কাগজে দশহাজার টাকার মালিক একথা জানিয়া জা'য়ের প্রতি সন্তুষ্ট তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা কম করে নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বজয়া নিবোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে, সুনীলের মা তাহাকে ততটা আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার স্বামী চিরকাল বড় চাকরী করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ছেলেমেয়ে অল্পভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। স্বরূপ হইতেই তিনি দরিদ্র জ্ঞাতি পরিবার হরিহরের সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিতে লাগিলেন যে সর্বজয়া আপনিই হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথায় ব্যবহারে কাজে খুঁটিনাটি সব বাপারেই তিনি জানাইয়া দিতে লাগিলেন যে সর্বজয়া কোনরকমেই তাহাদের সঙ্গে সমানে সমানে মিশিবার যোগ্য নহে। তাহাদের কথাবার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে এই ভাবটা অনবরত

প্রকাশ পায় যে তাঁহারা অবস্থাপন্ন স্বয়ং। ছেলে যেয়ে সর্বদা কিছুকিট্টা নাভিয়া আছে, কাপড় এতটুকু ময়লা হইতে পায় না, চুল সর্বদা ঝাচড়ানো, অভদ্রীয় পলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার হুল, একপ্রস্থ চা ও খাবার না খাইয়া সকালে কেহ কোথাও বাহির হয় না, সঙ্গে পশ্চিমা চাকর আছে, সে-ই সব গৃহকর্ম করে—মোটের উপর সব বিষয়েই সর্বজ্ঞানদের দরিদ্র সংসারের চালচলন হইতে উহাদের বাপারের বহু পার্থক্য।

সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোন ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপূর সঙ্গেও নয়—পাছে, পাড়াগাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত, অসভ্য ছেলেপিলেদের দলে মিশিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়। তিনি এ গ্রামে বাস করিবার জন্ত আসেন নাই, জরীপেব সময় নিজেদের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসাই তাহার উদ্দেশ্য। ভুবন মুখুযোয়া ইহাদের কিছু জমা রাখেন, সেই খাতিরে পশ্চিম কোঠায় দু'খানা ঘর হইাদের জন্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়াও ইহাদের পৃথক হয়। ভুবন মুখুযোদের সঙ্গে ব্যবহারে সুনীলের মায়ের কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, কারণ ভুবন মুখুযোর পরমা আছে, কিন্তু সর্বজ্ঞানকে তিনি একেবারে মাহুষের মধোই গণ্য করেন না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড় ছেলে স্বরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাড়ী রহিল। স্বরেশ অপূরই বয়সী, ইংরাজী ইকুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফর্সা নয়, উজ্জল শ্রামবর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। অপূর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশী হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনেরো ষোল বৎসরের ছেলের মত দেখায়। স্বরেশও এপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। ওপাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ীর রামনাথ গাঙ্গুলীর ছেলে তাহার সহপাঠী। গাঙ্গুলী বাড়ী রামনবনী দোলের খুব উৎসব হয়, সেই উপলক্ষ্যে সে-ও মামার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। স্বরেশ অধিকাংশ সময় সেইখানেই কাটায়, গাঁয়ের অন্য কোনো ছেলে মিশিবার যোগা বলিয়া সে-ও বোধহয় বিবেচনা করে না।

যে পোড়ে ভিটাটা অঙ্গলারূত হইয়া বাড়ীর পাশে পড়িয়া থাকিতে সে জ্ঞান হইয়া অবশি দেখিতেছে, সেই ভিটার লোক ইহারা। সে হিসাবে ইহাদের প্রতি অপূর একটি বিচিত্র আকর্ষণ। তাহার সমবয়সী স্বরেশ কলিকাতায় পড়ে—ছুটিতে বাড়ী আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্ত অনেকদিন হইতে সে প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু স্বরেশ আসিয়া তাহার সহিত তেমন মিশিল না, তাছাড়া স্বরেশের চালচলন ও কথাবার্তার ধরণ এমনি যে, সে যেন প্রতি-পক্ষেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশী উঁচু। সমবয়সী হইলেও মুখচোরা অপূ তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁষে না।

অপূ এখনও পর্যন্ত কোনো স্থলে যায় নাই, স্বরেশ তাহাকে লেখাপড়ায় কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি।

দোলের দিন গাভুলীদের পুত্রে বাঁধাবাটে জলপাইতলায় বসিয়া হরেশ প্রাণের ছেলেদিগকে দ্বিগুণ নৈমায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গীতে এ প্রশ্ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। অপুকে বলিল—বলতো ইন্ডিয়া বাউণ্ডারী কি? জিওগ্রাফী জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। হরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি করেচ? ডেসিমল ফ্র্যাকশন কষতে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জাম্বুক, তাহার সেই টিনের বাস্কটিতে বৃষ্টি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্গপদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত—এইসব। সে ঐ সব বই পড়িয়াছে—অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়,—ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মাতৃষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মত তাহার একটা অদম্য অগ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিবার মত সঞ্চতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশী লেখাপড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ী থাকে নিজের কাছে বসাইয়া ছেলেকে এটা ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বালোর অধীত বিন্দুত বিত্তা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কবায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে ‘বঙ্গবাসীর’ গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো ‘বঙ্গবাসী’ তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজ্ঞ হরিহর সেগুলিকে সমস্তে বাঙাল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নতুন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই ‘বঙ্গবাসী’ কাগজখানার জ্ঞান ক্রুরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখ্যোর চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাস্কটীর কাছে পিণ্ডনের প্রত্যাশায় ইঁা করিয়া বসিয়া থাকে—হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত অদম্য জিনিসটা যোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টনটন করে।

অপু তবুও পুরাতন ‘বঙ্গবাসী’ পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে—লিউকা ও বাকেল, মাটিনিক দ্বীপের অগ্নুপাত, সোনাফরা জাদুকরের গল্প, আরও কত কথা। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়া তাহার কিছুই হয় না। মোটে ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিতি পরিমিতির নামও শোনে নাই—ইংরেজির দোড় ফার্স্ট বুকের ষোড়শ পাতা।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার মায়ের একটু অন্তরূপ ধারণা। সর্বজনা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ছেলে স্কুলে পড়িয়া মাতৃষ হইবে এ উচ্চ আশা তাহার

নাই। তাহার পরিচিত মহলে কেউ কখনো স্থলের মুখ দেখে নাই। তাহার যে সব শিশু-বাড়ী আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা। আরও একটা আশা সর্বজন্ম রাখে। গ্রামের পুরোহিত দীক্ষু ভট্টাচার্য বৃদ্ধ হইয়াছে। ছেলেবাও কেহ উপযুক্ত নয়। রাণীর মা, গোকুলের বো, গাঙ্গুলী গাড়ীর বড়বধু সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ইহার পব অপুকে দিয়া কাজকর্ম করাইবেন, দীক্ষু ভট্টাচার্যের অবর্তমানে তাঁহার গাজাখোর পুত্র ভোম্বলের পরিবর্তে নিষ্পাপ, সরল, হস্তী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা-পূজায় লক্ষ্মী-পূজায় তাহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামেব মেয়েরা এই চায়। অপুকে সকলেই ভালবাসে। ঘাটে পথে প্রতিবেশীন্দ্রের মুখে এ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সর্বজন্ম অনেকবার শুনিয়াছে, এবং এইটাই বর্তমানে তাহার সবচেয়ে উচ্চ আশা। সে গরীব ঘরের বধু, ইহা ছাড়া উজ্জল ভবিষ্যতের ধারণা নাই। এই যদি ঘটে তাহা হইলে শেষ রাত্রে স্বপ্নকে সে হাতের মুঠায় পায়।

একদিন একথা ভুবন মুখুয়ার বাড়ীতে উঠিয়াছিল। দুপুরের পর সেখানে তাসের আড্ডায় পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সর্বজন্ম সকলের মন যোগাইবার ভাবে বলিল—এই বড় খুড়ী আছেন, ঠাকুমা আছেন, মেজদি আছেন, এঁদের যদি দয়া হয় তবে অপু আমার সামনের কাণ্ডনে পৈতেটা দিয়ে নিয়ে গাঁয়ের পূজোটাতে হাত দিতে পারে। ওর আমার তাহলে ভাবনা কি? আট দশ ঘর শিশুবাড়ী আছে, আর যদি মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয় গাঙ্গুলী-বাড়ীর পূজোটা বাঁধা হয়ে যায় তাহ'লেই—

সুনীলের মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তাঁহার ছেলে স্বরেশ বড় হইলে আইন পড়িয়া—তাঁহার জ্যেষ্ঠত্ব ভাই পাটনার বড় উকীল, তাঁহার কাছে আসিয়া ওকালতি করিবে। স্বরেশের সে মামা নিঃসন্তান অথচ খুব পসার-ওয়াল উকীল। এখন হইতেই তাঁহাদের ইচ্ছা যে, স্বরেশকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান,—কিন্তু সুনীলের মা পরের বাড়ী ছেলে রাখিতে যাইবেন কেন ইত্যাদি সংবাদ নির্বোধ সর্বজন্মের মত হাউ হাউ না বকিয়াও, ইতিপূর্বে মাঝে-মিথালে কথাবার্তার ফাঁকে তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভুবন মুখুয়ার বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সর্বজন্ম ছেলেকে বলিল—শোন একটা কথা—পরে চুপি চুপি বলিল—তোর জ্যেষ্ঠিমাও কাছে গিয়ে বলিস্ না যে, জ্যেষ্ঠিমা আমার জুতো নেই, আমায় এক জোড়া জুতো দাও না কিনে?

অপু বলিল, কেন মা?

—বলিস্ না, বড়লোক ওরা চাইলে হয়তো ভালো এক জোড় জুতো দেবে এখন—দেখিস্নি যেমন ঐ স্বরেশের পায়ে আছে? তোর পায়ে ওই রকম লাল জুতো বেশ মানায়—

অপু লাজুক মুখে বলিল—আমার বড় লজ্জা করে মা, আমি বলতে পারবো না—কি হয়তো ভাববে—আমি...

সর্বজয়া বলিল—তা এতে আবার লজ্জা কি !...আপনার জন—বলিস্ না—তাতে কি ?

—হঁ...উ—সে আমি বলতে পারবো না মা । আমি কথা বলতে পারিনে জ্যোতিমার সামনে...

সর্বজয়া রাগ করিয়া বলিল—তা পারবে কেন ? তোমার যত বিদ্বি সব ঘরের কোণে—খালি পায়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আজ ত'বছর পায়ে জুতো নেই সে ভালো, বড় লোক, চাইলে হয় তো দিয়ে দিত কিনে—তা তোমার মুখ দিয়ে বাকিা বেরবে না—মুখচোরার রাজা—

পূর্ণিমার দিন রাণীদের বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল । রাণী তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল—আমাদের বাড়ী তো আগে আগে কত আসতিস্, আজকাল আসিস্ নে কেন রে ?

—কেন আসবো না রাণুদি,—আসি তো ?

রাণী অভিমানের স্বরে বলিল, হ্যাঁ আসিস্ । ছাই আসিস্ । আমি তোর কথা কত ভাবি । তুই ভাবিস্ আমার, আমাদের কথা ?

—না বৈ কি । বারে—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো দিকি ?

এ ছাড়া অল্প কোনো সম্ভাষণক কৈন্যিঃ তাহার যোগাইল না । রাণী তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল ! হাসিয়া বলিল, থালা-সুন্ধ নিয়ে যা আমি কাল গিয়ে খুড়ীমার কাছ থেকে নিয়ে আসবো—

রাণীর মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা নির্ভরতার ভাব আসিল অপু । রাণুদি কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আজকাল, রাণুদির মতো সুন্দরী এ পর্যন্ত অল্প কোনো মেয়ে সে দেখে নাই । অন্তর্দীপ্ত সর্বদা বেশ ফিটকাট থাকে বটে, কিন্তু দেখিতে রাণুদির কাছে লাগে না । তাহা ছাড়া অপু জানে, এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে, রাণুদির মত মন কোন মেয়ের নয় । দিদির পরই যদি সে কাহাকেও ভালবাসে সে রাণুদি । রাণুদিও যে তাহার দিকে টানে, তাহা কি আর অপু জানে না ।

সে থালা তুলিয়া চলিয়া বাইবার সময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—রাণুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না ! একথানা দেবে পড়তে ? প'ড়েই দিয়ে যাব ।

রাণী বলিল—কোন বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখছি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না, অবশেষে বলিল—আচ্ছা পড়তে দিই যদি এক কাজ করিস্ । আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে—জ্যাঠামহাশয় আমাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে দুপুর বেলা চোঁকি দিতে,—আমার সেখানে একা একা ভালো লাগে না, তুই যদি যাস্ আমার বদলে তুবে বই পড়তে দেবো—

রাণী প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—বেশ তো ? ১৬ ছেলেমানুষ সেই বনের

যথ্যে ব'লে রাছ চৌকি দেবে বৈকি ? তুমি বুড়ো ছেলে পারো না, আর ও যাবে ? যাও তোমার বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো—

অপু কিন্তু রাজী হইল । রাণীর বাবা ভুবন মুখুয্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আশিবার অনেক দেবি অথচ এই বইগুলার উপর তাহার বড় লোভ । এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুকচিস্তে সতুদের পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে । হু-একথানা একটু আধটু পড়িয়াছেও । কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, কাহাকেও পড়িতে দেয় না । নায়কের ঠিক সঙ্কটময় মুহূর্তটিতেই হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে—বেথে দে অপু, এ ছোট কাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে ।

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল ।

প্রতিদিন দুপুরবেলা আলমারী হইতে বাছিয়া একখানি করিয়া বই সতুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাশবনের ছায়ায় কতকগুলো সেওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া একমনে পড়ে । বই অনেক আছে—প্রাণস্ব-প্রতিমা, সরোজ-সরোজিনী, কুসুম-কুমারী সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটক, দম্ভা-দুহিতা, প্রেম-পরিণাম বা অমৃতে গরল, গোপেশ্বরের গুপ্তকণা সে কত নাম করিবে । এক-একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছাড়িতে পারে না । চোখ টাটাইয়া ওঠে, রগ টিপ্ টিপ্ করে, পুতুরধারে নির্জনে বাশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া সন্ধ্যা পুতুরটার পাটা-শেওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোনদিক দিয়া বেলা গেল ।

কি গল্প । সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া সরোজ নৌকাযোগে মূর্শিদাবাদে যাইতেছেন, পথে নবাবের হুকুমে সরোজের হইয়া গেল প্রাণদণ্ড, সরোজিনীকে একটা স্বাক্ষর করে চাবিতালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল । গভীর রাত্রে কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল, নবাব সন্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—সুন্দরী, আমার হুকুমে সরোজ মরিয়াছে, আর কেন ইত্যাদি । সরোজিনী সদর্পে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—রে পিশাচ, রাজপুত্র রমণীকে তুই এখনও চিনিস নাই, এ দেখে প্রাণ থাকিতে ইত্যাদি । এমন সময়ে কাহার ভীম পদাঘাতে কারাগারের জানালা ভাঙ্গিয়া গেল । নবাব চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন—একজন জটাভূটধারী তেজঃপূর্ণ-কণ্ঠস্বর সন্ন্যাসী, সঙ্গে যমদূতের স্তব বলিষ্ঠ চাবি-পাঁচজন লোক । সন্ন্যাসী ঘোষকবাণীতে নয়নে নবাবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—নবাবম, স্বাক্ষর হইয়া ভক্ষক ? পরে সরোজিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, আমি তোমার স্বামীর গুরু—যোগানন্দ স্বামী, তোমার স্বামীর প্রাণহানি হয় নাই, আমার কয়লুর জলে পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, এখন তুমি চল মা আমার আশ্রমে, বৎস সরোজ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছে । ..গ্রন্থকারের লিপিকৌশল সুন্দর, —সরোজের এই বিন্দুজনক পুনরুজ্জীবন আরও বিশদভাবে ফুটাইবার জন্য তিনি পরবর্তী অধ্যায়ের প্রতি পাঠকদের কৌতূহল উদ্বীণ করিয়া বলিতেছেন—এইবার চল পাঠক, আমরা দেখি বধ্যভূমিতে সরোজের প্রাণদণ্ড হইবার পর

কি উপায়ে তাহার পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হইল...ইত্যাদি।

এক একটি অধ্যায় শেষ করিয়া অপূর চোখ ঝাপসা হইয়া আসে,—গলায় কি যেন আটকাইয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিয়া সে দু-এক মিনিট কি ভাবে,—আনন্দে, বিষ্ময়ে, উত্তেজনায় তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে, পরে ক্রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্তী অধ্যায়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিদিকে ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাশঝাড়ে কত কী পাখীর ডাক শ্রবণ হয়, উঠি-উঠি করিয়াও বইএর পাতার এক ইঞ্চি উপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে—যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।

এই রকম বই তো সে কখনো পড়ে নাই? কোথায় লাগে সীতার বনবাস আর ডুবালের গল্প?

বাড়ী আসিলে তাহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পরের মাছ চোঁকি দিস্ গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে ব'সে একখানা বই পড়বার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে!

কিন্তু বোকা অপূর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার মায়ের সেদিক সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই! আজকাল সে দুইখানা বই পাইয়াছে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'। উইটিবি, বৈচিবনের প্রেক্ষাপটে নিম্নতর দুপুরের মায়ায় দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া চলে—জেলখানা নদীর উপর বসিয়া আতত নারেনের স্তম্ভা করিতেছে, আওরঙ্গজেবের দরবারে নিজেকে পাঁচহাজারী মনসবদারের মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া শিবাজী রাগে ফুলিয়া ভাবিতেছেন—শিবাজী পাঁচহাজারী? একবার পুণায় যাও তো, শিবাজীর কোঁজে কত পাঁচহাজারী মনসবদার আছে গণিয়া আসিবে।

রাজবাবার মরুপর্বতে, দিল্লী-আগ্রার রঙ-মহালে শিসমহালে, ওড়না-পেশোয়াজ-পুরা হুন্দবীদলেব সঙ্গে তাহার সারাদিনমান কাটে। এ কোন্ জগৎ—যেখানে শুধু জোৎস্না, তলোয়ার-খেলা, হুন্দর মুখের বকুত, আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘবর্ষা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া উষর উপত্যকা ও ভুট্টাক্ষেত পার হইয়া ছোট্টা?

বীরের যাহা সাধা, রাজপুতের যাহা সাধা, মাল্লবের যাহা সাধা—প্রতাপ সিংহ তাহা করিয়াছিলেন। হুন্দবীদলের পার্বত্য-বর্জ্যের প্রতি পাষাণ-ফলকে তাহার কাহিনী লেখা আছে। দেওয়ারের বর্ণক্ষেত্রের দ্বাদশ সহস্র রাজপুতের হৃদয়-বন্ধে তাহার কাহিনী অক্ষয় মহিমায় লেখা আছে।

বহুদিন পরেও প্রাচীন যোদ্ধগণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া পৌত্রপৌত্রিগণের নিকট হুন্দবীদলের অভূত বীরত্বের কথা বলিত

অদৃষ্টহস্তনিকিপ্ত একটি বর্ষা আসিল।...অপূ এই গ্রামের চিরস্তায় বনভূমির ছায়ায়, লতাপাতার নিবিড়তায়, ভিজা মাটির গন্ধে মাল্লব হইয়াছে—তবুও সে জানে রাজপুতনার ভীল-প্রদেশের বা আরাবলী-মেবারের প্রত্যেকটি স্থান; নাহারা-মগ্গোর অপূর্ব বস্ত্র সৌন্দর্য্য সে ভাল করিয়াই চেনে...পর্বত হইতে

অবতরণশীল শত্ৰুপাণি ভেজসিংহের মূর্তি কি সুন্দর মনে হয়।

‘সেই চম্পন প্রদেশে অনেক দিন অবধি সেই ভীল গ্রামের নির্জন কন্দরে ও উন্নতশিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যুষে নির্জন প্রান্তবে, পশ্চিকগণ কখনও কখনও একটি রমণীর পাণ্ডুর মুখ ও চকল নয়ন দেখিতে পাইত, লোকে বলিত কোন বিশ্রামশীলা উদ্বিগ্না বনদেবী হইবে।’ সেই গানের অস্পষ্ট করুণ মূর্ছনা যেন অপূর কানে বাশ-বাগানেব পিছন হইতে ভাসিয়া আসে।

কমলমীর সূয়াগড়ের যুদ্ধ, সেনাপতি শাহবাজ খাঁ, সুন্দরী হুরজাহান, পুষ্পকুমারী, বন্য ভীল-প্রদেশ, বীর চালক চন্দন সিংহ—দূর সুদূর কল্পনা।—তবু কত নিকট, কত বাস্তব মনে হয়। রাজবারার মকুডুমি আর নীল আগ্রাবল্লীর উন্নত পর্বতের শিখরে শিখরে চেনার বৃক্ষে ফুল ফটিয়া করিয়া পড়িয়াছে, দেবী মেবার লক্ষীর অলঙ্ক-রক্ত-পদচিহ্ন আঁকা রহিয়াছে বনবাস ও বীচ-নদীও তটভূমির শিলাথণ্ডে, ঝরণার উপল-রাশির উপরে, বাজ রা ও জগুয়ার ক্ষেত্রে ও মোড়ল বনে।

চিতোর রক্ষা হইল না। রাণা অমরসিংহ বাদশাহের সম্মান গ্রহণ করিলেন। সর্বহারা পিতা প্রতাপসিংহ যিনি পঁচিশ বৎসর পরিয়া বনে পর্বতে ভীল-পাল লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি বাধাস্কন্ধে কোথা হইতে দেখিয়াছিলেন এ সব?

তপ্ত চোখের জলে পুকুর, উইতিবি, বৈচিবন, বাশ-বাগান—সব আপ্স-হইয়া আসে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া ভাসিমুখে বলিল—ছাথো তো খোঁকা, কি বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারী ঘোষের শান্তভীর নিকট যে নিনটি টাকা পাইয়াছে, জীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু’টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, জী জানিতে পারিলে অল্প পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোন মতেই বাঁচানো যায় নাই।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। ইয়া-খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে, ‘বঙ্গবাসী’ কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য বৎসরখানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মত অধীর আগ্রহে ভুবন মুখ্যঘোড়ের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাচ্চটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রীতি শনিবারে ইা করিয়া বসিয়া থাকিত। খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কি অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড় বড় পাতায়?

হরিহরের মনে হয়—দুইটা টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে যে আনন্দের হাসি

ফুটাইয়া ভুলিয়াছে, তাহার ভুলনায় কোন বন্ধকী মাকড়ী খালাসের আশ্বস্তমাদ-
মোটাই বেশী হইত না।

অপু খানিকক্ষণ পড়িয়া বলে—ত্যাখো বাবা, একজন ‘বিলাত গাত্রী’র চিঠি
বেরিয়েচে, আজ থেকেই নতুন বেকুলো। খুব সময়ে আমাদের কাগজটা
এসেছে—না বাবা ?

তবুও তার মনে দুখ থাকিয়া যায় যে, গত বৎসর কাগজখানা হঠাৎ উহার
বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়মাস্তরের গল্পটার শেষ ভাগ তাহার পড়া
হয় নাই, রাইকো রাজসভায় যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল তাহা সে
জানিতে পারে নাই।

একদিন রাণী বলিল—তোর খাতায় তুই কি লিখছিল রে ?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ খাতায় ? তুমি কি ক’রে—

—আমি তোমাদের বাড়ী সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি ? তুই ছিলিনি,
খুড়িমার সঙ্গে কতক্ষণ ব’সে কথা বল্লাম। কেন খুড়িমা তোকে বলেনি ? তাই
দেখলাম তো’র বই-এর দৃষ্টে তো’র সেই রাজা খাতাখানায় কি সব লিখিচিস্—
অ মাং মাং রয়েছে, আর দেবী সিং না কি একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প।

—কি গল্প রে ? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রাণী একখানা ছোট বাঁধানো খাতা অপু’র হাতে দিয়া বলিল—এতে
তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস—একটা বেশ ভাল দেখে। দিবি তো ?
অতসী বল্ছিল তুই ভাল লিখতে পারিস নাকি। লিখে দে, আমি অতসীকে
দেখাবো।

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে—আর একটা পলা
তেল দাও না মা। এইটুকু লিখে রাখি আজ। ৩ হার মা বলে—আজ
রাত্তিরে আর পড়ে না—মোট দু’পলা তেল আছে, কাল আবার বাঁধবো কি
দিয়ে ? এইখানে বাঁধছি, এই আলোতো ব’সে পড়। অপু ঝগড়া করে।

মা বকে—এঃ ছেলের রাত্তির শলে যত লেখা পড়ার চাড্—সারাদিন চুলের
টিকিটি দেখবার যো নেই। সকালে করিস কি ? যা তেল দেব না।

অবশেষে অ্যু উম্মনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া
বসে। সর্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড় হলে আমি ওকে ভাল দেখে বিয়ে
দেবো। এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ী উঠবে। আসচে বছর পঁয়তেরা দিয়ে
নি, তারপর গাজুলী বাড়ীর পূজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—

চার-পাঁচদিন পরে সে রাণীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিল। রাণী
আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস্ ?

অপু হাসি হাসি মুখে বলিল—ত্যাখো না খুলে ?

রাণী দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওঃ অনেক লিখেচিস্ যে রে। দাঁড়া
অতসীকে ডেকে দেখাই।

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরও কিছু—ইস্! এসব বই দেখে দেখা।

অপু প্রতিবাদেয় সুরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বই কি? আমি তো গল্প বানাই—পটুকে জিজ্ঞেস ক'রো দিকি অতসী-দি? ওকে বিকেলে গাঙের ধারে ব'সে ব'সে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

ব'লী বলিল—না ভাই, ও লিখেছে আমি জানি। ও ওই রকম পেখে। খাসা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালে। পরে অপুকে বলিল—নাম লিখে দিস্নি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন! 'সচিত্র যৌবনে-যোগিনী' নাটকের ধরণে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই; অথচ দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলেও রাগুদি—বিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই ফেরৎ দিয়াছে।

তাহার বাবা বাড়ীতে নাই। সকালে উঠিয়া সে তাহাদের গ্রামের আর সকলের সঙ্গে পাশের গ্রামের এক আত্মজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে গেল। স্নানলগ্নে গেল তাহার সঙ্গে। নানা গ্রামের ফলায়ে বামুনের দল পাঁচ-ছয় কোশ দূর হইতেও ইটিয়া আসিয়াছে। এক-এক ব্যক্তি পাঁচ-ছয়টি করিয়া ছেলেমেয়ের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে; সকলকে সুবিধামত স্থানে বসাইতে গিয়া একটা দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম। প্রত্যেকের পাতে চাষিখানা করিয়া লুচি দিয়া যাইবার পর পরিবেশনকারীরা বেগুনভাজা পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখিল কাহারও পাতে লুচি নাই—সকলেই পার্থক্য চাদরে বা গামছায় লুচি তুলিয়া বসিয়া আছে। একটি ছোট ছেলে অতশত না বুঝিয়া পাতের লুচি ছিঁড়িতে যাইতেছে—তাহার বাপ বিস্ময়ের শুটুচায় হেঁ মারিয়া ছেলের পাত হইতে লুচি উঠাইয়া পাশের চাদরে রাখিয়া বলিল—এগুলো রেখে দাও না! আবার এখুনি দেবে এখন।

তাহার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ দোরগোল হইতে লাগিল—'লুচির খামাটা এ সারিতে', 'কুম্ভোটা যে আমার পাতে একেবারেই', 'ওহে, গরম গরম দেখে', 'মশাই কি দিলেন হাত দিয়ে দেখুন দিকি, স্নেফ্ কাঁচা ময়দা' ইত্যাদি। ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের তুমুল বিবাদ! কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—তা হোলে সেখানে শুদ্ধর লোকদের নেহত্তর করতে নেই। স'-পাঁচগু লুচি এ একেবারে ধরা-বাধা ছাঁদার রেট—বজাল সেনের আমল থেকে বাধা রয়েছে। চাইনে ভোমার ছাঁদা, কন্দগো মজুমদার এমন জায়গায় কখনও—

কর্মকর্তা হাতে পারে ধরিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।

অপুও এক পুঁটলি ছাঁদা বহিয়া আনিল। সর্বজনা তাকাতাকি বাহিরে

আমিরা হাসিমুখে বলিল—ওমা এষে কত এনেচিস—দেখি খোল তো ? মুচি, পানতুয়া, গজা—কত রে । ঢেকে রেখে দি, সকাল বেলা খেও এখন ।

অপু বলিল—তোমারও কিছু মা খেতে হবে—তোমার জন্তে আমি চেয়ে ছ'বার ক'রে পানতুয়া নিয়েচি ।

সর্বজয়া বলিল—হ্যাঁরে, তুই বলি নাকি আমার মা খাবে দাও ? তুই তো হাবলা ছেলে !

অপু ঘাড় ও হাত নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই বুঝি আমি বলি ! এমন ক'রে বল্লাম তারা ভাবলে আমি খাবো ।

সর্বজয়া, শিশির সহিত পুঁটলিটা তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল ।

খানিকক্ষণ পরে অপু সুনীলের বাড়ী গেল । উহাদের ঘরের রোয়াকে পা দিয়াই শুনিল, সুনীলের মা সুনীলকে বলিতেছেন—ওসব কেন ব'য়ে আনলি বাড়ীতে ? কে আনতে বলেচে তোকে ? সুনীলও সকলের দেখাদেখি ছাঁদা বাঁধিয়াছিল, বলিল—কেন মা সবাই তো নিলে—অপুও তো এনেচে !

সুনীলের মা বলিলেন—অপু আনবে না কেন—ও ফলারে বামুনের ছেলে ! ও এরপর মাকুরপুজো ক'রে আর ছাঁদা বেঁধে বেড়াবে,—ওই ওদের ধারা । ওর মা-টাও অমনি ছাংলা । ঐ জন্তে আমি তখন তোমাদের নিয়ে এ গাঁয়ে আসতে চাইনি । কসঙ্গে পড়ে যত কুশিক্ষা হচ্ছে । যা, ও সব অপুকে ডেকে দিয়ে আয়—যা ; না হয় ফেলে দিগে যা । নেমতন্ন করেছে নেমতন্ন খেলি—ছোটলোকের মত ওসব বেঁধে আনবার দরকার কি !

অপু ভয় পাইয়া আর সুনীলের ঘরে ঢুকিল না । বাড়ী ফিরতে ফিরতে ভাবিল যাহা তাহার মা পাইয়া এত খুশি হইল, জ্যাঠাইমা তাহা দেখিয়া এত রাগিল কেন ? খাবারগুলো কি ঢেলামাটি যে, সেগুলো কেলিয়া দিতে হইবে ? তাহার মা ছাংলা ? সে ফলারে বামুনের ছেলে ? বা রে ' জ্যোঠিমা যেন অনেক পানতুয়া-গজা খাইয়াছে, তাহার মা ও-সব কিছুই খাইতে পায় না । আর সে-ই বা নিজে এ সব ক'দিন খাইয়াছে ? সুনীলের কাছে যাহা জন্তায়, তাহার কাছে সেটা কেমন করিয়া জন্তায় হইতে পারে !

লেখাপড়া বড় একটা তাহার হয় না, সে এই সবই করিয়া বেড়ায় । ফলার খাওয়া, ছাঁদা বাঁধা, ব'পের সঙ্গে শিয়বাড়ী যাওয়া, মাছধরা । সেই ছোট্ট ছেলে পটু—জেলপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়া যে সে-বার মার খাইয়াছিল—সে এ সব বিষয়ে অপূর সঙ্গী । আজকাল সে আরও বড় হইয়াছে, মাথাতে লম্বা হইয়াছে, সব সময় অপুদার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে । ওপাড়া হইতে এ পাড়ায় আসে শুধু অপুদার সঙ্গে খেলিতে, আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না । তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া অপুদা যে জেলের ছেলেদের হাতে মার খাইয়াছিল, সেকথা সে এখনো ভোলে নাই ।

মাছ ধরিবার শখ অপূর অত্যন্ত বেশী । সোনাদাড়া মাঠের নীচে ইছামতীর ধারে কাঁচিকাটা খালের মুখে ছিপে খুব মাছ ওঠে । প্রায়ই সে এইখানটিতে



‘গিয়া নদীতীরে একটা বড় ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারি ভালো লাগে, একেবারে নির্জন, হুগারে নদীর পাড়ে কত কি গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম শিমুল গাছ, বেগুনী রং-এর বনকলমী ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাশবন, পাখীর ডাকে, বনের ছায়ায়, উলুবনের শ্রামলতায় মেশামেশি মাথামাথি সিন্ধু নির্জনতা।

সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠার-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বননদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। মাছ হোক বা না হোক, যখনই ঘন বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুর ঝোপের ডাঁসা খেজুরের গাছে ভরপুর হইয়া ওঠে, সিন্ধু বাতাসে চারিদিক হইতে বৌ-কথা-কণ, পাপিষ্যর ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে ডালে অশ্রু আবার ছড়াইয়া সূর্যদেব সোনাভাগর মাঠেব সেই ঠাণ্ডাড়ে ষটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায় গাভশালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেরে, তখনই তাহার মন বিভোর হইয়া ওঠে, পুলকচোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখে, মনে হয়—মাছ না পাওয়া গেলেও রোজ সে এইখানটিতে আসিয়া বসিবে, ঠিক এই বড় ছাতিমগাছের তলাটাতে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের কাংনা স্থির জলে দণ্ডেব পর দণ্ডে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার দৈর্ঘ্য তাহার থাকে না, সে এদিকে-ওদিকে ছটফট করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসার খোঁজে ফিরিয়া আসিয়া হয়ত চোখে পড়ে কাংনা একটু একটু ঝুঁকিয়াইতেছে। ছিপ তুলিয়া বলে—দূর। কেঁয়া মাছেব ঝাঁক লেগেছে, এখানে কিছু হবে না। পরে সেখান হইতে ছিপ তুলিয়া একটু দূরে শেওলা দায়ের পাশে গিয়া টোপ ফেলে। জলটার গভীর কালো রং-এ মনে হয় বড় কই কাংনা এখনি টোপ গেলে আর কি। ভ্রম ঘূটিতে বেশী দেবী হয় না, শরের কাংনা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এক একদিন সে এক একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। স্বদেশের নিকট হইতে সে একখানা নীচের ক্লাসের ছবি-এলা ইংরাজি বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজি বইখানাতে শুণু ছবি দেখে। দূর দেশের কথা ও সকল রকম মহত্বের কাহিনী খুব ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড় দোলা দেয়, এই বইখানাতে সেই ধরণের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষয় তুলার ঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ঈতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিষ্টোফার কলম্বস কিরূপে আमेয়িকা আবিষ্কার করিলেন—এমনি সব গল্প। যে ছ’টি ইংরাজি বালক-

বালিকা সমুদ্র তীরের শৈলগাজে গাঙচিলের বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, সে সাহসিনী বালিকা প্রাস্কোভিয়া লপুলফ নির্বাসিত পিতার নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহার করিবার আশায় জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তরের পথে স্বদূর সাইবেরিয়া হইতে একা বাহির হইয়াছিল—তাহাদের যেন সে দেখিলেই চিনিতে পারে।

স্বার ফিলিপ সিডনীর ছোট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ দু'টি জলে ভরিয়া যায়। স্বরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—স্বরেশ দা, গল্পটা জান তুমি? বড় ক'রে বলো না?

স্বরেশ :—ও, জুটফেনের যুদ্ধের কথা।

অপু অবাক হইয়া বলে—কি স্বরেশ দা? জুটফেন। কোথায় সে?

স্বরেশ ঐটুকুর বেশী আব বলিতে পারে না।

মাসখানেক পরে একদিন।

মাছ বরিতে গিয়া একটা বড় সবুজ মাছ কি কবিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

গোভ পাইয়া সে জায়গাটা আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালশালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

এমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াডিপ মাঠের পারে স্বদূরপ্রসারী সবুজ উলুবনে, কাশ ঝেপে, কদম-শিমূল গাছের মাখায় আবার তাহার শৈশব পুলকেব স্তম্ভমূর্ত্তেব অতি পবিচিত, পুরাতন মাথা—বৈকালের মিলাইয়া-যাওয়া শেষ রোদ।

বঙ্গবাসীতে বিলাত যাবার চিঠির মর্যো পড়া সেই স্তম্ভব গল্পটি তাহার মনে পড়ে

সে স্বরেশদাদাব ইংরাজি মাপে ভ্রমধ্যমাগর কোথায় দেখিয়াছে, তাবই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশেব বৃকে তখন বৈদেশিক সৈন্তবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন, রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুণ্ঠরাজ। জাতিব এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন্ প্রদেশের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রাম এক দরিদ্র কৃষক-হুহিতা পিতার মেঘশালক চরাইতে যায়, আর মেঘের দলকে ইতস্ততঃ ছাড়িয়া দিয়া নিভৃত পরীপ্রান্তরের তৃণভূমির উপব বসিয়া স্থল নয়ন দু'টি আকাশ পানে তুলিয়া নির্জনে দেশের দুর্দশা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিম্পাপ কুমারী মনে উদয় হইল, কে তাহাকে বলিতেছে—তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড়ো কর, অস্ত্র ধর, দেশেব জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে! দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী—দূর স্বর্গ হইতে তাহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তাবুপর নবতেজদৃষ্ট ফরাসী সৈন্তবাহিনী কি করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কি করিয়া ভাবয়নী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের

স্বাভাবিক সিংহাসনে বসাইলেন, তারপর অজানাত লোকে কি করিয়া তাঁহাকে তাইনী অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া দাখিল, এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শাস্ত নদীর ধারে গল্পটা ভাবিতে ভাবিতে কি অপূর্ব ভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়।—কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অস্ত্র সব সে তত ভাবে না। কি যে ছবিটি তার বার বার মনে আসে তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিদিকে যদৃচ্ছবিচরণশীল মেঘদল, নিম্নে শ্রাম তৃণভূমি, মাথার উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিপুণতা, জয়লালসার দর্প, রক্তশ্রোত,—অপর দিকে এক সরলা, দ্বিবা-ভাবময়ী, নীলনয়না পল্লীবালিকা। ছবিটি তাহার প্রবন্ধমান বাগক মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে। কতদূরে নীল সমুদ্রে ঘেরা মার্টিনিক দ্বীপ। চারিদিকে আখের ক্ষেত, মাথার উপর নীল আকাশ—বহু বহু দূর—শুধু নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র।—শুধু নীল আর নীল। আরও কত কি, তাহা বুঝানো যায় না—বলা যায় না।

ছিপ শুটাইয়া সে বাড়ীর দিকে ঘাইবার যোগাড় করে। নদীর ধারে ধায়ে নতশীষ বাব্বা ও সাইবাব্বার বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে। সোনাভাঙা মাঠের মাঝে ঠাণ্ডাডে বটগাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে,—যেন কোন দেবশিশু আলকার জলন্ত কেনিল সোনার সমুদ্র হইতে ফুঁ দিয়া বুধুদ তুলিয়া খেলাচ্ছিলে আকাশে উড়াইয়া দিয়াছিল, এই মাত্র সেটা পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর বনাস্তরালে নামিয়া পড়িতেছে।

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জেগে করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সামনে আসিয়া বলিল—তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা, তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধর্তে এইছিস, তাই এলাম। যাছ হয় নি ? একটাও না ? চল বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি ?

কদমতলায় নংয়েবের ঘাটে অনেক দূরদেশ নৌকা আসে, গোলপাতা বোঝাই, ধানবোঝাই, ঝিহুক-বোঝাই নৌকা সারি সারি বাধা। নদীতে জেলেদের ঝিহুক ভোলা নৌকায় বড় জাল ফেলিয়াছে। এ সময় প্রতি বৎসরই ইহার দক্ষিণ হইতে ঝিহুক তুলিতে আসে, মাঝ-নদীতে নৌকায় নৌকায় জোড়া দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। অপু ভাঙার বসিয়া দেখিতেছিল—একজন কালোমত লোক বার বার ডুব দিয়া ঝিহুক খুঁজিতেছে ও অল্পক্ষণ পরে নৌকার পাশে উঠিয়া হাতের থলি হইতে ছ'চারিখানা ঝিহুক বালি-কাঁদার বালি হইতে ছাঁকিয়া নৌকার খোলে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। অপু খুলির সহিত পটুকে আদুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখছিল পটু, কতক্ষণ ডুব দিয়া থাকে ? আর শুণে দেখি এক ছুই ক'রে। পারিল তুই অভক্ষণ ডুবে থাকতে ?...

নদীর দুর্বাধাস-ঝোড়া তীরটি চালু হইয়া জলের কিনারা পর্যন্ত নাষিয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে বোঝাই নৌকার খোঁটা পৌতা—নোঙর ফেলা। ইহার কত দেশ হইতে আসিয়াছে, কত বড় নদী খাল পার হইয়া বড় বড় নোনা গাঙের জোয়াব-ভাঁটা-তুফান খাইয়া বেডায়,—অপুর ইচ্ছা করে মাঝিদের কাছে বসিয়া সে সব দেশের গল্প শোনে ? তাহার কেবল নদীতে নদীতে, সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু সে চায় না। সুরেশের বইখানাতে নানাদেশের নাবিকদের কথা পড়িয়া অবশিষ্ট এই ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পটু ও সে নৌকার কাছে গিয়া দর করে—ও মাঝি, এই গোলপাতা একপটি কি দর ? তোমার এই ধানের নৌকো কোথাকার, ও মাঝি ? ঝালকাটির ? সে কোন্ দিকে, এখন থেকে কতদূর ?

পটু বলিল—অপু-দা, ১৫ তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি, একটু বেড়িয়ে আসি চল।

দু'জনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট-ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠাণ্ডা আর্দ্রগন্ধ উঠিতেছে, কলমী-শাকের নামে জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাকের তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙ-শালিকের দল কলবব করিতেছে, পডস্ত বেলায় পূর্ব আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘভূপ।

পটু বলিল—অপু-দা একটা গান কর না ? সেই গানটা সেদিনের।

অপু বলিল—সেটা নয় ! বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভাল গানের। সেইটে গাইবো, আর-এটু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েছে—এখানে না।

—ভূই ভারি লাজুক অপু-দা। কোথায় লোক রয়েছে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—দর, ধবু সেইটে।

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। পটু বাশের চটায় বৈঠকখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুই-এ চূপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে ; নৌকা বাহিব্যার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড় বাকের দিকে চলে। অপূর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল ! অপু এবার বাহিতেছিল। নৌকা কম দূরে আসে নাই—লা-ভাঙার বাকটা নজরে পড়িতেছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ পটু ঈশানকোনের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ও অপু-দা, কি রকম মেঘ উঠেছে দেখচিস ? এখনি ঝড় এলো ব'লে—নৌকো ফেরাবি ?

অপু বলিল—হোকগে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে গান গাইতে লাগে ভালো, চল আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাথবপুয়ের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সার্বা আকাশ ভরিয়া ফেলিল ; তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া

ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। অনেক দূরে সৌ সৌ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখীর কলরব শোনা গেল, ঠাণ্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল, পাখাওয়ালা আকাশের বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাব্‌লা ও বড় বড় ছাতিয় গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, শাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘ সারি বাধিয়া উড়িয়া পালাইল। অপূর্ব বৃক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কৌচাচ কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মত উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল।

পটু বলিল—বড় মুখোড় বাতাস অপূ-দা, সামনে আর নোকা যাবে না। কিন্তু যদি উটে যায় ? ভাগিস্ হুনীলকে সঙ্গে করে আনি নি।

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না—মনও ছিল না। সে নোকার গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে সমুখের ঝটিকাস্কন্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চারিধারে কালো নদীর নর্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের-রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিহুকের তৃপ্তলা, স্রোতে ভাসমান কচুরীপানার দাম সব যেন মুছিয়া যায় ! নিজেকে সে ‘বঙ্গবাসী’ কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে ! কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে ; বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া সমুদ্র মাঝের কত অজানা দ্বীপ প্যর হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্রামন্তন্দর নারিকেলবন-লী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূর চক্রবালে রাখিয়া, সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে !—চলিয়াছে !—চলিয়াছে !

এই ইচ্ছামতীর জলের মতই কালো, গভীর, স্কন্ধ, দূরের সে অদেখা সমুদ্রবন্ধ, এই বকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও। সেখানে এইরকম সন্ধ্যায় গাছতলায় বসিয়া এডেন বন্দরে সেই বিলতি-যাত্রী লোকটির মত সে রূপদী আরবী মেয়ের হাত হইতে এক গ্রাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে। চালতেপোতার বাকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজের বর্ণিত জাহাজের পিছনের সেই উড়নশীল জলচর পক্ষীর ঝাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যেন !

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্য-যাত্রা করিবে, বড় সদাগর হইবে, অনবরত, দেশে-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে ; চীন-সমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই ঘন-মাতানো কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বিষয় ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুবু-ডুবু হইলে ‘আমার অপূর্ব ভ্রমণ’ পঠিত নাবিকদের সেও জালিবোটে কবিতা ডুবো-পাহাড়ের গায়ে-লাগা গুল্মী শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকুল দরিদ্রায়

পাড়ি দিবে! ওই যে মাধবপুর গ্রামে বাঁশবনের মাধব তুঁতে বং-এর মেঘের পাহাড় থানিকটা আগে ঝুঁকিয়াছিল—ওরই ওপারে সেই সব নীলসমুদ্র, অজানা বেলাভূমি নারিকেলকুণ্ড, আগ্নেয়গিরি, তুষারাস্তীর্ণ প্রান্তর, জ্বলন্তা, সরষু, গ্রেস ডালিং জুটফেন, পাঁচচিল-পাখির ডিম-আহরণরতা সেই সব স্তম্ভী ইংরাজ বালক-বালিকা, মোনা-করা যাতকর বটগাছ, নির্জন-প্রান্তরে চিন্তারতা সোপানের সেই নীলনয়না পল্লীবালা ছোয়ান—আরও কত কি আছে। তাহার টিনের বাস্কটের বই কথানা, রাণু-দিদির বাড়ীর বইগুলি, স্বরেশদাদার কাছে চাহিয়া লওয়া বইখানা, পুরাতন ‘বঙ্গবাসী’ কাগজগুণা ওই সব দেশের কথাই তাহাকে বলে, সে সব দেশ কোথায় কাহারো যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেখান হইতে তাহাবও ডাক আসিবে একদিন,—সেও যাইবে।

একথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে। আর দিনকতক পরে বাড়ী-বাড়ী ঠাকুর পূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্যন্ত সে ইষ্টুলের মুখ দেখিল না ভাল কাপড়, ভাল জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অসহায় মহায়ম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে?

এ সব প্রশ্ন মনে জাগিলে হয়ত তাহার তরুণ-কল্পনার স্বপ্নবেগ—তাহার আশাভরা জীবন-পথের দুর্বীর মোহ, সকল সংশয়কে জয় করিতে পারিত, কিন্তু এ সকল কথা তাহার মনে ওঠে না। শুধু মনে হয়—বড় হইলেই সব হইবে অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে এখন শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র। সে বড় হইলে সুযোগ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহাব মাদব আমন্ত্রণ আসিবে,—সে জগৎ জানার, মাতৃদেহনার স্বিগ্নিজরে যাইবে।

বড়ী ভবিষ্যৎ স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকী পঞ্চটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলাব ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে, নৌকা বাধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসে শিশু দিতে দিতে বাড়ীর দিকে চলে। সে-ও তাহার মা ও দিদির মত স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।

পথের পাঁচালী

সম্ভাবিত পরিস্ফুট

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়াছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া রাত্রি মায়ের সঙ্গে বাবার যেসব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহার এদেশের বাস উঠাইয়া কালী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কালীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়সে

সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সম্ভা। তাহার মা আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই,—দুঃখ এদেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুটিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।

গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ীতে সর্বজয়ার পূজা মানত ছিল। ক্রোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায়—এইজন্ত এ পর্যন্ত মানত শোধ হয় নাই। এবার এদেশ হইতে যাইবার পূর্বে পূজা দিয়া যাওয়া দরকার, কিন্তু খুঁজিয়া লোক মিলিল না। অণু বলিল—সে পূজা দিয়া আসিবে, ও ঐ গ্রামে তাহার শিমিমা থাকেন, তাহার সহিত কখনও দেখাশোনা হয় নাই, অগ্নি দেখা করিয়া আসিবে। তাহার মা বলিল—যাঃ, বকিস নে তুই, একলা যাবি বে কি ? এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ পথ।

অণু মায়ের সঙ্গে তর্ক শুরু করিল—আমি বুঝি সর্বাঙ্গিনী এইবকম বাড়ীতে বসে থাকবো ? যেতে পারবো না কোথাও বুঝি ? আমার বুঝি চোখ নেই, কান নেই, পা নেই ?

—সব আছে। উনি একলা যাবেন সেই গঙ্গানন্দপুর—বড় সাহসী পুরুষ কিনা।

অবশেষে কিছু অপূর নির্বন্ধাতিশয়ো তাহাকেই পাঠাইতে হইল।

সোনাডাঙা মাঠের বুক চিরিয়া উঁচু মাটির পথ। পথের দু'ধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দফুলের বন, দীর্ঘ, শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভাণ্ডে নত হইয়া দুর্বাঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পথে কোনো লোক নাই, দুপুরের অগ্নিই দেবী আছে, গাছপালাব ছায়া ছোট হইয়া আসিতেছে। অপূর খালি পায়ে বেলে-মাটির তাত লাগিতেছিল—তাহাতে বেশ আরাম হয়। পথের ধারে বনে ঝোপে কত কি ফুল ফুটিয়াছে, সাঁই-বাবলাগাছের নতুন ফোটা ফুলের শীষ সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে ছোট এক বকমের গাছে রাঙা রাঙা বন-ডুমুরের মত কি ফল অজস্র পাকিয়া টুকটুক করিতেছে, মাটির মধ্য হইতে কেমন রোদ পড়ে সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে। সে মাঝে মাঝে নীচু হইয়া ঝোপের ভিতর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈচিক্য তুলিয়া দাতে-সেলাই-করা রাঙা মাটিনের জামাটায় ঢ'পকেট ভর্তি করিয়া লইতেছিল।

যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না যে, সে কী ভালবাসে এই মাটির তাজা রোদপোড়া গন্ধটা, এই ছায়াভরা দুর্বাঘাস, সূর্যের আলো-মাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখী, বনঝোপ, ঐ দোলানো ফুল-ফলের ঝোলো, আলকুশী, বনকলমী, নীল অপরাঞ্জিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না, তারি মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে—খোকা, তুমি শুধু পথে-পথে বেড়িয়ে বেড়াও—তাহা

হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন-ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুট হাঁটে—শুধুই হাঁটে। মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশবনে কক্ষির ডালে ডালে শব্দ-শব্দ শব্দ, বৈকালের যোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রঙ-বেরঙ-এর পাখীর গান।

অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। এক ঋতু কাটিয়া গিয়া কখন অল্প ঋতু পড়ে—গাছপালায়, আকাশে বাতাসে, পাখীর কাকলীতে তাহার বার্তা বটে। ঋতুতে ঋতুতে ইচ্ছামতীর নব নব পরিবর্তনশীল রূপ সঙ্গক্ষে তাহার চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—কোন ঋতু গাছপালায় জলে-স্থলে শূন্য ফলে ফলে কি পরিবর্তন ঘটায়, তাহা সে ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদেব সহিত এই ঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালবাসে, ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না! এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপরে রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল। গ্রীষ্মের খরতাপ ও শুমটের অবসানে সারা দিক্‌চক্রবাল জুড়িয়া ঘননীল-মেঘসজ্জার গম্ভীর সুন্দর রূপ, অস্তবেলায় সোনা-ডাণ্ডার মাঠের উপরকার আকাশে কত বর্ণের মেঘের খেলা, ভাদের শেষে ফুটন্ত কান্দ-ফুলে ভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদনি রাতে জ্যোৎস্নাজ্বালার খুপ-রি-কাটা বাঁশবনের তলা,—অপুর ফুটনোমুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল। অপু কখনো জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিরজীবন সৌন্দর্যের পূজারী হইবার যে ব্রত, নিজের অলঙ্কিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করাইতেছিলেন।...

অতিভাঙ্গার বাঁওড়ে কাহারো মাছ ধরিতেছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। গ্রামের মধ্যে একটা কানা ভিথারী একতারা বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে—ও গান তো অপু জানে—কতবার গাহিয়াছে :—

‘দিন-দুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহানো হোল ভার।’

বোষ্টম-দাত গান খুব ভাল পায়।

হরিশপুরের মধ্যে চুকিয়া পথের ধারে একটা ছোট্ট চালাঘরে পাঠশালা বসিয়াছে, ছেলেরা হর করিয়া নাম্তা পড়িতেছে, সে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। গুরুমশায়ের বয়স বেশী নয়, তাহাদের গায়ে প্রশঙ্গ গুরুমশায়ের চেয়ে অনেক কম।

আর এক কথা তাহার বার বার মনে হইতেছিল। এইতো সে বড় হইয়াছে। আর ছোট নাই, ছোট থাকিলে কি আর মা একা কোথাও ছাড়িয়া দিত?... এখন কেবলই চলা, কেবলই সামনে আগাইয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া, আসচে মামের এই দিনটিতে তাহার কতদূরে, কোথায় চলিয়া যাইবে! কোথায় সেই কালী—সেখানে।

বৈকালের দিকে গঙ্গানন্দপুরে গিয়া পৌঁছিল। পাড়ার মধ্যে পৌঁছিতেই কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে এমন পাইয়া বলিল যে, সে কোনো দিকে চাহিতেই পারিল না। কায়ক্লেশে সমুখের পথে দৃষ্টি রাখিয়া কোনরকমে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সকলেই তাহার দিকে চাহিতেছে। সে যে আজ আসিবে তাহা যেন সকলেই জানে, হয়তো ইহারা এতক্ষণ মনে মনে বলিতেছে—এই সেই যাচ্ছে, ঝাথ্ ঝাথ্ চেয়ে। সে যে পুঁটুলির ভিতর বাধিয়া নারিকেল-নাড়ু লইয়া যাইতেছে, তাহাও যেন সকলে জানে। তাহার পিসেমশাই কুঞ্জ চক্রবর্তীর বাড়ীটা কোন্‌দিকে একথাটা পর্যন্ত সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অবশেষে এক বুড়ীকে নির্জনে পাইয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করাতে সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। বাড়ীটার সামনে পাঁচিল-ঘেরা। উঠানে ঢুকিয়া সে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। 'ত' একবার কাসিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় সাধা কি ? কতক্ষণ সে চৈতন্যমাসের খরষোঁড়ে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিত ঠিকানা নাই, কিন্তু খানিকটা পরে একজন আঠারো উনিশ বছরের শ্রামবর্ণ মেয়ে কি কাজে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই দেখিল—দরজার কাছে কাতাদের একটি অপরিচিত, শ্রিয়দর্শন বালক পুঁটুলী হাতে লজ্জাকুণ্ডিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি বিস্মিতভাবে বলিল—তুমি কে থোকা ? কোথেকে আসচো ?—অপু আনাড়ির মত আগাইয়া আসিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—এই আমার বাড়ী—নিশ্চিন্দপুরে, আমার—নাম অ-পু।

তাহার মনে হইতেছিল—না আসিলেই ভাল হইত। হয়তো তাহার পিসিম তাহার একপ অপ্রত্যাশিত আগমনে বিরক্ত হইবে, হয়তো ভাবিবে কোথা হইতে আবার এক আপদ আসিয়া ছুটিল !... তাহা ছাড়া,—কে জানিত আগে যে অপরিচিত স্থানে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া এত কঠিন কাজ ? তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়েটি তখনই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মহা-আদরে রোয়াকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার মা-বাবা কেমন আছেন সে কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চিবুকে হাত দিয়া কত আদরের কথা বলিল। দ্বিধিকে যদিও কখনও দেখে নাই তবুও দ্বিধির নাম করিয়া খুব দুঃখ করিল। নিজের হাতে তাহার গায়ের জামা খুলিয়া, হাতমুখ ধোয়াইয়া শুকনা গামছা দিয়া মুছাইয়া তাড়াতাড়ি এক গ্লাস চিনির সরবৎ করিয়া আনিল। পিসি বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, অল্প বয়স—রাজীর দ্বিধির চেয়ে একটু বড়।

তাহার পিসিও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। জ্ঞাতিসম্পর্কে ভাইপোটি যে দেখিতে এত স্বন্দর বা তাহার বয়স এত কম তাহার পিসি বোধহয় ইতিপূর্বে জানিত না। তাই পাশের বাড়ী হইতে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া অপূর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে একটু গর্বের সহিত বলিল—আমার ভাইপো,

নিশিদিপুয়ে বাড়ী, খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে, সম্পর্কে খুবই আশন, তবে আলা যাওয়া নেই তাই।...পরে সে পুনরায় গর্বের চোখে অপূর দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবটা এট—ত্যাখো আমার ভাইপোর কেমন রাজপুত্রের মত চেহার', এখন বোঝ কি দরের—কি বংশের মেয়ে আমি।

সন্ধ্যার পর কল্প চক্রবর্তী বাড়ী আসিল। পাক্‌শিটে-মারা চোখাড়ে-চোখাড়ে চেতারা বয়স বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পিসিকে দেখিয়া তাহার যেমন লজ্জা হইয়াছিল, পিসেমশায়কে তেমনি তাহার ভয় হইল। ছেলেকে লোয় সে যে প্রশন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িত, তেমনি যেন চেহারাটা। মনে হইল এ লোক যেন এখনই বলিত পারে—বড্ড জ্যাঠা ছেলে দেখছি তো তুমি ?

পরদিন সকালে উঠিয়া অপূ পাড়ার পথে এদিক-ওদিকে একটু ঘুরিয়া আসিল। চারিদিক জঙ্গলে ভরা, ফাঁকা জমি—দুর্বাধাস প্রায় নাই, এমন জঙ্গল। এই একটা বাড়ী, আবার বনে-ঘেরা হুঁড়ি পথ বাহিয়া গিয়া আবার দূরে একটা বাড়ী। অনেক সময় লোকের বাড়ীর উঠানেও উপর দিয়া পথ। তাহার বয়সী চ'চারজনকে খেলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু সকলেই তাহার দিকে মন না করিয়া চাহিয়া রহিল যে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পিসির বাড়ীর দিকে ফিরিবার সময়ও বিপদ। একরূপ সকালে কার কাছে সে চিঁড়া মুড়ি, নাড়ু বা বাসি-ভাত খাইয়া থাকে। এখানে কি উঠারা দিবে ? কাল তো রাত্রে ভাত খাইবার সময় ভুধের সঙ্গে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে। আজ যদি সে এখনই ফিরে, তবে হয়তো উঠারা ভাবিবে ছেলেটা ভারি পেটুক ; খাবার খাইবার লোভে-লোভে এত সকালে বাড়ী ফিরিল। বোজ বোজ খাবার খাওয়া কি ভাল ? এখন সে কি করে ? নাঃ, বাড়ী ফিরিবে না। আরও খানিক পথে-পথে ফিরিয়া একেবারে সেই ভাত খাওয়ার সময়ের একটু আগে বাড়ী যাইবে। অপরিচিত জায়গায় এতক্ষণ পথেই বা কোথায় দাঁড়াইয়া থাকে।

পায়ে পায়ে সে অবশেষে বাড়ীতেই আসিয়া পৌঁছিল।

একটি ছয় গাত বছরের মেয়ে একটা কামার বাটি হাতে বাড়ী ঢুকিয়া উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—নাউ রেঁধেচো জোঠিয়া, মোরে একটু দেবে ? অপূর পিসিমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল—কে রে, গুল্‌কী ? না ওবেল' বাধবো, এসে নিয়ে যাস্। গুল্‌কী বাটি নামাইয়া বোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, ছেলেদের চুলের মতো খাটো। ময়লা কাপড় পরণে, মাথায় তেল নাই, বং শ্যামবর্ণ। অপূর দিকে চাহিয়া, কি বুঝিয়া একবার ফিক করিয়া হাসিয়া বাটি উঠাইয়া সে চলিয়া গেল।

অপূ জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটা কাদের পিসিমা ?

তাহার পিসি বলিল—কে, গুল্‌কী ? ওদের বাড়ী এখানে না—ওর মা-বাপ কেউ কোথাও নেই। নিবারণ মুখ্যোয় বউ—এই যে পাশের বাড়ী, ওর দূর সম্পর্কের জেঠী—সেখানেই থাকে।

পরদিন পাড়ার একটা ছেলে আসিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিল ও
সঙ্গে করিয়া গ্রামের সকল পাড়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া বেড়াইল। বাড়ী ফিদিবার
পথে দেখিল—সেই অনাথা মেয়ে গুল্কী পথের ধারে পা চড়াইয়া একলাটি
বসিয়া কি খাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিলে কড়াইতে গেল—
আসিলে একরাশ আধপাকা বকুল গেল। অপু ইতিমধ্যে পিসিয়া কাচে গেল
আর চৈয় লইয়াছে, নিবারণ মুখযোব বো ভাল ব্যবহার করবে। লোক
ভাল নয়—পিসিয়া বসিবেছিল—জোটা তোনয় বগচণ্ডী, কখনো খোতও
দেয় না, এর ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়। নিজের পুস্তিই মাংগণ—আমদই
জোটে না, তার আবার পর। গুল্কীকে দেখিয়া অপু মোটেই লজ্জা হয় না।
—হাট এতটুকু মেঘেটা, আহা কেহ নাই। তাহার সঙ্গে ভাব করিলে অপু
বড় হচ্ছা হইল। সে কাছে গিয়া বলিল—আসলে কি লুক্কিস দেখি থুকী?
গুল্কী হঠাৎ আসল গুটাইয়া লইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া নীচু হইয়া পোড দিল।
তাহার কাণ্ড দেখিয়া অপু হাসি পাইল। ছুটিবার সময় গুল্কীর আসনের
বকুল পড়িতে পড়িতে চলিয়াছিল, সেগুলি সে কড়াইতে কড়াইতে বসি
প'ড়ে গেল, সব প'ড়ে গেল, নিয়ে যা তোর বকুল ও থুকী, কিছু পোলবে না ও
থুকী। গুল্কী ততকণে উধাও হইয়াছে।

পূর্বে স্নান সারিয়া আসিয়া সে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল
খিডকী-দরজার আডাল হইতে গুল্কী একবার একটুখানি দিয়া উকি
মাড়িছে আর একবার মুখ লুকাইতেছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ
হইয়া গুল্কী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—
দাঁড় তোকে ধরছি এক দৌড়ে—বলিয়া সে খিডকী দরজার দিকে ছুটিল।
গুল্কী আর পিছন দিকে না চাহিয়া পথ বাহিয়া সোজা পুকুরপ'ড়ে দিক ছুট
দিল কিন্তু অপু সঙ্গে পারিবে কেন? নিরুপায় দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই
অপু তাহার কাঁকড়া চুলগুলি মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বড় ছুট দিচ্ছিলি
যে? আমার সঙ্গে ছুটে বুঝি তুই পারবি, থুকী? গুল্কীর প্রথমটা ভয়
হইয়াছিল বুঝি বা তাহাকে মারিবে। কিন্তু অপু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া
জানিয়া ফেলায়, সে বুঝিল এ একটা খেলা। সে আবার সেই বকম হাসিয়া
ফেলিল।

অপু বড় দয়া হইল। তাহার মুখের হাসিতে এমন একটা আভাস ছিল
যাহাতে অপু মনে হইল এ তাহার সঙ্গে ভাব করিতে চায়—খেলা করিতে চায়,
কিন্তু ছেলেমানুষ কথা কহিতে জানে না বলিয়া এইরকম উকিমুঁকি মারিয়া—
ফিক করিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া—তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অল্প
টপস্বয় ইহার জানা নাই। এ যেন ঠিক তাহার দিদি। এই বয়সে দিদি যেন
এই রকমই ছিল—এই রকম আসলে কুল-বেল-বৈচি বাধিয়া আপন মনে ঘুরিয়া
বেড়াইত, কেহ বুঝিত না, কেহ দেখিত না, এই রকম পেটুক—এই রকম
বুদ্ধিহীন ছোট মেয়ে!

অপু ভাবিল—এর সঙ্গে খেলা করে না, একে নিয়ে একটু খেলি ! আহা, মা-বাপ-ভাড়া ছুঁখী মেয়ে, আপন মনে বেড়ায় !—সে গুল্কীর চুলের মূঠা ছাড়িয়া দিয়া তাৎ পরিয়াছিল, বলিল—খেলা করবি খুকী ? চল ঐ পুকুরের পাড়ে । না, এক কাজ কর খুকী, আমি তোকে ধরবো—আর তুই ছুটে যাবি ; ঐ কাঁটালগাছটা বুড়ী । আয়—

মূঠা ছাড়িয়া দিওই গুল্কী আর না দাঁড়াইয়া আবার নীচু হইয়া দৌড় দিল । অপু চোঁচাইয়া বলিল—‘আচ্ছা যা, যা’ দেখি কদরূর যাবি—ঠিক তোকে ধরবো দেখিস । আচ্ছা, ঐ গেলি তো এত দ্রুত—বলিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সে এক দৌড় দিল—চু উ-উ-উ-উ । গুল্কী পিছন দিকে চাহিয়া অপুকে দৌড়িতে দেখিয়া প্রাণপণে যতটুকু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে কলায় দৌড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু অপু একটুখানি ছুটিয়া গিয়াই তাহাকে পরিয়া কেলিল । তারি ছুটে শিথিলি খুকী, না ? তা-কি তুই আমার সঙ্গে পারিস । চল চোর চৌকীদার খেলা করবি—তুই হবি চোর—এই কাঁটাল পাতা চুরি করে পালাবি, বুঝি ?—আব আমি হবো চৌকীদার, তোকে ধরবো ।

গুল্কীর মুখে হাসি আর দ্বিভাবিত ছিল না—হয়তো সে অতক্ষণ মনে মনে চাহিতেছিল এই স্তম্ভর ছেলেটির সঙ্গে ভাব করিতে । মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিবার স্ববে বলিল—কাঁইবিচি নেবে ? অপু মনে ভাবিল চাষার গ্রামে থাকিয়া ও এইসব কথা শিখিয়াছে—তাহাদের গ্রামে যেমন গোয়ালি কি সঙ্গোপের ছেলেমেয়েরা কথা বলে নেননি ।

তৎপরেলা তাহার পিসিমা ডাকিলে পিছনে গুল্কী আসিল । অপুও থাওয়া হইয়া গেল তাহার পিসি জিজ্ঞাসা করিল—ভাত খাবি গুল্কী ? অপুও পাতে বোস—খোঁচাব ঘণ্ট আছে—ভাল দিচ্ছি । অপু ভাবিল—‘না, ও খাবে জানলে তু’খানা মাছ ওর জন্মে দেখে দিতাম । গুল্কী স্বিকৃতি না করিয়া নির্লজ্জভাবে খাড়াই বসিল । অনেকগুলি ভাত চাহিয়া লইয়া ভাল দিয়া সেগুলি মাখিল, পরে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অত ভাত না খাইতে পারিয়া পাতের পাশে রাশী-রুত মেলিয়া রাখিল । ‘বুও উঠিবার নাম কবে না । অপুও পিসিমা হাসিয়া বলিল—আর খেতে হবে না গুল্কী—হাস ফাস্ কচ্চিস্—নে ওঠ, কত ভাত নিয়ে ফেলি ছাখতো ? তোর কেবল দৃষ্টি-খিদে—পরে বলিল, জোঠিয়ার কাণ্ড ছাখো—এতখানি বেলা হয়েছে—কাঁচা খেয়েটা—ভাত খেতে ডাকেও না ?—হলোই বা পর—তা হলেও কচি তো ?

শনিবারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অপু পূজা দিতে গেল । আচার্য্য ঠাকুরের খুব লম্বা সাদা দাড়ি বৃকের ওপর পড়িয়াছে, বেশ চেহারা । তাহার বিধবা মেয়ে বাপের সঙ্গে সঙ্গে আসে, পূজার আয়োজন করিয়া দেয়, বৃদ্ধ বাপকে খুব সন্তাষা করে । মেয়েটি বলিল, চার পয়সা দক্ষিণে কেন থোকা ? এতে তো হবে না, বাবের পূজোতে ছু’আনা দক্ষিণে লাগবে । অপু বলিল—আমার মা যে চার পয়সা দিয়েচে মোটে, আর তো আমার কাছে নেই ? মেয়েটি খানকতক

কলা মূলা বাছিয়া একখানা পাভায় বড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—ঠাকুরের
প্রসাদ এতে বৈল, বেলপাতা আর মিন্চর ও ছিল। তোমাদের বাড়ীর মেয়েদের
ও। অপু ভাবিল—বেশ লোক এরা, আমার যদি পরসী থাকতো আরও
স্নান দিতাম—

পরিমার বাড়ীতে এসে বসে বসে বসে বসে জোয়ারের আলোতে বসে
পরিমার সঙ্গে পূর্বের গল্প করিতেছে, পূর্বের গল্পকীর্তনের বাড়ীতে এসে গুল্কীর
সঙ্গে গুল্কীর অকস্মিক চোঁকান শোনা গেল—ওরে জোঁটা, অমন ক'রে
মেয়ের নাম—ওরে ব'য়ে—ও জোঁটা মোর পিঠি কেটে মন্ত পড়বে—মো
জোঁটা—সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলায় শোনা গেল—হাবামজাদী—বনমায়ের
চৌধুরীদের বাড়ী গিয়েচো নেমুন খেতে, এমনি তোমার নোনা? তোমার
নোনায় যদি আজ হাত পুড়িয়ে ছেঁকা না দিই—লোকের বাড়ী খেয়ে বেয়ে
বেড়াবে আর শতেক কোয়ারীর চে খের মাথা খেয়ে দেখতে পা'য় না, বলাক
খেতে দেয় না—আপদ বানাই কোথাকার—বাড়ীতে তোমায় খেতে দেয় না?
তোমায় আজ—

অপুর পরিমার বলিল—দেখো, মেন দিয়ে কথ' শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে?
সত্যি কথা বললেই লোকের সঙ্গে আর ভাব থাকে না—তা হলেই তুমি খাশপ—
অপুর মনটা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। মেয়ের জন্যে গলা অ'ড় হ'ও'র
দরুন কোন কথা মুখ দিয়া বাতির হইল না।

পরদিন সকালের কিছু আগে আতাপাদি সারিয়া অপু গেলেন পাভার দিকে
চলিল। আগের দিন তাহার পিসেমশায় ঠিক করিয়া দিয়াছে এ গ্রাম হইতে
নবাবগঞ্জে তামাক বোঝাই গাড়ী যাহবে, সেই গাড়ীতে উঠিয়া সকালের সময়
রওনা হইলে সকালের দিকে নিশ্চিন্দপুরের পথে তাহাকে উহার নামাহয়
দিবে।

অল্পদূর গিয়া বামুনপাড়ার পথের মোড়ে গুল্কীর সঙ্গে দেখা। সে সকাল
খেলা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। অপু বলিল—বাড়ী চলে যাচ্ছি রে থুকাঁ আজ
—সারাদিন ছিল কোথায়? খেলতে এলিনে, কিছু না—। পরে গুল্কী
অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া বলিল—সত্যি, সত্যি বলছি, এই জাগ
পুঁটলী, কার্তিক গোয়ালার বাড়ী গিয়ে গাড়ী উঠবো—আয় না আমার সঙ্গে,
এগিয়ে দিবি?

গুল্কী পিছনে পিছনে অনেকদূর চলিল। পাভা চাড়িয়া থানিকটা
ফাকা মাঠ। তাহার পরেই গোয়ালপাড়া। গুল্কী মতর ধার পর্যন্ত আসিল।
অপুর বাড়ী মাটির জামাটার দিকে আঁতুল দেখাইয়া কহিল—তোমায় এই
আজ জামাটা ক'পরসী?

অপু হাসিমুখে বলিল—দু'টাকা—তুই নিবি? গুল্কী ফিক করিয়া হাসিল।
অর্থাৎ—তুমি যদি দাও, এখনি।

হঠাৎ সামনের পথে চোখ কিরাইতেই দেখিতে পাইল, মাঠের শেষে পাছ-

পালার ফাঁকে আলো হইয়া উঠিয়াছে—অরনি কেমন করিয়া তাহার মনে হইল আগামী মাসের এমন দিনটাতে তাহারা কোথায়, কতদূরে চলিয়া যাইবে! পরে গুলকীকে বলিল—আর আসিস্ নে খুকী, তুই চলে যা—অনেকদূরে এসে গিইচিস—তোরা বাড়ীতে হয়তো আবার বকবে—চলে যা খুকী—আবার এলে দেখা হবে, কেমন তো? হয়তো আর আসবো না, আমরা কালী চলে যাবে বোশেখ মাসে, সেখানে বাস করবো—।

গুলকী একবার ফিক্ করিয়া হাসিল।

৩০. পূর্ণিমা কি চতুর্দশী এমন একটা দিদি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাট, কিন্তু বাল্যের এই একা প্রথম বিদেশ-গমন-সম্পর্কিত একটা ছবি অনেকদিন পর্যন্ত তাহার মনে ছিল—সোজা মাঠের পথের দূর-প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, (বা চতুর্দশীর চন্দ্র, তাহার ঠিক মনে ছিল না। পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতি, অনাথা অবোধ, কাঁকড়াচুল ছোট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

পথের পাঁচালী

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের প্রথম হরিহর নিশিদ্দিপুব হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিষপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠাল-কাঠের বড় তরুণাশ, মিল্ক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খবিতান আসিয়া সস্তাদবে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুকন্নিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশিদ্দিপুরে দুই ও মংস্ত যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসাৰ চলে, সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্ত্রীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবাতার পর বলিলেন—বাপু আছেই বা কি দেশে যে থাকতে বোলবো—তাছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাকো কোনো কাজেব নয়, এ আমি নিজেই দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেয়ে আসবো, যদি ভগবান দিন দেন—

রাণী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ী আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁবে অপু তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি বাণুদি, জিজ্ঞেস করো মাকে—

তবুও রাণী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণী অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল, কবে যাবি রে?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবার—

—আমিহি নে আর কখনো ?

রাণীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল. বলিল—তুই যে বলিস্ নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি ক'রে ?

অপু বলিল—আমি কি করবো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা ? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে ? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো রাগুদি, বড় হোলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রাণী বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও শেষ করে দিলি নে. খাতায় নাম মইও কোরে দিলিনে. তুই বেশ ছেলে তো অপু ?

চোখের জল চাপিয়া রাণী দ্রুতপদে বাটির বাহির হইয়া গেল। অপু বুকিতে পারে না রাগুদি মিছামিছি কেন রাগ করে। সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে ?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। স্নানমুখে বলিল—তোর জন্মে নিজে জলে নেবে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট কাটলাম, একদিন মাছ ধরবিনে তাতে ?

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপুঞ্জা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিনের পরে পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব, অসংযত আনন্দে অপুও বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এ সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোন ক্রটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ী মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজ-কাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ীর সেট দো-চালা ঘরখানা। অনেক লোক জড়ো হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনী'র ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল—তখন সে ছোট ছিল—এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরী বুড়ী ডাইনী নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—গ্রীব, অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না. থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে ঘরিয়া পড়িয়া থাকিত ? সংকাদের লোক হয় না ? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাতিরে আনিয়া ঢালিল এক হাঁড়ি শুকনা আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ী আমসি আমচুর তৈয়ারী করিয়া দিত ও তাহা হাতে হাতে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কাবণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আমসি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাকা ঠেকিতে লাগিল। আর-বছরও চড়কের

বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সতিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পরমা দেবো অপু, একথানা শীতাহরণের পট দেখিস। দিদি মেলায় পাস? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পান্সে পুতুপুতু পট তাই তোর কিনে হবে, আমি পারবো না, যা—কেন রাম-রাবণের যুদ্ধ একথানা কেন না? তাহার দিদি বলিল—তোরা কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ—তোরা যা কাও। কেন ঠাকুর দেবতার পট বুঝি ভাল হোল না? দিদির শিল্পভুক্তিতির উপর অপু কোন কালেই অন্ধা ছিল না।

তাছাড়া বেড়ার গায়ে রাংচিটা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে তাহার মুখ মনে পড়ে পাখার ডাকে মগফোটা গুডকল্মীর ফুলের তুলনিত—দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর। আর কখনো, কখনো সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না।

মেলায় গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশি বাজাইতেছে। নতুন স্বর তাহার বড় ভাল লাগে—খুঁজিয়া বাহির করিল মালপাড়ার হারাণ মাল এক বাঁশল বাঁশের বাঁশি চাঁচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন-স্বরূপ একটি বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপু জিজ্ঞাসা করিল—একটা ক'পরমা? হারাণ মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা নাকি শোন্‌লাম খোকা গাঁ ছেড়ে চলে? তা কোথায় যাচ্—হ্যাগা? অপু দেউ পরমা দিয়া সফ্র বাঁশের বাঁশি একটা কিনিল। বলিল, কোন্‌ কোন্‌ ফুটোতে আঙ্গুল টেপো হারাণ কাকা? একবার দেখিয়ে দাও দিকি।

মনে আছে একবার অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সে খানিকক্ষণ জাগিয়া ছিল। দূর নদীতে অন্ধকার রাত্রে জেলেদের আলোয় মাছধরা দোনা-জালের একঘেয়ে একটান ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। এমন সময় তাহার কানে গেল অনেক দূরে যেন কুসীর মাঠের পথের দিকে অত রাত্রে কে খোলা গলায় গান গাহিয়া পথ চলিয়াছে। কুসীর মাঠের পথে বেশী রাত্রে বড় একটা কেহ হাঁটে না তবুও আশ্চর্য্যে কতদিন যে নিশাথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় অচেনা পথিক-কণ্ঠে মধুকানের পদ ভাঙা গানের শব্দকে দর হহতে দরে মিলাহয়া যাইতে শুনিয়াছে—কিন্তু সে বার যা শুনিয়াছিল তাহা একেবারে নতুন। স্বরটা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই—আশ জাগরণের ঘোরে স্বধমামণী স্থলস্মী দুই ঘূমের মাঝখানের পথ বাহিয়া কোথায় অগুহিত হইয়াছিলেন, কোনোদিন আর তাহার সন্ধান মিলে নাই—কিন্তু অপু কি তাহা কোনোদিন ভুলিবে?

চড়ক দেখিয়া নানা গাঁয়ের চাষাদের ছেলেমেয়েরা বড়িন কাপড় জামা, কেউ বা নতুন কোরা শাড়ী পরণে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেবা বাঁশি

বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার পাঁচ জোশ নর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখী, কাঠের পুতুল, রঙিন কাগজের পাখা রং করা হাঁড়ি, ছোঁবা—সকলেরই হাতে কোনো না কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনি-ফুলুরী দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু হুঁপসার তেলে-ভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহাণা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আব চডকের মেলা দেখিতে পাইবে না। মনে ভাবিল—সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বোলবো, আমি মেলা দেখবো বাবা, নিশ্চিন্দপুর চল যাই—না হয় দু'দিন এসে খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে যাবো?

চডকের পরদিন জিনিসপত্র বাধাছাদা হইতে লাগিল। কাল হুপুরে আহাৱাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জোঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিকচিক করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপু মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্ন বিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের স্রুটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়ী ঘর, ওই বাগ্গবন, সলুতে-খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুই ভাতি করার ওই জায়গাটা—এ সব সে কত ভালবাসে। ওই অন্ন নারিকেলের গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়। স্বমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্না-করা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাতে দিদির সঙ্গে সে দশপঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দপুর। যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নোকা বাহিতে পারিবে, বেল বেল খেলিতে পারিবে, কদমতলার স্নায়ের ঘাটের মত ঘাট কি সে দেশে আছে? রাগুদি আছে? সোনাতাড়ার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

হুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীকান্তের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহাৱাদি সান্নিধ্য ঘূমাইতেছে, অপু ঘরের মধ্যে থাকের উপরিহিত জিনিসপত্র কি লওয়া

সাইতে পারে না পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। উচু তাকের উপর একটা কলসী সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা কি জিনিস গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। ধূনা ও মাকড়সার বুল মাথা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

সেই ছোট সোনার কোটাটা, আর বছর যেটা সেম্বঠাকুরুণদের বাড়ী হইতে চুরি গিয়াছিল।

দুপুরে কেহ বাড়ী নাই, কোটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্তর্যমনস্তাবে দাঁড়াইয়া—তিল, বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শব্দ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মত কানে আসে। আপন মনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি ক'রে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল।

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিডকী দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রোজে কিমাইতেছে, সেই শব্দটিলা কোন্ গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, ঈশপায়ন হ্রদ লুকায়িত প্রাচীন যুগের সেই পবাক্ষিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যাহ্নটা। একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কোটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার দিদি ভুলো কুকুরের ডাক দিলে যে ঘন বন-ঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাহার পাশে রাণীকৃত শুকনা বাঁশ ও পাতার রাশির মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল।

মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জানতে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কোটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন কি মাকেও না।

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হীক গাডোয়ানের গরুর গাড়ী রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ, প্রচুর বৈশাখী-মধ্যাহ্নের রোজ গাছে পালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ীর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপু দা, এবার বারোয়ারীতে ভাল যাজ্ঞদলের বায়না হয়েছে, তুই শুনতে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশী ক'রে নিবি, আমার পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠেব ধার দিয়া বাজা। মেলায় চিহ্ন-স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারো মাঠের একপাশে রাঁধিয়া থাইয়াছে, আঙুনে কালো মাটির টেলা ও একপাশে কালিমাথা নতুন হাড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চূপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার যেন কেমন

ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভাল চইল? কতদিনের শৈতনিক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধুমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও-বা মাটির প্রদীপ টিম্ টিম্ করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জ্ঞান নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ী হইতেছে আতুরী বুড়ীর সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ কবিতা সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর-বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী গিয়া একেবারে আষাঢ়, ঘাইবার বাধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজ্ঞান মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য যাকিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা।

ক্রমে যৌত্র পড়িল—গাড়ী তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্য দিয়া ঘাইতেছিল। হরিহর মাঠের মধ্যের একটা বড় বটগাছ দেখাইয়া কহিল—ওই জাখো, ঠাকুরঝি পুকুরের ঠাঙাড়ে বটগাছ। সর্বজ্ঞা তাড়াতাড়ি মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছটা চারিদিকে সুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে। সেই বৃক্ষ ব্রাহ্মণ ও তাহার বালকপুত্রের গল্প সে কতবার শুনিয়াছে। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহার শব্দের পূর্বপুরুষ এই বকম সন্ধ্যাবেলা ওই বটতলায় নিবীত ব্রাহ্মণ ও তাহার অবদান পুত্রকে অর্ধলোভে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পংশের ওই নাবাল জমি, যেটা সেকালের ঠাকুরঝি পুকুর ছিল—ওইখানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ছেলেটির মা হয় তো পুত্রের বাড়ী ফিরিবার আশায় কত মাস, কত বছর বৃথা অপেক্ষা করিত সে ছেলে আর ফিরে নাই—মাগো! সর্বজ্ঞার চোখ হঠাৎ জলে ঝাপসা হইয়া আসে, গলায় কি একটা আটকাইয়া যায়।

সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ, শিমূল বাবুল গাছ, খেজুর গাছে খেজুরের কাঁদি ফুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় ফুলিতেছে, চারিদিকে বৌ-কথা-কও পাণিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রং-এর মত গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না ঘন সবুজঘাসে মোড়া উঁচু নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা-বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটার শ্রামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদ্দাস বাউলের মত দূর হইতে দূরে আপন মনে বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মুখালির বিল পড়িল। কোন প্রাচীনকালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অস্বহিত নদীর বিশাল খাতটা যেন পদ্মফুল ভরা বিল। অপু পাকীতে বসিয়া মাঠ ও চারিদিকের অপূর্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে ঘাইতেছিল। বেলাশেষের স্বপ্নপটে আবার কত কি শৈশব কল্পনার আশা-বাগ্মণ! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে! এখন হয়তো কোথায় কতদূরে

চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে-সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব জীবন ।

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই হোল পঞ্চ-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওটখানে বন বিবির দরগা-তলায় জীবন মাসে ভারী যেনা হয়, এমন সস্তা কুমডো আর মেলে না ।

আষাঢ় বাজারের নীচে খেয়ায় বেত্রবতী পার হইবার সময় চাঁদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিক্ চিক্ করিতেছিল । আজ আষাঢ়ের হাট, কয়েকজন শাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানোকায় এপারে আসিতেছে । অপূদের গাড়ীস্বদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল । অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢ় বাজার দেখিতে নামিল । ছোট বাজার, সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান, সেকরার দোকানের ঠুকঠাক শুনা যাইতেছে, একটা খেজুর গুড়ের আড়তের সামনে বহু গরুর গাড়ীর ভীড় । মাঝেরপাড়া স্টেশন এখনও প্রায় চারিক্রোশ, বাস্তা কাঁচা হইলেও বেশ চওড়া, দুপাশে নীলকুঠাব সাহেবদের আমলে রোপিত বট, অশ্বথ তুঁতগাছ । বৈশাখ মাসের প্রথমে পশুপার্শ্বের বট অশ্বথের ডালায় নোংরা কোথায কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া শব্দ হইতেছে, সারাপাখট প্রাচীন বটের সারির নুবি দোলানো । কচি পাতার বাশি জ্যোৎস্না লাগিয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছে

বাংলার বসন্ত চৈত্র বৈশাখের মাঠে, বনে, বাগানে, যেখানে, সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাক, নবপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নানিশ্চ দক্ষিণহাওয়ায় উল্লাসে আনন্দনৃত্য স্বর করিয়াছে । একরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল । এই অল্পবয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরालা বনপ্রান্ত, স্মৃথ জ্যোৎস্না-রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামূর্ত্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান ।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ী পৌঁছিল । আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ী স্টেশনে পৌঁছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়াছিল, গাড়ী থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্র্যাটফর্মে হাজির হইল । সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারারাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই । ঐ হীক গাড়োয়ানের গরু দুইটার জগুই একরূপ ঘটিল, নতুবা এখনি সে ট্রেন দেখিতে পাইত । প্র্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট সাজানো—দুজন রেলের লোক একটা লোহা বাক্স মত দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাঙাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে । জ্যোৎস্না পড়িয়া বেলেব পাটি চিক্ চিক্ করিতেছে । ওদিকে রেললাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেই রকম দুটা লাল আলো । স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপর চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জলিতেছে । একরাশ বাঁধানো খাতাপত্র । অপু দরজার কাছে

গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট খড়মের বউলের মত জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট খট শব্দ করিতেছে।

ইষ্টিশান! ইষ্টিশান! বেশী দেরী নয়, কাল সকালেই সে রেলের গাড়ী শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবে!

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ভাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মত জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর-ধারে রাঁদিয়া থাইবার যোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ী পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের এক বোঁ ও এক যুবক। অপু জনিল বোঁটি হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বোঁটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ীর চাল ডাল খুইতেছে, বোঁটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু ই করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ী দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে কুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত কুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালসীও লোকজনদের হটাইয়া দিতেছিল।

কতবড় ট্রেনখানা! কি ভয়ানক শব্দ! সামনের একেই ইন্ডিন বলে? উঃ! কী কাণ্ড!

হবিবপুরের বোঁটি ঘোমটা খুলিয়া কোঁতুলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়াছিল।

গাড়ীতে হৈ হৈ করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব সুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ীর মেজেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানালা দরজা সব ছবছ! এই ভারী গাড়ীখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপূর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহার এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ী আজ চম্বিবে না! তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঁকা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেন-খানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, অপূর মনে হইল লোকটা কুপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ী চড়িল না সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া? হীক গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ী চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব ছলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, ই-করিয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীক গাড়োয়ান সকলকে শিছনে ফেলিয়া গাড়ী বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলা সটসট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া

পলাইতেছে—কী বেগ ! এরই নাম য়েলগাড়ী ! উঃ মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে । ঝোপঝাপ গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি ছোটো-খাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে ! গাড়ীর তলায় জাঁতা-পেবার মত একটানা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কি শব্দটা !

মাঝের পাড়া স্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগ্‌নালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে !

অনেকদিন আগের সে দিনটা ।

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধ্বাসে রেলের বাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল ! সেদিন—আর আজ ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাভাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বৃড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন স্নানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে !...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মার' গেলেও দুজনের খেল, করার পথেঘাটে বাঁশবনে আমতলায় সে দিদির যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দপূরের ভাঙা কোঠাবাড়ীর প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্যসত্যই দিদির সহিত চিবকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল !...

তাহার যেন মনে হয়, দিদির আর কেহ ভালবাসিত না, মা' নয়, কেউ নয় । কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয় ।

হঠাৎ অপূর মন এক বিচিত্র অল্পভূতিতে ভরিয়া গেল ! তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না । কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে...আতুর্বা ডাইনী...নদীর ঘাট...তাহাদের কোঠাবাড়ীটা...চালতে তলার পথ...রাণুদি...কত বৈকাল, কত দুপুর...কতদিনের কত হাসি-খেলা...পটু...দিদির মুখ...দিদি...কত না-মেটা সাধ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে...

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক-ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছা ক'রে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে—

সত্যই সে ভুলে নাই !

উত্তরজীবনে নীলকুম্ভলা মাগরমেথলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল । কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিত ব্যাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়াক্রপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুম্ভবেষ্টিত কোন নীল পর্বতমাঝ সমুদ্রের

অপু, সেতে উঠলে আশায় একটিনি লেগাডী চেঁচাবি ?

अथ ३२ वा

উল্লেখ্য পরিচ্ছেদ

সর্বপ্রথম এবার লষ্টয়া মোটে দুইবার বেলে চড়িল। আর একবার সেট
কোন কালে—উনি তখন নতুন কাশা হইতে আসিয়া দেশে সংসার পাতিয়াছেন
—জ্যেষ্ঠমাসে আড়ম্বাটার যুগলকিশোর ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিল—সে কি
আজকার কথা? সে খুশির সহিত স্টেশনে স্টেশনে মুখ বাড়াইয়া লোকজনের
গুঠা নায়া লক্ষ্য করিতেছিল। বউকিয়া উঠিতেছে না মিতেছে—কেমন সব
চেহারা, কেমন কাপড়-চোপড়, গহনাগজ! জগন্নাথপুর স্টেশনে ভাল মুড়ির
মোয়া কিরি করিতেছে দেখিয়া সে ছেলেকে বলিল—অপু মুড়ির মোয়া খাবি?
তুই তো ভালবাসিস, নেব তোর জন্তে? স্টেশনে টেলিগ্রাফের তাবের ওপর
কি পাখি বসিয়া দোল খাইতেছে, অপু ভাল করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া
আড়ুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—জ্যাখো মা, কাদের বাড়ীর খাচা থেকে একটা
মননা পাখি পালিয়ে এসেছে।

卷六

সময় সূর্য অস্ত হইতেছিল, সর্বজয়া একদৃষ্টে চাহিয়াছিল—ওপার হইতে হ-হ বাতাস বহিতেছে, গঙ্গার জলে নৌকা, দুপারে কত ভাল বাড়ী বাগান, এসব দৃশ্য জীবনে সে কখনো দেখে নাই। ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস্ অণু, একখানা ঘোঁয়ার আহাজ ? পরে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া আপন মনে বলিল—যা গঙ্গা, তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি, অপরাধ নিও না মা, কালীতে গিয়ে ফুল বিধিপত্রে তোমায় পূজো করবো, অণুকে ভাল রেখো, যে জন্তে যাওয়া তা যেন হয় সেখানে যেন আশ্রয় হয় মা—

আনন্দে, পুলকে, অনিশ্চয়তার রহস্তে তাহার হৃদয় তুলিতেছিল—এ বকম মনোভাব এর আগে সে কখনো অনুভব করে নাই। স্ত্রীবিধায় হোক, অস্ত্রবিধায় হোক, অবাধ মুক্ত জীবনের আনন্দ সে পাইল এই প্রথম; তার চিরকালের বাঁশবনের বেড়া ঘেবা ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ পল্লীজীবনে এ বকম সচল দৃশ্যরাজি, এ বকম অভিনব গতির বেগ, এত অনিশ্চয়ের পুলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনও হয় নাই—সে জীবনে চারিধারে পাঁচিল দেওয়াল তুলিয়া আপনাকে আপনি ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ চলিয়াছে, চলিয়াছে, সম্মুখে চলিয়াছে—পশ্চিম আকাশের অন্তর্যমান সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া—নদ-নদী, দেশ-নিদেশ ডিঙাইয়া ছুটিয়াছে—এই চলিয়া চলার বাস্তবতাকে সে প্রতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল আজ।—এই তো সেদিন এক বৎসর আগেও নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীতে কত রাত্রে শুইয়া যখনই সে ভাবিত, স্ত্রীবিধা হইলে একবার চাকদা কি কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখনই তাহা সম্ভবের ও নিশ্চয়তার বহু বাতিরের জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছে—আর আজ ?

ব্যাঙল স্টেশনে গাড়ি আসিবার একটু আগে সম্মুখের বড় লাইন দিয়া একখানা বড় গাড়ী হ-হ শব্দে ঝড়েব বেগে বাতির হইয়া চলিয়া গেল। অণু বিশ্বাসের সঙ্গে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কি আওয়াজ !—হেঁ—হেঁ— ব্যাঙল স্টেশনে পৌঁছিয়া তাহার গাড়ী হইতে নামিল। এদিক-ওদিকে এঞ্জিন দৌড়িতেছে, বড় বড় মালগাড়ীগুলি স্টেশন কাঁপাইয়া প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর না থামিয়া চলিয়া যাইতেছে। হেঁ হেঁ শব্দে—এদিকে এঞ্জিনের সিটির কানে-তলা-পরা আওয়াজ, ওদিকে আর একখানা যাত্রীগাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে, গার্ড সবুজ নিশান তুলাইতেছে—সন্ধ্যার সময় স্টেশনের পূর্বে পশ্চিমে লাইনের ওপর এত সিগ্‌ন্যাল কাঁকে কাঁকে—লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে—বেল, এঞ্জিন, গাড়ী, লোকজন !—

একটু রাত্রি হইলে তাহাদের কালী যাইবার গাড়ী আসিয়া বিকট শব্দে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইল। বিশাল স্টেশন, বেজায় লোকের ভিড়—সর্বজয়া কেমন দিশাহারা হইয়া গেল—তাড়া খাইয়া অনভ্যস্ত, আড়ষ্ট পায়ে স্বামীর পিছনে পিছনে একখানা কামরার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিহর অতিকণ্ঠে তর্জয় ভিড় ঠেলিয়া বেপথুমানা স্ত্রীকে ও দিশাহারা পুত্রকে কায়ক্লেশে গাড়ীর বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া কুলীর সাহায্যে মোটগাঁট উঠাইয়া দিল।

ভোয়ের দিকে সর্বজন্মের তজ্জা গেল ছুটিয়া। ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে—মাঠ, মাটি, গাছপালা একাকার করিয়া ছুটিয়াছে—বাজের গাড়ী বলিয়া তাহারা সকলে এক গাড়ীতেই উঠিয়াছে—হরিহর তাহাকে মেয়ে-কামুয়ায় দেয় নাই। গাড়ীতে ভিড় আগের চেয়ে কম—এক এক বেঞ্চে এক একজন লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। উপরের বেঞ্চে একজন কাবুলী নাক ডাকাইতেছে। অপু কখন উঠিয়া হাঁ করিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

হরিহর জাগিয়া উঠিয়া ছেলেকে বলিল—ওরকম ক’রে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকো না থোকা, এখখুনি চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে—

কয়লার গুঁড়ো তো নিরীহ জিনিস, চোখদুটা যদি উপড়াইয়া চিনিয়া ও যায় তবুও অপূর সাধা নাই যে, জানালার দিক হইতে এখন চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে। সে প্রায় সারাবাজি ঠায় এইভাবে বসিয়া! বাবা মা তো ঘুমাইতেছিল—সে যে কত কি দেখিয়াছে! কত স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় নাই, আলো লোকজন স্বচ্ছ স্টেশনটা হস করিয়া হাউইবাজীর মত পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল—বাত্রে কখন তাহার একটু তজ্জা আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নায় রেলগাড়ী ঝড়ের বেগে একটা কোন নদীর ছোট সাঁকো পার হইতেছে,—সামনে খুব উঁচু একটা কালোমত ঢিবি, ঢিবিটার ওপরে অনেক গাছপালা, নদীর জলে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল, আকাশে সাদা সাদা মেঘ—তারপর সেই ধরণের বড় বড় আরও কয়েকটা ঢিবি, আরও সেই রকম গাছপালা। তাহার পর একটা বড় স্টেশন লোকজন, আলো—পাশের লাইনে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—একজন পানওয়ালাব সঙ্গে একটা লোকের যা ঝগড়া হইয়া গেল।—স্টেশনে একটা বড় ঘড়ি ছিল—সে তাহার মাষ্টার মশায় নীচের বাবুর কাছে ঘড়ি দেখতে শিখিয়াছিল, গুনিয়া গুনিয়া দেখিল রাজি তিনটা বাজিয়া বাইশ মিনিট হইয়াছে। তারপর আবার গাড়ী ছাড়িল—আবার কত গাছ, আবার সেই ধরণের উঁচু উঁচু ঢিবি—অনেক সময়ে রেলের রাস্তার দুধারেই সেইরকম ঢিবি—গাড়ীতে সবাই ঘুমাইতেছে, ইহারা যদি কিছু দেখিবে না তবে রেলগাড়ী চড়িয়াছে যে কেন? কাহাকেও সে জিজ্ঞাসা করে যে অত ঢিবি কিসের? এক একবার সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া নুঁকিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নিরুপণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল গাড়ীখানা কত জোরে যাইতেছে—চুল বাতাসে উড়িয়া মুখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না, যেন কে মাটির গায়ে কতকগুলি সরল রেখা টানিয়া চলিয়াছে,—উঃ! রেলগাড়ী কি জোরে যায়!—কোতুহলে, উন্মেষজ্ঞান সে একবার এদিকের জানালায়, একবার ওদিকের জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল।

মাঝে মাঝে পূর্বদিকের দ্রুতবিলীযমান অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, কত দূরে তাহারা আসিয়াছে! এসব

কোন দেশের উচু নীচু মাঠ দিয়া তাহারা চলিয়াছে ?

সকালের দিকে সে আবার একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একটা প্রকাণ্ড স্টেশনে সশঙ্কে গাড়ী আসিয়া দাড়াইতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—প্র্যাটকর্মের পাথরের ফলকে নাম লেখা আছে—পাটনা সিটি।

তাহার পর কত স্টেশন চলিয়া গেল। কি বড় বড় পুল। গাড়ী চলিয়াছে, চলিয়াছে, মনে হয় বুঝি পুনটা শেষ হইবে না—কত ধরণের সিগ্‌নাল, কত কল কারখানা, একটা কোন স্টেশনের ঘরের মধ্যে একটা লোহার থামের গায়ে চোঙ লাগানো মত—তাহারই মধ্যে মুখ দিগা একজন রেলের বাবু কি কথা কহিতেছে—প্রাইভেট নম্বর ? হাঁ আচ্ছা—সিক্সটি নাইন—সিক্সটি নাইন—হাঁ ? ৩০ নম্বর ছয়ের পিটে নয়—হাঁ—হাঁ—

স্নেহ অবাক হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল—ও কি কল বাবা ? ওর মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম বলচে কেন ?

তখন বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে এমন সময় হরিহর বলিল—এইবার আমরা কাশী পৌঁছে যাবে, বাঁ দিকে চেয়ে থেকো, গঙ্গার পুলের ওপর গাড়ী উঠলেই কাশী দেখা যাবে—

অপু —‘হট’ কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিল। আজ সে সারাপথ টেলিগিরাপের তার ও খুঁটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছে—সেই একটিবার ছাড়া এমন করিয়া এব আগে কখনও দেখে নাই জীবনে। এইবার যদি সে রেল রেল খেলার ব্যয়োগ পায়, তখনই সে ওই ধরণের তারের খুঁটি বসাইবে। কি ভুলটাই করিত আগে। যেখানে যাইতেছে, সেখানকার বনে গুলফ-লতা পাওয়া যায় তো ?

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। বাঁশফটুকা গলির একখানা মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ীর একতলায় হরিহর বাসা লইয়াছে। কেন্দ্রো পূর্ব পরিচিত লোকের সন্ধান সে মিলাইতে পারে নাই। আগে যাহাবা যে-সব জায়গায় ছিল, এখন সে-সব স্থানে তাহাদের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। কেবল বিশ্বেশ্বরের গলির পুবাঁতন হালুইকর রামগোপাল সাহু এখনও বাঁচিয়া আছে।

বাড়ীর ওপরের তলায় একজন পাঞ্জাবী সপরিবারে থাকে, মাঝের তলায় এক বাঙালী ব্যবসায়ী থাকে, বাইরের ঘরটা তাঁর দোকান ও গুদাম—আশে পাশের ছ’তিন ঘরে তাঁর রন্ধন ও শয়নঘর।

এ পাঁচ ছয় দিনে সর্বজয়া নিকটবর্তী সকল জায়গা স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছে। স্বপ্নেও কখনো সে এমন দৃশ্যের কল্পনা করে নাই,—এমন মন্দির ! এমন ঠাকুর দেবতা ! এত ঘরবাড়ী !—আড়াংঘাটার যুগলকিশোরের মন্দির এতদিন তাহার কাছে স্থাপত্য-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন বলিয়া জ্ঞান ছিল—কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির ?—অন্নপূর্ণার মন্দির ? দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরকার লালপাথরের মন্দিরগুলো ?

মধ্যে একদিন সে পাঞ্জাবী ভক্তলোকটির স্ত্রীর সঙ্গে রাজে বিশ্বনাথের আরতি

দেখিতে গিয়াছিল—সে যে কি ব্যাপার তাহা সে মূখে বলিতে পারে না।
 ধূপধূনার ধোঁয়ায় মন্দির অন্ধকার হইয়া গেল—সাত-আটজন পূজারী একসঙ্গে
 মন্ত্র পড়িতে লাগিল—কি ভিড়, কি জাঁকজমক, কত বড় ঘরের মেয়েরা দেখিতে
 আসিয়াছিল তাহাদের বেশভূষারই বা কি বাহার। কোথাকার একজন শাণী
 আসিয়াছিলেন—সঙ্গে চার-পাঁচজন চাকরাণী। দামী বাণারমী শাড়ী পরে,
 সোনার কঙ্কাবসানো আঁচলটা আরতিব পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আগুনেন মত
 জ্বলিতেছিল—কি টান! ভাগ্যের চোখ—কি ভুরু, কি মুখশ্রী—সম্মতিক্রমে রাণী
 সে কখনো দেখে নাই—গল্পেই শুনিয়াছে—হাঁ, রাণীর মত রূপ বাট। তাঁহাকে
 বেশীক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছে কি ঠাকুরের আরতি বেশীক্ষণ দেখিয়াছে তাহা সে
 জানে না।

ঠাকুর-দেবতার মন্দির ছাড়া এক-একখানা বসতবাড়ীই বা কি।
 দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্দীপুরের গাঙ্গুলী বাড়ী গিয়া সে গাঙ্গুলীদেব নাট্যমন্দির
 দো-মহলা বাড়ী, বাধানো পুকুরঘাট দেখিয়া মনে মনে কত ঈর্ষান্বিত হইত—
 মনে আছে একবার দুর্গাকে বলিয়াছিল দেখেচিস বড়লোকের বাড়ীঘরে কি
 লক্ষ্মীছিরি?—এখন সেসব বাড়ী রাস্তার দুধারে দেখিতেছে—তাহার কাছে
 গাঙ্গুলীবাড়ী?

এক গাড়ীঘোড়া একসঙ্গে যাইতে কখনও সে দেখে নাই। গাড়ীই বা কত
 ধরণের! আসিবার দিনে রাণাঘাটে, নৈহাটিতে সে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়াছে
 বটে কিন্তু এত ধরণের গাড়ী সে আগে কখনো দেখে নাই। দু-চকর গাড়ীই
 যে কত যায়! তাহার তো ইচ্ছা করে পথের ধানে দাঁড়াইয়া তঁদণ্ড এইসব
 চোখে—কিন্তু স্ত্রীলোকটি সঙ্গে থাকে বলিয়া লজ্জায় পারে না।

অপু তো একেবারে অবাঁকু হইয়া গিয়াছে, এরকম কাণ্ডকারখানা সে
 কখনো কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। তাহাদের বাসা হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট
 বেশী দূর নয় রোজ বিকালে সেখানে বেড়াইতে যায়। রোজই যেন চড়কের
 মেলা লাগিয়াই আছে। এখানে গান হইতেছে, এখানে কথা হইতেছে শুদিকে
 কে একজন রামায়ণ পড়িতেছে, লোকজনের ভিড়, হাসিমুখ, উৎসব অপু
 সেখানে শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে আর সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া মহা-
 উৎসাহে গল্প করে।

কতাদের চাকর একটি ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বাঁদিয়া রোজ বেড়াইতে
 আনে অপু তাব করিয়াছে,—তার নাম পল্টু, ভাল করিয়া কথা কহিতে জানে
 না, তারি চকল, তাই পাছে হারাইয়া যায় বলিয়া বাড়ীর লোকেদের এই জেল-
 কয়েদীর মত ব্যবস্থা। অপু হাসিয়া খুন। চাকরকে অত্যাধিক করিয়াছিল,
 কিন্তু সে ভয়ে দড়ি ধুলিতে চাহে না। বন্দী নিত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অবোধ—এ ধরণের
 ব্যবহার যে প্রতিবাদযোগ্য, সে জানই তাহার নাই। বাড়ী আসিলে সর্বজনা
 রোজ তাহাকে বকে—একলা একলা গুরুকর যাস কেন? শহর বাজার জায়গা,
 যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলিস? মায়ের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একথা সে

আকে ছাত্ত নাড়িয়া ঢ'বেলা অধাবসায় সহকাৰে বুঝায়।

কালীতে আসিয়া হরিহরের আয়ত্ত বাড়িল? কয়েক স্থানে ঠাটাইটি করিয়া সে কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পূৰ্ণাণ-পাঠের কাৰ্য যোগাড় করিল। তাহা-ছাড়া একদিন সৰ্বজ্ঞয়া স্বামীকে বলিল—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে পুঁথি নিয়ে বোসো না কেন? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল ব'সে ব'সে পরামর্শ আটা—

দৌর তাড়া খাইয়া হরিহর কাশাখণ্ডের পুঁথি লইয়া বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে। পূৰ্ণাণ-পাঠ করা তাহার কিছু নতুন বাবদায় নহে, দেশে শিষ্ণুবাড়ী গিয়া কত এত-পূৰ্ণাণ উপলক্ষ্যে সে এ কাজ করিয়াছে। পুঁথি খুলিয়া হুস্বরে সে বন্দনা গান শুন করে—

বর্ধাপীড়াভিরামং যুগমদন্তিকং কুণ্ডলাক্রান্তগুণং।

... শ্রীতত্ত্বভগমুখং স্বাধরে ব্রহ্ম বেণুং

.....ব্রহ্মগোপালবেশং।

ভিড মন্দ হয় না।

বাসায় ফিরিয়া বালির কাগজে কি লেখে। স্ত্রীকে বলে, শুধু শ্লোক প'ড়ে গেলে কেউ শুনতে চায় না—ওই বাঙাল কথকটার ওখানে আমার চেয়ে বেশী ভিড হয়—ভেবেচি গোটাকতক পালা লিখবো, গান থাকবে। কথকতার মতও থাকবে, নৈলে লোক জমে না—বাঙালটার সঙ্গে পরশু আলাপ হোল, দেবনাগরীর অক্ষরপবিচয় নেই, শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়... আমার রেকাবী কুড়িয়ে ছ'য়ানা, আট আনা, আর ওর একটা টাকার কম নয়... শুনবে একটু কেমন লিখ'চি?

খানিকটা সে পড়িয়া শুনায়। বলে—ঐ কথকের পুঁথি দেখে বনের বর্ণনাটা লিখে নেবো ভেবেচি—তা কি দেবে?

—তুমি কোন্ খান্টায় ব'সে কথা বলো বলতো? একাদশ শুনতে যেতে হবে—

—যেও না, শীতলার মন্দিরের নীচেই বসি—কালই যেও, নতুন পালাটা বলবো, কাল একাদশী আছে, দিনটা ভালো—

—আদবার সময় বিশেষের গলির দোকান থেকে চার পয়সার পানফলের জিলিপী এনো দিকি—পুর জন্তে—সেদিন ওপরের খোটা বউ কি পুজো ক'রে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দিলে, বল্লে, পানফলের জিলিপী বিশেষের গলিতে পাওয়া যায়, খেতে গিয়ে ভাবলুম অপু জিলিপী খেতে বড় ভালবাসে—তা জল খেতে দিয়েচে আমি আর কি ব'লে নিয়ে আসি—এনো দিকি আজ চার পয়সার।

কয়েকদিন ধরিয়া হরিহরের কথকতা শুনিতে বেশ ভিড হইতেছে। একখানা বড় বারকোশে করিয়া নাগদঘাটের কালীবাড়ীর ঝি বড় একটা সিধা আনিয়া অপুদের দাওয়ায় নামাইল। সৰ্বজ্ঞয়া হাসিমুখে বলিল—আজ বুঝি শারের পূজো?

—উনি বাড়ী আসছেন দেখলে হ্যাঁ কি? কি চলিয়া গেলে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—এদিকে আস অপুর—এই ছাথ তোর সেই নারকেলের ফৌল—তুই ভালবাসিস, কিস্মিস, কলা, কত বড় বড় আম দেখেছিস, আর খাবি মিই—বোস এখানে—

উৎসাহ পাইয়া হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাতির করে। সর্বজন্ম বলে—ঋষচরিত্র সন্ততে সন্ততে লোকের কান যে কালাপালা হোল, নতুন একটা কিছু ধরো না? সারা সকাল ও দুপুর বসিয়া হরিহর একমনে জড়ভরতের উপাখ্যানকে কথকতার পালার আকারে নিখিগ শেষ করে। মনে পড়ে এট ক'ন্তেই বসিয়া আজ বাইশ বৎসর পূর্বে যখন সে গাতগোবিন্দের পথান্তবাদ করে তখন তাহার বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। দেশে গিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যেন নিজের কাছে আরও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। কাণীতে এত ছিল না—দেশে ফিরিয়া চাবিনগরে দাণ্ডায়ে গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অদিকারীর শুকসারীর বন্দ, নোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পশার তাহার মনে একটা নতুন ধরণের প্রভাব বিস্তার করিল।

রাত্রে জীর কাছে গল্প করিত—বাজ্ঞানের ব'বোধারীতে কবির গান হচ্ছে বুঝলে?—ব'সে ব'সে সুনাম বুঝলে? সোজা পদ সব—কিছুই না, বও না, সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে বসি ভাল হ'য়ে—নতুন ধরণের প'ল' বাধবো—এরা সকলে গায় সেই সব মাহাত্ম্য আমনের পদ—রাজুকে ত'ই কাল ব'ল'ছিল'ম—

অনেক রাত্রে উঠিয়া এক একদিন হরিহর বাতির দাণ্ডায় বসিয়া কি ভাবিত, অনির্দিষ্ট কোন আনন্দে তাহার মন যেন প'লকের মত হালকা হইয়া উঠিত।

কি উজ্জল ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে।

ঝাড়লঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, জামা নক্সিত, পদ, রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূরদূরান্তর হইতে মাঠ-ঘাট ভাঙ্কিয়া লোকে আবারেব পুঁটুলি বাদিয়া আনিয়া বসিয়া আছে গান শুনিতে। দলের অদিকারীরা তাহার বাড়ী আসিয়া পালা চাতিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঃ। ভারি চমৎকার তো। কার দাঁধ' ছড়া?—'কবির শুক ঠাকুর হক' হক ঠাকুরের?—না। নিশ্চিন্দপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।

এই দশ বর্ষে ঘাটে বসিয়াই তো বাইশ বৎসর পূর্বে মনে মনে কত ভাড়া-গড়া করিয়াছে—ত'দ'প' কবে সে সব ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল—কবে ধীরে ধীরে নতুন খাতাপত্রের তাড়া বাজের অনাদৃত, শুণ্ড কোণ আশ্রয় করিয়া দিনের আলো হইতে মুখ লুকাইয়া রহিল—যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াশার মত দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

হারানো যৌবনের দিকে চাতিয়া দেখিলে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে, কত কথা মনে পড়ে—জীবনের সেসব দিনকে আর একবারও ফেরানো যায় না? দশাবর্ষে ঘাটে অনেক ছেলের সঙ্গে অপূর ভাব হইয়াছে। কিন্তু এখানে

তাহার বয়সী সব ছেলেই ফুলে পড়ে, সে-ই কেবল এখনো ফুলে পড়ে নাই ; নিশ্চিন্দ্রপুরে মাছ ধরিয়া ও নৌকায় বেড়াইয়া দিন কাটানো চলিত বটে, কিন্তু এখানে সমবয়সীদের কাছে কিছু পড়ে না বলিতে লজ্জা করে।

তাঁহা ছাড়া দশাশ্বমেধ ঘাটে গেমস ছেলের সঙ্গে তাহার ভাব হইয়াছে, সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। পদ্মদাদা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে তাহার বাবাকে খুব বিদেশে বেড়াইতে হয়। অপু বলিয়াছিল—কেন তোমাদের বৃষ্টি খুব শিগ্ৰ-বাড়ী আছে? পদ্মদাদা আশ্চর্য হইয়া বলিল—শিগ্ৰ বাড়ী? কিসের ভাই?

অপু সন্তুষ্ট দিব্য পূর্বেই সে বলিল—আমার বাবা কন্ট্রাক্টরী করেন কিনা? তাহা কীভাবে ছোট জমিদারী আছে—তবে আজকাল কিস্তি দিচ্ছে কিই বা থাকে?

এক একদিন বৈকালে অপু দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতে গিয়া বাবার মুখে পুরাণ-পাঠ শোনে। হরিণশিশু প্রাপদ কর্তৃক নিহত হইলে হরিণবালকের স্নেহাসক্ত রাজর্ষি ভরতের করুণ বিরহবেদনা ও পরিশেষে তাহার মৃত্যুর কাহিনী শীতলা-মন্দিরের পৈঠার উপর বসিয়া একমনে শুনিতে শুনিতে তাহার চোখে জল আসে—দিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রত্নগণ তাহার স্মরণ না জানিয়া রাজর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কোতূহলে ও উৎকণ্ঠায় তাহার বুক ঢুক ঢুক করে, মনে হয় এইবার একটা কিছু ঘটবে, ঠিক ঘটবে। কথকতার শেষে পূর্ববী সুরের আশীর্বচনটি তাহার ভারি ভাল লাগে—

কালে বর্ষতু পর্জন্মং পৃথিবী শশশালিনী

লোকা সন্ত নিরাময়া:

সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে অন্তহ্রদেব রাঙা আভা ও পূর্ববীর মুর্ছনার সঙ্গে হরিণ বালকের বিয়োগবেদনাতুৰ, জর্ঘির ব্যথা যেন মিশাইয়া থাকে।

বাড়ীতে কাগজ কলম বাবাব কাছে লইয়া গিয়া বলে—আমায় লিখে দাও না বাবা, ঐ যে তুমি গাও—কালে বর্ষতু পর্জন্মং?

হরিহর খুশি হইয়া বলে—তুই বৃষ্টি শুনিছ খোকা?

—আমি তো রোজই থাকি—তুমি কাল যখন ভরতের মা মারা যাওয়ার কথা বলছিলে আমি তখন তো তোমার পিছন দিকে বসে—মন্দিরের ধাপে—

—তোমার কি রকম লাগে—ভাল লাগে?

—খু-উ-উ-উব। আমি তো রোজ বোজ শুনি—

অপু কিন্তু একটা কথা লুকায়। যেদিন তাহার সঙ্গীরা থাকে, সেদিন কিন্তু বাবার দিকে সে যায় না। সেদিন বাবার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার বাবা দেখিতে পাইয়া ডাকিল—খোকা, ও খোকা—

তাহার সঙ্গে বন্ধুটি বলিল—তোমাকে চেনে না কি?

অপু শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হ্যাঁ। সে বাবায় কাছে আসে নাই সেদিন। তাহার বাবা ঘাটে কথকতা করিতেছে, একথা বন্ধুরা পাছে টের পায়! সে পনের দাদা ছাড়া অন্য বন্ধুদের কাছে গল্প করিয়াছে কালীতে তাহাদের বাড়ী আছে, তাহারা কালীতে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছে, দেশে খুব বড় বাড়ী, তাহার বাবা কট্টাকীবী করেন, তাছাড়া দেশে জমিদারীও আছে। শেষে বলে—কিন্তু জমিদারী থাকলে কি হবে, কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে?

বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা খুব বেশী নয় বলিয়াই বোধ হয় তাহার বণিত গল্পের সঙ্গে তাহার পোষাক পরিচ্ছদের অসঙ্গতি দূরী পড়ে না। বিশেষতঃ তাহার স্বন্দ মুখের গুণে সব মানাইয়া যায়।

পূর্ণিমার দিন কথক ঠাকুরের ওখানে বেশ ভিড় হইল। সন্ধ্যার পর হরিহর কথা শেষ করিয়া ঘাটের বানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, কথক ঠাকুর জলে হাত মুখ ধুইতে নামিল। হরিহরকে দেখিয়া বলিল—এই যে আপনিও আছেন, দেখলেন তো কাণ্ড, পূর্ণিমের দিনটা—বলি আজ দিনটা ভাল আছে, বামন-ভিক্ষে লাগাই—আগে আগে এই কালীতে বামন-ভিক্ষা চোলে পনের সের আধমণ ক'রে চাল পড়তে—আজকাল মশাই মহা বামন-ভিক্ষেতেও লোকে ভেজে না—চালের ত একটা দানাও না—এদিকে সিকে-পাঁচেক হবে, তার মধ্যে আবাব চুটো অচল দোয়ানি—। মশায়ের লিঙ্কা কোথায়?

—লিঙ্কা তো ছিল এই কালীতেই, অনেকদিন আগে। তবে এত দিন দেশেই ছিলাম—এইবার এখানে এসে বাসা ক'রে আছি।

—মশায়ের বাসা কি নিকটে? একটু চা খাওয়াতে পারেন? কদিন থেকে ভাবছি একটু চা খাবো—এই দেখুন না, চাদরের মুড়োয় চা বেঁধে নিয়ে নিয়ে ঘুরি, বলি না হয় কোনো হালুইকরের দোকানে একটু গরমজল করিগে গলা বসে গিচ্ছে, একটু লোন চা খেলে গলাটা

হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন না এই তো নিকটেই আমার বাসা চলুন না?

কথককে লইয়া হরিহর বাড়ী আসিল।

চা খাওয়ায় পাট কোন কালে নাট। কড়ায় জল গরম করিয়া চা টেবী হইল। অপু কাসার ঘাসে চা ও রেকাবি—কিছু খাবার কথকের সামনে লইয়া আসিল। বাবায় দেখিয়া কথক ঠাকুর তারি খুশি হইল—খাবারের আশা সে করে নাই।

—এটি ছেলের বৃত্তি! বাঃ বেশ ছেলে তো আপনার? তারি স্তম্ভর দেখতে—
—বাঃ—এস এস বাবো, থাক থাক কল্যাণ হোক—লোন-চা করিয়েচেন তো মশায়? দেখি—

হরিহর বলিল—আপনার কি ছেলেপিলে সব এখানেই—

—সংসার নেই তো ছেলেপিলে? দশ বিঘে জমিও বেরিয়ে গেল অথচ ও মূলেও হাতাত—জমি ক'বিঘে যদি আজ থাকতো—তো আজ কি এই এতদূরে আসি—আপনিও যেমন!...এসব কি আর দেশ মশাই?...বিধেখর অবিভি

মাথায় ঝাঁকুন—এমন শীতকাল যাচ্ছে মশাই—না একটু খেজুর রস, না একটু গুড় পাটালি—আমার নিজের মশাই ঢুকুড়ি খেজুর গাছ—

—মশাইয়ের দেশটা কোথায় ?

—সাতক্ষীরের সন্নিকট, —বাড়ডে শীতলকাটি জানেন ? শীতল-কাটির চক্কুরি খুব ঘরানা—

হরিহর তামাক সাজিয়া নিজে কয়েক টান দিয়া কথকঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল—থান—

—কিছু না মশায়, ফাস্তন মাসের দিকে তো যাউ—একটা বাগান আছে দিগে আমি শিক্রি ক’রে —আমবা আবার শ্রোত্রিয় কিনা ? তা জমি দশ বিঘে ছিল, তাই বন্ধক দিয়ে পণ যোগাড় করলাম—বিঘেও করলাম,—মশাই দশ বছর ঘর করলাম—হোল কি জানেন ? সম্ভাবেনা রান্নাঘরের চাল থেকে কুমড়ো কাটতে গিয়েছে—ছিল মশাই সেখানে সাপ আমার জন্তে তৈরী হয়ে—হাতে দিঘেচে কামড়ে—আমি আবার নেই সেদিন বাড়ী—কেই বা বত্তি কবরেজ দেখিয়েচে, কেই বা কি করেছে—পাটুলির ঘাট পার হচ্ছি—গাঁয়ের মহেশ সাধুখা ওপার থেকে আসচে, আমায় বল্লে—শিগ্গির বাড়ী যান মশায়—আপনার বাড়ী এত বিপদ—কি বিপদ তা বলে না—বাড়ী পৌঁছে দেখি আগের রাতিতেই তো গিয়েচে ম’রে ।—এই গেল ব্যাপার মশাই জমিকে জমিও গেল—এদিকেও—। সেই থেকে বলি, যাই দেশে থেকে আর কিই বা হবে—কোথেকে পাবো তিন চারশ টাকা যে আবার বিয়ে করবো ? যাই বিশ্বনাথের ওখানে অন্নকষ্টটা তো হবে না আজ বছর আষ্টেক হ’য়ে গেল । এক খুড়তুলে ভাই আছে—জমিজমা সামান্য যা একটু আছে, দখল ক’রে ব’সে আছে—বলে তোমার ভাগ নেই—বেশ বাপু নেই তো নেই—গোলমালের মধ্যে কখনো আমি যাবো না—করগে যা দখল । উঠি মশাই—আপনার এখানে বেশ চা খাওয়া গেল—আপনার ছেলেটি কোথায় গেল ? বেশ ছেলে, থামা—

পুরানো চামড়ার তালি দেওয়া ক্যান্ডিসেব জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইয়া কথকঠাকুর পায়ে দিয়া দরজার কাছে আসিল—যাইতে যাইতে বলিল—কালও লাগাবো বামনভিক্ষে—দেখি কি হয়—

পথের পাঁচালী

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহরের বাসটা বিশেষ ভাল নয় । নীচের তলার স্ত্রীতসঁতে ঘর, তাও মাত্র দুখানি, এও অন্ধকার যে হঠাৎ বাহির হইতে আসিলে ঘরের কোনো জিনিস নজরে পড়ে না । এরকম স্থানে সর্বজন্ম কখনো বাস করে নাই, তাহাদের দেশের বাড়ী পুরানো হইলেও রোহাওয়া খেলিবার বড় বড় দরজা জানালা ছিল, সেকালের উচু ভিতরে কোঠা, খট খট কবিত, শুকনা । এ বাসার স্ত্রীতসঁতে মেয়ে ও অন্ধকারে সর্বজন্মের মাথা ধবে । অপু তো মাটেই ঘরে

থাকে না। নৃখালোকপুট নবীন তরুণ স্ত্রীর শুধু আলোর দিকে তার মুখটি থাকে ফিরানো, নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত মাঠে, নদীর আলো-ছাওয়ায় মাছুষ হইয়া এই বকুঘরের অন্ধকারে তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, একদণ্ডও সে এখানে ভিত্তিভে পাবে না।

কাশী দেখিয়া সে একটু নিরাশ হইয়াছে। বড় বড় বাড়ীঘর থাকিলে কি হইবে, এখানে বন নাই মোটেই।

সন্ধ্যার দিকে একদিন কথকঠাকুর হরিহরের বাসায় আসিল। একথা-ওকথার পর বলিল—কৈ আপনার ছেলেকে দেখ্‌চি নে ?

হরিহর বলিল—কোথায় বেরিয়েচে খেলা কর্তে, দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকেই বোধহয় বেরিয়েচে—

কথকঠাকুর উড়ানির প্রান্তে বাঁধা কি দ্রবা খুলিতে খুলিতে বলিল—আপনার ছেলের সঙ্গে বড় ভাব হয়ে গিয়েছে মশাই—সেদিন ঘাটে কাছে ডেকে বসিয়ে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কইলাম—কড়ি খেলতে ভালবাসে তাই এই তুটো সমুদ্রের কড়ি সেদিন ত্রুতের দিগ্ধের কারা দিইছিল, ভালবাস ওকে দিয়ে আসি—রেখে দিন আপনি ও এলে দেবেন—

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অপু বাবাকে ধলিল সে স্থলে ভর্তি হইবে। বলিল—সবাই পড়ে ইস্কুলে বাবা, আমিও পড়বো—ওই তো গলির ঝোড় ছাড়িয়ে একটুখানি গিয়েই ভাল ইস্কুল—

হরিহর ছেলেকে স্থলে ভর্তি করিয়া দিল। যদিও ছাত্রবৃত্তি স্থলে তবে ইংরাজী পড়াও হয়। প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে—সে প্রায় পাঁচ বছর হইয়া গিয়াছে—এই তাহার পুনরায় অন্না বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া।

মাঘমাসের মংকামাষি কথকঠাকুর এক টুকরা বালির কাগজ তাতে একদিন হরিহরের বাসায় আসিয়া হাজির। কাগজের টুকরা দেখাইয়া বলিল—দেখুন তো মশাই পড়ে, এই বকম যদি লিখি তবে হয় ?

হরিহর পড়িয়া দেখিল কাশীবাসী রামগোপাল চক্রবর্তী নামে কোনো লোক কথক ঠাকুরের নামে স্বগ্রামের দশবিঘা জমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, অমুক অমুক সাক্ষী, স্থান দশাশ্বমেধ ঘাট, অমুক তারিখ। কথক ঠাকুর বলিল—ব্যাপারটা কি জানেন ? আমাদের দেশে কুমুরে গ্রামের রামগোপাল চক্রবর্তী ভারি পণ্ডিত ছিলেন, মরবার বছর খানেক আগে বল্লেন রামধন, তোমার তো কিছু নেই, তাবছি তোমাকে বিধে দশেক জমি দান করব—তুমি নেবে কি ? তা ভালবাস সদ্ভ্রাক্ষণ, দিতে চাচ্ছেন, দোষই বা কী ? তারপর তিনি মুখে মুখে জমিটা আমায় দিয়ে দিলেন। দিলেন দিলেন—এতকাল তত গা করিনি, কাশীতেই থাকবো, দেশে ঘরে থাকবো না কি হবে জমি ? তারপর চক্রবর্তী গেলেন মারা। জমির দানটা মুখে মুখেই রয়ে গেল। এতকাল পরে তাবচি দেশে যাবো—ছেলেপিলে না হলে কি আর মানুষ মশাই ? আপনাকে বলতে কি, ন জিনেক টাকা হাত করেচি—করেচি জলাহার ক'রে মশাই—আর ন

দুই টাকা গেলে জ্যোতিয় ঘরের মেয়ে পাওয়া যায়—তা যদি তাই ঘটে, তবে জমিটা দরকার হবে তো ? ভাবলাম মুখে মুখে দান, সে কি আর চক্ৰস্তি মশাই—এর ছেলেরা মানবে ? ভেবে িন্তে এই কাগজখানা ব'সে ব'সে লিখিচি—নিজেই লিখিচি মশাই, সই টাই সব—দুজন সাক্ষী, সব বানানো—দেখি লেখা কাগজ যদি মানেন। গিয়ে বলবো, এই ছাখো তোমার বাবা এই জমিটা দান করেছেন—

উঠিবার সময় কথকঠাকুর বলিল—ভালো কথা মশাই, মঙ্গলবারের মাঘী-পূর্ণিমার দিন আপনার ছেলেকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো ওই টেওটার রাজার ঠাকুরের বাড়ীতে, ঠিক মানমন্দিরের গায়েই একেবারে। সন্ধ্যার পর বছর বছর ব্রাহ্মণভোজন খায় কিনা। একটু সগর্বে বলিল—আমায় একখানা করে নেমস্তন্ন পস্তর ছায়, বেশ ভাল পাওয়ায়, চমৎকার। আমি এসে নিয়ে যাবো সেদিন কিছ।

মাঘীপূর্ণিমার দিন শেষ রাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড় দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া গেল। দলে দলে মেয়ে পুরুষে 'জয় বিশ্বনাথজী কি জয়', 'বোলো বোয়াম', 'বোলো বোয়াম', বলিতে বলিতে বলিতে দুরন্ত মাঘের নীতকে উপেক্ষা করিয়া স্নানের জগা চলিয়াছে। একটু বেলা হইলে পাঞ্জাবী জীলোকটির সঙ্গে সর্বজয়াও স্নান করিতে গেলে—গঙ্গার ঘাটের জল, সিঁড়ি, মন্দির পথ সব উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে পূর্ণ। জলে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বর্গীর মন্দিরে লাল নিশান উড়িতেছে।

সন্ধ্যার আগে কথকঠাকুর অপুকে লইতে আসিল। সর্বজয়া বলিল—পাঠিয়ে দাও গিয়ে, কেউ নেই, অপূর ওপর একটা দম হয়েছে, দশাশ্বমেধঘাটে ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে গল্প করে. একদিন নাকি পেঁপে কিনে খাইয়েচে—পাঠিয়ে দাও, লোক ভালো—

অপু প্রথমে কথকঠাকুরের সঙ্গে তাহার বাসায় গেল। খোলাঘর ঘর, মাটির দেওয়ালের নানাস্থানে খড়ি দিয়া হিসাব লেখা। নমুনা :

সিয়ারসোলের রাণীর বাড়ী ভাগবত পাঠ	৮
মুদ্রান্ত কুস্তার ঠাকুর বাড়ী .. ঐ .	৩
ধারক লালজী দোবের একদিন খোরাকী	১০

বিশেষ কিছু আসবাবপত্র নাই। একখানা সরু চৌকী পাতা, একটা ছোট টিনের তোরঙ্গ, একটা দাড়ি-টাঙানো আলনা একজোড়া খড়ম। দেওয়ালের গায়ে পেরেক একটা বড় পদ্মবীজের মালা টাঙানো।

কথকঠাকুর বলিল—কমলালেবু খাবে ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে আপনার ?

কি জানি কেন এই কথকঠাকুরের কাছে তাহার কোনো প্রকার লজ্জা কি সন্দোহ বোধ হইতেছিল না। লেবুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—‘কালে বর্ষতু পৰ্জ্জন্তং’ জানেন আপনি ?

—‘কালে বর্ষতু পৰ্জ্জন্তং’ ? খুব জানি, রোজ বলি তো, একদিন শুনো না—

—এখন বলুন না একটিবার ?

কথক হুয় করিয়া বলিল বটে কিন্তু অপূর মনে হইল তাহার বাবার মুখে শুনিলে আরও ভাল লাগে, কথকের গলা বড় মোটা ।

দেশে লইয়া যাইবার জন্য কথকঠাকুর নানা খুঁচরা মাটির ও পাথরের জিনিস—পুতুল, খেলনা, শিবলিঙ্গ মালা কাঠের কাঁকই সংগ্রহ করিয়া বাখিয়াছে । অপূকে দেখাইয়া বলিল—কাশ্মীর জিনিস, সবাই বলবে কি এনেচ দেখি । তাই নিয়ে যাবে—

নানা সুরু গলি পার হইয়া একটা অঙ্ককার বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া কথকঠাকুর দাঁড়াইল । নীচু দরজা দিয়া অতি কষ্টে কথকের সঙ্গে ঢুকিয়া অপূর মনে হইল বাড়ীটায় কেহ কোথাও নাই, সব নিশুম । কথকঠাকুর দু'একবার গলায় কাশ্মীর শব্দ করিতে কে একজন দালানের চারপাই হইতে খুম ভাঙিয়া উঠিয়া মোটা গলায় হিন্দীতে কি জিজ্ঞাসা করিল, অপূ তাতা বুঝিতে পারিল না । কথকঠাকুর পরিচয় দিবার পরেও মনে হইল লোকটা তাতাকে চিনেও না, বা তাতাদের আগমন প্রত্যাশাও করে নাই । পরে লোকটা যেন একটু বিরক্তির সহিত কাতাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল । কিছ ফিরিতে এত দেরী কবিতো লাগিল যে, অপূর মনে হইল হয়ত ইহাও বলিবে তোমাদের তো নিমন্ত্রণ হয় নাই, যাও তোমরা । যাহাই হউক, অঙ্ককারে ঠায় পনেরো মিনিট দাঁড়াইবার পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া দালানের একস্থানে আর অঙ্ককারে খানকতক শালপাতা পাতিয়া ঈশাদের বসাইয়া দিল । একটা মোটা শিতলের নোটায় জল দিয়া গিয়াছে । কথকঠাকুর যেন ভয়ে ভয়ে গিয়া আসনের উপর বসিল । রাজার বাড়ী কি না জানি খাওয়ায় । অধীর আগ্রহে অপূ প্রায় আরও বিশ মিনিট পাতা পাতিয়া বসিয়া রহিল—কাহারও দেখা নাই । নিমন্ত্রণ খাইতে পাইবার নিশ্চয়তার সম্বন্ধে যখন পুনরায় অপূর মনে সন্দেহ দেখা দিতেছে ঠিক সেই সময় পরিবেশকের আবিভাবরূপ অঘটন ঘটিল । মোটা মোটা আটার পুরী ও স্বাদগন্ধগীন বেগুনের ঘণ্ট—শেষে খুব বড় বড় লাড্ডু । অপূ কামড়াইতে গিয়া লাড্ডুতে দাঁত বসাইতে পারিল না, এত কঠিন । কথকঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া সেই মোটা পুরী খান দশ-বারো আগ্রহের সহিত খাইল । মাঝে মাঝে অপূর দিকে চাহিয়া বসিতেছিল—পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরো না, বেশ খাওয়ায়—বেশ লাড্ডু, না ? দাঁতে এখনও খুব জোর আছে, বেশ চিবুতে পারি ।

একশত বৎসর একসঙ্গে থাকিলেও কেহ হয়তো আমার হৃদয়ের বাহিরে থাকিয়া যায় যদি না কোন বিশেষ ঘটনায় সে আমার হৃদয়ের কবচ খুলিতে পারে । আজকার এই নিমন্ত্রণ খাইতে আমার অনাদর, অবজ্ঞা, অপূ বালক হইলেও বুঝিয়াছিল । তাপস পরও এই খাইবার লোভে ও আনন্দে অপূর অন্তরতম হৃদয়ে ঘা লাগিল । তাহার মনে হইল এ কথকঠাকুর অতি অভাজন । ভাবিল, কথকঠাকুর কখনো কিছু খেতে পায় না, আহা এই লাড্ডু তাই

অমন করে থাকে—ওকে একদিন মা'কে ব'লে বাসাতে নেমত্তর করে
খাওয়াবে—

ককণা ভাগবাসার সবচেয়ে মূল্যবান মশলা, তার গাঁপুনী বড় পাকা হয়।
তাহার শৈশব মনে এটী বিদেশী, দুদিনের পরিচিত, বাঙাল কথকঠাকুর তাহার
দিদি ও গুলকীর সঙ্গে এক হারে গাঁথা হইয়া গেল স্বন্ধ এক লাড্ডু, খাইবার
অধীর লোভের ভঙ্গীতে।

ইহার অল্পদিন পরেই কথকঠাকুর দেশে চলিয়া গেল। রাজঘাটের স্টেশনে
কথকঠাকুরের নির্জ্ঞাতশয্যে হরিহর অপুকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গাড়ীতে
তুলিয়া দিতে গেল। হরিহরের মনে হইল আজ বাটশ বৎসর পূর্বে সে যাহা
করিতে দেশে গিয়াছিল—সেই ব্যক্তি তাহার বর্তমান বয়সের চেয়েও অল্পতঃ
আট বৎসর বেশী বয়সে তাহাই করিতে অর্থাৎ নূতন করিয়া সংসার পাত্তিতে
দেশে চলিয়াছে। স্ততরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে? কোন
কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?

গাড়ী ছাড়িলে অপু'র চোখে জল আসিল। বালকের প্রাণে সময়ে সময়ে
বয়স্ক লোকের উপর স্থায়ী সত্যিকার স্নেহ আসে। দুর্লভ বলিয়াই তাহা বড়
মূল্যবান।

মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন হরিহর হঠাৎ বাড়ী ঢুকিয়াই উঠানের
ধারে বসিয়া পড়িল। সর্বজ্ঞয়া কি করিতেছিল, কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি
উঠিয়া আসিয়া বলিল, কি হয়েছে এমন করে ব'সে পড়লে যে? স্বামীর
মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু মুখের কথাটা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। হরিহরের
চোখ দুটা জ্বাফুলের মত লাল, ডান হাতখানা যেন কাঁপিতেছে। সর্বজ্ঞয়া
হাত ধরিয়া তুলিতে আসিতে সে ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবে বলিল—থোকা
কোথায় গেল? থোকা?

সর্বজ্ঞয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে।
সন্তর্পণে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল
—অপু আসচে, তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েচে ওপরের ওই নন্দবাবু, বোধ হয়
গোবুলিয়ার মোড়ে তার দোকানে নিয়ে গিয়েচে,—

অপু দোকানে যায় নাই, নন্দবাবুর ঘরের সামনে ছাদে বসিয়া বই
পড়িতেছিল। মাসখানেক হইল নন্দবাবুর সঙ্গে অপু'র খুব আলাপ জমিয়াছে
নন্দবাবুর বয়স কত তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, তবে
তাহার বাবার চেয়ে ছোট মনে হয়। নন্দবাবুর উপরের ঘরে সে অনেকগুলি
বই আবিষ্কার করিয়াছে—নন্দবাবু যখন ঘরে থাকে তখন বই লইয়া ছাদে বসিয়া
পড়ে! কিন্তু ভয় হয় পাছে নন্দবাবু পড়িতে না দিয়া বই কাড়িয়া লয়, কারণ
একদিন সেরূপ ব্যাপার ঘটয়াছিল। ছাদের এক কোণে লোভে বসিয়া অপু
পড়িতেছিল, নন্দবাবু ঘরের ভিতর কি খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরে আসিয়া

তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধমক দিয়া বলিল—আরে যেথো দাও, তোমার ব'লে ব'লে যত ঐ সব বই পড়া, কোথাকার জিনিস কোথায় রাখো তার ঠিক নেই, কাজের সময় খুঁজে মেলে না—যাও, রাখো বই, যাও—

সে তো ঘরের অন্ত কোনো জিনিসে হাত দেয় না, তবে তাহাকে বকিবাবর কারণ কি ? সেই হইতে সে ভয়ে ভয়ে বই লইয়া থাকে ।

নন্দবাবু সন্ধ্যার সময় টেরি কাটিয়া ভাল জামা কাপড় পরিয়া শিশি হইতে কি গন্ধ মাখিয়া রোজ বেড়াইতে যায় । অপূর্ব গায়ে একদিন একটু শিশি হইতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, বেশ ভুবভূরে গন্ধটা ।

সন্ধ্যার পরও সে আগে আগে নন্দবাবুর ঘরে পড়িতে যাইত । কিন্তু সন্ধ্যার পরে নন্দবাবু আলমারি হইতে একটা বোতল লইয়া লাল-মত একটা ওষুধ খায় । সে সময়ে সে একদিন ঘরে গিয়া পড়িলে তাহাকে ভারি বকিয়াছিল । নন্দবাবুদের ঘরে উঠিবার সিঁড়ি অন্তরিকার আর একদিন রাজে হঠাৎ ওপরের ঘরে গিয়া সে দেখিয়াছিল একটি কে স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে । তাহাকে দেখিয়া নন্দবাবু বলিয়াছিল—এখন যাও অপূর্ব, ইনি আমার শালী—দেখতে এসেচেন, এখনি চলে যাবেন । ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে শুনিয়াছিল নন্দবাবু বলিতেছে—ও আমাদের নীচের ভাড়াটের ছেলে—কিছু বোকে শোজে না ।

নন্দবাবু তাহাকে প্রায়ই তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করে । বলে, তোমার মাকে ব'লে পান নিয়ে এস দিকি ? আমার চাকরটা পান সাজতে জানে না—

অপূ মায়ের কাছে আবদার করিয়া প্রায়ই পান আনে । নন্দবাবু মাঝে মাঝে বলে—তোমার মা আমার কথা কিছু বলেন টলেন নাকি—না ?—অপূ বাড়ী আসিয়া মাকে বলে—নন্দবাবু বেশ লোক মা—তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস করে—

—আমার কথা ? আমার কথা কি জিজ্ঞেস করে ?

—বল্ছিলো তোমার মাকে বোলো, আমি তাঁর কথা জিজ্ঞেস করি-টরি—
বেশ লোক—

—করুক সে—তুই পাচ্ছি ছেলে অত ওপরের ঘরে যাস্-টাস্ কেন ?
বিকলে ওপরে ব'লে ব'লে কি করিস ?

হরিহরের জ্বরটা একটু কমিল । অপূ স্কুল হইতে আসিয়া বই নামাইয়া রাখিতেছে । পায়ের শব্দ পাইয়া হরিহর বলিল—থোকা এস, একটু বসো বাবা—

অপূ বসিয়া বসিয়া স্কুলের গল্প পড়িতে লাগিল । হাসিমুখে নীচু স্বরে বলিল—এই দু'মাস তো স্কুলে গিইচি, এরই মধ্যে বাবা, সবাই খুব ভালবাসে, রোজ রোজ ফার্স্ট বেঞ্চে বসি—স্কুলে আমাদের ক্লাসে একখানা ছাপিয়ে কাগজ বার করবে একমাস অন্তর । আমাকে সেই দলে নিয়েচে—তোমায় দেখাবো—
বাবা বেকলে—

হরিহরের বৃকের ভিতরটা মমতায় বেধনায় কেমন করে। অপু একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলে—একটা লেখা লিখেচি—কাগজখানা ছাপাবে বলেচে, আমার নামে—কিন্তু যারা ছুঁটাকা কোরে চাঁদা দেবে শুধু তাদেরই লেখা ছাপাবে বলেচে—ছুঁটাকা দেবে বাবা ?

হরিহর অধীর আগ্রহে ছেলের হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে শুরু করে। ছেলে যে লেখে সে খবর সে জানিত না। রাজপুত্রের মৃগয়ার গল্প, হৃন্দর বানানো, হরিহর খুশি হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসে, বলে,—ভূই লিখেচিস্ থোকা ?

—আমি তো আরো কত লিখিচি বাবা, ভূতের গল্প রাজকন্ঠের—বাড়ী থাকতে রাগুণী খাতায় লিখে লিখে দিতাম তো—

সর্বজ্ঞা টাকার নাম শুনিয়া দিতে চাহে না। স্বামী অস্থখে পড়িয়া, এ অবস্থায় যাহা আছে তাহা সংসারের খরচই কুলাইবে, না, দরকার নাই ছাপানো কাগজে ! হরিহর বুকাইয়া বলিয়া টাকা দেওয়ার, বলে—দাও গিয়ে, আঙ্গা খোকার লেখাটা ছাপিয়ে আঙ্গক, সেরে উঠে পথিয়া করলেই ঠাকুরবাড়ীর ভাগবত পাঠটা তো ঠিকই রয়েছে—ওতেও তো গোটা দশেক টাকা পাবো—

দিন হইয়া আর অপু নিরাশ মুখে রাজা ঠোট ফুলাইয়া বাবার কাছে চুপি চুপি আসিয়া বলে, হ'লো না বাবা। ছাপাখানাওয়ালার লোকেরা বেশী দাম চেয়েচে, তাই আজ স্কুলে বলে দিয়েচে, চার টাকা ক'রে চাঁদা চাই,—

ছেলের মুখের নিঃশাসর ভাব হরিহরের বৃকে খচ করিয়া বিঁধে। খানিকক্ষণ অল্প কথার পর সে বলে—দাখ দিকি থোকা তোর মা কোথায় গেল ? বালিশের তলা হইতে চাবির খেলো বাহির করিয়া দিয়া বলে—চুপি চুপি ওই কাঠের ছাপ বাক্স, যেটাতে আমার কঞ্চির কলমের বাঙিল আছে, ওইটে খোল তো ? কোণে দাখ তো টাকা আছে ? তাহার পরে হরিহর সম্ভর্ণণে বাক্সখোলা-নিরত পুত্রের দিকে মমতার চোখে চাহিয়া থাকে। অবোধ, অবোধ, নিতান্ত অবোধ !...ওর হৃন্দব, শুভ্র চাঁদের মত ললাটটি ওর মায়ের ললাট, চোখ দুটি ওর মায়ের চোখ। যখন হরিহর প্রথম যৌবনে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনে, নববধু সর্বজ্ঞার অবিকল সেই মুখের হাসি এগারো বছরের অপূর অনাবিল নবীন মুখে।

অকারণে হরিহরের বৃকের মধ্যে স্নেহমুদ্র উদ্ভেল উদ্ভাল হইয়া উঠিয়া চোখে জল ভরিয়া আনে।

অপু যেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়, তাহার মুখের আনন্দ যেন প্রভাতের নব-অরুণ আভা, তার ভাগর ভাগর নীলাভ চোখ দুটির চাহনির মধ্যে নিজের অতীত যৌবন দিনের সে অসীম স্নপ্প, স্ননীল পাহাড়ের নবীন শালতরুশ্রেণীর উল্লাস-মর্মর—কুলহারী সমুদ্রের দূরগত সঙ্গীতধ্বনি।

অপু চুপি চুপি বাবাকে দেখাইয়া বলে...চারটে টাকা আছে বাবা—হরিহর সময় সময়ের জ্ঞান টাকা কয়টি রাখিয়া দিয়াছে নিজের বাক্সে লুকাইয়া, স্ত্রী

জানে না, কাজেই সে নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারিল—নিয়ে যা থোকা, টাঙ্গা দিয়ে দিস, কিন্তু ভোর থাকে যেন বলিসনে ।

অপু খুশির হবে বলে—ছাঁপা বেকলে তোমায় দেখাবো বাবা, আমার নামে ছাপিয়ে দেবে বলেচে—এই সোমবারের পরের সোমবারে বেরবে—

পরদিন সকাল হইতে হরিহরের অস্থখ আবার বাড়িল ।

সর্বজয়া ভয় পাইয়া ছেলেকে বলিল—নন্দবাবুকে বলগে যা তো—একবার এসে দেখে যান—

নন্দবাবু দেখিয়া বলিল—একজন ডাক্তার ডাকতে হবে অপূর্ব, তোমার মাকে বলো ।

বৈকালে নন্দবাবুই একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিল । ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে, ব্রকো-নিমোনিয়া—ভাল নাসিং চাই, নীচের ঘরে কি এমনি ক'রে থাকে !... থোকা, তুমি একটা শিশি নিয়ে এস আমার ডাক্তারখানায়, ওষুধ দেবো—

অপু কয়দিন গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর ডাক্তারের ডিসপেন্সারী হইতে ঔষধ আনিল । বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না । দিন দিন হরিহর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল । এদিকে টাকা যে কয়টি ছিল—ভিজিটে ও পণ্যে খরচ হইয়া গেল । ডাক্তার বলিল, অন্ততঃ এক সের করিয়া দুধ ও অন্ত্রান্ত ফল না খাইতে দিলে রোগী দুর্বল হইয়া পড়িবে । সাড়ে তিন টাকা দামের একটা বিলাতী পণ্যের ব্যবস্থাও দিয়া গেল । বিদেশ, বিভূঁই জায়গা । একবার দেখিয়া সাহস দেয় এমন লোক নাই, সর্বজয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল ।

এই বিপদের মধ্যে সর্বজয়া আবার এক নতুন বিপদে পড়িল । উপরের ছাদে টাড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে রাঁধিবার ঘর দেখা যায় । ইতিপূর্বেও সে মাঝে মাঝে নন্দবাবুকে ছাদ হইতে তার রান্নাঘরের দিকে উঁকি ঝুঁকি মারিতে দেখিয়াছে, সম্প্রতি হরিহরের অস্থখ হইবার পর হইতে নন্দবাবু বড় বাড়াইয়া তুলিল । নানা অজিলায় সে দিনে দশবার ঘরের মধ্যে আসে—আগে আগে অপুকে আডাল করিয়া ভিজ্জাস করিত—আজকাল সরাসরিই তাহাকে সঞ্চোধন করিয়া কথাবার্তা । প্রথমটা সর্বজয়া কিছু মনে করে নাই—বরং বিপদের সময় এই অনাস্থীয় লোকটি যথেষ্ট সাহায্য ও দেখাশুনা করিতেছে ভাবিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞই ছিল, কিন্তু ক্রমেই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই যে বাড়াবাড়ি—ইহা কোথায় যেন বেথাপ ঠেকিতেছে । নন্দবাবু নিজে পান কিনিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলে—চাকরদের হাতে পান সাজা—জীবনটা গেল বোঁঠাক্কণ—সাজন দিকি একবার—তাচাতেও সর্বজয়া দোষ ধরে নাই, বরং এই প্রবাসী আশ্রয়স্নেহবঞ্চিত লোকটির উপর মনে মনে একটু করুণাই হইত—কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমে শোভনস্তার সীমা ভিঙাইতে চলিল । আজকাল পান আনিয়া বলে—রাখো দিকি বোঁঠাক্কণ । হাত হইতে সর্বজয়া লইবে—এইরূপই যেন

চায়। অপু তো পাগল—অধিকাংশ সময়ই বাড়ীতে তাহাকে খুঁজিয়া য়েলে না—ওঘরে হরিহর অঁচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে—আর ঠিক সেই সময়টিতেই নন্দবাবু ঘরে আসিবে রোগী দেখিতে। ছলছুতায় একথা-ওকথায় আধঘণ্টা কাটাইয়া সে ঘর হইতে যায় না। বলে কোনো ভয় নেই বোঁঠাবরণ—আমি আছি ওপরে—অপূর্ব থাকে না থাকে—ওই সিঁড়িটার ওপর গিয়ে ডেকো না। বিপদের সময় অত বাছতে গেলে একটু চুন দাও তো। বোঁটা নেই?... আতা আঙুলের মাথাতে ক'রেই একটু দাও না অমনি—

হরিহরের জ্ঞান হইলেই ছেলের জন্ম অস্থির হইয়া উঠে। এদিক-ওদিকে চানিয়া ক্ষীণ... বলে—থোকা কৈ। থোকা কৈ। সর্বজয়া বলে—আসচে, তাই কি হতচ্ছাড়া ছেলে একটু কাছে বসবে... বেরিয়েচে বুঝি সেই ঘাটে। ছেলে বাড়ী এলে বলে—বসতে পারিসনে একটু কাছে। থোকা থোকা ক'রে পাগল—থোকার তো ভেবে ঘুম নেই—যা বসগে যা. গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে নেই বুঝি? ছেলে হ'য়ে স্বপ্নে ঘণ্টা দেবেন কি না?

অপু অপ্রতিভ মুখে বাবার শিয়রের পাশে বসে। কিন্তু থানিকটা বসিয়াই মনে ভাবে—‘ও’ কতক্ষণ ব'সে থাকবো—বেশ তো? আমার বুঝি একটু বেডাতে কি খেলা করতে নেই। কনকনে ঠাণ্ডায় পা অবশ হইয়া আসে। তাহার মন ছটফট করে—এক দৌড়ে একেবারে সেই দশাশ্রমেঘ ঘাট। জলের রানা নির্মল মুক্ত হওয়া, স্তবেশ নরনারীর ভিড়। পল্টু সূদীর গুলু পটল... পল্টুর দাদা। রামনগরের রাজার সেই ময়রপঞ্জীটায় আজ আবার বাচ, বেলা চারটাব সময়। উল্খুস কবিতো কবিতো চক্ষুজ্জ্বল সজ্জা করিয়া ফেলে, মায়ের ভয়ে যাইতে সাহস পায় না।

সকালে সর্বজয়া একদিন ছেলেকে বলিল—হ্যাঁবে ওই সাদা বাড়ীটার পাশে কোন্ ছন্তর জানিস?

—উহ—

—তুই ছন্তরে থাসনি একদিনও এখানে এসে? কানীতে এলে ছন্তরে খেতে হয় কিন্তু, জানিসনে বুঝি। খেয়ে আসিস না আজ দেখেই আসিস না?

—কানীতে এলে ছন্তরে খেতে হয় কেন?

—খেলে পুণি হয়—আজ দশাশ্রমেঘ ঘাটে নেয়ে অমনি ছন্তর থেকে খেয়ে আসিস—বুঝ লি।

বেলা বারোটার সময় সজ্জ হইতে খাইয়া অপু বাড়ী ফিরিল। তাহার মা রান্নাঘরের বায়ান্দার বসিয়া বাটিতে কি লইয়া খাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা লুকাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু অপু অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—লুকাইতে গেলে সন্দেহ জাগানো হয় ভাবিয়া সহজ সুরে বলিবার চেষ্টা করিল—খেয়ে এলি? কেমন খাওয়ালে রে?

মা অডহরের ভাল ভিজা খাইভেছে।

—ভালো না:—কুমড়োর একটা ছাই ঘণ্ট—ব'সে ব'সে হয়রান—বড্ড ময়লা

কাপড় পরা লোক সব খেতে যায়—আমি আর যাচ্ছি নে, পুণিয়াতে আমার দরকার নেই—ওকি খাচ্ছ মা? তোমার বেৰ্তো নাকি? রান্না হয়নি?

—আজতো আমার কুলুইচণ্ডী। এই দুটো অডহরের ডাল ভিজে—বেশ খেতে লাগে—আমি বড্ড ভালবাসি খাবি দুটো ওবেলা?

বাক্সিতেও রান্না হইল না। তাহার মা বলিল—অডহরের ডাল ভিজে খেতে কতখানি দিকি? ১। লাগবে এখন—এবেলা রাঁধলাম না, ভারি তো খাস, এত কটা ভাতে বসিস বই তো নয়—ওই খেয়ে কি আর খেতে পারবি?

পরদিন দুপুরে নন্দবাবু একতাড়া পান অপূর হাতে দিয়া বলিল—তোমার মার কাছে থেকে সেজে নিয়ে এসো তো? রোগীর ঘরের পাশের ঘরে সর্বজয়া বসিয়া পান সাজিতেছে, নন্দবাবু জুতার শব্দ করিতে করিতে উপর হইতে নামিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই সেখানে হইতে বাহির হইয়া সর্বজয়া যে-ঘরে পান সাজিতেছে সেখানে ঢুকিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া সর্বজয়ার কিম্বুনি ধরিয়াছিল, জুতার শেষে চমক ভাঙিলে একেবারে সম্মুখে নন্দবাবু, বলিল—পান সাজা হয়েছে বোঠাকুরুণ? সর্বজয়া নীরবে সাজা পানের খিলিগুলি বেকাবীতে করিয়া সামনের দিকে ঠেলিয়া দিতে নন্দবাবু এক খিলি তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল—চুন বড্ড কম হয় বোঠাকুরুণ তোমার পানে, সরো দেখি আমি নিচ্ছি—

সর্বজয়ার কোলের কাছে পানের বাটা। বাড়ীতে কেহ নাই, অপূ কোথায় বাহির হইয়াছে। পাশের ঘরে হরিহর ঔষধের বশে ঘুমাইতেছে। নিস্তক দুপুর। হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল যেন নন্দবাবু চুন লইবার অভিল্য অনাবশ্যককপে—তাহার অত্যন্ত কাছে ঘেষিয়া আসিতে চাহিতেছে—একটা অশ্লষ্ট চীৎকার করিয়া এক লহমার মধ্যে সে উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইল। একটা বিছাতের মত কিসের স্রোত তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত খেলিয়া গেল। আঙুল দিয়া সিঁড়ি দেখাইয়া তীব্রস্বরে বলিল—চলে যান এখুনি ওপরে—কখুনো আর নীচে আসবেন না—নীচে এলে আমি মাথা ঝুঁড়ে খুন হবো—কেন আপনি আসেন? খবরদার আর আসবেন না—

সর্বজয়া পড়িল মহা ফাঁপরে। বিদেশে জায়গা, এই রোগী ঘরে—নিঃসহায় হাতে একটি পয়সা নাই, একটি পরিচিত লোক কোনো দিকে নাই, ছেলের বছর এগারো বয়স মোটে—তাও বুদ্ধিভুক্তি নাই, নিতান্ত নির্বোধ। এদিকে এইসব উৎপাত।

উপরের পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কালেক্ত্রে নীচে নামে—এক আধবার সর্বজয়াকে উপরে তাহার ঘরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ ছয় মাস কালিতে আসিয়াও সর্বজয়া না পারে হিন্দি বলিতে, না পারে ভাল বুঝিতে, কাজেই আলাপ মোটেই জন্মে নাই। অস্ত্র তাহার কাছে গিয়া নন্দবাবুর ঘটনা আত্মপূর্বক বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পাঞ্জাবী মেয়েটির নাম সুরযকুমারী, দ্বাবী-স্ত্রী দুজনেই পাঞ্জাবের রোয়ালসর জেলার অধিবাসী; স্বামীটি রেল

ওভারসিয়ারের কাজ করে। মেয়েটির বয়স খুব অল্প না হইলেও দেখিতে কমবয়সী, পৌরাকী, আয়তনহীন, আটসাঁট দীর্ঘগড়ন। সে সব শুনিয়া বলিল—কোনো ভয় নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আবার যদি কিছু বদমায়েসীর ভাব দেখেন আমার বলিবেন, আমার স্বামীকে দিয়া উহার নাক কাটিয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িব।

ঠিক দুপুর। কয় রাত্রি জাগিবার পর সর্বজন্ম মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাষ্টয়া পড়িয়াছে। উত্তরের ঘরের জানালা দিয়া একফালি হোত্র আসিয়া সৰু উঠানটাতে বীকান্তাবে পড়িয়াছে। অপু মাটির মালুমাতে গাঁদাফুলের পাছ লাগাইয়াছিল, তিনটা একপেটে গাঁদা নিতান্ত বিরক্তভাবে ফুটিয়া আছে,—তনার একটা বিড়াল-ছানা বসিয়া। অপু বাবার বিছানার পাশেই বসিয়াছিল। তাহার বাবা আজ সকাল হইতে একটু ভাল আছে—ডাক্তার বলিয়াছে বোধহয় জীবনের আশা হইল। ভাল থাকিলেও রোগীর খুব চৈতন্য আছে বলিয়া মনে হয় না, বেহুঁস অবস্থা। তাহার বাবা হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাহার দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া কি বলিল। অপু মনে হইল বাবা তাহাকে আরও কাছে সরিয়া আসিতে বলিতেছে। অপু সরিয়া আসিতে হরিহর রোগশীর্ণ কীর্ণ দুই হাতে ছেনেং গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অপু একটু অবাক হইল, বাবার চোখের ওরকম দৃষ্টি কখনো সে দেখে নাই।

রাত্রি দশটার সময় নিদ্রিত অপুর কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে কীণ আলো জলিতেছে—মা অঘোরে ঘুমাইতেছে, বাবার গলার মধ্যে নানান্তরে যেন কি শব্দ হইতেছে। তাহার কেমন ভয় ভয় ঠেকিল। ফুল-মাখানো কড়িকাঠ, স্নাতসৈতে মেঝে, হাড়ভাঙা শীত, কাঠকয়লার আগুনের ধোঁয়া—সব মিলিয়া যেন একটা কঠিন দুঃস্বপ্ন। বাবার অসুখ সারিলে যেন বাঁচা যায়।

শেষ রাত্রে তাহার মায়ের ঠেলা পাইয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল—অপু, ও অপু ওঠ, শীগ্গির গিয়ে ওপর থেকে হিন্দুস্থানী বোকে ভেকে আনতো—

অপু উঠিয়া শুনিল বাবার গলার সেই শব্দটা আরও বাড়িয়াছে। উপর হইতে সুরযকুঁয়ারী আসিবার একটু পরেই রাত্রি চারটার সময় হরিহর মারা গেল।

মাঝ-বধীর ধরাধূতর কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে মনে হয় যে পৃথিবীর রোজরোজ দিনগুলো স্বপ্ন না সত্য? এই মেঘ, এই দুদিন, অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এরাই রহিল চিরসার্থী—দিগন্তের মায়া-লীলার মত চৈত্র বৈশাখের যে দিনগুলো অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহা ফিরিয়া আসে?

চারিধার হইতে সর্বজন্মকে কি এক কুয়াশায় ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মখ দিয়া না দেখা যায় পথ, না চেনা যায় সার্থী, না জানা যায় কোথায় আছি সন্দেহ হয় এ কুয়াশা বোধহয় বেলা হইলে, রোজ উঠিলেও কাটিবে না, এ পিছনে আছে আকাশ-ছাওয়া ফিকে ধূসর বৎ-এর সান্নাদিনব্যাপী অন্ধ

কান্দলের মেঘ ।

বিপদের দিনে পাড়াবী ওভারসিয়ার জালিম সিং ও তাহার স্ত্রী যথেষ্ট উপকার করিল । জালিম সিং অফিস কামাই করিয়া সংকারের লোকের জন্য বাড়াপী-টোলায় ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল । খবর পাইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সেবকও আসিয়া পৌঁছিল ।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সংকার-অস্ত্রে সন্ধ্যাবেলায় অণু স্নান করিয়া ঠাণ্ডা পান্ডিতে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপর উঠিল । রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু তাহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল । বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অস্ত্রদিগন্তের স্নান আলো পাথরের মন্দিরগুলার আগাটুকুতে মাত্র চিক্‌চিক্‌ করিতেছে । সারাদিনের ব্যাপারে দিশাহারা অপূর মনে হইল তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে :

কালে বর্ষতু পর্জন্তুং পৃথিবী শশ্তশালিনী...

যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়া-ছিল.—রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অণু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত লহু হুয়ে শুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূর্বীর সুরে আশীর্বচন গান করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্তুং পৃথিবী শশ্তশালিনী .

লোকাঃ সন্ত নিরাময়াঃ .

পথের পাঁচালী

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কোনোরূপে মাসথানেক কাটিল । এই একমাসের মধ্যে সর্বজন্মা নানা উপায় চিন্তা করিয়াছে কিন্তু কোনাটাই সমীচীন মনে হয় না । দু-একবার দেশে কিরিবার কথাও যে তাহার না মনে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু যখন সে কথা মনে ওঠে, তখনই সে তাহা চাপিয়া যায় । প্রথমত তো দেশের এক ভিটাটুকু ছাড়া বাকী সব কতক দেনার দায়ে, কতক এমনি বেচিয়া কিনিয়া আসা হইয়াছে, অমিষমা কিছুই আর নাই, দ্বিতীয়ত সেখান হইতে বিদায় লইবার পূর্বে সে পথে, ঘাটে, ৫৫ শব্দের সম্মুখে নিজেদের ভবিষ্যতের স্তরের ছবি কতভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছে । নিশ্চিন্দপুরের মাটি ছাড়িয়া যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র, এ পোড়া মূর্খের দেশে তাহার স্বামীর কদর কেহ বুঝিল না, কিন্তু যেখানে যাইতেছে সেখানে যে তাহাকে সকলে লুকিয়া লইবে, অবস্থা দিহিতে যে এক বৎসরও দেবী হইবে না—এ কথা হাতমুখ নাড়িয়া সর্বজন্মা প্রজ্ঞাবে তাহাদের বুঝাইয়াছে । এই তো চৈত্র মাস, এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই । ইহারই মধ্যে একরূপ নিঃস্বল, দীন অবস্থায়, তাহার উপরে প্রায়শ্চেষ্টা সেখানে কিরিয়া গিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবার কথাটা

আবিভেই সে লজ্জায় সন্মোচন মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। যাহা হইবার এখানেই চটক, ছেলের হাত ধরিয়া কালীর পথে পথে ভিক্ষা করিয়া সে ছেলেকে মাতৃশয় করিবে, কে দেখিতে আসিবে এখানে ?

মাসখানেক পরে একটা সুবিধা হইল। কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক মিশনের অফিসে জানাইলেন যে, তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারের জন্ত একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে আব্রাহাম, জাতের মেয়ে, ঘরে আসিবেন কাজকর্মে সাহায্য করিবেন। মিশন এরূপ কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারেন কি না ? শেষ পর্যন্ত মিশনের যোগাযোগে ভদ্রলোকটি অপুত্রের সেখানে পাঠাইতে রাজী হইলেন ! সর্বজয়া অকুলসমুদ্রে কুল পাইয়া গেল। দিনদুই পরে সেই ভদ্রলোকটি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাসা একেবারে উঠাইয়া যাইবার জন্ত যেন ইহার প্রস্তুত হয়, কারণ সেই ধনী গৃহস্থদের বাটী কালীতে নয়, তাঁহাদের বাড়ীর কাছাকাছি কালীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

প্রকাণ্ড বড় হলুদ রঙের বাড়ীটা। কালীতে যে বকম বড় বড় বাড়ী আছে, সেই ধরণের খুব বড় বাড়ী। সকলের পিছনে পিছনে সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া সমুচিতভাবে বাড়ির ভিতর ঢুকিল।

অন্তঃপুরে পা দিতেই অভিযন্তার একটা বোল উঠিল—তাহার জন্ত নহে—যে দলটি এইমাত্র কালী হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, তাহাদের জন্ত।

ভিড় ও গোলমাল একটু কমিলে বাড়ীর গিন্নি সর্বজয়ার সম্মুখে আসিলেন। খুব মোটামোটা, এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। গিন্নিকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন—ধাক্, ধাক্, এসো, এসো—আহা এই অল্প বয়সেই এ—এটি ছেলে বুঝি ? খাসা ছেলে, কি নাম ?

আর একজন কে বলিলেন—বাড়ী বুঝি কালীতেই ? না ?—তবে বুঝি—

সকলের কৌতুহল-দৃষ্টির সম্মুখে সর্বজয়া বড় লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। গিন্নির হুকুমে যখন কি তাহার জন্ত নির্দিষ্ট ঘরে তাহাকে লইয়া গেল, তখন সে হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

পর্বদিন হইতে সর্বজয়া চুক্তিমত রান্নার কাজে ভর্তি হইল ! বাঁধনী সে একা নয়, চার পাঁচজন আছে। তিন চারটা রান্নাঘর। আশ, নিরামিষ, দুধের ঘর, কটীর ঘর, বাহিরের লোকদিগের রান্নার আলানদা ঘর। ঝি-চাকরের সংখ্যা নাই। রান্নাবাড়ীটা অন্তঃপুরের মধ্যে হইলেও একটু পৃথক। সেদিকটা যেন ঝি-চাকর-বামুনের রাজত্ব। বাড়ীর মেয়েরা কাজ বলিয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যান মাত্র, বিশেষ কারণ না ঘটিলে রান্নাবাড়ীতে বড় একটা থাকেন না।

সর্বজয়া কি বাঁধিবে একথা লইয়া আলোচনা হয়। সর্বজয়ার বরাবরই বিশ্বাস সে খুব ভাল বাঁধিতে পারে। সে বলিল নিরামিষ তরকারী রান্নার ভার বয়স তাহার উপর থাকুক ! বাঁধনী বামনি মোক্ষনা মুচ্কি হাসিয়া

‘বলিল—বাবুদের রান্না ভুঁমি করবে ? তা হ’লেই তো চিক্কির ! পরে পাঁচি-ঝিকে ডাক দিয়া কহিল, শুন্টিস, ও পাঁচি কানীর ইনি বলছেন নাকি বাবুদের তরকারী রাখবেন ! কি নাম গা তোমার ? ভুলে যাই—মোক্ষদার গুপ্তের কোণের ব্যক্তের হাসিতে সর্বজয়া সন্দিগ্ধ সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল বটে কিন্তু দু’একদিনেই সে বুদ্ধিতে পারিল যে তাহার পাড়াগাঁয়ের কোনো তরকারী রান্না সেখানে খাটিবে না । ঝোলে যে এত চিনি মিশাইতে হয় বা বাধাকার ফ্রিটার্স বলিয়া একটা যে তরকারী আছে, একথা সে এই প্রথম শুনিল ।

গৃহিণী সর্বজয়াকে মাস-দুই বেশ যত্ন করিয়াছিলেন । হালকা কাজ দেওয়া খোজ খবর নেওয়া । ক্রমে ক্রমে অল্প পাঁচজনের সমান হইয়া দাঁড়াইতে হইল । বেলা দুটা পর্যন্ত কাজ করার পর প্রথম প্রথম সে বড় অবসন্ন হইয়া পড়িত, এভাবে অনবরত আগুনের তাতে থাকার অভ্যাস তাহার কোনো কালে নাই, অত বেলায় খাইবার প্রবৃত্তিও বড় একটা থাকে না । অল্প অল্প বাধুনীরা নিজেদের জন্ত আলাদা করিয়া মাছ-তরকারী লুকাইয়া রাখে, কতক খায়, কতক বাহিরে কোথায় লইয়া যায় । সে পাতের কাছে একবার বসে মাত্র ।

রান্নার বিরাট ব্যাপার দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া যায়, এত বড় কারখানার ধারণা কোনো দিন স্বপ্নেও তাহার ছিল না, বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবে,—‘দু’বেলায় তিন সের করে তেলের খরচ ? রোজ একটা যজ্ঞের তেল-ঘি-এর খরচ ১০০ পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছোট সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে এসব বুদ্ধিয়া উঠিতে পারে না ।

একদিন সন্ধ্যা চালের ভাত রান্নার বড় ডেক্‌চিটা নামাইবার সময় মোক্ষদা বামনীকে ডাক দিয়া বলিল—ও মাসীমা, ডেক্‌চিটা একটুখানি ধরবে ?

মোক্ষদা শুনিয়াও শুনিল না ।

এদিকে ভাত ধরিয়া যায় দেখিয়া নিজেই নামাইতে গিয়া ভারী ডেক্‌চিটা কাত করিয়া ফেলিল, গরম কেন পায়ের পাতায় পড়িয়া তখনি ফোস্কা পড়িয়া গেল । গৃহিণী সেই দিনই তাহাকে রুটীর ঘরে বদলি করিয়া বলিয়া দিলেন, পা না সারা পর্যন্ত তাহাকে কোনো কাজ করিতে হইবে না ।

সর্বজয়া চালকে লইয়া নীচের একটা ঘরে থাকে । ঘরটা পশ্চিমদিকের দালানের পাশেই । কিন্তু সেটা এত নীচু, আর যেহে এত শ্রান্তিসেতে এবং ঘরটাতে সব সময় এমন একটা গন্ধ বাহির হয় যে, কানীর ঘরও এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল । দেওয়ালের নীচের দিকটা নোনা-ধরা, রাঙা রাঙা বড় বড় ছোপ, প্রতিবার বাহির হইতেই ঢুকিয়াই অপু বলে—উঃ, কিসের গন্ধ দেখচো মা, ঠিক যেন পুরোনো চালের কি কিসের গন্ধ বলো দিকি ? নীচের এ ঘরগুলো কর্তৃপক্ষ মন্তব্যবাসের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করেন নাই, সেইজন্যই এ গুলিতে চাকর-বাকর বাধুনীরা থাকে ।

উপরের দালানের সব ঘরগুলি অপু বাহির হইতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া

দেখিয়াছে, বড় বড় জানালা দরজা। জানালায় সব কাচ বসানো। ঘরে ঘরে গদি-আটা বড় বড় চেয়ার, ঝকঝকে টেবিল, যেন মুখ দেখা যায়, এত ঝকঝক করে। অপুদের বাড়ীতে যেমন কার্পেটের পুরানো আসন ছিল, ঐ রকম কিন্তু ওর চেয়েও ঢের ভাল, পুরু ও প্রায় নতুন—কার্পেট মেঝেতে পাতা। দেওয়ালে আয়না টাঙানো, এত বড় বড় যে, অপুর সমস্ত চেতরাখানা তাহাতে দেখা যায়, সে মনে মনে ভাবে—এত বড় বড় কাচ পায় কোথায়? জুড়ে জুড়ে কপেচে বোধ হয়—

দোতলার বারান্দায় আর একটা বড় ঘর আছে—সেটা প্রায়ই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে চাকরবাকরে আলো হাওয়া খাওয়াইবার জন্ত খোলে। সেটার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্ত অপুর অদমা কোতুল হয়। একদিন ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। কি বড় বড় ছবি! পাথরের পুতুল। গদী আটা চেয়ার, আয়না,—সে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সব দেখিতেছে, এমন সময় ছটু খানসামা তাকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া কথিয়া আসিয়া বলিল—কোন বা? কাছে ইস্‌মে ঘুসা?

হয়তো সেদিন সে মারই খাইত, কিন্তু বাড়ীর একজন ঝি দালান দিয়া যাঠিতে যাঠিতে দেখিয়া বলিল—এই ছটু, ছেড়ে দাও, কিছু বলো না—ওর মা এখানে থাকে—দেখচে দেখুক না—

সকালে খাওয়া-দাওয়া সারা হইলে সর্বজয়া বেলা আড়াইটার সময় নিজের ঘরটিতে আসিয়া খানিকটা শোয়। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টা কেবল মায়ের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা হয় বলিয়া মাঝে মাঝে অপু এ সময় ঘরে আসে। তাহার মা তাকে একবার করিয়া দিনের মধ্যে চায়। এ বাড়ীতে আসা পর্যন্ত অপু যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে। সারাদিন খাটুনি আর খাটুনি—ছেলের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হয়। বহুবারে কাজ সারিয়া আসিতে অপু ঘুমাইয়া পড়ে, কথা হয় না। এই দুপুরটার জন্ত তার মন ভূষিত হইয়া থাকে।

দোরে পায়ের শব্দ হইল। সর্বজয়া বলিল—কে অপু! আর—দোর ঠেলিয়া বামনী মাসী ঘরে ঢুকিল। সর্বজয়া বলিল—আহ্নন মাসীমা, বহ্নন। সঙ্গে সঙ্গে অপুও আসিল। বামনী মাসী বাবুদের সম্পর্কে আশ্বীয়া। কাজেই তাহাকে খাতির করিয়া বসাইল। বামনী মাসীর মুখ ভারী ভারী। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দেখলে তো আজ কাওখানা বড়-বৌমার? বলি কি দোষটা তুমি তো বরাবরই কটীর ঘরে ছিলে? মাছ, ঝি এসে চুপডীতে ক'রে বেখে গেল, আমি ভাবলাম বাধাকপিতে বুঝি—কি রকমটা অপমানটা দেখলে ত একবার? শোলাঘোর মাছ ত সে কথা ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠালে তো হতো? সচ্ছ ঝিও কি কম বদমায়েসের খাড়ী নাকি? গিল্লির পেয়ারের ঝি কিনা? মাটি মাড়িয়ে চলে না, ওপরে গিয়ে সাতখানা ক'রে লাগায়—ওই তো ছিরিকণ্ঠ ঠাকুরও ছিল—বলুক দিকি?

গল্প করিতে করিতে বেলা যায়। মাসী বলে, ঘাই, জলখাবারের ময়দা

বাথিগে—চারটে বাজলো—

মালী চলিয়া গেলে অপু মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। তাহার মা আদর করিয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিল—কোথায় থাকিস্ হুপুবে বলতো ?

অপু হাসিয়া বলিল ওপরের বৈঠকখানা ঘরে কলের গান বাজচে মা—
শুনছিলাম—ঐ বারান্দাটা থেকে—

সর্বজয়া খুশি হইল।

—হ্যাঁ তোর সঙ্গে বাবুদের ছেলেদের ভাব-সাব হয় নি ? তোকে ডেকে বসায় ?

—খু-উ-উব।

অপু এটা মিথ্যা বলিল। তাহাকে ডাকিয়া কেহ বসায় না। ওপরের বৈঠকখানাতে গ্রামোফোন বাজানোর শব্দ পাইলেই খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া পরে ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া যায় ও বৈঠকখানার দোরের পাশে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া গান শোনে। প্রতি মুহূর্তেই তাহার ভয় হয় এইবার হয়তো উহার তাহাকে বলিবে নীচে চলিয়া যাইতে। গান শেষ হইলে নীচে নামিবার সময় ভাবে—কেউ তো কিছু বকলে না ? কেন বকবে ? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গান শুনি বাইরে, আমি তো বাবুদের ঘরের মধ্যে যাচ্ছি নে ? এরা ভাল লোক খুব—

এ বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেও তার মেলামেশা হইল না। তাহার উহাকে আমলই দেয় নাই। সেদিন রমেন, টেবু, সমীর, সন্তু—ইহার একটা চৌকি-পিঁড়ির মত তক্তা সামনে পাতিয়া কাঠের কালো কালো গুটি চালাইয়া এক রকম খেলা খেলিতেছিল, নাম নাকি ক্যারোম খেলা—সে খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলাটি দেখিতেছিল—তার চেয়ে বেগুনবিচি খেলা চের ভালো।

বৈশাখের প্রথমে বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে বাড়ী সৰগরম হইয়া উঠিল। গয়া, মুন্সেয়, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কানী নানান্থান হইতে কুটুম-কুটুম্বিনীদের আগমন শুরু হইল। সকলেই বড়লোকের ঘরের মেয়ে, ও বড়বাবুর বধূ, প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেদের স্বি-চাকর আনিয়াছে। নীচের তলায় দালান-বারান্দা রাজে তাহারাই দখল করে। সারা রাত্রি হৈ চৈ।

সকালে সর্বজয়া ক ডাকিয়া গিয়া বলিলেন—ও অপূর্ব মা, তুমি এক কাজ করো, এখন দিন-চই রাত্রাঘরের কাজ তোমার থাকুক, নানান জায়গা থেকে তত্ত্ব আসচে, তুমি আর ছোট মোক্ষদা সে সবগুলো শুছিয়ে তোমাদের কটির ঘরের ভাঁড়ারে তোলাপাড়া করো—মিষ্টি খাবার ওখানেই রেখো, ফলফুলুরী যা দেখবে পচবার মত, সহু স্বির হাতে পাঠিয়ে দেবে, নয়ত রেখে দিও, জলখাবারের সময় নিয়ে আসবে বামনী মালী—

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বি বেহারাদের মাথায় কত জায়গা হইতে যে কত তত্ত্ব আসিতে লাগিল সর্বজয়া গুণিয়া সংখ্যা করিতে পারে না। মিষ্টানের জায়গা দিতে পারা যায় না, ছোট ছোট রুপার চন্দনের বাটি জমিয়া গেল

পনেরো বোলটা। আম এখনও উঠে নাই, তবুও একটা বড় ধামা আছে :
বোঝাই হইয়া গেল।

সর্বজয়া বামুনী মাসীর হাতে খাবার তুলিয়া দিতে দিতে ভাবে—এই এত
ভালমন্দ, এত কাণ্ড, তাই কি ছেলের জন্তে কিছু—আহা বাছা আমার
সরকারদের খাবার ঘরের কোণটায় কাঁচুমাচু হ'য়ে ব'সে দুটো ভাত খায়, না
দিতে পারি পাতে দু'খানা ভালো দেখে মাছ, না একটু ভালো তরকারী, না
এক হাতা দুধ—তখ'খনি ঐ সহু হারামজাদী লাগাবে নিজের ছেলের পাতে
বাবুদের হৈসেল থেকে সব—

বিবাহের দিন খুব ভিড়। বরপক্ষ সকালের গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়া
শহরের অল্প এক বাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যায় কিছু পূর্বে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা
করিয়া বর আসিল।

বাহিরের উঠান নিমন্ত্রিতের দলে ভরিয়া গিয়াছে সারা উঠানটাতে সত্তরঞ্চি
পাতা এক কোণে চওড়া জরিপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন, জরির
ঝালর-দোলানো নীল সাটিনের চাঁদোয়া, হুপাশে কিংখাবের ডাকিয়া, বড় বড়
বেলফুলের মালা তিনগাছা করিয়া চাঁদোয়ার খিলানে খিলানে টাঙানো ! চারি
পাশে বগয়াত্রীপণের চেয়ার ও কৌচ। বিলাতী সেন্ট ও গোলাপ জলের
পিচকারী ঘন ঘন ছুটিতেছে।

অপু এ সমস্ত বিষয় কিছু দেখে নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একবার
মাত্র সে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল, তখন স্ত্রী-আচার হইতেছে, বাক্সি অনেক !
মাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, উৎসবের ভিড়ে কে জানে কোথায় কি কাজে
বাস্ত আছে। দামী বেনারসী শাড়ী-পরা যেরেদের ভিড়ে উঠানের কোথাও
এতটুকু স্থান ফাঁকা নাই। ছোটবাবু যেরে অকণা কাহাকে ডাকিয়া বাহিরের
বৈঠকখানা হইতে বড় অর্গ্যানটা বাড়ীর ভিতরে আনিতে বলিতেছেন।

বিবাহের দিন-দুই পরে সন্ধ্যার বিয়েটার উপলক্ষ্যে আবার খুব হৈ চৈ।
উঠানের এক কোণে স্টেজ বাঁধা হইয়াছে। গোলাপফুলে ও অকিঙে স্টেজটা
খুব চমৎকার সাজানো ! পাঁচশত ডালের প্রকাণ্ড ঝাড়টা স্টেজের মধ্যে ঝাটানো
হইল। এ কয়দিনের ব্যাপারে তো একেই অপু'র তাক লাগিয়াছে, আজকার
বিয়েটার জিনিসটি কি সে আদৌ জানে না, আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত পূর্ব
হইতেই ভাল জায়গাটি দখল করিয়া রাখিবার জন্য সে আসনের সামনের দিকে
সন্ধ্যা হইতে বসিয়া রহিল।

ক্রমে ক্রমে একে একে নিয়ন্ত্রিত ভঙ্গলোকেরা আসিতে লাগিলেন, চারিদিকে
আলো জলিয়া উঠিল। বাড়ির দারোয়ানেরা জরির উদী পুরিয়া আসরের
বাহিরে ও দরজার কাছে দাঁড়াইল। সরকার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া কাজ
দেখাইতে লাগিল। কনসার্ট আরম্ভ হইল। যখন ড্রপসিন উঠিবার আর বেশী
দেরী নাই, বাড়ীর গোমস্তা গিриশ সরকার তাহার কাছে আসিয়া নীচু হইয়া
চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কে ? অপু যুখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল কিন্তু

মুখচোরা খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তাহাকে জবাব দিবার অবকাশ না দিয়াই গিরিশ সরকার বলিল—ওঠো, ওঠো এখানে বাবুয়া বসবেন—ওঠো—গিরিশ সরকার আন্দাজে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

অপু পিছনে চাহিয়া বিপন্নমুখে নামুতা পড়ার স্বরে বলিল—আমি সন্ধ্য থেকে এইখানটায় বসে আছি, পেছনে যে সব ভর্তি কোথায় যাবো? তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গিরিশ সরকার তাহার হাতের নড়া ধরিয়া জোরে কাঁকুনি দি' উঠাইয়া দিয়া বলিল—তো'র নিকুচি করেছে, জ্যাঠা ছোকরা কোথা'কার, জ্ঞান নেই, একেবারে সামনে—বাবুয়া বসবেন, উনি রাধুনীর ব্যাটা এসেছে মুখের কাছে বসতে! কোথায় যাব শুঁকে ব'লে দাও—ফাজিল জ্যাঠা কোথা'কার—যা এখান থেকে যা, ঐ থাম-টামের কাছে বসগে যা কোথাও—

পিছন হইতে হ'একজন কর্মকর্তা বলিলেন—কি হয়েছে, কি হয়েছে গিরিশ—কিসের গোল? কে ও?

—এই দেখুন না ম্যানেজারবাবু, এই জ্যাঠা ছোকরা বাবুদের এখানে এসে বসে আছে, একেবারে সামনে—চন্দননগরের গুরা এসেচেন, বসবার জায়গা নেই—উঠতে বলছি, আবার মুখোমুখি তর্ক?

ম্যানেজারবাবু বলিলেন—জ্ঞাও না দুই খান্সড় বসিয়ে—

অপু জড়সড় হইয়া কোনো দিকে না চাহিয়া অভিভূতের মত আসরের বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল আসরের সকলের চোখ তাহার দিকে, সকলেই কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রথমটা ভাবিল হঠাৎ এক দৌড় দিয়া সে এখনি এক আসর লোকের চোখের আড়ালে যে কোনো জায়গায় ছুটিয়া পালায়। তাহার পর সে গিয়া এক খাম্বের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার গা ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, ভয়ে অপমানে, লজ্জায়, তার স্মৃষ্ অল্পভূতির পর্দাগুলিতে হঠাৎ বেখান্সা গোছের কাঁপুনি লাগিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া খাম্বের আড়াল হইতে উকি মাঝিয়া দেখিল...কিন্তু চারিধারে চাকর বাকর, এপারের বারান্দায় টিনের আড়ালে মেয়েরা, ঝি-রাধুনীরাও নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা তো সকলেই ব্যাপারটা দেখিয়াছে, কি মনে করিতেছে, উহারা! না জানিয়া কি কাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে সে! সে তো জানে না ওটা বাবুদের জায়গা? সে বারবার মনকে স্মৃষ্ হইতে চেঁটা করিল তাহাকে সম্ভবতঃ কেহ চিনিতে পারে নাই। কে না কে, কত তো বাইরের লোক আসিয়াছে—কে তাহাকে চিনিয়াছে!

তাহার পর বিয়েটার আরম্ভ হইয়া গেল। সেদিকে তাহার লক্ষ্যই রহিল না। সন্ধ্যের এই লোকের ভিড়, বজ্র বায়ু, আলোর মেলা, দারোয়ান চাকরের হৈ চৈ—কোনদিকে তাহার খেয়াল রহিল না। ছটু খানসামা একটা রূপার হাঁসের পানদান লইয়া নিমজ্জিত ব্যক্তিদের সারিতে পান বিলি করিতেছিল—সেইটার দিকে চাহিয়া অপু'র গা যেন কেমন করিয়া উঠিল। উপরের বারান্দায়

দিকে চাহিয়া ভাবিল, ওদিকে যা নাই তো ? যদি যা একথা জানিতে পারে !
কিন্তু অপূর্ণ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার যা তখন সে অঞ্চলেও ছিল না, এসব
কথা তাহার কানেও যায় নাই ।

পথের পাঁচালী

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরের বাড়ী নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় চোরের মত থাকা সর্বজন্মের জীবনে এই
প্রথম । স্বথে হোক, দুঃথে হোক, সে এতদিন একা ঘরের একা গৃহিণী ছিল ।
দরিদ্র সংসারের রাজরাণী—সেখানে তাহার চকুম এই এত বড় বাড়ীর গৃহিণী,
বৌ-রাণীদের চেয়ে কম কার্যকরী ছিল না । এ যেন সর্বদা ভুজু হঠয়া থাকা,
সর্বদা মন যোগাইয়া চলা আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটা, পান
থেকে চুন না খসে ! ছোটর ছোট তন্তু ছোট !... এ তাহার অসহ্য হঠয়া
উঠিতেছিল । খাটিতে খাটিতে মুখে রক্ত ওঠে—কিন্তু এখানে খাটার মূল্য নাই ।
প্রাণপণে খাটো—কেহ নাম করিবার নাই । উহার যখন দিবে তখন গর্বের
সঙ্গে তাজিলার সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে—তোমার খাটার মূল্য দিতেছে
বলিয়া সমানে সমানে দিবে না । তোমাকে হাঁটু গাড়িয়াই লইতে হইবে ।

এ ক্রমে তাহার অসহ্য হঠয়া উঠিতেছে । কিন্তু উপায় কি ?... বাহিরে
যাইবার সুবিধা কই ? আশ্রয় কে দিবে ? কোথায় দাঁড়াইবে ?...

চিরকাল এইরকম কাটিবে ? যতদিন বাঁচিবে ততদিন ? ঐ বাম্বনি
মাসীর মত ?

বিবাহের উৎসবের জের এখনও মেটে নাই, আজ মেয়েদের প্রীতিভোজ ।
সন্ধ্যার পর হইতেই নিমন্ত্রিত মহিলাদের গাড়ী পেছনের গেটে আসিতে শুরু
করিল । ভিতরের বড় দরজা পার হইয়া সম্মুখেই মেয়ে মহলের দোতলার
বারান্দায় উঠিবার চওড়া মার্বেলের সিঁড়িটা নীলফুলের কাজ-করা কার্পেট দিয়া
মোড়া । সারা বারান্দাতে ও সিঁড়িতে গ্যাসের আলো, দোতলার বারান্দায়
উঠিবার মুখে বড় গ্যাসের ঝাড় জলিতেছে । দুই বৌ-রাণী ও বাড়ীর মেয়েরা
অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে উপরে পাঠাইয়া দিতেছিলেন । নিমন্ত্রিতা মেয়েরা
কেহ মুচকি হাসিয়া, কেহ হাসির লহর তুলিয়া, কেহ ধীর, কেহ ক্ষিপ্ত, কেহ
সুন্দর, অপূর্ণ গতি-ভঙ্গীতে, সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন ।

অপু অনেকক্ষণ হইতে নীচের বারান্দায় একটা থামের কাছে দাঁড়াইয়া
দেখিতেছিল । এ ধরণের দৃশ্য জীবনে সে এই প্রথম দেখিল, সেদিন বিবাহের
রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িবার দরুন সে বিশেষ কিছু দেখে নাই । সকলের
চেয়ে তাহার ভাল লাগিতেছিল এ বাড়ীর মেয়ে সজ্জাতাকে । সে কার্পেট-
মোড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া এক একবার নামিয়া আসিতেছে
নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে কাহারও দিকে হাসিমুখে বলিতেছে—বা বেশ তো মণি-দি !
একেবারে রাত আটটা কোরে ? বকুলবাগানের বৌদি এলেন না ? অভ্যর্থিত

সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—গাড়ী সাজিয়ে ব'সে আছি বেলা ছটা থেকে...বেকনো তো লোজা নয় ভাই, সব তৈরী না হোলে তো...জানোই তো সব—

সুজাতা কানুনজুল রং-এর দামী চায়না ক্রেপের হাতকাটা জামার ফাঁক দিয়া বাহির হওয়া ভুল, সুগোল, নিটোল বাহু দিয়া পিছন হইতে নিমন্ত্রিতাকে বেঠেন করিয়া আদরের ধরণে তাঁহার ডান কাঁধে মুখ রাখিয়া একসঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিল। বলিতে বলিতে চলিল...মা বলছিলেন বকুলবাগানের বৌদি নাকি সামনের মাসে যাবেন কলকাতা,—বুধবারে মা গেছিলেন যে—ঠিক কিছু হোল ?

সিঁড়ির উপরের ধাপে মেজ বো-রাণী দেখা দিলেন। বয়স একটু বেশী, বোধ হয় ত্রিশের উপর, অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর বেশের কোন বাছল্য নাই, ফিকে চাপারঙের চওড়া লালপাড় বেশমী শাড়ীর প্রান্ত মাথার চুলে হীরার ক্লিপ দিয়া আঁটা, সিঁড়ির বড় ঝাড়ের আলোয় গলার সরু সোনার চেন চিক্ চিক্ করিতেছে, সুন্দর গড়ন, একটু ধীর, গভীর—এই বয়সেও দুধে-আলতা রং-এর আভা অপূর্ব। মাস খানেক হইল উপযুক্ত ভাই মারা যাওয়াতে একটুখানি বিষাদের ছায়া পরিণত মুখের সৌন্দর্যকে একটি সংযত শ্রী দান করিয়াছে।

মনি-দি উঠিতে উঠিতে মেজ বো-রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া সিঁড়ির উপরই দাঁড়াইয়া গেলেন—মেজ বৌদির শরীর আজকাল কেমন আছে ? এই দেখুন না, একবার আসবো আসবো ক'রে...কাল ঠুঁরা এটোয়া থেকে সব এলেন, তাই নিয়ে অনেক রাত অবধি ..

এত সুন্দর দেখিতে মানুষ হয়, অপূর্ব এ-ধারণা ছিল না। অপু ইহাকে এই প্রথম দেখিল কারণ ইনি এতদিন এখানে ছিলেন না, ভাইয়ের মৃত্যুর পর সবে দিনকয়েক হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছেন—সে মুগ্ধ চোখে অপলক বিশ্বয়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই আলো, চারিধারে সুন্দরী বয়েসা, দামী পুষ্পসারের সুস্থ মনমাতানো সৌরভ, বীণার স্বাক্ষরের মত স্বর ও হাসির সহরীতে তাহার কেমন এক নেশা জমিয়া গেল। এই যদি সারাদিন চলে ?

মেজ বো-রাণী অনেকক্ষণ হইতেই দেখিতেছিলেন সিঁড়ির কোণে কে একজন অপরিচিত ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। সকলকে তিনি জানেন না—তাঁহার বাপও খুব বড় লোক, প্রায়ই বাপের বাড়ী থাকেন। ছ-ধাপ নামিয়া আসিয়া মুহূর্তে ডাকিয়া বলিলেন—খোকা উঠে এস। দাঁড়িয়ে কেন ? তুমি কোথেকে আসছ ?

অপু অন্তরিক্তে চাহিয়া একদল আগন্তুকদের লক্ষ্য করিতেছিল—ঠাণ্ডা কিরিয়া চাহিয়া তাহাকেই মেজ বো-রাণী ডাকিতেছেন দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল—যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। পরেই রাজ্যের লজ্জা আসিয়া জুটিতেই সে উপরে উঠিয়া যাইবে কি ছুটিয়া পলাইবে ভাবিতেছে—এমন সময় মেজ বো-রাণী নিজেই নামিয়া আসিলেন—কাছে আসিয়া বলিলেন—কোথেকে আসচ খোকা ?...

অতি কষ্টে অনেক চেষ্টায় অপূর্ব মুখ দিয়া বাহির হইল—আমি—আমি—ঐ—আবার মা—এই বাড়ী থাকেন—সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভ্যস্ত ভয় হইল যে,

এখানে সে দাঁড়াইয়া আছে—কোথাকার রাঁধুণীর ছেলে—একথা শুনিয়া এখনি হয়তো ইনি কাতাকেও ডাকিয়া বলিবেন—ইতাকে গলাধাক্কা দিয়া বাতির করিয়া দাও এখান থেকে!...

মেজ বো-রাণী কিম্ব সে সব কিছুই করিলেন না—তিনি বিস্মিত মুখে বলিলেন—এ বাড়ী থাকেন তোমার মা? কে বল তো... কি করেন কতদিন তোমরা এসেচ?...

অপু ভাঙা ভাঙা কথায় আবোল তাবোল ভাবে পরিচয় দিল। মেজ বো-রাণী বোধ হয় ইত্যাদের কথা এবার আসিয়া শুনিয়াছেন। বলিলেন—ও তোমরা কালী থেকে এসেছ বুঝি?—কি নাম তোমার? তাহার স্বন্দর, সরল চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বোধ হয় কেমন করুণা হইল। বলিলেন—এস না ওপরে দাঁড়াবে—এখানে কেন?—ওপরে এস...

অপু চোরের মত বো-রাণীর পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া কোণ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপরে মেয়েদের বড় মজলিস—সারা বারান্দাটা কার্পেট মোড়া। ধারে ধারে বড় বড় কাঁচকড়র টেব গোলাপ গাছ, এরিকা গাছ। কোণে বড় বৈঠকখানার অর্গানটা। একটি মেয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধির পরে অর্গ্যানের ধারে ছোট গদি-আটা টুলে গিয়া বসিলেন ও দু-একবার হালকা হাতে চাবি টিপিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাসিমুখে গান ধরিলেন। মেয়েটি দেখিতে সুন্দরী নয়, বংটা মাঝামাঝি, কিম্ব গানের গলা ভারি সুন্দর। তাহার পর আর একটি মেয়ে গান গাহিলেন, এ মেয়েটি দেখিতে তত ভাল নয়। মেজ বো-রাণীর মেয়ে লীলা একটি হাসির কবিতা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আবৃত্তি করিয়া সকলকে খুব হাসাইল। ভারি সুন্দর মেয়ে, মায়ের মত সুন্দরী। আর কি মিষ্ট হাসি!

অপু ভাবিতেছিল এই সময় তাহার মা একবার উপরে আসিয়া দেখিল না কেন? কোথায় রহিল মা কোন্ বান্ধাঘরে পড়িয়া, হয়তো কাজ করিতেছে, এসব মা আর কোথায় দেখিতে পাইবে?

মেয়েদের মজলিস চলিতেছে, এমন সময় নীচে এক হৈ-হৈ উঠিল। পিবিব সবকারের গলাটা খুব শোনা যাইতেছিল!

সহু ঝি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া বলিল—পোড়ানি!...কাণ্ড জাখো...হি...হি...বলে কিনা হাঁকোর মধ্যে...হি...হি... দুইজন নিমন্ত্রিতা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছে রে? কি?

—ঐ ঠিকে ঠাকুর একটা এসেছিল কোথেকে—লুচি ভাজতে গিয়েচে... সবকারের খাবার ঘরের উঠানে ব'সে লুচি ভাজচে, বলে আসি বাইরে থেকে একবার, হাঁকোর মধ্যে ঘি নিয়ে যাচ্ছে পুরে চুরি করে আধসেরের ওপর গোমস্তা মশায় ধরেচে...বান্ধনিহোর সিং মার যা দিচ্ছে...চুলের ঝুঁটি না ধরে—

সর্বজন্মের আজ, সকাল হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। প্রায় দুই মণ মাছ ভাজার ভার তার একবার উপর—সকাল আটটা হইতে সে বাছে

ঘরে এই কাজেই লাগিয়া আছে। চোঁচামেচি ভুনিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল এক উঠান লোকের মধ্যে একজন পঁচিশ ত্রিশ বছরের পাতলা, ময়লা রং এর, মথলা কাপড় পরা বামূনের ছেলেকে দু' তিনজনে মিলিয়া কেহ কিল, কেহ চড় বধণ করিতেছে—লোকটা ঠিকে রাঁধুনী অগ্নিকার কার্যের জন্তই বাহির হইতে আসিয়াছিল—সে নাকি হকার ভিতর করিয়া ঘি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার সে হঁকাটি একদিকে ছিটকাইয়া ঘি টুকু উঠানের একদিকে পড়িয়া গিয়াছে—মারের চোটে কাছা খুলিয়া গিয়াছে—লোকটা বিপন্নভাবে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিতেছে এবং হঁকার ভিতরে দ্ব্যত পাওয়া একটা যে খুব স্বাভাবিক এবং নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বা ইহার মনো মন্দেহের বা আশ্চর্য হইবার কথা কিছুই নাই—এই কথা উন্নত জনসঙ্ঘকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথা শেষ না করিতে দিয়াই শত্ৰুনাথ সিং দাবোয়ান তাহাকে এমন এক ঠেলা মারিল যে, অক্ষুটস্থরে 'বাবা রে' বলিয়া দালানের কোণের দিকে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল এবং থামের কোণে মাথাটা ঠক্ করিয়া জোরে লাগিয়া বোধহয় রক্তও বাহির হইল।

সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হযেচে ক্ষেমিমাসি। আহা গুরুকর্ম ক'রে মারে? বামূনের ছেলে

ক্ষেমি বলিল—মারবে না?—হাড় গুঁড়ো করে ছাড়বে, মারার হযেচে কি এখনো, পুলিশে দেবে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—

ক্ষেমি ঝির মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

সে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই তটস্থ অবস্থায় দাড়াইয়া রহিল। সর্বজয়া চাহিয়া দেখিল একজন পর্য্যট-সত্তর বছরের বৃদ্ধা সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন, পাশাপাশি গৃহিণী, পিছনে দুই বৌ রাণী ও এ বাড়ীর মেয়ে অরুণা ও হুজ্জাতা। সকল ঝি চাকরের দল তটস্থ অবস্থায় সিঁড়ির নীচের বারান্দায় কাতার দিয়া দাড়াইয়া—এ উহার পিঠে ঊঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে চুপ চুপি বলিল, কে ক্ষেমিমাসি? ক্ষেমি ঝি ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল—কোথাকার রাণীমা—সর্বজয়া ভাল শুনিতে পাইল না। কিন্তু তাহার মনে হইল ঠিক গুরুকর্ম চেহারার মানুষ সে যেন কোথায় আগে দেখিয়াছে। গিন্নী কাহাকে বাল বন—খিড়কীর ফটকে ইনার পাকী আসিয়াছে কিনা দেখিয়া আসিতে। বৃদ্ধার নিজের সঙ্গেও দুই তিনটি ঝি আসিয়াছে, তাহারা পিছনে পিছনে আছে। নানা বিদায় আপায়নের বিনিময় হইল, বহু বিনীত হস্ত বিস্তার লাভ করিল, হঠাৎ এ বাড়ীর ঝি-চাকরের দল মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া থানিকক্ষণ যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিল। সর্বজয়া মনে মনে ভাবিল—এরা এত বড় লোক, এরা যখন এত খাতির করবে, তখন তো যে সে নয়। বৃদ্ধার বোল বেহারার প্রকাণ্ড পাকীটা খিড়কীর ফটকেই এতক্ষণ ছিল, বৃদ্ধাও পাকীতে উঠিলেন। তাহার দায়োয়ানেরা পাকীর সামনে পিছনে দাঁড়াইল। জঁহাকে বিদায় দিয়া গৃহিণী, অজ্ঞাত মেয়েরা উপরে উঠিয়া গেলেন।

মাসিয়া কটির ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—পরমা রে বাণু, দেখলে তো পয়সার আদরটা ? নিজেরই মস্ত জমিদারী, ভূনাথ টাকা দান করেছেন বাঙাল দেশের কোণাকার কলেজের জন্তে,—পয়সারই আদর—আর এই তো আমিও আছি...ওদের তো আপনার লোক...গেরাজি করে কেউ !

সর্বজয়ার কিন্তু সেদিকে মন ছিল না। এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এইরকম চেহারার ও এইরকম বয়সের—সেই তাহার বড়ী ঠাকুরস্বি ইন্দির ঠাকুরণ, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা, ভাঙা পাথরে আমড়াভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাকলের জন্ত কত অপমান, কেউ পোছে না, কেউ মানে না, চপুবেলায়, সেই বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু...

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মাতৃশ্বেদ অস্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বারবার মনে মনে কমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

পথের পাঁচালী

ত্রয়শ্লিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পর অপু দালান দিয়া বাইতেছে, উপরের সি ডি বাড়িয়া মেজবৌ-রাণীর মেয়ে লীলা নামিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—দাঁড়াও না ? তোমার নাম কি,—অপু নাকি ?

অপু বলিল—অপু ব'লে মা ডাকে—ভাল নাম শ্রীঅপূর্বকুমার বায়...

সে একটু অবাক হইল। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কখনও ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। লীলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কি সুন্দর মুখ ! রাগুদি, অতসী-দি, অমলা-দি, সকলেই দেখিতে ভাল বটে, কিন্তু তখন সে তাহাদের চেয়ে ভাল কাহাকেও দেখে নাই। এ বাড়ী আসিয়া পর্যন্ত তাহার পূর্বকথা ধারণা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া মেজবৌ-রাণীর মত সুন্দরী—সেদিন যখন লীলা মেয়েদের মজলিসে হাসির কবিতা বলিতেছিল, তখন অপু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কবিতা সে ভাল শোনে নাট।

লীলা বলিল—তোমরা কতদিন এসেচ আমাদের বাড়ী ? সে-বার এসে তো দেখিনি ?

—আমরা ফাস্তন মাসে এইচি, এই ফাস্তনমাসে—

—কোথেকে এসেচ তোমরা ?

—কালী থেকে। আমার বাবা সেইখানে মাঝা গেলেন কিনা—তাই—

অপুর যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। সারা ঘটনাটা এখনও যেন অবাস্তব, অসম্ভব ঠেকিতেছিল। লীলা, মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা তাহাকে ডাকিয়া

যাচিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। খুশিতে তাহার সারা গা কেমন করিতে লাগিল !

লীলা বলিল—চল, আমাব পড়াব ঘরে গিয়ে বসি, মাষ্টার মশায়ের আসবার সময় হয়েছে—এস—

অপু জিজ্ঞাসা করিল—আমি যাবো ?

লীলা হাসিয়া বলিল—বা—রে বল্চি তো চল, তুমি তো ভারি লাজুক ?
এস—তুমি দেখে নি আমার পড়ার ঘর ? ওই পশ্চিমের দালানের কোণে ?

ঘর বেশী বড় নয়, কিন্তু বেশ সাজানো। একটি ছোট পাথরের টেবিলের দু'পাশে দু'খানা চামড়ার গদি-আটা চেয়ার পাতা। একখানা বড় ছবিওয়াল ক্যালেন্ডার। সবুজ কাঁচকড়ার খোলে একটা ছোট টাইমপিস্ ঘড়ি। একটা বই রাখিবার ছোট দেওয়াজ। চারপাঁচখানা বাঁধানো ফটোগ্রাফ এ দেওয়ালে, ও দেওয়ালে। লীলা একটা চামড়ার এ্যাটামি কেস্ খুলিয়া বলিল—এই ছাথো আমার জলছবি, মাষ্টার মশায় কিনে দিয়েছেন, ভাগ শিখলে আরও দেবেন, জলছবি ওঠাতে জানো ?

অপু বলিল—তুমি ভাগ জানো না ?

—তুমি জানো ? ভাগ করেছে ?

অপু তাকিল্যের সহিত ঠোট উন্টাইয়া বলিল—কবে।

এই ভঙ্গীতে অপুর সুন্দর মুখ আরো সুন্দর দেখাইল।

লীলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বেশ মজার কথা বলতে পারো তো ? পরে সে অপুর ঠোঁটের নীচে হাত দিয়া বলিল—এটা কি ? তিল ? বেশ দেখায় তোমার মুখে, তিলে বেশ মানিয়েচে, তোমার বয়স কত ? তেরো ? আমার এগাবো—তোমার চেয়ে দু বছরের ছোটো—

অপু বলিল—তুমি সেদিন মুখস্ত বলেছিলে সেই একটা হাসির ছড়া, বেশ লেগেচে আমার—

—তুমি জানো কবিতা ?

—জানি—বাবার একখানা বই আছে, তা থেকে শিখিছি—

—বলো দিকি ?

লীলার গলার স্বর কি মিষ্টি, এমন স্বর সে কোনো মেয়ের এ পর্যন্ত শোনে নাই।

অপু ঘাড় হুলাইয়া বলিল—

যে জনের খড় পেতে খেজুর চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে,

তাকে খাট-পালক খাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে ?

কথার শেষে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। বলিল—দাদু রায়ের পাঁচালীর ছড়া, আমার কাছে বই আছে—

লীলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি। বলিল—তুমি ভারি মজার কথা জানো তো, এমন হাসাতে পারো তুমি !

লীলার মুখের প্রশংসায় অপূর মনে আত্মলাদ ধরে না। সে উৎসাহের স্বরে বলিল—আর একটা বলবো? আমি আরও জানি—পরে সে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া একটুখানি ভাবিয়া লইয়া পরে আবার ঘাড় হুলাইয়া আগন্তু করে :—

মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অত্র আশা
নিষ্কর্য লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
পনীর চিন্তা পন আর নিরেনকসই—এর ধাক্কা,
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ককিবেব চিন্তা মক্কা,
গৃহদেব চিন্তা বজ্রায় রাখতে চারি চালের ঠাটটা।
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেটটা।

এ ছড়ার সকল কথার অর্থ লীলা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার যোগাড় করিল। বলিল, দাঁড়াও লিখে নেবো—

লীলা এ্যাটাসি কেস্ হইতে একটা কলম বাহির করিয়া বলিল—বলো দিকি?

অপু আবার বলিতে সুরু করিল। খানিকটা পরে একটু অবাক হইয়া বলিল—কালি নেওনি তো, লিখ্চো কেমন করে?

লীলা বলিল—এ তো ফাউন্টেন পেন—কালি তো লাগে না, এর মধ্যে ভরা আছে—জানো না?

অপূর হাতে লীলা কলমটা তুলিয়া দিল। অপু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—এ তো বেশ, কালিতে মোটে ডোবাতে হয় না!

—তা নয়, কালি ভরা থাকে, ভরে নিতে হয়—এই ছাখো, দেখিয়ে দি—

—বাঃ, বেশ তো!—দেখি একবারটি—

লীলা কলমটা অপূর হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল—তোমায় দিয়ে দিলাম একেবারে—

অপু অবাক হইয়া লীলাব দিকে চাহিল! পরে লজ্জিতমুখে বলিল—না আমি নেবো না—

লীলা বলিল—কেন?

—উহ—

—কেন?

—নাঃ!

লীলা একটু হতবিশত হইল। বলিল—না?...আমি আর একটা বাবার কাছ থেকে নেবো, নাও তুমি এটা, দেখি তোমার হাত? বাস! আর ফেরত দিতে পারবে না।

ব্যাপারটা অপূর সম্পূর্ণ অবাস্তব ঠেকিল। সে বলিল—কিন্তু তোমায় যদি কেউ বকে?

লীলা বলিল—ফাউন্টেন পেন দেবার অস্ত্রে? কেউ বকবে না, আমি মাকে

বলবো অপূর্বকে দিয়ে দিলাম—বাবার কাছ থেকে আর একটা নেবো—বাবার কটো দেখবে?...ওই কালেণ্ডারের পাশে টাঙানো—দাঁড়াও পাড়ি—

তাহার পর লীলা আবও দু'তিন খানি কটো দেখাইল। আলমারি হইতে খানকতক বই বাহির করিয়া বলিল—মাষ্টার মশায় কিনে দিয়েছেন—তুমি কোন স্থলে পড়ো?

অপু কানীতে সেই যা দিনকতক স্থলে পড়িয়াছিল, আর ঘটে নাই। বলিল—কানীতে পড়তাম, এখন আর পড়ি নে—কথাটা বলিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল বলিয়াই শেষের কথাটা এমন স্বরে বলিল, যেন না পড়িয়া থুব একটা বাহাদুরী করিতেছে। একথানা বইয়ে অনেক ছবি! অপু বলিল—বইখানা পড়তে দেবে একবারটি? লীলা বলিল—নাও না? আমার আরও অনেক ছবির বই আছে, তিন বছরের বাঁধানো মুকুল আছে, মায়ের ঘরের আলমারীতে, এনে দেবো, পড়ো—

অপু বলিল—আমার কাছেও বই আছে, আনবো?

লীলা বলিল—চলো, তোমাদের ঘরে যাই—

লীলাকে নিজেদের ঘরে লইয়া যাইতে অপূর লজ্জা করিতে লাগিল। আসবাবপত্র কিছু নাই, ছেঁড়া বালিশের ওয়াড়, আলমারি গায়ে দেওয়ার কাঁথা। লীলা তবুও গেল। অপু নিজের টিনের বাক্সটা খুলিয়া একথানা কি বই হাসি-হাসি মুখে দেখাইয়া গর্বের স্বরে বলিল—আমার লেখা, এই ছাথো ছাপার অঙ্করে আছে আমার নাম—

লীলা তাড়াতাড়ি হাত হইতে লইয়া বলিল—দেখি দেখি?

সেই কানীর স্থলের ম্যাগাজিনটা। হরিহর ছেলের গল্প ছাপানো দেখিয়া যাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যুর তিন দিন পরে কাগজ বাহির হয়। লীলা পড়িতে লাগিল, অপু তাহার পাশে বসিয়া উৎকৃষ্ট মুখে লীলার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পঠিত লাইনগুলি নিজেও মনে মনে একবার করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। শেষ করিয়া লীলা প্রশংসমান চোখে অপূর মুখের দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—বেশ তো হয়েছে, আমি এখানা নিয়ে যাই, মাকে দেখাবো—

অপূর ভাণ্ড লজ্জা হইল। বলিল—না—

লীলা শুনি ন। কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিল। বলিল—নিশ্চিন্দিপুর লেখা আছে, নিশ্চিন্দিপুর কোথায়?

নিশ্চিন্দিপুর যে আমাদের গাঁ—সেইখানেই তো আমাদের আসল বাড়ী—কানীতে তো মোটে বছর-খানেক হ'ল আমরা—

এমন সময় ছোট মোক্ষদা চব্বারের কাছে আসিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া কহিল—ওমা দিদিমণি, তুমি এখানে ব'সে? আমার পোড়ানি! ওদিকে মাষ্টারবাবু ব'সে ব'সে হয়রান, আমি ওপর নিচে সব খুঁজে খুঁজে—তা কে জানে তুমি এই এ'দো-পড়া কুঠুরিতে—এস এস—

লীলা বলিল—যা ভূই, আমি যাচ্ছি, যা—

ছোট মোক্ষদা বলিল—তা বসবার কি এই জায়গা নাকি ? বলে আমাদেরই তাই মাথা ধরে—তাই কি ওই আশ্রয়বলের খোঁটা মিসেরা ঘোড়ার জায়গাগুলো কাঁট দেয়, না পোয় ? উহ-হ, কি গন্ধ আসচে ঢাথো—এস—দিদিমনি, শিগ্গির—

লীলা বলিল—যাবো না যাঃ, আমি আজ পড়বো না, যা বল্গে যা, কে তোকে বলেছে এখানে বসবস করতে ? যা মাকে বল্গে যা—

ছোট মোক্ষদা খুব খুব করিয়া চলিয়া গেল ! অপু বলিল—তোমার মা বসবেন না ? কেন ওকে ওরকম বলে ?

পরদিন ভুপুরে সে নিজের ঘরে ঘুমাইতেছিল । কাহার ঠেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাতিয়াই দেখিল—লীলা হাসিমুখে বিছানার পাশে । সে মেজেতে মাতুর পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, লীলা হাটু গাড়িয়া বসিয়া তাকে ঠেলা মারিয়া উঠাইয়াছে, এখনও সেট ভাবেই কৌতুকপূর্ণ ভাগর চোখে তাহার দিকে চাতিয়া আছে । হাসিমুখে বলিল—বেশ তো, ভুপুরবেলায় বুঝি এমন ঘুমোয় ? আমি বাঁর থেকে ডাক দিলাম, এসে দেখি খুব ঘুম—

অপু ষোড়শ খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল । বলিল—সকালবেলা পড়তে আসোনি ? আমি তো পড়ার ঘর-টর খুঁজে দেখি কোথাও নেই—

লীলা অপূর স্বরের সেই কাগজখানা অপূর হাতে দিয়া বলিল—মাকে প'ড়ে শোনালাম কাল ব্যস্ত, মা নিজেও প'ড়ে দেখলেন । অপূর সারা গা খুশিতে কেমন করিয়া উঠিল ! অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইল । মেজ বো-বাণী তাহার লেখা পড়িয়াছেন !

লীলা বলিল—এমো আমার পড়ার ঘরে, 'সখা-সাক্ষী' বাঁধানো এনে রেখেছি তোমার জন্যে—

অপু আলনার দিকে চাহিল । তাহার ভাল কাপড়খানা এখনও শুকায় নাই, যেখানা পরিয়া আছে সেখানা পরিয়া বাহিরে যাওয়া যায় না । বলিল—এখন যাবো না—

লীলা বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কেন ?

অপু ঠোট চাপিয়া সকৌতুক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল । সে জানে না তাহার মুখ কি অপূর্ব স্বন্দর দেখায় এই ভঙ্গীতে ।

লীলা মিনতির স্বরে বলিল—এস এস—

অপু আবার মুখ টিপিয়া হাসিল ।

—বাবা, কি একগুঁয়ে ছেলে যে তুমি ! না বলে আর হা হ'বার যো নেই বুঝি ? আচ্ছা দাঁড়াও, বইটা এখানে—

অপু হাসি চাপিতে না পারিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল ।

লীলা বলিল—অত হাসি কেন ? কি হয়েছে বলো—না বলতেই হবে—

বলো ঠিক—

অপু আলনার দিকে হাসি-ভরা চোখের ইঙ্গিত করিল মাত্র, কিছু বলিল না।

এবার লীলা ব্যুলিল। আলনার কাছে গিয়া হাত দিয়া বলিল—একটুখানি শুকিয়েচো, তুমি বসো, আমি বইখানা আনি—ফাউন্টেন পেনে লিখ্‌চো? কেমন, বেশ ভাল লেখা হয় তো?

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া লীলার আনা বই দু'জনে দেখিল। বই মাদুরে পাতিয়া দুইজনে পাশাপাশি হাঁটু গাডিয়া বসিয়া উপুড় হইয়া বইএর উপর খুঁকিয়া বই দেখিতেছিল। লীলার বেশমের মত চিকণ নরম চুলগুলি অপূর্ব খোলা গায়ে লাগিয়া যেন গা শিব্ শিব্ করে। ষষ্ঠাং লীলা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি গ'ন জানো?

অপু ঘাড় নাড়িল।

—তবে একটা গাও—

—তুমি জানো?

—একটু একটু, কেন বিয়ের দিন শোনোনি?

ছোট মোক্ষদা কি ঘরে উঁকি মাড়িয়া কহিল—এই যে দিদিমণি এখানে। আমিও ভেবেচি তাই, উপরে নেই, পড়ার ঘরে নেই, তবে ঠিক—এস দিকি, এই দুধটুকু খেয়ে যাও জুড়িয়ে গেল—হাতে ক'রে বুজে বুজে হয়রান—

রূপার ছোট ঘাসে এক মাস দুধ। লীলা বলিল—রেখে যা—এসে এবার মাস নিয়ে যাস—

কি চলিয়া গেল। আরও খানিকটা ছবি দেখা চলিল। এক ফাঁকে লীলা দুধের মাস হাতে তুলিয়া বলিল—তুমি খেয়ে নাও আদ্যেকটা—

অপু লজ্জিত হইতে বলিল—না।

—তোমাকে ভারি খোসামোদ করতে হয় সব তাতে—কেন ও রকম? আমাদের মূলতানী গরুর দুধ—খেয়ে নাও—কীরের মত দুধ, লক্ষ্মী ছেলে—

অপু চোখ কুঁচকাইয়া বলিল—ই: লক্ষ্মী ছেলে। ভারি ইয়ে কিনা? উনি আবার—

লীলা দুধের মাস অপূর্ব মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর লজ্জায় কাজ নেই—আমি চোখ বুজে আছি নাও—

অপু এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া ফেলিয়া মুখ নামাইয়া লইল ও ঠোঁটের উপর দুধের দাগ তাড়াতাড়ি কৌচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে হাসিয়া ফেলিল।

লীলা মাসে চুমুক দিয়া বাকী দুধটুকু শেষ করিল, পরে সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—বেশ মিষ্ট দুধ, না?

—আমার এঁটো খেলে কেন? খেতে আছে পরের এঁটো?

আমার ঠেঁকে—একটুখানি খামিয়া কহিল—তুমি বলে জলছবি তুলতে জানো, ছাই জানো, দাঁও তো আমার ক'খানা জলছবি তুলে?

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সর্বজয়া চাহিয়া-চিন্তিয়া কোনো একমে অপূর উপনয়নের ব্যবস্থা করিল। পরের বাড়ী, ঠাকুর-দালানের রোয়াকের কোণে ভয়ে ভয়ে কাজ সারিতে হইল। বামুনী মামী নাড়ু ভাজিতে সাহায্য করিল, ত'একজন বামুনী বামুনঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, বাড়িরের সম্রাস্ত্র লোকের মধ্যে বীণা গোমস্তা ও দাঁতু খান্ধা। উপনয়ন মিটিয়া যাওয়ার দিন-কতক পরে, অপূ নিজেই ঘণটিতে বসিয়া বসিয়া লীলার দেওয়া বাঁধানো 'মুকুল' পড়িতেছিল। থোলা দরজা দিয়া কে ঘরে ঢুকিল। অপূ যেন নিজের চোখে বিশ্বাস করিতেই পারিল না, তাহার পরই বলিয়া উঠিল—এ কি, বাঃ—কখন—

লীলা কৌতুক ও হাসিভরা চোখে দাঁড়াইয়া। অপূ বলিল—বাঃ বেশ তো তুমি। ব'লে গেলে সোমবারে আসবো কল্কাতা থেকে, কত সোমবার হ'য়ে গেল—ফেরবার নামও নেই—

লীলা হাসিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িল। বলিল—আসবো কি ক'রে? স্কুলে ভর্তি হয়েছি, বাব' দিয়েছেন ভর্তি ক'রে, বাবার শরীর খারাপ, এখন আমরা কল্কাতার বাড়ীতেই থাকবো কিনা। এখন ক'দিন ছুটি আছে, তাই মা'র সঙ্গে এলাম—আবার বুধবারে যাবো।

অপূর মুখ হঠাৎ হাসি মিলাইয়া গেল। বলিল—থাকবে না আর তোমরা এখানে?

লীলা বলিল—বাবার শরীর ভালো হ'লে আবার আসবো—

পরে সে হাসিমুখে বলিল—চোখ বুজে থাকো তো একটু? অপূ বলিল—কেন?

—থাকো না?

অপূ চক্ষু বুজিল ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে কি একটা ভারী জিনিসের স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ খুলিতেই লীলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা কাউ বোর্ডের বাক্স তাহার কোলের উপর। বাক্সটা খুলিয়া ফেলিয়া লীলা দেখাইল ভাল দেশী ধুতি চাদর ও বাঙা সিল্কের একটা পাঞ্জাবী। লীলা হাসিমুখে বলিল—মা দিয়েছেন—কেমন হয়েছে? তোমার পৈতের জন্তে—

ধুতি চাদর বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবীটা দরের জিনিস, ব্যবহার করা দূরের কথা' এ বাড়ীতে পা দিবাব পর্বে অপূ চক্ষেও কখনো দেখে নাই।

লীলা অপূর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এক মাসে তোমার মুখ বদলে গিয়েছে, আরও বড় দেখাচ্ছে, দেখি নতুন বামুনের পৈতে?—তারপর কান বেঁধাতে লাগলো না? আমার ছোট মামাতো ভাইয়েরও পৈতে হোল কিনা, সে কেঁদে ফেলেছিল—

হঠাৎ অপূ একথাও 'মুকুল' দেখাইয়া বলিল—পড়েচো এ গল্পটা?

লীলা বলিল—কি দেখি ?

অপু পড়িয়া শোনাইল। সমুদ্রের তলায় কোন্ স্থানে স্পেনদেশের এক ধনবত্ত-পূর্ণ জাহাজ দুই তিনশত বৎসর পূর্বে ডুবিয়া যায়—আজ পর্যন্ত আনক খোঁজ করিয়াছে, কেহ স্থানটা নির্ণয় করিতে পারে নাই। গল্পটা এইমাত্র পড়িয়া সে ভারি খুশি হইয়াছে।

বলিল—কেউ বাব করতে পারেনি—কত টাকা আছে জানো ? একক, দশক, শতক সহস্র অযুত, লক্ষ—পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডের মোনা কপো এক পাউণ্ড তের টাকা—গুন করো দিকি ? তাহার পর সে তোড়াতোড়ি একটু কাগজে আঁকটা কবিয়া দেখাইয়া বলিল—এই এক টাকা। আগেও আঁকটা সে একবার কথিয়াছে। উজ্জ্বল মুখে বলিল—আমি বড় হোলে যাবো—দেখ বো গিয়ে—ঠিক বাব কর্বো দেখো—কেউ সম্ভান পায়নি, এখনও সেথেনে—

লীলা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল—তুমি যাবে ? কোন্ জায়গায় আছে তুমি বাব করবে কি করে ?

—এই ছাথো, লিখেছে ‘পোতো প্লাতার সন্নিহিত সমুদ্রগর্ভে’—খুঁজে বাব করবো।

সে গল্পটি পড়িয়াই ভাবিয়াছে, ভালোই হইয়াছে কেহ বাহির করিতে পারে নাই। সবাই সব বাহির কবিয়া লইলে তাহার জ্ঞান কি থাকিবে ? সে বড় হইয়া তবে কি তুলিবে ? এখন সে যাওয়া পর্যন্ত থাকিলে হয়।

লীলার বয়স কম হলেও খুব বুদ্ধিমতী। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—ওদের মত জাহাজ পাবে কোথায় ? তোমার একখানা আলাদা জাহাজ চাই—ওদের মতন—

—সে হয়ে যাবে, কিন্বো, বড় হ’লে আমার টাকা হবে না বুঝি ?

এবার বোধ হয় লীলার অনেকটা বিশ্বাস হইল। সে এ লইয়া আর কোনও তর্ক উঠাইল না।

খানিকটা পরে বলিল—তুমি কল্কাতা গিয়েচ ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমি দেখিনি কথখনো—খুব বড় শহর ?—এর চেয়ে বড় ?

লীলা হাসিয়া বলিল—চের চের—

—কালীর চেয়েও বড় ?

—কালী আমি দেখিনি—

তারপর সে অপুকে নিজের পড়ার ঘরে লইয়’ আসিল। একখানা খাতা দেখাইয়া বলিল—ছাথো তো কেমন ফুলগাছ এঁকেচি, কি বকম ডুইংটা ?

অপু খানিকটা পরে বলিল—আমি শুইগে, মাথাটা বড্ড ধরেচে—

লীলা বলিল—দাঁড়াও, আমি একটা মস্তর জানি মাথা-ধরা সারাবার—দেখি ? পরে সে ছ’হাতের আঙুল দিয়া কপাল এমন ভাবে টিপিয়া দিতে লাগিল যে, অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—উঃ, বড় হুড়্‌হুড়ি লাগ্‌চে !—লীলা

হাসিয়া বলিল—আমার বড় মাঝাতো ভাইকে কুস্তি দেখায় একজন পালোয়ান আছে, তার কাছে শেখা—বেশ ভালো না? সেবেচে তো?

দিনকতক পরেই লীলারা পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

অপু মাকে বলিয়া কহিয়া একটা ছোট দলে যায়। যে বড় রাস্তার দূরে ইহাদের বাড়ী, সেখান হইতে কিছুদূর গিয়া বাঁ-পারে ছোট গলির মধ্যে একতলা বাড়ীতে স্থল। জন পাঁচেক মাষ্টার, ভাড়া বেঞ্চি, চাতল-ভাড়া চেয়ার, তেলকানি-ওঠা ব্র্যাকবোর্ড, পুরানো মাপ খানকতক—ইটাই স্থলের আসবাব। স্থলের সামনেই খোলা ড্রেন, অপুদের ক্লাস হইতে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলে পাশের বাড়ীর চুন-বালির-কাজ-বিরহিত নয় ইটের দেওয়াল নজরে পড়ে। সে স্থলে যাইতে যাইতে দেখে পাড়ডে ড্রেন সাফ করিতে করিতে চলিয়াছে। স্থানে স্থানে ময়লা জড়ো করা। সারাদিন স্থলের মধ্যে কেমন একটা বন্ধ বাতাসের গন্ধ, পাশের এক হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা দুপুরের পর কয়লার আঁচ দেয়, কাঁচা কয়লার ধোয়ার মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, অপুস মাথার মধ্যে কেমন করে, স্থলের বাহিরে আসিয়াও যেন সেটা কাটিতে চায় না।

তাঁহার ভাল লাগে না, মোটেই ভাল লাগে না। শহরের এই সব ইট-সিমেন্টের কাণ্ড-কাবখানায় তাঁহার হাঁক ধরে, কেমন যেন দম আটকাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি করে, সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাবে।

পথে ঘাস খুব কম, গাছপালা বেশী নাই, ছ'একটা এখানে ওখানে! সবুজের পথ, পাকা ড্রেন, দুই বাড়ীর মাঝখানের পথে আবর্জনা, ময়লা জল, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ। একদিন সে এক সহশাণীর সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। একতলা খোলার ঘর। অপুদের উঠানের চারিদিকের ঘরগুলিতে এক-একঘর গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে। দোরের গায়ে পুরানো চটের পর্দা। ঘরের মেঝে উঠান হইতে বিঘতের বেশী উচু নয়, কাছেই আঁদ্রতা কাটে না। ঘরের মধ্যে আলো হাওয়া বাল্য নাই। উঠান বিশী নোংরা, সকল গৃহস্থই এক সঙ্গে কয়লার আঁচ দিয়াছে, আবার সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা। সবসুদ্ধ মিলিয়া অপুস অভ্যস্ত খারাপ লাগে, মন যেন ছোট এতটুকু হইয়া যায়, সেদিন তাহারা উঠাকে বসিতে বলিলে সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে নাই, সদর রাস্তায় আসিয়া তবুও অনেকটা স্থিতি বোধ করিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়াও সেই বন্ধতা। বরং যেন আরও বেশী। এখানে ইট-সিমেন্ট আর মার্বেল পাথরে চারিদিক মাথ উঠান পর্যন্ত বাঁধানো। অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না, এখানে যা মাটি আছে, তাও যেন অন্তরকম। যে মাটির সঙ্গে তার পরিচয়, এ যেন সে মাটি নয়। তাহা ছাড়া ইহাদের বাড়ী চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা কৈ? থাকিতে হয় ভয়ে ভয়ে চোবের মত! কে কি বলিবে, উচু গলায় কথা কওয়া যায় না, ভয় করে।

এক একদিন অপু দপ্তরখানায় গিয়া দেখিয়াছে বুড়া খাতাগুলি একটা লোহার

শিক বসানো খাঁচার মত ঘরে অঙ্ককারের মধ্যে বসিয়া থাকে। অনেকগুলি থেরো-বাঁধানো হিসাবের খাতা একদিকে তপীকৃত করা। ছোট কাঠের হাতবাক্স সামনে করিয়া বৃদ্ধা সারাদিন ঠায় একটা ময়লা চিট তাকিয়া হেলান দিয়া আছে। ঘরে এত অঙ্ককাব যে, দিনমানেও মাঝে মাঝে ছোট্ট একটা বেড়ীর তেলের প্রদীপ জলে। গিরীশ গোমস্তা জমা-সেরেস্তায় বসে। নিচু তক্তপোশের উপর ময়লা চাদর পাতা—চাবিধারে দু'কোণে কাপড়ে বাঁধা রাশি রাশি দপব। সে ঘরট' খাতা-কিতানার মত অত অঙ্ককার নয়, দু'তিনটা বড় বড় জানালাও আছে কিন্তু তক্তপোশের নীচে বাশীকৃত তামাকের গুল ও ছেঁড়া কাগজ এবং কড়িকাঠে মাকডসার জাল ও কেরোসিন আলোব বুল। যখন বীক মুরী ইকিয়া বনে—ওহে বামদয়াল দেখো তো, গত তৌজিতে বাজকর খাতে খরচ লেখা আছে? তখনই কি জানি কেন অপূর মনে দাক্ষণ বিতুষা আবার জাগিয়া ওঠে।

সকালবেলা। অপূ দেউড়ির কাছটায় আসিয়া দেখিল বাড়ীর ছেলেরা চেয়ার-গাড়ীটা ঠেলিয়া খেলিতেছে। গাড়ীটা নতুন তৈয়ারী হইয়া আসিয়াছে, ডাঙা লাগানো লোহার চেয়ার, উপরে চামড়ার গদী, বড় বড় চাকা—ঝকঝকে দেখিতে। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, রমেন বলিল—এই, এসে ঠেল তো একবার আমাদের—

এই গাড়ীটা আসা অবদি অপূর মনে মনে ইহার উপর লোভ আছে, খুশি হইয়া বলিল—ঠেল চি, আমায় একবার চড়তে দেবেন তো?

রমেন বলিল—আচ্ছা হবে, ঠেল তো—খুব জোরে দিবি—

খুব খানিকক্ষণ খেলা হইবার পর রমেন হঠাৎ বলিল—আচ্ছা খুব হয়েছে এবেলা—ধাক আর নয়—। পরে গাড়ী লইয়া সকলে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অপূ বলিল—আমি এটু চড় বো না?

রমেন বলিল,—আচ্ছা যা যা, এ বেলা আর চড়ে না, বেশী চড়লে আবার ভেঙে যাবে—দেখা যাবে ও বেলা—

কোন্ডে অপূর চোখে জল আসিল। সে এতক্ষণ ধরিয়া আশায় আশায় ইহাদের সকলকে প্রাণপণে ঠেলিয়াছে।

বলিল—ব' আপনি যে বলেন আমাকে একবার চড়তে দেবেন আমার পালায়? আমি সকলকে ঠেললাম—বেশ তো? সেদিনও ওইরকমই চড়ালেন না শেষকালে—

রমেন বলিল—ঠেলনি কেন তুই, না ঠেললেই পাস্তিস্—যা—কে বলেচে তোকে চড়তে দেবে? গাড়ী কিন্তে পয়সা লাগে না?

সে বলল—কেন, আপনিও বলেন, ওই সন্তও তো বলেন—ঠেলে ঠেলে আমার হাত গিয়েছে—আর আমি বুঝি একবারটি—বেশ তো আপনি—

রমেন গরম হইয়া বলিল—আমি বলিনি যা—

সন্ত বলিল—হু-বু-বু,—বক দেখেচ?

কোনও কিছু না, হঠাৎ বড়বাবু ছেলে টেবু আসিয়া তাহার গলায় হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—যা যা—আমারা চড়াবো না আমাদের খুশি—তোমার নিজের ঘরের দিকে যা—এদিকে আসিস কেন খেলতে ?

টেবু অপূর অপেক্ষা বয়সে ছোট বলিয়া তাহার কৃত অপমানের দরুণই হউক বা সকলের ঠাট্টা বিজ্রপের জন্ম হউক—অপূর মাথা কেমন বেঠিক হইয়া গেল—সে কঁাকুনি দিয়া ঘাড় ছিনাইয়া লইয়া টেবুকে এক পাক্ষা মারিতেই টেবু ঘুরিয়া গিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেল—কপালটা দেওয়ালে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া রক্তপাত হইলে টেবু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল।

স্বি-চাকর ছুটিয়া আসিল, খানসামা দারোয়ান ছুটিয়া আসিল—উপরের বৈঠকখানায় বড়বাবু সকালবেলা কাছারি করিতেছিলেন, তিনি সদলবলে নীচে নামিয়া আসিলেন। দশদিক হইতে দশঘটি জন বাতাস জনপতি, হৈ-হৈ কাণ্ড।

গোলমাল একটু কমিলে বড়বাবু—কৈ, কে মেরেচে দেখি ?

গামনিহোরা সিং দারোয়ান পিছন হইতে ঠেলিয়া অপূকে বড়বাবুর সামনে দাঁড় করাইয়া দিল। বড়বাবু বলিলেন—এ কে ? ওই সে কানীর বামুন-ঠাক্করণের ছেলে না ?

গিরিশ সরকার আগাইয়া আসিয়া বলিল ভারি বদ ছোকরা—আবার জ্যাঠামি ওর যদি শোনেন বাবু, সেই সে-বার ষিয়েটারের দিন, বসেছে একেবারে সকলের মুখে সামনে বাবুদের জায়গায়, স'রে বসতে বলেচি, মুখোমুখি তর্ক কি ? সেদিন আবার দেখি ও শেঠেদের বাড়ীর মোড়ে রাস্তায় একটা লাল পাগ্লাবী গায়ে দিয়ে বার্ডসাই খেতে খেতে আসচে—এই বয়সেই তৈরী—

বড়বাবু রমেনকে বলিলেন সকালে আজ তোমাদের মাস্টার আসেনি ? পড়াশুনো ছিল না ? এই আমার বেতের ছড়িটা নিয়ে এসো তো কেউ। ওর সঙ্গে মিশে খেলা কর্তে কে বলে দিয়েচে তোমাদের ?

রমেন কঁাদো-কঁাদো মুখে বলিল—ওই তো আমাদের খেলার সময় আসে, আমরা কেন যাবো, জিক্সেস করুন বরং সন্তকে—আপনার সেই ছবিওয়ালো ইংরেজি ম্যাগাজিনগুলোর ছবি দেখতে চায়—আবার বড় বৈঠকখানায় ঢুকে এটা সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে—

গিরিশ সরকার বলিল—দেখুন, সখটা দেখুন আবার—

এবার অপূর পালা। বড়বাবু বলিলেন—স'রে এসো এদিকে—টেবুকে মেরেছ কেন ?

ভয়ে অপূর প্রাণ ইতিপূর্বেই উড়িয়া গিয়াছিল, সে বাগের মাথায় ধাক্কা দিয়াছিল বটে কিন্তু এত কাণ্ডের জন্ম প্রস্তুত ছিল না। সে আড়ষ্ট জিহ্বা দ্বারা অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল—টেবু আমাকে আগে তো—আমাকে—

বড়বাবু কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—টেবুর বয়স কত আর

তোমার বয়স কত জান ?

গুছাইয়া বলিতে আনিলে অপূর পক্ষ হইতেও একথা বলা চলিত যে টেবুয় বয়সে কিছু কম হইলেও কার্যে সে অপূর জ্যেষ্ঠামশাই নীলমণি রায় অপেক্ষাও পাকা। বলা চলিতে পারিত যে, টেবু ও এ-বাড়ীর সব ছেলেই বিনা কারণে যখন তখন তাহাকে বাঙাল বলিয়া খেপায়, বক দেখায়, পিছন হইতে মাথায় ঠোকব মারে—সে না হয় একটু খেলা করিতে যায় এই তো তাহার অপরাধ। কিন্তু উঠানভরা লোকারণার কোতুহলী দৃষ্টির সম্মুখে, বিশেষ করিয়া বড়বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে জিহ্বা তাহার তালুর সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছিল—সে শুধু বলিল—টেবুও—আমাকে—শুধু শুধু—আমাকে এসে—

বড়বাবু গজ্ঞন করিয়া বলিলেন—স্টুপিড, ডেঁপো ছোকরা—কে তোমাকে বলে দিয়েচে এদিকে এসে এদের সঙ্গে মিশতে—এই দাও তো বেতটা—এগিয়ে এস—এস—

সপাং করিয়া এক ঘা সঙ্গে আরে পিঠে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন বিষয়ের চোখে বড়বাবু ও পুনর্বার-উদ্ধত বেতের ছড়িটার দিকে চাহিল—জীবনে সে কখনও ইহার পূর্বে মার খায় নাই, বাবার কাছেও নয়,—তাহার বিদ্রাস্ত মন যেন প্রথমটা প্রহার খাওয়ার সত্যটাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না—পরে সে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বেতটা ঠেকাইবার জ্ঞান হাত দু'খানা উঠাইল। কিন্তু এবার আর তাহার দুঃখ করিবার কিছু রহিল না যে, সে তাহার পালার বেলা ফাঁকে পড়িল। বেতের সপাসপ শব্দে টেবুকেও কপালের ব্যাথা ভুলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইল রাধুনীর ছেলের যাছাতে স্পর্ধা আর না হয় বড়বাবু এ বিষয়ে তাহাকে হুশিয়ারি দিলেন। অল্প বেত হইলে ভাঙিয়া যাইত, এ বেতটা বোধ হয় খুব দামী।

বড়বাবু হাঁপ জিরাইয়া লইয়া বলিলেন—বুড়ো খাড়ী বয়সে ছোকরা কেথাকার, আজ থেকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, ফের যদি শুনি এ বাড়ীর কোনো ছেলের সঙ্গে মিশেচ, কান ধ'রে তক্ষুনি বাড়ী থেকে বিদায় করে দেবো—পরে কাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—দেখুন না ধীরেনবাবু, বিধবা মা, সতীশবাবু ম্যানেজার কানী থেকে আনলেন, ভাবলাম জাতের মেয়ে থাকুক—দেখুন কাণ্ড, মা ভাত রাখে উনি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে সিগারেট খেয়ে বেড়ান—

ধীরেনবাবু বলিলেন—ওসব ওই রকমেই হয়ে থাকে—এরপর কোকেন খাবে—মা'র বাস্তু ভাঙবে—ওর নিয়মই ওই—তার ওপর আবার কাশীর ছেলে—

বাড়ীর মধ্যে সকল কথা গিয়া পৌঁছায় না, অপূর মার খাওয়ার কথা কিন্তু সর্বজ্ঞা শুনিল। একটু ভাল করিয়াই শুনিল। গৃহিণী বলিলেন—ওরকম যদি শুণ্ডো ছেলে হয় তা হ'লে বাচ্চা—ইত্যাদি। ক্রটির ঘর হইতে আসিয়া দেখিল অপূর স্থল গিয়াছে, মাকে কিছু বলে নাই, এসব কথা সে কখনো মাকে বলেও না। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সর্বজ্ঞার গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সর্বজ্ঞ হইতে

যেন ঝাল বাহির হইতে থাকিলে, ঘরে না থাকিতে পারিয়া সে বাহিরের অপরিষর বারান্দাটাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার অপূর গাণ্ডে হাত। সে যে এখনও বলে, মা সিঁড়ির ঘর দিয়ে যখন তুমি রান্নাবাড়ী থেকে আসবে, তখন রাত্রে তোমায় এমন ভয় দেখাবো?... তাহার কি কোনো বুদ্ধি আছে? কত লাগিয়াছিল, কে তাহাকে বুঝিয়াছে সেখানে, কে শুনিয়াছে তাহার কান্না?

সর্বজয়ার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল।

মা-বঁা ছপুর...আকাশে ছ একটি পাখী সেই উচুতে উড়িয়া বেড়ায়— আন্তাবলের মাখায় আমলকী গাছের ডালে বাতাসে বাধে, দালানের কোণের লোহার ফুটা চৌবাচ্চার পাশে বসিয়া কণাটা ভাবিতে কান্নার বেগে তাহার সবশরীর কাঁপিতে লাগিল—

—ঠাকুর, ঠাকুর, ও আমার বড় আদরের ঘন, তুমি তো জানো ও একদু চোখের আড়াল থেকে সরলে আমি থির্ থাকতে পারি নে, যা কিছু শান্তি দেবার আমার ওপর দিয়ে দাও ঠাকুর, ওকে কিছু বোলো না, আমার বুক ফেটে যায় ঠাকুর, তা আমি মইতে পারবো না—

সকাল সকাল অপূদের স্কুলের ছুটি হইয়া গেল! তাহার ক্লাসের ছেলেরা ধরিল তাহাদের ফুটবল খেলায় অপূকে বেকারী হইতে হইবে। অপূ ভাবি খুশি হইল, ফুটবল খেলা সে এ শহরে আসিবার পূর্বে কোনোদিন দেখে নাই, সে খব ভাল খেলিতেও পারে না, তবুও কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকেই সকলের চেয়ে পছন্দ করে, খেলার বেকারী হইতে প্রায়ই তাহার ডাক পড়ে।

সে বলিল—সেই বড় হইসিনটা বাড়ী থেকে নিয়ে আসি ভাই, বাক্সে প'ড়ে রয়েছে, আমি ঠিক চারটের সময় মাঠে যাবো এখন—

পথে আসিতে আসিতে অপূব সকালের কথা মনে উঠিল। আজ সারা দিনটাই সে মে-কথা ভাবিয়াছে। বার্ডমাই খাইতে গিয়া সেদিন গিরিশ সরকারের সামনে পড়িয়া গিয়াছিল একথা ঠিক, কিন্তু বার্ডমাই কি সে যোজ খায়? সেদিন মেজ বো-বাণীর দেওয়া বাড়া পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাহার হঠাৎ সখ হইয়াছিল, এই বকম পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া বাবুরা বার্ডমাই খায়, সেও একবার খাইবে। তাই খাবারের পয়সাটায় বার্ডমাই কিনিয়া সে ধরাইয়া খাইতেছিল, কিন্তু সেই একদিন নিশ্চিন্দপূরে লুকাইয়া খাইতে গিয়াও ভাল লাগে নাই, সেদিনও লাগিল না। তাহার মনে হইয়াছিল—দুঃ! এ না কিনে এক পয়সার ছোলা ভাজা কিনলে বেশ হোত! এ যে কেন লোকে কিনে খায়; কিন্তু গিরিশ সরকার না জানিয়া শুনিয়া তাহাকে যা তা বলিল কেন?

ভাগ্যিস লীলা এখানে নেই! থাকিলে সে দেখিলে বড় লজ্জার কথা হইত। মাও বোধ হয় টের পায় নাই। পাছে মা টের পায় এই ভয় হইত সে ওবেলা স্কুলে চলিয়া আসিয়াছিল।

লীলা কতদিন এখানে আসে নাই। সেই আর বছর গিয়াছে আর আসে নাই। এখন আসিলেই কি আর উহার তাহার সহিত কথা কহিতে দিবে ?

বাড়ী ফিরিতে দেউড়ির কাছটায় আসিয়া সুনীল উপরের বৈঠকখানায় কলেব গান হইতেছে। শব্দটা কানে যাইতেই সে খুশি-ভরা উৎসুক চোখে মুখ উচু করিয়া দোতলার জানালার নীচে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গেল। রাস্তা হইতে গানের কথা সব ভাল বোঝা যায় না। কিন্তু স্বরটি ভারি চমৎকার, শুনিতে শুনিতে স্থল, খেলা, রেফাবীগিরি, গুবেলার মার-থাওয়া, মন হইতে সব একেবারে মুছিয়া গেল।

গানের স্বরে তাহার মনটা আপনি আপনি কোথায় উড়িয়া যায়—সেই তখন নিশ্চিন্দপুরের নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া কতদিন দেখিত, গুপারের উলুখড়ের মাঠে ছোট রাঙা ফুল-ভরা শিমুল চারা, তাহাদের পিছনে কতদূরে নীল আকাশের পট—খড়ের মাঠে যেন আঁকা, রাঙা-ফুল শিমুল চারা যেন আঁকা, শুকনা ডালে কি পাখী বসিয়া থাকিত, সব যেন আঁকা। তাহাদের সকলের পিছনে সেই দেশটা, ব-হ-উ-দূরের দেশটা—কোন দেশ তাহার জানা নাই, মাত্র মনের খুশিতে যেটা ধরা দিত।

কে যেন ডাকে, কতদূর হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দভরা পরিচিত স্বরের ডাক আসে—অগু—উ—উ—উ—উ—

মন খুশিতে ভরিয়া উঠিয়া মাড়া দেয়—যা-আ-আ-ই ই-ই—

তাহাদের ছোট ঘরটাতে ফিরিতে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—সকাল সকাল এলি যে ? সে বলিল—গুপার ক্রাসের ছেলেরা বল খেলায় জিতেছে তাই হাফ স্কুল—

তাহার মা বলিল—আয় বোস এখানে। খানিকক্ষণ পরে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—আজ তোকে গুণা কি জ্ঞে নাকি ডেকে নিয়ে—বকেচে ?

—নাঃ, ওই টেবুর একটুখানি লেগেচে, তাই বডবাবু ডেকে বলছিলেন কি হয়েছে,—তাই—

—বকে টকে নি তো ?

—নাঃ—

তাহার মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কথা ভাবচি, এখান থেকে চ'লে যাবি ?

সে আশ্চর্য হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। পরে হঠাৎ খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল—কোথায় মা, নিশ্চিন্দপুর ? সেই বেশ তো, চলো, আমি সেখানে ঠাকুর পূজা করবো—পৈতেটা তো হয়ে গিয়েচে—নিজদের দেশ, বেশ হবে—এখানে আর থাকবো না—

সর্বজয়া বলিল—সে কথাও তো ভাবচি আজ দু'বছর। সেখানে যাবি বলছি, কি আর আছে বল দিকি সেখানে ? এক বাড়ীখানা, তাও আজ তিন

বছর বর্ষার জল পাচ্ছে, তার কিছু কি আছে আদিনি? মাফাতার আমলের পুরোনো বাড়ী—ছিল একটু ধানের জমি, তাও তো—গিয়ে মাথা গোজবার জায়গাটুক নেই—শস্তুর হাঙ্গামে যাওয়া

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কাজ করে হু, চল বর—
আচ্ছা কাশা যাবি?

বিশেষ কিছু ঠিক হইল না। গ্রাহার মায়ের মনও খাওয়া হয় নাই। স্নান সারিয়া পুনরায় রান্নাবাড়ী চলিয়া গেল। অপূর একটা কথা মনে হইল। তাহার গানের গলা আছে দিদি বলিত, যাত্রাদলের বন্ধুও সে-বার বলিয়াছিল। সে যদি কোনো যাত্রাদলে যায়, তাহাকে নেয় না? এখানে মা'র বড় কষ্ট। এখান হইতে সে মাকে লইয়া যাইবে।

উঃ কি গরম। রান্নাবাড়ীর নলের মুখে বোয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, কার্নিসেব গায়ে রোদ ঘরের ভিতরটা এবই মতো অন্ধকার আস্তাবলে মাতাবিবা মতিস্ কি হিন্দি বুলি বলিতেছে পাথর-বাধানো মেজ্জেতে ঘোড়ার খুঁর ঠুকিবার খট খট আওয়াজ ড্রেনের সেই গন্ধ তাহার মাথাটা এমন বরিয়াছে যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। সে ভাবিল এখন একটু শুয়ে নি—এরপর উঠে খেলার মাঠে যাবো—মোটো তিনটে বেজেছে—এখন বড় রোদটা।

বিছানায় শুইয়া একটা কথাই বারবার তাহার মনে আসিতে লাগিল। একথাটা এতদিন এভাবে সে ভাবিয়া দেখে নাই। এতদিন যেন তাহার মনের কোন্ কোণে সব সময়েই স্পষ্টভাবে আগিয়া থাকিত যে, এসবের শেষে যেন তাহাদের গ্রাম অপেক্ষা করিয়া আছে—তাহাদের জন্ত। যদিও সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় ফিরিবার কোনো কথাই ছিল না—সে জানে, তবুও এ মোহটুকু তার একেবারে কাটে নাই।

কিন্তু আজকার সমুদয় ব্যাপারে বিশেষ, করিয়া মায়েরও বড়বাবু কথায় তাহাদের নিরাশ্রয়তা ও গৃহহীনতার দিকটা তাহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর কি কখনও সে তাহাদের গায়ে ফিরিতে পাইবে না—?—কখনো না?—কখনো না?

এই বিদেশ, এই গিৰিশ সরকার, এই চোর হইয়া থাকা—না হয় মায়ে-ছেলে হাত ধরিয়া ছন্নছাড়া পথে পথে চিরকাল—এবাই কি কালের হইতে আসিয়াছে?

আস্তাবলে দুই সহসে ঝগড়া বাধাইয়াছে, রান্নাবাড়ীর ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে—একটু পরে তাহার মনে হইল, একই কি কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা! আস্তাবলে ঘোড়ার খুঁরের আওয়াজ ধামে নাই...সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সঁধিয়া যাইতেছে...খুব—খুব মাটির ভিতর...নীচের দিকে কে যেন টানিতেছে...বেশ আদায়...মাথা ধরা নাই...বেশ আদায়।

উঃ—কি বোদটাই কাঁ কাঁ করিতেছে! দিদির বা কাও—এত বোদুয়ে

চড়ুইভাতি। সে বলিতেছে—দ্বিদি শুয়ে নে, এত বোন্ধুবে চড়ুইভাতি ?

বাগুদি কানেব কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা বলিয়া যাইতেছে। বাগুদির চলছেলে ডাগর চোখ দুটি অভিমান-ভরা। সে কি করিবে ? নিশ্চিন্দিপুরে তাদের চলে না যে। বাগু দি না লীলা ?

হারণ কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্ত আনিয়া বাজাইতেছে ভারি চমৎকার বাজায়। সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিনবো বাবা, একটা পয়সা দেবে ?

তাহার বাবা তাহার বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে—বেশ হয়েছে তোব গল্পটা, ছাপিয়ে এলে আমায় দেখতে দিস্ খোকা ?

সে বলিতেছে—কোকেন কি বাবা ? গিরিশ সরকাব বলেচে আমি নাকি কোকেন খাবো—

বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথক ঠাকুরের মত।

তাহাদের মাঝেরপাড়ার ইষ্টিশান। কাঠের বড় তক্তাটায় লেখা আছে, মা-ঝে-র-পা-ডা। সে আগে আগে ভারী বোঁচকাটা পিঠে মা পিছনে পিছনে তাহাব গায়ে বাঁড়া পাড়াবীটা। কেমন ছায়া সাবাপথে। আকাশে সন্ধ্যাতাণা উঠিয়াছে। পাকা বটফলের গন্ধেভরা বাতাসটা।

নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না সে চলিয়াছে চলিয়াছে চলিয়াছে সে আর মা এ পথে একা কখনো আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না ও কাস্তে-হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এটু ব'লে ছাও না আমাদের ? যশডা-নিশ্চিন্দিপুর, বেজবতীর ওপারে ?

তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হ্যাঁবে, ওঠ ও অপু, বেলা যে আর নেই, বল্লি যে কোথায় খেলতে যাবি ? ওঠ-ওঠ।

সে মাঘেব ডাকে ধডমড করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চাবদিকে চাহিল—উঁ কি বেলায় গিয়াছে। বোদ একেবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে।

তাহার মা বলিল—বল্লি যে কোথায় খেলতে যাবি, তা গেলি কৈ ? অবেলায় প'ড়ে প'ড়ে কি ঘুমটাই দিলি ? দেবো তোব সেই বাঁশিটা বের করে ?

শোরঙ্গ হইতে বাতিল করিয়া বাঁশিটা মা বিছানার কোণে রাখিয়া দিল বটে, সে কিন্তু বেকারীগিরি করিতে যাওয়ার কোন উৎসাহ দেখাইল না। ঘরের ভিতরে এরই মধ্যে অন্ধকার। উঠিয়া আসিয়া জানালার কাছে অগ্ন্যম্নস্বভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাতিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা একেবারে নাই। কি অসহ্য শ্রমোট। আস্তাবলের ড্রেনের গন্ধটা যেন আরও বাড়িয়াছে। ফটকের পেটাঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া বোধ হয় ছ'টা বাজাইতেছে।

ওই আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা, ওরই ওপারে পূবদিকে বহুদূরে তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর।

আজ কতদিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই। তি—ন বৎসর! কতকাল!

সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে-রাতে সব সময় ডাকে, শাঁথারীপুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাণ্ডার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার মায়েবের খাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।

পোড়ো ভিটার মিষ্ট লেবু-ফুলের গন্ধে সজ্জনেতলার ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি? আবার কবে তাহাদের বাড়ীর ধারের শিরীষ সৌদালি বনে পাখীর ডাক?

এতদিন তাহাদের সেখানে ইচ্ছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুলতলায় জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা-কাঁটা, বনকলমীর ফুল পরিয়াছে। বন-অপরিস্জিতার নীল ফুল বনের মাথা ছাওয়া।

তাহাদের গ্রামের ঘাটটাতে কুঁচ-ঝোপের পাশে বাকুকাকা হয়তো এতক্ষণ তাহার অভাসমত অবেলায় স্থান করিতে নামিয়াছে, চালুতে-পোতার বীকে নতুন কষাড বনের ধারে ধারে অকুর মাঝি মাছ পরিবার দোয়াডী পাতিতেছে, আজ সেখানকার হাট বার, ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই বটগাছটার পিছনে দিগন্তের কোলে বাগা আগুনের ফেনার মত সূর্য অস্ত যাইতেছে, আর তাহারই তলাকার মেঠোপপ ব্যাংগা গ্রামের ছেলে পটু, নীলু, তিম্বু, ভোলা সব হাট করিয়া ফিরিতেছে।

এতক্ষণে তাহাদের বনে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটানে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখী ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট, নিঃশব্দ, শাস্ত বৈকাল—সেই হলুদে পাখীটা আজও আসিয়া পাঁড়িলের উপরের কক্ষের ডানটানে সেই একমই বসে, মায়েব হাতে পোঁতা লেবু চারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটার সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে কিঞ্চ সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাজ্জা জালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগ্‌ডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার বব শোনা যাইবে। কেহ কোনদিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়েব সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোনোদিন জানিবে না, ওড়কলমীর ফুল ফুটিয়া আপন-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল, নোনা মিথ্যাই পাঁকিবে, হলুদে ডানা তেডো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিবিবে।

বনের ধারে সে অপূর্ণ মায়ায় বৈকালগুলি মিছামিছিই নামিবে চিরদিন!

ওবেলা এক উঠান লোকের সম্মুখে বিনা বিচারে মার খাইয়াও তাহার চোখ দিয়া একফোটা জল বাহির হয় নাই, কিন্তু এখন নির্জন ঘরের জানালাটাতে একা একা দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হইল, উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল হইবে মনে মনে বলিল—আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়

—ভগবান—তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দ্রপুর যাওয়া হয়—নৈলে বাঁচবে না—পায়ে পড়ি তোমার—

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্থ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামে বাঁশেব বনে, ঠাণ্ডাডে বীক বায়ের বটতলায়, কি ধলচিত্তের খেয়াঘাটেব সীমানায। তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পাব হয়ে পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলেব পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে দেশ ছেড়ে দেশান্তরেব দিকে, স্র্ষোদয় ছেড়ে স্র্ষাস্তেব দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিস্রেষের উদ্দেশ্যে

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস বর্ষ, মনুষ্যের মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায়—তোমাদের মর্মব জীবনস্বপ্ন শেওলা-ছাতা দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না চলে চলে চলে এগিয়েই চলে

অনির্বাক তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অস্ত আকাশ

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিণয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি

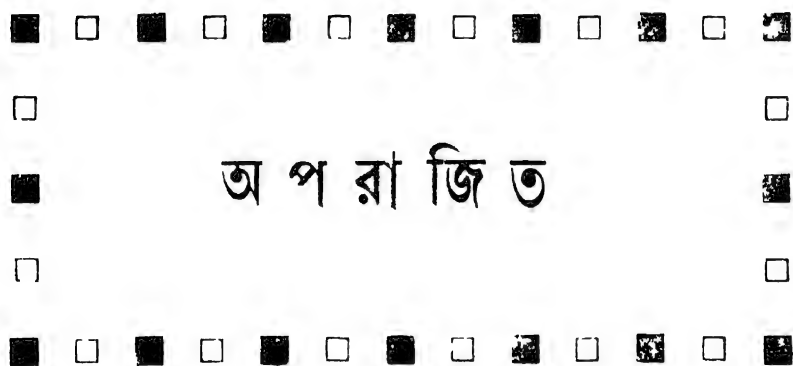
চল এগিয়ে যাই।

সমাপ্ত



অপু

দ্বিতীয় খণ্ড



অপরাজিত

নাঃ দেবীকে

দুপুর প্রায় পাঁচটায় শিখাচ্ছে। বায়চৌধুরীদের বাড়ির বড় ঘটকে বসিমা-
সরোজ ভাষাীদের ডিউ এখনও ভাঙে নাই। বাক মুক্তবীর ডাঙ্গর ভিখারীর
চাউল দিবার ভাব আছে, কিন্তু ভিখারীদের মধ্যে অল্প অনেকে সন্দেহ
করে, তখনকার ক্ষুণ্ণ দিহা সঙ্গে যোগ সাড়সের দলে তাহার গাথা
প্রাণ হইতে প্রাণবাহী বসন্ত হইতেছে। ইহা লইয়া তাহাদের কগড়া
ঘন কানিকালেই মেটে নাই। শেষ পর্যন্ত দাণ্ডায়ানো বাকিয়া ভেঁ,
বামনিহোবা সং চু-চাবডনকে গলাগাথা দিতে যায়। তখন হয় দুডো
বাড়ি মহাশয়, নয়তো গির্জা গোমদা আসিয়া বাগাবতা মিনাইয়া
দেয়। প্রায় কোন ব্যবস্থা ভিখারী বিদায় বাগাবতা বিনা গোলমালে
নিশ্চয় হয় না।

রান্না-বাড়িতে কি একটা লইয়া একজন বাকচৌধুরী মনে বড়সে চালাতে লাগে।
রান্না-বাড়ী মোক্ষদা দালায় নিজেও ভাত সাড়াইয়া লইয়া বসে। বাকচৌধুরী
সরোজা পড়াতে সেখানকা গোলমালও একটু কমল। বাকচৌধুরী মনে
সবজ্ঞার বয়স অনেক কম—বড়লে কেবল বাড়ি—সহব-বাড়ার ভাষা
পাড়াগেসে মেরে বলিয়া তাহাদের এসব কথাবাতর সে বড় একটা থাকে না।
তবুও মোক্ষদা বামনি তাহাকে মধ্যস্থতায় সাহায্যে কি অবিচারে কথা
সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। এখন দলে থাকে, তখন সে দলের মন
যোগাইয়া কথা বলিতে সবজ্ঞার একটা অভ্যাস, এটা তাহাদের
কাছবস্তু বাগ নাই। মোক্ষদা সবিস্তার ভাষা সবজ্ঞার মনেও ভাত
বাড়িয়া লগ্না তাহাও থাকিবেন ছোট ঘণ্টাতে ফিরল। এ বাড়ির প্রায়
আসিয়া বড়-বড় ঠাণ্ডদালনের পাশেই যে ঘণ্টাতে সে থাকিত, এ ঘণ্টা
সেটা নয়, তাহাবস্তু সামান্যতম নিশ্চিমেব বাসালার কোণে ঘণ্টা ও সে
এখন থাকে—সেই বকমত অন্ধকার, সেখানেই সাতারসে মেছে, তবে
সে ঘণ্টার মত ইহাও পাশে আস্তাবল নাই, এই একটা সুবিধার কথা।
সবজ্ঞা তখনও ভাল কিস্তি ভাতের দালা ঘরের মেঝেতে নামায় নাই,
এমন সময় সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—বলি, মুখি বামনি কা পুচেয় দিচ্ছিল তোমার কাছে শুন ? বদমায়েশ
মাগী কোপাকার, আমায় নামে এখন-তখন পাঁচ-তাব কাছে লাগিয়ে কবে
কি জিগোস করি ? বলে দেয় যেন বড় বোরানীর কাছে—যায় যেন বলতে—
তুমিও দেখে নিও বলে দিচ্ছি বাবা, আমি যদি গিল্লিমার কাছে বসে শুকে
এ বাড় থেকে না তাড়াহ তবে আমায় বামনিদি ভেঙের মেয়েই নই—নই—নই—
এই তোমায় বলে দিলাম।

সর্বজ্ঞা হাসিমুখে বলিল, না সত্-মাসী, সে বললেই অমনি আমি শুনবো কেন ? তা ছাড়া ওর অতীত জ্ঞানো—ওই একম, ওর মনে কোন রাগ নেই, মুখে হাড়-কাড় করে বকে এমন তো কিছু বলেও নি—আমি তা ছাড়া আমি আজ ত্র মাস দশ মাস তো নয়, তোমায় দেখাও আজ তিন বছর—বললেও কি আমি আমি শুনি ? তিন বছর এ বাড়িতে চুকিচি, কে তোমা নামে—

সত্-মি একমু নবম সত্-মি বলিল অর্থাৎ কোপায় দেখিচি নে—আজ তো বিবাহ—হৃদয় তো আজ বন্দ—

নবজ্ঞা প্রতিদিন রাত্রে ঘবে কাজ মারিয়া গবে দান করে, তেলের বাড়িতে বাতিল হইতে নাগকেন তেল চালিতে চালিতে বলিল, কেবল বোঝে। ওই যেতেই বাড়ির পাশে কোন এক বন্ধুর বাড়ি দেখা দৃষ্টি দিন বাস বেড়াতে। তাই বুঝি বাসে। এলে তো নয়, একটা পাশ—এই বাসুর পাশে মাথার ও দিগে পাওয়া উই তাই। প্রতিবে কেন, বোসো না মাসী।

সত্-মি বলিল, না আমি অর্থাৎ, আমি বসবো না—ভাবনায় দাঁড়ি কথাটা গিরে শুনি আসি, তাই এতম। বোলো ওবেলা দুখি বাসনাকে একম, বুঝে দিও—থাকাবাণ্ড ভাতে সেত দইয়ের হাঁচি বৈ-কথা মনে নেই বুঝি সত্-মি তো অনেক কথা আছে, বুঝলে ? দেখতেই ভালমাত্র, বোলো দেখিয়ে

সত্-মি চালিয়া গেলে সর্বজ্ঞা তেল মাখিতে বসিল একম পক্ষে দেবে কাছে যের শব্দে বুঝ হুঁলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল ওঃ বোলো, তেঁও বুঝে একেবারে পাড়া হয়ে গিয়েছে। বস বোস—আজ—ওম আমায় ক হবে।

অপু ঘবে। সত্-মি চুকিয়া একেবারে সোজা বিছানায় গিয়া একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল। হাত পাখাখানা সজোরে নাড়িয়া মিনটখানেক বাতাস খাওয়া লইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখনও না শুনি ? বেলা তেঁওটো—

সব জ্ঞা বলিল, ভাত খাবি তুটো ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—

—খা না তুটোখানি ? ভাল ছানার ডালনা আছে, সকালে শুদ্ধ তো ভাল আব বেগুনভাজা দিলে খেয়ে গিইচস্। ক্ষিদে বেচে আবাব এতক্ষণ—অপু বলিল, দেখি কেমন ?

পবেসে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মেঝেতে ভাতের থালাব ঢাকি উঠাইতে গেল। সবজ্ঞা বলিল, ছুঁস নে, ছুঁস নে—থাক এখন, নেয়ে এসে দেখাচ্চি।

অপু হাসিয়া বলিল, ছুঁস নে, ছুঁস নে কেন ? কেন ? আমি বুঝি মুচি।

ব্রাহ্মণকে দুখি অমনি বলিতে আছে ? পাপ হয় না ?

—হা হয় হবে। ভাবি আমাব বামুন সঙ্কো নেই, আশিক নেই। বাচবিচেৎ
জ্ঞান নেই, এঁতৌ জ্ঞান নেই—ভাবি আমাব—

খানিকটা পাপ সবজয়া পান সাবিয়া আসিয়া ছেলেকে বলিল, আমার পাতে
বসিস এখন।

অপু মুখে হাসি টিয়া বলিল, আমি কাকব পাতে বসচি নে, ব্রাহ্মণের খেতে
নেই কাকব এঁতৌ।

সবজয়া খাইতে বসিলে অপু মাথের দুখের দিকে চাহিয়া দুব নিঃ কণিয়া
বলিল, আজ এক ভাষণায় একটা চাকবিব কথা বলেচে মা একজন। ইষ্টি-
শানব স্নানফ্রমে ঠাণ্ডিয়ে, গাভী যখন এনে লাগবে—লোকেদের কাছে নতুন
পাঁচি বিক্রী কবতে হবে। পাঁচ টাকা মাইনে আর জলখাবার। ইক্ষুলে
ওতেও হবে। একজন বলছিল।

ছেলে যে চাকবিব কথা একে একে জিজ্ঞাসা কণিয়া বেড়ায় সবজয়া একথা
জানে। চাকবি হইলে এন মন্দ কথা নয়, কিন্তু অপু দুখ চাকবিব কথা
তাহার মোটেই ভাল লাগে না। সেতো এমন কিছু বদ হয় নাই। তাহা
ছাড়া এনে আছে, রুটি আছে। শহর বাজার ভাষণা, পথে ঘাটে গাড়িঘোড়া
—কণ বিদা। অত বিবদের মুখে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে সে বাজী নয়।

সবজয়া কণাটা তেমন গায়র মাখিল না। ছেলেকে বলিল, আয় বোস পাতে
—হয়েচ আমাব। আস—

অপু খাইতে বসিয়া বলিল, বেশ ভাল হয় না মা ? পাঁচ টাকা ক'বে মাইনে।
তুমি জমিও তাবদর মাইনে বাড়াবে বলেচ। আমাব বন্ধু সতীনদের
বাড়ির পাশে খেলার ঘর ভাড়া পাও তু বেকা মসে। দেখানে আমাব। ষো
—এদের বাড়ী হোয়ার না খাউনি। এল থেকে অমনি চলে বাবো ঠিকশানে—
খাবার সপনেই খাবো। কেমন তো ?

সবজয়া বলিল—কি কবে দেবো, বেঁচে নিয়ে আস।

দিন দশেক কাটিয়া গেল। পাপ কখন কণাব তা কোনো স্কেই দিগিল না।
তাহার পব বড়বাবু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত পছন্দ ও সদগা
পন্ন অবস্থায় ঐতর দিয়া তাহার দিন—নেবো কাটিল। বাড়তে সকলের
মুখে, নি চাকব দাবোয়ানদের দুবে বড়বাবুর অসুখের বিবরণ। অবস্থার কথা
ছাড়া আর অন্য কথা নাই।

বড়বাবু সামলাইয়া উঠিবার দিনকল্পেক পব একদিন অপু আসিয়া হাসি-হাসি
মুখে যাকে বলিল, আজ মা, দুপুরে, একটা ঘুড়ির দোকানে বলেচে যদি আম
ব'সে ব'সে ঘুড়ি জুড়ে দি অঠা দিয়ো, তাহা সাত টাকা কবে মাইনে আর
রোজ ছ'খানা করে ঘুড়ি দেবে। মস্ত পাড়র দোকান, ঘুড়ি তবী কবে কল-
কাতায় চালান দেয়—সামবাবে খেতে বলেচে—

এ আশার দৃষ্টি, এ হাসি এ সব জিনিস সবজয়ার অপরিচিত নয়। দেশে

নিশ্চিন্দ্রপুরের ভিটাতে থাকিতে কতদিন দীর্ঘ পনেরো ষোল বৎসর পরিয়া
 মাঝে মাঝে কতবার স্বামীব মুখে এই সরনের কথা সে শুনিয়াছে। 'হে মৃদু,
 এই কথার ভাঙি সে চেনে। এইবাব একটা কিছু লাগিয়া থাকবে—এইবাব
 ঘটিল, অল্পই দেবী। নিশ্চিন্দ্রপুরের এখাসবর বিবাহ করিয়া দে বাহির
 হওয়ার মলেও সেহ সুপেরত মোহ।

চাণি বৎসর এখনও গুণ হয় নাহ, 'হেই দশা ইত্যন মতো। কিন্তু সফলতা
 চিনিয়াও চিনিলা না। আজ বহুদিন পরিয়া গ্রাহ্য নিজেই 'হে বলিয়া কিছু
 নাহ, অথচ নাবীর অস্ত্রনিহিত নাহ। সারি বসি পিসার, 'হেই দশা
 গ্রাহ্যকে পাড়া দেখ। 'হেই তুলু ও 'হেই তুলু তটক, মন গ্রাহ্য
 আকড়াহা পরিতে চুটিয়া য়, নিজেই চলাইতে দে। 'হেই কন।

তাহা চাড়া দেবে অনভিজ্ঞ মনের 'হেই টাসকে পরিও বয়সের 'হেই টাস
 চাণে 'হেই টাসকে কথিয়া মানিতে মায়াও হয়।

হে বলিল 'হেই টাস না সোমবার। বের তো—দেখে 'হেই টাস 'হেই
 'হেই টাস, 'হেই বোঝা 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 বাহিতে—

অন্য 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 কবে মা, কবে?

'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 পাবে না, 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস

লীলা 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 কেন 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 মনে মন 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 দেখা 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস

পরিদিন 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস

কানীতে 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস

হে বলিল, কই দেখি?

'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস
 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস 'হেই টাস

সর্বজন্মা বলিল, তুই তো ঠেকে নিশ্চিন্দিপূবে দেখেচিস।—সেই সেবার গেলেন, দুগ্গাকে পুতুলের বাক্স কিনে দিয়ে গেলেন, তুই এখন সাত বছরের। মনে নেই তোব? তিনদিন ছিলেন আমাদেব বাড়ি।

—জানি মা দিদি বলতো তোমার জ্যাঠামশায় হন—না? তা এতদিন তো আর কোনও—

—আপন নয়, দব সম্প্রদেব। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড় একটা থাকতেন না কাশী রা ঠাকুর দেবতার জায়গার ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এখনও বেড়ান। উদ্দেশ দেশ হচ্ছে মনদাখোতা, আড়ংঘ গার কাছে। সেখানে থেকে ক্রোশ দুই—সেবার আড়ংঘাটায় খুল দেখতে গিয়ে উদ্দেশ বাড়ি গিয়েছিলাম দুদিন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই থাকত। সে মেয়ে জামাই তো লেবেচেন মারা গিয়েচে—ছেলে-লি কায় নেই—

অপ বলিল, হ্যাঁ, তাই তো লেবেচেন। নিশ্চিন্দিপূবে গিয়ে আমাদেব খোঁজ করেচেন। সেখানে শুনেচেন কাশী গাইচি। তার কাশী গিয়ে আমাদেব দব বরা রেখেচেন। এবারকও ঠিকানা নিয়েচেন বোম্ব হয় বাম্বাম্ব মিশন থেকে।

সর্বজন্মা হাসিয়া বলিল—আমি দুপুরবেলা শেষ একটা বাল গড়াই ফ্রমি বি বললে তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দাখ আমা নাম—তামি তো অবাক হয়ে গেলাম—তারপর খলে পড়ে নোখ হে নিলে আসবে লেবেচেন শাগ্গিব। ডাখ দিকি কবে আমবে লেখা পাচে কিছু?

অপ বলিল, বেশ হয়, না মা? এদেশ এখানে একদণ্ডও পল লাগে না তোমার খাতি নিটা কমে—সেই সকালে উঠে বামা-বাতি চোকা, আর তো তিনটে—

বাপাবটা এখনও সর্বজন্মা বিশ্বাস করে না। আবাব হুহ মিলবে, আম্ব মিলবে, নিজের মনোমত ঘর গড়া চলিবে। বড়লোকেব বাড়ির এ আন্দো-বুতি এ ছলছাড়া জীবনযাত্রা কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না। অদুত ওয়ান নয় বলিয়া ভয় করে।

তাহার পর দুজনে মিলিয়া নানা কথাবার্তা চলিল। জ্যাঠামশায় কি একম লোক, সেখানে পুণ্ডিয়া ঘটিলে কেমন হয়,—নানা কথা উঠিবার সময় অপ বলিল—শেঠেদের বাড়ির পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে একটা পবে। দেখে আসবো মা?

—সকাল সকাল ফিরবি, যেন ফটক বন্ধ করে দেয় না,—দেখিস—

পথে যাঠিতে যাঠিতে পুশিতে তাহার গা কেমন কবিতো লাগিল। মন যেন শোলার মত হাল্কা। মুক্তি, এতদিন পরে। কিন্তু লীলা যে আসিতেছে? পুতুলনাচের আসরে বসিয়া কেবল লীলার কথা মনে হইতে লাগিল। লীলা আসিয়া তাহার সহিত মিশিবে তো? হয়ত এখন বড় হইয়াছে,

হয়ত আর তাহার সঙ্গে কথা বলিবে না।

পুতুলনাচ আবশ্য হইতে অনেক দেরি হইয়া গেল। না দেখিয়াও সে যাইতে পারিল না। অনেক দ্বারে তখন আসন্ন ভাঙিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল, এত দ্বারে বাড়ি চোকা নাহবে না, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে, বড়লোকের বাড়ির দায়োয়ান না কেহ তাহার দ্বারা গরজ করিয়া ফটক খুলিয়া দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড় ভয়ও হইল। বাড়িতে এ দকম একা সে বাড়ি বাহিরে কাটায় নাই। কোথায় এখন সে-দাকম? মা-ই বা কি বলিবে?

আসন্ন বাক সব চলিয়া গেল। আসন্ন কোন্ একটা পান-লেনমেনের দোকানে তখনও বেচা কেনা চলিতেছিল। সেখানে একটা কাঠের বাগ্গেব টাংগেই করিয়া বসিয়া পড়িল। তা'র বকখন যে দুমাইয়া ভাঙিয়াছে জানে না, দুম ভাঙিয়া দে'ল খোস হইয়া যায় তে, যে লোক চলাচল আবশ্য হওয়াছে।

সে একটা বেলা করিয়া বাড়ি গিয়া পড়িল। তা'কেব কাছে বাড়ির গাতি দুই-বার্ন তৈয়ার হইয়া নাহিয়া গাছে। এতটুকুও কয়লা পানকরা আসিয়া দেখিল বাড়ি তা'র গাতি তখন ছলে না গিয়া ভাঙিয়া কোন্ দিক দিয়াছে। নিজেদের দরবে সময়ে নিস্তারিয়া দিকে গাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ম'দমা এত সকালে বাড়ি ছে' কো'রায়? মেজবাবু কি আজকে আসবেন?

নিস্তারিয়া বলল, তা'ই গো শুনি। কাল চি' এসেছে—শু' মেজবাবু আর বে'শী আসবেন, লীলা দিদিমনি প্রথম আসবেন না—ইচ্ছলেব এ'তামিন। সে ব'ল' দিনের সময় তা'বে আসবে। গিল্লোমা বলছিলেন বিকেলে—

আসন্ন ম'দমা এক মুহুর্তে দমিয়া গেল। লীলা হাসিবে না। বড়দিনের ছুটিতে আসলেই বা কি—দে'তো তা'হা' আগে এখন হইতে চলিয়া গিবে। তা'রবার আগে একবার দেখা হইয়া গি'ত এ'ত সময় আদিলে। ক'তদিন সে আসে নাহি।

তা'হা' মা বলিল, বেশ ভুলে গ'ো, কোথায় ডিলি বাড়িবে? আমাব ভেবে সাবান'ত চো'দেব পা' বো'জে ন' কাল।

অ'ব বলিল বা'ত বেশা' হয় গেল, টেক বন্ধ করে দেবে গ'নি, তা'ই আমাব এক বন্ধু ছিল, আমাব সঙ্গে গ'দে, তা'দে'ই ব'ডি'তে—এ'বে হ'সিয়া : ল'য়া বলিল, না মা, সেখানে পানের দোকানে একটা ক'শেমি ক'ঠের ব'ন্ধু গ'ডে ছিল, তা'র উপা' শুয়ে

সবজিয়া বলিল ওমা, আমাব কি হ'ব। এই সা'বাত ঠা'গ'র সে'খনে—ল'খা'ছা'ডা ছেলে, যেও হ'মি বে'ব কোনদিন সন্দে'ব প'ব কোথাও তা'মাব ব'ড'ই'য় হ'য়েছে, না?

অ'বু হ'সিয়া বলিল—তা' আমি কি ক'রে চুকবো' বলো'না? ফ'ক ভে'ঙে চুকবো'?

বাগটা একটু কমিয়া আসিলে সবডয়া বলিল—তারপর জ্যাঠামশায় তো কাল এসেচেন। তুই বেবিয়ে গেলে একটু পবেই এলেন, তোর খোঁজ করলেন, আজ ওবেলা খাবার আসবেন। বললেন, এখনে কোথায় তাঁর জানা শুনা লোক আছে, এ দেব বাড়ি থাকবেন। এদেব বাড়ি থাকবার অসুবিধে—দ্রুত নিয়ে যেনে চাচ্ছেন।

অপু বলিল, সত্যি? কি কি বল নায়া, কি সব কথা হ'ল?

অগ্রহে অসু নায়েব পাশে চৌকির দায়ে বসিয়া গড়িয়া মায়েব মুখের দিকে চাহিল। কানে অনেক কথাবার্তা হইল। জ্যাঠামশায় বলিয়াছেন, তাহাব আব কেহ নাই, হোদেবই উপর সব ভাব দিয়া তিনি কাশী খাইবেন। অনেক দিন পরে সুসার প্রতিবার আশায় সবডয়া আনন্দে উৎফুল্ল। ইহাদের বাড়ি হইতে নানা কুসুম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস নানা সময় সংগ্রহ করিয়া সমস্তে বাঁধিয়া দিয়াছে। একটা টিনের চেমি দেখাইয়া বলিল, সেখেনে রাগা ঘবে জ্বালবে। কত বড় লম্পাও দেখেচিস। হাঁপসাব তেল হবে।

দ্রুতের সঙ্গে মায়েব পাতে লাগাইতে বসিয়াছে, এমন সময় দয়ারেব সম্মুখে কাহা ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখিয়া সে ভাঙেব মাস আন মুখে তুলিয়া গাল না

লীলা।

পরক্ষণেই লীলা হাসি মুখে মনে মুকিল। কিয়ৎ অল্প দিকে চাহিয়া সে যেন একটু চব্বাক হওয়া গেল। অদূরে যেন আর চেনা যায় না—সে তো দেখিলে বসাবই মন্দ, কিয়ৎ দীর্ঘ বৎসরে কি হইয়া উঠিয়াছে, সে কি গায়েব বস, কি মুখেব নী, কি মনেব প্রমত্তা চোখ দি। লীলা যেন একটা লীলা হইল। বলিল, ডঃ আগের চেয়ে মাঝাতে কত বড় হয়ে গিয়েছে।

লীলা পরক্ষণে অল্প ঠিক স্বেচ্ছ কহা মনে হইল। যেন লীলা নয় তাহাব সঙ্গে সে দড় বৎসর বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত মন ওখেলা করিয়াছে। তাহাব মনে হয় না লীলাব মত মন্দদী মেয়ে সে কোথাও দেখিয়াছে—রাগ দিও নয়। তানকক্ষন সে যেন চোখ দিয়াছে। বলিল না।

তু জনেই যেন কেউ সঙ্গে যোগ করিতে লাগিল।

অপু বলিল, তুমি কি করে এলে? আমি আজ সকালেও জিজ্ঞাস করিচি। নিশ্চয়ই মাসা বললে, আমি আসবে না, এখন দ্রুতের ছুটি নেই—সেই বড় দিনের সময় নাকি আসবে?

লীলা বলিল, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

—না, তা কেন? তাৎপর্য হ'ল দিন বে বৃষ্টি—বেশ—একেবারে ডুমুরের ফুল—

—ডুমুরের ফুল আমি, না তুমি? বোকামদির ভাঙের সময় তোমাকে

হয় নাই

একটু পূর্ব লীলা অনেক বই আনিল অপুর মনে হইল লীলা কেমন
কবিতা তাহার মনের কাণ্ডি জানিয়া, সে বাহা পড়ি ও জানিতে ভালবাসে
সেই মনোব বইগুলি আনিয়াছে। 'সাগরের কথা' বইখানিতে অঙ্কুত অঙ্কুত
গল্প। সাগরের তল যবড বড গাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, প্রবল
নামক এক প্রকার পানী আছে, দেখিতে গাছপালার মত—কোণায় এক
মহাদেশ ন কি সমুদ্রের মত ডুবিয়া আছে—এই সব।

লীলা একবার পুণাতন বাতা দেখাইল। তাহার মৌক 'চবি' থাকিবার
দিকে বলিল—সহী তোমার একবার ফলগাছ এঁকে দেখতে দিলাম মনে
হাচ্ছে তাহা কত এঁকেচি দেখবে?

অপুর মনে হইল লীলার হাতের ইঁকা আগের চেয়ে এখন ভাল হওয়াছে।
সে নিজে একটা খোকা কখনো সোজা কাঁষা টানিতে পারে না—এগুলি
দেখিতে দেখিতে লীলা দিকে চাহিয়া চিত্তাশ কবিল, বেশ এঁকোচো তো।
তোমাদের ইঁকুলে কখনো না এমনি ইঁকো।

এতক্ষণ পবে অপূর্ণ মনে াল লীলা ফল খেতে, কোন হাসি খেপে কবি
কিছুই চিত্তাশ করা হয় নত। বলিল—তোমাদের ইঁকুল? এবার
কোন রাসে খেচো?

—এবার মাইনব সেকেন্ড রাসে খেচি—আমি মা হনো গাল ম ফল—
আমি দেব বাড়িবা পাশে—

অপূ বলিল, 'ভয়েস কবরো।'

লীলা হাসি মুখে ঘাট নাওয়া ক রয়া হল

অপূ বলিল, 'অচ্ছা বলো—তোমার কলার মোতনাব কত গিফ
হবে?

লীলা ভাবিয়া বলিল, চিগার ইজ অন্দি মাটর অক দিক ফল

অপূ বলিল কত মর তোমাদের সেথেন?

—অটোন হেড মর্যাদ এন্ট্রাস পাশ, আমাদের গামান খডান।
বলিল—মর মর দেয়া কববে না?

—এখন কবো না একটু কবো? বিকল কবো এখন, নত
ভাল।

—তাহার পেরে একটু দামিয়া বলিল কুম শোনান লীলা আমা
এখান থেকে চলে পড়ি।

লীলা অশচ হইয়া অপূর দিকে চাইল বলিল—কোণায়?

আমার এক দাদামশায় আছে, তিনি এতদিন পরে আমাদের খোজ পেয়ে
তাঁদের দেশের বাড়িতে নিয়ে গেতে এনেচেন।

অপূ সংক্ষেপে সব বলিল।

লীলা বলিয়া উঠিল—চলে যাবে? বাঃ রে।

চাটুযো। কি নামটা রে পাঁচী? বললে বাস করবো। বাড়ী থেকে চাল-
ডাল সিঁদে পাঠিয়ে দিই। তিন মাস বইল, বলে আজ ছেলেপিলে খানব
—কাল ছেলেপিলে খানব—ও মা এক মাগী গোয়ালার মেয়ে উঠোন পাঁচী
দিত আমাদেব, তা বলি বাবুন মাগুয় এসেছে, ওরও কাজটা করে দিদ।
খেয়াব কথা শোনো মা, আর বছর শব্দবাড়ি দিন—তাকে নিয়ে-
বড় ভাটি ও মেয়েবা বাবা কিনা কব্বিয়া হাদিয়া উঠিল।

সবজয়া অবাধ হইয়া বলিল, পালালো নাকি?

পালালো কি এমন তেমন পালালো মা? সেট সস্তে আমাদেব এক প্রভু
বাসন। কিছুই জানি নে মা, সব নিজেব পর থেকে বলি অহা বাবুন এসেছে
ককক আছে বাড়ি ও সেট বাসন সবদুই নিয়ে শুভনে নিউদিয়া।
কক সে সব কথা মা, দাঁড়ি নাহলে অহা। আমাদেব আছে না-? ছে বলো
মা সব দিই বন্দোবস্ত করে।

আদম দান কারিগর গেল সবজয়া দরবাড়ি মনের মত কব্বিয়া সাজাইয়াছে
দেওয়াল দান নিকাটিয়া পুঁজিয়া লইয়াছে। নিজস্ব ঘরদোর অনেকদিন ছিল
না, নিশ্চিন্তি হইয়া অবস্থি নাট—এতদিন পরে একটা সংসারের সমস্ত
সব জিনিস গাছের সগুণ চাষ বৎসরের সঞ্চিত সপ্ত মিটাইতে বাস্তব হইয়া
ছিল।

জামানামায় লোক মন নজর বসে, কিছু শোধর সবজয়া দেখিল তিন একটু
বন্দা। ওমা! কমেই হইবে বোকা গেল—তিন থেকে নিকট পরার্থপরতার কোঁকেট
হইবে মনে পান্ডিত্যের গ্রাহী নহে, অনেকটা অনিয়াছেন নিজের
গায়ে। গুলদের পুঁজি টাননি। জানা কিলে সদস্য লাল রূপ চলে
না, গাছের বাক দাঁড়ি বন্ধ হইয়া যায়। এই বাইক প্রতি সফল কব-
য়াই মন কব্বা বাকেন। পাকা লোক, অনেক ভাবিয়া চাহিয়া তবে তিনি
হইবে অগ্নিয়া পুঁজিয়াছেন। সবজয়াকে প্রায়ই বলেন—জয়া, তেঁব
ছেলেকে বল কা কন সব দেখে নেও। আমাব মেয়াদ অপর কত দিন
ওদের বাড়ি কাজটা দিক না অগ্নি কবে—সিঁদে চলেই তো মাস চলে
যাবে।

সবজয়া গাছের দরদারী

সকলের প্রতিবেদ শোধর অপর সত্য কাজ আবস্ত করিল—দুটি একটি কব্বিয়া
কাজকর আশ্রয় হইলে ওয়ে ক্রমে ওপাড়ায় ওপাড়ায় অনেক বাড়ি
হইতেই লক্ষ্মীপুজায় মাকল পুজায় তাহার ডাক পাসে। অপর মহা
চংসাহে প্রাতঃদান কব্বিয়া উন্নয়নের চেলী কপড পুঁজিয়া নিজের টিনের
বাগ্নে বাংলা নিত্যকর্মপদ্ধতিবান হাণ্ডে লইয়া পুঁজা কব্বিতে যায়। পুঁজা
কব্বিতে বদিয়া আনাড়ীর মত কোন্ অনুষ্ঠান কব্বিতে কোন অনুষ্ঠান কবে।
পুঁজার কোন পদ্ধতি জানে না—বার বার বইয়ের উপর কুঁকিয়া পুঁজিয়া দেখে
কি লেখা আছে—‘বজ্রায় হং বলিবার পর শিবের মাথায় বজ্র’ কি গতি

কবিত্তে হইবে—‘ওঁ ব্রহ্মপুষ্ঠ ঋষি সূতলছন্দ কুর্মো দেবতা’ বলিয়া কোন যুগ্ম
আসনেব কাণ কি ভাবে দরিত্তে হইবে—কোন বকমে গৌজামিল দিয়া
কাঙ সাবিবার মত পুত্ৰও তাহার আয়ত্ব হয় নাই, সূতবাং পদে পদে
আনাড়ীপণটুকু যা পড়ে।

একদিন সেই বৈশী কসিয়া গাওঁ ডিল ওগাডাব সবকারদেব বাড়ি। যে
ব্রাহ্ম তাহাদেব বাড়িতে পড়া কবিত্ত, সে কিস্তা বাগ কবিয়া চলিয়া গিয়াছে,
গৃহদেবতার নাবায়নে পড়ার জন্য তাহাদেব লোক অপুকে ডাকিয়া
লইয়া গেল। বাড়ির বড় মেয়ে নিবপমা পড়ার যোগাড় কবিয়া দিতেছিল,
চৌদ্দ বছরের ছেলেকে চেলা পাঁসিয়া পুঁনি বগলে গভীর মুখে আসিতে দেখিয়া
সে একই অবাৎ হইল। ভিত্তাসা কসিল, গমি ভো কবতে পাববে? কি
নাম তোমার? চকনি মশায় তোমার কে হন? দুখচোরা অপর মুখে বৈশী
কথা বেগাইল না, লাজুক মুখে সে গিয়া আনাড়ীর মত আসনের উপর
বসিল।

পড়া কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে নিকম্মার কাছে পড়াবীর বিড়া প্যা
পড়িয়া গেল। নিকম্মা হাসিয়া বলিল, ডাক? ঠাকুর নামিয়া আগে নতবে,
নাও, তবে তো তুলসী দেবে? —অপর পুত্ৰও বাইয়া গাওঁ নামাতে গেল।
নিকম্মা বসিয়া পড়িয়া বলিল—ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ কবো না। এত চাও
আগে ঠাকুর নামাও—আচ্ছা, এখন বড় প্যা কুণ্ডুতে ওল চালাও—

অপর কুঁকিয়া গিয়া বইয়ের পাতা উন্টাইয়া দানের মত দাঁড়িতে লাগিল।
তুলসীপত্র খাইয়া শালগ্রামকে সিঁহাসান উঠাইতে বাইতে, ‘নিকম্মা’
বলিল, ওকি? তুলসী পত্র উত্তর কানে নাতে হয় কি? চিং কবে নাও
ঘামে বাড়াইয়া হইয়া কোন বকমে পড়া সাপ কসিয়া তর চলিয়া আসিতেছিল
নিকম্মা ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েবা তাহাকে আসন পাড়িয়া বসাইয়া ভোগেন
ফলমূল ও সন্দেশ ওলোগ কবাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল।

মাদখানেক কাটিয়া গেল।

অপর কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপর মাসকপ এখনকার কিছুতেও
নাই। এই গ্রামে নদী নাই, মাঠ থাকিলেও সে মাঠ নাই, লোকজন বৈশী
গ্রামেব মশাও লোকজন বৈশী। নিশ্চিন্দিপুরের সেই উদার সপ্নমাখানো
মাঠ, সে নদাতীত এখানে নাই, তাহাদের মত গাছপালা, অত ফুলফল, পাখি,
নিশ্চিন্দিপুরের সে অপর বন-বৈচিত্র্য, কোথায় সে সব? কোথায় সে নিবিড়
পুষ্পিত, ছান্মি বন, গালে ডালে সোনার সিঁহত ছড়ানো সন্ধ্যা?
সবকার বাড়ী হইতে আড়কাল প্রায়ই পুণ্য কবিরার ডাক আসে। শাস্ত্র-
সভার ও সন্দর চেহারা গুণে অপুকেই আগে চায়। বিশেষ বাবরতের দিনে
পুত্ৰপত্র সাবিষা অনেক বেলায় সে শামা কবিয়া নানাবাড়ির পূজাব নৈবেদ্য ও
চাল-কলা বহিয়া বাড়ী আনে; সর্বজয়া হাসিমুখে বলে, ওঃ, আড় চাল তো
অনেক হয়েছে। —দেখি। সন্দেশ কাদের বাড়ির নৈবিজিতে দিলে রে।

অপু খুশীর সহিত দেখাইয়া বলে, 'কুণ্ডুবাড়ি থেকে কেমন একচড়া কলা দিয়েচে, দেখেচো যা ?'

সবজয়া বলে, এবার বোধহয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, এদের ধরে থাকা থাক, গিন্নী লোক বড় ভালো। মেজছেলের গুস্তরবাড়ির থেকে তদু পাঠিয়েচে—অসময়ের আম—অমনি আমাব এখানে পাঠিয়ে দিয়েচে—খাস এখন চপ দিয়ে।

এত নানারকমের ভাল জিনিস সবজয়া কখনো নিজের আয়ত্রেব মধ্যে পায় নাই। 'তাহার কতকালের স্বপ্ন। নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে কত নিশ্চক্ৰ মথ্যাকে উঠানোর উপর বুঁকিয়া-পড়া বাঁশবনের প্রস্পন্দনে, ঘুঘুর ডাকে, 'তাহার অবসন্ন শ্রমবনস্ত মন যে অবাপ্তব সম্ভলতার ছবি আপন মনে ভাসিত গড়িত—হাতে খবচ নাই, কটা বাড়িতে জল পড়ে রক্তিব রাত্রি, পাড়ার মুখ পায় না, সকলে চুপ কবে, তাকিলা করে, মাথায় বলিয়া গণ্য কবে না—সে সব দিনের স্মৃতিব সঙ্গে, আমবল শাকেব বনে পুবাণো পাঁচিলেব দাঁড়াবার সঙ্গে যে সব পূবকালের দূবাশাব বড়ে বড়িন ভবিষ্যৎ জড়ানো ছিল—এই তো এতদিনে তাহারা পুদিবীর মাটিতে নামিয়া আঁদিয়াছে।

এজাব কাজে অপুও 'তাহা উৎসাহ। বে'জ সকালে উঠিয়া সে কলুপাড়ার একটা গাছ হইতে বাশীকত কচি কচি বেলপাতা পাড়িয়া আনে একটা খণ্ড এঁয়িয়াছে, তাহাতে সদা বাবজাবের সুবিধার জন্য নানা দেবদেবীর স্তবেব মথ 'গেনেব মথ, গ্লানাদান গলা লিখিয়া লইয়াছে। 'পাড়ায় পড়া কটিতে নিজের 'তাল বেলপাতা লইয়া যায়, পড়াব সকল প্রতি নিবৃত্ত-ভাবে জানা না থাকিলেও 'সদ হও একাখণ্ডায় দে সকল অভাব 'বল ক'িয়া লয়।

বর্ষাকালের মাঝ মাঝি অপু একদিন মাকে বলিল যে, সে ইন্সুলে পড়িতে খাইবে।

সবজয়া আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন ইন্সুলে বে ? —কেন, এই তো আডবে'য়ালেতে বেশ ইন্সুল রয়েছে।

—সে তো এখন থেকে যেতে-আসতে চাবকোশ পথ। সেখানে যাবি হেঁটে পড়তে।

সবজয়া কথাটা তখনকার মত উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু ছেলেব মুখে কয়েকদিন পরিয়া বাব বাব কথাটা শুনিয়া সে শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, যা খুশি কনো বাপু, আমি জানি নে। তোমরা কোনো কালে কারুব কথা তো শুনলে না ? শুনবেও না—সেই একজন নিজের খেয়ালে সাংজন্ম কাটিয়ে গেল, তোমাবও তো সে ধরা বজায় বাখা চাই। ইন্সুলে পড়বো। ইন্সুলে পড়বি তো এদিকে কি হবে ? দিবা একটা যাহোক দাঁড়াবার পথ তবু হুয়ে আসছে—এখন তুমি দাঁও ছেড়ে—তারপব ইদিকেও যাক,

ওদিকেও যাক্—

মায়েঃ কথায় সে চুপ কসিয়া গেল। চক্রবর্তী মহাশয় গত পৌষ মাসে কানী চলিয়া গিয়াছেন, আজকাল তাহাকেই সমস্ত দেখিতে শুনিতে হয়। সামান্য একটু ওমি-ডমা আছে, তাহাব খাজনা আদায়, দান কাটাঁইবার বন্দোবস্ত, দশকর্ম, ইহ'দেবতার পূজা। গ্রামে ব্রাহ্ম- নাই, তাহাবাই একঘর মোটে। চাষী কৈবত ও অন্যান্য জাতির বাস তাহা ছাড়া এ-পাড়ার দু'তু ১৩ ৩-পাড়ার সবকাবেব। কাজে কর্মে ইহ'দেব সকলেরই বাড়ি অপুকে ষষ্ঠী পূজা মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। সবাই মানে, নিসিন্দ্র দেয়।

সেন্নি কি একটা তিথি উপলক্ষে সরকাব বাড়ি লক্ষ্মীপূজা। পূর্ণ সাবিয়া খানিক বাত্রে জিনিসপত্র একটা পুঁলি দানিয়া লয়্যা সে পথ বাহিয়া বাড়িব দিকে আসিতেছিল; খুব জোৎনা, সবকাব বাড়িব সামনে ন বিকেল গাছে কাঠঠোকরা শব্দ করিতেছে। শীত বেশ পড়িয়ছে; বাতাস খুব ঠাণ্ডা, পবে ক্ষেত্র কাশিব বেডায় আমড়া গাছে বটল দিয়াছে। কাশলিব বাড়িব পিছনে বেগুনক্ষেতের উঁচুনিচু ভূমিতে এক জায়গায় জোৎনা পড়িয়া চক্-চক্ করিতেছে—পাশেব খাদ্যেতেই ক্ষুধাব। অপু মনে মনে কখনা করিতে কসিতে খাইতেছিল যে উঁচু জায়গাটা একটা ভানুক, নিচুটা জলের চৌবাচ্চা, তাব পবেব উঁচুটা মনেব চিবি। মনে মনে ভাবিল—কমলালেবু দিয়েচে, বাড়ি গিয়ে কমলালেবু খাবো। মনেব সুখে শহবে-শেখা গানেব একটা চরণ সে গুন গুন করিয়া পলি—

সাগর কূলে বসিয়া বিবলে হেঁবি লহনী মাল!—

অনেকদিনেব স্বপ্ন মেনে আবার ফিবিয়া আসে। নিশ্চিন্দিপুরে থাকিত ইচ্ছামতীব তাঁবের বনে, মাঠে কত ধূসব অপসারকুব, কত জোৎনা রাওব সে সব স্বপ্ন। এই ছোট চাষাগাঁয়েব চিবকাপই এ একম ষষ্ঠীপূজা করিয়া কাটাঁইতে হবে?

সাবাদিনেব রোদে-পোড়া মাটি নৈশ শিশিরে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এখন শীতেব বাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহাষ্ট সুগন্ধ।

অপুর মনে হঠল মেলগাড়ির চাক'য় চ'ক'য় যেমন শব্দ হয়—ছোট্টা'কুর-পো—বটঠাকুর-পো—ছোট্টা'কুর-পো—বটঠাকুর-পো—

দুই-এক দিনের মধ্যে সে মায়েব কাছে কথাটা আবার ডুলিল। একবার শুধু তোলা নয়, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। আডবোয়ালেব মূল দুই ক্রোশ দূবে, তাই কি? সে খুব হাঁটিতে পারিবে এটুকু। সে বুঝি চিবকাল এই রকম চাষাগাঁয়ে বসিয়া ঠাকুরপূজা করিবে? বাহিরে ঘাইতে পারিবে না বুঝি।

তবু আরও মাস দুই কাটিল। স্কুলের পড়াশোনা সর্বজয়া বোঝে না, সে যাহা বোঝে তাহা পাইয়াছে। তবে আবার ইস্কুলে পড়িয়া কি লাভ? বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তার-

পরই একঘর মানুষের মত মানুষ।

সর্বজন্মের স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

কিছু অপূৰ্ব তাহা হয় নাই। তাহাকে পরিয়া বাখা গেল না—স্রাবণের প্রথমে সে আড়বোয়ালের মাঠের স্কুলে ভর্তি হইয়া পাঠ্যক্রম শুরু করিল।

এই পথের কথা সে জীবনে কোনদিন ভোলে নাই—এই একটি বৎসর পরিয়া কি অশ্রু আনন্দই পাঠিয়াছিল—প্রতিদিন সকালে-বিকালে এই পথ ইটিবার সময়টোতে ১০০' নর্শিং পুর্ন ছাড়াইয়া অবশ্য এত আনন্দ খাব হয় নাই।

ক্রোধ হইত পথ। দুপায়ে বসে, তুঁতে চায়া, খোপঝাপ, মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ। স্কুলে বসিয়া অপূৰ্ব মনে হইত সে মনে একা কতদূর বিদেশে আসিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত—চুটি পথে নির্জন পথে বাঁহর হইয়া পড়িত।—বিকালের ছায়ার ঢাঙা তাল-খেড়গাছগুলি যেন দিগন্তের আকাশ চুঁইতে চাহিতেছে—পিড়িং পিড়িং পাখির ডাক—ভ-ভ মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ আনিতেছে—সবত্র একটা মুক্তি, একটা আনন্দের বাতাস।...

কিছু সন্ধ্যাপেক্ষা সে আনন্দ পাইত পথ-চলতি লোকজনের সঙ্গে কথা কহিয়া। কত গ্রামের লোকেব সঙ্গে পথে দেখা হইত—কত দূর-গ্রামের লোক পথ দিয়া ইটিত, কত দেশের লোক কত দেশে যাইত। অল্প সবেমাত্র একা পথে বাঁহর হইয়াছে, বাহিরেব পৃথিবীটার সহিত মিলন ভাবে গাঢ় হয় হইতেছে, পথে ঘাটে সকলে সঙ্গে আলাপ কবিয়া ত হইবে কথা জানিতে তাহার প্রবল আগ্রহ। পথ চলবার সময়টা এইজন্য বড় ভালো লাগে, সাগ্রহে সে ইহার প্রতীক্ষা করে, স্কুলের চুটি পথে পথে নামিয়াই ভাবে—এইবার গল্প শুনবো। পথে ক্ষিপ্পপদে আগাইয়া আসিয়া কোনো অপরিচিত লোকেব নাগাল পরিয়া ফেলে। প্রায়ই চাষালোক, হাতে হাঁকোকক্কে। অল্প জিজ্ঞাসা কবে—কোপায় খাচ্ছ, ইঁা কাকা? চলো আমি মনসাগোতা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাবো। মামজোয়ান গিইছিলে? তোমাদের বাড়ি বুঝি? না? শিক্‌ডে? নাম শুনেচি, কোনদিকে জান নে। কি খেয়ে সকালে বেবিয়েচ, ইঁা কাকা?...

তারপর সে নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞাসা করে—কেমন সে গ্রাম, ক'ঘর লোকেব বাস, কোন নদীর ধারে? ক'জন লোক তাদের বাড়ি, কত ছেলে-মেয়ে, তাবা কি কবে?...

কত গল্প, কত গ্রামের কিংবদন্তী, সকাল-একালের কত কথা, পল্লীগৃহস্থের কত সুখদুঃখের কাহিনী—সে শুনিয়াছিল এই এক বৎসরে। সে চিরদিন গল্প-পাগলা, গল্প শুনিতে শুনিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়—যত সামান্য ঘটনাই হোক, তাহার ভাল লাগে। একটা ঘটনা মনে কি গভীর রেখাপাতই করিয়াছিল!

কোন গ্রামের এক ব্রাহ্মণবাড়ির বৌ এক বাগদীর সঙ্গে কুলের বাহির হইয়া গিয়াছিল—আজ অপূৰ্ব সন্ধ্যাটি এইমাত্র শায়ুকপোতার বিলে গুগলি তুলিতে

দেখিয়া আসিয়াছে। পরণে ছেঁড়া কাপড়, গায়ের গহনা নাই, ডাঙায় একটি চোট ছেলে বসিয়া আছে, বোধ হয় তাহারই। অপু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার দেশের মেয়ে? তোমায় চিনতে পারলে? ইয়া. নিনতে পারিয়াছিল। কত কাঁদিল, চোখের জল ফেলিল, বাপ-মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। অনুবোধ করিল যেন এসব কথা দেশে গিয়া সে না বলে। বাপ-মা শুনিয়া কষ্ট পাইবে। সে বেশ সুখে আছে। কপালে যাহা ছিল, তাহাই হইয়াছে।

সঙ্গীটি উপসংহারে বলিল, বামুন-বাড়ির বৌ, হর্তেলের মত গায়ের রঙ—যেন ঠাকুরুণের শিব তিমে।

দুর্গা-প্রতিমার মত রূপসী একটি গৃহস্থবধূ ছেঁড়া কাপড় পরণে শামুকপোতার বিলে ইটু ফল ভাঙিয়া চুপড়ি হাতে গুগুলি তুলিতেছে—কত কাল ছবিটা তাহার মনে ছিল।

সেদিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল স্কুলসূদ্ধ লোক বেড়ায় সম্ভ্রান্ত। মাস্টারেরা এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। স্কুল-ঘর গাঁদা ফুলের মালা দিয়া সাজানো হইতেছে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় খামোকো একটা সুরহং সিঁড়িভাঙা ভগ্নাংশ কথিয়া নিজেব ক্লাসের বোর্ড পুণাইয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ আজ স্কুল-ঘরের বাবান্দা ও কম্পাউণ্ড এত সাফ করিয়া বাধা হইয়াছে, যে, যাহারা বাবোমাস এস্থানের সহিত পবিচিত, তাহাদের বিস্মিত হইবার কথা। হেড-মাস্টার ফণাবাবু খাতাপত্র, এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিবা বই লইয়া মহা বাস্ত। সেকেণ্ড পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, ও অমুলাবাবু, চোঁঠো তাস্থি খাতায় যে নাম সহই কবেন নি? আপনাকে বলে বলে আব পাণ গেল না। দে দিতে এসেছিলেন তো খাতায় সহই ক'বে ক্লাসে গেলেই হ'ত? সব মনে থাকে, এইটের বেলাতেই—

অপু শুনিল একটাব সময় ইন্সপেক্টর আসিবেন স্কুল দেখিতে। ইন্সপেক্টর আসিলে কি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসের ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগিলেন।

বাগেটাব কিছু পূর্বে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া স্কুলের সামনে থামিল। হেডমাস্টার তখনও ফাইল দ্ববস্ত শেষ করিয়া উঠিতে পাঠকন নাই বোধ হয়—তিনি এত সকালে ইন্সপেক্টর আসিয়া পড়াটা প্রত্যাশা করেন নাই, জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গাড়ি দেখিতে পাইয়াই উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্ট ভেকের মত সজীব হইয়া উঠিয়া তারম্বরে ও মহা উৎসাহে (অন্যদিন এই সময়টাই তিনি ক্লাসে বসিয়া, ম্যান্যাক্টক নিদ্রাটুক উপভোগ করিয়া থাকেন) দ্রব পদার্থ কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। পাশের ঘরে সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়ের হকের শব্দ অন্তত ক্ষিপ্ততার সহিত বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল। শিক্ষক বলিলেন, মতি, তোমরা আসিয়া

কমলালেবু দেখিয়াছ, পৃথিবীর আকার—এই হলেন—কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার—

হেডমাস্টারের পিছনে পিছনে ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিলেন। বয়স চল্লিশ-বিশাংশ বৎসর হইবে, বেঁটে, গৌরবর্ণ, সাটিন জিনের লম্বা কোট গায়ে, সিল্কের চাদর গলায়, পায়ে সাদা ক্যান্সিসের জুতা, চোখে চশমা। গলার স্বর ভারী। প্রথমে তিনি অফিস-ঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র অনেকক্ষণ পরিয়া দেখার পবে বাহির হইয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফার্ক' ক্রাসে গেলেন। অপূর বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। এইবার তাহাদের ক্রাসে আসিবাব পালা। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় গলার সুব আর এক গ্রাম চড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিয়া বোর্ডের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা কি ভগ্নাংশ ধরতে? তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ আগ্রহসহকারে উজ্জল দেখাইল; বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, হু' ক্রাসে আমিই অঙ্ক কষাই কি না। ও ক্রাসেই অনেকটা এগিয়ে দিই—সরল ভগ্নাংশটা শেষ করে ফেলি—

ইন্সপেক্টর এক এক কবিতা বাংলা বিড়ি পড়িতে বলিলেন। পড়িতে উঠিয়াই অপূর গলা কাঁপিতে লাগিল। শেষের দিকে তাহার পড়া বেশ ভাল হইতেছে বলিয়া তাহার নিজেরই কানে ঠেকিল। পরিস্কার সতেজ দাঁশির মত গলা। বিন্বিনে মিষ্টি।

—বেশ, বেশ বিড়ি। কি নাম তোমার?

তিনি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তারপর সবগুলি ক্রাস একে একে ঘুরিয়া আসিয়া জলের ঘবে ডাব ও সন্দেশ খাইলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় অপূকে বলিলেন, তুই হাতে ক'বে এই ছুটি দরখাস্তখানা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। তোকে খুব পছন্দ কবেছেন, যেন বাইবে আসবেন, তুমি দরখাস্তখানা হাতে দিবি—৩ দিন ছুটি চাইবি—তোব কথায় হয়ে যাবে—এগিয়ে যা।

ইন্সপেক্টর চলিয়া গেলেন। তাহার গাড়ি কিছুদূর যাইতে না যাইতে ছেলেরা সম্মুখে কলরব করিতে কবিতা স্ল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হেডমাস্টার ফণীবাবু অপূকে বলিলেন, ইন্সপেক্টরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে গিয়াছেন তোমার ওপর। বোর্ডের একজামিন দেওয়াবো তোমাকে দিয়ে—তৈবী হও, বুঝলে?

বোর্ডের পরীক্ষা দিতে মনোনিবেশ হওয়ার জন্য যত না হউক, ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনের জন্য ৩ দিন স্কুল বন্ধ থাকিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হইল। অন্য দিনের চেয়ে দেবি হইয়া গিয়াছে। অর্ধেক পথ চলিয়া আগিয়া পথের ধারে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া মায়ের দেওয়া খাবারের পুঁটুলি খুলিয়া কুটি, নারিকেলকোথা ও গুড় বাহির করিল। এইখানটাতে বসিয়া রোজ সে স্কুল হইতে ফিরিবার পথে খাবার খায়। রাস্তার বাঁকের মুখে সাঁকোটা, হঠাৎ কোনো দিক হইতে দেখা যায় না, একটা বড়

তুঁত-গাছের ডালপালা নত হইয়া ছায়া ও আশ্রয় তুঁত-ই যোগাইতেছে ।
সাঁকোব নীচে আমরুল শাকেব বনের ধারে এক একটু জল বানিয়াছে,
মুখ বাড়ান্লে জলে ছায়া পড়ে । অপূব যেমন একটা অস্পষ্ট ভি ওহীন
ধাবণা আছে যে, জলটা মাঝে ভিত্তি, তাই সে একদু একদু কটির টুকু বা উ-ব
হইতে ঝেলিয়া দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে মাঝে ঠোকাহতেছে কি না ।

সাঁকোব নীচের জলে হাত মুখ ধুতে না মতে গিয়া হঠাৎ তাহার চোখ
পড়িল একজন ঝাঁকড়া-চুল কালো-মত লোক বাসাব ধারের মাঠে নামিয়া
লতা-কাঠি কুড়াইতেছেন । অপূব কৌতুহলী হইয়া চাহিয়া বহিল । লোকটা
খুব লম্বা নয়, বৈটে সরল, শত্রু হাত পা, মিঠে একগাছা বড় ধুক, একটা
বড় বোঁচকা, মাথায় চুল লম্বা লম্বা, গলায় বাঁধা ও সবুজ হিংলাজের মালা ।
সে অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া ডাকিয়া বলিল, ওখানে কি খুঁজচো ? পরে
লোকটির সঙ্গে তাহার আলোচন হইল । সে জাতিতে সাঁওতাল, অনেক
দূরে কোথাব ঘুমকা ছেলা আছে, সেখানে বাড়ি । অনেক দিন বা মাঝে
ছিল, বাঁকা বাঁকা বাংলা বলে, পায়ে হাঁটিয়া সেখানে হইতে আসিতো ।
গল্পের স্থান অনির্দেশ—একদেব যাবনা যাবনা যাইবে, সঙ্গে তীব্র ধুক
আছে, পথের ধারে বসে মাঠে বাহা শিকার মেলে—তাড়াই যায় ।
সম্প্রতি একটা কি পাখি মাঝিয়াছে মাঠের কোন ক্ষেত্রে হইতে গোটা কয়েক
বড় বড় বেগুন ও কুলিয়াছে—তাড়াই পাইয়া খাইবার খোঁজাও শুধু
লতা কাঠি কুড়াইতে । অপূব বলিল, কি পাখি দেখি ? লোকটা মেলা
হইতে বাহির করিয়া দেখাইল একটা বড় হাড়িমালা ধূম । সাঁতাকাবের ভাব
ধুক—বাহাতে সত্যিকারের শিকার সহব হয় অপূব কখনও দেখে নাই ।
বলিল, দেখি একগাছা তীব্র তোমার ? পরে হাতে লইয়া দেখিল, মুখে
শত্রু লেহাষ ফলা, পিছনে বুনোপাখির পালক বাঁধা—হৃদয় কে হৃদয়প্রদও
মুগ্ধকর ভিনিস ।—

—ছাড়া এতে পাখি মবে, আর কি মবে ?

লোকটা উত্তর দিল, সবাই মারা যায়—খসগোস, শিয়াল, মেজী এমন কি
বাঘ পর্যন্ত । তবে বাঘ মাঝিবার সময় তীব্র ফলস্ব অগ্নি একটা লতাব রস
মাঝাইয়া লইতে হয় । তাহার পর সে তুঁত গাছতলায় শুকনা পাতা-লতাব
আগুন জালিল । অপূব পা আঁব সেখানে হইতে নড়িতে চাহিল না—মুগ্ধ
হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, লোকটা পাখিটাব পালক ছাড়াইয়া আগুনে
ঝলসাইতে দিল, বেগুন গুলিও পুড়াইতে দিল ।

বেলা অত্যন্ত পড়িলে অপূব বাড়ি বসনা হইল । আহাব শেষ করিয়া
লোকটা তখন তাহার বোঁচকা ও তীব্র ধুক লইয়া বসনা হইয়াছে । এ
রকম মনুষ্য সে তো কখনো দেখে নাই । বাঃ—যেদিকে তুঁত চোখ যায়
যেদিকে যাওয়া—পথে পথে তীব্র ধুক দিয়া শিকার করা, বনের লতাপাতা
কুড়াইয়া গাছতলায় দিনের শেষে বেগুন পুড়াইয়া খাওয়া । গোটা আটকে

বড় বড় বেগুন সামান্য একটু গুনের ছিটা দিয়া' গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া কি করিয়াই নিমেষের মধ্যে সাব'ড় করিয়া ফেলিল।...

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। সকালবেলা স্কুলের ভাঙ চাইতে গিয়া অপু দেখিল রান্না চড়ানো হয় নাই। সব'ড়য়া বলিল, আজ যে কুণ্ডুইচণ্ডা পূজো—আজ স্কুলে যাবি কি করে? ওয়া বলে গিয়েচে ও দর পূজোটা সেরে দেওয়াব জন্মে—পূজোবারে কি আর স্কুলে যেতে পারবি? বড় বড় দেহী হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই বৈ কি? আমি পূজো করতে গিয়ে স্কুল কামাই করি আর কি? আমি ওসব গাববো না, পূজোতুতো আমি আর ক'ব কি করে, গোড়ই তো পূজো লেগে থাকবে আর আমি বুঝি শোভ বোজ—তুমি ভাত নিয়ে এস, আমি ওসব শুদ্ধিহিনে—।

—লক্ষ্মী বাবা আমার। আজ্ঞা, আজকের দিনটা পূজোটা সেরে নে। ওরা বলে গিয়েছে ওপাড়াসুদ পূজো হবে। তাল পাওয়া গেবে এক সামান্য কম নয়, মানিক মা'ব কথা শোনো, গুনতে হয়।

অ', কোন মতেই কথা শুনিল না। অবশেষে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সব'ড়য়া ভাবে নাই যে, ছেলে দশতাই তাহার কথা 'ঠেলি'বা না খাইয়া স্কুলে চলিয়া যাবে। এখন দশতাই বুঝিতে পারিল তখন তাহার চোখের ওল আর ব'না মানিল না। ইহা সে অ'শা করে নাই।

অপু স্কুলে পে হিঠেই হেডমাস্টার ফর্নিব'বু তাহারক নিজেব ঘরে ডাক দিলেন। ফর্নিব'বু পোষ্টে খানায় ব্র'থ পোষ্ট-অফিস, ফর্নিব'বুই পোষ্ট-মাস্টার। তিনি এখন ডাকঘরের কাজ করিতেছিলেন। বলিলেন, এসো অপু, তোমার নথর দেখবে? আজ ইন্সপেক্টর অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে—ব্যাডে'ব এগজামিনে তুমি জেলার প্রথম হয়েছ—পাঁচ টাকার একটা সল'শিশি পাবে যদি আবে পড়ে ওবে। পড়ে তো?

এই সময় প্রতীক পড়িত মহাশয় ঘরে ঢুকিলেন। ফর্নিব'বু বলিলেন, ওকে সে কথা এখন বললাম পড়িতমশাই। তিজেসক ক'টি আরও পড়বে তো?

প্রতীক পড়িত বলিলেন, পড়বেনা, বাঃ হ'বেব টুকশো ছেলে, স্কুলেব নাম বেখে'ত। ওয়া যদি না পড়ে তো পড়বে কে, কেউ 'ঠেলি'ব'না গোব'দ'ন কিছু না, আপন ইন্সপেক্টর অফিস লিখে দিন যে, ও হ'ই স্কুলে পড়বে। ওব আবার তিজেসটা কি?—ওঃ, সোজা পবিশ্রম কবিচি মশাই ওকে ভা'ংশটা শেখাতে?

প্রথমটা অপু যেন ভাল ক'শিয়া কথাটা বুঝিতে পারিল না। প'র এখন বুঝিল তখন তাহার মুখে কথা যোগাইল না। হেড মাস্টার একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সামনে ধ'িয়া বলিলেন—এখানে একটা নমুনা ক'রে দাও

তো। আমি কিন্তু লিখে দিলাম যে, তুমি হাইস্কুলে পড়বে। আজই ইন্সপেক্টর অফিসে পাঠিয়ে দেবো।

সকাল সকাল ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে মায়ের করুণ মুখচ্ছবি বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। পথের পাশে দুপুরের রৌদ্রভরা শ্রামল মাঠ, প্রাচীন তুঁত বটগাছের ছায়া, ঘন শালপত্রের অন্তরালে ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ, সব যেন করুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই অপূর্ব করুণ ভাবটি বড় গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। আজিকার দুপুরটির কথা উত্তর জীবনে বড় মনে আসিত তাহার। কত—কতদিন পরে আবার এই শ্রামচ্ছায়াভরা বীথি, বালোব অপরূপ জীবনানন্দ ঘুঘুর ডাক, মায়ের মনের একদিনের দুঃখটি—অনন্তের মহিমাতে গাঁথা দানাগুলির একটি, পশ্চিম দিগন্তে প্রতি সন্ধ্যায় ছিঁড়িয়া-পড়া, বহুবিশ্রুত মুক্তাবলীর মধ্যে কেমন করিয়া অক্ষয় হইয়াছিল। বাড়িতে তাহার মাও আজ সাবাদিন ঝগড়া নাই। ভাত চাহিয়া না পাইয়া ছেলে না খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে স্কুলে—সবজিয়া কি করিয়া খাবাবের কাছে বসে? কুলুইচণ্ডী ব ফলার খাইয়া অপু বৈকালে বেড়াইতে গেল।

গ্রামের বাহিবে ধ্বংসের ফসল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। চারি ধারে খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। আবার সেই সব রঙীন কল্লনা : সে পবীকায় রুত্তি পাইয়াছে। তার স্বপ্নের অতীত। মোটে এক বছর পড়িয়াই রুটি পাইল।...সুখের জীবনের কত ছবিই আবার মনে আসে। এ মাঠের পারে রক্ত আকাশটার মত রহস্যময়ভরা যে অজানা অকূল জীবন-মহাসমুদ্র।...পুলকে সারাদেহ শিহরিয়া উঠে। মাকে এখনও সব কথা বলা হয় নাই। মায়ের মনের বেদনার রঙে যেন মাঠ, ঘাট, অন্তর্দিগন্তের মেঘমালা রাঙানো। গভীর ছায়াভরা সন্ধ্যা মায়ের দুঃখের মনটার মত ঘুলি ঘুলি অন্ধকার।

দালানের পাশের ঘরে মিটি মিটি প্রদীপ জলিতেছে। সবজিয়া রান্নাঘরবেব দাওয়ায় ছেলেকে ওবেলার কুলুইচণ্ডী-ব্রতের চিঁড়ে-মুড়কির ফলার খাইতে দিল। নিকটে বসিয়া চাঁপাকলার খোসা ছাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, ওরা কত দুঃখ করলে আজ। সরকার-বাড়ি থেকে বলে গেল তুই পূজা করবি—তারা খুঁজতে এলে আমি বললাম, সে স্কুলে চলে গিয়েছে। তখন তারা আবার ভৈরব চক্রান্তিকে থেকে নিয়ে গিয়ে ওই অত বৈলায়—তুই যদি যেতিস—আজ না গিয়ে ভাল করিচি মা। আজ হেডমাস্টার বলেচে আমি এগ্জামিনে স্কলারশিপ পেইচি। বড় স্কুলে পড়লে মাসে পাঁচ টাকা করে পাবো। স্কুলে যেতেই হেডমাস্টার থেকে বললে—

সবজিয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোথায় পড়তে হবে?

—মহকুমার বড় স্কুলে।

—তা তুই কি বলি?

—আমি কিছু বলি নি। পাঁচটা করে টাকা মাসে মাসে দেবে, যদি না পড়ি

তবে তো আর দেবে না। ওতে যাইনেও ফ্রি করে নেবে আর ওই পাঁচ টাকাতে বোর্ডিং-এ থাকবার খরচও কুলিয়ে যাবে।

সর্বজন্মা আর কোন কথা বলিল না। কি কথা সে বলিবে? যুক্তি এতই অকাটা যে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। ছেলে স্থলারশিপ পাইয়াছে, শহরে পড়িতে যাইবে, ইহাতে মা-বাপের ছেলেকে বাধা দিয়া বাড়ি বসাইয়া রাখিবার পদ্ধতি কোথায় চলিত আছে? এ যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন দণ্ডী তার নির্মম অকাটা দণ্ড উঠাইয়াছে, তাহার ওল হাতের সাখা নাই যে ঠেকাইয়া রাখে। ছেলেও ঐনিকে ঝুঁকিয়াছে। আজকার দিনটিই যেন কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল সে। ভবিষ্যতের সহস্র সুখস্বপ্ন কুশাশার মত অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে কেন আজকার দিনটিতে বিশেষ করিয়া?

মাসখানেক পরে রবি পাওয়াব খবর কাগজে পাওয়া গেল।

যাইবাব পূর্বদিন বেকালে সবজন্মা বাস্তবাবে ছেলের জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। ছেলে কখন একা বিদেশে বাহির হয় নাই, নিতান্ত আনাড়ী, ছেলে-মানুষ ছেলে। কত জিনিসের দরকার হইবে, কে থাকিবে তখন সেখানে যে মুখে মুখে সব অভাব যোগাইয়া গিরিবে, সব জিনিস হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে? খুঁটিনাটি—একখানা কাঁধা পাতিবার, একখানি গায়েব—একটি জল খাইবাব গ্লাস, ঘরের তেবি এক শিশি সরেব দি, এক পুঁতুলি নাবিকেল নাড়ী, অপু ফুলকাটা একটা মাঝারি ডামবাটিতে দুগ খাইতে প্রলবাসে—সেই বাটিটা ছোট একটা বোতলে মাখিবাব চৈ-মিশানো নারিকেল তৈল, আবও কত কি। অপু মাবার বালিশের পুরানো ওয়াড বদলাইয়া নতুন ওয়াড পাইয়া দিল। দদি-মাত্রার আবশ্যকীয় দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল। ছেলেকে কি কবিতা বিদেশে চলিতে হইবে সে বিষয়ে সহস্র উপদেশ দিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। ভাবিয়া দেখিয়া যেটি বাদ দিয়াছে মনে হয় সেটি তখান আবাব ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।

—যদি কেউ মাঝে চারে, কত দুফ্টু ছেলে তো আছে, অমনি মাষ্টারকে বলে দিবি—বুঝি? বাগিবে ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন ভাত খাবাব আগে। এ তো বাড়ি নয় যে কেউ তোকে ওঠাবে—থেকে তবে ঘুমুবি—নয়তো তাদের বলবি, যা হয়েছে তাই দিলে ভাত দাও—বুঝি তো?

সন্ধ্যার পর সে কুণ্ডুদেব বাড়ি মনসার ভাসন স্তনিত গেল। অধিকারী নেচে বেহলা সাজিয়া পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে—বেশ গানের গলা। খানিকটা শুনিয়া তাহার ভাল লাগিল না। শুধু ছড়া কাটা ও নাচ সে পছন্দ করে না,—যুদ্ধ নাই, তলোয়ার-খেলা নাই, খেন পান্সে-পান্সে।

তবুও আজিকার রাতটি বড় ভাল লাগিল তাহার। এই মনসা-ভাসানোর আসর, এই নতুন জামগা, এই অচেনা গ্রামা বালকেব দল, ফিরিবার পথে তাহাদের পাড়ার বাঁকে প্রস্ফুটিত হেনা ফুলের গন্ধ ভরা নৈশ্র বাতাস জোনাকি

-অলা অঙ্ককারে কেমন মায়ায় মনে হয়।...

রাতে সে আরও দু-একটা তিনিস সঙ্গে লইল। বাবার হাতের লেখা এক-খানা গানের খাতা, বাবার উড়ট শ্লোকেব খাতাখানা বড় পেটাবা হঠাৎ বা'হির কবিয়া বাবিল—বড় বড় গোটা গোটা ছাঁদের হাতে লেখা বাবার কথা মনে আ'নয় দেয়। গানগুলি সঙ্গে বাবার গলাব সুব এমনভাবে জুড়াইয়া আছে যে, গুলি গ শুয়া গেলেই বাবার সুব কানে বাজে। নিশ্চিন্দপূর্বের কত ক্রীড়ান্ত শাস্ত সজ্জা, মেঘমেঘন ব্যামশাস্ত, কত জোৎস্না ভা' হস্যময়ী রাত্রি বিদেশ-ব'হু'ই-এব সেই দুঃখ-মাখানো দিনগুলিব সঙ্গে এই গানের সুব যেন জুড়াইয়া আছে—সেই দশাশ্রমের ঘাটেব রান', কাশীব পবিত্রিত সেই বাঙাল কথকঠাকুর।

সবজ্ঞাব মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়ত ছেলে শেষ পর্যন্ত বিদেশে যাইবাব মত কবিবে না। কিন্তু তা'হাব অপূর্ণে নিছনে দিকে কিসিয়াও চাহিতেছে না। সে যে এত খাটিয়া, একে ওকে বলিয়া কহিয়া গাহাব সাদামত যতটা কুলায় ছেলের প্রতিভা জীবনের অবলম্বন একটা খাড়া কিসিয়া দিয়াছিল—ছেলে তা'হা পায়ে দলিয়া যাইতেছে—কি জানি কিসের টানে। কোথায়? তা'হাব হেহবল নৃতি শাহাকে দেখিতে দি'হিল না যে, ছেলের ডাক আসিয়াছে বাহিবেব জগং হইতে। সে জগং' গাহাব দাবা আদায় কপিতে তো ছাডিবে না—সাদা কি সবজ্ঞাব যে চিংকাল ছেলেকে আ'লে লুকাইয়া বাখে?

যাত্রাব পূর্বে মাঙ্গলিক অংগঠানের দিব কৌণা অপূর্ণ কালে গজগা দিতে দিতে বলিল—বা'হি আবার শীগ'গিব শীগ'গিব আসবি কিয়, নোদের ইতুপ্জোব ছুটি দেবে তো'?

—হ্যাঁ, ইস্থলে বৃষ্টি ইতুপ্জোয় ছুটি হয়? তাতে আবার বড় ইস্থল। সেট আবার আসবো গরমের ছুটিতে।

ছেলের অকল্যাণের আশংকায় উচ্ছ্বসিত চোখের ডল বড় কঠে সবজ্ঞা চাপিয়া রাখিল।

অপু মায়ের প'স্বব দলা লইয়া ভাবী বেঁচকাটা দিঠে বুলাইয়া বা'হিব বা'হির হইয়া গেল।

মাঘ মাসের সকাল। ক'ল একু একটু মের ছিল, আজ মেঘ-অ'গা ব'ড়া রৌদ পুতুবাতির দো-দলা আম গাছের আদায় বলমল কিসিংছে—বা'হিব সামনে বাঁশবনের তল'য় চক্কে সবুজ পাতাব আড়ালে বুনো অ'দার ব'জান ফুল যেন দূর ভবিষ্যতের ব'জান স্বপ্নের কত সকালের বুকে।

অপরায়িত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সবে ভোর হইয়াছে। দেওয়ানপুর গবর্ন'মেন্ট মডেল হস্পিটিডশনের ছেলে দেয় বোর্ডিং-ঘরের সব দরজা এখনও খুলে নাই। টুকবল স্কুলের মাঠে দুইজন

শিক্ষক পায়েচাঁরী কবিত্তেছেন। সম্মুখের রাস্তা দিয়া এত ভোরেই গ্রাম
হঠাৎ গোয়ালারী বাজাৎ উপ বেচিতে আসিত্তেছিল, একজন শিক্ষক অগা-
ইয়া আসিয়া বললেন দাঁড়াও, ও ঘোষের পো, কাল উপ দি য় গেলে তা
নিউক হল, আঙ দেখি কেমন উপটা।

আর শিক্ষকটি পিছু পিছু আসিয়া বললেন, নেবেন না সন্তানবাবু, একটু
বেলা না গেলে ভাল উপ পাওয়া যায় না। আপনি নুন লোক, এসব ভায়-
গাব গতিক জানেন না, বাব তার কাছে ছু নেবেন না—আমার জানা
গোয়ালী আছে, কিনে দেবো বেলা হলে।

বোড়ি বাড়ির কোণেব ঘবে দাঁড়া গুলিয়া একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল
ও ঘবেব কণোনেশন কক-টাওয়ারেব দ্বিত্তে বয়না বাড়িয়াছে চাহিয়া দেখি-
বাব চোকা ক'ল। সন্তানবাবুর সখা শিক্ষকটির নাম বামন্দবাবুর, তিনি
ঢাকিয়া বললেন—ওহে সন্ন্যাস, ওহে যে ছেলেটি এবার দ্বিত্তিষ্ট স্কলারশিপ
পেয়েছে, সে কাল ব'বে এসেছে না?

ছেলেটি বলিল, এসেছে স্যার খুশুছে এখনও। থেকে দেবো?—পবে সে
জানাল্য ক'রে গিয়া ঢাকিল, অপর, ও অপর।

চিন্টিয়ে পাওয়া যেতনা চৌদ্দ পনেরো বৎসরের একটি খুব সন্দব ছেলে
চোখ মুড়িতে মুড়িতে বাহির হওয়া গিলিল। বাম দবাব বলিলেন, হোমার -
নাম ও ব'। ও।—এবার অ'বেব'লেন স্কল থেকে স্কলারশিপ পেয়েছ?—
বাড়ি কো'য়? ও। বেশ বেশ, হাজা, স্কল দেখা হবে।

সময় চিন্দা ক'ল, স'ব, উপব' কোন ঘবে থাকবে এখনও সেকেন
মাসের মসায় দিক কমে দেন নি। আপনি একটি বলবেন?

বামন্দবাবু বলিলেন, কেন হোব ঘবে হো সীট খালি রয়েছে—ওখানেই
থাকবে। সময় বোধ হয় ইহ'ই চাহিত্তেছিল, বলিল,—আপনি একটি বলবেন
তাহলে সেকেন—

বাম দবাব চলিয়া গেলে অপর জিজ্ঞাসা কলিল ইনি কে? পবে পবিচয়
কিনিয়া সে একটি অপ'ল হইল। হঠাৎ বো'ড়িং—এব নিয়ম নাই এত বেলা
প'ব' খুমানো, সে না জানিয়া প্রায় দিনটাতেই হয়ত একটা অপ'ব'ব কাছ
কবিয়া বসিয়াছে।

এক? বেলা হইলে সে স্কল-বাড়ি দেখিতে গেল। কাল অনেক ব'বে আসিয়া
শো'চিয়াছিল, ভাল ক'িয়া দেখিবাব সুযোগ পায় নাই। বাস্তব স্কলকারে
আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া সাদা ব'ব প্রকাণ্ড স্কল বাড়ি তাহাব মনে
একটা আনন্দ ও বহুসোব স'গাব ক'িয়াছিল।

এই স্কলে সে পড়িতে গাইবে।...কতদিন শহবে থাকিতে তাহাদেব ছোট
স্কলটা হঠাৎ বাহির হইয়া বাড়ি ফিবিবাব পথ দেখিতে পা'ত—হাই স্কলর
প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছেলেরা সকলেই এক ধরনের পোশাক পরিয়া ফুটবল

খেলিতেছে। তখন কতদিন যেন হইয়াছে এত বড় স্কুলে পড়িতে যাওয়া কি তাহার ঘটিবে কোন কালে—এসব বড়লোকের ছেলেদের জগৎ। এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইতে চলিল।

বেলা দশটার কিছু আগে বোর্ডিং-সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিধুবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে কোন্ ঘরে আছে, নাম কি, বাড়ি কোথায়, নানা জিজ্ঞাসা-বাদ করিয়া বলিলেন, সমীর ছোকরা ভাল। একসঙ্গে থাকবে বেশ পড়াশুনো হবে। এখানকার পুস্তকের ভলে নাইবে না কখনো—জল ভালো নয়, স্কুলের ইন্দারার ভলে ছাড়া—আচ্ছা যাও, এদিকে আবার ঘণ্টা বাজবার সময় হ'ল। সাড়ে দশটার ক্লাস বসিল। প্রথম বই খাতা হাতে ক্লাস-রুমে ঢুকিবাব সময় তাহার বুক আঁহেব ঔৎসুক্যে চিপ্ চিপ্ করিতেছিল। বেশ বড় ঘর, নীচু চৌকির উপর মাস্টারের চেয়ার পাতা—খুব বড় ব্ল্যাকবোর্ড। সব ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁতভাবে সাজানো। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, ডেস্ক সব ঝকঝক করিতেছে, কোথাও একটু ময়লা বা দাগ নাই।

মাস্টার ক্লাসে ঢুকিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ নিয়ম পূর্বে সে যে সব স্কুলে পড়িত সেখানে দেখে নাই। কেউ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইবার কথা মাস্টার শিখাইয়া দিতেন। সত্য সত্যি এতদিন পরে সে বড় স্কুলে পড়িতেছে বটে।...

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল পাশের ক্লাস-রুমে একজন কোট-প্যান্টপরা মাস্টার বোর্ডে কি লিখিতে দিয়া ক্লাসের এদিক-ওদিক ঘুরচালা করিতেছেন—চোখে চশমা, আঙ্গুঠা দাড়ি বুকের উপর পড়িয়াছে, গম্ভীর চেহারা। সে পাশের ছেলেকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, উনি কোন্ মাস্টার ভাই?

ছেলেটি বলিল—উনি মিঃ দত্ত, হেডমাস্টার—ক্রিস্টিয়ান, খুব ভাল ইংরিজি জানেন।

অপূর্ব ভূমিয়া নিরাশ হইল যে তাহাদের ক্লাসে মিঃ দত্তের কোন ঘণ্টা নাই। খাড়া ক্লাসের নিচে কোন ক্লাসে তিনি নাকি নায়েন না।

পাশেই স্কুলের লাইব্রেরী, ল্যাপ্‌থলিনের গন্ধ-ভরা পুরোনো বই-এবং গন্ধ আসিতেছিল। ভারিল এ ধরনের ভরপুর লাইব্রেরীর গন্ধ কি কখনো ছোট-বাটো স্কুলে পাওয়া যায়?

ঢং ঢং করিয়া ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে—খাড়াবোয়ালের স্কুলের মত একখণ্ড রেলের পাটির লোহা বাজায় না, সত্যিকারের পেটা ঘড়ি।—কি গভীর আশ্রয়ভাটা!

টিকিনের পরের ঘণ্টায় সত্যেনবাবুর ক্লাস। চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, ইহার মুখ দেখিয়া অপূর্ব যেন হইল ইনি ভারী বিদ্বান বুদ্ধিমানও বটে। প্রথম দিনেই ইহার উপর কেমন এক ধরনের শ্রদ্ধা তাহার গড়িয়া উঠিল? সে শ্রদ্ধা আরও গভীর হইল ইহার মুখের ইংরিজি উচ্চারণে।

ছুটির পর স্কুলের মাঠে বোর্ডিং-এর ছেলেদের নানা ধরনের খেলা শুরু হইল।

তাহাদের ক্লাসের নবী ও সমীর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অল্প সকল ছেলেদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। সে ক্রিকেট খেলা জানে না, নবী তাহার হাতে নিজের ব্যাটখানা দিয়া তাহাকে বল মারিতে বলিল ও নিজে উইকেট হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া খেলার আইনকানুন বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

খেলার অবসানে যে-বাহার স্থানে চলিয়া গেল। খেলার মাঠে পশ্চিম কোণে একটা বড় বাদাম গাছ, অপর গিয়া তাহার তলায় বসিল। একটু দূরে গবর্ণমেন্টের দাতব্য ঔষদালয়। বৈকালেও সেখানে একদল রোগীর ভিড হইয়াছে। তাহাদের নানা কলরবের মধ্যে একটি ছোট মেয়ের কান্নার সুর শোনা যাইতেছে। অপর কেমন অন্তরঙ্গ হইয়া গেল। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের মধ্যে এই আজ প্রথম দিন, যেদিনটি সে মায়ের নিকট হইতে বহুদূরে আশ্রয়-বন্ধুহীন প্রবাসে একা কাটাইতেছে। সেদিক দিয়া দেবিতে গেলে আজ তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কত কথা মনে ওঠে, এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরের জীবনে কি অপর বৈচিত্র্য কি ঐশ্বর্য।

সমীর টেবিলে খালো জালিয়েছে। অপর কিছু ভালো লাগিতেছিল না—বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিল। খানিকটা পরে সমীর পিছনে চাহিয়া তাক্যাকে সে অবস্থায় দেখিয়া বলিল, পড়ে না ?

অপর বলিল, একটু পরে—এই উঠি।

—খালোটো জালিয়ে রাখো, সুপারিন্টেন্ডেন্ট এখনি দেখতে আসবে, শুয়ে আছ দেখলে বকবে।

অপর উঠিয়া খালো জালিল। বলিল, রোজ আসেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ! সেকেন্ড মাস্টার তো—না ?

সমীরের কথা ঠিক। অপর খালো জালিবার একটু পবেই বিধুবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম লাগলো আজ ক্লাসে ? পড়াশুনো সব দেখে নিয়েচ তো ? সমীর, ওকে একটু দেখিয়ে দিস্ তো কোথায় কিসের পড়া। ক্লাসের রুটিনটা ওকে দে বরং—সব বই কেনা হয়েছে তো তোমার ? ...জিওমেট্রি নেই ? আস্তা, আমার কাছে পাওয়া যাবে, এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, কাল সকালে আমার ঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসো একখানা।

বিধুবাবু চলিয়া গেলে সমীর পড়িতে বসিল ; কিন্তু পিছনে চাহিয়া পুনরায় অপূর্বকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল, বাড়ির জন্যে মন কেমন করচে—না ?

তাহার পর সে খাটের দ্বারে বসিয়া তাহাকে বাড়ির সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিল, তোমার মা একা থাকেন বাড়িতে ? আর কেউ না ? তাঁর তো থাকতে কষ্ট হয়।

অপূর্ব বলিল, ও কিসের বকটা ভাই ?

—বোডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা—চলো যাই।

খাওয়া দাওয়া পর দুই-তিনজন ছেলে তাহাদের ঘরে আছিল। এই সময়টা আর সুপারিন্টেন্ডেন্টের ভয় না, তিনি নভের ঘরে দণ্ডা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শীতের গায়ে আর বড় একটা বাহির হন না। চেগেরা এই সময়ে এখন-এখন বোইয়া পুনঃপ্রবেশ অবকাশ পায়। সমীর দণ্ডা বন্ধ কাঁচিয়া দিয়া বলিল, এসো নুপেন, এটী আমায় খাটে বসে—শিশির গাও ওখানে—অপূর্ব জানো তাস খেলা?

নুপেন বলিল হেডমাস্টার আসবে না তো?

শিশির বলিল, হ্যাঁ, এত বাট্রিবে আবার হেডমাস্টার—

অপূর্ব তাস খেলিতে আসিল বটে কিন্তু শাঘ্রত বৃষ্টিতে পাবিল, মায়ের ও 'দ'দব সঙ্গে কতকাল আগে খেলায় সে বিছা লইয়া এখানে তাস খেলা খাট্রিবে না। তাস খেলায় ইহারা সব খা, কোন হাতে কি তাস আছে সব ইহাদের নবদর্পণে। তাহা ছাড়া এতগুলি অপরিচিত ছেলের সম্মুখে তাহাকে তাহার পুরাতন মুখচোখা বেগে খাইয়া বদিল। অনেক লোকের সম্মুখে সে মোটেই স্বচ্ছন্দে কথাবাতা বলিতে পারে না। মনে হয়, কথা বলিলেই হয়ত ইহারা হাসিয়া উঠিবে। সে সমীরকে বলিল, তোমরা খেলো, আমি দেখি। শিশির ছাড়ে না। বলিল, তিনদিনে শিখিয়ে দেব, সব দিকি তাস।

বাহবে খেল 'কিসেব শব্দ হইল। শিশির সঙ্গে সঙ্গে চুপ কাঁচিয়া গেল এবং হাতেব তাস লুকাইয়া পের পাঁচ মিনিট এমন অবস্থায় গিলি যে সেখানে একটা কাঠের পুতুল থাকিলে সেটাও তাহাব অপেক্ষা বেশী নড়িত। সকলেই সেই অবস্থা। সমীর টেবিলের আলোটা একটু কমাইয়া দিল। আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। নুপেন একবার দবজাব ফাঁক দিয়া বাহিবের বাবান্দাতে ভাঁকি মাটিয়া দেখিয়া আসিয়া নিজে তাস সমস্তে তে'শকো তলা হইতে বাহির করিয়া বলিল, ও কিছু না, এস এস—তোমরা হাতের খেলা শিখ।

রাত এগারোটার সময় পা টিপিয়া টিপিয়া যে তাহাব ঘরে চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের রোজ এমন হয় নাকি? কেউ টেব পায়ে না? আচ্ছা চুপ করে বসেছিল, ও ছেলেরা কে?

ছেলেটাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার পর হইতে সে বেশী কথা বলে নাই, তাহার খাটের কোণটিতে নীরবে বসিয়া ছিল। বয়স তেব-চৌদ্দ হইবে, বেশ চেহারা। ইহাদের দলে থাকিয়াও সে এতদিনে তাস খেলা শেখে নাই, ইহাদের কথাবাতা হইতে অপূর্ব বুঝিয়াছিল।

পরদিন শনিবার। বোডিং-এর বেশীরা ভাগ ছেলেই সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে ছুটি লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। অপূর্ব মোটে দুইদিন হইল আসিয়াছে; তাহা ছাড়া, যাতায়াতে খরচপত্রও আছে, কাজেই তাহার খাওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার মনে হইল, এই শনিবারে যাকে দেখিয়া

আসিলে মন্দ হইত না—সাবা শনিবারের বৈকালটা কেমন খালি খালি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় সে ঘবে আসিয়া আলো জ্বালিল। ঘরে সে একা সমীর বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, একমুখ চুণকাম-কলা ঘবে একা থাকিবাব নে ভাগ্য কখনও তাহার হয় না, সে খুশী হয়। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজে বসে বসিয়া বহিল। মনে মনে ভাবিল, এবার সমীরের মত একটা চেবিল আমার হয়? এবটা চেবিলে দম কত, সমীরকে হিটাদা করবো।

পরে সে আলোটা লইয়া গিয়া সমীরের চেবিলে পড়িতে বসিল। কুটিনে লেখা আছে—৬ মবারে পাটিগাঁওর দিন। অঙ্কে সে বাঘ বিবেচনা করে। বইখানা খুলিয়া দেখে প্রণাবলাব অঙ্ক কয়েকটি দেখিতেছে, এমন সময় দরজা দিয়া ঘবে কে ঢুকিল। কাল বাত্রে সেই শান্ত ভেলেট। অপুর বলিল—এসো এসো বোসো। ভেলেট বলিল, আপনি বাড়ি যান নি?

অপুর বলল, না, আমি তো মোটে পবণ্ড এলাম, বাড়িও দূরে। গিয়ে আবার সোমবারে আদা হবে না।

ভেলেট তাই মথের দিকে চাহিয়া বহিল। অপুর বলিল—বোর্ডিং-এ যে অঙ্ক একেবারেই ছেলে নেই, সব শনিবারেই কি এমনই হয়? খুনি বাড়ি যাও নি কেন? তোমার নামটা কি জান নে ভাই।

—দেবব্রত বধু—আপনার মনে থাকে না। বাড়ি গেলাম না কি ইচ্ছে কবে? সেকেন মাটা ছুটি দিল না। ছুটি চাড়ে গেলাম বললে, আর শনিবারে গেলে আবার এ শনিবারে কি? হব না, যাও।

তাঁহার পর সে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। তাহার বাড়ি শহর হইতে মাইলবাহী দূরে, যেনে খাড়ে হব। সে শনিবারে বাড়ি না গিয়া থাকিতে পারে না, মন হাপাইয়া উঠে, অথচ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছুটি দিতে চায় না। তাহার কথাবাতাব শব্দে অপুর বুঝিতে পারল যে, বাড়ি না যাইতে পারিয়া মন অঙ্ক খুবই খারাপ, অনবরত বাড়ির কথা ছাড়া অন্য কথা সে বড় একটা বলিল না।

দেবব্রত খানিকটা বসিয়া থাকিয়া অপুর বালিশটা টানিয়া লইয়া উইয়া পড়িল। অনেকটা আপন মনে বলিল, সামনের শনিবারে ছুটি দিতেই হবে, সেকেন মাটার না দেয়, হেডমাষ্টারের কাছে গিয়ে বলবো।

অপর এ ধরনের দূর প্রবাসে একা রাত্রিবাস করিতে আদৌ অভ্যস্ত নয়, চিরকাল মা-বাপের কাছে কাটাইয়াছে, আজকার রাত্রিটা তাহার সম্পূর্ণ উদ্ভাস ও নিঃসঙ্গ ঠেকিতেছিল।

দেবব্রত হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বলিল, আপনি দেখেন নি বুঝি? জানেন না? আসুন না আপনাকে দেখাই, আসুন উঠে।

পরে সে অপূর হাত ধরিয়া পিছনের দেওয়ালের বড় জানালাটির কাছে লইয়া গিয়া দেখাইল, সেটার পাশাপাশি দু'টি গরাদ তুলিয়া ফেলিয়া আবার

বনানো চলে। একটা লোক অনায়াসে সেই কাঁকটুকু দ্বিগুণ করে যাতায়াত করিতে পারে। বলিল, শুধু সমীরদা আর গণেশ জানে, কাউকে যেন বলবেন না।

একটু পরে বোর্ডিং-এর খাওয়ানো ঘণ্টা পড়িল।

খাওয়ার আগে অপু বলিল, আচ্ছা ভাই, এ কথাটার মানে জানো?

এক খণ্ড ছাপা কাগজ সে দেবব্রতকে দেখিতে দিল। বড় বড় অক্ষরে কাগজ-খানাতে লেখা আছে—Literature. এত বড় কথা সে এ পর্যন্ত কমই পাইয়াছে, অর্থটা জানিবার খুব কৌতূহল। দেবব্রত জানে না, বলিল, চলুন, খাওয়ার সময় যদিাকে ডিস্কাস করবো।

মণিমোহন সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্র, দেবব্রত কাগজখানা দেখাইলে সে বলিল, এ মানে সাহিত্য। এ ম্যাক্সিমিলান কোম্পানীর বইয়ের বিজ্ঞাপন, কোথায় পেলে?

অপু হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, ওই লাইব্রেরীর কোণটার কুড়িয়ে পেয়েছি, লাইব্রেরীর ভেতর থেকে কেমন ক'বে উড়ে এসেছে বোধ হয়।

কাগজখানার আখ্যায় লইয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন ন্যাপথলিমের গল্পটা।

কাগজখানা সে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল।

হেডমাস্টারকে অপু অত্যন্ত ভয় কবে। প্রায় বয়স, বেশ লম্বা, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি—গোঁফ—অনেকটা যাত্রাব দলের মূনির মত। ভাবী নাকি কড়া মেজাজের লোক, শিক্ষকেরা পয়স্তু তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন। অপু এতদিন তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া আসিতেছিল। একদিন একটা বড় মগা হইল। সতোন-বাবু ক্লাসে আসিয়া বাংলা হইতে ইংরেজি করিতে দিয়াছেন, এমন সময় হেড মাস্টার ক্লাসে ঢুকিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেডমাস্টার বইখানা সতোন-বাবুর হাত হইতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—আচ্ছা, এই যে এতে ভিক্টর হিউগো কথাটা লেখা আছে, ভিক্টর হিউগো কে ছিলেন জানো?—ক্লাস নীরব। এ নাম কেহ জানে না। পাঠ-গোয়েব ফুলের ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, কেহ নামও শোনে নাই।—

কে বলতে পারে।—তুমি—তুমি?

ক্লাসে সূচ পড়িলে তাহার শব্দ শোনা যায়।

অপুর অস্পষ্ট বনে হইল নামটা—যেন তাহার নিত্যন্ত অশ্রুচিত নয়, কোথাও যেন সে পাইয়াছে ইহার আগে। কিন্তু তাহার পালা আসিল ও চলিয়া গেল, তাহার মনে পড়িল না। ওদিকে বেঞ্চিটা ঘুরিয়া যখন প্রশ্নটা তাহাদের সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, নিশ্চিন্দপুরে থাকিতে সেই পুয়াতন ‘বঙ্গবাসী’ গুলার মধ্যে কোথায় সে এ-কথাটা পড়িয়াছে—বোম্ব হয়, সেই ‘বিলাত যাত্রীর চিঠি’র মধ্যে হইবে—তাহার মনে পড়িয়াছে। পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ফরাসী দেশের লেখক, খুব বড় লেখক। প্যারিসে তাঁর পাথরের মূর্তি

আছে, পথের ধারে ।

হেডমাস্টার বোধ হয় এ ক্লাসের ছেলের নিকট এ ভাবের উত্তর আশা করেন নাই, তাহার দিকে চশমা-আঁটা অলঙ্কারে চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই অপূ অভিজুত ও সঙ্কচিত অবস্থায় চোখ নামাইয়া লইল । হেড-মাস্টার বলিলেন, আজ্ঞা, বেশ । পথের ধারে নয়, বাগানের মধ্যে মৃতিটা আছে—বসো, বসো সব ।

সতোনবাব তাহার উপর খুব সম্বুদ্ব হইলেন । ছুটির পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন । ছোটোখাটো বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একাই থাকেন । স্টোভ আলিয়া চা ও খাবাব করিয়া তাহাকে দিলেন, নিজেও খাইলেন । বলিলেন, আর একটু ভাল ক'রে গ্রামারটা পড়বে—আমি তোমাকে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবো ।

অপর লজ্জাটা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, সে আলমারিটার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওতে আপনার অনেক বই আছে ?

সতোনবাব আলমারি খুলিয়া দেখাইলেন । বেশীর ভাগই আইনের বই, শীঘ্রই আইন পরীক্ষা দিবেন । একখানা বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এখানকার মি পড়ে—বাংলা বই, ইতিহাসের গল্প ।

অপর খানও দু'—একখানা বই নামাইয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাবিল না ।

মাংস-ভাজনের মধ্যে বোর্ডিং-এব সকলের সঙ্গে তাহার খুব জানাশোনা হইয়া গেল ।

হয়ত তাহা ঘটত না, কাবণ তাহার মত লাজুক ও মুখচোবা প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে সকলো সহিত মিশিয়া খালাপ করিয়া লওয়াটা একরূপ সম্ভব বাহ্যিক বাহ্যিক, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার সহিত ঘাচিয়া আসিয়া আলাপ করিল । তাহাকে কে খুশী করিতে পাবে—ইহা লইয়া দিনকতক খেঁচ বোর্ডিং-এব ছেলেদের মধ্যে একটা পাল্লা দেওয়া চলিল । খাবার-ঘরে খাইতে বসিবার সময় সকলেই ইচ্ছা—অপু তাহাকে কাছে বসে, এ তাড়াতাড়ি বড় পিঁড়িখানা পাতিয়া দিতেছে, ও ঘি খাইবার নিমন্ত্রণ করিতেছে । প্রথম প্রথম সে ইহাতে অস্বস্তি বোধ করিত, খাইতে বসিয়া তাহার ভাল করিয়া খাওয়া ঘটত না, কোন এক সময়ে খাওয়া সাফিয়া উঠিয়া আনিত । কিন্তু খেঁচ ফার্স্ট ক্লাসের রমাপতি পদস্থ তাহাকে নিজেব পাতেব লেবু তুলিয়া দিয়া গেল সেদিন সে খুশী তো হইলই, একটু গর্বও অনুভব করিল । রমা তি বয়সে তাহার অপেক্ষা চার-পাঁচ বৎসরের বড়, ইংরেজি ভাল জানে বলিয়া হেডমাস্টারের প্রিয়পাত্র, মাস্টারেরা পয়স্তু খতিব করিয়া চলেন, একটু গল্পা—প্রকৃতির ছেলেও বটে । খাওয়া শেষ করিয়া আনিতে আসিতে সে ভাবিল, আমি কি ওই জামলালের মত ? রমাপতিদা পর্যন্ত সেথে সেথে

অপু—

লেবু দিল! দেহ ওদের? কথাই বলে না।

দেহব্রত অঙ্ককারের মধ্যে কাঠালতলাটার তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল।
বলিল—আপনার ঘরে যাবো অপূর্বদা, একটা টাক্স একটু বলে দেবেন?
পবে সে হাসিমুখে বলিল, আজ বুধবার, আর চারদিন পরেই বাড়ি যাবো।
শনিবারটা ছেড়ে দিন, মশো আর তিনটে দিন। আপনি বাড়ি যাবেন না,
অপূর্বদা?

প্রথম ব্যয়েকমাস কাটিয়া গেল। স্কুল-কম্পাউণ্ডে সেই পাতাবাহার ও
চীনা-জবাব কোণটা অপূর্ব বড় শ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে রবিবারের শান্ত
হৃদয়ের রোজে ষাঠি দিয়া শুকনা পাতাব রাশির মধ্যে বসিয়া বসিয়া বই পড়ে।
ক্লাসের বই পড়িতে তাহার ভাল লাগে না। সে-সব বই-এর গল্পগুলি সে মাস-
খানেকের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিয়াছে। কিন্তু যুক্তিকল এই যে, স্কুল
লাইব্রেরীতে ইংরেজি বই বেশী। যে বইগুলার মধ্যেই চিত্রাকর্ম, ছবি বেশী,
সেগুলো সবই ইংরেজি। ইংরেজি সে ভাল বুঝিতে পারে না, কেবল ছবির
তলাকার বর্ণনাটা বোঝে মাত্র।

একদিন হেডমাস্টারের অফিসে তাহার ডাক পড়িল। হেডমাস্টার ডাকিতেছেন
জানিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে ভয়ে অফিস ঘরের দুয়ারের কাছে
গিয়া দেখিল, আব একজন সাহেবো পোশাক-পর্যায় ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে
বসিয়া আছেন। হেডমাস্টারের ইঙ্গিতে সে ধীরে ঢুকিয়া হুঁজনের সামনে
গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি ইংরেজিতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সামনের একখানা
পাতার উপর খুঁকিয়া পড়িয়া এক দোঁয়া পাইয়া একখানি ইংরেজি বই তাহার
হাতে দিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, এই বইখানা তুমি পড়তে পারিয়াছিলে?

অপূর্ব দেখিল, বইখানা The World of Ice, মাসখানেক আগে লাইব্রেরী
হইতে পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল। সবটা ভাল বুঝিতে পারে না।
সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ইয়েস—

হেডমাস্টার গর্তন করিয়া বলিলেন, ইয়েস স্যার।

অপূর্ব পা কাঁপিতেছিল, ভিত্ত শুকাইয়া আসিতেছিল, প্রথমত খাওয়া বলিল,
ইয়েস স্যার—

ভদ্রলোকটি পুনরায় ইংরেজিতে বলিলেন, স্নেজ কাকে বলে?

অপূর্ব ইহার আগে কখনও ইংরেজি বলিতে অভ্যাস করে নাই, ভাবিয়া
ভাবিয়া ইংরেজি বানাইয়া বলিল, এক ধরনের গাড়ি কুর্কুরে টানে। বরফের
উপর দিয়া যাওয়ার কথটা মনে আসিলেও হঠাৎ সে ইংরেজি করিতে পারিল
না।

অন্য গাড়ির সঙ্গে স্নেজের পার্থক্য কি?

অপূর্ব প্রথমে বলিল, স্নেজ ছাড়া—তারপরই তাহার মনে পড়িল—মাটিকুল-
সংক্রান্ত কোন গোলযোগ এখানে উঠিতে পারে। 'এ' বা 'দি' কোনটা

বলিতে হইবে ভাড়াভাড়ির মাঝার ভাবিবার সময় না পাইয়া সোলাসুজি বহ-
বচনে বলিল, স্নেহ হাভ নো হইলস্—

—অরোয়া বোরিস্লালিস কাহাকে বলে ?

অপুর চোখমুখ উজ্জল দেখাইল। মাত্র দিন কতক আগে সত্যোৎসাহবুর কি
একখানা ইংরেজি বইতে সে ইহার ছবি দেখিয়াছিল। সে জাম্বগাটা পড়িয়া
মানে না বুঝিলেও একখাটা খুব গাল ভরা বলিয়া সত্যোৎসাহবুর নিকট উচ্চা-
রণ জানিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ভাড়াভাড়ি বলিল, অরোয়া বোরিস্লা-
লিস ইজ এ কাইণ্ড অব্ এ্যাটমোস্ফেরিক ইলেকট্রিসিটি—

ফিয়ার্সা আসিবার সময় শুনিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, আন্‌ইউ-
জুয়াল ফর এ বয়স অব্ ফোর্থ ক্লাস। কি নাম বললেন ? এ স্ট্রাইকিংলি
জাওসাম বয়স—বেশ বেশ।

অপু পরে জানিয়াছিল তানি স্কুল-বিভাগেব বড ইন্সপেক্টর, না বলিয়া হঠাৎ
স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন।

পরে সে রমাপতির ঘরে ঝাঁক বুঝিতে যায়। রমাপতি অবস্থাপন্ন ঘরের
ছেলে, নিজের সাট বেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে। টেবিলের উপর পাথরের
দোয়াতদানি, নতুন নিব পরানো কলমগুলি সাক করিয়া গুটাইয়া রাখিয়াছে,
বিছানাটি খুববে, বালিশের ওপর তোয়ালে। অপু সঙ্গে পড়াশুনার কথা-
বাতা মিটিবার পর সে বলিল, এবার তোমায় সরস্বতী পূজোতে ছোট ছেলেদের
লীডার হতে হবে, আর তো বেশী দেয়াও নেই, এখন থেকেই টান্দা আদামের
কাছে বেরুনো চাই।

উঠিবাব সময় ভাবিল রমাপতিদাব মত এই রকম একটা দোয়াতদানি হয়
আমার ? চমৎকার ফুলকাটা ? লিখে আরাম কাছে। ই্যা টান্দা চাইতে
যাবো বৈ কি ? সব হবে না আমায় দিলে।—আসল কথা সে বেজায় মুখ-
চোরা, কাহারও সাহিত কথা বলিতে পারিবে না।

সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেবব্রত সমীরের টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ
করিয়া শুইয়া আছে। অপু বলিল, কি দেবু, বাড়ী যাও নি আজ ?

দেবব্রত মাথা না তুলিয়াই বলিল, দেখুন না কাণ্ড সেকেন্‌ মাস্টারের, ছুটি
দিলে না—ও শনিবারে বাড়ি যাই নি, আপনি তো জানেন অপূর্বদা। বললে,
তুমি ফি শনিবারে বাড়ি যাও, তোমার ছুটি হবে না।

দেবব্রতের জগ্য অপু মনে বড কষ্ট হইল। বাড়ির জগ্য ভাহার ঘনটা সারা
সপ্তাহ ধরিয়া কি রকম ভূষিত থাকে অপু সে সন্ধান রাখে। মনে ভাবিল,
ওরই ওপর সুপারিন্টেন্ডের যত কডাকডি। থাকতে পারে না, ছেলেমানুষ—
আচ্ছা লোক !

অপু বলিল, রমাপতিদাকে দিলে আমি একবার বিধুবাবুকে বলাবো।

দেবব্রত স্নান হাসিয়া বলিল, কাকে বলাবেন ? তিনি আছেন বুঝি ? মেয়ের
জন্তে নিখে বেহারাকে দিলে বাজার থেকে কল্যাণেব আনায়েন, কপি আনা-

লেন। তিনি বাড়ি চলে গিয়েছেন কোন্ কালে, সে ছোটো ট্রেনে—আর এখন বলেই বা কি হবে, আমাদের লাইনের গাড়িও তো চলে গিয়েছে—আজ আর গাড়ি নেই।

অপু তাহাকে ডুলাইবার জন্য বলিল, এসো একটা খেলা করা যাক। তুমি হও চোর, একখানা বই চুরি ক'বে লুকিয়ে থাকো, আমি ডিটেকটিভ হবো, তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবো—কিংবা ওইটে যেন একটা নক্সা, তুমি ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পালাবে আমি তোমাকে খুঁজে বার করবো—পড়ে নি 'নিহিলিস্ট রহস্য' ? চমৎকার বই—উঃ কি সে কাণ্ড ? প্রতুলের কাছে আছে, চেয়ে দেখো।

দেবব্রতের খেলাধুলা ভাল লাগিতেছিল না, তবুও অপূর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া মাথা তুলিয়া বসিল। বলিল, আমি লাইব্রেরীর ওই কোণটার গিয়ে লুকিয়ে থাকবো ?

—লুকিয়ে থাকতে হবে না, এই কাগজখানা একটা দরকারী নক্সা, তুমি পকেটের মধ্যে নিয়ে যেন রেলগাড়ীতে যাচ্চো, আমি বার ক'বে দেখে নেবো, তুমি পিস্তল বার ক'রে গুলি করতে হাসবে—

দেবব্রতকে লগিয়া খেলা জমিল না, একে সে 'নিহিলিস্ট রহস্য' পড়ে নাই, তাহার উপর তাহার মন খারাপ। নতুন ধরনের যুদ্ধ-আত্মা ছেঁব নক্সাখানা সে বিনা বাধ্যতায় ও এত সহজে বিপক্ষেব গুপ্তচরকে চুরি করিতে দিল যে, তাহাকে এসব কার্যে নিযুক্ত করিলে ক্রমশী় সম্রাটকে পতনের অপেক্ষায় ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিদ্রোহের মুখ চাছিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। বোডিং-এর পিছনে দেওয়ানী আদালতের কম্পাউণ্ডে অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত ভিড কমিয়া গিয়াছে। দেবব্রত জানলার দিকে চাহিয়া বলিল, ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে ক'টা বেজেচে দেখুন না একবার ? কাউকে বলবেন না অপূর্বদা, আমি এখুনি বাড়ি যাবো।

অপু বিশ্বস্তের সুরে বলিল, এখন যাবে কিসে ? এই যে বললে যেন নেই ? দেবব্রত সুব নিচু করিয়া বলিল—এগাবো মাইল তো রাস্তা যোটে, হেঁটে যাবো, একটু রাত যদি হ'য়ে পড়ে জোয়াংলা আছে, বেশ খাওয়া যাবে।

—এগাবো মাইল রাস্তা এখন এই পডন্ত বেলায় হেঁটে যেতে দেখে কত রাত হবে জানো ? রাস্তা কখনো হেঁটেচো তুমি ? তা ছাড়া না ব'লে খাওয়া—য'দ কেউ টের পায় ?

কিন্তু দেবব্রতকে নিবৃত্ত করা গেল না। সে কখনও রাস্তা হাঁটে নাই তাহা ঠিক, রাত্রি হইবে তাহা ঠিক, বিনুবাবুর কানে কথাটা উঠিলে বিপদ আছে, সবই ঠিক, কিন্তু বাড়ি সেই যাইবেই—সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না—যাহা ঘটে ঘটবে। অবশেষে অপূর্ব বলিল, তাহা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

দেবব্রত বলিল, তা হ'লে সবাই টের পেয়ে যাবে, আপনি তিন-চার ঘাস

বোডিং ছেড়ে কোথাও যাব নি, খাবার-ঘরে না দেখতে পেলে সবাই জানতে পারবে।

দেবব্রত চলিয়া গেলে অপু কাহারও নিকট সে কথা বলিল না বটে, কিন্তু পরদিন সকালে ষাণ্মার-ঘরে দেখা গেল দেবব্রতের অনুপস্থিতি অনেক লক্ষ্য করিয়াছে। রবিবার বৈকালে সমীর আসিলে তাহাকে সে কথাটা বলিল। পরদিন সোমবার দেবব্রত সকলে সম্মুখে কি করিয়া বোডিং-এর কম্পাউণ্ডে ঢুকিবে বা থাণ্ডা পড়িলে কৃতকার্যের কি কৈফিয়ৎ দিবে এই লইয়াই হুজনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া দেবব্রতকে সমীরের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে দেখিয়া সে দস্তর মত ঝবাক হইয়া গেল। সমীর বাইরে মুখ ধুইতে গিয়াছিল, আসিলে জানা গেল যে, কাল অনেক রাত্রে দেবব্রত আসিয়া জানালার শব্দ করিতে থাকে। পাছে কেউ টের পায় এজন্য পিছনের জানালার খোলা-গরাদটা তুলিয়া সমীর তাহাকে ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে।

অপু আগ্রহের সঙ্গে গল্প শুনিতে বসিল। কখন সে বাড়ি পৌঁছিল? রাত কত হইয়াছিল? তাহার মা তখন কি করিতেছিলেন?—ইত্যাদি।

রাত অনেক হইয়াছিল। বাড়িতে রাতের খাওয়া প্রায় শেষ হয়-হয়। তাহার মা ছোট ভাইকে প্রদীপ ধরিয়া রান্নাঘর হইতে বড়ঘরের বোয়াকে পৌঁছাইয়া দিতেছেন এমন সময়—

অপু কত দিন নিজে বাড়ি যায় নাই। মাকে কতদিন সে দেখে নাই। ইহা মত হাঁটিয়া যাতায়াতের পথ হইলে এতদিনে কতবার যাইত। রেল-গাড়ি, গহনা নৌকা, আবার খানিকটা হাঁটা-পথও। যাতায়াতে দেড় টাকা খরচ, তাহার একমাসের জলখাবার। কোথায় পাইবে দেড় টাকা যে, প্রতি শনিবার তো দুবেশ কথা, মাসে অন্তত একবারও বাড়ি যাইবে? জলখাবারের পরশ বাঁচাইয়া আনা আফেক পয়সা হইয়াছে, আর একটা টাকা হইলেই—বাড়ি। হয়ত এক টাকা জমিতে জমিতে গরমের ছুটিই বা আসিয়া যাইবে, কে জানে?

পরদিন সকালে হৈ হৈ বাপাব। দেবব্রত যে লুকাইয়া কাহাকেও না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল এবং রাববার রাত্রে লুকাইয়া বোডিং-এ ঢুকিয়াছে, সে কথা কি কবিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বিধুবাবু সুপারভেন্টেণ্ডেন্ট—সে কথা হেডমাস্টারের কানে তুলিয়াছেন। বাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া সমীরের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল, সে-ই যে জানালার ভাঙা গরাদ তুলিয়া দেবব্রতকে তাহাদের ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে, সে কথা হেডমাস্টার জানিতে পারিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? সমীর রম্যপতির ঘরে গিয়া অবস্থাটা বুঝিয়া আসিল। দেবব্রত নিজেই সব স্বীকার করিয়াছে, সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু সমীরের জানালা খুলিয়া দেওয়ার কথা কিছুই বলে নাই। বলিয়াছে, সে সোমবার খুব ভোরে চুপি চুপি লুকাইয়া

বোর্ডিং-এ চুকিয়াছে কেহ টের পায় নাট। স্কুল বসিলে ক্লাসে ক্লাসে হেডমাস্টারের সাকুলার গেল যে, টিফিনের সময় স্কুলের হলে দেবত্রতকে বেত মারা হইবে, সকল ছাত্র ও টিচারদের সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকা চাই। সমীর গিয়া রমাপতিকে বলিল, আপনি একবার বলুন না রমাপতিদা হেডমাস্টারকে, চেলেমানুষ, থাকতে পারে না বাড়ি না গিয়ে, আপনি তো জানেন ও কি রকম home-sick? মিথো মিথো ওকে তিন শনিবার ছুটি দিলেন না সেকেন্দ্র মাস্টার, ওর কি দোষ?

উপব ক্লাসেব ছাত্রদেব ডেপুটেশনকে হেডমাস্টার ইঁকাইয়া দিলেন। টিফিনের সময় সকলে একত্র হইলে দেবত্রতকে আনা হইল। ভয়ে তাব মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। হেডমাস্টার বড় গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, এই প্রথম অপরাধ বসিয়া তিনি শুধু বেত মারিয়াই চাডিয়া দিতেছেন নতুবা স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতেন।—রীতিমত বেত চলিল। কয়েক ঘা বেত খাইবার পবই দেবত্রত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, চুপ। bend this way bend। মার দে মরা বিশেষ করিয়া দেবত্রতের কাপ্তান অপর চোখে ডল আসিয়া গেল। মনে পড়িল লীলাদের বাড়ি এই বকম মার একদিন সেও খাইয়াছিল বড়বার কাছে। সেও বিনা দোষে।

অপু উঠিয়া বাবান্দায় গেল। ফিরিয়া আসিতে সমীর ধমক দিয়া চুপি চুপি বলিল, তুই ও-বকম কাঁদচিস কেন অপূর্ব? গাম না—হেডমাস্টার বকবে—

সরস্বতী পূজার সময় তাহার আট আনা চাঁদা মরাতে অপু বড় বিপদে পড়িল। মাসের শেষ, হাতেও পয়সা তেমন নাই, অথচ সে মুখে কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না, সরস্বতী পূজার চাঁদা দিয়া হাত একেবারে খালি হইয়া গেল। বৈকালে সমীর জিজ্ঞাসা করিল, বাবার খেতে গেলি নে অপূর্ব?

সে হাসিয়া মাড় নাড়িল।

সমীর তাহার সব খবর রাখে, বলিল, আমি বরাবর দেখে আসছি অপূর্ব, হাতের পয়সা ভারী বে-আন্দাজি খরচ করিস তুই—বুকেসুজে চললে এরকম হয় না—আট আনা চাঁদা কে দিতে বলেছে?

অপু হাসিমুখে বলিল, আচ্ছা, যা তোকে আর শেষাতে হবে না—ভারী আমার গুরুঠাকুর—

সমীর বলিল, না হাসি নষ্ট, সস্তা কথা বলছি। আর এই নবী, ভুলো, রাসবেহারী—ওদের ও রকম বাজারে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াস কেন?

অপু ভাবিলোয় ভজিতে বলিল, যাঃ রকিস্ নে—ওরা ধরে খাওয়ারবার ভুলে-

তা করবো কি ?

সমীর রাগ করিয়া বলিল, খাওয়াতে বললেই জ্বনি খাওয়াতে হবে ? ওরাও দুটুর মাড়ি, তোকে পেয়েছে ওই রকম তাই। অন্য কারুর কাছে তো কই ঘেঁষে না। খাডালে তোকে বোকা বলে তা জানিস ?

—হ্যাঁ বলে ঐকি।

—আমার মিশো কথা বলে লাভ ? সেদিন শনিদার ঘরে তোর কথা হচ্ছিল। ওই বদমায়েন বাসবেছারাটা বলছিল—কাকি দিয়ে খেয়ে নেয়,—আর ও-সব কল্যা লজ্জা,স কিনে এসে বিলিয়ে বাহাদুরি করতে কে বলেছে তোকে।

সমীর নিতান্ত মিশো বলে নাই। জীবনে এই প্রথম নিজের খরচপত্র অপুকে নিজে বুঝিয়া কবিতো হইতেছে, ইহার পূর্বে কখনও পয়সাকড়ি নিজেব হাতেব মশো পাইয়া নাড়াচাড়া করে নাই—কাজেই সে টাকা পয়সার ওজন বুঝিতে পারে না, স্ফলারশিপের টাকা হইতে বোডিং-এর খবচ মিটাইয়া টাকা-দুই হাতখবচের ভগ্ন বাঁচে—এই দেড় টাকা দুটাকাকে সে টাকার হিাবাবে না দেখিয়া সে পয়সার হসাবে দেখিয়া থাকে। ইতিপূর্বে কখনও আটটা পয়সা একত্র হাতেব মশো পায় নাই—একশো কুড়িটা পয়সা তাহার কাছে কুবেরের পনভাঙারের সমান অসীম মনে হয়। মাসেব প্রথমে ঠিক রাখিতে না পারিয়া সে দবাঙ্গ হাতে খবচ কবে—বাধানো খাতা কেনে, কালি কেনে, খাবাব খায়। প্রায়ই এ চারজন ছেলে আসিয়া পবে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে। তাহায়া খুব প্রশংসা কবে, পড়াশুনার তারিফ করে। অপু মনে মনে অত্যন্ত গর্ব অনুভব কবে, ভাবে—সোজা ভাল ছেলে আমি। সবাই কি খাতিব কবে। তবুও তো মোটে পাঁচ মাস এসেচি।

মহা খুশীর সহিত তাহাদিগকে বাজাবে লইয়া গিয়া খাবাব খাওয়ায়। ইহাব উপর খাবাব কেহ কেহ দার কবিতো আসে, অপু কাহারকেও ‘না’ বলিতে পারে না।

এরূপ করিলে কুবেরেব ভাঙার আর কিছু বেশী দিন টিকিতে পারে বটে, কিন্তু একশত কুড়িটা পয়সা দশদিনেব মশো নিঃশেষে উড়িয়া যায়, মাসের বাকি দিনগুলিতে কষ্ট ও টানটানিৰ সীমা থাকে না। দু’দশটা পয়সা যে তাহা পাব লয়, যুখচোবা অপু কাহারও কাছে তাগাদা করিতে পারে না—প্রায়ই তাহা আর আদায় হয় না।

সমীর বাড়িমন্টনের ব্যাংকেট হাতে বাহির হইয়া গেল। অপু ভাবিল—বলুক বোকা, আমি তো আর বোকা নই ? পয়সা দার নিম্নেচে কেন দেখে না—সবাই দেখে।

পরে সে একখানা বই হাতে লইয়া তাহাব প্রিয় গাছপালা-ঘেবা সেই কোণটিতে বসিতে যায়। মনে পড়ে এতক্ষণ সেখানে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, চীনে জবা গাছে কচি কচি পাতা ধরিয়াছে। যাইবার সময় ভাবে, দেখি আর,

ক'টা লজেঞ্জুস আছে ? —পরে বোতল হইতে গোটকতক বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া দেন্ন। ভাবে, আসছে মাসের টাকা পেলে ঐ যে আনারসের একরকম আছে, তাই কিনে আনবো এক শিশি—কি চমৎকার এগুলো খেতে ! এ ধরনের ফলের আবাদযুক্ত লজেঞ্জুস সে আর কখনও খায় নাই !

কম্পাউণ্ডে নামিয়া লাইব্রেরীর কোণটা দিয়া যাইতে যাইতে সে হঠাৎ অবাচ্ছ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। একজন বেঁটে-মত লোক ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া ফুলের কেরানী ও বোর্ডিং-এর বাজার-সরকার গোপীনাথ দত্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছে।

তাহার বৃকের ভিতরটা কেমন ছ'াৎ করিয়া উঠিল - - সে কিসের টানে যেন লোকটার দিকে পায়ে পায় আগাইয়া গেল...লোকটা এবার তাহার দিকে ফিরাইয়াছে—হাতটা কেমন বাঁকাইয়া আছে, তবনি কথা শেষ করিয়া সে ইঁদারার পাড়ের গায়ে ঠেস্-দেওয়ানো ছাতাটা হাতে লইয়া কম্পাউণ্ডের ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। লোকটাকে দেখিতে অবিকল তাহার বাবার মত।

কতদিন সে বাবার মুখ দেখে নাই। আজ চার বৎসর !

উদগত চোখের জল চাপিয়া জবাতলায় গিয়া সে গাছের ছায়ায় চূপ করিয়া বসিল।

অন্যমনস্তভাবে বইখানা সে উন্টাইয়া যায়। তাহার প্রিয় সেই তিন-রঙা ছবিটা বাহির করিল, পাশের পৃষ্ঠার সেই পত্ৰটা।

মদেশ হইতে বহুদূরে, আয়ীন্নস্বজন হইতে বহুদূরে, আলভিরিয়ার কর্কশ, বন্ধুর, ভলহীম মরুপ্রান্তে একজন মুম্বু তরুণ সৈনিক বাণশযায় শায়িত। দেশবার কেহ নাই। কেবল জনৈক সৈনিকবন্ধু পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখে চাড়ার বোতল হইতে একটু একটু জল দিতেছে। পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার সময় সম্মুখের এই অপরিচিত, ঘূসর উঁচুনিচু বালিয়াড়ি, পিছনের আকাশে সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা, দূরে ঝড়বৃষ্ণ ও উষ্ণ-মুখ উষ্ণশ্রেণীর দিকে চোঁক রাখিয়া মুম্বু সৈনিকটির কেবলই মনে পড়িতেছে বহুদূরে রাইন নদীতীরবর্তী তাহার জন্মপ্রসূর কথা...তাহার মা আছেন সেখানে। বন্ধু, জুঁজি আমার মাসের কাছে খবরটা পৌঁছাইয়া দিও, ভুলিও না।...

For my home is in distant Bingen, Fair Bingen on the Rhine !...

মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচ মাস !—সে আর থাকিতে পারে না...বোর্ডিং তাহার ভাল লাগে না, ফুল আর ভাল লাগে না, মাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না।

এই সব সময়ে এই নিজের অপরাহ্নগুলিতে নিশ্চিন্দিপুরের কথা কেমন করিয়া তাহার মনে পড়িয়া যায়। সেই একদিনের কথা মনে পড়ে।...

বাড়িতে পাশের পোড়ো ভিটার বনে অনেকগুলো ছাতারে পাখি ঝিচঝিচ করিতেছিল, কি ভাবিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেই দলের মধ্যে ছোট একট পাখি ঘাড মোচড়াইয়া টুপ করিয়া ঝোপের নিচে পড়িয়া গেল, বাকীগুলো উড়িয়া পলাল। তাহার ঢিলে পাখি সত্য সত্য মরিবে ইহা সে ভাবে নাই, দৌড়িয়া গিয়া মহা আগ্রহে দাঁদিকে ডাকিল, ওরে দিদি, শীগ্গির আয়রে, দেখাবি একটা জিনিস, ছুটে আয়—

ধুগা আসিয়া দেখিয়া বলিল, দেখি, দে-দিকি আমার হাতে। পরে সে নিজের হাতে পাখিটিকে লইয়া কোঁচুহলের সাহিত নাড়িয়া চাউড়িয়া দেখিল। ঘাড ভাঙিয়া গিয়াছে, গুথ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, ধুগাব আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। ধুগা তিরস্কারের সুরে বলিল, আহা কেন মাঝতে গেলি তুই ?

অপুর বিকল্পগবে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।

ধুগা বলিল, আজ কি বাব রে ? সোমবাব না ? তুই তো বামুনের ছেলে—চল, তুই আর আমি একে নিয়ে গিয়ে গাঙের ধারে পুড়িয়ে আসি, এর গতি হয় যে বাবে।

তারপর ধুগা কোথা হইতে একটা দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তেঁতুলতলার ঘাটের এক ঝোপের ধারে শুকনো পাতার আগুনে পাখিটাকে শানিক পুড়াইল, পরে আদ-ঝলসানো পাখিটা নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া সে ভক্তিভাবে বলিল—হাঁওবোল হরি, হরি ঠাকুর ওব গতি করবেন, দেখিস। আহা, কি করে ঘাডটা ধোঁতলে দিয়েছিল ? কখনো ওবকম করিস নে আর। বনে জঙ্গলে ডেডে বেডায়, কারুর কিছু কবে না, মারতে আছে, ছিঃ।—

নদী হহতে অঞ্জলি গরিয়া জল তুলিয়া ধুগা চিতার ভাস্কর্যটা ধুইয়া দিল। সন্ধ্যার আগে ঘাড ফিরবার সময় কে জানে তাহার কোন মুক্ত বিহঙ্গ আস্ত্রার আশ্রয় দলইয়া ফিরিয়াছিল।

দেবব্রত আসিয়া ডাক দিতে অপূর নিশ্চিন্দিপুবেব স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

দেবব্রত বলিল, অপূবদা এখানে বসে আছেন ? আমি ঠিক ভেবেচি আপনি এখানেই আছেন—কি কথা ভাবছেন—মুখ ভার ভাব—

অপূ হাসিয়া বলিল—ও কিছু না, এস বসো। কি ? চলো দেখি রাসবেহারী কি করছে।

দেবব্রত বলিল, না, যাবেন না অপূবদা, কেন ওদের সঙ্গে মেশেন ? আপনার নামে লাগিয়েচে, দোপার পয়সা দেয় না, পয়সা বাকী রাখে এই সব। যাবেন না ওদের ওখানে—

—কে বলচে এসব কথা ?

—ওই ওরাই বলে। বিনোদ ধোপাকে শিখিয়ে দিচ্ছিল আপনার কাছে পয়সা বাকী না রাখেতে। বলছিল, ও আব দেবে না—তিন বারের পয়সা বাকী আছে ?

অপূ বলিল, বা রে, বেশ লোক তো সব। হাতে পয়সা ছিল না তাই দিই

বী—এই লায়নের বাসে প্রথমই বিরে দেবো—তা আবার খোঁসকে শিখিয়ে দেওয়া—আচ্ছা তো সব।

দেবব্রত বলিল—আবার আপনি ওদের যান খাওয়াতে। আপনার সেই খাড়া খানা নিয়ে ওই বড়মাইস্ হিমাংগুটা আজ কত ঠাটা তামাসা করছিল—ওদের দেখান কেন ওসব?

অপু বলিল, এসব কথা আমি জানি নে, আমি লিখছিলাম ননৌষাধব এসে বলে, ওটা কি? তাই একটুখানি পড়ে শোনালাম। কি কি—কি বলছিল?

—আপনাকে পাগল বলে—যত রাজার গাছপালার কথা নাকি শুধু শুধু খাতায় লেখা। আবোল-তাবোল শুধু তাতেই গতি? ওরা তাই নিয়ে হাসে। আপনি চূপ কবে এইখানে মাঝে মাঝে এসে বসেন বলে কত কথা ভুলেছে—

অপু বাগ হইল, একটু লজ্জাও হইল। ভাবিল, খাতাখানা না দেখালেই হ'ত সেদিন। দেখতে চাইলে তাই তো দেখলাম, নইলে আমি সেদে তো আর—

মাঝে মাঝে তাহার মনে কেমন একটা অন্তরিতা আসে, এ সব দিনে বোর্ডিং-এর ঘরে অব্যক্ত থাকিতে মন চাহে না। কোথায় কোন মাঠ বেকালের রোদে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, চারান্ধরা নদীজলে কোপায় নববধুর নাকচাবির মত পানকলস শেওলার কুচা কুচা শব্দা ফুল ফুটিয়া নদীজল আলো কিনিয়া রাখিয়াছে, মাঠের মাঝে উঁচু ডাঙায় কোথায় খেঁটুকুলের বন...এই সবের স্বপ্নে সে বিভোর থাকে, মুক্ত আকাশ, মুক্ত মাঠ গাছপালার জন্য মন কেমন করে। গাছপালা না দেখিয়া বেশদিন থাকা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। মনে বেশী কষ্ট হইলে একখানা খাতায় সে বসিয়া বসিয়া যত রাজার গাছের ও লতাপাতার নাম লেখে এবং ঘে ঘরনের ভূমিশ্রাব জন্য মনটা তৃষ্ণিত থাকে, তাহারই একটা কল্পিত বর্ণনায় খাতা ভরাটয়া তোলে। সেখানে নদীর পাশেই থাকে মাঠ, বাবলা বন, নানা বনজ গাছ, পাখিডাকা সকাল বিকালের বোধ... ফুল। ফুলের সংখ্যা থাকে না। বোর্ডিং-এর ঘরটার আবদ্ধ থাকিয়াও মনে মনে সে নানা নানা মাঠে বনে নদীতীরে বেড়াইয়া আসে। একখানা পান খাওয়াই সে এভাবে লিখিয়া পুবাটয়া ফেলিয়াছে।

অপু ভাবিল, বলুক গে, আর ক'খনো কিছু দেখাচ্ছি নে। ওদের সঙ্গে এই আবার হয়ে গেল। দেবো আর কখনো ক্লাসেব টানলেগন বলে।

অপরাজিত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কল্কিন বাসের প্রথম হইতেই কুল-কম্পাউণ্ডের চারিপাশে গাছপালার নতুন পাতা পড়াইল। ক্রিকেট খেলার মাঠে বড় বাদাম গাছটার রক্তাক্ত কচি কল্কিন পাতা সকালের রৌদ্রে দেখিতে হইল চমৎকার, খীত একেবারে নাই

বলিলেই হয়।

ষোড়শ-এর রাসবিহারীর দল পরামর্শ করিল মাম্ভোয়ানে দোলার মেলা দে খিতে যাইতে হইবে। মাম্ভোয়ানের মেলা ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত মেলা। অপু গুলীর সহিত রাসবিহারীদের দলে ভিড়িল। মাম্ভোয়ানের মেলার কথা অনেক দিন হইতে সে শুনিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া নিশ্চিন্দ-পুরে পর্যন্ত কোথাও মেলা বা বারোয়ারি আর কখনো দেখা ঘটে নাই।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিদ্যাব্যু ৩ দিনের ছুটি দিলেন। অপু অনেক পরে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্রোশ তিনেক পদ—মাঠ ও কাঁচা মাটির রাস্তা। ছোট ছোট গ্রাম, কুমারবা চাক ঘুঘাইয়া কলনী গড়িতেছে। পথেব ধারে ছোট দোকানে দোকানদার রেডির ফলের বাঁজ ওজন করিয়া লইতেছে—সজিনা গাছ সব ফলে ভর্তি—এমন চমৎকার লাগে। ...ছুটি-ছাটা ও শনি-রবিবারে সমাধিবন না হইয়া এতটুকু জীবনধারণ পথের দুই পাশে, দিনে রাত্রিতে দুঃখে দুঃখ আকাশ বাতাসেব তলে, নিঃস্বপন মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাইয়া চন্দ্রল আনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে—এই জীবনধারণ সহিত সে নিঃস্বপন পরিচিত করিতে চায়।

মাঠে কাছাকাছি শুকনো খেড়ের ডালের আড়নে রস জাল দিতেছে দেখিয়া তাহার ঈচ্ছা হইল সেও হদের কাছে গিয়া খানিকক্ষণ রস জাল দেওয়া দেখিবে, বসিয়া বসিয়া শুনিবে উহারা কি কথাবার্ত বলিতেছে।

ননী বলিল, তাকে পংগল বলি কি আবসাদে? দূব, দূর,—আর কি দেখবি ওখানে? অপু সম্প্রতি দুঃখে বলিল, আর না ওনা কি বলছে শুনি? ওনা কত গল্প শুনে, জানিস? আর না—

রাঙা নায়ের পাঠশালায় সেও দিনগুলি হইতে বয়স্ক লোকের গল্পের ও কথাবার্তার প্রতি তাহার প্রবল ঘোহ আছে—একটা বিস্মৃততব, অপরিচিত জীবনের কথা ইহাদের মুখে শোনা যায়। অপু ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়—রাসবিহারীর দল ওগো তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোকের ছেলে দোঁবয়া মুঁচিয়া খুব খাতির কবিল। খেড়ের-রস খাইতে আসিয়াছে ভাবিয়া মাটির নতুন ভাঁড় ধুইয়া জিরান কাটের টাটকা রস লইয়া আসিল। ইহাদের কাছে অপু আদৌ মুখচোরা নয়। ঘন্টাখানেকের উপর সে তাহাদের সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুড আল দেওয়া দেখিল।

মাম্ভোয়ানের মেলার পৌঁছিতে তাহার হইয়া গেল বেলা বারোটা। প্রকাণ্ড মেলা, ভ্রমরক ভিড়। বোঁদ্রে যেন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছে, সজীদের মধ্যে কাছাকাছি সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পাবিল না। ক্রুখা ও তুম্বা দুই-ই পাইয়াছে, ভাল খাবার খাইবার পরমা নাই, একটা দোকান হইতে সামান্য কিছু খাইয়া এক ঘটি জল খাইল। তাহার পর একটা পানীর খেলার

তীব্র ফাঁক দিয়া ঘোঁষবার চেষ্টা করিল—ভিতরে কি খেলা হইতেছে। একজন পশ্চিমা লোক হটাইয়া দিতে আসিল।

অপু বলিল, কত করে নেবে খেলা দেখতে? হুপসসা দেব—দেখাবে?

লোকটি বলিল, এখন খেলা শুরু হইয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্য পবে আসিতে।

একটা পানের দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাত্তা কবে বসবে জানো?

বৈকালে লোকের ভিড় খুব বাড়িল। দোকানে দোকানে, বিশেষ করিয়া পানের দোকানগুলিতে খুব ভিড়। খেলা ও ম্যাজিকের তীব্রতার সামনে—

খুব ঘণ্টা ও ভয়টাক বাজিতেছে। অপু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—

একটা বড় তীব্র বাহিরে আলকাতরা-মাখা জন দুই লোক বাঁশের মাচার উপর দাঁড়াইয়া কোতূহলী জনতার সম্মুখে খেলাব অভ্যাসচর্চা ও অভিনবত্বের নমুনা স্বরূপ একটা লম্বা লাল নীল কাগজের মালা নানা অঙ্গভঙ্গিসহকাবে মুখ হইতে টানিয়া বাহিরে কবিত্তেছে।

সে পাশের একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিল, এ খেলা ক'পসসা জানো?

নিশ্চিন্দপুরে থাকিতে বাবার বইয়ের দপ্তরে একখানা পুঁথাতন বই ছিল, তাহার মনে আছে, বইখানার নাম 'বহুস্য লহন'। রুমাল উড়াইয়া দেওয়া, কাটামুণ্ডু ক কথা-বলানো, এক ঘণ্টা মধো আম-চারায় নল-ধরানো প্রভৃতি নানা ম্যাজিকের প্রক্রিয়া বইখানাতে ছিল। অপু বই দেখিয়া দু-একবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিল কিন্তু নানা বিলাতী ঔষধের ফর্দ ও উৎকণ্ঠের তালিকা দেখিয়া, বিশেষ কবিতা 'নিশাদল' এবাটি কি বা তাহা কোথায় পাওয়া যায় টিক কবিত্তে না পারিয়া, অবশেষে ছাড়িয়া দেয়।

সে মনে মনে ভাবিল—ওই সব দেখেই তো ওয়া শেখে। বাবার দেই বইখানাতে কত ম্যাজিকের কথা লেখা ছিল।—নিশ্চিন্দপুর থেকে আসবার সময় কোথায় যে গেল বইখানা।

চারিধারে বাজারে শব্দ, লোকজনের হাসি-খুশি, খেলো সিগারেটের ধোঁয়া, ভিড়, আলো, সাজানো দোকানের সারি, তাহার মন উৎসবেব নেশায় মাতিয়া উঠিল।

একদল ছেলেমেয়ে একখানা গোরুর গাড়ির চইয়ের ভিতর হইতে কোতূহল ও আগ্রহে মুখ বাড়াইয়া ম্যাজিকের তীব্র জীবন্ত বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে যাইতেছে। সকল লোককেই সিগারেট খাইতে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল সেও খায়—একটা পানের দোকানে ক্রেতার ভিড়ের পিছনে খানিকটা দাঁড়াইয়া অবশেষে একটা কাঠের বাস্তুর উপর উঠিয়া একজনের কাঁধের উপর দিয়া হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এক পসসার দাও তো? এই যে এই-দিকে—এক পসসার সিগারেট—ভাল দেখে দিও—খা ভালো।

একটা গাছের তলায় বইয়ের ঘোড়ান দেখিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। ক্রেতার খেলের উপর বই বিছানো, দোকানী খুব বড়ো, চোখে সূতা-বাঁধা চলমা।

একখানা ছবিওয়লা চটি আরব্য উপন্যাস অপু পছন্দ হইল—সে পড়ে নাই

—কিছু ঘোঁকাণী দাব বলিল আঁট আঁটা। হাতে পরসী থাকলে সে কিবিত ৮
বইখানা আর একবার দেখিতে গিয়া হঠাৎ সম্মুখের দিকে চোখ পড়িতে
সে অবাক হইয়া গেল। সম্মুখের একটা দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া আছে
—পটু। তার নিশ্চিন্দপুরের বালাসজী পটু।

অপু তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া গায়ে হাত দিতেই পটু মুখ কিরাইয়া
তাহার দিকে চাহিল—প্রথমটা যেন চিনিতে পারিল না—পরে প্রায় চিংকার
করিয়া বলিয়া উঠিল, অপু দা, ... এখানে কি করে, কোথা থেকে অপু দা ? ...
অপু বলিল, তুই কোথা থেকে ?

—আমার তো দিদির বিয়ে হয়েছে এই লাউখালি। এইখেন থেকে দু-
কোশ। তাই মেলা দেখতে এলাম—তুই কি করে কাশী থেকে ?—

অপু সব বলিল। বাবাব মৃত্যু, বড়লোকের বাড়ি, মনসাপোতা স্কুল।
জিজ্ঞাসা করিল, বিনিদির বিয়ে হয়েছে মাম্বোয়ানোর কাছে ? বেশ
তো—

অপুর মনে পড়িল, অনেকদিন আগে দিদির চড়ুইভাতিতে বিনিদির ভয়ে
ভয়ে আসিয়া যোগ দেওয়া। গরীব অগ্রদানী বামুনের মেয়ে, সমাজে নিচু
স্থান, নম্র ও ভারি চোখ দুটি সবদাই নামানো, অল্লিই সন্তুষ্ট।

দু'জনেই খুব খুশী হইয়াছিল। অপু বলিল—মেলার মধ্যে বড়ড ভিড ভাই,
চল কোথাও একটু ফাঁকা জায়গাতে গিয়ে বসি—অনেক কথা আছে তোর
সঙ্গে।

বাহিরেব একটা গাছতলায় দু'জনে গিয়া বসিল—তাহাদের বাড়িটা কিভাবে
আছে ? ... বাগুদি কেমন ? ... নেতা, পটল, নীলু সবুদা ইহাবা ? ... ইছামতী
নদী ? পটু সব কথার উত্তর দিতে পারিল না পটুও আজ অনেকদিন
গ্রাম ছাড়া। পটু ব আপন মা নাই, সংমা। অপুবা দেশ ছাড়িয়া চালিয়া
যাওয়া নয় হইতে সে সজীহান হইয়া পড়িয়াছিল। দিদির বিবাহের পরে
বাড়িতে একেবারেই মন টিকিল না। কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া
বেড়াইতেছিল পড়াশুনার চেফায়। কোথাও সুবিধা হয় নাই। দিদির
বাড়ি মাঝে মাঝে আসে, এখানে থাকিয়া যদি পড়াশুনার সুযোগ হয়, সেই
চেফায় আছে। অনেকদিন গ্রাম ছাড়া, সেখানকার বিশেষ কিছু খবর জানে
না। তবে শুানিয়া আসিয়াছিল—শোভিত বাণীদিব বিবাহ হইবে, সে তিন
বছর আগেকার কথা, এতদিন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে।

পটু কথা বলিতে বলিতে যখন দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।
রূপকথার রাজপুত্রের মত চেহারা হইয়া উঠিয়াছে অপুদাব। ... কি সুন্দর মুখ ...
অপুদাব কাপড়চোপড়ের ধরনও একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অপু তাহাকে একটা খাবারের দোকানে লইয়া গিয়ে খাবার খাওয়াটল,
বাহিরে আসিয়া বলিল, সিগারেট খাবি ? তাহাকে ম্যাজিকের তাঁবুর সামনে
আনিয়া বলিল, ম্যাজিক দেখিস নি তুই ? আস্ত তোক দেখাই—পরে শে

আট পয়সায় দুইখানা টিকিট কাটিল। উৎসুক মুখে পটুকে লইয়া ব্যাজিকের
আবুতে ঢুকিল।

ব্যাজিক দেখিতে দেখিতে অপু জিজ্ঞাসা করিল, ইয়ে, আবার চলে এলে
রাণুদি বলতো নাকি কিছু আমাদের—আমার কথা? নাঃ—

খুব বলিত। পটুব কাছে কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে অপু তাহাকে কোন
পত্র লিখিয়াছে কি না, তাহাদের কাশীর ঠিকানা কি? পটু বলিতে পারে
নাই। শেষে পটু বলিল, বুড়ো নরোওম বাবাজী তোব কথা ভারী
বলতো।

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার বোন্টম দাধু এখনো বাঁচিয়া
আছে?—এখনও তাহার কথা ভুলিয়া যায় নাই। মধুব প্রভাতের পদ্মফুলের
বড় ছিল দিনগুলো—আকাশ ছিল নিমল, বাতাস ক'শান্ত, নবীন উৎসাহ
স্তরা যথুচ্ছন্দ। মধুব নিশ্চিন্দিপুর। মধুব ইচ্ছামতীব কলমর্মর।...মধুব
তাহার দুঃখী দিদি দুগ'ব হেইডবা ডাগব চোখো স্মৃতি।...কতদূর ক—ত
দূরে চলিয়া গিয়াছে সে দিনের জীবন। খেলাঘরের দোকানে নোনা-পাতাব
পান বিক্রী, সেই সতুদাব মাকাল ফল চুবি কবিয়া দৌড় দেওয়া...

একবার একখানা বইতে সে পড়িয়াছিল দেবতার মায়ায় একটা লোক
মানের সময় ডলে ডুব দিয়া পুনরায় উঠিবার যে সামান্য ফাঁকটুকু তাহারই
মধ্যে ষাট বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিল—যেন
তাহার বিবাহ হইল, ছেলেমেয়ে হইল, তাহার সব মানুষ হইল, কতক বা
মরিয়া গেল, বাকীগুলির বিবাহ হইল, নিজেও সে রক্ত হইয়া গেল—হঠাৎ
জল হইতে মাথা তুলিয়া দেখে—কোথাও কিছু নয়, সে যেখানে সেখানেই
আছে, কোথায় বা ঘরবাড়ি, বা ছেলেমেয়ে।

গল্পটা পড়িয়া পথস্ত মাঝে মাঝে সে ভাবে তাহারও ওরকম হয় না?
এক-এক সময় তাহার মনে হয় হয়ত বা তাহার হইয়াছে। এ সব কিছু
না—স্বপ্ন। ব'বার মৃত্যু, এই বিদেশে, এই স্কুলে পড়া—সব স্বপ্ন। কবে
একদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিবে সে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে তাহাদের
সেই বনের পারের ঘরটাতে আবার পড়ন্ত বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—
দুন্ডার দিকে পাখির কলরবে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছে,
কি সব হিজিবিজি অর্থহীন স্বপ্নই না সে দেখিয়াছে ঘুমের ঘোরে।...বেশ মজা
হয়, আবার তাহার দিদি ফিরিয়া আসে, তাহার বাবা, তাহাদের বাড়িটা।

একদিন ক্লাসে সত্যেনবাবু একটা ইংরেজী কবিতা পড়াইতেছিলেন, নামটা
গ্রেভস্ অফ এ হাউস্‌হোল্ড। নিজ'নে বসিয়া সেটা আবৃত্তি করিতে করিতে
তাহার চোখ দিয়া জল পড়ে। ভাইবোনেরা একসঙ্গে মানুষ, এক যানের
কালেপিঠে এক ছেঁড়া কাথার তলে বড় হইয়া জীবনের ভাকে কে কোথায়
গল চলিয়া—কাহারও সমাধি সমুদ্রে, কাহারও কোন অজানা দেশের
অপরিসীম আকাশের তলে, কাহারও বা ফুল-ফোটা কোন গ্রাম্য বনের

থাকে ।

আপনি-আপনি পথ চলিতে চলিতে এই সব স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া যায় । কত কথা যেন মনে ওঠে । কত লোকের দুঃখের তদুদ্দেশ্য কাহিনী । নিশ্চিন্দ-পুণ্ড্রের জানালার দ্বারে বসিয়া বসিয়া সে ছবি দেখা—সেই বিপন্ন কর্ণ, নিবাসিতা সীতা, দরিদ্র বালক অশ্বখামা, পরাজিত রাজা দুর্দ্যোতন, স্ত্রীবাণিকা জোয়ান । বুঝাইয়া বলিবার বয়স তাহার এখনও হয় নাই ; ভাবকে সে ভাষা দিতে জানে না—অল্পদিনের জীবনে অশীত সমুদ্রের পথ ও কাহিনী অবলম্বন করিয়া সে যে ভাবে ভগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছে—অনাবিল তরুণ মনের তাহা প্রথম কাব্য—তাব কাঁচা জীবনে সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায় গাঁথা বনফুলের হাব ।—প্রথম উচ্চারিত শব্দমন্দের কাব্য ছিল যে বিশ্বয় যে আনন্দ—তাহাদেরই সগোত্র, তাহাদেরই মত ঋদ্ধিশীল ও অবাচ্য সৌন্দর্যময় ।

(রাগবক্ত সঙ্ক্যার আকাশে সত্যের প্রথম শুকতারার ।)

কে জানে—ওব মনেরসে-সব গহন গভীর গোপন রহস্য ? কে বোঝে ?

ম্যাজিকের তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দু'জনে মেলার মতো ঢুকিল । বোর্ডিং-এর একটি ছেলের সঙ্গেও তাহার দেখা হইল না, কিন্তু তাহার আমোদের তৃষ্ণা এখনও মেটে নাই, এখনও ঘুবিয়া ফিবিয়া দেখিবার ইচ্ছা । বলিল—চল পটু দেখে আসি যাত্রা বসবে কখন—যাত্রা না দেখে যা'স নে যেন ।

পটু বলিল, অপুদা কোন ক্লাসে পড়িস তুই ?

অপু অনুমনস্কভাবে বলিল, ঐ যে ম্যাজিক দেখলি, ও আমার বাবার একখানা বই ছিল, তাতে সব লেখা ছিল, কি ক'বে করা যাব—জিনিস পেলে আমিও করতে পারি—

—কোন ক্লাসে তুই—

—ফোর্থ ক্লাসে । একদিন আমাদের স্কুলে চল, দেখে আসবি—দেখবি কত বড় স্কুল—গাত্রো আমাদের কাছে থাকবি এখন—একটু থামিয়া বলিল—সত্যি এত ভয়গায় তো গেলাম, নিশ্চিন্দপুত্রের মত আব কিছু লাগে না—কোথাও ভাল লাগে না—

—তোবা যা'বি নে আর সেখানে ? সেখানে তোদের জন্যে সবাই দুঃখ করে, তোর কথা তো সবাই বলে—পরে সে হাসিয়া বলিল, অপুদা, তোব কাপড় পববার ধরন পর্যন্ত বদলে গেছে, তুই আর সেই নিশ্চিন্দপুত্রের পাডার্গেয়ে ছেলে নেই—

অপু খুব খুশী হইল । গর্বের সহিত গায়ের শার্টটা দেখাইয়া বলিল, কেমন রংটা, না ? ফাস্ট ক্লাসের রম্যাপতিদাব গায়ের আছে, তাই দেখে এটা কিনেছি—দেড় টাকা দাম ।

সে একথা বলিল না যে শার্টটা সে অগ্রশষ্ঠাং না ভাবিয়া অপরের দেখাদেখি দরজির দোকান হইতে ধারে কিনিয়াছে, দরজির অনবরত ভাগাদা সন্তোষ

এখনও দাম দিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বেলা বেশ পড়িয়া আসিয়াছে। আলকাতরা-মাথা জাবন্ত বজাপনাট বকট চিংকার করিয়া লোক জড়ো করিতেছে।

পটু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিদির বাড়ির দিকে রওনা হইল। অপূর সহিত এককাল পরে দেখা হওয়াতে সে খুব খুশী হইয়াছে। কোথা হইতে অপূদা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। তবুও শ্রোতের তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে অপূদা আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে, কিন্তু এই তিন বৎসবকাল সে-ও তো ভাসিয়া বেড়াই-তেছে এক রকম, তাহাব কি কোন উপায় হইবে না?

সন্ধ্যার পর বাড়ি পৌঁছিল। তাহার দ্বি'দ্বিনির বিবাহ বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরে হয় নাই, মাটিব বাড়ি, খেডের চাল, খান্ধুই তিন ঘর। পশ্চিমের ভিটার পূর্বানো আমলের কোঠা ভাঙিয়া আছে, তাহারই একটা ঘরে বর্তমানে রান্নাঘর, ছাদ নাই, আপাততঃ খেডের ছাউনি একখানা চাল ইটের দেওয়ালের গায়ে কাংভাবে বসানো।

বিনি ভাইকে খাবার খাইতে দিল। বলিল—কি রকম দেখলি মেলা? সে এখন আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, বিশেষ মোটাসোটা হয় নাই, সেই রকমই আছে। গলাব ঘর শুধু বদলাইয়া গিয়াছে।

পটু হাসিমুখে বলিল, আজ কি হয়েছে জানিস দিদি, অপূর সঙ্গে দেখা হয়েছে—মল্লান।

বিনি বিস্ময়েব সুরে বলিল, অপূ। সে কি ক'রে—কোথা থেকে—

পরে পটুব মুখে সব শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল। বলিল—বড় দেখতে ইচ্ছে করে—আহা সঙ্গে কবে আনলি নে কেন?... দেখতে বড় হয়েছে?—

—সে খুঁই আর নেই। দেখলে চেনা যায় না। আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে—তবে সেই রকম পগলা আছে এখনো—ভারী সুন্দর লাগে—এমন হয়েছে।...এতকাল পরে দেখা হয়ে আমার মেলান্ন যাওয়াই আজ সার্থক হয়েছে খুঁদিয়া মনসাপোতা থাকে বললে।

—সে এবেন থেকে কত দূর?...—

—সে অনেক, রেল যেতে হয়। মামজোন্মান থেকে ন' দশ কৌশ হবে।

বিনি বলিল, আহা একদিন নিজে আসিস না অপূকে, একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

ছাদ-ভাঙা রান্না বাড়ির রোয়াকে পটু খাইতে বসিল। বিনি বলিল, তোর চক্ৰতি মশায়কে একবার বলে দেবিস দিকি কাল? বলিস বছর তিনেক থাকতে ছাও, তার পর নিজের চেফা নিজে করবো—

পটু বলিল, বছর তিনেকের মধ্যে পড়া শেষ হয়ে যাবে না—ছ'সাত বছরের কমে কি পাশ দিতে পারব? অপূদা বড়িতে পড়ে কত লেখাপড়া জানত—আমি তো তা পড়ি নি, তুমি একবার চক্ৰতি মশায়কে বলো না দিদি?

বিনি বলিল—আমিও বলবো এখন। বড্ড ভয় করে—পাছে আবার বট ঠাকুরঝি হাত-পা নেড়ে গঠে—বট ঠাকুরঝিকে একবার ধরতে পারিসু ? —আমি কথা কইলে তো কেউ শুনবে না, ও যদি বলে তবে হয়—

পটু যে তাহা বোঝে না এমন নয়। অর্থাভাবে দিদিকে ভাল পাত্রের হাতে দিতে পারা যায় নাই, দোজব, বয়সও বেশ। ও—স্বৈর ডটিকতক ছেলে-মেয়েও আছে, দুই বিধবা নন্দ বর্তমান, ইহাও সকলেই তাহার দিদির প্রভু। ভালমানুষ বলিয়া সকলেই তাহার উপর দিয়া ষোল আনা প্রভু চালাইয়া থাকে। উদয়াস্ত খাটিতে হয়, বাড়ির প্রত্যেকেই বিবেচনা করে তাহাকে দিয়া যত্নগত দ্বন্দ্বমাইশ খাটাইবার অধিকার উহাদের প্রত্যেকেরই আছে, কাজেই তাহাকে কেহ দয়া করে না।

অনেক বাএ বিনিব স্বামী অজুন চক্রবর্তী বাড়ি ফিলিল। মামজোয়ানের বাজারে তাহার খাবারের দোকান আছে, আজকাল মেলাব সময় বলিয়া রাত্রে একবার আহব কবিত্তে আসে মাত্র। খাইয়াই আবার চলিয়া যায়, রাত্রেও বেনা বোকা হয়। লোকটি ভাবি রুপে, বিনি বোজাই আশা করে—ছোট ভাঙটা এখনে কয়দিন হইল শাসিয়াছে, এ পর্যন্ত কোন দিন একটা রস-গোলাও তাহ ও জন্য হাতে কপিয়া বাড়ি আসে নাই, অথচ নিজেরই তো খাবারের দোকান। এ বকম লোকেব কাছে ভাইয়েব সম্বন্ধে কি কথাই বা সে বলিবে।

ওও বিনি বলিল। স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া সে সামনে বসিল, নন্দেয়া কেহ পাশ্চাত্যে নাই, এ ছাড়া আর সুযোগ ঘটবে না। অজুন চক্রবর্তী বিস্ময়ে সুবে বলিল—পটল ? এখনে থাকবে ?

বিনি মদীয়া হইয়া বলিল—ওই ওর সমান অপূব বলে ছেলে—আমাদের মায়েব, সেও পড়ে। এখানে এদি থাকে তবে এই মামজোয়ান ইকুলে গিয়ে পড়তে পাবে—একটা হিএ হয়—

অজুন চক্রবর্তী বলিল—ওসব এখন হবে-টবে না, দোকানের অবস্থা ভাল নয়, দোলের বাজারে খাজনা বেড়ে গিয়েছে তুনো, অথচ দোকানে অন্ন নেই। মামজোয়ানে খটি থলে চাব আনা সেব ছানা—তাই বিকুচ্ছে দশ আনান্ন, তা লাভ কববো, না খাজনা দোবো, না মহাঙ্গন মেটাবো ? মেলা দেখে বাড়ি চলে যাক্—ও সব ঝকি এখন নেওয়া বুলেই নেওয়া—।

বিনি খানিকটা চুপ কপিয়া থাকিয়া বলিল—বোশেখ মাসের দিকে আসতে বলবো ?

অজুন চক্রবর্তী বলিল—বোশেখ মাসেব বাকীটা আর কি—আর মাস-দেডেক বৈ তো নয়।...ওসব এখন হবে না, ওসব নিয়ে এখন দিক্ কবো না—ভাল লাগে না, সাবাদিন খাটুনিব পর—বলে নিজের আলান্ন তাই বাঁচি নে তা আবার—হ—

বিনি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনে খুব কষ্ট হইল—ভাইটা আশা

করিস্না আসিয়াছিল—দিদির বাড়ি থাকিস্না পড়িতে পাইবে। বলিল—আচ্ছা, অপু কেমন করে পড়েছে বে?

পটু বলিল—সে যে এক্সলারশিপ পেয়েছে—তাতেই খরচ চলে যায়।

বিনি বলিল—তুই তা পাস নেন? তাহ'ল তোব তো—

পটু হাসিয়া বলিল—না পড়েই এক্সলারশিপ পাবো—বা তে'—পাশ দিলে তবে পাওয়া যাবে, সে সব আমার হবে না, অপুদা ভাল ছেলে—ও কি আব আমার হবে?...

বিনি বলিল—তুই অপুকে একবার ব'লে দেখবি? ও ঠিক একটা কিছু তোকে জোগাড় ক'বে দিতে পারে।

দু'জনে পরামর্শ করিয়া তাহাই অবশেষে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

সবজন্মা পিছু পিছু উঠিয়া বড়ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিতে আসিল, সংগ্রহের উঠানে নামিয়া বলিল—মাঝে মাঝে এস বোমা, বাড়ি ভাগলে পড়ে থাকতে হয়, নইলে দুপুর বেলা এক একবার ভাবি তোমাদের ওখানে একটু বেরিয়ে আসি। সেদিন বাপু গয়লাপাড়ার চুরি হ'য়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফেলে যেতে ভরসা পাই নেন।

তেলি বাড়ির বড় বধু বেড়াইতে আসিয়াছিল, তিন বৎসরের ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সবজন্মা বেশ ছিল। ইহারা সব দুপুরের পর আসিয়াছিল, গল্পগুচ্ছের সময়টা তবুও এরকম কাটিল। কিয়ৎ একা একা সে তো আব থাকিতে পারে না। শুধুই, সব সময়ই, দিন নাই রাত্রি নাই,—অপু কথা মনে পড়ে। অপু কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই তাহাব মনে স্থান পায় না।

আজ যে গিয়াছে এই পাঁচ মাস হইল। কত শনিবার কত ছুটিব দিন চলিয়া গিয়াছে এই পাঁচমাসের মধ্যে। সবজন্মা সকালে উঠিয়া ভাবিয়াছে—আজ দুপুরে আসিবে। দুপুর চলিয়া গেলে ভাবিয়াছে বৈকালে আসিবে। অপু আসে নাই।

অপু কত ভিনিস ধবে পড়িয়া আছে, কত স্থান হইতে কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে—অবোধ পাগল ছেলে।...শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া সর্বজন্মা হাঁপায়, অপু মুখ মনে আনিবার চেষ্টা করে। এক একবার তাহার মনে হয় অপু মুখ সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। যতই জোর করিয়া মনে আনিবার চেষ্টা করে ততই সে মুখ অস্পষ্ট হইয়া যায়...অপু মুখের আদলটা আনিলেও ঠোঁটের ডগ্গিটা ঠিক মনে পড়ে না, চোখের চাহনিটা মনে পড়ে না...সবজন্মা একেবারে পাগলের মত হইয়া ওঠে—অপু, তাহার অপু মুখ সে ভুলিয়া যাইতেছে।

কেবলই অপু ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। অপু কথা বলিতে জানিত না, কোন কথার কি মানে হয় বুঝিত না। মনে আছে...নিশ্চিন্দ্রপুরের

বাড়িতে থাকিতে একবার রান্নাবাড়ির দাওয়ায় কাঁঠাল ভাজিয়া ছেলেমেয়েকে দিতেছিল। দুর্গা বাটি পাতিয়া আগ্রহের সহিত কাঁঠাল-ভাঙা দেখিতেছে, অপু দুর্গার বাটিটা দেখাইয়া হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—দিদি কাঁঠালের বড় প্রভু না যা? সবজিয়া প্রায়টা বুঝিতে পারে নাহি, শেষে বুঝিয়াছিল, ‘দিদি কাঁঠালের বড় ভক্ত’ এ কথাটি বুঝিতে ‘ভক্ত’ কথাটার স্থানে ‘প্রভু’ ব্যবহার করিয়াছে। তখন খন্দ বয়ন নয় বৎসরের কম নয় অথচ তখনও সে কাঁধে—কপায় নিতান্ত ছেলেমানুষ।

একবার নতুন পংখের কাপড় কোথা হঠাতে ছিঁড়িয়া আসিবার জন্য অপু বাব খাইয়াছিল। কতদিনের কথা, তবুও ঠিক মনে আছে। হাঁড়িতে আমদস্ত গুলচর বাঁধবার জো ছিল না, অপু কোন্ ফাঁকে ঢাকনি খুলিয়া চুরি করিয়া খাইবেই। এই অবস্থায় একদিন ধরা পড়িয়া যায়, তখনকার সেই ভয়ে-ছোট-হইষা যাওয়া বাড়া মুখখানি মনে পড়ে। বিদেশে একা কত কটুই হইতেছে, কে তাহাকে সেখানে বুঝিতেছে।

আর একদিনের কথা সে কখনো ভুলিবে না। অপু বয়স যখন তিন বৎসর তখন সে একবার হারাইয়া যায়। খানিকটা আগে সমুখের উঠানের কাঁঠাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে, ইহাবই মধ্যে কোথায় গেল। পাড়ায় কাহানও বাড়িতে নাই, চিছনের বাশবনেও নাই—চাবপারে খুঁজিয়া কোথাও অপুকে পাইল না। সবজিয়া দানিয়া আগুল হইল—কিন্তু যখন হাফিব বাড়ির পাশের বাশতলায় ডোবাটা খুঁজিবার জন্য ও পাড়া হইতে ডেলেদের ডাকিয়া আনাইল, তখন তাহার আর কান্নাকাটি বহিল না। সে কেমন কাঠের মত হইয়া গোবাব পাড়ে দাঁড়াইয়া ডেলেদের ডাল-ফেলা দেখিতে লাগিল। পাড়াশুদ্ধ লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—ডোবাব পাড়ে অক্লুর ডেলে টানাডালের বাঁধন খুলিতেছিল, সবজিয়া ভাবিল অক্লুর মাঝিকে চিরকাল সে নিরীহ বলিয়া জানে, ভালমানুষের মত কতবাব মাছ বেচিয়া গিয়াছে তাহাদের বাড়ি—সে সাক্ষাৎ যমের বাহন হইয়া আসিল কি করিয়া? শুধু অক্লুর মাঝি নয়, সবাই যেন যমদূত, অন্য অন্য লোকেরা, যাহারা মজা দেখিতে ছুটিয়াছে, তাহারা—এমন কি তাহার স্বামী পর্যন্ত। সে-ই তো গিয়া ইহাদের ডাকিয়া আনিয়াছে। সবজিয়া মনে হইতেছিল যে, ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে—কোন হৃদয়হীন নির্ভর্য ষড়যন্ত্র।

ঠিক সেই সময়ে দুর্গা অপুকে খুঁজিয়া আনিয়া হাজির করিল। অপু নাকি নদীর ধাবের পথ দিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া একা একা সোনাডাঙার মাঠের দিকে খাইতেছিল, অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ফিরিতে গিয়া বোধহয় পথ চিনিতে পাবে নাই। বাড়ির কাঁঠালতলায় বসিয়া খেলা করিতে করিতে কখন কোন্ ফাঁকে বাহির হইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না।

যখন সকলে-যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল, তখন সবজিয়া স্বামীকে বলিল—এ

ছেলে কোবদিন সংসারী হবে না, দেখে নিও—

হরিহর বলিল—কেন ?...তা ও রকম হয়, ছেলেমানুষে গিয়েই থাকে—

সবুজিয়া বলিল—তুমি যাগল হয়েছ ১০০ তিন বছর বয়সে অন্য ছেলে বাড়ি
বাইবে পা দেয় না, আর ও কিনা না ছেড়ে, মাঠ ভেঙ্গে গিয়েছে সেই সোনা
ডাঙার মাঠের পাশায়। তাও ফেববার নাম নেই—হন হন ক'রে হেঁটেই
চলেছে।—কখনো সংসারে মন দেবে না, তোমাকে বলেছিলাম
—এ আমার কপালেই লেখা আছে।

কত কথা সব মনে পড়ে—নিশ্চিন্দ্রপুরে বাড়ি কথা, ডগা কথা। এ
জায়গা ভাল লাগে না, এখন মনে হয়, আবার যদি নিশ্চিন্দ্রপুরে গিয়া
যাওয়া সম্ভব হইত। একদিন যে-নিশ্চিন্দ্রপুর ছাড়িয়া আসিতে উৎসাহের
অবধি ছিল না, এখন তাহাই যেন কপকপাৎ বাতাসের মত সাত সমুদ্র তেবো
নদীর ওপরকার সব ছোয়ার বাহিরে ভিনিস হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিতে
ভাবিতে প্রথম বসন্তের পুষ্পসুবাসময় বকাল বহরয়া গায়, অলস অস্ত
আকাশে কত বৎ ফুটিয়া অ'বা' মলাইয়া যায়, গাছপালার পাতা পড়ে। এ
রকম একদিন নয়, কতদিন হইয়াছে।

কোন কিছু শালমন্ড ভিনিস পাইলেই সেবুত স' জয়া ছেলেব জন্ম গুলিয়া
রাখে। সেবুতের বাড়ি বিবাহের ওয়ে সন্দেহ আসিলে স' জয়া পা-দাখা
তাহার একটা খাটতে পাবে নাই। ছেলের জন্ম লিয়া দাখা রাখিয়া অব
শেষে এখন টাঁড়ি ভিতর গিয়া উঠিল এখন সেলিয়া দিতে হইল। পৌষ-পার্ব-
ণের সময় হয়ত অ'পু বাড়ি আসিবে, তিথে যাইতে ভালবাসে নিশ্চয় আসিবে।
সবুজিয়া চাল কুটিয়া সমস্ত অ'য়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়া বসিয়া রহিল—
কোথায় অ'পু ?

এক সময় তাহার মনে হয় অ'পু আর সে অ'পু নাই। সে নেন কেমন
হইয়া গিয়াছে, কই অনেকদিন তো পেন ম'কে ড-উ-ট করিয়া থা দেখায়
নাই, অ'কারে আসিয়া তাহাকে ছড়াইয়া পেন নাই, কোণে কোণে
লুকাইয়া তুমি-ভবা হাঙ্গিরে ড'কি মাগে নাই, বাহা গ'হা বলিয়া কথা
ঢাকিতে যায় নাই। ভাবিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে—সব সব জয়া ছন্দ
করে না। অ'পু ছেলেমানুষি জন্ম সবুজিয়ার মন গুণিত হইয়া থাকে, অ'পু
না বাড়ুক, সে সব সময় তাহাদের উপরে একাধ নিউশাল ছো' শোকাটি
হইয়া থাকুক—সবুজিয়া যেন মনে মনে ইছাই চায়। কিম্ব তাহার অ'পু গে
একেবাবে বদলাইয়া যাইতেছে।...

অ'পুর উপর মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত রাগ হয়। সে কি জানে না—
তাহার মা কি রকম চটফট করিতেছে বাড়িতে। একবারটি কি এতদিনে
মধ্যে আসিতে নাই? ছেলেবেলার সজ্জার পর এ-ঘর হইতে ও-ঘরে গাইতে
হইলে মায়ের দরকার হইত, মা খাওয়াইয়া না দিলে খাওয়া হইত না—
এই সেদিনও তো। এখন আর মাকে দরকার হয় না—না? বেশ—তাহারও

ভাবিবার দায় পড়িয়া গিয়াছে, সে আর ভাবিবে না। বয়স হইয়া আসিল, এখন ইচ্ছা করিয়া কাল কাটাঁইবার সময়, ছেলে হইয়া স্বর্গে ধজা ফুলিবে কি না।

কিছু শোধন করিয়া আবিষ্কার করিল—ছেলের কথা না ভাবিয়া সে একদণ্ডও থাকিতে পারে না। এতদিন সে ছেলের কথা প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে ভাবিয়া আসিয়াছে। অল্প সহিত অসহযোগ করিলে জীবনটাই যেন কাঁকা খর্গছাঁন, অবলম্বনশূন্য ভয় পড়ে—তাহার জীবনে আর কিছুই নাই—এক অসহ্য ভাঙা।...

এক একাদিন নিজন অল্প বেলা ধরে বাসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদে। সে দিন বৈকালে সে ধরে বাসিয়া কার্পাস ফুলাব বীজ ছড়াইতেছিল, হঠাৎ সম্মুখে ছোট খুলখুলি জানালার কাঁক দিয়া বাড়ির সামনের পথের দিকে তাহার চোখ পড়িল। অল্প দিয়া কে যেন যাইতেছে—মাপার চুল ঠিক যেন অল্প মত, ঘন কালো, বড় বড় চেউ খেলানো, দর্ভঙ্গার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল—এ অঙ্কের মধ্যে এককম চুল তো কখনও কাপড় দোষ নি কোনদিন—সেই শত্রুর মত চুল অবিকল।...

তাহার মনটা কেমন উদাস অগমনীয় হইয়া যায়, ফুলার বীজ ছাড়াইতে আর আগ্রহ থাকে না।

হঠাৎ যবে দাঁড়াবে কে যেন টোকা দিল। তখনি আবার যুহু টোকা। দর্ভঙ্গা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া ফেলে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারে না।

অল্প দুটু মি-শ্যা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে। নিচু হইয়া প্রশ্ন করিবার আগেই দর্ভঙ্গা পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে ডাড়াইয়া ধরিল।

অল্প হাসিয়া বলিল—টেব পাওনি তুমি, না মা? আমি ভাবলাম আস্তে আস্তে টেব দাঁড়ায় টোকা দেবো।

সে মাম্‌জোয়ানের মেল দেখিতে আসিয়া একবার বাড়িতে না আসিয়া থাকিতে পারে না। এত নিকটে আসিয়া মার সঙ্গে দেখা হইবে না। পুলিশের নিকট বেলভাড়া ধর লইয়া তবে আসিয়াছে। একটা পুঁটলি খুলিয়া বলিল, তোমার জন্যে ছুঁচ আর গুলিসূতো এনেছি—আর এই ছাখো কেমন কাঁচা পাঁপব এনেছি যুগের ডালের—সেই কাশীতে তুমি ভেজে দিতে!

অপুর চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। অন্য ধরনের জামা গায়ে—কী সুন্দর মানাইয়াছে। দর্ভঙ্গা বলে, বেশ জামাটা—এবার বুঝি কিনেচিস? মার দৃষ্টি আরুট হইয়াছে দেখিয়া অল্প খুব খুশী। জামাটা ভাল করিয়া দেখাইয়া বলিল—সবাই বলে জামাটার রং চমৎকার হয়েছে—চাঁপাফলের মত হবে ধুয়ে এলে—এই তো মোটে কোরা।

বোড়িংএ থিরা অল্প এই কম মাস মাস্টার ও ছাত্রের মধ্যে যাহাকেই মনে মনে প্রশংসা করে, কতকটা নিজের জ্ঞাতসারে কতকটা অজ্ঞাতসারে তাহারই

হাবভাব, কথা বলিবার ভঙ্গি নকল করিয়াছে। সত্যেনবাবুর, রমাপতির, দেবব্রতের, নতুন আঁকেব মাস্টারের। সৰ্বজ্ঞার যেন অপুকে নতুন নতুন ঠেকে। পুৰাতন অপু যেন আঁব নাই। অপু তো এ বকম-মাথা দিছনেব দিকে হেলাইয়া কথা বলিত না? সে তো পকেটে হাত পুরিয়া এ ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইত না?

সন্ধ্যার সময় মায়ের বাঁদিবাব স্থানটিতে অপু দি'ডি পাতিয়া বসিয়া গল্প করে। সৰ্বজ্ঞা আজ অনেকদিন পরে বাঁত্রের ঠাণ্ডিতে বসিয়াছে।—দেখানো কত ছেলে একসঙ্গে থাকে? এক ঘবে ক'জন? দু'বেলাই মাছ দেয়? পেট ভরিয়া ভাত দেয় তো? কি খাবাব খায় সে বৈকালে? কাপড় নিজে কাটিতে হয়? সে তাহা পারে তো।—পড়াশুনার কথা সৰ্বজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিতে জানে না, শুধু খাওয়ার কথাই জিজ্ঞাসা করে। অপু হাসিতে, ঘাড় হুলুনিতে, হাত-নাড়াতে, চোঁটের নিচের ভঙ্গিতে সব জ্ঞা আবার পুৰাতন অপু চিবপবিচিত অপুকে ফিরাইয়া পায়। একে চা'তে ইচ্ছা কবে। সে অপু'ব গল্প শোনে না, শুধু মুখেব দিকেই চাহিয়া থাকে।

—হাতে পায়ে বল পেল'ম মা, এক এক সময় মনে হ'ত—অপু বলে কেট ছিল না, ও যেন স্বপ্ন দেখিচি, আবার ভাব'ম—না, সেটো চো'ব, বক'তুকে ঠোঁট, মুখেব ঠিল—সপ্ন নয়, সত্যিই তো—বাঁ'তে বসেও কেবল মনে হয় মা, অপু'ব আঁসা স্বপ্ন হয় তো, সব মিথো—তাহ কেবল ও'ব মুখেই চো'ব ঠাউরে দেখি—

অপু চলিয়া যাঁইবার কয়েকদিন পরে সৰ্বজ্ঞা তেলগিঞ্জিব কাছে গল্প কবিস্থাছিল।

পরদিনটাও অপু বাড়ি রহিল।

যাইবার সময় মাকে বলিল—মা, আমাকে একটা টাকা দাও না? কতকগুলো খাব আছে এ মাসে, শোধ করব, দেবে?

সৰ্বজ্ঞার কাছে টাকা ছিল না, বিশেষ কখনও থাকে না। তেলিগা ও নুতু'গা জিনিসপত্ৰটা, কাপড়খানা, সিঁদাটা—এই বকমই দিয়া সাহায্য করে। নগদ টাকাকড়ি কেহ দেয় না। তবু ছেলের পাছে কষ্ট হয় এজন্য সে তেলিগিঞ্জির নিকট হইতে একটা টাকা ধাব করিয়া আনিয়া ছেলের হাতে দিল।

সন্ধ্যার আগে অপু চলিয়া গেল, ক্রোশ দুই দূরে স্টেশনে, সন্ধ্যার পরেই ফেরে।

বৎসর দুই কোথা দিয়া কাটিয়া গেল।

অপু কবেই বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে, খরচে আয়ে কিছুতেই জমা কুলাইতে

পারে না। নানাদিকে দেনা—কতভাবে হুঁশিয়ার হটয়াও কিছু হয় না।
এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দুই বেলা খাইল, নিজে সাবান দিয়া কাপড় কাচিল,
লঙেজুস্ ভুলিয়া গেল।

পরদিনট আবার বোর্ডিং এর ছেলেদের দল চাঁদা কবিন্সা হাণ্ডিয়া খাইবে।
অপু হাসিমুখে সমীরকে বলিল—তু' আনা ধাব দিবি সমীর, হাণ্ডিয়া খাবো ?
—তু' আনা ক'রে চাঁদা—ওই ওরা ওখানে কবছে—কিশমিশ দিয়ে বেশ ভাল
ক'রে করচে—

সমীরের কাছে অপু ব দেনা অনেক। সমীর পয়সা দিল না।

প্রতিবাব বা'ড হইতে আদিবার সময় সে মাসের যৎসামান্য আন্ন হইতে
টাকাটা আনুলিটা প্রায়ট চাহিয়া আনে—মা না দিতে চাহিলে রাগ করে
অভিমান কবে, সর্বজ্ঞাকে দিতেই হয়।

ইহার মধ্যে আবার পট মাঝে মাঝে আসিয়া ভাগ বসাইয়া থাকে। সে
কিছুই সুবি। কবিতে পাবে নাই পড়াশুনার। নানাস্থানে ঘুরিয়াছে, ভগ্নীপতি
অজুন চরুচণী তো তাহাকে বাড়ি ঢুকিতে দেয় না। বিনিকে এ সব লইয়া
কম গল্পনা ১১ কবিতে হয় নাই বা কম চোপের জল ফেলিতে হয় নাই : কিন্তু
শেষ পর্যন্ত পট নিরাশ্রয় ও নিবলধ অবস্থায় পথে পথেই ঘোরে, যদিও
পড়াশুনার আশা সে এখনও অবশি ছাড়ে নাই। অপু তাহাব জন্য অনেক
চেটা কশিয়াছে, কিন্তু সুবি কবিতে পাবে নাই। দু'তিন মাস হয়ত দেখা
নাই, হঠাৎ একদিন কোথা হইতে পুঁটলি বগলে কবিন্সা আসিয়া হাজির হয়,
অপু ও তাকে সজ্জ কিয়া গাখে, তিন-চারদিন ছাড়ে না, সে না চাহিলেও যখন
যাহা পাবে হাতে গিয়া দেয়—টাকা পাবে না, সিকিটা, দুয়ানিটা। পটু
নিশ্চিন্দিত্যের আশ পাশ না—তাহাব ব'বা সম্প্রতি না। গিয়াছেন—সংসা
দেশের বা'িতে তাহাব দুই মেয়ে লইয়া থাকেন, সেখানে ভাই বোন কেহই
আপ বাস না। পটকে দেখিলে অপু র ভাবি একটা সহানুভূতি হয়, কিন্তু ভাল
কবিবাব তাহাব হাতে আব কি ক্ষমতা আছে ?

একদিন বাসবিহারী আসিয়া তু' আনা পয়সা ধাব চাহিল। বাসবিহারী
গয়ীরেব ছেলে, তাহা ছাড়া পড়াশুনা ভাল নয় বলিয়া বোর্ডিং-এ বাতিবও
পায় না। অপুকে সবাই দলে নেয় পয়সা দিতে না পারিলেও নেয়। কিন্তু
তাহাকে পৌছেও না। অপু, এ সব জানিত বলিয়াই তাহার উপর কেমন
একটা করুণা। কিন্তু আজ সে নানা কারণে বাসবিহারীব প্রতি সহ্যই ছিল
না। বলিল, আমি কোথায় পাবো পয়সা ? আমি কি টাকার গাছ ?—
দিতে পারবো না যাও।—বাসবিহারী পীড়াপীড়ি শুরু কবিল। কিন্তু অপু
একেবারে বাঁকিয়া বসিল।—বলিল, কখনো দেবো না তোমায়—না পারো
করো।

রমাপতির কাছে ছেলেদের একখানা মাসিক পত্র আসে, তাহাতে সে
একদিন 'ছানাপথ' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িল। 'ছানাপথ' কাহাকে বলে

ইহার আগে জানিত না—এতবড় বিশাল কোন জিনিসের দারণাও কখনো করে নাই—নক্ষত্রের সম্বন্ধেও কিছু জানা ছিল না। শরতের আকাশে রাত্রে যেযমুজ—বোডিং—এর পিছনে খেলার কম্পাউণ্ডে রাত্রে দাঁড়াইয়া ছায়াপথটা প্রথম দেখিয়া সে কী আনন্দ! অলঅলে সাদা ছায়াপথটা কালো আকাশের বুক চিরিয়া কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে—ভুপু নক্ষত্রের ভরা '...

কাঁঠাল-তলাটায় দাঁড়াইয়া সে কতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া বহিল—নবজাগ্রত মনের প্রথম বিশ্বাস।...

পৌষ মাসের প্রথমে অপূর্ণ নিজের একটু দুর্বিপা ঘটিল। নতুন ডেপুটিবাবুর বাসাতে ছেলেদেব জন্ম একজন পড়াইবাব লোক চাই। হেডগণ্ডিত তাহাকে ঠিক করিয়া দিলেন। দু'টি ছেলে পড়ানো, থাকা ও খাওয়া।

তুই—তিনদিনের মধ্যেই বোডিং হইতে বাসা উঠাইয়া অণু সেখানে গেল। বোডিং—এ অনেক বাকী পড়িয়াছে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট তলে তলে হেডমাস্টারের কাছে এ সব কথা রিপোর্ট করিয়াছেন, যদিও অণু তাহা জানে না।

বাহিরের ঘরে থাকিবাব জায়গা স্থির হইল। বিছানা—পত্র গুচ্ছাইয়া পাতিয়া লগতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে বানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া রাদুনি ঠাকুরের ডাকে বাড়ির মধ্যে বাইতে গেল। দালানে ঘড়ি ভিক্ষা বাইতে বাইতে তাহাব মনে হইল—একজন কে পাশের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ হইতে তাহার বাওয়া দেখিতেছেন। একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে তিনি সরিয়া আসিলেন। দুব সুন্দরী মহিলা, তাহার মায়েব অপেক্ষাও বয়স অনেক—অনেক কম। তাহাকে ভিজ়াসা করিলেন—মায়েব বাড়ি কোথায়?

অণু ঘাড় না তুলিয়া বলিল, মনসাপোতা—অনেক দূর এবান থেকে—

—বাড়িতে কে কে আছেন?

ভুপু মা আছেন, আর কেউ না।

—তো'মার বাবা বুঝি...ভাগ বোন ক'টি তো'মরা?

—এখন আমি একা। আমার দিদি ছিল—সে সাত আট বছর হল মারা গিয়েছে!—

কোনো রকমে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া সে উঠিয়া আসিল। শীতকালেও খেব ঘামিয়া উঠিয়াছে।

পরদিন সকালে অণু, বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া আসিয়া দেখিল, বছর তেরো বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে ছোট একটি খোকার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে দাঁড়াইয়া আছে। অণু বুঝিল—সে কাল রাত্রেব পরিচিতা মহিলাটির মেয়ে। অণু আপন মনে বড় গুচ্ছাইয়া স্কুলে খাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল যেয়েটি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ অণুর ইচ্ছা হইল, এ মেয়েটির সামনে কিছু পৌকষ দেখাওঁবে—কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই, শিখায় নাই, আপন! আপনি তাহার মনে হইল; হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া সে

নিজের অঙ্গের ইনট্রুমেন্ট বাস্‌টী বিনা কারণে পুলিশ প্রোটেক্টর, সেক্রেটারি কম্পাসভুলোকে বিধানার উপর চড়াইয়া ফেলিয়া পুনরায় দেঙলি বাস্‌টে সাজাইতে লাগল। কি জানি কেন অপুর মনে হইল, এই বাপারেই তাহার চরম পৌরুষ দেখান হইবে। মেয়েটি দাঁড়াইয়া দৌঁতে লাগিল, কোনো কথা বলিল না অথচ কোনো কথা বলিল না।

আলাপ হইল সৌন্দর্য্যসম্মত। দেঙলি হইতে আদিয়া সবে দাঁড়াইয়াছে, মেয়েটি আদিয়া লাড়ক চোখে বলিল—আপনাকে মা খাবার খেতে ডাকচেন।

আসন পাঠা—পরোটা, বেগুন ভাজা, আনু চুড়ি, চিনি। অপু চিনি পছন্দ করে না, গুড়ের মত তিনিব নাই, কেন হারা এমন সুন্দর গরম গরম পরোটা চিনি দিয়া দায় ?...

মেয়েটি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল—মাকে বলব আব দিতে ?

—না : তোমার চিনি খাও কেন ? গুড় তো ভাল—

মেয়েটি বিম্বিত্ত্বেরে বলিল—কেন, আপনি চিনি খান না ?

—ভালব দি . . . —পাখার খাবার—খেজুর গুড়ের মত কি আব খেতে ভাল ?

মেয়েটির সামনে তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু এই সময়ে মহিলাটি ঘরে ঢোকাতে অপু লক্ষ্য লভ কথা বন্ধ হইয়া গেল। মহিলাটি বলিলেন—ওকে দনা বলে থাকি নিঃশব্দে কাছে বসে খাওয়াতে হবে রোজ। ও দেখাও সে একম লাড়ক, এ পছন্দ তো আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না—না দেখলে আপনিও দেখে উঠে যাবে।

অপু লক্ষ্য হইল। মনে মনে ভাবিল ইহাকে সে মা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু লক্ষ্য পরিণত না, সুযোগ কোথায় ? এমনি খামাকো মা বলিয়া ডাকা—সে বড়—সে তাহা পারিবে না।

মাসবানেক ইহাদের বাড়ি থাকিতে থাকিতে অপু কতকগুলি নতুন বিষয়ে জ্ঞান হইল। সবাই ভাবী পরিদাব পরিচ্ছন্ন, আটপোঁবে পোশাক-পরিচ্ছদও সুদৃশ্য ও সুকচিসম্মত। মেয়েদের শাড়ি পরিবার ধনটি বেশ লাগে, একে সবাই দেখিতে সুখী, তাহার উত্থব সুদৃশ্য শাড়ি-সেমিজে আবও সুন্দর দেখায়। এই ভিনিসতি অপু, কানও জানিত না, বডলোকেব বাড়ি থাকিবার সময়ও নহে, কানও সেখানে যত্নেরে আত্মতরে তাহার অনভ্যন্ত চক্ষু ধাঁসিয়া গিয়াছিল—সহজ দৃষ্টি জীবনের দন্দলিন বাপাবের পায়েরে তাহাকে সে ফেলিতে পারে নাহ।

অপু যে সমাজ, যে আবহাওয়ার মাণুষ—সেখানকার কেহ এ ধরনের সহজ সৌন্দর্য্যময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়। নানা ভাস্কর্য্য বেড়াইয়া নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহার আজকাল চোখ ফুটিয়াছে, সে আজকাল বৃষ্টিতে পারে নিষ্কিন্তুপুবে তাহাদের গৃহস্থালী ছিল দরিদ্রের, অতি দরিদ্রের গৃহস্থালী।

শিল্প নয়, শ্রী ছাঁদ নয়, সৌন্দর্য নয় শুধু খাওয়া আর থাকা ।

নির্মলা আসিয়া কাছে বসিল । অপু খালজেরার শক্ত অঁক কষিতেছিল, নির্মলা নিজে বইখানা খুলিয়া বলিল—আমার ইংরেজিটা একটু, বলে দেবেন দাদা ? অপু বলিল—এসে ছুটলে ? এখন ওসব হবে না, ভাগী মুশকিল, একটা অঁকও সবাল থেকে মিললো না ।

নির্মলা নিজে বসিয়া পড়িতে লাগিল । সে বেশ ইংরেজি জানে, তাহার বাবা যত্ন করিয়া শিখাইয়াছেন, বাংলাও খুব ভাল জানে ।

একটু, পড়িয়াই সে বইখানা বন্ধ করিয়া অপু'র অঁক কষা দেখিতে লাগিল । খানিকটা আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া বহিল । তাহার পর আর একবার ঝাঁকিয়া দেখিয়া অপু'র কাঁধে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিল—এদিকে কিরুন দাদা, আচ্ছা এই পড়টা মিলিয়ে—

অপু বলিল—যাও । আমি জানি নে, ওই তো তোমার দোষ নির্মলা, অঁক মিলচে না এখন তোমার পড়া মেলাবার সময়—আচ্ছা লোক—

নির্মলা মুহূর্তে হাসিয়া বলিল—এ পড়টা আর মেলাতে হয় না আপনার—বলুন দিকি—সেই গাছ গাছ নয়, যাতে নেই ফুল—

অপু অঁক-কষা ছাড়িয়া বলিল—মিলবে না ? আচ্ছা ঢাকা—পরে খানিকটা আপন মনে ভাবিয়া বলিল—সেই লোক লোক নয়, যার নেই বল—হল না ?

নির্মলা লাইন দুটি আপন মনে আরও কবিয়া বুঝিয়া দেখিল কোণায়ও কানে বাধিতেছে কি না । ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা এবার বলুন তো আর একটা—

—আমি আর বলব না—তুমি ওরকম দুটো মিকর কেন ? আমি অঁকগুলো কবে নিই, তা'র পর যত ইচ্ছা পদা মিলিয়ে দেবো—

—আচ্ছা এই একটা—সেই ফুল ফুল, নয়, আর—

—মাকে এগুনি উঠে গিয়ে বলে আসবো, নির্মলা—ঠিক বলছি, ওরকম যদি—

নির্মলা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল । যাইবাব সময় ফিচন ফিচিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ওবেলা কে খাবার বাঁয়ে আনেন বাইবেব ঘরে দেববো—

ওরকম প্রায়ই হয়, অপু ইহাতে ভয় পায় না । বেশ লাগে নির্মলাকে ।

পুত্রার পর নির্মলার এক ম'য়া বেড়াইতে আনিলেন । অপু শুনিল, তিনি নাকি বিলাতকোরং—নির্মলার ভোট ভোট নষ্ট করি নিকট কথাটা শুনিল । বয়স পঁচিশ ভাবিশের বেশী নয় যোগা শ্রামবর্ণ । এ লোক বিলাতকোরং ।

বালো নদীর ধারে ছান্নাময় বৈকালে পুরাতন 'বজ্রবাণী'তে পড়া সেই বিলাতবাজীর চিঠির মধ্যে পঠিত আনন্দভরা পুরাতন পথ বাহিয়া মকছুমির

পার্শ্বের সুয়েজ খালের ভিত্তি দিয়া নীল ভূমধ্যসাগরমধ্যস্থ দ্রাক্ষাকুঞ্জ-বেষ্টিত
কর্ণিকা দূরে ফেলিয়া সেই মধুর দুগ্ধমাখা পথ-যাত্রা ।

এই লোকটা সেখানে গিয়াছিল ? এই নিতান্ত সাধারণ দরনের মানুষটা—যে
দিবা নিরীহমুখে বাগাঘরের দাওয়ায় কসিয়া মোচার ঘন্ট দিয়া ভাত
খাটতেছে ।

৩'এক দিনেই নির্মলার মামা অমরবাণু সহিত তাহার খুব আলাপ হইয়া
গেল ।

বিলাতের কত কথা সে জানিতে চায় । পূর্বের ধাবে সেখানে কি সব
গাছপালা ? আমাদেব দেশের পরিচিত কোন গাছ সেখানে আছে ? প্যারিস
খুব বড় শহর ? অমরবাণু নেপোলিয়নের সমাধি দেখিয়াছেন ? ডোভারের
খড়ি পাছা ? ব্রিটন মিউজিয়ামে নাকি নানা অদ্ভুত জিনিস আছে—কি
কি ? আব ভেনিস ?—ইতালির আকাশ নাকি দেখিতে অপূর্ব ?

পার্শ্বাংশের ক্ষুদ্র চলে, এত সব কথা জানিবার কৌতুহল হইল কি করিয়া
অমরবাণু বুঝিতে পারে না । এত আগ্রহ করিয়া শুনিবার মত জিনিস
সেখানে কি আর আছে । একত্রে—দৌয়া—বুষ্টি—শীত । তিনি পল্লসা
খরচ করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন সাবান-প্রস্তুত প্রণালী শিবিবার জন্য, পথের
পাশের গাছপালা দেখিতে যান নাই বা ইতালির আকাশের রং লক্ষ্য করিয়া
দেখবার উপযুক্ত সময়ের প্রার্থনাও তাঁর ছিল না ।

নিঃলাকে উপর ভাল লাগে, কিন্তু সে তাহা দেখাইতে জানে না । পরের
বাড়ি বলিয়াই হউক, বা একটু লাগুক প্রকৃতির বলিয়াই হউক, সে বাহিরের
দেবে শান্তভাবে বাস কবে—কি তাহার অভাব, কোনটা তাহার দরকার, সে
কথা কহাকেও জানায় না । অপূর এই উদাসীনতা নিঃশব্দ বড় বাজে, তবুও
সে না চাহিতেই নিমলা তাহার ময়লা বলিশের ওয়াড সাবান দিয়া নিজের
কাচিয়া দিয়া খাষ, গামছা পরিষ্কার করিয়া দেয়, ছোঁড়া কাপড় বাড়ির মধ্যে
লইয়া গিয়া মাকে দিয়া সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আনিয়া দেয় ।
নিমলা চায় অপূর—দাদা তাহাকে ফাই ফবমাশ কবে, তাহার প্রতি হুকুম-
জাবি কবে ; কিন্তু অপূর কাহারও উপর কোনো হুকুম কোনোদিন করিতে জানে
না—এক মা ছাড়া । দিদি ও মায়ের সেবায় সে অভ্যস্ত বটে, তাও সে সেবা
অযাচিত ভাবে পাওয়া যায় তাই । নইলে অপূর কখনও হুকুম করিয়া সেবা
আদায় করিতে শিখে নাই । তা ছাড়া সে সমাজের যে স্তরের মধ্যে মানুষ,
ডেপুটিবাবুবা সেখানকার চোখে ব্রহ্মলোকবাসী দেবতার সমকক্ষ জীব । নির্মলা
ডেপুটিবাবুর বড় ঝোঁপে—রূপে, বেশভূষায়, পড়াশুনায়, কথাবার্তায় একমাত্র লীলা
চাওয়া সে এ পর্যন্ত মত মেয়ে সংস্পর্শে আসিয়াছে—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
সে কি করিয়া নির্মলার উপর হুকুমজাবি করিবে ? নির্মলা তাহা বোঝে না—সে
দাদা বলিয়া ডাকে, অপূর প্রতি একটা আন্তরিক টানের পরিচয় তাহার প্রতি
কাছে—কেন অপূর দাদা তাহাকে প্রাণপণে খাটাইয়া লয় না, নিষ্ঠুরভাবে

অথবা ফাই-ফরমাস কবে না ? তাহা হইলে সে খুশী হইত ।

চৈত্র মাসের শেষে একদিন ফুটবল খেলিতে খেলিতে অপুর হাতটা কি ভাবে মচকাইয়া গিয়া সে মাঠে পড়িয়া গেল । সঙ্গীরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া ডেপুটিবাবু বাসায় দিয়া গেল । নিমলাব মা বাস্ত হইয়া বাহিরের ঘরে আসিলেন, কাছে গিয়া বলিলেন—দেখি দেখি, কি হয়েছে ? অপূর উজ্জল গৌরব মুন্দর মুখ ঘামে ও যক্ষ্মায় বাড়া হইয়া গিয়াছে, দান পা-খানা সোজা করিতে পারিতেছে না । মনিয়া চাকর নিমলাব মাদ্রি স্ট্রিং লইয়া ডাক্তারখানায় ছুটিল । নিমলা বাড়ি ছিল না, ভাইবোনদের লইয়া গাড়ি করিয়া মুম্বাইবাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিল । একটু পরে সবকাণী ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন । সন্ধ্যায় আগে নিমলা আসিল । সব শুনিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল—কই দেখি, বেশ হয়েছে—দস্তিপ্রতি কণার ফল হবে না ? ভাবী দূর্নী হয়েছে আমি নিমলা কিছ না বলিয়া চলিয়া গেল । অপূ মনে মনে ক্ষম হইয়া ভাবিল—যাক না, আর কখনও যদি কথা কই—

আম ঘটা পড়েই নিমলা আসিয়া হাজির । এক হুকের সঙ্গে বলিল—দায়ের বাধা-টানি জানি নে, গরম জল আনতে বলে দিয়ে এসোম, এমন করে সেক দেবো—লাগে তো লাগবে—হুটমি কণার বাত তবি বর্ণিয়ে যাবে—কমলা লেবু খাবেন একটা ?—না, ও ও না ।

মনিয়া চাকর গরম জল আনিলে নিমলা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া বাতের উপর সেক দিল ; নিমলাব ভাইবোনেরা সব দেখিতে আসিয়া গেল—ও দাদা, এইবার একটা গল্প বলুন না । অপূ মুখে গল্প শুনিতে সবাই ভালবাসে ।

নিমলা বলিল—হ্যাঁ, দাদা এখন পাশ ক্রিবে শুতে পারছেন না—এখন গল্প না বললে চলবে কেন ?...চুপ করে বসে থাকো সব—নয়তো বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দেব ।

পরদিন সকটা নিমলা আসিল না । তপুদের পর আসিয়া বেকাল পক্ষ বসিয়া নানা গল্প কবিল, বই পড়িয়া শুনাইল । বাড়ির ভিতর হইতে খালাস করিয়া আখ ও শর্শি-আলু কাটিয়া লইয়া আসিল । তাহাব পর তাহাদের সন্মিলন-নোর আর অন্ত নাই । নিমলাব পদটি মিলাইয়া দিয়াই অপূ তাকে আর একটা পদ মিলাইতে বলে—নিমলাও অল্প কয়েক মিনিটে তাহাব জবাব দিয়া অন্য একটি প্রশ্ন কবে ...কেহ কাহাকেও ঠকাইতে পারে না ।

ডেপুটিবাবুর স্ত্রী একবার বাতীরের ঘরে আসিতে আসিতে শুনিয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, আর ভাবনা নেই—এখন তোমরা ভাইবোনে একটা কবির দল খুলে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াও গিয়ে—

অপূ লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল । ডেপুটিবাবুর স্ত্রীর বড় সাধ অপূ তাহাকে মা বলিয়া ডাকে । সে আড়ালে তাহাকে মা বলে, তাহা তিনি

42

বলিল—আর ওকে ক্ষাপাবো না—ভারী পাগল—আহা, ওকে সব সময় খোঁচা দিই—সোজা খেটেছে ও, যখন পা ভেঙ্গে পড়ে ছিলাম পনেরো দিন ধবে, জানতে দেয় নি যে আমি নিজের বাড়িতে নেই—

ইহাব মদ্যে আবাব একদিন পটু আসিল। ডেপুটিবাবুর বাসাতে অপু উঠিয়া আশিবাব পর সে কখনও আসে নাই। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বাগায় ঢুকিল। এক-পা ধূলা, ক্লক চুল, হাতে পুঁটুলি। সে কোন সুবিধা খুঁজিতে আসে নাই, এদিকে আসিলে খুব সঙ্গে দেখা না করিয়া সে যাইতে পাবে না। পটুব মুখে অনেক দিন পর সে রাগুদিব খবর পাইল। পাড়াগাঁয়ের নিঃসহায় নিরুপায় ছেলের অভ্যাসমত সে গ্রামের মত মেয়েদেব শ্রুতবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো শুরু কাঁবয়াছে। বাপেব বাড়িব লোক, অনেকেব হয়ত বা খেলায় সঙ্গী, মেয়েবা আগ্রহ করিয়া বাবে, ছাড়িয়া দিতে চাহে না যে কয়টা দিন থাকে যাওয়া সম্বন্ধে নির্ভাবনা। কোন স্থানে দু'দিন, কোথাও পাঁচদিন—মেয়েবা আবাব আসিতে বলে, আবাব সময় খাবার তৈয়ারী কাঁবয়া সঙ্গে দেয়। এ এক ব্যবসা পটু ধরিয়াছে মন্দ নয়—ইহাব মদ্যে সে তাহাদেব পাড়ায় সব মেয়েব শ্রুতবাড়িতে দু-চার বাব ঘুরিয়া আসিয়াছে।

এইভাবেই একদিন রাগুদিব শ্রুতবাড়ি সে গিয়াছে—সে গল্প কবিল। রাগু দব শ্রুতবাড়ি বাগাঘাটের কাছে—তাঁহাবা পশ্চিমে কোথায় চাকুবা উপলক্ষে থাকেন—পুড়ার সময় বাড়ি আদয় ছিলেন, সপ্তমী পূজাব দিন অনাহৃতভাবে পটু গিয়া হাজিব। সেখানে আট 'দন ছিল। রাগুদিব যত্ন কি। তাহার চরবস্থা শুনিয়া গোপনে তিনটা টাকা দিয়াছিল আসবার সময় নতুন পুঁচি চ'দব, এক পুঁটুলি বাস পুঁচি সন্দেশ।

অপু বলিল—আমাব কথা কিছু বললে না?

—শুধুই তোর কথা। যে কয়দিন ছিলাম, সকালে সন্ধ্যাতে তোর কথা। তারা আবাব একাদশীব দিনই পশ্চিমে চলে যাবে, আমাকে রাগু'দ বললে, ভাড়ার টাকা দিচ্ছি, তাকে একবার নিম্নে আয় এখানে—ছ'বছর দেখা হয় নি—তা আমার আবাব অর হল—দিদিব বাড়ি এসে দশ-বাবোদিন পড়ে রইলাম—তোর ওখানে আব যাওয়া হল না—ওরাও চলে গেল পশ্চিমে—ভাড়ার টাকা দেয় নি?

পটু লজ্জিত মুখে বলিল—হ্যাঁ, তোর আর আমার যাতায়াতের ভাড়া হিসেব ক'রে—সেও খরচ হয়ে গেল, দিদি কোথায় আর পাবে, আমার সেই ভাড়ার টাকা থেকে নেবু ডালিম ওষু—সব হ'ল। রাগুদিব মতন অমন মেয়ে দেখি নি অপুদা, তোর কথা বলতে তার চোখে জল পড়ে—

হঠাৎ অপু'র গলা যেন কেমন আডক্ট হইয়া উঠিল—সে ভাড়াভাডি কি দেখিবার ভ'ন করিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিল।

—শুধু রাগুদি না, যত মেয়ের শ্রুতবাড়ি গেলাম, রাণীদি, আশালতা, ওপাড়ার সুনন্দনাদি—সবাই তোর কথা আগে জিজ্ঞেস করে—

যক্টা হুই থাকিয়া পটু চলিয়া গেল।

দেওয়ানপুর স্কুলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়। খরচ-পত্র কমিয়া কোথাও খাইতে হইল না। পর্বীক্ষার পর হেডমাষ্টার মিঃ দত্ত অপুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—বাড়ি গাবে কবে?

এই কয় বৎসরে হেডমাষ্টারের সঙ্গে তাহার কেমন একটা নির্বিড় সৈন্যদোর সখ্য গুলিয়া ঢায়াছে, তখনেব বেহই এতদিনে জানিত পাবে নাই সে বন্ধন কতটা দৃঢ়।

অপু বলিল—সামনের পুস্তকাবে যাব ভাবছি।

—পাশ হ'লে কি কববে ভাবছো? কলেজে পড়বে তো?

—কলেজে পড়বাব খুব ইচ্ছে, গ্যার।

—যদি স্কলারশিপ না পাও?

অপু দত্ত হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে।

—ভগবানের ওপর নির্ভর করে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, বাইবেলো একটা জায়গা পড়ে শোনাই তোমাকে—

মিঃ দত্ত ব্রীটান। নাসে কতদিন বাইবেল খুলিয়া চমৎকার চমৎকার উক্তি তাহাদেব পাশে, শুনাইয়াছে, অপুও তখন মনে বৃদ্ধদেবের পীতবাসধারী সৈন্য-মূর্তি পাশে, তাহাদেব গ্রামের হিন্দুস্ত্রী দেবী বিশালাক্ষীর পাশে, বোষ্টমদাত্ত নবোন্ম দামের ঠাণ্ডা শীতলতার পাশে, দীর্ঘদেহ শান্তনয়ন পশুদ্যুত কোন কালে অফিত হয়। তখনেব—তাহার মন বীণকে বজন করে নাই, তাঁটার যন্ত্রণা লাগিত, অসমানিত এক দেবোন্মাদ যুবককে মনে প্রাণে বরণ করিতে শিখিয়াছিল।

মিঃ দত্ত বলিলেন—কলকাতাতেই পড়ো—অনেক জিনিস দেখবার শেখবার আছে—কোন কোন বাড়ীঘরে কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ বেটে না, আমি কলকাতাকেই ভাল বলি।

অপু অনেকদিন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কলেজে পড়িবে এবং কলিকাতা কলেজেই পড়িবে।

মিঃ দত্ত বলিলেন—স্কলারশিপের খেঁজ মিটাবেবল্—খানা তুমি খুব ভাল-বাসতে—ওখানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আর একখানা কিনে নেবো। অপু বেশী কথা বলিতে জানে না—এখনও পারিল না—মুখচোরার মত স্বানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হেডমাষ্টারের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হেডমাষ্টারের মনে হইল—তাহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের শিক্ষক-জীবনে এরকম আর কোন ছেলের সংস্পর্শে তিনি কখনও আসেন নাই।—ভাবময় হৃদয়দর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন। হয়ত একটু নিবোধ, একটু অপারণা-মদর্শী—কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, জ্ঞান-পিপাসু ও জিজ্ঞাসু। মনে মনে তিনি বালকটিকে বড় ভালবাসিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে এই একটি আশিরাহিল, চলিয়া গেল। ক্লাসে পড়াইবার সময় ইহাব কৌতূহলী ডাগব চোখ ও আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজীর ঘণ্টায় কত নতুন কথা, কত গল্প, ইতিহাসের কাহিনী বলিয়া যাইতেন—ইহাব নীবব, জিজ্ঞাসু চোখ দুটি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ জোর করিয়া পাঠ আদায় কবিত্তা লইয়াছে সেদণ্ড অব কেহ পাবে নাই, সে প্রোণী সহজ লগা নয়, তিনি তাহা জানেন।

গত চাব বৎসরের স্মৃতি-জড়ানো দেওয়ানপুর হইতে বিদায় লইবার সময়ে অপূৰ মন ভাল ছিল না। দেবরত বলিল—‘খুঁচি চলে গেলে অপবদা, এবাব পড়া ছেড়ে দেবো।’

নিমলাব সংজ্ঞ বাহিবেব ঘবে দেখা। ফাল্গুন মাসেব অপর অদৃত দিনগুলি। বাতাসে কিসেব খেন মৃদু নিঃশ্বাস, অনির্দেশ্য সুগন্ধ। খামেব বউলেব সুবাস সকালেব ঘৌদ্রকে খেন মাতাল কবিত্তা হুল্লিয়ারছে। কিছু অপূৰ আনন্দ খেন সব হইতে আসে নাই—গত কয়েকদিন খিয়া সে নাইডাব হাগাডেব ‘খিওপেয়া’ খিডিতেছিল। তাহাব তরুণ কল্পনাকে অদৃতভাবে নাড়া দিয়াছে বহিষ না। কোথায় এই হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন সমাধি—জ্যোৎস্নাভাণী নীলনদ, বিস্মৃত ‘খা’ দেবের মন্দির।—ও ন্যাসিক খাণাডেব স্থান সমালোচকের মতে যেখানেই নির্দিষ্ট হউক তাহাতে আসে খয় না—তাহা খনবান, অবিদিত মন একদিন যে গভীর আনন্দ খাইয়াছিল বহিষনা হইতে—এটাই বড় কথা তাহাব কাছে।

নির্মলার সহিত দেখা অপূৰ মনের সেই অবস্থায়—এ প্রসুতিস্থ, মণ্ড, খঙান—সে তখন শুধু একটা সুপ্রাচীন বহুমুখ, অদূরাত্মপু জাগীয়া দেশে খুঁচিয়া বেড়াইতেছে। খিওপেয়া? হউন তিন দুন্দবা—ওঁহাকে খে খাখ কবে না। খিবামিডেব অন্ধকাব গর্ভগর্হে বড় হাজার বৎসরের সুখি খাজিয়া সমাট মেফাউ-বা খানাইট পাখিবেব সমাধি খিন্দকে খন খোখে খাখ খি খন কখেন—খখা সৃষ্টি খবেকাব খনখান আদিম খুখিখি খাববতাব খনো খুখু খিখো খনদী খিখিয়া মকখুখি খুকে খ উপ খিয়া বখিয়া খায়—খ খ হইখো খা খিখর। অদৃত নিয়তির অকাটা খিখি। তাহাব মন সাগা খুখ খাব কিছু খাখিতে চায় না।

গরম বাতাসে খকা খলখালি উড়াইয়া খানিতেছিল বলিয়া খপু খনজা খেজায়া খসিয়া ছিল, নিমলা খরজা খেলিয়া ঘরে আদিখ। খপু বলিল—এস এস, আখ সকলে খো খোখাখের খুলে খাইজ হল—ক খাখ খিলেন, খুখখখাবুর খ্তা, না? এ খোটা খখ খিনি গাখি খেকে খামলেন, খখি খো খো?—আখনি খুখি ওখিকে ছিলেন তখন? খাগো, কি খোটা?—খাখি খো কখনো—খরে খঠা খেন খন খলি এইভাবে বলিল, তারপর খাপনি খো খাখেন আখ, না দাদা?

—খ্যা, খুটোর গাখিতে খাখো—খামখাখিখাকে একটু খেকে নিখে এস খো

—জিনিসপত্তরগুলো একটু বেঁধে দেবে ।

—রাখধারিরা কি আপনার চিরকাল ক'রে দ্বিবে এসেছে বাকি ? কই কি জিনিস আগে বলুন না ।

তুইজনে মিলিয়া বইয়ে খুলা ঝাড়িয়া গোছানো, বিছানা বাঁধা চলিল । নির্মলা অপূর ছোট টিনের তোরঙ্গটা খুলিয়া বলিল—মাগো ! কি ক'রে বেঁধেছেন বাস্কাটা ! কাপড়ে, কাগজে, বইয়ে হাণ্ডুল পাণ্ডুল—আচ্ছা এত কাজে কাগজ কি হবে দাদা ? ফেলে দেবো ?...

অপূ বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ---না না---ওসব ফেলো না ।

সে আজ তুই-তিন বছরের চিঠি, নানা সময়ে নানা কথা লেখার কাগজের টুকরা সব জমাইয়া রাখিয়াছে । অনেক স্মৃতি জড়ানো সেগুলির সঙ্গে, পুরাতন সময়কে আবার ফিরাইয়া আনে—সেগুলি প্রাণ ধরিয়া অপূ ফেলিয়া দিতে পারে না । কবে কোন কালে তাহার দিদি দুর্গা নিশ্চিন্দ্রপুরে থাকিতে আদর করিয়া তাহাকে কোন্ বন হইতে একটা পাখীর বাসা আনিয়া দিয়াছিল, কতকালের কথা—বাসাটা আজও বাস্কে রাখিয়া দিয়াছে—বাবার হাতের লেখা একখানা কাগজ—আরও কত কি ।

নির্মলা বলিল—এ কি ! আপনার মোটে দুখানা কাপড়, আর জামা নেই ? অপূ হাসিয়া বলিল—পয়সাই নেই হাতে তা জামা । নইলে ইচ্ছা তো আছে সুকুমারের মত একটা জামা কণাবো—ওতে আমাকে খা মানান্ন—ওর রংটাতে—

নির্মলা ঘাড নাড়িয়া বলিল—থাক থাক, আর বাহাহরি করতে হবে না । এই রইল চাবি, এখনি হারিয়ে ফেলবেন না যেন আবার । আমি শিশির ঠাকুরকে বলে দিয়েছি, এখন লুচি ভেজে আনবে—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে আপনার পাড়ির কত দেরি ?

—এখনও বকটা তুই । মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, আবার হয়ত কত দিন পরে আসবো তার ঠিক কি ?

—আসবেনই না । আপনাকে আমি বুঝি নি ভাবছেন ? এখান থেকে চলে গেলে আপনি আবার এ-মুখো হবেন ? কথুনো না ।

অপূ কি প্রতিবাদ করিতে গেল, নির্মলা বাধা দিয়া বলিল—সে আমি জানি । এই দু'বছর আপনাকে দেখে আসছি দাদা, আমার বুকে বাকী নেই, আপনার খরীয়ে দয়ামাত্রা কম ।

—কম ?—বা রে—এ তো তুমি—আমি বুঝি—

—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে শিশির ঠাকুর কি করছে—ডাড়া না দিলে সেকি আর—

নির্মলার মা ঘাইবার সময় চোখের জল ফেলিলেন । কিন্তু নির্মলা বাড়ির মধ্যে কি কাজে বাস্ত ছিল, যারের বহু ডাকাডাকিতেও সে কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিতে পারিল না । অপূ স্টেশনের পথে ঘাইতে ঘাইতে ভাবিল—

—নির্মলা আচ্ছা তো! একবার বার হ'ল না—যাবার সময়টা দেখা হ'ত—
জান্না খাখেরাঙ্গি! ✓

যখন তখন রেলগাড়িতে চড়াটা ঘটে না বলিয়াই রেল চড়িলেই তাহার
কিছুটা অর্ধ আনন্দ হয়। ছোট্ট ভোরক ও বিছানাটার ঘোট লইয়া জানাপার
দ্বারে বসিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কত কথা মনে আসিতোছিল। এখন
সে কত বড় হইয়াছে—একা একা ট্রেনে চড়িয়া বেড়াইতেছে। তারপর এমনি
একদিন হয়ত নীল নদের তীরে, ফ্রিগেট্টার দেশে—এক জোৎস্না রাতে শত
শত প্রাচীন সমাধির বৃকের উপর দিয়া অজানা সে খাতা!

ট্রেনে না'মিয়া বাড়ী যাইবার পথে একটা গাছতলা দিয়া যাইতে যাইতে
দ্বারে দ্বারে কেমন একটা সুগন্ধ—বাটির, ঝরা পাতার, কোন্ ফুলের।
ফাল্গুনের তপ্ত রোজ গাছে গাছে পাতা ঝরাইয়া দিতেছে, মাঠের ধারে
অনেক গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে—পলাশের ডালে রাঙা রাঙা নতুন
কোটা ফুল যেন আরতির পঞ্চপ্রদীপের উজ্জ্বল শিখার মত অলিতেছে।
অপুর মনে আনন্দে শিহরিয়া ওঠে—যদিও সে ট্রেনে আজ সা ১ পথ শুধু
নির্মলা আর দেবব্রতের কথা ভাবিয়াছে...কখনো শুধুই নির্মলা, কখনো শুধুই
দেবব্রত—তাহার স্কুলজীবনে এই দুইটি বন্ধু যতটা তাহার প্রাণের কাছাকাছি
আসিয়াছিল, ততটা নিকটে অমনভাবে আর কেহ আসিতে পারে নাই, তবুও
তাহার মনে হয় আজকার আনন্দের সঙ্গে নির্মলার সম্পর্ক নাই, দেবব্রতের
বাই—আছে তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যজীবনের স্নিগ্ধস্পর্শ, আর বহুদূর-বিস-
পিত, রহস্যময় কোন্ অন্তরের ইজিত—সে মনে বালক হইলেও এ-কথা
বোঝে।

প্রথম যৌবনের শুরু, বয়ঃসন্ধিকালে রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে,—এই ছান্না,
বকুলের গন্ধ, বনান্তরে অবসন্ন ফাল্গুনদিনে পাখীর ডাক, ময়ূরকণ্ঠী বৎ এর
আকাশটা—রক্তে যেন এদের নেশা ল'গে—গর্ব, উৎসাহ, নবীন জীবনের
আনন্দভরা প্রথম পদক্ষেপ। নির্মলা তুচ্ছ! আর এক দিকে হইতে ডাক
আসে—অপু আশায় আশায় থাকে।

বিবার মূক প্রকৃতির এ আত্মান, রোমালের আত্মান—তার রক্তে মেশানো,
এ আসিয়াছে তাহার বাবার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে—বন্ধনমুক্ত হইয়া
ছুটিয়া বা হর হওয়া, মন কি চায় না—বুঝিয়াই তাহার পিছু পিছু দৌড়ানো,
এ তাহার নিরিহ শান্ত-প্রকৃতি ব্রহ্মপণ্ডিত পিতামহ রামহরি তর্কালঙ্কারের
দান বহু—যদিও সে তাঁর নিষ্পৃহ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়ন-প্রিয়তাকে লাভ
করিয়াছে বটে। কে জানে পূর্ব-পুরুষ ঠাণ্ডাড়ে বীক রানের উচ্ছ্বল রক্ত
আছে কি-না—

তাই তাহার মনে হয় কি যেন একটা খটিবে, তাহারই প্রতীক্ষা থাকে।

অর্ধ গজেন্দ্রগা বাতাসে, নবীন বসন্তের শ্রাবণপ্রীতে, অন্তসূর্যের রক্ত আভাস
যে রোমালের বাড়ী যেন লেগা থাকে।

বাড়িতে অপু ঘায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিল। কলিকাতায় যদি পড়তে যায় স্কলারশিপ না পাইলে কি কোন সুবিধা হইবে? সর্বশ্রম কখনও জীবনে কলিকাতা দেখে নাই—সে কিছু জানে না। পড়া তো অনেক হইয়াছে আর পড়ার দরকার কি?—অপুর মনে কলেজে পড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কলেজে পড়িলে মানুষ বিদ্যার জাহাজ হয়। সবাই বলিবে কলেজের ছেলে।

মাকে বলল—নাই যদি স্কলারশিপ পাই, তাই বা কি? একরকম ক'রে হস্তে যাবে—রমাপতিদা বলে, কত গরীবের ছেলে কলিকাতায় পড়চে, গিয়ে একটা চেক্টা করলেই নাকি সুবিধা হস্তে যাবে, ও আমি ক'রে নেবো মা—

কলিকাতায় খাইবার পূর্বদিন রাত্রে আগ্রহে উত্তেজনার তাহার ঘুম হইল না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করে, বুকের মধ্যেও। গলায় যেন কি আটকাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্য সে কাল এমন সময় কলিকাতায় বসিয়া আছে?...

কলিকাতায় ১০০ কলিকাতা সম্বন্ধে কত গল্প, কত কি সে শুনিয়াছে। অভাবদ শহর আর নাই। কত কি অদ্ভুত জিনিস দেখিবার আছে, বড় বড় লাইব্রেরী আছে, সে শুনিয়াছে বই চাহিলেই সেখানে বসিয়া পড়িতে দেয়।

বিহানায় শুইয়া সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। বাড়ির পিছনের তেঁতুল গাছের ডালপালা অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে, ভোর আর কিছুতেই হয় না। হস্তত তাহার কলিকাতা খাওয়া ঘটিবে না, কলেজে পড়া ঘটিবে না, কত লোক হঠাৎ মারা গিয়াছে, এমন হস্তত সেও মরিয়া যাইতে পারে। কলিকাতা না দেখিয়া, কলেজে অন্তত কিছুদিন পড়ার আগে যেন সে না মরে।—দে'হ ই ভগবান।

কলিকাতায় সে কাহাকেও চেনে না, কোথায় গিয়ে উঠিবে ঠিক জানা নাই, পথঘাটও জানা নাই। মাসকতক আগে দেবব্রত তাকে নিজের এক মেনোমশাহরের কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিল, দরকার হইলে এই ঠিকানায় গিয়া তাহার নাম করলেই তিনি আদর করিয়া থাকিবার স্থান দিবেন। ট্রেনে উঠিবার সময় অপু সে-কাগজখানা বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। রেলের পূর্ণাবলী টাইমটেবলের পিছন হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা কলিকাতা শহরের নক্সা তাহার টিনের তোয়ড়টার মধ্যে অনেকদিন আগে ছিল, সেখানাও বাহির করিয়া বসিল।

ইহার পূর্বেও অশু নহর দেখিয়াছে, তবুও ট্রেন হইতে নামিয়া খিরাঙ্গবহ
স্টেশনের সম্মুখে বড় রাস্তার একবার আসিয়া দাঁড়াতেই সে অবাক হইয়া
পেল। এরকম কাণ্ড সে কোথায় দেখিয়াছে? ট্রামগাড়ি ইহার নাম? আর
এক রকমের গাড়ি নিঃশব্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছে, অপূ কখনও না দেখিলেও
মনে মনে আন্দাজ করিল, ইহারই নাম মোটর গাড়ি। সে বিশ্বস্তের সহিত
দু-এক-খানার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল; স্টেশনের অফিস ঘরে সে
বাখার ওপর একটা কি চাকার মত জিনিস বসে বসে বসে বসে বসে বসে
সে আন্দাজ করিল উহাই ইলেকট্রিক পাখা।

বে-ঠিকানা বন্ধু দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে এক মহা
মুশকিলের ব্যাপার, পকেটে রেলের টাইমটেবলের মোড়ক হইতে সংগ্রহ করা
কলিকাতার যেনজ্ঞা ছিল তাহা মিলাইয়া স্থারিসন রোড খুঁজিয়া বাহির
করিল। জিনিসপত্র তাহার এমন বেশী কিছু নহে, বগলে ছোট বিছানাটি
ও ডান হাতে ভারী পুঁটুলিটা ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে সামনে পাওয়া
গেল আমহার্স্ট স্ট্রীট। তাহার পর আরও খানিক ঘুরিয়া সে পকানন
দাসের গলি বাহির করিল।

অখিলবাবু সন্ধ্যার আগে আসিলেন, কালো বাতাস মুস চেহার। অপূর
পরিচয় ও উদ্দেশ্য উনিয়া খুঁজি হইলেন ও খুব উৎসাহ দিলেন। যিকে ডাকা-
ইয়া তখনই বাবার আনাইয়া অর্পণে খাটতে দিলেন, সারাদিন খাওয়া হয়
বাই ভানিতে পারিয়া তিনি এত বাস্তব হইয়া উঠলেন যে, নিজের সঙ্ঘাতিক
করিবার জন্য আসনখানি ঘেসের ছাদে পাতিয়াও আফ্রিক করিতে ভুলিয়া
গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সে ঘেসের ছাদে শুইয়া পড়িল। সারাদিন বেড়াইয়া সে বড়
ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সে তো কলিকাতার আসিয়াছে—বিউজিয়ায় গড়ের মাঠ দেখিতে পাইবে
তো... বার্নোস্তোপ দেখিবে... এখানে খুব বড় বার্নোস্তোপ আছে সে জানে।
তাহাদের দেওরানপুত্রের স্থলে একবার একটা ভ্রমণকারী বার্নোস্তোপের দল
গিয়াছিল, তাহাতেই সে জানে বার্নোস্তোপ কি অন্তত দেখিতে। তবে এখানে
নাকি বার্নোস্তোপে গল্পের বই দেখায়। সেখানে তাহা ছিল না—এলগাডী
দৌড়াইতেছে একটা লোক হাত পা বাড়িয়া মুখস্তজি কারিয়া লোক হাসাইতেছে
—এই সব। এখানে বার্নোস্তোপে গল্পের বই দেখিতে চায়। অখিলবাবুকে
জিজ্ঞাসা করিল, বার্নোস্তোপ যেখানে হয়, এখান থেকে কত দূর?

অখিলবাবুর ঘেসে খাইয়া অপূ ইহার উহার পরামর্শমত বানাহানে ইটাটাটি
করিতে লাগিল, কোথাও বা থাকবার স্থানের জন্য, কোথাও বা চলে পড়াই-
বার সুবিধার জন্য, কাহারও কাছে বা কলেজে যেন। যেভাবে ভর্তি হইবার
যোগা-যোগের জন্য। এদিকে কলেজে ভর্তি হইবার সময়ও চলিয়া যার, সঙ্গে কে
করটা টাকা ছিল তাহা পকেটে লইয়া একদিন সে ভর্তি হইতে বাহির হইল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের দিকে সে ইচ্ছা করিয়াই ঘেঁসিল না, সেখানে সবদিকেই
 ঘরচ অভ্যস্ত বেশী। মেটোপলিটান কলেজ গুলির ভিতর, বিশেষতঃ পুরানো
 ধরনের বলিয়া সেখানেও ভর্তি হইতে ইচ্ছা হইল না। মিশনারীদের কলেজ
 হইতে একদল ছেলে বা ছা হইয়া সিটি কলেজে ভর্তি হইতে চলিয়াছিল,
 তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়া কেগানীর নিকট হইতে কাগজ চাহিয়া নাম
 লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটার গডন ও আকৃতি তাহা কাছে
 এত খারাপ ঠেকিল যে, কাগজখানি ছি ডিয়া ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া
 হাঁপ চাড়িয়া বাঁচল। অবশেষে রিপন কলেজের বাড়ি তাহার কাছে বেশ
 ভাল ও উঁচু মনে হইল। ভর্তি হইয়া সে আর একটি ছেলের সঙ্গে ক্লাস কন্স-
 তুলি দেখিতে গেল। ক্লাসে ইলেকট্রিক পাখা। কি করিয়া খুলিতে হয়?
 তাহার সঙ্গী দেখাইয়া দিল। সে খুলার সহিত তাহার নীচে খানিকক্ষণ বসিয়া
 রহিল। এত হাতের কাছে ইলেকট্রিক পাখা পাহরা বার বার পাখা খুলিয়া বন্ধ
 করিয়া দেখিতে লাগিল।

অখিলবাবুদের যেসে থাকা ও পড়াশুনা দুইয়েরই ঘোর অসুবিধা। এক
 একঘরের মেজতে তিনটি ট্রাক, কতকগুলি ছুতাঃ বাস্ক কালি বুরুশ, তিনটি
 হুক। ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নাই, রাত্রে আলো সবদিন জলে না।
 ঘর দেখিয়া মনে হয় ইহার অসিবাঙ্গীগণের ভীষনে মাত্র ২ইটি উদ্দেশ্য আছে—
 অফিসে চাকরি করা ও যেসে আসিয়া খাওয়া ও ঘুমানো। এক এক ঘরে যে
 তিনটি বাবু থাকেন তাঁহারা ছুতার সময় অফিস হইতে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া
 যে যার বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে থাকেন, একটু
 আধটু গল্পগুজব যা হয়, প্রায়ই অফিস সংক্রান্ত, তারপরেই আহাঃদি সারিয়া
 নিদ্রা। অখিলবাবু কোথায় ছেলে পড়ান, অফিসের পর সেখান হইতে
 ফিরিতে দোর হইয়া যায়। তিনিও সারাদিন খাটুনির পর যেসে আসিয়া
 শুইয়া পড়েন।

অপু এরকম ঘরে এতগুলি লোকের সহিত এক বিছানায় কখনও শুইতে
 অভ্যস্ত নহ্ন, রাত্রে তাহার ঘেন হাঁপ ধরে, ভাল ঘুম হয় না। কিন্তু অন্য কোথাও
 কোনরকম সুবিধা না হইলে সে যাইবে কোথায়? তাহা ছাড়া অপূর আর
 এক ভাবনা মাসের জন্য। স্কলারশিপ পাইলে সেই টাকা হইতে মাকে কিছু
 কিছু পাঠাইবার আশ্বাস সে আসিবার সময় দিয়া আসিয়াছে কিন্তু কোথায় বা
 স্কলারশিপ, কোথায় বা কি। মা'র কিরূপে চলতেছে, দিন যাওয়ার সঙ্গে
 সঙ্গে সেই ভাবনাই তাহার আরও প্রবল হইল।

মাসের শেষে অখিলবাবু অপূর জন্য একটা ছেলে পড়ানো ঠিক করিয়া
 দিলেন, দুইবেলা একটা ছোট ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে, মাসে
 পনেরো টাকা।

অখিলবাবু যেসে পরের বিছানায় শুইয়া থাকা তাহার পছন্দ হয় না।
 কিন্তু কলেজ হইতে ফিরিয়া পথে কয়েকটি যেসে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল,

পথেগো টাকা আর আয়ে কোনো বেদে থাকা চলে না। তাহার ক্লাবের কয়েকটি ছেলে বিলিয়া একবারা বর ভাড়া করিয়া থাকিত, নিজেরাই রান্ধিয়া খাইত, অণুকে তাহারা লইতে রাজী হইল।

যে তিনটি ছেলে একসঙ্গে বর ভাড়া করিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই বাড়ি মুন্সিবাবাদ জেলায়। ইহাদের মধ্যে সুরেশ্বরের আর কিছু বেশী, এম-এ ক্লাসের ছাত্র, চল্লিশ টাকার টিউশনি আছে। জানকী যেন কোথায় ছেলে পড়াইয়া কুড়ি টাকা পায়। নির্মলের আর আরও কম। সকলের আর একত্র করিয়া যে মাসে যাহা অকুলান হয়, সুরেশ্বর নিজেই তাহা দিয়া দেয়, কাহাকেও বলে না। অণু প্রথমে তাহা জানিত না, মাস দুই থাকিবার পর তাহার সন্দেহ হইল প্রতিমাসে সুরেশ্বর পঁচিশ-ত্রিশটাকা দোকানের দেনা শোধ করে, অথচ কাহারও নিকট চায় না কেন? সুরেশ্বরের কাছে একদিন কথাটা তুলিলে, সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বেশী এমন কিছু দেয় না, যদিই বা দেয়—তাহাতেই বা কি? তাহাদের যখন আর বাড়িবে তখন তাহারও অনায়াসে দিতে পারিবে, কেহ বাধা দিবে না তখন।

নির্মল রবি ঠাকুরের কবিতা আরম্ভ করিতে করিতে বরে চুকিল। তাহার গায়ে খুব শক্তি, সুগঠিত মাংসপেশী, চওড়া বুক। অণুর মতই বলস। হাতের ভিতর একটা কাগজের চোঙা দেখাইয়া বলিল—নূতন মটরগুটি লক্ষ্য দিলে ভেঙ্গে—

অণু হাত হইতে চোঙাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখি? পরে হাসিমুখে বলিল—সুরেশ্বরদা, স্টোভ ধরিয়ে নিন—আমি মুড়ি আনি—ক'পরসার আনবো? এক-দুই-তিন-চার—

—আমার দিকে আঙুল দিয়ে গুণে না ওরকম—

অণু হাসিয়া নির্মলের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—তোমার দিকেই আঙুল বেশী ক'রে দেখাবো—তিন তিন-তিন—

নির্মল তাহাকে ধরিতে যাইবার পূর্বে সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল—একরাশ বই এনেছে কলেজের লাইব্রেরী থেকে—এত ও পড়তে পারে—মায় মমসেনের রোমের ইস্ত্রি এক ভল্যুম—

অণুর গলা মিষ্ট বলিয়া সন্ধার পর সবাই গান গাওয়ার জন্য ধরে। কিন্তু পুরাতন লাজুকপনা তাহার এখনও যায় নাই, অনেক সাধাসাধনার পর একটি বা দুটি গান গাহিয়া থাকে, আর কিছুতেই গাওয়ানো যায় না। কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতার সে বড় ভক্ত, নির্মলের চেয়েও। যখন কেহ বরে থাকে বা, নিজনে হাত-পা নাড়িয়া আরম্ভ করে—

সন্ন্যাসী উপশ্ল

মধুরাপুরীর প্রাচীরের ভলে

একদা ছিলেন সুশ্ল।

ইতিহাসের অধ্যাপক বি: বসুকে অণুর সবচেয়ে ভাল লাগে। সবদিন তাহার

ক্লাস থাকে না—কলেজের পড়ার কোন উৎসাহ থাকে না সেদিন। কবিতা
 গিবন-ঝোলানা পাঁশ-নে চশমা পরিয়া উজ্জলচক্ষু দি: বসু ক্লাসরূপে চকিলেই
 সে নড়িয়া চড়িয়া সংযত হইয়া বসে, বক্তৃতার প্রত্যেক কথা মন দিয়া শোনে।
 এম-এ-তে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট। অপূর ধারণায় মহাপণ্ডিত।—গিবন বা
 মন্সেন বা লর্ড ব্রাউন্স জাতীয়। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস—ঈজিপ্ট,
 ব্যাবিলন, আসিরিয়া, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উত্থানপতনের কাহিনী তাঁহার
 মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ছবি মত পড়িয়া আছে।

ইতিহাসের পরে লজিকের ঘণ্টা। হাজিবা ডাকিয়া অধ্যাপক পড়ানো শুরু
 করিবাব সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে কমিতে শুরু করিল। অপূ এ ঘণ্টায় পিছনের
 বেঞ্চিতে বসিয়া লাংব্রেরী হঠতে লওয়া ইতিহাস, উপন্যাস, বা কবিতার বই পড়ে
 অধ্যাপকের কথা দিকে এতটুকু মন দেয় না, শুনিতে ভাল লাগে না। সেদিন
 একমনে অন্য বই পড়িতেছে, হঠাৎ অধ্যাপক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি প্রশ্ন
 করিলেন। প্রশ্নটা সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু ক্লাস হঠাৎ নীরব হইয়া যাও-
 য়াতে তাহ'র চমক ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিল সকলোই চোখ তাহা'র দিকে।
 সে উঠিয়া দাড়াইল। অধ্যাপক বলিলেন—তোমার হাতে ওখানা লজিকের
 বই?

অপ, বলিল—না স্যর, পালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি---

—তোমাকে যদি আমাব ঘণ্টায় পার্সেন্টেজ না দিই? পড়া শোনো না
 কেন?

অপ চুপ করিয়া বহিল। অধ্যাপক তাহাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় অধ্যা-
 পনা আশ্রয় করিলেন। জানকী চিমটি কাটয়া বলিল—হ'ল তো? বোজ
 বোজ বলি লজিকের ঘণ্টায় আমাদের সঙ্গে পালতে—তা শোনা হয় না—
 আর চলে—

দেডশত ছেলের ক্লাস। পিছনের বেঞ্চেব সামনের দশজাট ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া
 খুলিয়া বাধে পাল'টবার সুবিধার জন্য। জানকী এদিক ওদিক চাহিয়া
 সুড়ৎ করিয়া সরিয়া পড়িল। তাহা'র পবে বিগড়। অপূও মহাজনদের পথ
 ধরিল। নীচে আসিলে লাংব্রেরীমান বলিল—কি রায় মশায়, আমাদের
 পার্বণীটা কি পাব না?

অপু খুব খুশী হয়। কে তাহাকে চিনিত পাঁচ মাস আগে। এতবড় কল-
 কাটা শহা, এতবড় কলেজ, এত ছেলে। এখানেও তাহাকে ব্যায়ামশায়
 বলিয়া খাতিব করিতেছে, তাহা'র কাছে পার্বণী চাহিতেছে। হাসিয়া বলে—
 কাল এনে দোব ঠিক সভাবাবু, আজ ভুলে গেছি—আপনি এক ভলুম গিবন
 দেবেন কিন্তু আজ—

উৎসাহে পড়িয়া গিবন বাডি লইয়া যায় বটে কিন্তু ভাল লাগে না। এক
 ষ্টিনাটি বিরক্তিকর বনে হয়। পরদিন সেখানা ফেরত দিয়া অন্য ইতিহাস
 লইয়া গেল।

পূর্বের কিছু পূর্বে অপূর্বের বাবা উঠিয়া গেল। পরে আর অনেকদিন হই-
তেই ফুটাইতেছিল না, সুরেশ্বরের ভাল টিউনিংটা হঠাৎ হাডছাড়া হইল—
কে বাড়তি খাচ চালায়? নির্মল ও জানকী অন্য কোথায় চলিয় গেল, সুরেশ্বর
গিয়া যেসে উঠিল। অপূর্ব যে মাসিক আয়, কলেজের মাহিনা দিয়া তাহা
হুইতে বাণো টাকা বাঁচে—কলিকাতা শহরে বাণো টাকায় যে কিছুতেই চলিতে
পাবে না, অপূর্ব সে জ্ঞান এতদিনেও হয় নাই। সুতরাং সে ভাবিল বারো
টাকাতো চলিবে, খুব চলিবে। বাণো টাকা কি কম টাকা।

কিন্তু বাণো টাকা আরও বেশী দিন বহিল না একদিন পড়াইতে গিয়া গুনিল,
হেলো শব্দী খাবাপ বলিয়া ডাঙার হওয়া বদলাইতে বলিয়াছে, পড়াশুনা
এখন বন্ধ থাকিবে। এক মাসের মাহিনা তাহাণা বাড়তি দিয়া জবাব দিল।
টাকা কয়টা পকেটে কবিতা সেখান হইতে বাহির হইয়া অপূর্ব, আকাশ পাতাল
ভাবিতে ভাবিতে ফুটপাথ বাহিয়া চলিল। সুরেশ্বর যেসে সে নিসপত্র
রাখিয়া দিয়াছে, সেখানেই গেস্ট-চাফ দিয়া খায়, বাত্রে মেসের বাবাম্বাতে
সুইয়া থাকে। টাকা যাহা আছে, মেসের দেনা মিটাইতে খাইবে। সামান্য
কিছু হাতে থাকিতে পাবে বটে, কিন্তু তাহাও পব?

সুরেশ্বরের যেসে আসিয়া নিজের নামের একখানি পত্র ডাকবাক্সে দেখিল।
হাতের লেখাটা সে চেনে না—খুলিয়া দেখিল চিঠিখানা মায়ের, কিন্তু অপূর্বের
হাতের লেখা। হাতে বাণো হইয়া মা বড কষ্ট পাইতেছেন, অপূর্ব তিনটি
টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে? মা কখনো কিছু চান না, মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ
সহ্য করেন, সে-ই স্বয়ং দেওয়ানপুরে থাকিতে নানা ছল-ছুতায় মাঝে মাঝে কত
টাকা মায়ের কাছ হইতে লইয়াছে। হাতে না থাকিলেও তেলিবাড়ি হইতে
চাহিয়া-চিহ্নিয়া মা যোগাড় করিয়া দিতেন। খুব কষ্ট না হইলে কখনো মা
তাহাকে টাকার জন্য লেখে নাই।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুনিয়া দেখিল সাতাশটি টাকা আছে।
যেসের দেনা মাঝে পনেরো টাকা বাদে মাঝে এগারো টাকা থাকে। মাকে
কত টাকা পাঠানো যায়? মনে মনে ভাবিল—তিনটে টাকা তো চেয়েছেন
আমি দশ টাকা পাঠিয়ে দিই, মনিঅর্ডার পিওন যখন টাকা নিয়ে যাবে, মা
ভাববেন, বুঝি তিন টাকা কিংবা হয়তো দুটাকার মনিঅর্ডার—ভিজেন্স কর-
বেন কত টাকা? পিওন যেই বলবে দশ টাকা, মা অর্থাৎ হয়ে যাবেন। মাকে
তাক লগিয়ে দেবো—ভারী মজা, বাড়ীতে গেলে মা শুধু সেই গল্পই করবেন
দিনরাত—

অপ্রত্যাশিত টাকা প্রাপ্তিতে মায়ের আনন্দোচ্ছল মুখখানা কল্পনা করিয়া
অপূর্ব ভাবী খুশী হইল। বৌবাজার পোস্টোফিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া
সে ভাবিল—বেশ হ'ল! আহা, মাকে কেউ কখনো দশ টাকার মনিঅর্ডার
এক সঙ্গে পাঠায় নি—টাকা পেয়ে খুশী হবেন। আমার তো এখন বইল ঘেড়
টাকা, তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবেই।

কলেজের একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরীব ছাত্র, ঢাকা ডেলায় বাড়ি, নাম প্রণব মুখার্জী। খুব লম্বা, গোরবর্ণ, দোহাণী চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। কলেজ-লাইব্রেরীতে একসঙ্গে বাসিয়া বই পড়িতে পড়িতে দু'জনের আলাপ। এমন সব বই দু'জনে লইয়া যায়, যাহা সাধারণ ছাত্রেরা পড়ে না, নামও জানে না। ফার্স্ট-ইয়ারের ছেলেকে মস্‌সেন লইতে দোহাণী প্রণব তাহার দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

অপু শীঘ্রই বুদ্ধিতে পারিল, প্রণবের পড়াশুনা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী! অনেক গ্রন্থকারের নামও সে কখনও শোনে নাই—নীট্‌শে, এমাস'ন, টুর্গেনেভ, ব্রেস্টেড—প্রণবের কথায় সে হৃদয়ের বই পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই উৎসাহে সে পুনরায় দৈঘ ও অধ্যবসায়ের সহিত গিবন্‌ গুরু করিল, ইলিয়াদেব অনুবাদ পড়িল।

অপুর পড়াশুনার কোনও বাধাবিঘ্ন রীতি নাই। যখন যাহা ভাল লাগে, কখনও ইতিহাস, কখনও নাটক, কখনও কবিতা, কখনও প্রবন্ধ, কখনও বিজ্ঞান। প্রণব নিজে অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্ৰিয়। সে বলল, ওতে কিছু হবে না, ও রকম পড় কেন?

অপু চোঁটা করিয়াও পড়াশুনায় শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না। লাইব্রেরী ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড় বড় বইয়ে ভরা আলমারির দৃশ্য তাহাকে দিশাহারা করিয়া দেয়। সকল বই খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়,—Gases of the Atmosphere—স্মার উইলিয়াম রামজের। সে পড়িয়া দেখিবে কি কি গ্যাস! Extinct Animals —ই. রে. ল্যান্‌কাষ্টার, জানিবার তার ভরানক আগ্রহ! Worlds Around Us—প্রট্টের! উঃ, বইখানা না পড়িলে রাতে ঘুম হইবে না। প্রণব হাসিয়া বলে—দূর। ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া পড়া খেলা—

এত বড় লাইব্রেরী, এত বই! নব্বত্রিঙ্গণ হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর জীব-জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, আনুবীক্ষণিক প্রাণিকুল, ইতিহাস সব সংক্রান্ত বই। তাহার অনীর উৎসুক, মন চায় এই বিশ্বের সব কথা জানিতে। বুদ্ধিতে পারুক আর নাই পারুক—একবার বইগুলি খুলিয়া দেখিতেও সাধ যায়। লুপ্ত প্রাণিকুল সম্বন্ধে খানকতক ভাল বই পড়িল—অলিভার লভের Pioneers of Science—বড় বড় নীহারকারদের কটো দেখিয়া মুগ্ধ হ'ল। নীট্‌শে ভাল বুদ্ধিতে না পারিলেও দু-ভিনখানা বই পড়িল। টুর্গেনেভ একেবারে শেষ করিয়া ফেলিল, বারোখানা না বোলখানা বই। চোখের সামনে টুর্গেনেভ এক নতুন জগৎ খুলিয়া দিয়া গেল—কি অপূর্ব হাসি অশ্রু-মাখানো কল্পলোক!

প্রণবের কাছেই সে সন্ধান পাইল, শ্যামবাজারে এক বড় লোকের বাড়ি ঘরির ছাত্রদের খাইতে দেওয়া হয়। প্রণবের পরামর্শে সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল। এ পর্যন্ত কখনো কিছু সে চায় নাই, কাহারও কাছে চাহিতে পারে

না ; আত্মবর্জ্যবোধের জন্ত বহে, লাক্ষ্যকতা ও আনাড়ীপনার জন্ত । এতদিন
শে-নবের দরকারও হয় নাই, কিন্তু আর যে চলে না !

খুব বড়লোকের বাড়ি ; দারোয়ান বলিল—কি চাই ?

অপু বলিল, এখানে গরীব ছেলেদের খেতে দেয়, তাই জানতে—কাকে বলবে
জানো ?

দারোয়ান তাহাকে পাশের দিকে একটা চোট ঘরে লইয়া গেল ।

ইলেকট্রিক পাখার তলায় একজন মোটামোটা ভদ্রলোক বসিয়া কি লিখিতে-
ছিলেন । মুখ তুলিয়া বলিলেন—এখানে কি দরকার আপনার ?

অপু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—এখানে কি পুণ্ডর ঝুড়েকদের খেতে দেওয়া
হয় ? তাই আমি—

—আপনি দরখাস্ত করেছিলেন ?

কিসের দরখাস্ত অপু জানে না ।

—জুন মাসে দরখাস্ত করতে হয়, আমাদের নাম্বার লিমিটেড কিনা, এখন আর
খালি নেই । আবার আসছে বছর—তাছাড়া, আমরা ভারি ওটা উঠিয়ে দেবো
এস্টেট রিভিভারের হাতে যাচ্ছে, ও সব আর সুবিধে হবে না ।

ফিরিবার সময় গেটের বাহিবে আসিয়া অপু মনে বড় কষ্ট হইল । কখনও
সে কাহ রও নিকট কিছু চায় নাই, চাহিয়া বিমুখ হইবার দুঃখ কখনও ভোগ
করে নাই, চোখে তাহার প্রায় ডল আসিল ।

পকেটে হাত্ৰ ঘানা দুই পয়সা অবশিষ্ট আছে—এই বিশাল কলিকাতা শহরে
তাহাই শেষ অবলম্বন । কাহাকেই বা সে এখানে চেনে, কাহার কাছে যাইবে ?
অখিলবাবুর মেসে দুই মাস সে প্রথম খাইয়াছে, সেখানে যাতে লজ্জা কবে ।
সুরেশ্বরের নিজেরই চলে না ; তাহার উপর সে কখনও জুলুম করিতে পারিবে
না ।

আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল । কোনদিন সুরেশ্বরের মেসে এক বেলা খাইয়া,
কোনদিন বা জানকীর কাছে কাটাইয়া চলিতেছিল । একদিন সারাদিন না
বা খাওয়ার পর সে নিরুপায় হইয়া অখিলবাবুর মেসে সন্ধ্যার পর গেল ।
অখিলবাবু অনেকদিন পর তাহাকে পাইয়া খুশী হইলেন । রাত্রে খাওয়া দাওয়ার
পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিলেন । বলি বলি করিয়াও অপু নিজের
দুর্দশার কথা অখিলবাবুকে বলিতে পারিল না । তাহা হইলে হয়তো তিনি
তাহাকে চাড়াইবেন না, সেখানে থাকিতে বাধ্য করিবেন । সে জুলুম করা হয়
অবর্ণক ।

কিন্তু এদিকে আর চলে না । এক জায়গায় বই, এক জায়গায় বিছানা ।
কোথায় কখন রাত কাটাইবে কিছু ঠিক নাই—ইহাতে পড়াশুনা হয় না
পরীক্ষাও নিকটবর্তী । না খাইয়াই বা কয় দিন চলে ।

অখিলবাবুর মেসে হইতে ফিরিবার পথে একটা খুব বড় বাড়ি । ফটকের কাছে
ঘোঁটর পাড়ি দাঁড়াইয়া আছে । এই বাড়ির লোকে যদি ইচ্ছা করে তবে এখনি

তাহার কলিকাতায় থাকার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। সাহস করিয়া যদি সে বলিতে পারে, তবে হয়তো এখনি হয়। একবার সে বলিয়া দেখিবে ?

কোণাও কিছু সুবিধা না হইলে, তাহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিতে হইবে। এই লাইব্রেরী, এত বই, বন্ধুবাৎসব, কলেজ—সব ফেলিয়া হয়তো মনসাপোত্য গিয়া আবার পুণাতন জীবনের পুনর্গঠিত করিতে হইবে। পড়াশুনা তাহার কাছে একটা রোমাস, একটা অজানা বিচিত্র জগৎ দিনে দিনে চোখের সামনে খুলিয়া যাওয়া, ইহাকে সে চায়, ইহাই এতদিন চাহিয়া আসিয়াছে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাকরি, অর্থোপার্জন—এসব কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, তাহার মাথায় মধ্যে কোনদিন এসব সাংসারিক কথা ঢোকে নাট—সে চায় এই অজানার রোমাস—এই বিচিত্র ভাবধারার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। প্রাচীন দিনের জগৎ, অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল শূন্যে দৃশ্য, অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্রগতি, ফরাসী বিদ্রোহ—নানা কথা। এই সব ছাড়িয়া শালগ্রাম হাতে মনসাপোত্য বাড়ি-বাড়ি ঠাকুর পূজা...

অপু মনে হইল—এই রকমই বড় বাড়ি আছে লীলাদের, কলিকাতায়ই কোন জায়গায়। অনেকদিন আগে লীলা তাহাকে বলিয়াছিল কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়িতে। সে ঠিকানা জানে না—কোথায় লীলাদের বাড়ি, কে-ই বা এখানে তাহাকে বলিয়া দিবে তাহা ছাড়া সে-সব আজ ছয় সাত বছরের কথা হইয়া গেল, এতদিন কি-আব লীলা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে ? কোন কালে ভুলিয়া গিয়াছে।

অপু ভাবিল—ঠিকানা জানলেই কি আর আমি সেখানে যেতে পারতাম, না, গিয়ে কিছু বলত—সে আমার কাজ নয় তার ওপর এই অবস্থায়। দূর তা কখনও হয় ? তাহাড়া লীলায় বিয়ে খাওয়া হলে এতদিন সে স্বস্তরবাড়ি চলে গিয়েছে। সে সব কি আব আঙ্কের কথা ?

ক্লাসে ডানকী একদিন একটা সুবিধার কথা বলিল। সে আমাপুকুরে কোন ঠাকুরবাড়িতে রাত্রে খায়। সকালে কোথায় ছেলে পড়াইয়া একবেলা তাহাদের সেখানে খায়। সম্প্রতি সে বোনের বিবাহে বাড়ি যাইতেছে, কিব্বিয়া বা আসা পর্যন্ত অপু রাত্রে রাজবাড়িতে তাহার বদলে বাইতে পারে। বাড়ি যাইবার পূর্বে ঠাকুরবাড়ি সেবাইতকে বলিয়া কহিয়া সে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবে এখন। অপু বাতী আছে ?

রাজী ? হাতে স্বর্গ পাওয়া নিঃসন্ত গল্পকথা নয় তাহা হইলে।

ঠাকুরবাড়ির খাওয়া নিঃসন্ত মন্দ নয়। অপুও কাছে তাহা খুব ভাল লাগে। আলোচালের ভাত, টক কোনও কোনও দিন ভোগের পান্নসও পাওয়া যায়, তবে বাছ বাৎসেং সম্পর্ক নাই, নিরাশ্রয়।

কিন্তু এ তো স্নান হ'বেলা নয়, শুধু রাত্রে। দিনমানটাতে বড় কষ্ট হয়।

দুই পরসার হুড়ি ও কলের জল। তবুও ভো পেটটা ভরে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া বৈকালে তাহার এড কুশা পায় যে গা ঝিম্ ঝিম্ করে, ণেটে ঘেব এক কাঁক বোলতা হল ফুটাইতেছে—পরসা জুটাইতে পারিলে অপু এ সময়টা পথের ধারের দোকান হইতে এক পরসার ছোলাভাজা কিনিয়া খায়।

সব দিন পরসা থাকে না, সেদিন সন্ধ্যার পরেই ঠাকুরবাড়ি চলিয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরের আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বাইতে 'দবার নিয়ম নাই—তাও একবার নয়, দুইবার দুটি ঠাকুরের আরতি। আরতির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, সেবাইত ঠাকুরের মঞ্জি ও সুবিধামত রাত আটটাতেও হয়, ন'টাতেও হয়, দশটাতেও হয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যার পরেই হয়।

কলেজে যাইতে সেদিন মুরারী বলিল—সি. সি. বি-র ক্লাসে কেউ যেও না—আমরা সব স্টুইক কবেছি।

অপু বিষ্ময়ের সুরে বলল, কেন কি করেছে, সি. সি. বি. ?

মুরারী হাসিয়া বলিল,—করে নি কিছু, পড়া ডিস্টেন্স করবে বলেছে রোমের হিষ্টির। একপাতাও পড়ি নি, না পারলে বকুনি দেবে কি রকম জানো তো ?

গজেন বলিল—আমার তো আরও মুশকিল। রোমের হিষ্টির বই-ই যে আমি কিনি নি !

বন্দ্যধ আগে সেট ভেত্তিয়ায়ে পড়িত, সে বিলাতী নাচের ভঙ্গিতে হাত লম্বা করিয়া বার কয়েক পাক খাইয়া একটা ইংরাজি গানের চরণ বার দুই গাহিল। অপু বলিল—কিন্তু পাসে'ন্টেজ যাবে যে ?

প্রভুল বলিল—ভারী একদিনের পাসে'ন্টেজ। তা আমি ক্লাসে নাম প্রেজেন্ট করেও পালিয়ে আসতে পারি—সে তো আর তুমি পারবে না ?

অপু বলিল—খুব পারি ! পারবো না কেন ?

প্রভুল বলিল—সে তোমার কাজ নয়, সি. সি. বি-র চোখ ভারী ইয়ে—আমরা বলে ওাই এক-একদিন সরষের ফুল দেখি, তা তুমি ! পারো পালিয়ে আসতে ?

—এখুনি। দ্যাখো সবাই দাঁড়িয়ে—পারি কি না পারি, কিন্তু যদি পারি খাওয়াতে হবে ব'লে দিলাম—

অপু উৎসাহে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া গেল। গজেন বলিল—কেন ওকে আবার ওসব শেখাচ্ছিস ?

—শেখাচ্ছি বানে ? ভাজা বাছানো উন্টে খেতে জানে না—ভারী সাধু !

মুরারী বলিল—না, না, তোমরা জানো না, অপূর্ব ভারী Pure spirit !
সেদিন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাবি, ও-রকম সুন্দর চেহারা থাকলে আবারেও কত
খাটি ফিকেট আগতো—বাবা, বন্ধিবাবু কি আর সাথে সুন্দর যুগের ওপ
গেয়ে গেছেন ?

—কি বাজে বন্ধিস প্রভুল ? দিন দিন ভারী ইতর হয়ে উঠ্'ছিস
কিছু—

প্রিন্সিপালের গাড়ি কলেজের সামনে আসিয়া লাগাতে যে যেদিকে সুবিধা
পাইল সরিয়া পড়িল ।

বিঃ বসুর ক্লাসে নামটা প্রজেক্ট করিয়াই আজ অপু পালাইবার পথ খুঁজিতে
লাগিল । বাঁ দিকের ঘরখাটা একদম খোলা, প্রোফেসারের চোখ অন্যদিকে ।
মুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রোফেসারের চোখ আবার তাহার দিকে পড়িল,
কাজেই খানিকক্ষণ ভালমানুষের মত নিরীহ-মুখে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল ।
এইবার একবার : অন্য দিকে চোখ পড়িলেই হয় । হঠাৎ প্রোফেসার
তাহাকেই প্রশ্ন করিলেন,—Was Merius justified in his action ?
সর্বনাশ । যেহিলাস কে । একদিনও সে যে রোমের ইতিহাসের লেকচার
শোনে নাই ।

উত্তর না । গাঠিয়া প্রোফেসার অন্য একটা প্রশ্ন করিলেন—What do you
think of Sulla's—

অপু বিপরমুখে কডিকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।

রাস্তেল মণিলালটা মুখে কাপড় গুঁজিয়া ঝিল্ ঝিল্ করিয়া হাসিতেছে ।

প্রোফেসার 'বরজ হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন ।

—You, You there—you behind the pillar—

এবার মণিলালের পালা । সে থামের আড়ালে সরিয়া বসিবার বৃথা চেষ্টা
হইতে বিব্রত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল । দেবা গেল সুন্না বা যেহিলাসের
সম্বন্ধে অপু ম হ ও তাহার মতের : কোন পার্থক্য নাই, সমানই নির্বিকার ।
মণিলালের দুর্গতিতে অপু খুঁষ খুঁশী হইয়া পাশের ছেলেকে আঙুলের খোঁচা
দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—Rightly served ? ভারি হাসি
হাজিল —

—চুপ চুপ—এখনি আবার এদিকে চাইবে সি. সি. বি. কথা শুনে—

—এবার আবি সোণা—

পিছন হইতে নূপেন বাস্তবরে বলিল—এইবার আমার জিজ্ঞেস করবে—
ডেটটা ভাট ঘে না শীপ্‌গির ব'লে—শীপ্‌গির—

অপু পাশের ছেলেটি বলিল—কে কাকে ডেট বলে দাড়া—যেহিলাস
পুলারের খইয়ের মত কেমন এখনও চাক্ষুষ দেখি নি—কেটে পড়ে বা সোণা—
অপু খানিকক্ষণ হইতেই প্রোফেসারের দৃষ্টির গতি এক মনে লক্ষ্য করিতে-
ছিল, সে ব্রুজিতে পারিল ও-কোণ হইতে একবার এদিকে ফিরিলে পালানো
অসম্ভব হইবে,, কারণ এদিকে এখনও অনেক ছেলেকে প্রশ্ন করিতে থাকি ।

এই সুবর্ণসূর্যাস । বিলম্ব করিলে... ।

হু' একবার উসখুস করিয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া অপু গী করিয়া খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল ।

পিছু পিছু হরিদাস—অল্প পরেই নুপেন ।...

তিনজনেই উপরের বারান্দাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তর্- তর্- করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে একতলায় নামিয়া আসিল ।

অপু পিছন ফিরিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—হি-হি-হি—উঃ—আর একটু হলেই—

নুপেন বলিল—আমাকে তো—মিনিট-দুই ঘেরি---কাল হয়েছে কি বুঝলে?—

অপু বলিল—বাক, এখানে আর দাঁড়িয়ে খোশগল্প করার কোনও দরকার দেখছি নে । এখুনি প্রিন্সিপ্যাল নেমে আসবেন, গাড়ি লাগিয়েছে দরজায়—কমনরুমে বরং এসে—

একটু পরে সকলে বাহির হইয়া পড়িল । আজ আর ক্লাস ছিল না । কে গ্রাহ্য করে বুড়ো সি. সি. বি. ও তাঁহার রোমের ইতিহাসের যত বাজে প্রশ্ন ? অপু কিছু কিছু নিরাশ হইল । ক্লাস হইতে পালাইতে পারিলে প্রভুলের মূল খাওয়াইবে বলিয়াছিল ! কিন্তু লাইব্রেরীরানের কাছে ভিক্ষা করিয়া জানিল তাহারা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে ।—কোন সকালে দুই পয়সার মুড়ি ও একবার ফুলুগি খাইয়া বাহির হইয়াছে—পেট খেন দাঁউ দাঁউ জ্বলিতেছিল, কিছু খাইতে পারিলে হইত ! ক্লাসে এতক্ষণ বেশ ছিল, বুঝিতে পারে নাই, বাহিরে আসিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া উঠিল । এদিকে পকেটে একটাও পয়সা নাই । সে ভাবিল—ওরা আচ্ছা তো ? বললে খাওয়াযো, তাই তো আমি পালাতে গেলাম, নিজেরা এদিকে সরে পড়েছে কোন্ কালে ।...এখন কিছু খেলে তবুও রাত অবসি থাকা যেতো—আজ সোমবার, আটটার মধ্যেই আরতি হইবে—উঃ কিদে না পেরেছে !—

অপরাজিত

ষষ্ঠ - পরিচ্ছেদ

এ ধরনের কষ্ট কহিতে অপু কোনও অভ্যস্ত নয় । বাড়ির এক ছেলে, চিরকাল বাপ-মায়ের আদরে কাটাষ্টয়াছে । শহরে বড়লোকের বাড়িতে অল্প কষ্ট থাকিলেও খাওয়ার কষ্টটা অন্ততঃ ছিল না । তাহাড়া লেখানে মাঝার উপর ছিল না, সকল আপদবিপদে সবজিয়া ডান বেগিয়া ছেলেকে আড়াল করিয়া রাখিতে প্রাণপণ করিত, কোনও কিছু আঁচ লাগিতে দিত না । দেওয়ানপুরে স্কলারশিপের টাকায় হালকি বৃত্তিতে খেচকি শৌখিনতা করিয়াছে—খাইয়াছে, খাওয়াইয়াছে, ভাল ভাল কাপড় পরিয়াছে,—তখন সে সব মিনিল সন্তাও ছিল ।

কিছু শীতই অপু বুঝিল—কলিকাতা দেওয়ানপুর নয়। এখানে কেহ কাপড়ের দাব এত চড়িয়াছে যে, কাপড় আর কেনা যায় না! ভাল কাপড় তাহার ঘোটে আছে একখানা, একটা টুইল শার্ট সম্বল। ছেলেবেলা হইতেই মরলা কাপড় পরিতে সে ভালবাসে না, ২-তিনদিন অন্তর স'বান দিয়া কাপড় কাচিয়া শুকাইলে, তাহাই পরিয়া বাহির হইতে পারে। সবদিন কাপড় ঠিক সময়ে শুকায় না, কাপড় কাচিবার পরিশ্রমে এক-একদিন আবার ক্ষুধা এত বেশী পায় যে, মাত্র দু'পরসার খাবারে কিছুই হয় না—ক্লাসে লেকচার শুনিতে বসিয়া মাথা যেন হঠাৎ শোলার মত হ লকা বোধ হয়।

এদিকে থাকার কড়ও খুব। সুরেশ্বর এম.-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহার ঘেসে আর থাকিবার সুবিধা নাই। যাইবার আগে সুরেশ্বর একটা ঔষধের কারখানার উপরে একটা ছোট ঘরে তাহার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিয়া গিয়াছে। ঐ কারখানায় সুরেশ্বরের জানাশোনা একজন লোক কাজ করে ও রাত্রে ওপরের ঘরটাতে থাকে। ঠিক হইয়াছে, যতদিন কিছু একটা সুবিধা না হইতেছে, ততদিন অপু ওই ঘরটাতে লোকটার সঙ্গে থাকিবে। ঘরটা একে ছোট, তাহার উপর অর্ধেকটা ভাতি ঔষধ-বোঝাই প্যাকবাল্লে। রাশিকৃত অঞ্জাল বাস্কেটের পিছনে জমানো, কেমন একটা গন্ধ! নেংটি ইঁদরের উৎপাতে কাপড়চোপড় রাশিবার ধো নাই, অপু এক-মাত্র টুইল শার্টটার দু' জায়গায় কাটিয়া ফুটা করিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘরঘর আরসোলাব উৎপাত। ঘরের সে লোকটা যেমন নোংরা তেমনই তামাকপ্রিয়, রাত্রে উঠিয়া অন্ততঃ তিনবার তামাক সাজিয়া বায়। তাহার কাশির শেষে ঘুম হওয়া দায়। ঘরের কোণে তামাকের গুল রাশিকৃত করিয়া বাখিয়া দেয়। অপু নিজে বার দুই পিচ্ছার করিয়াছিল। এক টুকরো রবারের ফিতার বড়ই ঘরের নোংরা মিটা স্থিতিস্থাপক—পূর্বাবস্থায় ফিরিতে একটুকু দৌদি হয় না। ষাণ্মা-পরা-থাকিবার কষ্ট অপু কখনও করে নাই, বিশেষ করিয়া একলা যুক্তিতে হঠতেছে বলিয়া কষ্ট আরও বেশী।

অশ্রমস্বভাবে যাঁতে যাইতে সে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তি ব মোড়ে আসিল। যুদ্ধের নূতন খবর বাহির হ য়াহে বলিয়া কাগজওয়ালা হাঁকিতেছে। শেরা-লদার একটা ট্রাম হ-তে লোকজন নামা ওঠা করিতেছে। একট চোখে-চশমা ভরুণ যুবকের দিকে একবার চাহিয়া মনে হইল—চেনা চেনা মুখ। একটু পরে সেও অপু দিকে চাইতে দুইজনে চোখা-চাখি হইল। এবার অপু চিনিয়াছে—সুরেশদা। নিশ্চিন্দপুরের বাড়ির পাশের সেই পোড়ো ভিটার মালিক নীলমণি জ্যাঠামশায়ের হেলে সুরেশ।

সুরেশও চিনিয়াছিল। অপু তাডাতাড়ি কাছে গিয়া হাসিমুখে বলিল, সুরেশদা যে।

যেবার দুর্গা যার। যার, সে বৎসব শীতকালে ইছারা যা কয়েক ঘাসের জন্ত

বেশে গিয়াছিল, তাহার পর আর কখনও দেখানাকাং হয় নাই।
সুরেশ আকৃতিতে যুবক হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ দেহ, সুগঠিত হাত পা। বাল্যের
সে চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

সুরেশ সহজ-সুরেই বলিল—আরে অপূর্ব? এখানে কোথা থেকে?
সুরেশের খাটি শহরে গলার সুরে ও উচ্চারণ-ভঙ্গিতে অপূর্ব একটু ভয় বাইরা
গেল।

সুরেশ বলিল—তারপর এখানে কি চাকরি-টাকরি করা হচ্ছে?

—না—আমি যে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে রিপনে—

—তাই নাকি? তা এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

অপূর্ব সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, জোঠিবা
কোথায়?

—এখানেই, শ্রামবাজারে। আমাদের বাড়ি কেনা হয়েছে সেখানে—

সুরেশের সহিত সাক্ষাতে অপূর্ব ভারী খুশী হইয়াছিল। তাহাদের বাড়ির
পাশের যে পোড়ো ভিটার বনঝোটে বসিয়া তাহারা দিদি দুর্গার আবাল্য অতি
মধুর পরিচয়, সেই ভিটারই লোক ইহা। যদিও কখনও সেখানে হাজার
বাস করে নাই, শহরে শহরেই ঘোরে, তবুও তো সে ভিটারই লোক, তাহা
ছাড়া দশ বাত্মিব জ্ঞাতি, অতি আপনাব জন।

অপূর্ব বলিল অতসীদি এখানে আছে? সুনীল? সুনীল কি পড়ে?

—এবার সেকেন ক্লাসে উঠেছে—আচ্ছা, খাই তাহলে, আমার ট্রাম
আসছে—

সুরেশের সুরে কোনও আগ্রহ বা আশ্চর্য্যকিতা ছিল না, সে এমন সহজ সুরে
কথা বলিতেছিল, যেন অল্পের সঙ্গে তাহা হইবেলা দেখা হয়। অপূর্ব কিন্তু
নিজের আশ্চর্য্য লক্ষ্যে এত ব্যস্ত ছিল যে, সুরেশের কথাবার্তার সে-দিকটা
তাহার কাছে ধরা পড়িল না।

আপনি কি করেন সুরেশদা?

—বেডিকেল কলেজে পড়ি, এবার থার্ড ইয়ার—

—আপনাদের ওখানে একদিন খাব সুরেশদা—জোঠিবার সঙ্গে দেখা করে
আসবো—

সুরেশ ট্রামের পা-দানিতে পা দিয়া উঠিতে উঠিতে অনাসক্ত সুরে বলিল, বেশ
বেশ, আমি আসি এখন—

একদিন পরে সুরেশদার সহিত দেখা হওয়ার জন্যে অপূর্ব মনে এমন বিশ্বাস ও
আনন্দ হইয়াছিল, যে ট্রামটা ছাড়িয়া দিলে তাহার মনে পড়িল—সুরেশদার
বাড়ির ঠিকানাটা তো জিজ্ঞাসা করা হয় না।

নে চলল ট্রামের পাশে ছুটিতে ছুটিতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের বাড়ির
ঠিকানাটা—ও সুরেশদা, ঠিকানাটা যে—

সুরেশ যুব বাড়ীয়া বলিল—চলি এম হই সি, বিশ্বকোষ লেব, স্তান-

বাজার-—

পরের রবিবার সকালে স্নান করিয়া অপ, শ্যামবাজারে সুরেশদার ওখানে যাইবার জন্য বাহির হইল। আগের দিন টাইল শার্টটা ও কাপড়খানা সাবান দিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লইয়াছিল, জুতার শোচনীয় দুরবস্থা চাকিবান জন্য একটি পরিচিত মেসে এক সহপাঠ্য নিকট হইতে জুতার কালি চাহিয়া নিজে বুরুশ করিয়া লইল। সেখানে অতসীদি ইত্যাদি রহিয়াছেন, দীনহীন বেশে কি যাওয়া চলে?

ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে দেবি হইল না। ছোট-খাটো দোতারা বাড়ি, আধুনিক ধবনের তৈয়ারী। ইলেকট্রিক লাইট আছে, বাহিনের বৈঠকখানা দেওলায় উঠিবার সিঁড়ি। সুবেশ বাড়ি ছিল না, খিয়েব কাছে সে পরিচয় দিতে পারিল না, বৈঠকখানায় তাহাকে বসাইয়া নি চলিয়া গেল। ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, একটা পুরনো গোল-টপ ডেস্ক, বানকতক চেয়ার। ভারী সুন্দর বাড়ি তো। এত আনন্দের জন্যে কলকাতায় একমুখ বাড়ি আছে, ইহাতে অপ, মনে মনে একটু গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিল। টেবিলে একখানা সেদিনের মস্তকোজা পড়িয়া ছিল, উলটাইয়া পালটাইয়া যুদ্ধের খবর পড়িতে লাগিল। অনেক বেলায় সুবেশ আসিল।

তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে অপ, কখন এলে?

অপু হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমুন সুবেশদা—আমি, আমি অনেকক্ষণ ধরে—বেশ বাড়িটা তো আনন্দেব।—

এটা আমার বড়মামা—খানি পাটনার ঢকিল, তিনি কিনেছেন; তাঁরা তো কেউ থাকেন না, আমবাই থাকি। বসো আমি আসি বাড়ীর মধ্যে থেকে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এবার সুবেশদা বাড়ীর ভিতর গিয়ে বললেই গোঠিয়া ডেকে পাঠাবে, এখানে খেতে বলবে...

কিছু ঘটনাক্রমে মদ্য সুবেশ বাড়িবে ভেতর হইতে বাহির হইল না। সে যখন পুনরায় আসিল, তখন বাবোটা বাড়িয়া গিয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্তুদুবে বলিল, তারপর?...বলিয়াই খবরের কাগজখানা তুলিয়া চোখ প্লাইতে লাগিল। অপু দেখিল সুবেশ পান চিবাইতেছে। খাওয়ার আগে এত বেলায় পান খাওয়া অভ্যাস, না-কি খাওয়া হইয়া গেল।

দুই চারিটা প্রশ্নের জবাব দিতে ও খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে একটা বাজিল। সুবেশের নোখ ঘূমে বুজিয়া আসিতেছিল। সে হঠাৎ কাগজখানা টেবিলে রাখিয়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি না হয় বসে কাগজ পড়ো, আমি একটুখানি শুয়ে নি। একটা ডাব খাবে?—

ডাব খাইবে কি রকম, এত বেলায়, এ অবস্থায়? অপু ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ডাব? না থাক, এত বেলায়—ইয়ে—না।

সেই যে সুরেশ বাড়ি ঢুকিল—একটা—দুইটা—আড়াইটা, আর দেখা নাই। ইহারা কত বেলায় যায়। রবিবার বলিয়া এত দৌর? কিন্তু যখন তিনটা বাড়িয়া গেল, তখন অপূর্ব মনে হইল, কোথাও কিছু ভুল হইয়াছে নিশ্চয়। হয় সে-ই ভুল বুঝিয়াছে, না হয় উহাও ভুল কবিয়াছে। তাহার এত ক্ষুধা পাশে ছিল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না। উঠিবে কিনা ভাবি তেছে, এমন সময় সুবেশের ছোট ভাই সুনীল বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। অপূর্ণ ডাকিবাব পূর্বেই সে সাইকেল লইয়া বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেল।

সেই সুনীল—যাহাকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে ছাদা বাঁদিবাব দরুন ছোটমা তাহাকে ফলাবে-বামুনের ছেলে বলিয়াছিলেন। ইহাদের যে এতদিন পর আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা যেন অপূর্ণ ভাবে নাই। সুনীলকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও আনন্দ দুইই হইল। এ যেন কেমন একটা ঠিক বুঝানো যায় না—

ইহাদের সঙ্গে দেখা কবিত্তে আসিবার মূলে অপূর্ণ কোন স্বার্থসিদ্ধি বা সুযোগ-সন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল না, বা ইহা যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া অলাপ জমাইবার মত দেখাইতেছে—একবারও সে কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই। এখানে তাহার আসিবার মূলে সেই বিস্ময়ের ভাব—যাহা তাহার জন্মগত। কে আবার জানিত, খাস কলিকাতা শহরে এতদিন পবে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীর পাশের পোড়ো ভিটাটার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। এই ঘটনাটুকু তাহাকে মুগ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এ যেন জীবনের কোন্ অপবিচিত বাক্যে পুত্রপুষ্পে সজ্জিত অভ্যাস কোন্—কৃষ্ণবন—বাক্যের মোড়ে ইহাদের আন্তর্য যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

বিস্ময় মনের অতি উচ্চাভাব এবং উচ্চ বলিয়াই সহজলভ্য নয়। সত্যাকার বিস্ময়ের স্থান অনেক উপরে—বুদ্ধি যার খুব প্রশস্ত ও উদার, মন সব সময় সতর্ক—নতুন ছবি, নতুন ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখে—সে-ই প্রকৃত বিস্ময়-রসকে ভোগ করিতে পারে। যাদের মনের মন্থ অলস, মিনামনে—পরিপূর্ণ, উদার বিস্ময়ের মত উচ্চ মনোভাব তাদের অপবিচিত থাকিয়া যায়।

বিস্ময়কে যাহারা বলিয়াছেন Mother of Philosophy তাহারা একটু কম বলেন। বিস্ময়ই আসল Philosophy, বাকীটা তাহার অর্থসজ্জিত মাত্র। তিনটার পর সুরেশ বাহির হইয়া আসিল। সে হাই তুলিয়া বলিল—কাল রাতে ছিল নাইট-ডিউটি, গোখ মোটে বোজে নি—তাই একটু গড়িয়ে নিলাম—চল, যাঠে ক্যালকাটা টিমের হকি খেলা আছে—একটু দেখে আসা যাক---

অপূর্ণ যেন সুরেশদাকে ঘুমের জগৎ অপরাধী ঠাণ্ড করিবার জন্য লজ্জিত হইল। সারারাত কাল বেচারী ঘুমায় নাই—তাহার ঘুম আসা সম্পূর্ণ

স্বাভাবিকই তো ।...

সে বলিল—আমি যাচ্ছি যাঁবো না সুরেশদা, লগজামিন আছে, পড়া তৈরী
হয় নি মোটে—আমি যাচ্ছি—ইয়ে—জোঠিমার সঙ্গে একবার দেখা করে
গেলে হতো—

সুবোধ বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—বেশ তো—এসো না--

অপু সুবোধের সঙ্গে সঙ্কুচিত ভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। সুবোধের মা গরের
মধ্যে বসিযাছিলেন সুবোধ গিয়া বলিল--এই সেই অপূর্ব মা- নিশ্চিন্দি-
পুবেব হনিকাকার ছেলে--তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে--

অপূর্ব মন্ব ধূলা লইয়া প্রণাম করিল - সুবোধের কথায় ভাবে তাহার মনে
হইল, সে যে এতক্ষণ আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে সেকথা সুরেশদা
বাড়ির মধ্যে আদৌ বলে নাই।

জোঠিমার মাথার চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে বলিয়া অপূর্ব মনে হইল।
অপুর প্রণামের উত্তরে তিনি বলিলেন, এস--এস--পাক্, পাক্--কল-
কাতায় কি কবো?

অপু ইতিপূর্বে কখনো জোঠিমার সম্মুখে কথা বলতে পারিত না। গম্ভীর
ও নারীত্ব (যেহেতু সে পরিণত পাত্রী নহে) চালচলনের জন্য জোঠিমাকে সে
ভয় কবিত। থানাডী ও অগোছালো দুবে বলিল, এই এখানে পড়ি, কলেজে
পড়ি।

জোঠিমা যেন একটা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, বলেছে পড়? মাস্ট্রিক
পাশ দাখ্যে?

—আব বছর মাস্ট্রিক পাশ কবেছি—

—তোমার বাবা কোথায়?—তোমরা তো সেই কাশী চলে গিয়েছিলে, না?

—বাবা তো নেই—তিনি তো কাশীতেই

তাবদর অপু সংক্ষেপে বলিল সব কথা। এই সময়ে পাশের ঘর হইতে
একটি বাইশ তেইশ বছরের তরুণী এ ঘরে ঢুকিতেই অপূ বলিয়া উঠিল,
অতসাদি না?

অতসী অনেক বড় হইয়াছে, তাহাকে চেনা যায় না। সে অপূকে চিনিতে
পাবিল, বলিল, অপূর্ব কখন এলে?

আব একটি মেয়ে ও-ঘর হইতে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। পনেরো বোল
বৎসর বয়স হইবে বেশ সুন্দরী, বড় বড় চোখ। কথা বলিতে বলিতে
সেদিকে চোখ পড়াতে অপূ দেখিল, মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া
আছে। বানিকটা পরে অতসী বলিল—মনি দেখে এসো তো দিদি,
কুশিকাঁটাগুলো ও-ঘরের বিছানায় ফেলে এসেছি কি না?

মেয়েটি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই আবার দুয়ারের কাছে আসিয়া
দাঁড়াইল। বলিল—না বডদি দেখলাম না তো?

জোঠিমা অল্প দুই চারটি কথার পরই কোথায় উঠিল, গেলেন। অতসী

অনেকক্ষণ কথাবার্তা করিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। তারপর সেও চলিয়া গেল। অপু ভাবিতেছিল, এবার সে উঠিবে কিনা। কেহই ঘরে নাই, এ সময় ওঠাটা কি উচিত হইবে?...ক্ষণা একবার উঠিয়া পড়িয়া গিয়াছে এখন ক্ষণা আর নাই, তবে গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। যাওয়ার কথা কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়া যাইবে?...

দোরের কাছে গিয়া সে দেখিল সেই মেয়েটি বারান্দা দিয়া ৬-ঘণ হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিকে যাইতেছে—খাব কেহ কোথাও নাই, তাহাকেই না বলিলে চলে না। উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল—এই গিয়ে—আমি যাচ্ছি: আমার আবার কাজ—

মেয়েটি তাহাব দিকে ফিরিয়া বলিল—চলে যাবেন? দাঁড়ান, পিসিমাকে ডাকি—সে যেয়েছেন?

অপু বলিল—চা তা—থাক্, ববং অন্য একদিন—

মেয়েটি বলিল—বদুন,—বদুন দাঁড়ান চা আ নি—পিসিমাকে ডাকি দাঁড়ান। কিন্তু খানিকটা পবে মেয়েটিই এক গোয়ালী চা ও একটা গ্রেটে কিছু হালুয়া আনিয়া তাহাব সামনে বসিল। অপু ক্ষণা মুখে হালুয়াটুকু গো-খাসে গিলিল। গরম চা খাইতে গিয়া প্রথম চুমুকে মুখ পড়াইয়া তেলিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল—আ নি বুঝি ওদেব বুড়ুতো ভাই? থাক্ গ্রেটটা এইখানেই—আব একটা হালুয়া আনব?

—হালুয়া?...নাঃ--ইয়ে তেমন খিদে নেই—ঠাঁ, সুপেশদাব বাবা আমার জ্যাঠামশাই হতেন, জ্ঞাতি সম্পর্ক—

এই সময় অতসা ঘরে ঢেকাতো মেয়েটি চায়েব বাটি ও গ্রেট লইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পব ঠাণ্ডাবাড়িতে বাইয়া অনেক বাত্রে সে নিজেব থাকিবাব স্থানে ফিরিয়া দেখিল আজও একজন লোক সেখানে রাত্রেব জন্য আশ্রয় লইয়াছে। ঘাঝে মাঝে এরকম আসে কাহানার লোকের দু একজন খালীম-অজন ঘাঝে মাঝে আসে ও দু-চারদিন থাকিয়া যায়। একে ছোট ঘর, থাকিবাব চুট, তাহাতে লোক বাড়িলে এইটুকু ঘরের মধ্যে তিষ্ঠানো দায় হইয়া ওঠে। রণেশ্বর কান্ড এমন মশলা যে, ঘরের বাতাসে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। অপু বসন্ত কবিতা পারে, এক ঘবে এ-ধরনের নোংরা স্বভাবের লোকের ভিড়ের শো শুইতে পাবে না, জীবনে সে তা কখনো কবে নই—ইহা তাহার অসহ্য। চাখায় বাত্রে আসিয়া নির্জনে একটু পড়াশুনা করিবে—না ইহাদের বক্তৃ-কের চোটে সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নতুন লোকটি দ্বাভারের আলু-পোস্তার আলুর চালান লইয়া আসে—হগলা ফেলার কোন মগা হইতে, অপু জানে, আরও একবার আসিয়াছিল। লোকটি বলিল, খায়ান যান ও বশায়? আবার বেরোন না-কি?

অপ, বলিল, এইখানটাতে দাঁড়িয়ে-- বেজায় গরম আজ--

একট পরে লোকটা বলিয়া উঠিল--ই্যা, ই্যা, ই্যা, বিছানাটা কি মহাশয়ের ?
আসুন, আসুন, সবিয়ে ন্যান একট,--এঃ--হঁকোর জলটা গেল গড়িয়ে পড়ে
---দুস্তোর না--

অপ বিছানা সরান্ধা পুনরায় বাহিরে আসিল। সে কি বলিবে ? এখানে
তাহার কি জোব খাটে ? উহাবাই উপরোধে পড়িয়া দয়া করিয়া থাকিতে
দিয়াছে তথ্যে। যথেষ্ট কিছু না বলিলেও অপু অল্পদিন হয়তো মনে মনে
বিশ্রান্ত হইত, কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ অনমনস্ক ছিল। বাহিরের বারান্দায় জীর্ণ
কাঠের বেলাং ধরিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল--সুরেশদাদেব
কেমন চমৎকার বাড়ি কলকাতায়। ইলেকট্রিক পাখা, আলো, ঘরগুলি কেমন
সাজানো, মেয়েটিও কেমন সুন্দর কাপড় পরে। চারটা বাড়িতে চা,
ওলখাবাব, চারিদিকে খেন লক্ষ্মীপ্রী, কিছুরই অভাব নাই।

তাহাদেরই যে কি হইয়াছে কোথায় যা আছে, একটেরে পড়িয়া,
ক'লকাতা নহবে এই বকম ছন্নছাড়া অবস্থায় সে পথে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে,
পেট পুবিয়া আহার জেটে না, পরে নাই কাপড়।

দিন তিনেক পরে জগদাত্রী পূজা। ক'লকাতায় এত উৎসব জগদাত্রী
পূজায়, তা সে জানিত না। দেশে কখনও এ পূজা কোথাও হইত না--
কোথাও দেখে নাই। গলিতে গলিতে, সবত্র উৎসবের নহবৎ বাড়িতেছে,
কত ঘুঘাবে পাশে কলাগাছ বসানো, দেবদাক্ষ পাতাব মালা টাঙানো।

কাঠের কারখানার পাশে গ'লটার মধ্যে একজন বড়লোকে বাড়িতে পূজা।
সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রিত ভ্রাতৃলোকে বা সারি বাপিয়া বাড়িটার মধ্যে ঢুকিতেছে--
অপু ভাবিল, সেও যদি যায়। ...কতকাল নিমন্ত্রণ যায় নাই। কে তাহাকে
চানিবে ?...খুব লোভও হইল, ভয়ও হইল।

অপরাজিত

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শীতকালের দিকে একদিন কলেজ ইউনিয়নে প্রণব একটা প্রবন্ধ পাঠ
করিল। ইংবেজীতে লেখা, বিষয়--'আমাদের সামাজিক সমস্যা'। বাছিয়া
বাছিয়া শক্ত ইংবেজীতে সে নানা সমস্যার উল্লেখ করিয়াছে; বিধবা-বিবাহ,
স্ত্রীশিক্ষা, প্রণয়, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। সে প্রত্যেক সমস্যাটি নিজের দিক
হইতে দেখিতে চাহিয়াছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সনাতন প্রথা স্বপক্ষেই
মত দিয়াছে। প্রণবের উচ্চারণ ও বলিবাব ভক্তি খুব ভাল, যুক্তির ওজন
অনুসারে সে কখনও ভুল হাতে ঘুসি পাকাইয়া, কখনও মুঠাদারা বাতাস
আঁকড়াইয়া, কখনও বা সম্মুখের টোবলে সশব্দে চাপর মাড়িয়া বাল্য
বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও স্ত্রীশিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিয়া দিল। প্রণবের
বন্ধুদের ঘন ঘন করতালিতে প্রতিপক্ষের কানে ভাল লাগিবার উপক্রম

হইল।

অপর পক্ষে উঠিল মন্থ—সেই যে-ছেলেটি পূর্বে সেন্ট জেভিয়ারে পড়িত :
লাটিন জানে বলিয়া ক্লাসে সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে, তাহাব সামনে
কেহ ভয়ে ইংরেজী বলে না। পাছে ইংরেজী বুল হইলে তাহার বিদ্রূপ
শুনিতো হয়। সাহেবদের চাল-চলন, ডিনারের এটিকেট, আচাব-বাবহার
সম্বন্ধে ক্লাসের মধ্যে সে অথবাটি—তাহার উপর কারুর কথা খাটে না।
ক্লাসের এক হতভাগা ছাত্র সাহেবপাড়ার কোন বেস্তোবাঁতে তাহাব সহিত
বাইতে গিয়া ডান হাতে কাঁটা ধরিবার অপবাধে এক সপ্তাহকাল ক্লাসে
সকলের সামনে মন্থর টিঁকারি সহ্য কবে। মন্থর ইংরেজী আরও চোখা,
কম আড্ডা, উচ্চারণও সাহেবী ধরনের! কিন্তু একেই তাহার উপর ক্লাসের
অনেক রাগ আছে; এদিকে আবার সে বিদেশী বুলি খাণ্ডাইয়া সনাতন
হিন্দুধর্মের চিবাচরিত প্রথাব নিন্দাবাদ কবিতোছে; ইহাতে একদল ছেলে
খুব চটিয়া উঠিল—চারিদিক হইতে ‘shame’, ‘shame’,—‘withdraw,
withdraw’, রব উঠিল—তাহার নিজের বন্ধুদল প্রশংসাসূচক হাততালি
দিতে লাগিল—ফলে এত গোলমালের সৃষ্টি হইয়া উঠিল যে, মন্থর বক্তাব
শেষের দিকে কি বলিল সভাব কেহই তাহাব একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।
প্রণবের দলই ভারী। তাহাবা প্রবকে আকাশে তুলিল, মন্থরকে
স্বধর্মবিরোধী নাস্তিক বলিয়া গালি দিল, সে যে হিন্দুশাস্ত্র একছত্রও না পড়িয়া
কোন স্পর্ধায় বংশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় কথা ব’লিতে সাহস কবিল,
তাহাতে কেহ কেহ আশ্চর্য হইয়া গেল। লাতিন ভাষায় সহিত তাহাব
পরিচয়ের সত্যতা লইয়াও দু’একজন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ কবিল (লাটিন জানে
বলিয়া অনেকের রাগ ছিল তাহাব উপর)। একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,
—প্রতিপক্ষের বক্তার সংস্কৃতে এমন অধিকার, যদি তাহার লাতিন ভাষাব
অধিকারও সেই ধরনের—

আক্রমণ ক্রমেই ব্যক্তিগত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সভাপতি—অর্থনীতির
অধ্যাপক মিঃ দে বলিয়া উঠিলেন—‘Come, come, Manmatha has
never said that he is a Seneca or a Lucretius—have the
goodness to come to the point.’

অপু এই প্রথম এ-রকম ধরনের সভায় যোগ দিল—স্কুলে এ সব ছিল না,
যদিও হেডমাস্টার প্রতিবারই হইবার আশ্বাস দিতেন। এখানে এদিনকার
বাপারটা তাহার কাছে নিতান্ত হৃদ্যাস্পদ ঠেকিল। ওসব মাথুলি কথা
মাথুলিভাবে বলিয়া লাভ কি? সামনের অধিবেশনে সে নিজে একটা প্রবন্ধ
পড়িবে। সে দেখাইয়া দিবে—ওসব একঘেয়ে মাথুলি বুলি না খাণ্ডাইয়া
কি ভাবে প্রবন্ধ লেখা যায়। একেবারে নূতন এমন বিষয় লইয়া সে
লিখিবে, যাহা লইয়া কখনও কেহ আলোচনা করে নাই।

এক সপ্তাহ খাটিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। নাম—‘নূতনের আহ্বান’

সকল বিষয়ে পূর্বাভানকে ছাটিয়া একেবারে বাদ। কি আচার-ব্যবহার, কি সাহিত্য, কি দেবিবার ভঙ্গি—সব বিষয়েই নূতনকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অল্প মনে মনে অনুভব করে, তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা খুব বড়, খুব সুন্দর। তাহার উনিশ বৎসরের জীবনের প্রতিদিনের সুখঃখ, পণেব যে-ছেলেটি অসহায় ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, কবে এক অপরাহ্নের স্নান খালেয় যে পাখিটা তাহাদের দেশের বনের ধারে বসিয়া দোল খাইত, দিদিব চোখের মমতা-ভরা দৃষ্টি লীলার বন্ধুত্ব, রাণেদিদি, নির্মলা, দেবব্রত, বৌদদীপ্ত নীলাকাশ, জ্যোৎস্না বাহি—নানা কল্পনাব টুকরা, কত কি আশা-নিরাশার লুকোচুরি—সবসুদ্ধ লইয়া এই উনিশটি বৎসর—ইহা তাহার রদা যায় নাই—কোটি কোটি যোজন দূর শূন্যপার হইতে সূর্যের আলো যেমন নিঃশব্দ জ্যোতিব অবদানে শীর্ণ শিশু-চারাকে পত্রপুষ্পফলে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে, এই উনিশ বৎসরের জীবনের মধ্যে দিয়া শাগ্রত অনন্ত তেমনি ওব প্রবর্তমান তরুণ প্রাণে তাহার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছে—চান্নাককার তৃণভূমির গন্ধে, ডালে ডালে সোনার সিঁহ-মাখানো অপরূপ সন্ধ্যায়; উদার কল্পনায় ভ্রমস্থ নিঃশব্দ জীবনমায়ায়।—সে একটা অপ্রব শক্তি অনুভব কবে নিজেব মধ্যে—এটা যেন বাহিরে প্রকাশ করিবার জিনিস—মনে মনে ধব্বিয়া বাখাব নয়। কোথায় থাকিবে প্রব আর মন্থন ? সবাই মাঝুলি কদা বলে ? সকল বিষয়ে এই মাঝুলি ধরন যেন তাহাদের দেশের একচেটে হইয়া উঠিতেছে—যেমন গকডেব মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া সারা পৃথিবীটার বস ভাঙাব গ্রাস কবিতো ছুটিতেছে, সে তীব্র আগ্রহ-ভরা পিণিসাত নবীন মনের সকল কল্পনা ত'হাতে তৃপ্ত হয় না। ইহারই বিরুদ্ধে, ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে, সব ওলট পালট করিয়া দিবাব নিমিত্ত সম্মবন্ধ হইতে হইবে তাহাদিগকে এবং সে-ই হইবে তাহার অগ্রাণী।

দিন কতক পরিয়া অল্প ক্রাসে ছেলেদের মধ্যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধরনে গব কব্বিয়া বেড়াইল যে, এমন প্রবন্ধ পড়িবে যাহা কেহ কোনদিন লিগিবাব কল্পনা কবে নাই, কেহ কখনও শোনে নাই ইত্যাদি। লজিকের চোকগা-প্রোকেদাব ইউনিয়নের সেক্রেটারী তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন,—কি বলে নোটিশ দেবো তোমাব প্রবন্ধেব হে, বিষয়টা কি ?

পবে নাম শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ। নামটা বেশ দিলেছে—*but why not* ‘পূর্বাভানের বাণী’ ?—অপু হাসিমুখে চুপ করিয়া বহিল। নির্দিষ্ট দিনে যদিও ভাইস প্রিন্সিপালের সভাপতি হইবার কথা নোটিশে ছিল, তিনি কার্যবশতঃ আসিতে পাবিলেন না। ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে সভাপতির আসনে বসিতে সকলে অনুরোধ করিল। ভিড খুব হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় অনেক লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু করা অপূর এই প্রথম। প্রথমটা তাহার পা কাঁপিল, কিন্তু ক্রমে বেশ সহজ হইয়া

আসিল। প্রবন্ধ খুব সতেজ—এ বয়সে যাহা দোষ থাকে—উচ্চাস, অনভিজ্ঞ আইডিয়ালিজম, ভাল মন্দ নিবিশেষে পুরাতনকে ছাটিয়া ফেলিবার দৃষ্ট—বেপরোয়া সমালোচনা, তাহার প্রবন্ধে কোনটাই বাদ যায় নাই। প্রবন্ধ পড়িবার পরে খুব হৈ-ঠৈ হইল। খুব তীব্র সমালোচনা হইল। প্রতি-পক্ষ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। কিন্তু অপু দেখিল অধিকাংশ সমালোচকই ফাঁকা আওয়াজ করিতেছে। সে যাহা লইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও কিছু অভিজ্ঞতাও নাই, বলিবার বিষয়ও নাই, তাহার তাহাকে মন্থর শ্রেণীতে ফেলিয়া দেশোদ্ভোধী, সমাজদ্ভোধী বলিয়া গালাগালি দিতে শুরু করিয়াছে।

অপু মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। হয়ত সে আরও পরিস্ফুট করিয়া লিখিলে ভাল করিত। জিনিসটা কি পবিত্র হয় নাই? এত বড় সভার মধ্যে তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু'একজন বন্ধু ছাড়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে,—টিটকারি গালাগালির অংশের জন্য মন্থরকে হিংসা করার তাহার কিছুই নাই। শেষে সভাপতি তাহাকে প্রতিবাদেব উত্তর দিবার অধিকার দেওয়াতে সে উঠিয়া ব্যাপারটা আরও পুলিশা বলিবার চেষ্টা করিল। দু'চারজন সমালোচক—যাহাদের প্রতিবাদ সে বসিয়া নোট করিয়া লইয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তর দিতে গিয়া যুক্তিব বেই হাবাইয়া ফেলিল। অপু পক্ষ এই অবসরে আর এক পালা হাসিয়া লইতে ছাড়িল না। অপু রাগিয়া গিয়াছিল এইবার যুক্তির পথ না ধরিয়া উচ্চাসের পথ ধরিল। সকলকে সংকৌণমনা বলিয়া গালি দিল, একটা বিদ্রোহক গল্প বলিয়া অবশেষে টেবিলের উপর একটা কিল মারিয়া এমাস'নের একটা কবিতা আরাগ করিতে করিতে বক্তৃতার উপসংহার করিল।

ছেলেদের দল খুব গোলমাল করিতে করিতে হলের বাহির হইয়া গেল। বেশীর ভাগ ছেলে তাহাকে খা-তা বলিতেছিল—নিচক বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা ছাড়া তাহার প্রবন্ধে যে অন্য কিছুই নহে ইহাও অনেকের মুখে শোনা যাইতেছে। সে শেষের দিকে এমাস'নের এই কবিতাটি আরাগ করিয়াছিল—

I am the owner of the sphere

Of the seven star and the solar year.

তাহাতেই অনেকে তাহাকে দাম্ভিক ঠাওরাইয়া নানাক্রম বিদ্রূপ ও টিটকারি দিতেও ছাড়িল না। কিন্তু অপু ও-কবিতাটায় নিজেই আদৌ উদ্বেগ করে নাই, যদিও তাহার নিজেকে জাহির করার স্পৃহাও কিছু কম ছিল না। বা বিখ্যা গর্ব প্রকাশে সে ক্লাসের কাহারও অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী।

তাহার নিজের দলের কেহ কেহ তাহাকে ঘিরিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিল। ভিড একটু কমিয়া গেলে সে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলেজ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, গেটের কাছে একটি সতেরো আঠারো বছরের লাজুক প্রকৃতির ছেলে তাহাকে বলিল—একটুখানি দাঁড়াবেন?

অপু ছেলেটিকে চেনে না, কখনও দেখে নাই। একহারা, বেশ সুশ্রী, পাতলা
সিঙ্কের জামা গায়ে, পায়ে জরির নাগরা জুতা।

ছেলেটি কৃষ্টিতভাবে বলিল,—আপনার প্রবন্ধটা আমায় একটু পড়তে দেবেন ?
কাল আবার আপনাকে ফেরত দেব।

অপুর আহত আশ্রয়মান পুনরায় হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। খাতাখানা ছেলে-
টির হাতে দিয়া বলিল,—দেখবেন কাইগুলি, যেন হারিয়ে না যায়—আপনি
বুঝি—সায়েন ?—ও।

পুনর্দিন কলেজ বসিবার সময়ে ছেলেটি গেটেই দাঁড়াইয়াছিল—অপুর হাতে
খাতাখানা ফিরাইয়া দিয়া ছোট একটি নমস্কার করিয়াই ভিডের মধ্যে কোথায়
চলিয়া গেল। অন্তরমনস্ক ভাবে ক্লাসে বসিয়া অপু খাতাখানা উন্টাইতেছিল,
একখানা কি কাগজ খাতাখানার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইলেকট্রিক পাখার
হাওয়ার খানিকটা উড়িয়া গেল। পাশের ছেলেটি দেখানা কুড়াইয়া তাহার
হাতে দিলে সে পড়িয়া দেবিল, পেঙ্গিলে লেখা একটি কবিতা—তাহাকে
উদ্দেশ্য করিয়া :—

শ্রীযুগ অপবক্শমাব বায়

করকমলেশু—

বাঙ্গালী সমাজ যেন পঙ্কময় বন্ধ ওলাশয়

নাহি আলো স্নাত্তাভবা, বহে হেথা বায়ু বিষময়

জীবন-কোবকগুলি, অকালে শুকায় পড়ে বরি,

বাচাবাব নাহি কেহ, সকলেই আছে যেন মরি।

নাহি চিত্রা, নাহি বৃক্ষ, নাহি ইচ্ছা নাহি উচ্চ আশা,

দুঃখঃখ হান এক ওড়পিণ্ড, নাহি মুখে ভাষা।

এব মাঝে দেখি যবে কোনো মুখ উজ্জ্বল সরস,

নয়নে আশাব দৃষ্টি, ওষ্ঠপ্রান্তে জীবন ইবং—

অঙ্গের ললাটে স্তোত্র প্রতিভাব সুন্দর বিকাশ,

স্থির দৃঢ় কণ্ঠসবে ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ প্রকাশ,

সদয়ে হৃদয় পূবে, আনন্দ ও আশা ভাগে প্রাণে,

সম্মানিতে চাহে হিয়া বিমল প্রীতিব অবাদানে।

তাই এই ক্ষণ-ভাষা ছন্দে গাখি দীন উপহার

লজ্জাহীন অসঙ্কোচে অনিয়ার্থি সম্মুখে তোমাব,

উচ্চলক্ষ্য, উচ্চ আশা বাঙ্গালায় এনে দাও বীর

সুখোদগা সম্মান যে বে তোরা সবে স্বপ্ন জননীর।

গুণযুগ

শ্রী—

ফার্স্ট ইয়ার, সায়েন্স, দেক্সন বি ;

অপু বিন্মিত হইল। ' অগ্রাহের ও গুণসূকোর সহিত আর একবার পড়িল—

তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একে চান্ন তো
অগ্নে পায়,—একেই নিজের কথা পরকে জাঁক করিয়া বেড়াইতে সে আত্মীয়,
তাহার উপর তাহাবই উদ্দেশ্যে লিখিত এক অপরিচিত ছ'এর এই পত্র পাইয়া
আনন্দে ও বিশ্বাসে সে ভুলিয়া গেল যে, ক্রাসে স্বয়ং মিঃ বসু ইতিহাসের বহুতর
কোন এক বোমান সমাটের অমানুষিক ঔদরিকতাব কাহিনী সাধুভাবে বাল-
তেছেন। সে পাশেব ছেলেকে ডাকিয়া পত্রখানা দেখাইতে যাইতেই জানকী
খোঁচা দিয়া বলিল,—এই। সি. সি. বি. এখনি বকে ঝুঁবে—তোম দিকে
তাকাচ্ছে, সামনে চা—এই।

আঃ—কতক্ষণে সি. সি. বি.-ব এই বাজে বকুনি শেষ হইবে।—বাহিবে গিয়া
সকলকে চিঠিখানা দেখাইতে পাবিলে যে সে বাচ।—ছেলেটিকেও খুঁজিয়া
বাহিব করিতে হইবে।

ছুটির পর গেটের কাছেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হইল। বোধ হয় সে তাহাবই
অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কলেজের মতো এটকপ একজন মুখ ভক্ত পাইয়া
অপু মনে মনে গব অনুভব করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই তাহাব পুরাতন মুখচোরা
রোগ। তবে তাহাব পক্ষে একটু সাহসের বিষয় এই দাঁড়াইল যে, ছেলেটি
তাহার অপেক্ষাও লাড়ুক। অপু গিয়া তাহাব সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ
ইতস্ততঃ করিয়া তাহাব হাত ধবিল। কিছুক্ষণ কাবারা হইল। কেহই
কাগজে লেখা পড়টার কোনও উল্লেখ করিল না, যদিও দুজনেই বুঝিল
যে, তাহাদেব আলাপের মূলে কালকের সেই চিঠিখানা। কিছুক্ষণ
পর ছেলেটি বলিল,—চলুন কোথাও বেড়াইতে যাই কলকাতার বাইরে
কোথাও মাঠে—শহরের মধ্যে তাপ ধরে—কোথাও কোথাও দেখবার জো
নেই—

কথাটা শুনিয়াই অপু ব মনে হইল, এ ছেলেটি তো সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির।
ঘাস না দেখিয়া কন্দি হয় এমন কথা তো আজ পায় একবৎসর কলিকাতার
অভিজ্ঞতায় কলেজের কোন বন্ধুর মুখে শোনে নাই।

সার্ভে দেকশনের ট্রেনে গোটাচারেক টেশন ধরে তাহাব নাগিল। অপু
কখনও এদিকে আসে নাই। ফাঁকা মাঠ, কেয়া রোড, মাঝে মাঝে হোগলা
বন। সফ্র মেয়ো পপ পিয়া ওজনে তাটিয়া চলিতেছিল—গোনের অন্য আদ
ঘটার আলাপেই ওজনের মধ্যে একটা নিবিড় পনিচয় জন্মিয়া উঠিল। মাঠের
মধ্যে একটা গাছের তলয় ঘাসের উপরে ওজনে গিয়া বসিল।

ছেলেটি নিজের ইতিহাস বলিতেছিল—

হাজাপিরাগ ভেলায় তাহাদেব এক অশ্রম খনি ছিল, ছেলেবেলায় সে সেখা
নেই মানুষ। জায়গাটার নাম বডবনী, চারিদিকে পাহাড় খাব শাল-পলাশের
বন, কিছু দূর দারুকেশ্বর নদী। নিকটে পাহাড়ের গায়ে একটা খণ্ডা ১০০
পডন্ত বেলায় শালবনের পিছনে আকাশটা কত কি রঙে রঞ্জিত হইত—প্রথম
বৈশাখে শাল-কুসুমের ঘন সুগন্ধ উপরে রৌদ্রকে যাতাইত, পলাশবনে

বসন্তের দিনে যেন ডালে ডালে আবতিব পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিত—সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বাঘেরা আসিত ঝণাঝণা জল পান করিতে—বাংলো হইতে একটু দূরে বালির উপর কতদিন সকালে বড বড বাঘের পায়েব থাবাব দাগ দেখা গিয়াছে।

সেখানকার জ্যোৎস্না বাঁধ। সে বাঁধিব বর্ণনা নাই, ভাষা যোগায় না। স্বর্গ যেন দুবৈব নৈশকুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণীর ওপারে—চায়াহীন, সীমান্তহীন, অনন্তবর্ণ-কণা জ্যোৎস্না যেন দিকচক্রবালে গ্রাহ্যই ইচ্ছিত দিত।

এক-আমদিন নয়, শেষবৈব দশটি বৎসর সেখানে কাটিয়াছে। সে অন্য জগৎ, পৃথিবীর মুণ্ড পদাৰ্থতাব কণ সেখানে চোখে কি মায়া-অঙ্কন মাখাইয়া দিয়াছে—কোথাও খাব ভাল লাগে না। অশ্রুব খনিত লোকসান হইতে লাগিল, খনি অপবে কিনিয়া লইল, গ্রাহ্য পর হইতেই কলিকাতায়। মন হাঁপাইয়া উঠে—পাচান পাখিব মত ছটফট করে। বালোর সে অপব আনন্দ মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

অপূ বসন্তের কদা কাহাবও মুখে এ পদন্তু শোনে নাই—এ যে তাহানই অন্ত-বৈব কদা পতিমনি। গাছপালা, নদী, মাঠ ভালোবাসে বলিয়া দেওয়ান-পূবে তাহাকে সবাই বলিত পংগল। একব'ন মাদমাসেন শেষে পথে কোন গাছেব গায়ে আলোকলতা দেখিয়া সমাপ্তিকে বলিয়াছিল,—কেমন সুন্দর। দেশন দেশন বমাপ্তি—

সমাপ্তি মুকন্দিয়ানাব মূবে বলিয়াছিল মনে আছে—ওসব খাব মাধ্যম চক্রে তার পদকলটি একেবারে ঝনঝন হয়ে গেছে

পদক লটা কি জন্য যে ঝনঝন হইয়া গিয়াছে, একথা সে বৃত্তিতে পাবে নাই—কিন্তু ভাবিয়াছিল সমাপ্তিদা মূলের মধ্যে ভাল ছেলে, খস্ট ক্লাসেব ছাত্র, অবশ্যই গ্রাহ্য অপেক্ষা ভাল জানে। এ পদন্তু কাহাবও নিকট হইতেই সে ইহাব সময় পায় নাই, এই এতদিন পরে ইহাকে ছাড়া তাহা হইলে তাহাব মত লোকও আছে।...সে একেবারে সস্তিছাড়া নয়।

খনিব বলিল—দেশন, এই এত ছেলে কলেজে পড়ে, অনেকেব সঙ্গে আলোপ করে দেখেছি—ভাল লাগে না—dull unimaginative mind. পড়তে হয় পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ কোন বিষয়ে কোহুলও নেই, জানবাব একটা সত্যিকাব আগ্রহও নেই। তাছাড়া, এত ছোট কদা নিষে থাকে যে মন মোটে—মানে, কেমন যেন,—যেন মাটির উপর hop করে বেড়ায়। প্রথম সেদিন অপ্নাব কদা শুনে মনে হল এই একজন অন্য সবনৈব, এ দলেব নয়।

অপূ মত হাসিয়া চুপ করিয়া বহিল। এ সব সে-ও নিজেব মনৈব মদো অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিয়াছে, অপবেব সঙ্গে নিজেব এ পার্থক্য মাঝে মাঝে তাহাব কাছে ধরা পড়িলেও সে নিজেব সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয় বলিয়া এ জিনিসটা বৃত্তিতে পারিত না। তাহা ছাড়া অপূব প্রকৃতি আবও শাস্ত, উগ্রতাশূন্য ও উদার,—পরের তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণেব ধাতই নাই তাহাব একেবারে!

—কিন্তু তাহাৰ একটা মহৎ দোষ এই যে, নিজৰ বিষয়ে কথা একবাৰ পাড়িলে সে আৰু ছাড়িতে চায় না—অপৰেও যে নিজেদেৰ সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা কবিতো পাবে, বয়সেৰ অনাবিল আগ্নস্তম্ভিতা ও আগ্ন-প্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে তাহকে অনু কবিয়া বাখে । সুতৰাং সে নিজেৰ বিষয়ে একটোনা কথা বলিয়া যায়—নিজেৰ ইচ্ছা, অশা-আকাঙ্ক্ষা, নিজেৰ ভালমন্দ লাগা, নিজেৰ পড়াশুনা । নিজেৰ কোন দুঃখহৃদ শাপ কথা বলে না, কোন বাপা বেদনাৰ কথা তোলো না—জলৈৰ উপকাৰ দাংগেৰ মত সে-সব কথা তাহাৰ মনে মোটেই স্থান পায় না—অনকোবা তাজা নবীন চোখেৰ দৃষ্টি শুপুই সম্মু-দেৰ দিকে, সম্মুখেৰ বহুদূৰ দিক্‌চক্ৰবাল বেখাপে ওপাবে—আনন্দ ও আশায় ভবা এক অশ্রু বাছোৰ দিকে ।

সন্ধ্যাৰ পৰে বাসায় ফিৰিয়া চিম্‌নি-ভাঙা পুনো হিহুসেৰ লগ্ননটা অলিয়া সে পকেট হইতে অনিলেৰ চিঠিখানা বহিৰ কবিয়া আৰাৰ পড়িতে বসিল ।

আমায় সে ভাল বলে, সে আমাৰ পৰম বন্ধু, আমাৰ মহৎ উপকাৰ কৰে, আমাৰ আত্মপ্ৰত্যয়কে সুপ্ৰতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য কৰে, আমাৰ মনেৰ গভীৰ গোপন কোন লুকানো বস্তুকে দিনেৰ আলোয় মুখ দেখাইতে সাহস দেয় ।

পড়িতে পড়িতে পাশেৰ বিছানাৰ দিকে চাহিয়া মনে পড়ে—আজ আৰাৰ তাহাৰ ঘৰেৰ অপর লোকটিৰ এক আগ্নায় কাচডাশাড়া হইতে আদিয়াছে এবং এই ঘৰেই শুইবে । সে আগ্নায়টিৰ বয়স বছৰ ত্ৰিশেক হইবে । কাচগা-পাড়া লোকো অফিসে চাকরি কৰে, বেশী লেখা-ডা না জানিলেও অনবণ্ড যাতা ইংবেজী বলে, হৃদয় সিগাৰেট খায়, অত্যন্ত বকে, অকাৰণে গায়ে পড়িয়া ভাই ভাই বলিয়া কথা বলে, তাহাৰ মনো বাৰো আনা থিয়েটাৰেৰ গল্প, অথক স্নাকড্ৰেস-তাৰাবাঙ্গি-এৰ ভূমিকায় খে-রকম অভিনয় কৰে, অমুক থিয়েটাৰেৰ বিপুমুখীৰ মত গান-বিশেষ ক’ৰে ‘হীৰাৰ ঢুল’ গ্ৰহসনে বেদেদীৰ ভূমিকায়, ‘নয়ন জলৈৰ কাঁদ তেছি’ নামক বেই বিখ্যাত গান-খানি সে খেমন গায়, তেমন আৰ কোথাৰ, কে গাহিতে পাৰে?—তিনি এজন্য বাজি কেলিতে প্ৰস্তুত আছেন ।

এসব কথা অপর ভাল লাগে না, থিয়েটাৰেৰ কথা শুনিতে তাহাৰ কোনও কৌতূহল হয় না । এ লোকটিৰ চেয়ে আনুৰ বাবসাদাৰটি অনেক ভাল । সে পাডাগান্নেৰ লোক, অপেক্ষাকৃত সরল প্ৰকৃতিৰ, আৰ এও বাজে কথা বলে না ; অন্তত তাহাৰ সঙ্গে তো নহুই । এ ব্যক্তিটিৰ যত গল্প তাহাৰ সঙ্গে ।

মনে মনে ভাবে—একটু ইচ্ছে কৰে—বেশ একা একটি ঘৰ, একা বসে পড়া-শুনো কৰি, টেবিল থাকে একটা, বেশ ফুল কিনে এনে গ্লাসেৰ জল দিয়ে সাজিয়ে রাখে । এ ঘৰটোৰ না আছে জানলা, পড়তে পড়তে একটু খোলা আকাশ দেখবাৰ জো নাই, তামাকের গুল রোজ পরিষ্কাৰ কৰি, আৰ রোজ ওয়া এই রকম নোংরা কৰে—মা ওয়াড ক’ৰে দিলেছিল, ছিঁড়ে গিয়েচে, ইকি বিজী তেল চিটচিটে বালিশটা হয়েছে—! এবাৰ হাতে পল্লা হলে একটা

ওড়াই করাবো।

অনিলের সঙ্গে পরদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেল। চাঁদপাল ঘাটে, প্রিন্সেস্‌ ঘাটে বড় বড় জাহাজ নোঙর করিয়া আছে, অপু পড়িয়া দেখিল : কোনটার নাম 'বম্বে', কোনটার নাম 'ইদজু মারু'। সেদিন বৈকালে নতুন পরনের রং-করা একখানা বড় জাহাজ দেখিয়াছিল, নাম লেখা আছে 'গেনার-পোয়া', অনিল বলিল, আমেরিকান মাল জাহাজ—জাপানের পথে আমেরিকা যায়। অপু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া জাহাজখানা দেখিল। নীল পোশাক-পর্যায় একটা লম্বা রেলিং দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডুবের মধ্যে কি দেখিতেছে। লোকটি কি সুখী। কত দেশ বিদেশ বেড়ায়, কত সমুদ্রে পাড়ি দেয়, চীন সমুদ্রে টাইফুনে পড়িয়াছে, সিনাং-এর নাবিকেলকুঞ্জের ছায়ায় কত ভ্রমুর ক্রাটাইয়াছে, কত ঝড়ফিঁব বাত্রে এই সকল রেলিং দিয়া দাঁড়াইয়া বাত্যা-ফুক, উগ্রাল, উগ্র ও মহাসমুদ্রের রূপ দেখিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা বোঝে কি? কিছুই না। ও কি দুব হইতে ফুটিয়া মা দেখিয়া আনুহাণ হইয়াছে? দক্ষিণ আমেরিকার কোনও বন্দরে নামিয়া পথের ধারে কি গাছপালা আছে তাহা নির্বিকট মনে সাগরে পবীক্স করিয়া দেখিয়াছে? হয়ত জাপানের পথের ধারে বাংলা দেশের পরিচিত কোনও ফুল আছে, ও লোকটি জানে না, হয়ত ক্যালিফোর্নিয়ার শহরবন্দর হইতে পূর্বে নির্জন Sierra-র ঢালুতে বন-ঝেঁঝে নানা অচেনা ফুলের সঙ্গে তাহাদেব দেশের সজ্জামণি ফুলও ফুটিয়া থাকে, ও লোকটা কি কখনও সেখানে কৃষান্তের রাঙা আলোয় বড় একখণ্ড পাথরের উপরে আপন মনে বসিয়া নীল আকাশের দিকে চ'হিয়া থাকি-য়াছে?

অথচ ও লোকটাই অর্ধে ঘটিতেছে দেশ বিদেশে ভ্রম, সমুদ্রে-সমুদ্রে বেড়ানো—বাহ্যে চোখ নাই, দোহাতে জানে না : আর সে যে শৈশব হইতে শত সান পুখিয়া বাসিয়া আসিতেছে মনেব কোণে, তাহাব কি কিছুই হইবে না?...কবে সে যাইবে।...ক'লকাতাব শীতের বাত্রেব এ ধোঁয়া তাহার অসঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। চোখ অ'লা কবে, নিদ্রাস বন্ধ হইয়া আসে, কিছু দেখা যায় না, মন তাহাব একেবাবে পাগল হইয়া উঠে—এ এক অপ্রত্যাশিত উপদ্রব। কে জানিত শীতকালে কলিকাতাব এ চেহারা হয়।

ওই লোকটার মত জাহাজের খালাসী হইতে পারিলেও সুখ ছিল।

Ship ahoy।...কোথাকাব জাহাজ?...

কলিকাতা হইতে পোট মস'বি, অট্রেলেলিয়া

ওটা কি উঁচু মত দূরে?

প্রবালের বড় বাধ—The Great Bar

এই সমুদ্রের ঠিক এই স্থানে, প্রাচীন নাবিক টাস্মান ঘোব হুফানে পড়িয়া মাস্তুল ভাঙা পালার্ডেডা ডুবু ডুবু অবস্থায় অকূলে ভাসিতে ভাসিতে বারো দিনের দিন কূল দেখিতে পান—সেইটাই—সেকালে ভ্যান ডিয়েন্সল্যাণ্ড,

বর্তমানে টাস্‌মেনিয়া।...কেমন দূরে নীল চক্রবালরেখা।...উড্ডস্ত সিঙ্ক-
শকুনদলের মাতামাতি, প্রবালের বাঁদের উপর বড় বড় চেউয়ের সবেগে আছি-
ডাইয়া পড়ার গন্তীব আওয়াজ।

উপকূলবেষ্ণর অনেক পিছনে যে পাহাড়টা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওটা
হয়ত জলহীন দিক-দিশাহীন ধূ-ধূ নিজন মরুর মধ্যে...তুই বালি আর
ভকনা বাবুল গাছের বন,...শত শত ক্রোশ দূরে ওর অজানা অগিতাকায়
লুকানো আছে সোনার খনি, কালো ওপ্যালের খনি...এই খবর, অলপ, মরু-
রোদ্রে খনির সন্ধানে বাহির হইয়া কত লোক ওদিকে গিয়াছিল আর ফেরে
নাই, মরুদেশের নানা স্থানে তাহাদের হাড়গুলো বোঁদ্রে রক্ষিতে ক্রমে সাদা
হওয়া আসিল।

অনিল বলিল, চলুন, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখে
আব কি হবে?...

অপু সমুদ্র-সংক্রান্ত বহু বই কলেজ-লাইব্রেরী হইতে পড়িয়া ফেলিয়াছে।
কেমন একটা নেশা, কখনও কোন ছাত্র যাহা পড়ে না, এমন সব বই। বহু
প্রাচীন নাটক ও তাহাদের ওলখাত্রার রূপান্তর, নানা দেশ আবিষ্কারের কথা,
সিবাফ্রিয়ান কাবট, এরিক্সন, কটেজ ও পিজারো কত কমেটিকো ও পেরু
বিজয়ের কথা। দুর্ধ্ব স্পেনীয় বার পিজারো এক্সপ্লোর জঙ্গলে ক্রমাব
পাহাড়ের অনুসন্ধানে গিয়া কি করিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া বেঘোনে
অনাহারে সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল—আরও কত কি।

পরদিন কলেজ পালাহারা ভাঙনে ওপুববেলা দ্রাও বোঁদের সমস্ত স্ট্রামার
কোম্পানীর অফিসগুলি ধুঁকিয়া বেড়াইল। প্রথমে ‘পি-এণ্ড-ও’। টিফিনের
সময় কেরানীবাবুরা নীচের জলখাবার ঘরে বসিয়া চা বাইতেছেন, কেহ
বিডি টানিতেছেন। ‘অপু পিছনে রহিল, অনিল আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা
কবিল,—আজ্ঞে, আমরা জাহাজে চাকরি খুঁজছি, এখানে খালি আছে
জানেন?

একজন টাক-পড়া রোগা চেহারার বাবু বলিলেন—চাকরি?—জাহাজে
...কোন জাহাজে?

—যে কোন জাহাজে—

অপুর বুক টেব্রেজনার ও কোঁতুলে টিপ্ টিপ্ করিতেছিল, কি বুঝি হয়।
বাবুটি বলিলেন, জাহাজের চাকরিতে তোমাদের চলবে না হে ছোকরা,
—ছাড়া, একবার ওপরে মেরিন্‌ মাস্টারের ঘরে খোঁজ করো।

কিছুই হইল না। ‘বি-আই-এস্-এন্’ তথৈবচ। ‘নিপন্-ইউশেন কাইশা’ও
তাই। টার্নার মরিসনের ফ্রিসে তাহাদের সহিত কেহ কথাও কহিল না।
বড় বড় বাড়ি, সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা-নামা করিতে করিতে শীতকালেও ঘাম
দেখা দিল। অবশেষে মরীয়া হইয়া অপু গ্লাডস্টোন ওয়াইলির ফ্রিসে চার-
তলায় উঠিয়া মেরিন্‌ মাস্টারের কাষরায় চুকিয়া পড়িল। খুব দীর্ঘদেহ অত

বড গৌফ সে কখনও কাহারও দেখে নাই। সাহেব বিরক্ত হইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কাহাকে ডাক দিল। অপূর কথা কানেও তুলিল না। একজন প্রৌঢ় বয়সের বাঙালীবাবু ঘরে ঢুকিয়া ইহাদের দোখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—এ ঘরে কি? এসো, এসো, বাইরে এসো।

বাহিরে গিয়া অনিলের মুখে আদিবাব উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, কেন হে ছোকরা? বাড়ি থেকে রাগ করে পালাচ্ছ?

অনিল বলিল,—না, রাগ করে কেন পালাব?

—রাগ করে পালাচ্ছ না তো এ নতি হল কেন? জাহাজে চাকরি খুঁজছে—কোন চাকরি হবে জানো? খালাসীর চাকরি... এক বছরের এগ্রিমেন্টে জাহাজে উঠতে হবে। বাঙালীর খাওয়া জাহাজে পাবে না... কন্টের একশেষ হবে, গোয়া লঙ্করগুলো অত্যন্ত বদমায়েস, তোমাদের সঙ্গে বনবে না। আরও নানা কন্ট—স্টোকারের কাজ পাবে, কয়লা দিতে দিতে জান হয়রান হবে—সে সব কি তোমাদের কাজ?

—এখন কোনও জাহাজ ছাড়ছে নাকি?

—জাহাজ তো ছাড়ছে ‘গোলকুণ্ডা’—আর সাতদিন পরে মঙ্গলবারে ছাড়বে মাল জাহাজ—কলম্বো হয়ে ভারবান যাবে—

তখনই মহা পীড়ণাভি শুরু করিল। তাহাদের কোনও কন্ট হইবে না, কন্ট করা তাহাদের অভ্যাস আছে। দয়া করিয়া তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করেন। অপূ প্রায় কঁদ কঁদ হইয়া বলিল—তা হোক, দিন আপনি জোগাড় করে—ওসব কিছু কন্ট না—দিন আপনি—গোয়া লঙ্করে কি করবে আমাদের কয়লা খুব দিতে পারবে—

কেবানীবাবুটি হাসিয়া বলিলেন,—এক ছেলেখেলা হে ছোকরা! কয়লা দেবে তোমরা। বুঝতে তো পারছো না সেবানকার কাণ্ডকারখানা। বয়লারের গরম হাওয়া নেই, দম বন্ধ হয়ে আসবে—আর শভেন্ কয়লা দিতে না দিতে হাতের শিবা দড়ির মত ফুলে উঠবে—আর তাতে ওই ডেলিকেট হাত—হাঁপ জিরতে দেবে না, দাঁড়াতে দেখলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মারবে চাবুক—দল হাজার ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিনের স্টিম বজায় রাখতে হবে সব সময়, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাবে না—আর গরম কি সোজা! কুস্তীপাক বরকের গরম ফাংশের মুখে? সে তোমাদের কাজ?...

ভবুও দুজনে ছাড়ে না।

ইহারা যে বাড়ি হইতে পালাইয়া যাইতেছে, সে ধারণা বাবুটির আরও দৃঢ় হইল। বলিলেন,—নাম ঠিকানা দিয়ে যাও তো তোমাদের বাড়ির। দোখ তোমাদের বাড়িতে না হয় নিজে একবার যাব।

কোনো রকমেই তাহাকে রাজী করাইতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা চলিয়া আসিল।

একদিন অপু দুপুরবেলা কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গায়ের জামা খুলিতেছে, এমন সময় পাশের বাড়ির জানালাটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়িতে সে আর চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না। জানালাটির গায়ে খড়ি দিয়া মাঝারি অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে—‘হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।’ অপু অবাক হইয়া খানিকটা সেদিক চাহিয়া রহিল এবং পবক্ষণেই কৌতূহলের আবেগে হাতের নোটখাতাখানা ঘেঁষে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আপন মনে হো-হে করিয়া উঠিল।

পাশের বাড়ি—তাহার ঘর হইতে জানালাটা হাত পাঁচ ছয় দূবে---মধ্যে একটা সরু গলি। অনেকদিন সে দেখিয়াছে, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে জানালার গরাদে ধরিয়া এদিকে চাহিয়া আছে, বয়স চৌদ্দ মনেহয়। রং উজ্জল শ্যামবর্ণ, কৌকুড়া কৌকুড়া চুল বেশ মুখখানা, যদিও তাহাকে সুন্দরী বলিয়া কোনদিনও অপূর্ব মনে হয় নাই। তাহার কলেজ হইতে আদিবার সময় হইলে প্রায়ই সে মেয়েটিকে দাঁড়াইয়া থাকিও দেখিত। ক্রমে শুধু দাঁড়ানো নয়, মেয়েটি তাহাকে দেখিলেই হঠাৎ হাসিয়া জানালার আড়ালে মুখ লুকায়, কখনও বা জানালার খড়খড়ি বারকতক খুলিয়া বন্ধ করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, দিনেব মধ্যে দুবার, তিনবার, চারবার কান্ড বদলাইয়া ঘরটার মধ্যে অকারণে ধোয়াফেরা করে এবং ছুতানাতায় জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। কতদিন এ-বকম হয় অপূর্ব মনে মনে ভাবে-- মেয়েটা আচ্ছা বেহায়া তো। কিন্তু আজকাল এ বাপাও একেবারে অপ্রত্যাশিত।

আজও বেলা উড়ে ঠাকুরের হোটোলে খাইতে গিয়া সে দেখিয়াছিল সুন্দর ঠাকুর মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। দুই-তিনমাসের টাকা বাকী, সামান্য দু’জির হোটেল, অপূর্ববাবু ইহাব কি ব্যবস্থা করিতেছেন?... আর কতদিন এ ভাবে সে বাকী টানিয়া যাঠবে?... সুন্দর ঠাকুরের কথায় তাহাব মনে যে দুর্ভাবনার মেঘ ভয়িয়াছিল, সেটা কৌতূহলের হাওয়ায় এক মুহূর্তে কাটিয়া গেল! আচ্ছা তো মেয়েটা? জাখো কি লিখে গেছে---ওদের--- হো-হো---আচ্ছা---হি-হি---

সেদিন আর মেয়েটাকে দেখা গেল না, যদিও সন্ধ্যার সময় একবার ঘরে ফিরিয়া সে দেখিল, জানালার সে খড়ির লেখা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। পরদিন সকালে ঘরের মধ্যে যাত্রার বিড়াইয়া পড়িতে পড়িতে মুখ তুলিতেই অপূর্ব দেখিতে পাইল, মেয়েটি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। কলেজে যাওয়ার কিছু আগে মেয়েটি আর একবার আসিয়া দাঁড়াইল। তবে স্নান সারিয়া

আসিয়াছে, লালপাড শাড়ি পরণে, ভিজে চুল পিঠের উপর ফেলা, সোনার বালা পরা নিটোল ডান হাতটি দিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া আছে। অল্পক্ষণের জন্য---

কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে কলেজে গেল। সেখানে অনেকের কাছে ব্যাপারটা গল্প করিল। প্রণব তো শুনিয়া হাসিয়া খুন, জানকীও তাই। সবাই আসিয়া দেখিতে চায়--এ যে একেবারে সত্যাকার জানালা-কাবা। সত্যেন বলিল, নভেল ও মাসিকেব পাতায় পড়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে এ-বকম যে ঘটে তা তো জানা ছিল না।...না না হাসি তামাশা চলিল, সকলেই ভদ্রতাসঙ্গত কথা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিল তাহা বলিল সত্যের অপলাপ কথা হইবে।

তারা দু'দিনচাবেক বেশ কাটিল, হঠাৎ একদিন আবার জানালায় লেখা-- 'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।' জানালার খড়খড়ির গায়ে এমনভাবে লেখা যে, জানালা খুলিয়া লবণ কড়াটা মুড়িয়া ফেলিল লেখাটা শুধু তাহার দৃশ্য হইতেই দেখা যায়, অন্য কারো চোখে পড়িবার কথা নহে। প্রণবটা যদি এ সময় বেগুনে থাকিত। তাবপর আবাব দিন-দুই সব ঠাণ্ডা।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল--সকালে কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দুপুরের পরই আবাব খুব মেঘ করিয়া আসিল। কারখানায় উঠানে মাল-বোঝাই মোটর লণ্ডলাব শব্দ একটু পামিলেও দুপুরের 'শিফট'-এর মিস্ত্রী-দেখা-শ্রাব্যে গায়ে লোহা'র বেড়ারাইবার হুন্দাম আওয়া' বেজায়। এত বিকট আওয়াজেব জন্য দুপুরবেলা এখানে তিষ্ঠানো দায়।

অপু খুনাইবার রথা চোঁকা করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, মেয়েটি জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পক্ষণের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল! মেয়েটি অন্য অন্য দিনেব মত আঙু হাঙ্গিয়া ফেলিল। অপু'র মাথায় দুটুমি চায়া গেল। সেও অগাধিয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল-- তাবপর সে নিজেও হাসিল। মেয়েটি একবার পিছন ফিবিয়া চাহিয়া দেখিল কেহ আসিতেছে কিনা--পরে সেও আসিয়া জানালার ধাবে দাঁড়াইল। অপু কে'রেক সুবে বলিল,--কিগো হেমলতা, আমায় বিয়ে কববে?

মেয়েটি বলিল--কববো। কথা শেষ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

অপু বলিল,--কি জাত তোমরা--বামুন?--আমি কিন্তু বামুন।

মেয়েটি খোঁপায় হাত দিয়া একটা কাঁটা ভাল করিয়া গুঁড়িয়া দিতে দিতে বলিল--আমবাও বামুন।--পরে হাসিয়া বলিল--আমাব নাম তো ভেনেছেন, আপনাব নাম কি?

অপু বলিল, ভাল নাম অপূর্ব, আমবা বাঙ্গাল দেশের লোক--শহরের বেয়ে তোমরা--আমাদের তো হুঁচোখে দেখতেই পারো না--তাই না? তোমায় একটা কথা বলি শোন? ...ওবকম লিখো না জানালার গায়ে--যদি কেউ টের পায়?

মেয়েটি আর একবার পিছন ফিরিয়া বলিল, কে টের পাবে? কেউ দেখতে পায় না। ওদিক থেকে—আমি খাই, কাকীমা আসবে ঠাকুরঘর থেকে। আপনি বিকেলে বোজ থাকেন?

মেয়েটি চলিয়া গেলে অপূর্ব হাসি পাইল। পাগল না তো? ঠিক—এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই...মেয়েটি পাগল। মেয়েটি চোখে তাই কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের দৃষ্টি। কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর করুণা ও অনুকম্পায় তাহার সাধা মন ভরিয়া গেল। মেয়ের বাপকে সে মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখে—প্রোঁচ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোন অফিসের কেবানী বোধ হয়। সে কলেজে খাইবার সময় বোজ ওড়লোক ট্রামেব অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকেন। হয়ত মেয়েটির বাবাই, নয়ত কাকা বা জ্যাঠামশায়, কি মামা—মোটের উপর তিনিই একমাত্র অভিভাবক। খুব বেশী অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয় না। হয়ত তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে—এ-রকম তো হয়।

তাহার ইচ্ছা হইল, এবার মেয়েটিকে দেখিতে পাইলে তাহাকে দুটা মিষ্টি কথা, দুটা সান্ত্বনার কথা বলিবে। কেহ কিছু মনে করিবে? যদি নিতাই-বাবু টের পায়?—পাইবে।

ধবরের কাগজে সে মাঝে মাঝে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন পুঁজিত, একদিন দেখিল কোন একজন ডাক্তারের বাড়ির জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর দরকার। গেল সে দেখানে। দোতলা বড় বাড়ি, নিচে বৈঠকখানা কক্ষ সেখানে বড় কেহ বসে না, ডাক্তারবাবুর কনসাল্টিং রুম দোতলায় কোণে কামরায়, সেখানেই রোগীর ভিড়। অপূর্ণ গিয়া দেখিল ঘরোতে অনান জন-পনেরো নানা বয়সের লোক তীর্থের কাকের মত হাঁ কবিয়া বসিয়া—সেও গিয়া একপাশে বসিয়া গেল। তাহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, এই বিজ্ঞাপনটা শুধু তাহার চোখে পড়িয়াছে—এত সকাল, অত ছোট ছোট অক্ষরের এক কোণে লেখা বিজ্ঞাপনটা—সেও ভাবিয়াছিল—উঃ...এ যে ভিড় দেখা যায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

তাহাকে পড়াইতে হইবে; কোন ক্লাসের ছেলে, কত বড়, কেহই জানে না। পাশের একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল—মশাই জানেন কিছু, কোন্ ক্লাসের—

অপূর্ণ বলিল, সেও কিছুই জানে না। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছোকরার সঙ্গে অপূর্ণের আলাপ হইল। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া হোমিও-প্যাথিক পড়ে, টিউশনির নিত্যন্ত দরকার, না হইলেই চলিবে না। সে না কি কালও একবার আসিয়াছিল, নিজের দরবন্দার কথা সব কড়াতে জানাইয়া দিয়াছে, তাহার হইলেও হইতে পারে। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অপূর্ণ দেখিতে-ছিল, কাঠের সিঁড়িটা বাহিয়া এক-একজন লোক উপরের ঘরে উঠিতেছে

এবং নামিবার সময় মুখ অঙ্ককার করিয়া পাশের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। যদি তাহারও না হয়। পড়া বন্ধ করিয়া মনসাপোতা—কিন্তু দেখানেষ্ট বা চলবে কিসে?

চাকর আসিয়া জানাইল, আজ বেলা হইয়া গিয়াছে, ডাক্তাববাবু কাহারও সঙ্গে এখন আর দেখা করিবেন না। এক-একখানা কাগজে সকলে নিজের নিজের নামনাম ও বোগাতা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, প্রয়োজন বুঝিলে জানানো যাবে।

চেন্দো কথা। সকলেই একবার ডাক্তাববাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাগ্র হইয়া পাড়ন—প্রত্যেকেরই মনে মনে বিশ্বাস—একবার গৃহস্থানী তাহাকে চাক্ষুষ দেখা তাহার গুণ শুনিবে আর চাকুরি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। অর্থাৎ তাবল সে উপরে বাইতে পাবিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখত।—তবে সে নিজের ব্যবস্থার কথা কাহারও কাছে বলিতে পারিবে না। তাহার লজ্জা করে, দৈন্যের কাঁড়নি গাহিয়া পবের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা—অসম্ভব। লে কে কি করিয়া যে কবে। প্রথম প্রস্নম সে কলিকাতায় এসিয়া ভাষিয়াছিল কত বড়লোকের বাড়ি আছে বসিকাতায়, তাহিলে একজন দরিদ্র ছাত্রের উপায় করিয়া দিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। কত সমস্যাতো তাহাদের কত দিকে যায়? কিন্তু তখন সে নিজেকে ভুল বুঝিয়াছিল, তা হবার প্রতি, পবের চোখে নিজেকে হান প্রতিপন্ন করিবার প্রতি এ-সব তাহা মনে নাই। তাহার আছে—সে যাহা নয় তাহা হইতেও নিজেকে বড় বলিয়া গাহ কাঁদা, বাহ্যিক কবির মতো দেখা গব করিয়া বেড়াইবার একটা কুশাস। মাঝেব নির্বুদ্ধিতা এইদিক দিয়া ছেলেতে বর্তাইয়াছে, একেবারে হুবহু—অবকল। এই কলিকাতা শহরে মহা কষ্ট পাইলেও সে নিতান্ত অন্তঃকরণ এক-আত্মন ছাড়া কখনও কাহাকে—তাও নিজের মুখে কখনও—কিছু বলে না। পাছে ভাবে গবীব।

ইতস্ততঃ করিয়া সেও অপবের দেখাদেখি কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। নিচের উঠান হইতে চাকর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আরে কাছে আপ-লোক উপবমে যাতে হেঁ—বাত্ নেহি মানতে হেঁ, এ বড়া মুশকিল—। অপু সে কথা গ্রাহ না করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রোট বয়সের একটি ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া হোমিওপ্যাথি-পড়া ছোকরাটির সঙ্গে কি তর্ক চলিতেছে বাহির হইতে বুঝা গেল—ছোকরাটি কি বলিতেছে, ভদ্রলোকটি কি বুঝাই-তেছেন। সে ছোকরা একেবারে নাছোড়বান্দা, টিউশনি তাহার চাই-ই। ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, ‘ম্যাট্রিকুলেশন-ফেল টিউটর দিয়া তিনি কি করিবেন? ক্রমে সকলে একে একে বাহিরে আসিয়া চলিয়া গেল। অপু ঘরের মধ্যে চুকিয়া সসঙ্কোচে বলিল—আপনাদের কি একজন পড়বার লোক দরকার—আজ সকালের কাগজে বেরিয়েছে—

যেন সে এত লোকের ভিড়, উপরে উঠার নিবেদন, কাগজে নামবাম লিখিয়া

রাখিবার উপদেশ কিছু জানে না। আসলে সে ইচ্ছা করিয়া একরূপ ভাল-মানুষ সাজে নাই—পরিচিত স্থানে আসিয়া অপরিচিত লোকের সহিত কথা কহিতে গিয়া আনাড়ীপনার দরুন কথার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা লুকা সুর আসিয়া গেল।

ভদ্রলোক একবার আপাদমস্তক তাহাকে দেখিয়া লইলেন, তারপর একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, বসুন। আপনি কি পাশ ?—ও, আই—এ পড়েছেন—দেশ কোথায় ?—ও !—এখানে থাকেন কোথায় ?—হু।

তিনি আরও যেন ষাণিকক্ষণ তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মিনিট পনেরো পরে—অপু বসিয়াই আছে—ডাক্তারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—দেখুন, পড়ানো মানে—আমার একটি মেয়ে—তাকেই পড়াতে হবে। যাকে তাকে নিতে পারি নে—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—ওরে শোন—তোমার দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আস তো—বলগে আমি ডাকছি—

একটু পরে মেয়েটি আনিল। বছর পনেরো বয়স, তুল্লী, সুন্দরী, বড় বড় চোখ, আঙুলের গডন ভাবি সুন্দর, বেশমী জামা গায়ে, চণ্ডা পাড় শাড়ি, গলায় সোনার সরু চেন, হাতে প্লেন বালা। মাথায় চুল এত ঘন যে, হৃদয়ের কান যেন ঢাকিয়া গিয়াছে—জাননী মেয়েদের মত ফাঁপানো খোঁপা।

—এইটি আমার মেয়ে, নাম প্রীতিবালা। বেথুন স্কুলে পড়ে, এট সেকেন্ড ক্লাসে উঠেছে। ইনি তোমার মাস্টার খুকি—শাও বাদ দিয়ে কাল থেকে উনি আসবেন—হ্যাঁ, এঁর মুখ দেখেই আমার মনে হয়েছে ইনিই ঠিক হবেন। বয়স আপনার আর কত হবে—এই উনিশ-কুড়ি, মুখ দেখেই তো মনে হয় ছেলে-মানুষ, তাছাড়া একটা distinction-এর ছাপ রয়েছে। খুকি বোনো মা—

টিউশনি ভোটার আনন্দ যত হোক-না-হোক, ভদ্রলোক যেন বলিয়াছেন তাহার মুখে একটা distinction-এর ছাপ আছে—এই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সে সারাটা দিন কাটাষ্টল ও-ক্লাসে, পথে, বাগায়, হোটেলের—সর্বত্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাটা লইয়া নিবোধের মত খুব জাঁক করিয়া বেড়াইল। মাছিনা যত নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বলিল, মেয়েটির সৌন্দর্য-ব্যাখ্যা বাড়াইয়া করিল।

কিন্তু পরদিন পড়াইতে গিয়া দেখিল—মেয়েটি দেওয়ানপুবে নির্মলা নয়। সেরকম সরলা, শ্বেতময়ী, হাস্যমুখী নয়—হল কথা কয়, খাটোয়া লইতে জানে, একটু যেন গর্বিত। কথাবার্তা বলে হৃদয়ের ভাবে। অমুক অঙ্কটা কাল বুঝিয়ে দেবেন, অমুকটা কাল ক'রে আনবেন, আজ আর একঘণ্টা বেশী পড়াবেন, পরীক্ষা আছে ইত্যাদি। একদিন কোন কারণে আসিতে না পারিলে পরদিন কৈফিয়ত লব করিবার সুরে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপু মনে মনে বড় ভয় খাইয়া গেল, যেরকম মেয়ে, কোন দিন পড়ানোর কোন ক্রটির কথা বাবাকে লাগাইবে, চাকরির দফা গয়া—পথে বসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না। ছাত্রীর উপর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতে তাহার

মন ভরিয়া উঠিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। প্রথম মাসের মাহিলা পাইয়াই যাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল। বৌবাজার ডাকঘর হইতে টাকাটা পাঠাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সঙ্গে বন্ধুটি বলিল, এমো তো ভাষ একটু চোরাবাজারে, একটা ভাল অপেরাগ্লাস কাল দর করে বেখে এসেছি...নিম্নে আসি।

চোরাবাজারের নাগণ্ড কখনও অপু শোনে নাই। ঢুকিয়া দেখিয়াই সে অবাক হইয়া গেল। নানা ধরনের জিনিসপত্র, খেলনা, আসবাবপত্র, ছবি, ঘড়ি, ভুতা, কলের গান, বই, বিজ্ঞান, সাবান, কোচ, কেদারা—সবই পুরানো মাল। অপু মনে হল—বেশ সস্তা দরে বিকাইতেছে। একটা ফুলের টব, দর বলিল, চ'আনা। একটা ভাল দোয়াতদান দশ আনা। এগারো টাকায় কলের গান চ'আনা। একটা ভাল দোয়াতদান দশ আনা। এগারো টাকায় কলের গান মায় পেকড। এত দিন কলিকাতায় আছে, এত সস্তায় এখানে জিনিসপত্র বেচা-কেনা হয়, তা তো সে জানে। এত শৌখিন জিনিসের এত কম দাম। তাহার মাথায় এক খেয়াল আসিয়া গেল। পরদিন সে বাকী টাকা হাতে বৈকালে তাহা চোরাবাজারে ঢুকিল। মনে ভাবিল—এইবার একটু ভাল ভাবে থাকবো, ওকম গোয়াল ঘরে থাকতে পারি নে—যেমন নোংরা ভেয়ানি অন্ধকার প্রথমেই সে ফুলদানিভোড়া কিনিল। দোয়াতদানের উপর অনেকদিন হইতে ঝোঁক, সেটিও কিনিল। একটা জাপানী পর্দা, খানচ'বেক ছবি, খানকতক প্লেট, একটা আলনা, বুটা পাখব-বসানো চোট একটা আংটি। ছেলেমানুষের মত আনন্দে অধু জিনিসগুলিকে দেখলে আনিবাব ঝোঁকে খাহাই চোখে ভাল লাগিল, তাহাই কিনিল। দাঁও বুঝিয়া চ'একজন দোকানদার বেশ ঠকাইয়াও লইল। ডবল-উইকের একটা পিতলের টেবিলল্যাম্প পছন্দ হওয়াতে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল,—এটা দাম কত? দোকানী বলিল,—সাড়ে তিন টাকা। অপু বিশ্বাস...এ-বকম আলোর দাম পনেরো মাল টাকা। এরূপ মনে হওয়াব একমাত্র কারণ এই যে, অনেকদিন আগে লীলাদেব বাড়ি থাকিবার সময় সে এই ধরনের আলো লীলার পড়িবার ঘরে টেবিলে অলিতে দে রাখাছিল। সে বেশী দর কষিতে ভরসা করিল না, চার আনা মাত্র কয়দিয়া তিন টাকা চার আনা মূল্যে সে মাছাতার আমলের টেবিল ল্যাম্পটা মহা খুশী সহিত কিনিয়া যেলিল। মুঠের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া সে সোৎসাহে ও সাগ্রহে সব বাসায় আনিয়া হাজির করিল ও সারাদিন খাটিয়া ঘবদেব ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন করিয়া ছবিগুলি দেওয়ালে টাঙ্গাইল, সস্তা জাপানী পর্দাটা দরজায় ঝুলাইল, আলনাটাকে গড়াল আঁটিয়া বসাইল, ফুলদানির জন্য ফুল কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সেগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া আপাততঃ জানালার ধারে রাখিয়া দিল, দোয়াতদানটা তেঁতুল দিয়া মাজিয়া ঝকঝকে করিয়া রাখিল। বাহিরে অনেকদিনের একটা ঝালি পাকবাস্ত্র পড়িয়াছিল, সেটা ঝাড়িয়া মুছিয়া

টেবিলে পরিণত করিয়া সন্ধ্যার পর টেবিল ল্যাম্পটা সেটার উপর রাখিয়া পড়িতে বসিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে ঘন ঘন ঘবেব চারিদিকে খুশীর সহিত চাহিয়া দেখিতেছিল—ঠিক একেবারে যেন বডলোকদের সাজানো ঘর। ছবি, পদা, ফুলদানি, টোবল-ল্যাম্প সব।—এতদিন পরস্য ছিল না, হয় নাই। কিন্তু এইবার কেন সে মহিষেব মত বিলের কাদায় নুটাইয়া পড়িয়া থাকিতে যাইবে ?

বাহাদুরি করিবার ঝোঁকে পবদিন সে ক্লাসের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ কবিয়া আনিয়া নিজেব ঘবে খাওয়াইল—প্রণব, জানকা, সতীশ, অনিল এমন কি সেক্ট ডেভিয়ার কলেজের সেই ভূতপূর্ব ছাত্র চালবাজ মন্থথকে পথন্ত।

মন্থথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হব্বে। শারে আমাদেব অপূব এসব কবেছে কি। কোথেকে বাজে বাবিশ এক পুবনো পনা জুটিয়েছে ছাখো। এত খংবং কে খাবে ?

অপু নীচের কারখানায় হে মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহাদের বড লোহাব চায়েব কেটলিটা ও একটা পলিতা-বসানো সেকলে লোহাব স্টোভ দাব কবিয়া আনিয়া চা চড়াইয়াছে, একরাশ কমলালেবু, সিঙ্গাড়া, কুরী, পানতুয়া, কলা ও কাঁচা পাঁপর কিনিয়া আনিয়াছে—সবাই দেশেতে দেখিতে খাবার অধেকের উপর কমাইয়া আনিল। কথায় কথায় অপু তাহাদের দেশেব বাড়ি কপা তুলিল—মস্ত দোতলা বাড়ি নদীব ধারে, এখনও পজার দালানটা দোতলে তাক লাগে, দেশে এখনও খুব নাম—দেবান দায়ে মস্ত জমিদারী হাওছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই আজ এ অবস্থা—নইলে ইত্যাদি।

প্রণব চা পরিবেশন কশিতে গিয়া খানিকটা জানকীর পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ঘরসুদ্ধ সবাই হৌ হৌ কবিয়া হাসিয়া উঠিল। সতীশ আদিয়েট স্টান শুইয়া পড়িয়াছিল অপূর বিছানায়, বলিল,—ওহ তোমরা কেউ আমাব গালে একটা পানতুয়া ফেলে দাও তো।—হী কবে আছি—

সতীশ বলিল, হী হে ভাল কথা মনে পড়েছে। তোমাব সেট জানালা কাবোর নালিকা কোন দিকে থাকেন ? এই জানালাটি নাকি ?

অনিল বাদে আর সকলেই হাসি ও কলরবের সঙ্গে সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে গেল—অপু লজ্জামিশ্রিত সুবে বলিল—না না ভাই, ওদিকে যেও না—সে কিছু না, সব বানানো কথা আমাব—ওসব কিছু না—

ঝেন্নেটি পাগল এই সারণা হওয়া পর্যন্ত তাহার কথা মনে উঠিলেই অপূর মন ককণাদ্র হইয়া ওঠে। তাহাকে লইয়া এই হাসি-ঠাট্টা তাহার মনে বড বিধিল। কথার সুর ফিরাইবার জন্য সে-নতুন-কেনা পর্দাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরে হঠাৎ মনে পড়াতে সে সেই ঝুটা পাথরের আংটিটা বাহির করিয়া খুশীর সহিত বলিল,—এটা ছাখো তো কেমন হয়েছে ? কত দাম হবে। মন্থথ দেখিয়া বলিল—এ কোথাকার একটা বাজে পাথর বসানো আংটি, কেমিকেল সোনার, এর আবার দামটা কি...

দূর !

অনিলের এ কথাটা ভাল লাগিল না। মন্থর ইতিপূর্বে অপূর পদাটী দেখিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে, ইহাও তাহার ভাল লাগে নাই। সে বলিল—তুমি তো অস্তবী নও, সব তাতেই চাল দিতে আস কেন ? চেনো এ পাথর ?

অস্তবী হবার দরকারটা কি শুনি—এটা কি এয়ারেল্ড, না হীরে না—

—শুধু এয়ারেল্ড আর হীরের নাম শুনে রেখেছ বৈ ত নয় ? এটা কর্নেলিয়ান—চেনো কর্নেলিয়ান ? অস্ত্রের বনিতে গিয়া যায়, আমাদের ছিল, আমি খুব ভাল জানি।

অনিল খুব ভালোই জানে অপূর আংটির পাথরটা কর্নেলিয়ান নয়, কিছুই নয়—শুধু মন্থর কথার প্রতিবাদ কবিয়া মন্থর চালিয়াতি কথাবার্তায় অপূর মনে কোনও ঘা না লাগে সেই চেষ্টায় কর্নেলিয়ান ও টোপাজ পাথরের আকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা যথেষ্ট আসিল তাহাই বলিতে লাগিল। তার অভিজ্ঞতার বিকল্পে মন্থর সাহস কবিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না।

তাহার পর প্রণব একটা গান শ্রবণে উভয়ের তর্ক ধামিয়া গেল। আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিখুশী, কথাবার্তা ও আরও বার-দুই চা খাইবার পর অন্ত সকলে বিদায় লইল, কেবল অনিল থাকিয়া গেল, অপূর তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিল।

সকলে চলিয়া যাইবার কিছু পূর্বে অনিল মন্থর দূর বলিল—আচ্ছা এসব খাণ্ডার কি কাণ্ড ? সে—তদ্বিনেব খালপে এখনও অপূরকে ‘তুমি’ বলে না। কেন এসব কিনেছেন মিছে—সমস্যা খবচ করে ?

অপূর হাসিয়া বলিল—কেন তাতে কি ? এসব তো—ভাল থাকতে কি ইচ্ছে যায় না ?

—বেতে পান না এদিকে, আর মিথো এই সব—সে যাক্। এই দামে পুরানো বইয়ের দে'ক'নের সে গিৰনের সেটটা বে' হয়ে যেতো। আপনার মত লোকও যদি এতী ভুলো মালের পেছনে পরস্যা খবচ কবেন তবে অন্য ভেলের কথা কি ? একটা পুরানো দূরবীন বে' এই দামে হয়ে যেতো। আমার সন্ধানে একটা আছে ফ্রী স্কুল লাইব্রেরী এক ডায়গায়—একটা সাহেবেব ছিল—স্যাটানের রিং চমৎকার দেবা যায়—কম টাকায় হ'ত, মেম বিক্রী করে ফেলছে অভাবে—আপনি কিছু দিতেন, আমি কিছু দিতাম, দু'জনে কিনে রাখলে তের বেশী বৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত—

অপূর অপ্রতিভের হাসি হাসিল। দূরবীনের উপর তাহার লোভ আছে অনেকদিন হইতে। এতক্ষণে তাহার মনে হইল—এ টাকার ইহা অপেক্ষাও সম্ভব হইতে পারিত বটে। কিন্তু সে যে ভাল থাকিতে চায়, ভাল ঘবে সুদৃশ্য সুক্-চিসমত আসবাবপত্র রাখিতে চায়—সেটাও তো তার কাছে বড় সমা—তাহাকেই বা সে মনে মনে অস্বীকার করে কি কবিয়া ?

অনিল আরও কিছু বলিল না, পুরানো বাজারের এ-সব সম্ভা খেলো মালকে

গেল, সকলে বলিল, সে এনার্কিষ্ট দলে যোগ দিয়াছে।

প্রণব চলিয়া যাওয়ার মাসখানেক পর একদিন অপু হোটেল খাইতে গিয়া দেখিল, সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার মুখ ভাব ভাব। দু'তিন মাসের টাকা বাকী, পাওনাদার আর কতদিন শোনে। আত্মসম্পদ এনাংল, দেনা শোধ না করিলে আর খাইতে পাঠবে না। বলল, বাবু, অন্য খদ্দের হলে মাসের পয়সাটি খেতে দিই নে—ওই কফোবাবু খায়, ওদের পাটের কলের হপ্তাটি পেলে দিয়ে দেয়—তুমি বলে আমি কিছু বলছি না—তুমিও ওর আজ নিয়ে সাতদিন। যাক আর শাববো না, অপুনি আর আসবেন না—আমার ভাত একজন ওদরলোকের ছেলে খেয়েছে ভাববো, আর কি কবব।

কথাগুলি বুঝ গারো এবং আদে অসঙ্গত নয়, কিন্তু খাইতে গিয়া মদপকত প্রত্যাখ্যানে অপু চোখে জল আসিল। তাহার তো একদিনও ইচ্ছা ছিল না যে, ঠাকুরকে সে ফাঁকি দিবে, কিন্তু সেই প্রাতিব টিউশনিটা চাডিয়া দেওয়ার পর আত্ম দুই-তিনমাস একেবারে নিরুপায় অবস্থায় ঘুরিতে লাগে।

বিপদের উপর বিপদ। দিন দুই পরে কলেজ গিয়া দেখিল নোটিশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছে, যাহাদের মাহিনা বাকী আছে, এক সপ্তাহে। মনে শোনা না করিলে কাহাকেও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। অতঃপক্ষে অসম্ভব কার দেখিল। প্রায় গোটা এক বৎসরের মাহিনাই যে তাহার বাকী।—মাস মাস—হয়েক মাহিনা দেওয়া আছে—সেই প্রথম দিকে একবার, আর দ্বিতীয় টিউশনির টাকা হইতে একবার—তাহার পর হইতে যাওয়াই জোটে না ভেবে কলেজের মাহিনা। দশ মাসের বেতন ছাড়া টাকা হিসাবে ষাট টাকা বাকী কোন দিক হইতে একটা কলঙ্করূপা নিকেলের সিকিও চাসিব ন সুবিধা নাই তাহার, ষাট টাকা সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোথা হইতে দেওয়া করিবে। হয়ত তাহাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, হাঁহবে ছটির পর সেকেন্ড ইয়ারে উঠিতে দিবে না সারা বছরের কন্ট্রোল পরীক্ষায় সব বার্থ নির্বর্থক হইয়া যাইবে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ধ্যা সময় সে হাত পরেই যসা হইতে চাউল ও আলু কিনিয়া থাকবার ঘরের সামনে বাসাল্পাতে নামান যোগাড় করিল। হোটেলের পাওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে আত্ম কয়দিন নিজে রান্না করিয়া খাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছে ইচ্ছাও বুঝ সন্তোষ হয়, কাঠ কিনিতে হয় না। নিজের কারখানার ছুটির মিস্টারদের ঘর হইতে কাঠের চোচ ও টুকরা কুড়াইয়া আনে, পাঁচ-ছয় পয়সায় খাওয়া দাওয়া হয়। আলু ভাতে ডিমভাতে আর ভাত ভাত চড়াইয়া পাক দিল—ও বড়—বড়—নিয়ে এসে, আহার হয়ে গেল বল—ছোট ক্যান্ডিও এনে—

কারখানার দায়োয়ান শঙ্কুদণ্ড তেওয়ারীর বৌ একখানা বড় পিতলের থালা ও কাঁসি লইয়া উপরে আসিল—এক লোটা জল ও গোটা কতক কাঁচা লবণও আনি।

খালা বাসন নাই বলিয়া সে-ই দুই বেলা খালা আনিয়া দেয়। হাসিমুখে বলিল, মচ্‌লিকা তরকারি হুন্‌ নেহি ছুঁয়ে গা বাবুজী—

—কোথায় তোমার মচ্‌লি? ও শুণু আলু—একটু হলুদবাটা এনে দাও না বহু? রোজ রোজ আলুভাতে ভালো লাগে না—

বড়কে ভাল বলিতে হইবে, রোজ উচ্‌লিষ্ট গাল। নামাইয়া লইয়া যায়, নিজে মাড়িয়া লয় ‘হলুদুস্তানী ব্রাফণ যাহা কখনও করে না—অপু বাপা দিয়াছিল, বড় বলে, তুমি তো হামারে লেডকাকে বরাবর ভোগে বাবুজী ইসমে ক্যা ছান্ন?—

দিনকতক পর মাসের একটা চিঠি আসিল, হঠাৎ পিচলাইয়া পড়িয়া সর্বজন্যর ‘গায়ে বড লাগিয়াছে, প্লসস’ব কন্‌ট যাইতেছে। মাসের অভাবের খবর পাইলে অপু বড বাস্ত হইয়া ওঠে, মাসের নানা কাল্পনিক ঙ্‌খের চিন্তায় তাহার মনকে খন্‌তির করিয়া তোলে, হয়ত আজ প্লসস’র অভাবে মাসের খাওয়া হইল না, হয়ত কেহ দেপিতছে না, যা আজ দুদিন উপবাস করিয়া আছে, এই সব নানা ভাবনা প্লসস’র ভোটে, নিজেব আলুভাতে ভাতও যেন গলা দিয়া নামিতে চ’য না।

এদিকে মাস এক গোলমাল—কারখানার ম্যানেজার ইতিপূর্বে তাহাকে বার দুই ডাকাইয়া বলিয়াছেন, উপরে সে যে ঘরে আছে তাব সমস্তটাই ঐষধের গুদাম করা হইবে—সে যেন অন্যত্র বাসা দেখিয়া লয়—বলিয়াছেন আজ মাস তিনেক আগে, তাহার পর খাব কোনও উচ্‌চবাচা কবেন নাই—অপুও থাকি-বাব স্থানের জন্য কোথায় কি ভাবে ক’হ’ব ক’ছে গিয়া চেঁচা করিবে বুঝিতে না পানিয়া একরূপ নিশ্চেষ্টেই ছিল এবং নিশ্চিৎ ভাবে দিন খাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, ও-কথা হয়ত খাব উঠিবে না—কিন্তু এইবার যেন সময় পাইয়াই ম্যানেজার বেশী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন।

হাতেব প্লসস’র ফুবাইয়া শাসিবাব সঙ্গে সঙ্গে অপু এত সাধ করিয়া কেনা শখের আসবাবগুলি বেচিতে আবস্ত করিল। প্রথমে গেল প্লেটগুলি—তাও কেহই কিনিতে চায় না—অবশেষে চেন্দ আনায় এক পুবাণো দোকানদারের কাছে বেচিয়া দিল। সেই দোকানদারটাই ফুলদানিটা আট আনায় কিনিল, তখনো ছবি দশ আনায়। তবু শেষ পর্যন্ত সে স্যাণ্ডোর ডায়েলটা ও জাপানী পদাটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া বহিল।

দে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল—ছাত্তু তিনিসটার অসীম গুণ—সস্তার দিক হইতে বটে, অল্প খরচে পেট ভরাইবার দিক হইতেও বটে। আগে আগে চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহার মা নতুন যবেব ছাত্তু কুটিয়া তাহাদের খাইতে দিতেন—তখন ছাত্তু ছিল বৎসবেব মধ্যে একবার পাল-পার্বণে শখ করিয়া খাইবার তিনিস, তাহাই এখন হইয়া পড়িল প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। আগে একটু আধটু ওড়ে তাহার ছাত্তু খাওয়া হইত না, ওড আরও বেশী করিয়া দিবার জন্য মাকে কত বিবক্ত করিয়াছে, এখন খরচ বাঁচাইবার জন্য শুধু দুই ও তেওয়ারী-

বহর নিকট হইতে কাঁচা লঙ্কা আনাইয়া ভাই দিয়া খায়, অভ্যাস নাই, খাইতে ভাল লাগে না।

কিন্তু চাতু খুব সুস্বাদু না হউক, তাহাও বিনা পরসায় পাওয়া যায় না। অপু বৃথিতেছিল—টানাটানি করিয়া আর বড়-ভোর দিনদশেক—তারপর কুল-কিনারা হইল অজানা মহাসমুদ্র।...তখন কি উপায়?

সে বোঝ সন্ধ্যা উঠিয়া নিকটবর্তী এক লাইব্রেরীতে গিয়া দৈনিক ইংরেজী বাংলা কাগজে ছেলেপড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া দেখে। গ্যাস-পোস্টের গায়েও অনেক সময় এই ধরনের বিজ্ঞাপন যাবা থাকে—চলিতে চলিতে গ্যাস পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেডানো তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রায়ই বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন। আলো ও হাওয়াযুক্ত ভদ্রপরিবাবের থাক-বার উপযোগী দুইখানি কামরা বাগানঘর, ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালে-ভদ্রে এক-আধটা ছেলে পড়ানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তার ঠিকানাটি আগে আগে কেহ ছিঁড়িয়া দিয়াছে। কাণ্ড ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারী শ্রী একদিন সোড়া সাবান দিয়া নিজেদের কাণ্ড দিক কবিত্তে বসিয়াছে, অপু নিজের ময়লা শাট ও পুতিখানা লইয়া গিয়া বলিল, বহ, তোমার সাবানের বোল একটু দেবে, আমি এ পটোয় মাখিয়ে বেখে দি—তারপর ওবেলা কলেজ থেকে এসে কলেজল এল কেচে নেবো—দেবে?...

তেওয়ারী-বধু বলিল, দে দিভিয়ে না বাবুজী, হাম ঠাঁড়ি মে াল দেখা

অপু ভাবে—আহা বহ কি ভালো লোক!—যদি কখনও পরসা হয় ওর উপকার করবো—

এক একবার তাহার মনে হয়, যদি কিছু না ছোট্টে, তবে এবার হয়ত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মনসাপোতা িথিতে হইবে—কিন্তু দেখানো খার চলিবার কোনও উপায় নাই, তেলি ও কুণ্ড, বা পুজার জন্য অগ্ন্যুতান হইতে পুজারী-বামুন আনাইয়া ভায়গা-জমি দিয়া বাস করাইয়াছে। আশ কয়েকদিন হইল মায়ের পত্রে সে-খবর জানিয়াছে, এখন তাহার মাকেও আর তেলিগা সাহায্য করে না, দেখে-শোনে না। মায়ের একাধি চলে না—তার মধ্যে সে আবার কোন্‌দায় গিয়া জুটিবে?—তাহা ছাড়া পড়াশুনা ছাড়া? অসম্ভব।

সে নিজে বেশ বৃথিতে পারে এই এক বৎসরে তাহার মনের প্রসারতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, এখন একটা নতুনভাবে সে উগণ্টাকে জীবনটাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—যা কিনা দশ বৎসর মনসাপোতা কি দেওয়ার-পূরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সে এটুকু বেশ বোঝে কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনও প্রফেসরের বক্তৃ-তাতেও না—যাহা কিছু হইয়াছে এই বড় আলমারাতঃ লাইব্রেরীটার কাছে সে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ।

যতক্ষণ সে লাইব্রেরীতে থাকে ততক্ষণ তাহার খাওয়া দাওয়ার কথা তত মনে থাকে না। এই সময়ট, একটা খেলার ঘোরে কাটে। খেলায় মত এক একটা বিষয়ে প্রায় জাগে মনে, তাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বিকারের রোগী মত অদম্য দ্বিপাদায় সে সম্বন্ধে মত বই পাওয়া যায় হাতের কাছে—পড়িতে চেষ্টা করে। কখনও খেলা—নক্ষত্র জগৎ...কখনও প্রাচীন গ্রাস ও বোমের জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত একটা নিবিড় পরিচয়ের ইচ্ছা—কখনও কীটস্, কখনও ইল্যাড রোডের নেপোলিয়ন। কোন খেলায় থাকে দু'দিন, কোনোটা আবার একমাস। তার কল্পনা সব সময়ই বড় একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে চায়—বড় ছবি, জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, টাদের দেশের পাহাড়শ্রেণী, বর্তমান মহাযুদ্ধ, কোন বড় লোকের জীবনী।

কাথখানা: মানেভার আন একদিন ত গিদ দিলেন। পূব সুখের বাসা ছিল না বটে, কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? হাতে কিছু না থাকায় সে এবার পদটি একদিন বেচিতে লইয়া গেল। এটা তাহার বড় শখের জিনিস ছিল। পদটি একটা জাপানী চাঁদ আঁকা—ফুলে ভরা চেরা গাছ, একট, জলরেখা মাঝে-জলে বড় বড় ভিক্টোরিয়া পিঞ্জরা ফুটিয়া আছে। ওপরে টেটেখেলানো কাঠের ছাদওয়ালা একটা দেবমন্দির, দু'রে ফুসিমানের ভূষারারত শিবর একটু একটু নংবে পড়ে। এই ছবিখানার জন্যই সে পদটি কিনিয়াছিল, এবং এতদিন হাতছাড়া করিতে পারে নাই—কিন্তু উপায় কি? সাড়ে তিন টাকা দিয়া কেনা ছিল, বড় দোকান ঘুরিয়া তাহার দাম হইল এক টাকা মিনি-খানা।

পদটি বেচিয়া অনেকদিন পর সে প্রাণ দাঁদিবার ব্যবস্থা করিল। ছাতু খাওয়া খাইয়া থকাচ করা গিয়াছে, বাতাস হহুতে পরসব কলমা শাকও কিনিয়া আনিয়া। মনে পড়িল—সে কলমা শাক ভাজা বাইতে ভালবাসিত। বলিয়া হেলবেলার দাঁদি এখন-তখন গডের পুকুর হইতে কত কলমা টুলিয়া আনিয়া। এখন সাতেক পদটি-বেচা পরসায় চলল মন্দ নয়, তারপর ইয়ে কে সেট। আর পদটি নাই, কিছুই নাই, একেবারে কানাকড়িটা হাতে নাই।

কলেজ খাঠে হইল না-খাইয়া। বৈকালে কলেজ হইতে বাহির হইয়া সতাই মাথা ঘুরিতে লাগিল, যবে সেই মাথা কিম্ব কিম্ব করা, পা নাড়িতে না চাওয়া। মুশকিল এই যে ক্লাসে যথো গব ও বাহ্যাহার ফলে সকলেই জানে সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, কাহারও কাছে বলিবার মুখও তো নাই। ছুঁ-একজন যাহা জানে যেমন জানকী—তাহাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ।

সারাদিন না খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়াই শুইয়া পড়িল। রাত আটটার পরে ঘর না থাকিতে পারিয়া তেওয়ারী বধুকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

—চোলা কি ঝড়ের ডাল আছে, বহু? আজ আর খিদে নেই ভেমন
রাঁধবো না আর, ভিজিয়ে খেতাম।

সকালে উঠিয়াই প্রথমে তাহার মনে আসিল যে, আজ সে একেবারে
কপদ-কশূণ্য। আজও কালকার মত না খাইয়া কলেজে যাঁতে হইবে।
কতদিন এভাবে চালাইবে সে? না খাইয়া থাকার কষ্ট : ভয়ানক—কাল
লজিকের ঘন্টার শেষে সেটা দে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল—বিকালে দিকে
ক্ষুধাটা পড়িয়া খাওয়াতে তত কষ্ট বোঝা যায় নাই—কিন্তু সেই বেলা দুটোর
সময়টা!...—এটে ঠিক খেন বোলতার ঝাঁক হল ফুটাইতেছে—বার দুই জল
খাইবার ঘরে গিয়া গ্লাস-কতক জল খাইয়া যন্ত্রণাটা অনেকখানি নিবারণ
হইয়াছিল। আজ আবার সেই কষ্ট সংগ্রহে।

হাতমুখ ধুইয়া বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্যন্ত সে আবার নানা গ্যাস-
শোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইল, তাহার পর বাসায় না ফিরিয়া সেজা
কলেজে গেল। অন্য কেহ কিছু লক্ষ্য না করিলেও অনিল ছুঁতিনবার ভিজ্ঞাপন
করিল—আপনার কোনও অশুভ বিস্ময় হয়েছে? মুখ শুকনো কেন? অশু
অন্য কথা পড়িয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বই লইয়া আজ সে কলেজে আসে
নাই, খালি হাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় খানকটা ঘুরিল।
হঠাৎ তাহার মনে হইল মা আজ দিন বারো আগে টাকা চাহিয়া পত্র
পাঠাইয়াছিলেন—টাকাও দেওয়া হয় নাই, পত্রের জবাবও না।

কথাটা ভাবিতেই সে অত্যন্ত ব্যাভুল হইয়া পড়িল না-খাওয়ার কষ্ট সে ভাল
বুঝিয়াছে—মায়েরও হয়ত বা এতদিন না খাওয়া শুরু হইয়াছে, কে জানে?
তাহা ছাড়া মায়ের স্বভাবও সে ভাল বোঝে, নিজের কষ্টের বেলা মা
কাহাকেও বলিবে না বা জানাইবে না, মুখ বুজিয়া সমুদ্র গিলিবে।

অশু হস্তির হইয়া পড়িল। এখন কি করে সে! জ্যাঠাইমাদের বাড়ি গিয়া
সব খুলিয়া বলিবে?—গেটাকতক টাকা যদি এখন দার পাওয়া যায় সেখানে,
মাকে তো আপাততঃ পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে এখন।—কিন্তু খানকটা ভাবিয়া
দেখিল, সেখানে গিয়া সে টাকার কথা তুলিতেই পারিবে না—জ্যাঠাইমাকে
সে মনে মনে ভয় করে। অখিলবাবু? সামান্য মাছিনা পায়, সেখানে গিয়া
টাকা চাহিতে বাড়ে। তাহার এক সহপাঠীর কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল,
খুব বেশী আলাপ নাই, কিন্তু শুনিয়াছে বড়লোকের ছেলে—একবার খাইয়া
দেখিবে কি? ছেলেটির বাড়ি বৌবাজারের একটা গলিতে, কলকাতার
বনেদি ঘর, বড় ভেতলা বাড়ি, পূজার দালান, সামনে বড় বড় সেকলে ঘরনের
ঘাস, কানিসে একঝাঁক পায়ের বাসা; বাহিরের ফ্লোরের খোপটা একজন
হিন্দুস্থানী জুজাওয়াল ভাড়া-লইয়া ছাতুর দোকান খুলিয়াছে। একটু পরেই
অপুর সহপাঠী ছেলেটি বাহিরে আসিয়া বলিল—কৈ, কে ডাকছে—ও—তুমি?
—গোল টুএল্ড, এন্ডকিউজ মি—তোমার নামটা জানি নে ভাই—sorry
—এস, এস, ভেতরে এস।

তাহার ঠিকানা জানে, সবই জানে, অথচ কি জ্যাঠাইমা, কি সুরেশদা, কেহই তাহাকে জানায় নাই।

‘ন যথৌ ন তসৌ’ অবস্থায় বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সে জ্যাঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল; জ্যাঠাইমা নিলিখ, অশ্রুমনস্ক সুরে বলিল—খাচ্ছা ত্য, এসো—থাক্ থাক্—খাচ্ছা।

ফুটপাথে নামিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবল—সুরেশদার আগে হয়ে গিয়েছে কান্ডুন মর্মে, একবার বললেও না।—অথচ আমাদের আপনার লোক—আজ ভাবো না নববর্ষের দিনটা যেতেও বললে না—

খানিকদূর আসতে আসিতে তাহার কেমন হাসিও পাইল। খাচ্ছা যদি বলতাম, জোঠিমা আমি এখানে এবেলা খাবো তাহলে—হাঁহি—তাহলে কি হতো।

বাসার কাছে গথৈ দুন্দব-ঠাকুর হোলেগুয়ালার সনে দেখা। দুন্দব নাকি সে অপূর্ব বাসায় গিয়াছে, পায় নাই, আজ পয়লা বৈশাখ, হোলেগো নতুন খাণ্ডা—টাকা দেওয়া চাই হ। দুন্দব-ঠাকুর চাৎকাবের দূরে বাঁলল—ভাতের তো এক পয়সা দিলে না—আবার লুচি খেলে বাবু ন দিন—সাত আনা হিসাবে সাত নং তেষ্ট্রি আনা—তিন টাকা পনেরো আনা—আজ তিন মাস ঘোরাচ্ছেন, আজ খাণ্ডা মহাৎ—না দিলে হবেই না বলে দিচ্ছ।

অপূর দোষ—লেণ্ডে পড়িয়া সে কোথা হঠতে শোপ দিবে না ভাবিয়াও ধাবে আট নয় দিন লুচি খাওয়াছিল। দুন্দব-ঠাকুরের চড়া চাকদায় পথে লোক জুটিয়া গেল—পথে দাড়াইয়া অদন্ত হওয়ার ভয় সে কোথা হঠতে দিবে বিন্দুবিদগ না ভাবিয়াই বলিল, একালে নিলয়ই সব শোপ ক’স্মা দিবে।

বৈকালে একটা বিজ্ঞাপনে দোবল কৌন্সুলে একজন ম্যাক্সিমেলিয়ান পক্ষ করা শিক্ষক দরকার, টাকা মারিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও কেহ ছেঁড়ে নাও খুঁজিয়া তখন বাহির করিল, মেছুয়াবাজারের একটা গলির মধ্যে কাহালা ভাড়া বাড়ির বাহিরের ঘরে স্থল—আপার শ্রাইমারী পাঠশালা। একজন বুদ্ধ বসিয়া দাবা খেলিতেছেন, একজন তাহার মধ্যে নাকি স্কুলের ছেডমাস্টার। অঙ্কের শিক্ষক দশ টাকা বাহিনা—ইত্যাদি। বাজার যা তাতে ইহাই যথেষ্ট।

অপূর মন বেজায় দমিয়া গেল। এট অঙ্কার স্থলঘণ্টা, দাখিয়া, এট ত্রিকালোত্তীর্ণ বুদ্ধগণের মুখে একটা বুদ্ধিহীন সন্তোষের ভাব ও মনের স্তবিরত্ব, ইহাদের সংঘর্ষ হইতে তাহাকে দূরে হটাইয়া লইতে চাহিল। যাহা জীবনের বিরোধী, খানন্দের বিরোধী, সর্বোপরি—তাহার অস্থিমজাগত যে রোষাকের ভঙ্গা—তাহার বিরোধী, অপূ সেখানে একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। ইহাও বুদ্ধ বলিয়া যে এমন ভাব হইল অপূর, তাহা নয়, ইহাদের অপেক্ষাও বুদ্ধ ছিলেন, লৈলবের সঙ্গী নরোত্তম দাস বাবাজী। কিন্তু সেখানে সদাসর্বদা

একটা মুক্তির হাওয়া বহিত, কাশীর কথকঠাকুরকেও এইজন্যই ভাল লাগিয়াছিল। অসহায়, দরিদ্র রক্ত একটা আশাভরা আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মনে—যদিমাত্র জিনিসপত্র বাণিয়া হানিমুখে নতুন সংসার বাণিবার উৎসাহে রাজঘাটের স্টেশনে টেনে চড়িয়া দেশে রওনা হইয়া-
ছিলেন।

মুগ্ধ হইতে যখন সে বাহির হইল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহার কেমন একটা ভয় হইল—এ ভয়টা এতদিন হয় নাই। না খাইয়া থাকিবার বাস্তবতা ইতিপূর্বে এভাবে কখনও নিজে ভাবেনে সে অনুভব করে নাই—বিশেষ করিয়া যখন এখানে খাইতে-পাওয়া নির্ভর করিতেছে নিজের কিছু একটা গুঁড়িয়া বাহির করিবার সাফল্যের উপর। কিন্তু তাহাব সকলের চেয়ে দুর্ভাবনা মায়ের ভয়। একটা পয়সা সে মাকে পাঠাইতে পারিল না, আজ এতদিন মা পয়সা দিয়াছেন—কি করিয়া চলিতেছে মায়ের।...

কিন্তু এখানে তো কোন্‌ও কিছুই আশা দেখা যায় না—এত বড় কলিকাতা শহরে পাড়াগাঁয়েব ছেলে, মহায় নাই, চেনাশোনা নাই, সে কোথায় যাইবে—কি করিবে?...

পরে একটা মাতে যাত্রীর বাড়িতে বোধ হয় বিবাহ। সন্ধ্যার তখনও সমায়া বিলম্ব আছে, কিন্তু এবট মশো-সামনেব লাল-নীল ইলেকট্রিক আলোর মালা জ্বলাইয়া দিয়াছে, দাঁচাবথানা মোটর ও ছুড়ি গাড়ি আসিতে শুরু করিয়াছে। লুচি-ভাঙান মন-মাতানো দুগন্ধে বাড়িব সামনেটা ভবপুর। হঠাৎ অপর পাড়াইয়া গেল। ভাবিল—যদি গিয়া বলি আমি একজন পুণ্ডরীক—সাপাদিন খাট নি—তবে খেতে দেবে না? ঠিক দেবে—এত বড় লোকের বাড়ি, কত লোক তো খাবে—বলতে দোষ কি? কে-ই বা চিনবে আমায় এখানে?...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না। সে বেশ বুকিল, মনে যেন আলো ইচ্ছা থাকিলেও মুখ দিয়া একথা সে বলিতে পারিবে না কাহাবও কাছে—লজ্জা করিবে। লজ্জা না করিলে সে যাইত। মুখচোরা হওয়ার অসুবিধা সে ভাবেনে পদে পদে দেখিয়া আসিতেছে।

কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাপোতা যিবিবে? কথাটা সে ভাবিতে পারে না—প্রত্যেক বক্তাবিন্দু বিদোহী হইয়া ওঠে। তাহার জীবন-সঙ্কানী মন তাহাকে বলিয়া দেয় এখানে জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা—সেখানে অন্ধকার, দৈন্য, নিভিলা যাওয়া। কিন্তু উপায় কই তাহার হাতে? সে তো চেষ্টার ঐকি করে নাই। সব দিকেই গোলমাল। কলেজের মাছিনা না দিলে, আপাততঃ পরীক্ষা দিতে দিলেও বেতন শোধ না করিলে প্রমোশন বন্ধ। থাকিবার স্থানেব এই দশা, দু'বেলা ওষুধের কাবখানার ম্যানেজার উঠিয়া যাটবাব তাগিদ দেয়, আহাির তথৈবচ, সুন্দর-ঠাকুরের দেনা, মায়ের কষ্ট—একেই তো সে সংসারানভিজ, স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির—কিসে নি সুবিধা হয়

এবনিই বোঝে না—তাহাতে এই কয় দিনের ব্যাপার তাহাকে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বাসায় আসিয়া ছাদেব উপর বসিল। একখানা খাপ্‌বা কুড়াইয়া আনিয়া ভাবিল—আচ্ছা, দেখি দিকি কোন্ দিঠটা পড়ে? পবে নিচ্চিন্দিপুবে বালো দিদিব কাছে যেমন শিখিয়াছিল, সেইভাবে চোখ বুজিয়া খাপ্‌বাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেখিল—একবার—দু'বার—কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার দিকটাই পড়ে। তৃতীয় বার ফেলিয়া দেখিতে তাহা সাহস হইল না।

বাল্যকাল হইতে নিচ্চিন্দিপুবেব বিশ লাক্ষী দেবীর উপর তাহার অসীম প্রদা। ককেশ্য দেবীর কথা কত সে শুনিয়াছে, সে তো তাঁর নামের ডেলে—কলিকাতায় কি তাঁর শক্তি থাকে না?

পলীক্ষা হইবার দিনকয়েক পবে একদিন অনিল তাহাকে ডানাইল, সায়েরপে সেক্ষণের মধ্যে সে গম্ভীর ও বস্ত-বিজ্ঞানে পধ্য হইয়াছে, পযেসবের বাঁড় গিয়া নম্র ভাবিয়া তাদিয়াছে। অপু ভাবিয়া আনুগতিক সুখী হইল, অনিলকে সে শ্রীশী ভালবাসে, সত্যিকার চরিত্রবান্ বুদ্ধিমান ও উদারমতি ছাড়া শ্রীশী লেব যে জিনিসটা তাহার ভাল লাগে না, সেটা তাহার অপবকে ভীষণভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করিবার একটা দমনীয় পর্বাণ। কিন্তু এ শ্রীশী কোন মুহুর্তে বা জিনিসে অপু তাহার অসঙ্গতি দেখে নাট—কোনও ভাষা, কি সুবিদ্যাব কথা, কি ব্যক্তি বাসগল্প তাহার মুখে শোনে নাট।

অপু দেখিয়াছে সব সময় অনিলের মনে একটা চাঞ্চল্য, একটা অস্থিরতা—তাহার অসীম মন মহা বহুতর বক্ররূপে প্রকাশিত মত সব সময়ই তাহার দিয়া বসিয়া আছে—কাঁচ বাতী?

অপু সহিত এই জনোই অনিলের মিলিয়াছিল ভাল। দুজনের আশা অনেক আশ্রয়িত এক দশনের। অপু বাল্য ও ইংরেজী লেখা দুই ভাল, কাব্য-প্রবন্ধ, গায় একখানা উপন্যাস পর্যন্ত লিখিয়াছে। শ্রীশী বাল্যেই তাঁর ভাষা—লেখা এমন কিছু নয়, গল্পগুলি ছেলেমানুষি দশনের চক্রেই চলে। কবিতা সব ঠাকুরের নকল, উপন্যাসসম্বন্ধে—জলদস্যব দল, পেম, শ্রীশী কিছুই বদলায় নাট—কিন্তু এইগুলি পড়িয়াই অনিল সম্প্রতি অপু আরও ভরু হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তাহের শেষে শ্রীশী বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গেল। একটা ঝিলের ধারে ঘন সবুজ লক্ষা লক্ষা ঘাসের মধ্যে বসিয়া অনিল বন্ধুকে একটা সুসংবাদ দিল। বগানে আসিয়া গাছের ছায়ায় এইভাবে বসিয়া বলিলে বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষা ছিল। তাহার বাবার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভালবাসেন, বড়বলীর অল্পের খবর তিনি ছিলেন একজন অশীদার, তিনি গত পরীক্ষার ফলে অনিলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজের খরচে বিদেশে পাঠাইতে চাহিতেছেন, আই. এস. সি. টা পাশ দিলেই সোজা বিলাত বা

ক্ৰান্ত ।

—কেমব্রিজে কি ইম্পিৰিয়াল কলেজ অৱ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজিতে পঢ়বো, বাদাৰকোড আছেন, টেমসন্ আছেন—এ দেব সব ছুবেলা দেখতে পাওয়া একটা পুণ্য—যুদ্ধ কামলে ভাৰ্মানীতে যাব মন্ত জাত—বিবাত আইটালিটি—গয়তে, অতঃপৰা দেশ—ওখানে কি আব না আব ?

অনিল অপূৰ বিদেশে যাওবান চান জানে—বলিল, আপনাকে নিয়ে যাবান তেজা কবো। না হয় তেনে আমোদিক যচলে বাব—আমি দব ঠিক কৰব দেখোন।

অনিলেৰ পঠাব যেমন অপূৰ ভাবনে বিস্তাৰ লাভ কৰিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপূৰ চিহ্নেৰ বাবিত্ৰা, মনেৰ ছেলেয়াত্ৰিষ্ণু ও ভাবগ্ৰাহিতা অনিলেৰ কঠোৰ সমালোচনাও অতঃপৰা অক্ৰম-প্ৰৱৰ্ত্তকৈ অনেকটা সন্তত কঢ়িয়া তুলিতেছিল। নবোৰ নিচিয়া অপূৰ আশুও অনেক বেশী, অনেক উদ্ভাস—কলিকাতাব ধোয়া-ভাণ, দক্ষিণ, ভাৰ্ণসা-গন্ধ সিওয়াড' ট্ৰিচেন ভিতৰ বাহিৰ হুইয়া হঠাৎ যেন একটা পদাৰ-পাণ্ডাৰ, চোৎনদা মখা মুক্ত আকাশ, পাখিৰেৰ আনন্দভৰা পক্ষ-সমীৰেণ, কেটা বন প্ৰান্তেৰ বহুসংস সংক্ষিপ্ত ওয়া বয় অপূৰ কথাৰ সুবে, তেজা। সাধু ন্যায় চোখেৰ দৃষ্টিতে, অন্তঃ অনিলেৰ তেজ মনে হয়।

কান্ পথে যাওয়া হইবে সে কথা উঠিল। অপু উৎসাহে অনিলেৰ কাছে ঘোঁষিয়া বলিল—এসো একটা পাঠ কৰ—দেখি হাত ? এসো, আমবা কথখনো কোণাটোৰি কব না, য়সা য়সা কব না কথখনো—স মান্য ভিনিসে ফল না কথনও—বাস ? ... বে মাটিতে একটা দৃষ্টি মাটিয়া বলিল—থুব বড কাত কি, একটা কব জীবনে।

অনিল সাধুও অতঃপৰা মত নিজেৰ প্ৰশংসায় পক্ষমুখ হুইয়া উঠে না, তবুও আত্ম-সাহেব অতঃপৰা অনেক কথা বলিয়া তেলিল, বিলতে এ শেষ কঢ়িয়া। সে আমোদিকায় বাহবে, ভাৰ্ণসা হুইয়া দেশে ফিবিবে। বিদেশ হুইতে ফিবিয়া সাধুজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াই থাকিবে।

অপু বলিল—তখন দেশে হিলাম, তখন আমাৰ একখানা 'প্ৰাকৃতিক ভূগোল' বুলে হে ডা, পুনো বই ছিল—তাতে লেখা ছিল এমন সব নক্ষত্ৰ আছে, যাদেৰ আলো আঙু এসে পৃথিবীতে পৌঁছয়নি, সে-সব এত দূৰে—মনে আছে, সন্ধ্যাৰ সময় একটা নদীতে নেকা ছেড়ে দিয়ে নৌকাৰ ওপৰ বসে সে কথা ভাবতাম, ওপাবে একট কদম গাছ ছিল, তাৰ মাথাতে একটা তাবা উঠত সকলো আগে, তাবাটাৰ দিকে অবাৰ হয়ে চেয়ে দেখতাম—কি যে একটা ভাব হ'ত মনে। একটা mystery, একটা uplift এর ভাব—ছেলে-মাছুষ তখন সে-সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে হুঃখ হয়েছে, কি কোনও ছোট কাজে মন গিয়েছে, তখনই আকাশেৰ নক্ষত্ৰদেব দিকে চাইলেই আবার ছেলেবেলাৰ সেই uplift joy-এৰ ভাবটা, joy বুঝলে ? একটা অতঃপৰা transcendental—সে ভাই মুখে তোমাকে—

বেলা পড়িলে ছ'ম'নে ঘীম'রে কলিকাতায় ফিরিল।

পরদিন কলেজের কমন-রুমে অনেকক্ষণ আবার সেই কথা।

কলেজ হইতে উৎফুল্ল মনে বাহিব হইয়া অনিল প্রথমে দোকানে এক কাপ চা খাইল, পবে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া একটুখানি ভাবিল, কালীঘাটে মাসীর বাড়ি যাওয়ার কথা আছে, এখন যাওবে কিনা। একখানা বই কিনিবার জন্য একবার কলেজ ফ্রীটেও যাওয়া দরকার। কোথায় আগে যায়? অপূর্ব একমাত্র ছেলে, যাব কথা তাব সব সময় মনে হয়। বে কোনরূপে হটক অপূর্বকে সে নিশ্চয়ই বিদেশ দেখাইবে।

তলপেটে অনেকক্ষণ হইতে একটা কী বেদনা বোঝ হইতেছিল, এইবার যেন একটু বাড়িয়াছে, হাঁটিয়া চৌবঙ্গীর মোড় পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা আব না যাওয়াই ভাল। সংযুখেই 'দালহাউ'স ক্লোয়ারের টায়, সে ভাবিল—পরেরটাতে যাব, বেডায় শিড ব'স চিঠিখানা পাকে গেলে আদি।

নিকটেই লাল বংয়ের গোল ডাকবাক্স ফুটপাথের ধারে, ডাক বাবুচাঁব গা ঘেঁষিয়া একজন মুসলমান ফোঁসওয়ালা পাকা কাচকলা বিক্রী করিতেছে, তাহার বাজবায় পী না লাগে এতী জন্য এক পায়ে ভর কাঁথিয়া অন্য পা-খ'ন' একটু অস্বাভাবিক বকমে দিচ্ছেন বঁকাভাবে প্রতিমা সে পবে চিঠিখানা ডাকবাক্সের মুখে ঢাতিয়া দিয়াছে—এমন সময় হঠাৎ চিহ্ন হইতে যেন কে তাঁঙ্গ বর্শা দিয়া তাহার দেহটা একোড-ওয়ে'ড করিয়া দিল, এক নিমেষে অনিল সেটাতে হাত দিয়া সামলাইতেও যেন অবকাশ হইল না।... হঠাৎ যেন পায়ের তলা হইতে মাটিটা সপিয়া গেল... চোখে অন্ধকার—কাচকলাব বাজরার কানাটা মাথায় লাগিতেই মাথাচায় একটা বেদনা—মুসলমান'টি কি বলিয়া উঠিল—হে হৈ, বহু লোক—কি হয়েছে মশায়? কি হল মশায়? সরো সরো—বাতাস করো...বায় নিয়ে এসো...এই যে আমার কামাল নিন না...

অনিলের ছ'টি মাত্র কথা শুধু মনে ছিল—একবার সে অতিক্রমে গোড়াইয়া গোড়াইয়া বলিল—দি—রিপন কলেজ—অপূর্ব বায়—রিপন—

আর মনে ছিল সামনের একটা সাইন বোর্ড—গনেশচন্দ্র দাঁ এণ্ড কোং—কারবাইডের মশলা, তারপরেই সেই তাঁঙ্গ বর্শাটা পুনরায় কে যেন সজোরে তলপেটে ঢুকাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার—

কতক্ষণ পরে সে জানে না, তাহার জ্ঞান হইল। একটা বায় বা ঘবের মধ্যে সে শুইয়া আছে, ঘরটা বেডায় ভুলিতেছে—পেটে ভয়ানক ব্যথা—কাহারো কি বলিতেছে, অনেক মোটরগাড়ির ভেঁপুর শব্দ—আবার ঘোঁরা ঘোঁরা...

পুনরায় যখন অনিলের জ্ঞান হইল, সে চোখ মেলিয়া চাতিয়া দেখিল একটা বড় সাদা দেওয়ালের পাশে একখানা পাটে শুইয়া আছে। পাশে তাহার

বাবা ও ছোট কাকা বসিয়া, আরও তিনজন অপরিচিত লোক। নার্সের পোশাক পরা দু'জন মেম। এটা হাসপাতাল? কোন্ হাসপাতালে? কি হইয়াছে তাহার? তলপেটের যন্ত্রণা তখনও সমান, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, মাথা দেহ যেন অবশ।

পরদিন বেলা দশটার সময় অপূ গেল। সে-ই কাল খবর পাঠিয়া তখন ছুটিয়া শিয়ালদেহের মোড়ে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল সতোন ও চার-পাঁচজন ছেলে। চৌলফোনে অ্যাপুলেন্স গাড়ি আনাইয়া তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় ও বাট্রিতে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন হার্নিয়া...স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া তখন অস্ত্র কবা হইয়াছে।...

বৈকালেও সে গেল। কেবিন ভাড়া কবা হইয়াছে, অনিলের মা বসিয়া-ছিলেন, অপূ গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। অনিল এখন অনেকটা ভাল আছে, অস্ত্র কবাব পবে বেজায় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সাবায়াত ও সারাদিন - অপূরের পব সেটা একটু কম। তাহার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। সে হাসিয়া অপূর হাত ধরিয়া কাছে বসাইল। বলিল—স্বাস্থ্যের মতন তিনিস আর নেই, ৩৩ বর্ষ—তিনটে দিন যেন একেবারে মুছে গিয়েছে ভাবন থেকে।

অপূ বলিল—বেশী কথা বোলা না, যতটা কেমন এখন?

অনিলের মা বলিলেন, -তোমার কথা সব শুনেছি, ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা সেদিন।

অনিল বলিল—দেখবেন মজা, ঘণ্টা নাড়লেই নার্স এখনি ছুটে আসবে— বাতাব দেখবেন?—সে হাসিয়া একটা হাত-ঘণ্টা বাজাইতেই লম্বা একজন নার্স আসিয়া হাজির। সে চলিয়া গেলে অনিলের মা বলিলেন—কি যে করিস্ মিচিমিচি? ছিঃ—

৩৬ নৈই পব হাসিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ গড়েব মাঠের দিকে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পব বাসায় ফিরিয়া অপূ সব আলোটি জালিয়াছে, এমন সময় সতোন ও অনিলের পিসতুতো ভাই ফণী—অপূ, তাহাকে হাসপাতালে প্রথম দেখিয়াছে, সেখানেই প্রথম আলাপ—বাস্তব সমস্ত অবস্থায় ঘবে ঢুকিল। সতোন বলিল—ওঃ, তোমাকে হ'বার এব আগে থুঁড়ে গেছি—এখনি হাসপাতালে এস—ভান না?

অপূ ভিজাসু দৃষ্টিতে ওহাদেব মুখেব দিকে চাহিতেই ফণী বলিল—অনিল মাবা গিয়াছে এই সাড়ে চটাব সময়—হঠাৎ।

সকলে ছুটিতে ছুটিতে হাসপাতালে গেল। অনিলের মৃতদেহ খাট হইতে নামাইয়া সাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া যেরেতে বাখিয়াছে। বহু আত্মীয়স্বজন কেবিন ভবিয়া গিয়াছে, ক্রাসে অনেক ছেলে উপস্থিত, একদল ছেলে এইমাত্র এসেস ও ফুলের তোড়া লইয়া কেবিনে ঢুকিল! অল্পপরেই মৃতদেহ নিমতলায়

লইয়া যাওয়া হইল।

সব কাজ শেষ হইতে তিনটা বাজিয়া গেল।

অন্য সকলে গল্পাঙ্গান করিতে লাগিল। অপু বলিল, তোমরা নাও, আমি গল্পায় নাইব না, কলেব জলে সকালবেলা নাইবো। কলকাতার গল্পায় নাইতে আমার মন যায় না।

অনিলের বাবার মত লোক সে কখনও দেখে নাই। এত বিপদেও তিনি সাবা রাত বাঁধানো চাতালে বসিয়া শীতাবে কাঠেব নল বসানো সটকাতে তামাক টানিতেছেন। অপুকে বার দুই 'ওয়াস' ক'বয়'ছেন - বাবা তোমার দম লাগে নি তো ১০০ কোনও কফি হয় তো বলো বাবা।

অপু শুনিয়া চোখেব জল বাধিতে গায়ে নাই।

সুনীল সিগারেট কেসটা তাহার জিহ্মায় বাধিয়া জলে নামিলে সে ঘাটের দাপের উপর বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য অলম্বলে নক্ষত্র, বাত্রেয়েষেব আকাশে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল ওপারে ডেসপ কোম্পানীর কাবখানার মাধায় কুঁকিয়া পড়িতেছে, পূব আকাশে চিত্রা প্রাণাসঃ 'দবালোকের মুখে মলাইয়া যাইতেছে। অপূব মনের মনে কোন শোক কি দুঃখের ভাব বুজিয়া পাইল না—কিন্তু মাত্র তিন দিন আগে কোম্পানীর বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সাবা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রবাণীর দিকে চাইয়া ঝালো নদীর পারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখেবার দিনগুলি মনে এক অপূর্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল—কেমন মনে হইতে লাগিল, কি একটা অসীম রহস্য ও বিপ্লবের ভাবেই নিবাক নক্ষত্র জগৎটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হইতে।

অনিলের মুক্তার পর অপু বড় মুসড়াইয়া পড়িল। কেমন এক ধরনের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে, কোনো কাজে উৎসাহ আসে না, ভাণ্ডার উঠে না।

বৈকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলেজ-স্কোয়ারের একখানি বেস্ট্রি উপর বসিল। এতদিন তো এখানে বহিল, কিছুই স্থির হইল না, এভাবে আর ক'দিন চলে? ভাবিল, না হয় অস্থুলেসে যেতাম, কলেজের অনেকে তো যাচ্ছে, কি হয়? কি তা যেতে দেবে?

পরে ভাবিল—বাড়ী চলে যাই, মাসখানেক অর্ডারলি রিট্রিট করা যাক।

পাশে একজন দাঁড়িওয়াল ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়াছিলেন। বধ্যবস্তু লোক, চোখে চশমা, হাতেব শিরগুলি দড়ির মত মোটা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাঁতারের মাচা কবে হবে জানেন?

অপু জানে না, বলিতে পারিল না। ক্রমে ২-চার কথায় আলাপ জমিল। তাঁতারেরই গল্প। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল—তিনি ইউরোপ আমেরিকার জাহাজ ঘুরিয়াছেন। অপু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার নাম

জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক।

অনেকদিনের একটা কথা অপুর মনে পড়িয়া গেল, সে সোজা হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি আপনাকে চিনি। আপনি অনেকদিন আগে বঙ্গবাসীতে ‘বিলাত যাত্রীর চিঠি’ লিখতেন।

—হাঁ, হাঁ,—ঠিক, সে দশ এগারো বছর আগেকার কথা—‘তুমি কি ক’রে জানলে?’ পড়েও না কি?

—ওঃ, শুধু পত্র-তাম্রণ, হাঁ করে বসে থাকতাম কাগজখনার জন্যে—তখন আমার বয়েস বছর দশ। পাড়ার মধ্যে থাকতাম—কি inspiration যে পেতাম আপনাব লেখা থেকে।...

ভদ্রলোকটি শ্রী পুশা হইলেন। সে কি কবে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন—আমো, কোথায় ব’সে কে লেখে আব কোথায় গিয়ে তার বৌ ডেড পড়ে...বিলেতে ছাম্পস্টেডে একটা বোর্ডিং-এ বসে লিখতাম, আব বা’ল’ফ এক obscure পাড়ার মধ্যে এক ছোট ছেলে আমার লেখা পড়ে—বাঃ-বাঃ—

ভদ্রলোকটির বাবসা-বাণিজ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল। মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে জমি লইয়াছেন, নারিকেল ভ্যানিলা চাষ করিবেন। নিঃসন্দেহ তেরো বৎসরের নিজে বালককে ইংল্যান্ডে আসিয়া নিজে উপার্জন নিজে কবিতা দেখি-য়াছেন—দেশের যুবকদের চাষবাস করিতে উপদেশ দেন।

ভদ্রলোকটিকে আর অপুর অপরিচিত মনে হইল না। তাহার বাল্যজীবনের কতকগুলি অর্ধাঙ্গী, আনন্দ-মুহূর্তের জন্য এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দায়ী, ইহারই লেখার ভিতর দিয়া বাহিরেব জগতের সঙ্গে সেই আনন্দ-ভরা ম পরিচয়—সম্পর্ক নতুন মনের উৎসাহ লইয়া সে ফিবি। কে জানিত বঙ্গবাসীর সে লেখকের সঙ্গে এভাবে দেখা হইয়া যাইবে।...শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেঁচাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমার অনামনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে—সে যে কবিতা হৃদয় বাঁচিবে।

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেল-বাড়ির বড় বোঁ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল, দুব হইতে অন্ধকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—কে আসছে বলুন তো মা ঠাকুরাণী—বড়সার বৃক্কেব ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল অপুর নয় তো—অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অন্ধকে বৃক্কেব ভিতর জড়াইয়া ধরিল। সর্বাঙ্গের চোখের জলে তাহার জামার হাতাটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন নিজের অপেক্ষা পাখার ছোট, দুবল ও অসহায় বলিয়া অপূর্ণ মনে হইতে লাগিল। তপঃক্লম শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, আলুখালু, অর্ধক্লম চুলের গোছা

একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখা-
বলী এখনও অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবারে মায়ের চুল পাকিয়াছে,
কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহু-বেষ্টনে, সরলা,
চিরদুঃখিনী মাকে সংসাবে সহস্র দুঃখ-বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপূর
ইচ্ছা যায়। এ ভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল, ইতিপূর্বে
কখনও হয় নাই।

বড়-বৌ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে,
এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সবজন্মা বলিল,—এবার ও
এসেছে বোমা, এবাব কালই কিন্তু।

অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি খুঁজিমা, কাল কি?

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল,—দেখো কাল,—আজ বলবো না তো।

খিচুড়ী খাইতে ভালবাসে বসিয়া সবজন্মা অপুকে পাত্রে খিচুড়ী রাঙ্গিয়া
দিল; পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল, এই সাও-আটদিন পব আজ মায়েব কাছে।

সবজন্মা জিজ্ঞাসা করিল,—ই্যা রে সেখানে খিচুড়ী খেতে পাস?

অপূর শৈশবে তাহার মাস্ত প্রতারণাব আবরণে নয় দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর
রূপকে তাহাদেব শিশুচক্ষু খাড়া করিয়া রাখিতেন, এখন আবার অপূর
পালা। সে বলিল—ওঁ, বদলা হইলেই খিচুড়ী হয়।

—কি ডালের কবে?

—মুগেব বেশী, মসুরীরও করে, খাঁড়ি মসুরী।

—সকালে জলখাবার খেতে দেয় কি কি?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের এক কাল্পনিক বিবরণ পূর্ব উৎসাহের সহিত
বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, এক-একদিন লুচিও দেয়। পাওয়ার
বেশ সুবিধা।

প্রীতির টুটশানি কোন্‌কালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সেকথা মাকে
জানায় নাই, সবজন্মা বলিল—ই্যাবে, তুই যে সে মেয়েটিকে ‘ডাস—তাকে
কি বলে ডাকিস? পূর্ব বড়লোকের মেয়ে, না?

—তার নাম খবেই ডাকি—

—দেখতে-সুনেতে বেশ ভাল?

—বেশ দেখতে—

—ই্যা রে তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না? বেশ হয় তা হ’লে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল,—ই্যা—তার হ’ল বড়লোক—আমাব সঙ্গে—
তা কি কখনও—তোমার যেমন কথা।

সবজন্মার কিন্তু মনে মনে বিগ্ৰাস অপূর মত ছেলে পাটলে লোকে এখন
লুক্কি লগেবে। অপু ভাবে, তবুও তো যা আসল কথা কিছুই জানে না।

প্রীতির টুটশানি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায়?

অপু দেখিল—সে যে টাকা পাঠায় নাই, যা একটিবারও সে-কথা উত্থাপন

করিল না, শুধুই তাহার কলিকাতার অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহ-ভরা প্রশ্ন : নিজেকে এমনভাবে সর্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মত সে আর কাহাকেও এ পর্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত বাড়ি গেলে এ লইয়া মা কোন কথা তুলিবে না।

সবজিয়া একটা এনামেলের বাটি ও গ্লাস দ্বন্দ্ব ভিতর হইতে আনিয়া হাসিমুখে বলল, —এই ছাপ, এই ছাপনা চেঁড়া কাপড় বদলে তোর জগে নইচি—বেশ ভালো, না ?...কত বড় বাটিটা ছাপ।

অপু ভাবিল, মা এা ভাখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো, যদি আমাব সেই পুণানো-দোকানে কেনা প্লেটগুলো মা দেখত।

কলিকাতায় সে একই ভাবন-সংগ্রামের পর এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে। বাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলেমানুষের মত মনে কবে—বলে, সেই গানটা কি মা, ছেলেবেলায় তুমি আমায় শুনিয়ে শুয়ে শুয়ে বাঁচি গাইতাম—এক-একদিন দিদিও—সেই চিরদিন কখনও দ্যা'ন না যাস্ন—কভু বনে বনে বনে বাখালেবি সনে, কভু বা রাজত্ব পায়।—

পরে আবদাবের সুবে বলে—গাও না মা গানটা ?

সবজিয়া হাসিয়া বসে—হ্যা, এখন কি আব গলা আছে—দুব—

—এসো ছ'তনে গাই—এসো না মা—খুব হবে, এসো—

সবজিয়া মনে আছে—অপু এখন ছোট ছিল তখন কোনও কোনও মেয়ে-মজলিসে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান হয়ত হইত, অপূর গলা ছিল খুব মিট কিম্ব তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান-গাওয়ানো যাইত না—অথচ যেদিন তাহার গা'হিবান ইচ্ছা হইত, সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বাব বাব বলত, আমি কিম্ব আজ গান গাইবো না, গাইতে বলো না। অর্থাৎ সেদিন তাকে একআবার বলিলেই সে গাহিবে। সবজিয়া ছেলেব মন বুঝিয়া অমনি বলিত—তা অপু এবার কেন একটা গান কব না '...হ' একবার লাজুক মুখে অস্বীকার করায় পর অমনি অপু গান শুরু করিয়া দিত।

সেই অপু এখন একজন মানুষের মত মানুষ। এত রূপ এ অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে ? একহারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত-পা। কি মাথার চুল, কি ডাগব চোখের নিষ্পাপ পবিত্র দৃষ্টি : রঙা চোঁটের ছ'পাশে বালোব সে সুকুমার ভঙ্গী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু সর্বজিয়াই তাহা খরিতে পাবে।

অপু কিম্ব সে ছেলেবেলাব অপু আর নাই। প্রায় সবই বদলাইয়া গিয়াছে, সে অপূর্ব হাসি, সে ছেলেমানুষী, সে কথায় কথায় মান অভিমান, আবদার, গলায় সে রিগ'রিগে মিষ্টি সুব—এখনও অপূর স্বর খুবই মিষ্টি—তবুও সে অপরূপ ষালাস্বর, সে চাঞ্চল্য—পাগলাখি—সে সবার কিছুই নাই। সব ছেলেই বালো সমান ছেলেমানুষ থাকে না কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। সরলভায়,

হুফামিতে, রূপে, ভাবুকতায়—দেবশিশুর মত । এক ছেলে ছিল তাই কি, শত ছেলেতে কি হয় ? সবজয়া মনে মনে বলে—বেশী চাই নে, দশটা পাঁচটা চাইনে ঠাকুব, ওকেই খাব জন্মে আবার কোলজোড়া করে দিও ।

সবজয়ার জীবনের পাত্র পবিপণ কপিস্না অপ, যে অমৃত শৈশবে গণিবেশন কবিস্নাছে, তারই স্মৃতি তাব দুঃখ-ভাবা জীবন-পথে পাথেয় । আর কিছুই সে চায় না ।

কোনও কোনও দিন বাত্রে অপ, মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায় । সবজয়া বলে—তুই তো কত ইংবেজী বই পড়িস, কত কি—তুই একটা গল্প বল না বৎ শুনি । অপু গল্প কবে । শুভনে নানা পরামর্শ কবে, সবজয়া প.এর বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ কবে । কঠোদহের সাঙাল বাড়ি নাকি ভালো ময়ে আছে সে শুনিয়াছে, অপু পাশটা দিলেই এইবার...

তারপর অপ, বলিল,— ভালো কি না—আজকাল জোঠামা কলকা গয় বাড় পেয়েছে যে । সেদিন তাদের বাড়ি গেচলাম—

সবজয়া বলে,— তাই নাকি প.এ. থেকে দুই বছর কবলে ? কি খেতে দিলে—

অপ, নানা কথা সংজাইয়া ব'নাইয়া বলে, সবজয়া বলে, আমায় একবার নিয়ে যাবি—কলকাতা কখনও দেখি নি, বক্তৃতা-দেব বাড়ি গদিন থেকে মা-কালীচরণ দর্শন করে আসি তা হলে...

অপু বলে,— বেশ তো মা, নিয়ে যাব, খেতে দেই জোব সময় ।

সবজয়া বলে,— একটা দিন আছে প.এ. বক্তৃতা-দেব দর্শন নিশ্চিন্দিপুত্রে বাগানখানা মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস তুবন মুখ্যোদেব কা থেকে, তবে—

সামান্য সন্দ, সামান্য আশা । কিন্তু যত সাধু যত আশা, তব কাছে তা হতাশ নয়, সামান্যও নয় । মায়ের বাবা কোনখানে অপু তাহা বুঝিতে দাঁব হয় না । মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুত্রে গিয়া বাস কবা, সে অপ জানে । সবজয়া বলে,— তুই মানুষ হ'লে, তোর একটা ভাল চাকরি হ'লে তোর বো নিয়ে তখন আবাব নিশ্চিন্দিপুত্রে গিয়ে ভাঙেতে কে'টা ঘিয়ে বাস করবো । বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস বড় ইচ্ছে হয় ।

অপু কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশীদিন বাঁচবে না । মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবাব, কেবল অন্যে ভাগিতেছে । মুখে যত সাধুন দেওয়া, তত আশার কথা বলা সব বলে । জানলার দ'বে তক্তপোশে দুপুরের পর মা একটু খাইয়া পড়ে, অনেক বেলা পড়িয়া যায় । অপ, কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে,— গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি ?

সবজয়া সে-সব কথা উড়াইয়া দেয় । এ-গল্প ও-গল্প করে । বলে—ইয়ারে, অন্তরী বা আমার কথা-টখা কিছু বলে ?

ছেলে, তরুণ অপ., এব মন, মতিগতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা—সর্বজন্মের অভিজ্ঞতার বাহিরে...অপ, বলে,—না মা, তুমি সেই ছেলেবেলায় শ্যামলকার গল্পটা কবো সর্বজন্ম বলে,—তা আবার কি জ্ঞানবি- -তুই বং তোব বইয়ের একটা গল্প বল —কত ভালো গল্প তো পড়িস।...

পরদিন সে কলিকাতায় ফিবি।

কলেজ সেইদিনই প্রথম খুলিয়াছে, প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটিশ বোড়ে ব কাছে বধ্যাত্রার ভিড—সে অদৌ আশ্রয়ে ভিড ঠেলিয়া নিজেব নামটা আছে কিনা দেখিতে গেল।

আছে। দু'তিনবার বেশ ভাল করিয়া দেখিল। আরও আশ্চর্য্য এই যে পাশেই যে সব ছেলে পাশ করিয়াছে অংক বেতন বাকী থাকার দরুন প্রমোশন পায় নাই, তাহাদের একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অপ, নাম নাই, অংক অপ, জানে তাহাদের সবাপেক্ষা বেশী বেতন বাকী। সে ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভিডেব বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া একরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, নান্দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয় ও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

দু-তিনদিন পরে তাহাদের এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে অফিস-ঘরে কেরানীর কাছে গেল, সে ও গেল সঙ্গে। হে- কাক বলিল—একি ছেলের হাতে মোয়া হ চোকণ। কত বেলা ১০ পরে কে খানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া অংক ল দিয়া দেখাইয়া বলিল— এট ছাপো গোল টেন—কালির মাকী মংবা রয়েছে— দু'মাসের মাছিনে বাকী— মাছিনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, পিপিপলের কাছে যাও, তুমি অংক কি কবো ?

অপ, তাড়াতাড়ি অংকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল—তাহার গোল নম্বর দুটি ---একটি প'তায়। দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে সঙ্গে কালিতে 'পি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার মাছিনা দেয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে নামের প'ট'দিকে মন্তব্যের ঘরে কেন' কোন মাসের মাছিনা বাকী তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহাদের নান্দিক কেন' কিছু দাগ বাতু অ'চিড নাই—একেবারে পরিষ্কার মুক্তার মত হাতে লেখা অলম্বল করিতেছে—বায় অংক কুমা—লাল কালির একটা বিন্দু প'তায় নাই,—

ঘটনা হয়ত খুব সামান্য, কিছুই না। হয়ত এটা সম্পূর্ণ কলমেব ভুল, না হয় কেরানীর হিসাবের ভুল। কিন্তু অপ, মনে ঘটনাটা গভীর বেখাপাত করিল। মনে আছে—অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় তাহার দিদি খেবার মাথা গিয়েছিল, সেবার শীতের দিনে বেকালে নদীর ধারে বসিয়া ভাবিত, দিদি কি নরকে গিয়াছে ? লেখানকার বর্ণনা সে মহাভারতে পড়িয়াছিল, ঘোর অন্ধকার বরকে শত শত বিকটাকার পানী ও তাহাদের চেয়েও বিকটাকার

যমবুতের হাতে পড়িয়া তাহার দ্বিদির কি অবস্থা হইতেছে। কথাটা মনে আসিতেই বুকের কাছটায়া কি একটা আটকাইয়া যেন গলা বন্ধ হইয়া আসিত—চোখের জলে কাশবন শিমুলগাছ আপসা হইয়া আসিত, কি জানি কেন, সে তাহার হৃদয়মুখী দ্বিদির সঙ্গে মহাভারতের নরকের পাবিপাত্তিক অবস্থায় যেন কোন মতেই ঝাপ খাওয়াতেই পারিত না। তাহার মন বলিত, না—না দ্বিদি সেখানে নাই—সে জায়গা দ্বিদির জন্য নয়।

তারপর ওখানে কাশবনে দ্বান সজ্জাব রাঙা ঠালো যেন অপূর্ণ বহন্য মাখানো মনে হইত—আপনা আপনি তাহার শিশুমন কোন অদ্ভুত শক্তির নিকট হাতছোড় করিয়া, প্রার্থনা করিত—আমাব দ্বিদিকে তোমরা কোন কণা দিও না—সে অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে—তোমাদের পায়ে পড়ি, তাকে কিছু বলো না—

লেলেবেলা সে শুভ্র নিভৃততার ভাব দে এখনও হাব'য় নাই। এই সেদিনও কলিকাতার পথে আসবার সময়ও তাহার মনে হইয়াছিল—খাই না, আমি তো একটা ভাল কাজে যাচ্ছি—কত লোক তো কত চায়, আমি বি'দা চাইছি—আমায় সব সময় ভগবান ঠিক করে দেবেন—। তাহার এ নিভৃততা আরও বাড়িতে উঠে দাঁড় করাইয়াছিলেন দেওয়ানপুরের হেডমাস্টার মিঃ পি। তিনি ছিলেন—ভক্ত ও বিগানী খুঁস্টান। তিনি ও হাকেরে—সব কথা পলিতেন অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে সে ভাবে কথা বলিতেন না। শুধু গাম্ভীর্য আলোড়িত নয়—কত উপদেশের কথা, গভীর বিশ্রামের কথা প্রবল পরলোক অন্তিম অধরেব নানা গোপন বাণী। হয়ত বা তাহার মনে হইয়াছিল, এ বালকের মনের ক্ষেত্রে সকল উপদেশ সময়ে অর্থহীন হইবে।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি শস্যায় ফেবিওয়ালা হাঁকিতেছে, 'পেন্সারিফুলি অ'ম' 'লাংগা অ'ম' দিনব্যাপি টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, পথঘাটে জল কাদা। এই সময়টার সঙ্গে খুব কেমন একটা নিবাস্রয়তা ও নিঃস্বলতার ভাব জড়িত হইয়া আছে, আর—বলা ঠিক এই সময়টিতে কলিকাতায় নতুন আসিয়া অবলম্বন-শূন্য অবস্থায় পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছিল, কি না জানি হয়, কোথায় না জানি কি সুবিনা জুটিবে—এবারও তাই।

ঈশ্বরের কারখানায় এবাব আর স্থান হয় নাই। এক বন্ধুব যেসে দিনকতক চট্টয়াছিল, এখন আবার অন্য একটি বন্ধুব যেসে আছে। নানাস্থানে ছেলেপড়ানোর চেষ্টা করিয়া কিছুই জুটিল না। পবের যেসেই বা চলে কি করিয়া? তাহা ছাড়া এই বন্ধুর ব্যবহার তত ভাল নয়, কেমন যেন বিরক্তির ভাব সবদাই—তাঁহার অবস্থা সবই জানে অথচ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, সে যেস খুঁজিয়া লইতে এত দেরি কেন করিতেছে—

এ মাসটার পরে আর কোথাও সিট খালি পাওয়া যাইবে? অপু মনে বড় আহত হইল। একদিন তাহাব হঠাৎ মনে হইল খবরের কাগজ বিক্রয় করিলে কেমন হয়? কলিকাতার খরচ চলে না? মাকেও তো...

অপু সব সন্ধান লইল। তিন পয়সা দিয়া নগদ কিনিয়া আনিতে হয় খবরের কাগজের অফিস হইতে, চাব পয়সায় বিক্রী, এক পয়সা লাভ কাগজ পড়ু; কিন্তু মূলধন তো চাই; কাহাবও কাছে হাত পাতিতে লজ্জা করে, দিবেই বা কে? এই কলিকাতা শহরে এমন একজনও নাহি যে তাহাকে টাকা দেয়? সে সুদ দিতে বাজী আছে। সমীবেব কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সে ভাল কবিতা কথা কয় না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে কারখানার ওয়েয়ারী-বেয়ের কাছে গিয়া সব বলিল। ওয়েয়ারী-বো সুদ লইবে না। শুকাইয়া ছুটা মাত্র টাকা বাড়ির কারিয়া দিল। তবে আশ্বিন মাসে তাহাব দেশে যাইবে, তাহাব পূবে টাকাটা দেওয়া চাই।

ফিরবার পথে অপু ভাবিল - বহর পায়ের শুলো নিতে হচ্ছে করে, মায়ের মত ছাখে, আহা কি ভালো লোক।

পরদিন সকালে সে ছুটিল অমৃতবাজার-পত্রিকা অফিসে। সেখানে ক'গজ-বিক্রেতাদের মাঝমাঝি, সবাই আগে কাগজ চায়। অপু ভিতরে যেন ঢুকিতে পারিল না - কাগজ পাইতে বেলা হইয়া গেল। তাহাব সব এক নতুন বিপদ - অন্য ক'গজওয়ালাদের নত কাগজ হাকিতে তো দূবেব কথা, লোকে তাহার দিকে চাহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, গলা দিয়া কোনও কথা বাহিব হয় না। সকলেই তাহাব দিকে চায়, সুশ্রী সুন্দর পত্রলোকের ছেলে কাগজ বিক্রয় করিতেছে, এ দৃশ্য তখনকার সময়ে কেহ দেখে নাহি। অপু, তবে - বা রে, আমি কি চডকেবন হুন সঙ্ক নাকি? খানিক দূরে থাও একটা জায়গায় চলিয়া যায়। ক'হাকেও বিনীতভাবে মুখের দিকে না চাহিয়া বলে, একখানা খবরের কাগজ নেবেন? অমৃতবাজার?

কলেজে যাইবার পূবে মাত্র আঠারোখানি বিক্রয় হইল। বাকীগুলি এক খবরের কাগজের ফেবিওয়ালারা তিন পয়সা দরে কিনিয়া লইল। পরদিন লজ্জাটা কমিল, টামে অনেকগুলি কাগজ কাটিল, বেশ হয় বাঙালা ভদ্র-লোকের ছেলে বলিয়াই তাহার নিকট হইছে অনেকে কাগজ লইল।

মাসের শেষে একদিন কলেজে হৈ চৈ উঠিল। গিয়া দেখে কোথাকার এক ছেলে লাইব্রেরীর একখানা বই চুরি করিয়া প্লাইতেছিল, দরী পড়িয়াছে - তাহারই গোলমাল। অপু তাহাকে চিনিল - একদিন আর বহর সে ঠাকুর-বাড়িতে বাইতে যাইতেছিল, ওই ছেলেটিও বারানসা ঘোষ ফ্রীটের দণ্ডবাড়ি দরিদ্র ছাত্র হিসাবে বাইতে যাইতেছিল। শীতের রাত্রি, খুব রুষ্টি আসাতে ছ'জনে এক গাড়ী-বারান্দার নীচে ঝাড়া ছ'ঘন্টা দাঁড়াইয়া থাকে। ছেলেটি অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া অতদূর বাইতে যায় শুনিয়া অপু মনে বড় দয়া হয়। সে নাথও জানিত, যেটোপলিটন কলেজে থার্ড ইয়ারের ছেলে তাহাও জানিত,

কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিল না। কলেজ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুলিশের হাতে
দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, দর্শনের অধ্যাপক বুদ্ধ প্রসাদদাস মিত্র যথাস্থতা
করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

অপুর মনে বড় আখাত লাগিল—সে দিছু দিছু গিয়া অগিল মিস্ত্রী লেনের
মোড়ে ছেলেকে ধরিল। ছেলের নাম হবেন। সে দিশাহাবার মত
হাতিতেছিল, অতুলে চিন্তা করা কঠিন। কাদিয়া কাদিয়া কেলিল।
আর পাঠে দেয় না—বনন। এবদেশ, এ নে কোনও আশ্রয়স্থান
নাহ। অতুল মিস্ত্রীপুরে এ বনানী বেদিতে তাহাকে চানিয়া লম্বা গিয়া
বসাইল, ছেলের নাম দেবে বনেন্দ্র নাগ এ কালো চুল রক্ষ, গায়েব শর্ট কডির
অনেকটা উপর দাখ হেঁচা। অতুল চোখে চল আসিতোছিল, বলিল—
তোমাকে একটা মন দিই শোনো। এববেব কগজ বিক্রি কবে ৭ বাদাম-
ভাড়া পাওয়া যাবে—এই বদামাত্রা—

সত্যবন্ত প্রভৃতির বেশ চলল। এ সব সবই পুনর্মুখিক—তেওয়ারী
বৌয়ের দোশে ন কথিয়া হা কিল তাহাতে মাসিক খরচের কিছু অংশ
ফুলান হব বলে, বেশ লাভ হব না। সুকেনে যথার্থে সে প্রদীক্ষাও হইয়া
গেল। এবা ৪ গোলমাল—মাগ বচনের মাহিনা ও পরীক্ষার দিন দিতে হইবে
অন্য দিন পথে।

দুসার কিছুই নাই। নে ক'হ'বও ক'ছে কিছু চ'হিতে প'শিবে না। হস্ত
শোকা দগুয়াই হ'ব না। সত্য হ'তে এত ঢাকা—এতো খাব ছেলেখেলা
নয়? ম'থকে একদিন হ'ল'ম সব খ'ল'খা বলে। ম'থ শুনিয়া অব'ক হইয়া
গেল, বালল—এব'ক'না অ'শ'না হ'ব তা'মাকে। ম'থ সতাই খুব
খাটিল। নিজে দ'খ'ব বাস ল'হ'ব এতে চ'দা তুলিয়া প্র'ম প'ক্ষাশ টাকা
খানিয়া দিল ক'লেছে প্র'ম'ম'দ'ম' ম'নে। চ'দা তুলিয়া কে'ল'ন। অ'ল'দিনের
ম'নে। অ'প্র'ত্যাশিতভাবে অনেক ল'ল'চ'কা হ'সিতে দে'ব'য়া অ'শু নিজেই আশ'চ'র্য
হইয়া গেল। কিছু বাকী বেতন এক 'শ'ন হইলেও তখনও প'ব'জার
শি—এব' এক 'ম'নাও জোনা হয় নাও, ম'থও বো'ব'জারেব সেই ছেলেটি
বিশ্ব'ন'—হ'জ'নে ম'নিয়া শ'হ'স—প্রাণপ'পালকে গ'িয়া খ'বিল, অ'শুকে
ক'লেজেব বাকী বেতন কিছু ছা'ড়িয়া দিতে হইবে।

এদিকে ষষ্মের কারখানায় থাকিবার সুবিধাও জন্য অপু পুনরায় কারখানার
মানোজ্ঞারের নিকটে গেল। এই মস তিনেক যদি সেখানে থাকিবার সুবিধা
পায়, তবে পরীক্ষার পড়তি করিতে পাবে। এবং-ওর-তার মেসে সাবা বছর
অস্থিতপক্ষভাবে থাকিয়া তেমন পড়াশুনা হয় নাই। কাবখানাব আব সকলে
অপুকে চিনিত, পছন্দও করিত, তাহাবা বালাল—ওহে, তুমি একবার মি:
লাহিড়ীর কাছে যেতে পার ? ওব কাছে বলাই ডুল—মি: লাহিড়ী কাবখানাব
একজন ডিবেষ্টব, তাঁর চিঠি যদি আনতে পার, ও সুড—সুড ক'রে বাজী হবে
এখন। ঠিকানা লইয়া অপু উপরি উপরি, তিন-চার দিন ভাবানীপুরে মি:

লাহিড়ী বাড়িতে গেল, দেখা পাইল না,—বডলোকের গাড়ী-বারান্দার ধারে
বেঞ্চের উপর বসিয়া চলিয়া আসে। দিনকতক কাটিল।

সোদন রবিবার। ভাবিল, আজ আব দেখা না করিয়া আসিবে না।
যি: লাহিড়ী বাড়ী নাই বটে, তবে বেলা এগারোটার মধ্যে আসিবেন।
যা নিককণ বসিয়া আছে, এমন সময় একজন যি আসিয়া বলিল—আপনাকে
দিদিমণি ডাকছেন—

অপু আশ্চর্য হইয়া গেল। কোন্ দিদিমণি তাহাকে ডাকিবেন এখানে?
সে বিশ্বস্তের সুবে বলিল—আমাকে? না—আমি তো—

যি ভুল করে নাই, তাহাকেই। ডানদ্বারে একটা বড় কামরা, অনেকগুলো
বড় বড় আলমারী, প্রকাণ্ড বনাত-মোড়া টেবিল, চামড়ার গদি-খাটো আগাম
চেয়ার ও বসিবার চেয়ার। সড় বাগান্দা পাব হইয়া একটা চকমিলানো ছোট
পাথর-বাঁধানো উঠান। পাশের হোট ঘবতায় হাঙ্গল-হোন চেয়ারে একটা
আঠারো-উনিশ বছর বয়সের তরুণ বসিয়া বেবিলে বড় কাগজ ছড়াইয়া ক
লিখিতেছে, পংগে সাদাসিদ্দি আঁটপোবে লাল-হাটু, গোড়, চিলে
খোঁপা, গলায় সড় চেন, হাতে গ্লেন বালা—অপরূপ সুন্দরী। সে ঘরে মুকিটেই
মেয়েটি হাসিমুখে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপু স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? সকালে সে আজ কাহা মুখ দেখিয়া
উঠিয়াছে।...নিজেব চোখ ক যেন বিশ্বাস করিয়াও কণা যায় না—আপনা
আপনি তাহার মুখ দিয়া বা'হব হইল—লীলা।

লীলা মুহু মুহু হাসিমুখে তাহার 'দকে চাহিয়া ছিল। বলিল—চিনতে
পেরেছেন তো দেখছি? আপনাকে কিঞ্চু চেনা যায় না—ওং, কতকাল পর
—আট বছর খুব হবে—না?

অপু এতক্ষণ পর কণা ফিরিয়া পাইল। সন্দেহে এই অনিন্দাসুন্দরী তরুণী
লীলাও বটে, না-ও বটে। কেবল হাসিব ভাঙ্গি ও এক সংনেব হাত বাখিবার
ভঙ্গিটা পরিচিত পুরানো।

সে বলিল, আট বছর—হাঁ তা—তো—তোমাকেও দেখলে চেনা যায় না।
অপু 'আপনি' বলিতে পারিল না, মুখে বাড়িল, লীলা'র সন্দেহনে সে মনে
আঘাত পাইয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনাকে ৩'দিন দেখেছি, পনশু কলেজে যাবার সময় গাড়িতে
উঠছি, দেখি কে একজন গাড়ী-বারান্দার ধারে বোফিতে বসে—দেখে মনে হল
কোথায় দেখেছি যেন—আবার ভালও দেখি ব'সে—আজ সকালে বাইবেব
ঘরে খবরের কাগজখানা এসেছে কিনা দেখতে জানালা দিয়ে দেখি আজও
বসে—তখন হঠাৎ মনে হল আপনি...তখনই মাকে বলেছি, মা আসছেন...
কি করছেন কলকাতায়? রিপনে? বাং, তা এতদিন আছেন, একদিন
এখানে আসতে নেই?

বালোর সেই লীলা!—একজন অভ্যস্ত পরিচিত, অভ্যস্ত আপনার লোক যেন

দূরে চালিয়া গিয়া পর হইয়া পড়িয়াছে। ‘আপনি’ বলিবে না ‘তুমি’ বলিবে দিশাহারা অপু তাহা ঠাণ্ড করিতে পারিল না। বলিল—কি ক’রে আসব ? আমি কি ঠিকানা জানি ?

লীলা বলিল—ভাল কথা, আজ এখানে হঠাৎ কি ক’রে এসে পড়লেন ?

অপু লজ্জায় বলিতে পারিল না যে, সে এখানে থাকিবার সুপারিশ করাইতে খাতিয়াছে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল—মা ভাল আছেন ? বেশ—আপনার বুঝি সেকেন্ড ইয়ার ? আমার ফার্স্ট ইয়ার আর্টস।

একটি মহিলা ঘরে ঢুকিলেন। অপু চিনিল, বিস্মিতও হইল। লীলার মা মেজ-বোরাং কিম্বা বিপবার বেশ। আট দশ বৎসর পূর্বের সে অতুলনীয় রূপবাণি এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না। অপু পাত্তে ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। মেজ-বোরাং বলিলেন—এসো বাবা এসো, লীলা কালও বলেছে, কে একজন বসে আছে মা, ঠিক বর্ধমানের সেই অপুবেব মত—আজ আমাকে গিয়ে বললে, আব কেউ নয় ঠিক অপূর্ব—তখন আমি ঝিকে দিয়ে ডাকতে পাঠালাম—বসো, দাঁড়িয়ে কেন বাবা ? ভাল আছ বেশ ? তোমার মা কোথায় ?

অপু সঙ্কুচিতভাবে কথাব উত্তর দিয়া গেল। মেজ-বোরাংর কথায় কি আশ্চর্যিকতার সর্ব। যেন কত কালের পুরাতন পবিচিত আত্মীয়তার আৰ-হাওয়া। অপু কি কবিত্তেছে, কোথায় থাকে, মা কোথায় থাকেন, কি করিয়া চলে, এবার পবাক্ষা দিয়া পুনরায় পড়িবে কি না, নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন। তাবপব তিনি চা ও খাবারের বন্দোবস্ত করিতে বাড়ি বমো চলিয়া গেলে অপু বলিল—ইয়ে তোমার বাবা কি—

লীলা মন গলায় বলিল—বাবা তো, এই তিন বছর হবে—এটা আমার বাড়ি—

অপু বলিল—ও। তাই ঝি বললে দিদিমণি ডাকছেন। —মানে উনি—না ? ...মিঃ লাহিডা কে হন তোমার ?

—দাদামশায়—উনি বাবিস্টান, তবে আজকাল আর প্রাক্টিশ করেন না—বডমামা হাইকোর্টে বেকছেন। ও-বছর বিলেত থেকে এসেছেন।

চা ও খাবার খাইয়া অপু বিদায় লইল। লীলা বলিল—বড মামার মেয়ের নেম ডে সামনের বুধবারে। এখানে বিকেলে আসবেন অবিশ্রি অপূর্ববাবু—ভুলবেন না যেন—ঠিক কিস্ত, ভুলবেন না।

পথে আসিয়া অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। ‘অপূর্ববাবু’।—

লীলাই বটে, কিন্তু ঠিক কি সেই এগাবো বছরব কোতুকমরী সবলা স্নেহময়ী লীলা ? ...সে লীলা কি তাহাকে ‘অপূর্ববাবু’ বলিয়া ডাকিত ? তবুও কি আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা। ...আর নিজের আপনার লোক জ্যাঠাইমাও তো কলিকাতায় আছেন—মেজ-বোবানী সম্পূর্ণ পর হইয়া আজ তাহার বিষয়েতে যত খুঁটিনাটি আন্তরিক আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, জ্যাঠাইমা কোনও দিন তাহা

করিস্নাছেন ?...

বাসায় ফিবিয়া কেবলই লীলার কথা ভাবিল। তাহার মনে যে স্থান লীলা দখল করিয়া আছে ঠিক সে স্থানটিতে আর কেহই তো নাই? কিন্তু সে এ লীলা নয়। সে লীলা যখন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহার দেখা মিলবে কোনও কালে? সে ঠিক বৃত্তিতে পারিল না—আজকার সাক্ষাতে সে আনন্দিত হইয়াছে কি ব্যথিত হইয়াছে।

বৃথাবে পাটির জন্য সে টুইল শাট সাবান দিয়া কাটিয়া লইল। ভাবিল, নিজের যাহা আছে তাহাই পবিয়া যাইবে, চাহিবাব চিন্তিবার আবশ্যক নাই। তবুও যেন বড় হীনবেশ মনে হইল। মনে মনে ভাবিল, হাতে যখন পয়সা ছিল, তখন লীলাব সঙ্গে দেখা হ'ল না—আব এখন একেবাবে এই দশা, এখন কিনা—।

লীলার দাদামশায় মিঃ লাহিড়ী খুব মিশুক লোক। অপুকে বৈঠকখানায় বসাইয়া খানিকটা গল্পগুজব করিলেন। লীলা আসিল, সে ভাবি বাস্ত, একবার দু-চার কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। কোনও পাটিতে কেহ কখনও তাহাকে নিমন্ত্রণ কবে নাই। যখন এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ আসিতে আসন্ত করিলেন, তখন অপু খুব খুশী হইল। কলিকাতা শহরে এরকম ধনী উচ্চশিক্ষিত পরিবারে মিসিবাব সুযোগ—এ বৃত্তি সকলের হয়? মাকে গিয়া গল্প কবিরার মত একটা জিনিস পাইয়াছে এতদিন পরে। মা শুনিয়া কি খুশীই যে হইবেন।

বৈঠকখানায় অনেক সুবেশ যুবকের ভিড়, প্রায় সকলেই বডলোকের ছেলে, কেহ বা নতুন ব্যাবিস্টার পাশ করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ডাক্তার, বেশীদ ভাগ বিলাত-ফেরত। কি লইয়া অনেকক্ষণ পবিয়া তর্ক হইতেছিল। কর্পোরেশন ইলেক্শন লইয়া কথা কাটাকাটি। অপু এ বিষয়ে কিছু জানে না, সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাডারগানের কোন একটা মিউনিসিপ্যালিটির কথায় সেখানকার নানা অসুবিধাব কথাও উঠিল।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সোনা-বঁাধানো চশমা, একটু টানিয়া টানিয়া কথা বলিবার অভ্যাস, মাঝে মাঝে মোটা চুরুটে টান দিয়া কথা বলিতেছেন—দেখুন মিঃ সেন, এগ্রিকালচারের কথা যে বলছেন, শু শবের ব্যাপার নয়—ও কাজ আপনার আমার নয়, ইট মাস্ট বি ব্রেড্‌ ইন্‌ দি বোর্ন্—অন্তগত একটা দাত গড়ে না উঠলে শুধু কলের লাজল কিনলে ও হয় না—

প্রতিপক্ষ একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, সাহেবী পোশাক-পর্যায়, বেশ সবল ও সুস্থকায়। তিনি অধীরভাবে সামনে ঝুঁকিয়া বলিলেন—মাপ করবেন রমেশবাবু, কিন্তু একবার কোনও ভিত্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। আপনি কি বলতে চান তা হ'লে এডুকেশন, অর্গ্যানাইজেশন, ক্যাপিটাল—

এসবের মূল্য নেই এতকালচারে ? এই যে—

—আছে, সেকেন্ডারী—

—তবে চাষার ছেলে শিশু কোনও শিক্ষিত লোক কখনও এসবে যাবে না ?... কানন ইন্ড ইজ নট ব্রেড্‌ ইন্‌ দিজ বোর্ন্‌ ? শুধুত কথা আপনার—
আমাব সঙ্গে কেমিগ্রে একজন আইবিজ ছাত্র পড়ত—লম্বা লম্বা চুল মাথায়, সুন্দর চেহারা, ধনদারের পুত্র পোয়েট । হয়ত সাবাবাত ভেগে হটা কবেছে, একটা বেহালা নিয়ে বাজাচ্ছে—আবার হয়ত দেগুন সাপাদিন পড়ছে, বেসে কি লিপ্যন্ত—নয় তো ভাবছে—দ্রষ্টা নিয়ে চলে গেল বেগিয়ে ক্যানাডায়—
গবর্নমেন্ট হামস্টেড্‌ ল্যাণ্ডে ভল্লী জলি নিলে—ছোট একটা কাঠের কুঁড়েঘর সেই ভূমি শীতের মধ্যে তিন-চার বৎসর কাটালে—হামস্টেড্‌ ল্যাণ্ডের নিয়ম হচ্ছে চাইল হবার আগে পাঁচ বৎসর জমির ওপর বাস করা চাই—থেকে জমি পরিকাষ কবলে, নিজেব হাতে বোজ জমি সাধ কবে—লোকজন নেই, রেশো একটা জমি, গাবুন কতদিন—

ওদিকে একদলের মধ্যে আলোচনা বেশ ঘনাইয়া আসিল । একজন কে বলিয়া টিপ্পন—ওসব মব্যালিটা, আপনি যা বলেছেন, সেকেলে হবে পড়েছে—
—এটা তো মানেন যে, ওসব তৈরি হয়েছে বিশেষ কোনও সামাজিক অবস্থায়, সমাজকে বা ইনডিভিডুয়ালকে প্রোটেক্‌শান দেবার জন্যে, সুতরাং—

—বটে, তাহ'লে সব ই সুবিধাবাদী আশ্রয় । নগ্নাতিত ভ্যালু বলে কোনও কিছু স্থান নেই হুমিয়ায় পুস্তকন যদি—

অপু পুস্তক হইল । কলিকাতার বড়লোকের বাড়িতে পাটিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ছাড়া শিক্ষিত বিলাত-ফেরত দলের মধ্যে এভাবে । নাটক-নভেলে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই । সে অত্রাব পুস্তক সহিত চাষিগণের চাহিয়া একবার দেখিল মার্বেলের বড় ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প কডি হইতে ঝুলিতেছে, সুন্দর ফুলকাটা ছিটের কাপড়ে ঢাকা কৌচ, সোফা, দামী আসননা বড় বড় গোলাপ, মোবাবাদাদের পিতলের গোলাপদানী । নিজের বসিবার কৌচখানা সে দু-একবার অপরের অলঙ্কিতে টিপিয়া দেখিল । তাহা ছাড়া এ-ধরনের কথাবার্তা—এই তো সে চায় । কোথায় সে ছিল পাড়ান্নের গরীব ঘরের ছেলে—তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মাম্‌জোয়ানের স্কুলে পড়িতে যাইত, সে এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে । এ-ধরনের একটা উৎসবের মধ্যে তাহাব উপস্থিতি ও পাঁচজনের একজন হইয়া বসিবার আত্মপ্রসাদে ঘরের ভাব্য উপকরণ ও অনুষ্ঠানকে যেন সে সারা দেহ-মন দ্বারা উপভোগ করিতেছিল ।

কৃষিকার্ষে উৎসাহী ভদ্রলোকটি অন্য কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু অপূর দক্ষিণ ধারের দলটি পূর্ব আলোচনাই চালাইতেছেন এখনও । অপূর মনে হইল সে-ও এ-আলোচনায় যোগদান করিবে, আর হয়ত এ-ধরনের সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ জীবনে কখনও ঘটিবে না । এই সময় দু-এক কথা এখানে বলিলে

সে-ও একটা আশ্বপ্ৰসাদ। ভবিষ্যতে ভাবিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে। পাস-কে চশমা-পরী যুবকটির নাম হীরক সেন। নতুন পাশ-করা ব্যারিস্টার। মুখে বেশ বুদ্ধির চাপ—কি কথায় সে বলিল—ওসব মানি নে বিমলবাবু, দেহ একটা এঞ্জিন—এঞ্জিনেব যতক্ষণ স্টিম থাকে, চলে—যেই কলকাতা বিগড়ে যায়, সব বন্ধ—

অপু অবসব খুঁজিতেছিল, এই সময় তাহার মনে হইল এ বিষয়ে সে কিছু কথা বলিতে পারে। সে হু একবার চেষ্টা করিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কতকটা আনাড়ী, কতকটা মণীষার মত আবণ্ড মুখে বলিল—দেখুন মাপ করবেন, আমি আপনাব মতে ঠিক মত দিতে পারি নে—দেহটাকে এমিনেব সঙ্গে খেলনা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি বলেন দেহ ছাড়া আর কিছু নেই—

ঘরের সকলেই তাহার দিকে যে কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কেতুকের সাহেব চাহিতেছে, সেখানু সেরূপ সে বুদ্ধিতে আবিল—তাহাতে সে আবণ্ড ভিন্দুত হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু চাপিবার চেষ্টা আরও মনোমোহন হইয়া উঠিল।

একজন বাধা দিয়া বলিল—মশায় কি করেন, জানতে পারি কি?

—আমি এখানে আই এ দেবো।

পাস-নে চশমা-পরী যে যুবকটি এমিনেব কথা বলিয়াছিল সে বলিল—ইউনিভার্সিটির আরও দু-এক ক্লাস পড়ে এত ভাল কলে পাঠ করুন।

সে এমন অতিরিক্ত শাস্তভাবে কথাগুলি বলিল যে, যারা লোক হো হু করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপু মুখ দাঁড়ায় মত লাল হইয়া উঠিল।

যদি সে পূর্ব হইতেই তাহার কথা না লইত, সে এ-সময় কুণাদি দ্বন্দ্ব এবং উদ্ভাব দ্বারা কথিয়া তাহার এখনে ভিত্তি সহ্য করিতেছে—তাহা হইলে এমন উগ্র ও অভদ্রভাবে প্রত্যাগে হইত তাহার পাশ হইত কিয় সে তো কোনও কিছুতেই এদের সমকক্ষ নয়।—সব করিবার মত ভরসা সে নিজেই মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। তার অন্তঃস্বপ্ন হইল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা চাকিবার জন্য সে আরও মণীষার দুরে বলিল—ইউনিভার্সিটি ক্লাসে না পড়লে যে কিছু জানা যায় না, একথা আমি বিশ্বাস করি নে—আমি একা বলতে পারি কোনও কোর্সেই যারের চার-পাঁচ-কোনও কলেজের হিঁচড়ে কিট লিখ পোইট্রিতে—কিংবা জেনারেল নলেজে পারবে না আমায় সঙ্গে।

নিভাস্ত অগত্যা পরের কথা—সকলে আরও একদফা হাসিয়া উঠিল।

তারপর তাহার নিজেদের মধ্যে অন্য কথাবার্তার প্রবণ হইল। অপু আশ্চর্য্য থাকিলেও তাহার অস্তু হইত যেন সকলে ভুলিয়া গেল। উঠিবার সময় তাহার নিজেদের মধ্যে কর্মমর্দন ও পরস্পরের নিকট বিনাম গ্রহণ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।

যেভাবে সকলে তাহাকে উড়াইয়া দিল বা মানুষের মধ্যে গণ্য করিল না, তাহাতে সত্যি অপু অপমান ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পাশ কাটাওয়া সকলে চলিয়া গেল—কেহ একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার

সব্বন্ধে কেহ কোন কোঁতুললও দেখাইল না। অপুর মনে মনে ভাবিল—বেশ, না বলুক কথা—আমি কি জানি না-জানি, তার খবর ওরা কি জানে? সে জানত অনিল...

দে চালায়া খাইতেছে এমন সময় লীলা আসিয়া তাহাকে নিজে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। বলিল, - মা, অপূর্ববাবু না খেয়েই চুপি চুপি পালাচ্ছিলেন।

লীলা বেঠকখানার বাটারটা না জানিতে পারে...

একটি ছোট আঁট-নয় বসবের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—একে চেনেন অপূর্ববাবু? এ সেই খোকামণি, আমার ছোট ভাই, এর অনুরোধেই আপনাকে একবার আসতে বলেছিলাম, মনে নেই?

লীলার কথকটি সহ্যঠিনী সেখানে উপস্থিত, সে সকলকে বলিল—তোমরা জান না, অপূর্ববাবু গলা খুব ভাল, তবে গান গাইবেন কিনা জানি নে, মানে বেতায় লাড়ুক আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, একটা অনুরোধ রাখবেন অপূর্ববাবু?

অপূর্ণকেই অনুরোধ-উপরোধে অবশেষে বলিল—আমি বাজাতে জানি নে কেন যদি বস বাজান।

খাওয়াটা ভাল হইল। তবুও রাত্রে বাসায় ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইতে লাগিল আমি কখনও এখানে সে আসিবে না। বডলোকের সঙ্গে তাহার কিসের খাতির দবকাব কি আসিবার? দারুণ অস্থির।

দেদিন অপূর্ণ একা একা হঠাৎ হঠবে তাহার দিন-পাঁচেক আগে অপূর্ণের জন্মদিন মায়ের স্নান, হস্তাক্ষর তেলি বাড়ি বড বেঁয়ে।

সন্ধ্যার সময় অপূর্ণ বাড়ি পৌঁছিল।

সব-মা আবার গিয়ে দিয়া শুইয়া আছে, দুবল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয়। অপূর্ণকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। শনির দিন হইতেই অপূর্ণে ভুগিতেছে। বীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত হওয়াব ভয়ে খবর দেয় নাই, সেদিন তর্জিলের ভোগ করিয়া নিজে পত্র দিয়াছে। এমন যে কিছু শয্যাগত অবস্থা গ্রহণ নয়, খায় দয়, কাজকর্ম করে। আবার অসুখও হয়। সন্ধ্যা হইলেই শয্যা গ্রহণ করবে, আবার সকালে উঠিয়া গৃহকর্ম শুরু করে। চিবাদিনের গৃহিনীপনা এ অসুস্থ শরীরেও তাহাকে তাগ করবে নাই।

অপূর্ণ বলিল—উঠো না বিছানা থেকে মা—শুয়ে থাকো—দেখি গা।

তুই খায় বোস—ও কিছু না—একটু জ্বব হয়, খাই-দাই—ও এমন সময়ে হয়েই থাকে। বেশেখ মাসের দিকে সেবে যাবে—তুই যে ময়েকে পডাস, সে ভাল আছে তো?

সবজন্মাব বোগশৌর্য মুখের হাসিতে অপূর্ণ চোখে জল আসিল। সে পুঁটুলি খুলিয়া গোটাকতক কমলালেবু, বেদানা, আপেল বাহির করিয়া দেখাইল। জিনিষপত্র সস্তায় কিনিতে পারিলে সবজন্মা ভাবি খুশী হয়। অপূর্ণ জানে থাকে

আমোদ দিবার এটা একটা প্রকৃষ্ট পক্ষ। কমলালেবু দেখাইয়া বলে, কত সস্তায় কলকাতায় জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাহা—লেবুগুলো দশ পয়সা—প্রকৃতপক্ষে লেবু ক'টির দাম ছ'আনা।

সবজিয়া আগ্রহেব সহিত বলিল—দেখি এখানে যে গুগুলোর দাম বারো আনার কম নয়—এখানে সব ডাকাত।

চার পয়সার এক তাড়া খান দেখাইয়া বলিল—বৈঠকখানা বাজার থেকে দু'-পয়সায়—তাঁহা মা—

সবজিয়া ভাবে—এবার ছেলেব সংসারী হইবার দিকে মন গিয়াছে, হিসাব করিয়া সে চলিতে শিখিয়াছে।

অপু ইচ্ছা করিয়াই লীলার সহিত সাক্ষাতেব কথাটা উঠায় না। ভাবে মা মনে মনে দুর্দ্বাশা পোষণ কবে, হয়ত এখনি বলিবে—লীলার সঙ্গে তোব বিয়ে হয় না? ...দবকার কি, অসুস্থ মায়ের মনে সে সব দুর্দ্বাশাব চেউ তুলিয়া?

এমন সব কথা কখনও অপু মায়ের সম্মুখে বলে না, তাহা কিনা, মা বুঝিবে না। ভগৎ সংসারটাকে মায়ের সীমাবদ্ধ জানেব উৎসাহী করিয়াই সে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত কবে। দিন-তিনেক সে বাড়ি বহিল। বোত ভপুবে জানা লার খারে বিছানাটিতে সবজিয়া শুইয়া থাকে, পাশে সে বসিয়া নানা গল্প কবে। ক্রমে বেলা যায়, বোধ প্রদমে ওঠে পান্নাঘরের চাল'য়, পরে বেড়াব মনের পাল্‌তেমাদ্দার গাছটার মাধ্যম, ক্রমে পাশ'ঝাড়ের ভগায়। ছায়া বাড়িয়া যায় বৈকালের ঘন ছায়ায় অপু মনে আবার একটা বিপ্লব নির্জনতা ও সম্ভ্রম তার ভাব আনে—গত গ্রীষ্মের চূড়ির দিনের মত।

সবজিয়া হাসিয়া বলে—পাশটা হ'লে এবার ত্রের বিয়ের ঠিক কবেচি এক জায়গায়। মেয়ের দিদিমা এসেছিল এখানে, বেশ পোক—

ঘরের কোণে একটা তাকে সংসারের জিনিসপত্র সবজিয়া রাখিয়া দেয় একটা হাঁড়িতে আমদর, একটা পাত্রে আচার। অপু চিবকালের অভ্যাস অনুসারে মাঝে মাঝে ভাঙ হাঁড়ি গুজিয়া-পাতিয়া মাকে লুকাইয়া এটা-ওটা চুবি কা'য়া যায়। এক ময়দিনও খাইয়াছে। সবজিয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকে টের পায় না—সেদিন ভপুবে অপু জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে গায়ে মায়ের গামছাপানা। হঠাৎ সবজিয়া চোখ চাইয়া বলিল—আমার গামছা-খানা আবার পিষিচো কেন?—ওখানা তিলে বাড়ি দেবো বলে রেখে দিইচি—কুতু'দর বাড়ীর গামছা ওখানা, ভারি টনকো—আর সরে সরে তাকটার ধারে যাক কেন?—ছু'সনে তাক—তুমি এমন দু'ফট হয়েচো, বাসি কাপড়ে ছু'য়ে দিলে তাকটা?

কথাটা অপু বকে কেমন বি'দিল—মা সরে উঠে তিলে বাড়ি দেবে? তা' দিলেছে! মা আর উঠছে না—হঠাৎ তাহার মনে হ'ল, এই সেদিনও তো সে তাক হইতে আশঙ্ক চুরি করিয়াছে...মা, অসহায় মা বিছানায় আরের

ঘোরে পড়িয়াছিল... একুশ বৎসর ধরিয়া মায়ের যে শাসন চলিয়াছিল তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, নিজের অধিকার আর বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না কখনও .

অপু চতুর্থদিন সকালে চলিয়া গেল, কালই পরীক্ষা। চুকিয়া গেলেই আবার আসিবে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শোনে, সর্বজ্ঞা রান্নাঘরে ইতিমধ্যে কখন ঘুম হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছেলের সঙ্গে গরম পরোটা দেওয়া যাইবে।

সবজ্ঞা . এককম কোনও দিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বেকালে তাহার এত মন ভুগু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস অবস্থা। কত কথা, সারা জীবনের কত ঘটনা, কত আশা ও অশ্রু ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত একমাস পরিয়া এসব কথা মনে হইতেছে। নির্জনে বসিলেই বিশেষ কবিতা...। ছেলেবেলায় পুণী বলিয়া গাঠ ছিল বাড়িতে... বালাসজিনী হিম্মিদি . . . একসঙ্গে দো-পেটে গাঁদাগাছ পুতিয়া জল দিত। একদিন হিম্মিদিও সে বন্যার জলে মগ্নে ঘড়া বৃকে সীতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল, আর এক হইলেই

বিবাহ মনে আসে। আছে সেদিন তুপুবে খুব রফি হইয়া ছিল, তাহার ছোট ভাই ওখন শিখা, লুকায়ে তাহাকে নাড়ু দিয়া গিয়াছিল হাতের মুঠায়। ছোট ছেলেবেলায় অপু . . . কাচের পুতুলের মত রূপ... প্রথম স্পর্শে কথা শিখিল, কি জানি কি কিসে শিখিল ভিজে। একদিন অপুকে কদমা হাতে ভুলাইয়া রাখিয়া ছিল।—কেমন পেল ও বোকা?

অপু দম্পতীর মুখে কদমা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মত মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল ভিজে। হি-হি—ভাবিলে এখনও সবজ্ঞার হাসি পায়।

সেদিন তুপুবে হইতেই একে মাঝে মাঝে ফিক্-ধব। বেদনা হইতে লাগিল। তেলি বে আসিয়া তেল গরম করিয়া দিয়া গেল। দু'তিনবার দেবিয়াও গেল। সন্ধ্যায় . . . কেহ কোথাও নাই। একা নির্জন বাড়ি। অরও আসিল।

বাএ খুব পরীক্ষা আকাশে ত্রয়োদশী ব প্রকাণ্ড বড চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সবজ্ঞার একা থাকিতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। খানিক রাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে, নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে—একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক-গা ঘামিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। কে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু?—সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল—ইহার আগে কখনও তো এমন হয় নাই!

পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাহার আর একদফা ভয় হইল। ভয় কিসের? না—না—মৃত্যু, সে এরকম নয়। ও কিছু না।

কত চুরি, কত পাপ...চুরিই যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে? ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমকের গাছের শশাটা লুকাইয়া রাখিত তক্তপোশের তলায়—জ্বন মুখখোদের বাড়ি হইতে একবার দশ পলা তেল ধার করিয়া আনিয়া ভালমানুষ রাণুর মার কাছে পাঁচ পলা শোধ দিয়া আসিয়াছিল, মধ্যা কবিতা বলিয়াছিল—পাঁচ পলাই তো নিয়ে গিছলাম ন'দি—বোলো সেজ ঠাকুরঝিকে। সারাজীবন ধরিয়া শুধু হুঃ ও অপমান। কেন আজ এসব কথা মনে উঠিতেছে?

ঘর অন্ধকার।...খাটের তলায় নেংটি ইঁদুর খুট্ খুট্ করিতেছে। সবজিয়া ভাবিল, ওদের বাড়ি কলটা না আনলে আর চলে না—নতুন যুগগুলো সব খেয়ে ফেললে। কিন্তু নেংটি ইঁদুরের শব্দ তো?—সবজিয়ান আবার সেট ভয়টা আসিল হৃদ'মনীয় ভয়...সারা শবীর যেন দীর্ঘে দীর্ঘে অসাড় হইয়া আসি তেছে ভয়ে...পায়ের দিক হইতে ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া উপরের দিকে উঠি-তেছে, যতটা উঠিতেছে, ততটা অসাড় করিয়া দিতেছে...না—পায়ের দিক হইতে না—হাতে আঙুলের দিক হইতে...কিন্তু তাহার সন্দেহ হইতেছে কেন ইঁদুরের শব্দ নয় কেন? কিসের শব্দ? কখনও তো এমন সন্দেহ হয় না? হঠাৎ সর্বজন্মার মনে হইল, না পায়ের ও হাতের দিক হইতে সুড়সুড়ি কাটিয়া যাহা উপরের দিকে উঠিতেছে তাহা ভয় নয়, তাহা মৃত্যু। মৃত্যু? ভীষণ ভয়ে সর্বজন্মা ধড়মড় করিয়া আবার বিচানা হইতে উঠিতে গেল, চীংকার কবিত্তে গেল...খুব...খুব চীংকার, আকাশখাটা চীংকার—অনেকক্ষণ চীংকার কবি য়াছে, আর সে চেঁচাইতে পারে না...গলা ওড়িয়া আসিয়াছে...কেউ আসিল না তো?...কিন্তু সে তো বিচানা হইতে...বিচানা হইতে উঠিল কখন? সে তো উঠে নাই—ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া সারা দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে, যেন খুব বড় একটা কালো মাকডসা...ভুঁড়ের বিষে দেহ অবশ...অসাড় হাত ও বাড়ানো যায় না...পা-ও না...সে চীংকার করে নাই...ভুল।

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে...একজনের কথাই মনে হয়...অপু...অপু...অপুকে ফেলিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না...অসম্ভব।...বিশ্বাসের সহিত দেখিল...সে নিজে নিজে অনেকক্ষণ কাঁদিতেছে।—এতক্ষণ তো টের পায় নাই।

আশ্চর্য...চোখের জলে বালিশ ভিড়িয়া গিয়াছে।...

জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না...কেমন একটা আনন্দ...আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে...টুপ...টুপ...টুপ...টাপ...। আবার কান্না পায়...জ্যোৎস্নার আলোর জানালার গরাদে ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে?...সর্বজন্মার দৃষ্টি পাশের জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল...বিশ্বাসে, আনন্দে রোগনির্ধী বৃথখানা যুদ্ধে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল...অপু দাঁড়াইয়া আছে।

...এ অপু নয়...সেই ছেলেবেলাকার ছোট অপু...এতটুকু অপু... নিশ্চিন্দ-
পুরের বাঁশবনে ভিটেতে এমন কত চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে ভাঙা জানালার
ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িত তাহার দন্তহান ফুলের কুঁড়ির
মত কাঁচ মুখে...সেই অপু...ওর ছেলেমানুষ স্বপ্নের পাখির মত ডাগর ডাগর
চোখের নীল চাহনি...চুল কোঁকড়া কোঁকড়া...মুখচোরা, ভালমানুষ
লাজুক বোকা ভগ্নের ঘোরপ্যাচ কিছুই একেবারে বোঝে না...কোথায়
যেন সে যায়...নীল আকাশ বাহিয়া বত দূবে...বত দূরেব দিকে, সুনীল
মেঘদবীর অনেক উপরে...যায়...যায়...যায়...যায়...মেঘের ফাঁকে যাইতে
যাইতে মিলিয়া যায়...

প্রথম অধ্যায় আসিয়াছে।...কিন্তু তাব ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আশ
বাড়াইয়া লইতে...একটি দিন...

কি হাসি। কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের।...

প্রথম দিন সকালে তেলি বাড়ির বড়-বে আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া
হয় নাই, খোলাই আছে, বড়-বে আপন মনে বলিল—রাত্রে দেখছি মা-ঠাকু-
রনের অসুখ হ'ব বেড়েছে, খিলচাও দিতে পারেন নি।

বড়বার উপর সব জন্মা যেন ঘুয়াইতেছেন। তেলি-বে একবার ভাবিল—
শাকিবে না—কিন্তু প্রথমে কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে
গেল। সবজিয়া কোন সত্য দিলেন না, নড়িলেনও না। বড়-বো আরও
দু' একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া নিকটে আসিয়া ভাল
ক'িয়া দেখিল।

...অন্যদিকে সে সব দুঃখিল।

সবজিয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবেব সহিত পরিচিত
হইল। প্রথম প্রথম আনন্দ-মিশ্রিত—এমন কি মায়েব মৃত্যু-সংবাদ প্রথম
যখন সে তেলি-বাড়ির তাবের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে
একটা আনন্দ, একটা যেন মৃদু নিশ্বাস...একটা বাধন-ছেঁড়ার উল্লাস...অতি
অল্পকালে জন্ম—নিঃসঙ্গ অজ্ঞাতদাবে। তাহার পরই নিজেব মনোভাবে তাহার
দুঃখ ও আশঙ্কা উদ্ভূত হইল। এ কি। সে চায় কি। মা যে নিজেকে
একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার সুবিধার জন্য। মা কি
তাহার জীবনপথে বাধা—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়-
হীন—। তবুও সত্যকে সে অস্বীকার কবিতে পারিল না। মাকে এত ভাল-
বাসিত তো, কিন্তু মায়েব মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে যে, একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে
আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।
তাহার পর সে বাড়ি রওনা হইল। উলা স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে শুরু
করিল। এই প্রথম এ পথে সে যাইতেছে—যেদিন মা নাই। গ্রামে ঢুকিবার

কিছু আগে আশ্বিনী কোদলা নদী, এ সময়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়—এরই
 তীরে কাল মাকে সবাই দাঁহ করিয়া গিয়াছে। বাড়ি পৌঁছিল বেকালে।
 এই সেদিন বাড়ি হইতে গিয়াছে, মা তখনও ছিলেন—যেরে তানা দেওয়া
 চাৰি কাছাদের কাছে? বোধ হব তেলি বাড়ির গা মাথা গিয়াছে। যেরে
 পৈঠায় অপু চুপ কবিয়া বসিয়া রহিল। উঠানের বাহিরে আগডো কাঠে
 এক ক...য়... ডা বড ডডো কবা। সোদিকে চোখ... ডিতেই অপু গিহ
 রিয়া উঠিল—সে বুঝিয়াছে—মাকে খাবা সংকার করিতে গিয়াছিল, দাঁহ
 আস্তে তাহা কাল এখানে আশ্বিনী চুইয়া নিম... গা... হইয়াছে—
 প্রথটা অপু জানে—মা মাথা গিয়াছেন এখনও অপু বিশ্বাস হয় নাই—একশ
 বৎসবেব বন্ধন, মন এক... হুঁতে টানিয়া ছিঁটিয়া কোল... গা... নাহ—কিছু
 পোড়া বড... ন... নিতু... মা... নাহি। মা... নাহি।
 বৈকালেব কি... 'ন... নি... দিকে... উদাস
 পৃথিবী, নিতু... বিব... বা... অ'কাশ... অপু... দ...
 পোড়া বড... দিকে... ছিল।

কিছু মায়ের গায়ে: কাপাখানা টাংনে অলস মেলিয়া দেওয়া কেন?
 কাপাখানা মায়ের গায়ে ছিল... সস্ত্র... কা... অনেক দিনেব
 নিশ্চিন্দ্রপুবেব আমলে, মায়ের হাতে... কা... বা...
 কাজ... কতক... বসিয়া ছিল... আসিল। তেলি
 বাড়ির বড ছেলে না... চমক... সে... সি...
 ইল। স্থান... বলিল—এই... আম... বা...
 নাহ বলিল—কখন... একলা... বৈ... দাঁহ...
 এসো আমাদেব বাড়ি। 'অপু বলিল, না... চা... নিয়ে...
 ঘরের মধ্যে দেখি... কি... চা... না... গেল।
 —ঘর... আমি... অপু...
 উপর... নাহ, বলিল, মা... কিছু... প...
 ত... একটা...—বা...
 তুলিয়া... চা... না...
 বাহিরে... বলিল—... কে...
 বোরাটা... না... বাহিরে...
 বিক্রম... না... বলিল—...
 এলে... কে... বলি নি।

অপু বলিল—না, এই তো এসে,—এই এখনও আশ্বিনী হয় নি।

বিক্রম... বলিল—আমি... গিয়েছে, কাপা... মেলে
 দিলে... বাইরে, যাই... আসি...
 আসছি—

অপু বলিল—কাপাখানা মায়ের গায়ে ছিল, না বিক্রম?

—কোথায় ? ...পরন্তু রাগ তো তাঁর—পরন্তু বিকেলে বড় বোকে বলেছেন
কাঁদাখানা সরিয়ে রাখো যা—ও আমার অপূর জন্মে, বর্গাকালে কলকাতা
পাঠাতে হবে সেট পূর নো গুলোজমানো কালো কপলটা ছিল...সেইখানা
গায়ের দিয়েছিলেন—তিনি আবার প্রাণ দাবে তোমার কাঁধা নষ্ট করবেন ?

গাওঁ কাল দিন শুবা তাঁকে নিয়ে থুয়ে গেল তখন ভাবলাম রুগীর বিছানায়
তো ছিল কাঁদাখানা, কলকাটা কবে রোদে দিই—কাল আর পারি
নি আজ সকালে দিয়ে আলনায় দিয়ে গেলাম—তা এসো—আমাদের বাড়ি
—ওসব ভাববেন না—যুথ শুকনো—হবিগ্টি হয় নি ? এসো—

নিরুপমার আগে আগে সে কলেব পুতুলের মত তাদের বাড়ি গেল।
সবকার মহাশয় কাছে ডাকিয়া বসাইয়া অনেক সান্ত্বনাব কথা বলিলেন।
নিরুদ কি কহিয়া যুব দেখিয়া বুঝিল খাওয়া হয় নাই ? নাহুও তো
ছিল কে কোন্ কপা তো বলে নাই ?

সকাল পূর্ব নিরুদ ম কখনো বেকারীতে যাক ও ফলমূল কাটিয়া
আনিল একত মাসাব বাটতে কাঁচামুগের ডাল-ভিড়া, কলা ও আখের
প্রভু নিয়া নিরুদ কলসে মাখিয়া আনিয়াছে। অপু কারুর হাতে চটকানো
জিনিস পায় না...এতখো কবে...প্রথমটা মুখে তুলিতে একটুখানি গা-
কেমন কবিত্তেছিল। তারপর দুই-এক গ্রাস খাইয়া মনে হইল সম্পূর্ণ দ্বাভাবিক
আসাদই তো। নিরুদ হাতে বা মায়ের হাতে মাখলে যা হইত—তাই।
অন্যদিন হবি'র সময় নিরুদমা গোয়ালে সব যোগাড়যন্ত্র কবিয়া অপুকে ডাক
দিল টুপনে দু'পাট্রিয়া কাঁচ সবজি দিল। ফুটিয়া উঠিলে বলিল—
এইবার নামিয়ে পালো, ভাই।

তদু বলিল—আব একু না—নিরুদি ?

নিরুদমা বলিল—নামাও দেখ ও হয়ে গিয়েছে। ডালবাগটা জুড়োতে
দাও—

সব মিটিয়া গেলে সে কলিকাতায় ফিবিবাব উছোগ করিল। সর্বজন্মার
জাতিখানা, সবজন্মার হাতে সই-কবা খানহুই মনিঅর্ডাবেব রাসিদ চালের
বাঁত'ল গোড়া ছিল—সেগুলি, সব জন্মাব নখ কাটিবাব নরুণটা পুটিলির মধ্যে
বাঁিয়া লইল। দোরের পাশে ঘবেব কোণে সেই তাকটা—আসিবাব সময়
সেদিকে নজর পড়িল। আচাবভবা ভাঁড়, আমসত্তের হাঁড়িটা, কুলচুর, মায়ের
গজাভলেব পিওলেব বটি, সবই পড়িয়া আছে...সে যত ইচ্ছা খুশী খাইতে
পারে যাছা পুশী ছুঁইতে পাবে, কেহ বকিবাব নাই, বাধা দিবাব নাই। তাহার
প্রাণ ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে মুক্তি চায় না...অবাধ অধিকার চায় না—
তুমি এসে শাসন করো, এসব ছুঁতে দিও না, হাত দিতে দিও না—ফিরে
এসো মা...ফিরে এসো...

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, একটি তীব্র ওদাসীন্য় সব বিষয়ে, সকল

কাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক নির্জনতার ভাবটা। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় থাকিতে একদণ্ডও ইচ্ছা হয় না... মন পাগল হইয়া উঠে, কেমন যেন পালাই-পালাই ভাব হয় সর্বদা, অথচ পালাইবার স্থান নাই, জগতে সে একেবারে একাকী—সত্যাসত্যই একাকী।

এই ভয়ানক নির্জনতার ভাব এক এক সময় অপূরণ বৃক্ষে পাথরের মত চাপিয়া বসে, কিছুতেই সেটা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না, ঘরে থাকা তাহার পক্ষে তখন আবশ্যক হয় না। গলিটার বাহিরে বড় রাস্তা, সামনে গোলদাঁড়ি, বৈকালে গাড়ি, মোটর, লোকজন ছেলেমেয়ে। বড় মোটর-গাড়িতে কোনও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়েবা বাড়ির ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, অপূর্ণ মনে হয় কেমন সুখী পরিবার।—ভাই, বোন, মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, রাজাদি, বড়দা, ছোট কাকা। যাহাদের থাকে তাহাদের কি সব দিক দিয়াই এমন কবিতা ভগবান দিয়া দেন। অন্যমনস্ক হইবার জন্য এক-একদিন সে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীতে গিয়া বিলাতী মাগাজিনের পাতা উল্টাইয়া থাকে। কিন্তু কোথাও বেশীক্ষণ বসিবার ইচ্ছা হয় না, শুধুই কেবল এখানে-ওখানে, ফুটপাথ হইতে বাসায়। বাসা হইতে ফুটপাথে। এক ভায়গান্ন বসিলেই শুধু মায়ের কথা মনে আসে, উঠিয়া ভাবে গোলদাঁড়িতে আত্মসাতারের মাচের কি হাল দেখে আসি বসে—কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় বাহিরে কোথাও চলয়। গেলে শাস্তি পাওয়া খাইত—যে কোনও ভায়গান্ন, যে কোন ভায়গান্ন—পাহাড়ে, জঙ্গলে, হরিদ্বারে, কেদার-বদরীর পথে—মাঝে মাঝে ঘণ্টা, নিজের অদিতাকায় কত ধরনের বিচিত্র বন্যপুষ্প, দেওদার ও পাইন বনের ঘন ছায়া, সাধু-সন্ন্যাসী, দেবমন্দির, রামচটি, গ্যামচটি কত বর্ণনা তো সে বইয়ে পড়ে, একা বাহির হইয়া পড়া মনে কি?—কি হইবে এখানে শহরের ঘিড়ি ও ঘোঁয়ার বেড়াভালের মধ্যে?

কিন্তু পরস্য কৈ? তাও তো পরস্য দরকার। তেলিডা তুড়ি ঢাকা দিয়াছিল যাত্রাশ্রমের দরুন, নিকুপমা নিজে হইতে পনেরো, বড় বৌ আলাদা দল। অপু সে টাকার এক পরস্যও রাখে নাই, অনেক লোকজন খাওয়াইয়াছে। তবু তো সামান্যভাবে তিলকাফন শ্রাদ্ধ।

মশপিও দানের দিন সে কি ভীত বেদনা। পুরোহিত বলিতেছেন—প্রোত শ্রীসর্বজনা দেবী—অপু ভাবে ক'হাকে প্রোত বলিতেছে? সর্বজনা দেবী প্রোত? তাহার মা, প্রীতি আনন্দ ও দুঃখ-মুহুর্তের সজিনী, এত আশাবরী, হাস্যময়ী, এত জীবন্ত যে ছিল কিছুদিন আগেও, সে প্রোত? সে আকাশহো নিরালম্বো বায়ুদূত-নিরাশ্রয়? :

তারপরই মধুর আশার বাণী—আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক, পথের ধূলি মধুময় হউক, ওষধি সকল মধুময় হউক, বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য, চন্দ্র, অন্তরীকথিত আশাদের পিতা মধুময় হউন।

সারাদিনবাণী উপবাস অবসাদ, খোঁকের পর এ মস্ত্র অপূর মনে সভ্য সভাই মণুবর্ষণ করিয়াছিল, চোখের জল সে রাখিতে পারে নাই। হে আকাশের দেবতা, বাতাসে দেবতা, তাই কর, যা আমার অনেক কষ্ট ক'রে গিয়েছেন, তাঁর পাশে তোমাদের উদার আশীর্ষদের অমৃতধারা বর্ষণ কর।

এই অবস্থায় শুধুই ইচ্ছা কবে যারা আপনার লোক, যারা তাহাকে জানে ও মাকে জানিও, তাহাদের কাছে যাইতে। এক জ্যাঠাইয়ারা আছেন—কিন্তু তাহাদের সহ'ণুভূতি নাই, এখানেই যাইতে ইচ্ছা করে। তবুও মনে হয়, হয়ত জ্যাঠাইমা মায়েব সম্বন্ধে দু'-পাঁচটা কথা বলিবেন এখন, দুটা সহানুভূতির কথা হয়ত বলিবেন—

ম'স-গেনেক এভাবে কটিল। এ তিন মাসের কাহিনী তাহার জীবনের ইতিহাসে একটা একটানা নিবন্ধিঃ টুংখের কাহিনী। ভবিষ্যৎ জীবনে অপু ও গলিগাম নিকট দিয়া গাইতে গাইতে নিজের অজ্ঞাতসারে একবার বড় রাস্তা হইতে গলিব মে'সে চাহিয়া দেখিও, আর কখনও মে ইহাব মধ্যে টোকে নাই। ভোড় মাসের শেষে সে একদিন খবরের কাগজে দেখিল—যুদ্ধের জন্য লোক লক্ষ্য হইল। সে পাঠ স্ট্রুটে তাহার অফিস। দুপুবে ঘূষিতে ঘূষিতে সে গেল পাঠ স্ট্রুটে।

টেবিলে একরাশ চাপ মেনে ফর্ম পড়িয়া ছিল, অপু একখানা তুলিয়া পড়িয়া বসে। অকস্মাৎ ক বলিল—কোথাকার জন্য লোক নেওয়া হবে?

--মেসে'স টেলিগ্রাফ, টেলিগ্ৰাফ ও রাস্তাপোর্ট বিভাগের জন্য। তুমি কি টেলিগ্রাফ জানো—না ম'সেব দিসো?

অপু বলিল—সে কিছুই নহে। ও-সব কাজ জানে না, তবে অন্য যে-কোন কাজ কি ক'রানো যাবে?

ম'সেব বলিল—না, তুংখিও। আমবা শুধু কাজ জানা লোক নিচ্ছি—বেশীর ভাগ মে'সেব গাইভাব, সিগন্যালব, স্টেশন মাস্টার সব।

এই অবস্থায় একদিন লীলাব সঙ্গে দেখা। ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ঘূষিতে ঘূষিতে একদিন ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে সে রাস্তা পার হইবার জন্য অসুস্থ করিতেছে, সামনে একখানা হলদে রঙের বড় মিনার্ভা গাড়ি ট্রাফিক পুলিশে দাঁড় কর'য়া রাখিয়াছিল—হঠাৎ গাড়িখানার দিক হইতে তাহার নাম ধাবিয়া কে ঢাকিল।

সে গাড়িও কাছে গিয়া দেখিল, লীলা ও আর দুই-তিনটি অপরিচিত মেয়ে। লীলাব ছোটভাই দ্বাইভায়েব পাশে বসিয়া। লীলা আগ্রহেব সুবে বলিল—আপনি আচ্ছা তো অপরূবাবু? তিন-চার মাসের মধ্যে দেখা করলেন না, কেন বলুন তো? মাসেদিনও আপনার কথা—

অপূর আশুতিতে একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া সে বিশ্বাসের সুরে বলিল—আপনার কি হয়েছে? অসুখ থেকে উঠেছেন নাকি, শরীর—মাথার দুল অমন ছোট-ছোট, কি হয়েছে বলুন তো?

অপু হাসিয়া বলিল—কই না, কি হবে—কিছু ভো হই'নি ?

—মা কেমন আছেন ?

—মা ? তা মা—মা তো নেই। ফাস্তুন মাসে মারা গিয়াছেন।

কথা শেষ করিয়া অপু আর কথা দফা পাগলের মত হাসিল।

হয়ত বালোর সে প্রীতি নানা ঘটনায়, বড় বৎসরের চাপে লীলার মনে নিঃশ্রুত হইয়া গিয়াছিল, হয়ত ঐশ্ব্যের আঁচ লাগিয়া সে মধুব ব'লামন অন্য ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল দীবে-দ্বারে, অপু মুখেই এই অর্থহীন হাসিটা যেন এক-খানা ভৌঙ্ক ছুবিব মত গিয়া তাহার মানেব কোন্ গোপন মণিমঞ্জরীর কক্ষ ঢাক নিব কাঁকটীতে হঠাৎ একটা সজোবে চাড়া দিল, এক মুহূর্তে অপু'র সমস্ত ছবিটা তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল—সহায়হীন, মা'হীন, আশ্রয়হীন, পদে-পদে বেড়াইতেছে—কে মুখেব দিকে চাহিবার আছে ?

লীলার গলা আড়ন্ত হইয়া গেল, একটু ২প করিয়া থাকিয়া বলিল, —আপনি আমাদের ওখানে কবে আসবেন বলুন—না, ও একম বললে হবে না। এ-কথা আমাদের জানানো আপনার উচিত ছিল না ? অন্ততঃ মাকেও বল গো—কাল সকালে আসুন—ঠিক বলুন আসবেন ? কেমন ঠিক তো—সেবারকার মত করবেন না কিন্তু—ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা বলুন তো কি—হুলবেন না কিন্তু।

গাডি চলিয়া গেল।

বাসায় ফিদিয়া অপু মনেব মধ্যে অনেক ভোলপাড করিল। লীলার মুখে সে একটা কিসের ছাপ দেখিয়াছে, বর্তমান অবস্থায় মন তাহার এই আন্তরিকতার মেহস্পর্শ টুকুবই কাড়াল বটে—কিন্তু এ' বোশে কোথাও বাইতে হই'তা হয় না, এই ভ্রাম্য, এই কাপড়ে, এই ভাবে। দাক বরং।

তিনদিন পর নিজের নামে একখানা পত্র আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল মা চাড়া আর তো কাহান'ও পত্র সে' যায় নাই। কে পত্র দিল ? পত্র দ'লয় পড়িল :

অপূর্ববাবু,

আপনার এখানে আসবার কথা ছিল সোমবারে, কিন্তু আজ শুক্রবার হয়ে গেল আপনি এলেন না। আপনাকে মা একবার অশিশি আসতে বলেছেন, না এলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আপনার আসা চাই-ই। নমস্কার নেবেন।

লীলা

কথাটা লইয়া মনের মধ্যে সে অনেক বোঝাপড়া করিল। কি লাভ গিয়া ? ওরা বড়মানুষ, কোন্ বিষয়ে সে ওদের সঙ্গে সমান যে, ওদের বাড়ি যখন তখন যাইবে ? বেজ-বোরানী যে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই কথাটা তাহার মনে অনেকবার যাওয়া-আসা করিল—সেইটা, আর লীলার আন্ত-

রিকতা। কিন্তু মেজ-বোনানী কি আর তার মায়ের অভাব দূর করিতে পারিবেন? তিনি বডলোবের মেয়ে, বডলোকের বধূ। তাহার মায়ের আসন পদয়ের যে গুণটিতে, সে শুধু তাহার গুণখিনী যা অর্জন করিয়াছে তাহার বেদনা, ব্যর্থতা, দৈন্য-গুণ শত অপমান দাওয়া—ছয় সিলিগারের মিনাভী গাণ্ডিতে চড়িয়া কোনও নাবধু—হউন তিনি হেতুমন্ত্রী, হউন তিনি মহিমাময়ী— তাহার সেখানে পবেদানিকার কোথায়?

ভৈরব মাসের শেষে পৌষের মঙ্গলবার ১৯১৯ প্রথম বিভাগের প্রথম সপ্তের জনৈক মনো গ্রাহক নাম, বা লগে, সকলো মনো প্রথম হইয়াছে, এজন্য একটা মনো প্রবেশের পাঠবে। এমন কেহ নাট্য গ্রাহক আছে খবরটা বলিয়া বাহাদুরি করা যাচ্ছে পারে। কোনও পরিচিত বন্ধুবান্ধব পদস্থ এখানে নাই, - চুটিতে সব দেশে গিয়াছে। জায়াটমার কাছে বাইবে? গিয়া জানাইবে জায়াটমাকে। ক'ল লাভ, হয়ত তিনি বিবদ্ধ হইবেন দরকার নাই যাওয়ার।

অপরাজিত

দশম পরিচ্ছেদ

তা'র মাসের মানামারি সব কলেজ খুলিয়া গেল, অপর কোনও কলেজে ভর্তি হইল না। অপরক মিঃ বদু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইতিহাসে অনাস' কোস লওয়াইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। শুধু ভাবিল—কি হবে আর কলেজে পড়ে দে সময়টা ইম্প্রিন্সিয়াল লাইব্রেরীতে কাটাও, বি. এ. ব ইতিহাসে এমন কোন নতুন কথা নেই যা আমি জানি নে। ও ৩ বছর মিছিমিছিন্ট, লাইব্রেরীতে তাব চেয়ে অনেক পড়ে ফেলতে পারব এখন? এ ছাড়া ভর্তির টাকা, মাইনে, এ সব পাই বা কোথায়?

একটা কিছু চাকরি না খুজিলে চলে না। খবরের কাগজ—বিক্রয়ের পুঁজি অনেকদিন গুণাইয়া গিয়াছে, মাথের মতুন সব সে কাজে আর উৎসাহ নাই। একটা ছোট্ট ছেলে পড়ানো আছে, তাতে শুধু দুটো ভাত খাওয়া চলে ছুবেলা—কেন মতে ইকুমিক্ ককারে আনুদিক, ভালসিক ও ভাত। মাছ, মাংস, দুগ, আল, তরকারী তো অনেক—আগে—দেখা যথেষ্ট মত মনে হয়—যাক্ সে সব, কিন্তু খবরশা, কাপড়জামা, ভালসাবাব, এসব চলে কিসে? তাহা ছাড়া অপর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কলিকাতার ছেলে পড়ানো বাবাব যুবে শৈশবে শেখা উত্তর শ্রোকেব পদ্যপত্রস্থিত জলবিন্দু মত চপল, আজ যদি যাই কাল দাঁড়াইবাব স্থান নাই।

কয়েকদিন ধরিয়া খবরের কাগজ দেখিয়া পাইও'নসাব ড্রাগ স্টোরে একটা কাজ খালি দেখা গেল দিন কতক পরে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে বড দোকান, পিছনে কারখানা, তখনও ভিড জমিতে শুরু হয় নাই, অপর চুক-য়াই এক স্থূলকায় আধাবয়সী বডলোকের একেবারে সামনে পড়িল। বড-লোক বলিলেন, কাকে চান?

অপু লাজুক মুখে বলিল—আজ্ঞে, চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে—তাই—

—ও! আপনি মাস্ট্রিক পাশ?

—আমি এবার আই-এ...

ভদ্রলোক পুনরায় তাকিয়ায় ভর দিয়া হাল চাড়িয়া দিবার সুবে বলিলেন—ও আই-এ পাশ নিস্নে আমরা কি করব, আমাদের লেবেলিং ও মাল বটলিং করার জগ্য লোক চাই। ষাটুনিও খুব, সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা, মণো দেড ঘণ্টা খাবার ছুটি, আবার বারোটা থেকে পাঁচটা, কাজের চাপ পড়লে রাত আটটাও বাজবে—

—মাইনে কত?

—আপাতত মনেরো, ওভারটাইম খাটলে দু'খানা জলখাবার—সে-সব আপ-নাদের কলেজের ছোকরার কাজ নয় মশায়—আমরা এমনি মোটামুটি লোক চাই!

ইহার দিনকতক পর আর একটা চাকুরি খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া গেল ক্লাইভ স্ট্রীটে। দেখিল, সেটা একটা লোহা-লক্কেব দোকান বাড়লী ফাম। এক জন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের, অত্যন্ত চুল ফাঁপানো, টেরি-কাটা লোক ইন্সট্রকশন কমিজ পরিয়া বসিয়া আছে, যুগে নিচেব দিকেব গডনে একটা কর্শ ও স্থূলভাব, এমন ধরনের চোখের ভাবকে সে মাতাল ও কুচরিত্র লোকেব সঙ্গে মনে মনে ভড়িত করিয়া থাকে। লোকটি অত্যন্ত অবজাব সুবে বলিল—কি কি এখানে?

অপুর নিষেকেই অত্যন্ত ছোট বাধ হইল নিষেব কাছে। সে সঙ্কচিত সুবে বলিল—এখানে চাকুরী খালি শুনে আসছি।

লোকটার চেহারা বডলোকেব বাড়ির উচ্ছ্র আল, অসচ্চরিত, বড ছেলেব মত। পূর্বে এ ধরনের চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, লীলাদেব বাড়ি বধ মানে থাকিতে। এ টাইপটা সে চেনে।

লোকটা কর্শ সুবে বলিল—কি কর তুমি?

—আমি আই-এ পাশ—করি নে কিছ—আপনাদের এখানে—

—টাইপ রাইটিং জান? না? —যাও যাও, এখানে না—ও কলেজ-টলেজ এখানে চলবে না—যাও

সেদিনকার বাপারটা বাসায় আসিয়া গল্প করাতে ক্যান্বেল স্কুলেব চাত্রটিব এক কাকা বলিলেন—ওদের আজকাল ভারি দেমাক, যুদ্ধের বাজারে লোহার দোকানদার সব লাল হয়ে যাচ্ছে, দালালেরা পর্যন্ত দু-পয়সা ক'রে নিলে।

অপু বলিল—দালাল আমি হ'তে পারি নে?

—কেন পারবেন না, শক্তটা কি? আমার গল্প একজন বড দালাল, আপ-নাকে নিস্নে যাব একদিন—সব শিখিয়ে দেবেন, আপনাব মত শিক্ষিত ছেলে তো আরও ভাল কাজ করবে—

মহা-উৎসাহে ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলের লোহার বাজারে দালালি করিতে বাহির

হইয়া প্রথম দিন-চার পাঁচ ঘোবাবুরিই সার হইল; কেহ ভাল করিয়া কথাও বলে না, একদিন একজন বড় দোকানী জিজ্ঞাসা করিল—বোলট, আছে? পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ? অপু বোলট, কাহাকে বলে জানে না, কোন্ দিকের মাপ পাঁচ জ তাহাও বুঝিতে পারিল না। নোটবুকে টুকিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল, একটা অর্ডার তো পাইয়াছে, খুঁজিবার মতও একটা কিছু ছুটিয়াছে এতদিন পরে।

পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ বোলট এ-দোকান ও-দোকান দিন-চারেক বুধা বোজা-খুঁজির পর তাহার তাহার ধারণা পৌছিল যে ভিনিসটা বাজারে সুলভপ্রাপ্য নম্ন বলিয়াই দোকানী এত সহজে তাহাকে অর্ডার দিয়াছিল। একদিন একজন দালাল বলিল—মশাই সওয়া ইঞ্চি ঘেরের সাপের পাইপ দিতে পারেন যোগাড় ক'বে খাড়াই শো ফুট? যান না অর্ডারটা নিয়ে আসুন এই পাশেই ইউনাইটেড মেশিনারি কোম্পানীর অফিস থেকে।

পাশেই খুব বড় বাড়ি। অফিসের লোকে প্রথমে তাহাকে অর্ডার দিতে চায় না, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—মালু আমাদের এখানে ডেলিভারি দিতে পারবেন তো?...

এ কপাব মানে ঠিক না বুঝিয়াই সে বলিল—হ্যাঁ তা দিতে পারব।

বহু খুঁজিয়া কলেজ স্ট্রীটে যে দোকান হইতে মাল বাহিব হইল, তাহাশ মাল নিজের খবচে কোথাও ডেলিভারি দিতে বাজী নম্ন, অপু নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি লইয়া গরুর গাড়ীতে সীসার পাইপ বোঝাই দেওয়াইল—রাজা উডমাণ্ড স্ট্রীটে ছপু বোঁদে মাল আনিয়া হাজিও করিল। ইউনাইটেড মেশিনারি কিস্তি গাড়িব ভাড়া দিতে একদম অস্বীকার করিল, মাল তো এখানে ডেলিভারী দিবার কথা ছিল, তবে গাড়ি-ভাড়া কিসেব? অপু ভাবিল, না হয় নিজের দালালির টাকা হইতে গাড়ি ভাড়াটা মিটাইয়া দিবে এখন। এখন কাজে নামিয়া অভিজ্ঞতাই আসল, না-ই বা হইল বেশী লাভ।

সে বলিল—আমাব ব্রোকারেজটা?

—সে কি মশাই, আপনি সাড়ে পাঁচ আনা ফুটে দব দিয়েছেন, আপনার দালালি নেন নি? তা কখনও হয়!—

অপু জানে না যে, প্রথম দব দিবার সময় তাহার মধ্যে দালালি ধরিয়া দিবার নিয়ম, সবাই তাহা দিয়া থাকে, সেও যে তাহা দেয় নাই, একথা কেহই বিশ্বাস করিল না। বাব-বার সেই কথা তাহাদের বুঝাইতে গিয়া নিজের আনাড়িপনাই বিশেষ করিয়া ধরা পড়িল। সীসার পাইপওয়াল গোমস্তা তাহাদের বিল বুঝিয়া পাইয়া চলিয়া গেল—তিনদিন ধরিয়া বোঁদে ছুটাছুটি ও পরিশ্রম সার হইল, একটি পয়সাও তাহাকে দিল না কোন পক্ষই। খোটা গাডোয়ান পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল—হামারা ভাড়া কোন দেগা?

একজন বৃদ্ধ মুসলমান দালালের একপাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, অপু অফিস হইতে বাহিরে আসিলেই সে বলিল, বাবু আপনি কত দিন এ কাজে

নেমেছেন...কাজ তো কিছুই জানেন না দেখছি—

অপুকে সে-কথা স্বীকার করিতে হইল। লোকটি বলিল—আপনি লেখা-পড়া জানেন, ও-সব খুচরো কাজ করে আপনার পোষাবে না। আপনি আমার সঙ্গে কাজে নামবেন? বড় মেশিনাবীর দালালি, ইঞ্জিন, বয়লার এই সব। এক-একবারে পাঁচ-শো, সাত-শো টাকা বোজগার হবে—বাপু ইংবেজ জানি নে, তা যদি জানতাম, এ বাজারে এতদিন গুচ্ছয়ে...নামবেন আমার সঙ্গে?

অপু হাতে যগ পাইয়া গেল। গাড়োয়ানকে ভাড়াটা যে দণ্ড দিতে হইল, আনন্দের আতিশয্যে সেটাও গ্রাহ্যের মতো আনিল না। মুসলমানটির সঙ্গে তাহাব অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল—অপু নিজের বাসার ঠিকানা দিয়া দিল। স্থির হইল, কাল সকাল দশটার সময় এইখানে লোকটি তাহার অপেক্ষা করিবে।

অপু রাত্রে শুইয়া মনে মনে ভাবিল—এতদিন পরে একটা সুবিধে দুটেচে, —এইবার হয়ত পয়সার মুখ দেখব।

কিন্তু মাসখানেক কিছুই হইল না...একদিন দালালটি তাহাকে বলিল—দুটোর পর আর বাজার থাকেন না, এতে কি হয় কখনও বাপু? খান কোথায়?

অপু বলিল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যাই—দুটো থেকে সাতটা পর্যন্ত থাকি। একদিন যেও, দেখাবো কত বড় লাইব্রেরী।

লাইব্রেরীতে ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে, কোন এক দরিদ্র ঘরের ছোট ছেলের কাহিনী পড়িতে বড় ইচ্ছা যায় সংসারে দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধে—তাহাদের জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ দরনের সংবাদ জানিতে মন যায়।

মানুষের সত্যাকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কাণ্ড, সমাট, সম্রাট, মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকে, জাঁকজমকে, দরিদ্র গ্রহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পদের পরের আমগাছে তাহাদের পুঁটুলিবাঁধা ছাতু কবে ফুরাইয়া গেল, সম্রাট ঘোড়ার হাট হইতে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যস্থিত ভদ্রলোকের ছেলে তাহার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল—ছ' হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নাই—থাকিলেও বড় কম—যথাক্রমে কি সম্রাট অশোকের শুণু রাজনৈতিক জীবনের গল্প সবাই লৈশব হইতে মুখস্থ করে—কিন্তু ভারতবর্ষের, গ্রীসের, রোমের খবর, গম ক্ষেতের ধারে, ওলিভ, বন্যদ্রাক্ষা, মাটল ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে প্রতিদিনের জীবন, হাজার হাজার বছর ধরিয়া প্রতি সকালে সম্রাট যাপিত হইয়াছে...তাহাদের সুখ দুঃখ আশানিরাশার গল্প, তাহাদের বৃকের স্পন্দনের ইতিহাস সে জানিতে চায়।

কেবল বাবে বাবে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের লেখা পাতায় সম্মিলিত

সৈন্যবৃহের এই আডালট, সরিঙ্গা যন্ত্র, সারি বাঁধা বর্ষার অরণ্যের কঁাকে দূর অতীতের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ি নজরে আসে। অজ্ঞাতনামা কোন লেখকের জীবন-কথা, কি কালের শ্রোতে কুলে-সাগা একটুকুও নয়, প্রাচীন মিশরের কোন একক পত্রকে শস্য কাটিবার কি আয়োজন করিতে লিপিয়া-ছিল, ...বৎ হাজার বছর পর তাদের টুকরা ভূগর্ভে প্রোথিত অগ্ন্য-পাত্রেব মত দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসে।

কিছু আরও ঘনিষ্ঠ পরনের, আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চায় সে। মাংস, ম...ষের বৃকের কথা জানিতে চায়। আজ যা তুচ্ছ, হাজার বছর পরে তা মহাসম্পদ। ভবিষ্যতের সত্যকার ইতিহাস হইবে এই কাহিনী, মানুষের মনোবৈজ্ঞানিক ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস।

আজ একটা দিক তাহার চোখে পড়ে। একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কাছে—মহাকালের মিছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গির্জন ভ্রমশূন্য লিপিয়াছেন, কি অন্য কেহ ভ্রমশূন্য লিপিয়াছেন, এ বিষয়ে তত্ত্বের তত কোম্পল নাই, সে শুধু কেহ হইলোঁকান্ত মহাকালের এই বিরাট মিছিলে। হাজার যুগ আগেকার কত রাজা, রাণী, সম্রাট, মন্ত্রী, বোজা, সেনাপতি, বালক, দুবা, কত অশ্রময়না তরুণী, কত অর্থলিপ্সু রাজপুরুষ—যাহারা অর্থের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা বোধ করে নাই—অনন্ত কাল-সমুদ্রে ইহাদের ভাসিয়া যাওয়ার, বৃহদেব মত মিলাইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত। কোথায় তাহাদের রখা শ্রমের পুরস্কার, তাহাদের অর্থলিপ্সার সার্থকতা?

এদিকে ছুটাছুটিই সব হইতেছে—কাণ্ডে কিছুই হয় না। সে তো চায়-না বড়মাংস হইতে—খাওয়া-পা চালাইয়া গেলেই সে খুশী—পড়াশুনা করাব সে সময় পায় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু তাও তো হয় না, টুইশানি না থাকিলে একেবেলা আহারও ছুটিত না যে। তা ছাড়া এ সব ভ্রমগার আবহাওয়াই তাহার ভাল লাগে না আদৌ। চারিধারে অত্যন্ত হুঁশিয়ারী, দর-কষাকষি, ...শুধু টাকা...টাকা...টাকা...সংক্রান্ত কথাবার্তা—লোকজনের মুখে ও চোখের ভাবে ইতর ও অশোভন লোভ যেন উগ্রভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে—এদের পাকা বৈষয়িক কথাবার্তায় ও চালচলনে অপ...ভন্ন খাইয়া গেল। লাইব্রেরীর পরিচিত ভগতে আসিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে প্রতিদিন।

একদিন মুসলমান দালালটি বাজারে তাহার কাছে দুইটি টাকা হার চাহিল। বড় কষ্ট যাইতেছে, পরের সপ্তাহেই দিয়া দিবে এখন। অপ...ভাবিল—হয়ত বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, রোজগার নাই এক পয়সা। অর্থাভাবের কষ্ট যে কি সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে এই দুই বৎসরে—নিজের বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকিলেও একটি টাকা বাসা হইতে আনিয়া পরদিন

বাজারে লোকটাকে দিল।

ইহার দিন সাতেক পর অপু সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ঘরের দোরে কাহার ধাক্কার শব্দ পাইল, দোর খুলিয়া দেখিল—মুসলমান দালালটি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া।

—এসো, এসো আবুল, তার সব খবর কি ?

—আদার বাবু, চলুন, ঘরের মধ্যে বলি। এ-ঘরে আপনি একলা থাকেন, না, আর কেউ—ওঃ—বেশ ঘব তো বাবু।

—এসো বসো। চা খাবে ?

চা-পানের সব আবহুল আদিবাব উদ্বেগে বলিল। বাবাকপুবে একটা বড় বয়লাবেব সজ্জান পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ধরনের বয়লাবেবই খাবার যদিবে একটা খরিদা হুটিয়া গিয়াছে, কাজটা লাগাতেও পাবিলে তিনশো টাকাব কম নয়—একটা বড় লাভ। কিন্তু মুশকিল দাঁড়াইয়াছে—এই যে, এখনই বাবাকপুবে গিয়া বয়লাবটি দেখিয়া আসা দরকার এবং কিছু বয়না দিবারও প্রয়োজন আছে—অথচ তাহার হাতে একটা সয়দাও নাই। এখন কি করা ? অপু বলিল—খদ্দের মাল ইন্স্পেকশনে যাবে না ?

—আগে আমবা দেখি, তবে তো খদ্দেরকে নিয়ে যাব ?—দেড় পায়েন্ট কাঁবে খরলেও সাড়ে চারশো টাকা থাকবে আমাদের—খদ্দের হাতের দাঁড়িও রয়েছে—

—আপনি নর্ডবনায় থাকুন—এখন টোকাব কি করি ?

অপু দু'ব'দন ই ইশানির টাকা পাঠিয়াছিল, বলল—কত ক'র দরকার ?—মি তো ছেলে পড়ানোর মতনে পেয়েছি—কত তোমার লাগবে বলে।

হসাবপত্র কন্ঠিয়া অ'ট টাকার পড়িবে দেখা গেল। ঠিক হ'ল—আবলে এবেল বয়লাব দেখিয়া আদিয়া ওবেলা বাজারে অ'দুকে সব খবর দিবে। * : বাবু খুলিয়া টাকা আনিয়া আবহলের হাতে দিল।

বৈকালে সে পাঁচটো ওস্তেঙ্কের বাগান্দাতে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত অগ্রাহেব সহিত আবহলের অগমন প্রতীক্ষা করিল। আবহল দৌদান আসিল না, প'ব'দিনও তাহার দেখা নাই। ক্রমে ক্রমে একে একে সাত আটদিন কাটিয়া গেল—কোণায় আবহল ? সাবা বাজার ও রাজা উডমাগু স্ট্রীটের লোহা'র দোকান আগাগোড়া খুঁজিয়াও তাহার সজ্জান মিলিল না। ক্রাইভ স্ট্রীটের একজন দোকানদার শুনিয়া বলিল—কত টাকা নিয়েছে আপনার মশাই ? আবহল তো মশাই জোচ্ছেবেব পাড়ী—আর টাকা পেয়েছেন...তাকা নিয়ে সে দেশে পা'ল-য়েছে—আপনি যেমন !...

প্রথম সে বিশ্বাস করিল না। আবহল সে রকম ম'ল'ব নয়, তাহা চাড়া এত লোক থাকিতে তাহাকে কেন ঠকাইতে যাবে ?

কিন্তু এ ধারণা বেশীদিন টিকিল না। ক্রমে জানা গেল আবহল দেশে যাইবে বলিয়া যাহার কাছে সামান্য যাহা কিছু পাওনা ছিল, সব আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে দিন-সাতেক আগে। কাঁটাপেরেকের দোকানের বুদ্ধ বিশ্বাস

মহাশয় বলিলেন আশ্চর্য্য কথা মশাই, সবাই জানে আবহুলের কাণ্ডকারখানা আর আপনি তাকে চেনেন নি তু-তিনমাসেও ? রাখে-কুট ! ব্যাটা জুয়াচোরের পাণ্ডা, হাড্ডেনার বাজাবে সবাই চিনে ফেলেছে, এখানে আবহুলের হয় না, তাই গিয়ে আজকাল জুটেছে মেশিনারি বাজারে। কোনও দোকানে তো আ নাম একবার ভিডেস করণ্ড উচিত ছিল। হাড্ডেনারের দালালি করা কি আ-নাম মত ভালোমানুষের কাজ মশাই ? আপনার অল্প বয়স; অন্য কাজ কিছু দেখে নিন গে এখানে কথা বেচে খেতে হবে, সে আ-নাম কম নয়, তবু ভাল বে আচটা ঢাকাব ওপ দিয়ে গিয়েছে—

আজ ঢাকা পথের মহাশয়ের কাছে গুটী দুচ্চ হটক অপূর ক'ছে তাই নয় ! ব্যাপার বুঝিয়া চোখে অন্ধকার দেখিল-গোটা মাসের ছেলে পড়ানোর দরুন সব চাকরাই যে সে তুলিয়া দিয়াছে আবহুলের হাতে। এখন সাথ মাস চলিবে কিসে। বাড়ি গাভার দেনা, গত মাসের শেষে বন্ধুর কাছে পাব—এ সবের উদ্দেশ্য ?

দিশাহারা ভাবে দুপ্ চলিতে চলিতে সে ক্লাইভ ট্রীটে শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পিল। দালাল ও ফ্রেজারদের চিংকান, মাডেয়াসীদের ভিড ও লোটে ল, পলিক্রাফ্ট চ'আনা, পলিক্রাফ্ট চ'আনা, নাগরমল মাডে পাঁচ আ বেয়ায় ভিড, বেজায় ই-ই, লালদাশি পাশ কাটাইয়া লাটসাহেবের বাড়ির সামনে দিয় সে একেবারে গিড়ের মার্ঠের মতো কেল্লার দক্ষিণে একটা নিতন স্তম্ভে একটা বড় বড় মর্গিছের চ'মার্স ট'সিয়া বসিল।

অজুই সকালে বাঁি থালা একবার তাগাদা দিয়াছে, কাপড একেবারে নাই, না লাগিলেও ছেলে পড়ানোর টাকা হইতে কাপড কিনিবে ঠিক করিয়াছিল, সে যেহেতু নিতা পেরে গল্প তাগাদা করিতেছে। ~~কিন্তু শেষকালে~~ এভাবে ঠকাইল তাহাকে ? চোশেভাহান জল আসিয়া পড়িল—জু-বদিনের সারা বলিয়া কত বিশ্বাস যে কবিতা সে আবিওলকে।

অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। ঝাঁঝী করিতেছে দুপ, বেলা দেউটা আন্দাজ কেহ কোনদিকে নাই, আকাশ মেঘযুক্ত, দুপ্ত্রসাবী নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দু মত ছিল টিডিয়া চলিয়াছে...দূব হইতে দূবে সেই ছেলেবেলার মত ছোট হইতে ক্রমে নিল'ইয়া চলিয়াছে। একজন ঘেসেড়া বয়স লম্বা লম্বা ঘাস কাটিতেছে। ছোট একটি খেত'দেব মেয়ে ব্যস্তিত ঘুঁটে কুড়াইতেছে।...দূবে খিদিরপুরের টাম যাইতেছে, গজার দিকে বড একটা জাহাজের চোঙ খোটে ব বেতাবেব ম স্থল—এক...ই...তিন...চার...আকাশ কি ঘন নীল।...এই তো চাবিধাবের মুক্ত সৌন্দর্য এই কম্প-মান শ্রাবণ দুপুরের খববৌদ্র...বিহু...সূ...বাত্রি তারা...প্রেম...মা...দিদি অনিল...মাথার উপরে নিঃসাম নীল আকাশ...মুগুণ'বের দেশ...চিরবাত্রি অন্ধকার যেখানে সাই সাই রবে ধুমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ ডুলাইয়া উড়িয়া চলে—গ্রহ ছোটে, চন্দ্রসূর্য লাটিমের মত আপনার ষেগে আপনি ঘুরিয়া বেড়ান

...তুহিন শীতল বোমকেশ দূরে দূবে দেবলোকেব মেরু-পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে তাহাবা মিট মিট কবে—এই পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে জন্ম লইয়া আটটা টাকা...তুচ্ছ আট টাকা...এ কোন বিচিত্র। কিসেব খনিক্রফ্ট আর নাগব-মল ?

কখন বেলা পঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, কখন একটু দূবে একটা ফুটবল টিমের খেলা আবস্ত হইয়া গিয়াছিল—একটা বল ধুঁ করিয়া তাহার একে বাবে সামনে আসিয়া পড়াতে তাহাব চমক ভাঙিল। উঠিয়া সে বলটা ধুহাতে ধরিয়া ঝঞ্ঝাবে একটা লাথি মারিয়া সেটাকে ধাবমান লাইন্সম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

একদিন পূবে হঠাৎ প্রণবের সঙ্গে দেখা। দুজনেই ভারী খুশী হইল। সে কলিকাতায় আসিয়া পয়ত্ত্ব অপুকে কত জল্পগাল খুঁজিয়াছে, প্রথমটা সন্ধান পায় নাই, পবে জানিতে পাবে অপূব পড়াশুনা ছাড়িয়া কোথায় চাকরিতে চুকিয়াছে। প্রণব বাজনৈতিক অপবাবে অভিযুক্ত হইয়া বৎসব বানেক হাজ-তভোগেব পর সম্প্রতি ঝালাস হইষ ছে, হা'সিয়া বলিল—কিছুদিন গভর্ণমেণ্টের অতিথি হায়া এন্ম বে, এসেই, তোব কত খোঁজ করাছি—তারপর, কোথায় চাকরি করিস্ মাইনে কত ?

অপূ হা'সিমুখে বলিল—খববেব কাগজেব অফিসে, মাইনে সত্তর টাকা। সর্বৈব মিথ্যা। টাকা চল্লিশেক মাইনে পায়, কি একটা যত্ত্ব ববদ কিছু কাটিয়া লওয়াব পর হাতে পৌছায় তেত্রিশ টাকা ক আনা। এন্ম গবেব সুরে বলিল, চাকরি সোজা নয়, পষটাগেব বা লা কবাব ভাব অ'মাব ওপব—বৃধবাবেব কাগজে 'আর্ট ও সর্স' বলে লেখাতা আমার, দেগিস পড়ে।

প্রণব হো হো কহিয়া হা'সিয় উঠিয়া বলিল—তুই পূবে সন্দক্ষে লিপ্তে গেছিল কি নিম্নে বে। কি জা'নিস তুই—

—ওখানেই তোমার গোলমাল। সর্ম মানে তুই এ বলতে চাইচিস সেট' হচ্ছে collective সর্ম, আমি বলি ওটা'ব প্রয়োজনীয়তা ছিল আদিম মানুষের সমাজে, আব একটা সর্ম আছে, যা কিনা নিজেব, আমার সর্ম আমার, তোমার ধর্ম তোমার, এইটেব কথাই আমি—যে সর্ম আমার নিজেব তা যে আর কারো নয়, তা আমার চেয়ে কে ভাল বোঝে ?

—বৌবাজারের ঘোড়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা হবে না, আয় গোলদীপিতে লেক চার দিবি।

—শুন বি তুই ? চল তবে—

গোলদীপিতে আসিয়া দুজনে একটা নিজন কোণ বাছিয়া লইল। প্রণব বলিল—বেঞ্চেব উপর দাঁড়া উঠে।

অপূ বলিল—দাঁড়াছি, কিন্তু লোক জমবে না তো ? তা হ'লে কিছু আর একটা কথাও বলব না।

তারপর আধঘণ্টাটুকু অপু বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া গেল। সে নিকপট ও উদার—যা মুখে বলে মনে মনে তাহা বিবর্তন করে। প্রণব শেষ পর্যন্ত শুনিবার পর ভাবিল—এসব কথা নিজে খুব তো নাড়াচাড়া করেছে মনের-মধ্যে? একটু পাগলামির ছিট আছে, কিন্তু ওকে এজেন্টি এত ভালবাসি।

অপু বেঞ্চ হইতে নামিয়া বলিল—কেমন লাগল?—

—তুমি খুব sincere, যদিও একটু ছিট-গ্রস্ত!

অপু লজ্জামিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিল—যাঃ—

প্রণব বলিল—কিন্তু কলেজটা ছেড়ে ভাল কাজ করিস নি, যদিও আমি জানি, তাই সেদিন বিনয়কে বুদ্ধিলাম যে অপু কলেজে না গিয়েও যা পড়াশুনা করবে, তোমরা দু'বেলা কলেজের সিমেন্ট ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেললেও তা হবে না। ওর মধ্যে একটা সত্যিকার পিপাসা রয়েছে—

নিজেও প্রশংসা শুনিয়া অপু খুব খুশী—বালকের মত খুশী।—উজ্জলমুখে বলিল—অনেকদিন পবে তোর সঙ্গে দেখা, চল তোকে কিছু পাওয়াইগে—কলেজমোদেব আর কারও দেখা পাইনে—আমোদ করা হয় নি কতদিন যে—মা মায়া যাওয়ার পর থেকে তো...

প্রণব বিশ্বাসের সুরে বলিল—মাও মারা গিয়েছেন?

—ওঃ, সে কথা বুঝি বলি নি? সে তো প্রায় এক বছর হতে চলল—

সামনেই একটা চায়ের দোকান। অপু প্রবেশ হাত ধরিয়া সেখানে ঢুকিল।

প্রণবের ভাবি ভাল লাগিল অপুও এই প্রত্যন্ত খাঁটি ও অকৃত্রিম, আগ্রহভরা হাত ধরিয়া টানা। সে মনে মনে ভাবিল—এককম Warmth আর sincerity ক'জনেক মধ্যে পাওয়া যায়? বন্ধু তো মুখে অনেকই আছে—অপু একটা হুয়েল।

অপু বলিল—কি খাবি বল?...এই বেয়াবা, কি আছে ভাল?

খাইতে খাইতে প্রণব বলিল—তারপর চাকরির কথা বল—যে বাজার—কি করে ভেটালি?

অপু পূর্ণমুখে লোহার বাজারের দলালির গল্প করিল। হাসিয়া বলিল—

তাৎপর্য আর মজার মহাভিনয়মণের পবে হাডওয়ার আর ভমলো না—ঘুরে ঘুরে বেড়াই চাকরি খুঁজে, বুঝিল—একদিন একজন বললে, বি-এন আর অফিসে অনেক নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—গেলুম সেখানে। খুব লোকের ভিড়, চাকরি অনেক বালি আছে, ইংরিজি লিখতে পড়তে পাবলেই চাকরি হচ্ছে। ব্যাপার কি, শুনলাম মাস-দুই হ'ল স্ট্রাইক চলছে—তাদেব জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—

প্রণব চায়ের চুমুক দিয়া বলিল—চাকরি পেলি?

—শোন না, চাকরি তখনই হয়ে গেল, প্রিন্সিপালের সাটিফিকেটটাই কাজের হ'ল, তখনই ছাপানো ফর্মো স্যাপ্লেক্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিলে, বাইরে

এসে ভারি আনন্দ হল মনটাতে। চম্পিল ঢাকা মাইনে, যেতে হবে গঞ্জাম জেলায়, অনেকদূর, যা ঠিক চাই তাই—বেগিক স্ট্রিটের মোড়ে একটা চায়ের দোকানে বসে মনের খুশীতে উপরি উপরি চার কাপ চা খেয়ে ফেললাম—ভাবলাম এতদিন পর পরসার কন্ঠটা তো ঘুচল!... আর কি খাবি? এই বেল্লারা আর দুটো ডিম ভাজা—না-না খা—

—দু'দিন চাকরি হয়েছে বলে বুকি—তোর সেই পুর্বানো রোগ আজও—
হ্যাঁ তারপর?

—তারপর বাড়ি এসে রাতে শুয়ে শুয়ে মনটাতে ভাল বললে না—ভাবলাম, ওরা একটা সুবিধে আদায় করবার জন্য স্ট্রাইক করেছে, দু'মাস তাদেরও ছেলে-মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের মুখের ভাতের খালা কেড়ে খাব শেষকালে?—আবার ভাবি যাই চলে, অতদূর কখনো দেখি নি, তা ছাড়া মা মারা যাওয়ার পূর্ব কলকাতা আর ভাল লাগে না, যাইগে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত—কেব শুদেব অফিসে গেলাম—ছাপানো ফমাখানা ফেবত দিয়ে এলাম বলে এলাম আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না—

প্রণব বলিল—তোর মুখ আর চোখ look full of music and poetry.

—প্রথম থেকে আমি জানি এ একজন আইডিয়ালিস্ট ছোকরা—তোদের দিয়েই তো এসব হবে...তোব এ খবরের কাগজে কাজ কখন?—

—রাত নাটার পর যেতে হয়, রাত তিনটেব পূর্ব ছুটি। ভাবি খুম পায়, এখনও বাত জাগা অভাস হয়, নি, তবে সুবিধে আছে, সকাল দশটা—এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নি, সারাদিন লাইব্রেরীতে কাটাতে পারি—

খাওয়া দাওয়া ভালই হইল। অপু বলিল—জল খাস নে—চল কলেজ স্কোয়ারে শরবৎ খাবে—বেশ মিষ্টি লাগে খেতে। লেমন স্কোয়াস খেয়েচিস আর,—

কলেজের অত ছেলের মধ্যে এক অনিল ও প্রণব ছাড়া সে আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, অনেকদিন পরে মন গুলিয়া আলাপের লোক পাইয়া তাহার গল্প আর ফুরাইতে ছিল না। বলিল, গাছপালা যে কতদিন দেখি নি, ইট আর সিমেন্ট অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের অফিসে একজন কাজ করে, তার বাড়ি হাওড়া জেলা। সেদিন বলছে, বাড়ির বাগানে আগাছা বেড়ে উঠেছে, তাই সাফ করছে রবিবারে—রবিবারে। আমি তাকে বলি, কি গাছ মিণ্ডের মশাই? সে বলে—কিছু না, ঝুপি গাছ। আমি বলি—বলুন না, কি কি গাছ? রোড সোমবারে সে বাড়ি থেকে এলে তাকে এই কথা জিগোস করি—সে বোধ হয় ভাবে, আচ্ছা পাগল!...রাত্রে, তাই, সারারাত প্রেসের ঘড়-ঘড়ানি, গরম, প্রিন্টারের তাগাদার মধ্যে আমার কেবল মিত্তির মশালের বাড়ির সেই ঝুপি বনের কথা মনে হয়—ভাবি কি কি না জানি গাছ। এদিকে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে, রাত একটার পর শরীর এলিয়ে পড়তে চায়, শরীরের বাঁধন যেন ক্রমে অলগা হয়ে আসে, কুঁজোর জল চোখে মুখে

ঝাপটা দিয়ে ফুলো-ফুলো রাঙা রাঙা, আলি-করা চোখে আবার কাজ
করতে বসি—ইলেক্ট্রিক বাতিতে যেন চোখে ছুঁচ বেধে—আর এত গরমও
ঘরটাতে।

পবে সে আগ্রহের সুরে বলিল একদিন সবিলারে চল দুই আর আমি
কোনও পাড়ারগিয়ে গিয়ে মাঠে, বনের দারে পাবে সান্দদিন বেড়িয়ে কাটাৰ—
বেশ সেইখানেই লতা-কাঠি কুড়িয়ে ভাংবা প্রাণব বিকেল হবে—পাণীর
দাক যে কতকাল শুনি নি। দেয়েল কি বোঁ কপা কণ্ড, এদেব ডাক তো
ভুলেই গিয়েছি সবিলার দিনটা ছুটি, চণ্ডাবি—এখন কত ফুল ফোটারও
সময়—আমি অনেক বনের দলের নাম জানি, দেখিস্ চিনিয় দেব। গাবি
প্রাণব চল আজ গিয়েটাব দেখি? স্টাবে 'সম্ভাব একাদশী' আছে—যাবি?
নিভই শুধুনা গালাবিব চিকিট কিনিল—গিয়েটাব ভাঙিলে অনেক
বাত্তিতে সান্দবার পড়ে অপু বলিল—কি হবে বাকা রাত্ত কু ঘুমিয়ে; আজ
বসে গা কবে রাত কাটাছ। কণ্ডয়ালিশ সোষারের কাছে আসিয়া অপু
বন্ধুর হাত নসিা বেলা ১০ কাইয়া সোষারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল—আম
আম এহ বেলা ১০ বসি, আমি নিমটাদেব পাঁচ প্রে কবব দেববি—

প্রাণব হানিয়া বলিল তোব মাথা খারাপ আছে—এত বাত্রে বেশী চেচাস
নি পুলিশ এসে তাড়িয়ে দেবে—কিছু ক নিকট পর প্রাণবও মতিয়া উঠিল।
১ জনেই হানিয়া আবেল প্রাণব ল বকিয়া সান্দ পল্ট দানেক কাটাইল। অপু
একটা বন্ধুর টপে গড়গাচি দণ্ডেছিল ও দুবে নিমটাদেব শুকনো টংবাজি
কি কবিতা আরও কটি গেল—প্রাণবের মশলচক মবে টাটরা বসিয়া চাইয়া
দেখিল ফুট ১০০ উ ব একজন পাহাশাওয়াল। অমনি সে বেঞ্জন উপর
দাঁড়াইয়া চাৎকাব কবিয়া বলিয়া উঠিল—Hail, Holy Light! Heaven's
First born!—পরে ১ জনেই ডাক স্ট্রীটের দিকের সেরিা টাৎকাইয়া সোজা
দুদে দিল।

বাতি শাপ বেশী নাই। শামহাস্ট সান্টের একটা বড লাল বাড়িব পৈঠায়
অপু গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—কোণ্য আব খাবো—আম বোস্
এখানে—

পণ্ড বলিল একটা গান রতবে—

ওপু বলিল—ব ডিব লোকে দোব খুলে বেবিষে শাসবে কোন বকমে পুলি-
শের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি

—কেমন পাহাশাওয়ালটাকে চেঁচিয়ে বললুম—Hail Holy Light!

—হি চি—টেবও পায় নি? কোবা দিলে পালালুম—নিমটাদেব মত হয় নি?

হি-হি—

প্রাণব বলিল, তোব মাথার চিট আছে যা: সান্দ রাতটা ঘুম হল না তোব
পালায় পড়ে—গা একটা গানই গা—আন্তে আন্তে ধব—আবার হাসে,
যা:—

ইহার দিন-পনেবো পরে একদিন প্রণব আসিয়া বলিল—তোকে নিয়ে যাব বলে এলাম—আমাব মামাতো বোনব বিশ্বে হবে সোমবারে, শুক্রবারে বাজ্রে আমবা যাব, খুলনা থেকে জীমাবে যেতে হয়, অনেকদিন কোথাও বাস নি, চল আমার সঙ্গে, দিন-চাব-পাঁচেক ছুটি পাবি নে?

ছুটি মিলিল। ইতেনে উঠিবার সময় তাহাব ভাবি আনন্দ। অনেকদিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, অনেকদিন রেলও চলে নাই। সকালবেলা জীমারে উঠিবার সময় ভৈরবের উপার হইতে তকুণ সূর্য ওঠাব দৃশ্যটা তাহাকে মুগ্ধ করিল। নদী খুব বর্ড ও চওড়া, প্রণবের মামার বাড়ির ঘাটে ধরেনা, পাশেব গ্রামে নামিয়া নৌকায় ঘাইতে হয়। অপু এ অঞ্চলে কখনও আসে নাই সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, নদীর ধারে সুপারিব সারি, পাশ, যেত-বন, অসংখ্য নাবিকেল গাছ। টিনেব চালাওয়ালা গোলা গগ্গ। অদ্ভুত ধরনের নাম, স্বরূপ-কাটি, যশাইকাটি।

দক্ষিণ-পূব কোণ ও বাড়া পশ্চিম, চ'দিক হইতে প্রকাণ্ড দুটো নদী আসিয়া পবম্পরকে ছুঁইয়া অর্ধচন্দ্রাকাবে বাকিয়া গিয়াছে, সেখানটাতে জলের ব'ং জম্ব সবুজ এবং এই দৃশ্যমস্তানেরই ও-পারে আপ মাইলের মধ্যে প্রণবের মামার বাড়িব গ্রাম গঙ্গানন্দকাটি।

নদীর ঘাট হইতে বাড়িটা অতি অল্প দূরে।

মমো ইহাবাই অবস্থা-

পন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।

অনেকবাব অপু এ ধরনের বাড়িব কল্পনা করিয়াছে, এই ধরনের ব'ং নদীর ধারে, শহব-বাজাবেব হোয়াচ ও আবহাওয়া হইতে ব'ংদবে, কোন এক অখাত ক্ষুদ্র পাড়ারগোয়েব সম্ভ্রান্ত হ'হ, আগে অবস্থা ভাল ছিল, অপচ এখন নাই, নাট মন্দিব, পূজাব দালান, দোলমঞ্চ, বাসমঞ্চ, সবই থাকিবে, অপচ সে-সব হইবে ভাঙা, শ্রীহীন—আপ থাকিবে পাচীন ধনীবংশেব শাস্ত্র মবাদা বোপ, মান সম্মান, উদারতা। প্রণবের মামাব বাড়ির সঙ্গে সব খেন ওব' মিলিয়া গেল।

ঘাট হইতে দুই সাব নারকেল গাছ সোজা একেবাবে বাড'ব দেডাডতে গযা শেষ হইয়াছে, বাঁয়ে প্রকাণ্ড পূজাব দালান, তাইনে হুন্দ ব'ঙেব কলসী বসানো ফটক ও ফুলবাগান, দোলমঞ্চ, বাসমঞ্চ, নাটমন্দিব। গুর হোয়াচ নাই কোনটা'বই, কানিস বসিয়া পড়িতেছে, একবাশ গোলা গায়বা নাটমন্দিবের মেজেতে চবিয়া বেডাইতেছে, এক-আদটা ঝটাপট ক'নয়া চাঁদে উড়িয়া পালাইতেছে, একখানা ষোল-বহারার সেকেলে হাঙরমুখো পালকি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। দেখিয় মনে হয়—এক সময় ইহাদেব অবস্থা খুব ভাল ছিল, বর্তমানে পসরাহীন ডাক্তারের দ্বারসংযুক্ত অনাদৃত পিতলের পাতেব মত শ্রীহীন ও মলিন।

‘পুল এসেছে, পুল এসেছে’—‘এই যে পুল’—‘এটি কে সঙ্গে?’ ‘ও। বেশ বেশ, জীমার কি আজ লেট ৭...৩রে নিবারণকে ডাক, বাগটা বাড়ির মধ্যে

নিম্নে যা, আহা থাক এসো দীর্ঘজীবী হও ।’

প্রণব তাহাকে একেবারে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। অপূ অপরিচিত বাড়ির মধ্যে অন্দরমহলে যথারীতি অত্যন্ত লাজুক মুখে ও সঙ্কোচের সহিত ঢুকিল। প্রণবের বড় মামীমা আসিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। অপূকে দেখিয়া বলিলেন—এ ছেলেটিকে কোথেকে আনলি পুতুল। এ মুখ যেন—
প্রণব হাসিয়া বলিল—কি করে চিনবেন মামীমা ? ও কি আর বাঙাল দেশের মানুষ।

প্রণবের মামীমা বলিলেন—তা নয় রে, কতবার পটে আঁকা ছবি দেখেছি, ঠাকুরদেবতার মুখের মত মুখ—এসো এসো দীর্ঘজীবী হও—

প্রণবের দেখাদেখি অপূও পায়ের ধূলা হইয়া প্রণাম করিল।

—এসো এসো, বাবা আমার এসো—কি সুন্দর মুখ—দেশ কোথায় বাবা ?

সন্ধ্যার পর সারাদিনের গরমটা একটু কমিল। দেউড়ির বাহিরে আরতির কাসর ঘন্টা বাজিয়া উঠিল, চারিদিকে শাখ বাজিল। উপরের খোলাছাদে শীতলপাটি পাতিয়া অপূ একা বসিয়া ছিল, প্রণব ঘুম হইতে সন্ধ্যার কিছু আগে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। কেমন একটা নতুন ধরনের অনুভূতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরনের—কি সেটা ? কে জানে, হয়ত শীপের বব বা আরতির বাজনার দরুন—কিংবা হয়ত...

মোটের উপর এ এক অপরিচিত ভগৎ। কলিকাতার কর্মবাস্ত, কোলাহল—মুখের ধূমধূলিপূর্ণ আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভিন্ন জীবনধারার ভগৎ। নারিকেলশ্রেণীর পত্রশাণ্ডে নবমীর ছোৎনা ফুটিয়াছে, এইমাত্র ফুটিল, অপূ লক্ষ্য করে নাই। কি কথা যেন সব মনে আসে। অনেকদিনের কথা।

পিচন হইতে প্রণব বলিল—কেমন, গাছপালা গাছপালা করে পাগল দেখলি তো গাছপালা নদীতে আসতে ? কি রকম লাগল বল শুনি—

অপূ বলিল—সে যা লাগল তা লাগল—এখন কি মনে হচ্ছে জানিস্ এই আরতি শুনে ? ছেলেবেলায়, আমার দাত ছিল ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁর মুখে শুন—তাম, ‘বংশী বটতট কদম্ব নিকট, কালিন্দী ধীর সমীর’—যেন—

সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রণব ডাকিয়া বলিল—কে রে ? মেনী ? শোন—

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের বালিকা হাসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—কে, কে রে ? মেয়েটি পিচন ফিরিয়া তাহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—সবাই আছে, ননী-দি, দাসী-দি, মেজ-দি, সরলা—তাস খেলব চিলেকোঠার ঘরে—

অপূ মনে মনে ভাবিল—এ বাড়ির ছেলে-মেয়ে সবাই দেখতে ভারি সুন্দর তো ?

প্রণব বলিল—এটি আমার ছোট মেয়ে, এরই মেজ বোনের বিয়ে। ক’ বোনের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে সুশ্রী—মেনী ডাক তো একবার অপূর্ণাকে ?

যেনী সিঁড়িতে গিয়া কি বলিতেই একটা সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্য-
ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, অল্পক্ষণ পবেই একটি ষোল-সতেরো বছরের নতমুখী
সুন্দরী মেয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—ও আমাব বন্ধু,
তোবও সুবাদে দাদা—লজ্জা কাকে এখানে বে? মামাব মেজ মেয়ে অপর্ণা—
এবই—

মেয়েটি চপলা নয়, মুহু হাসিয়া তখনই সবিস্ময় গেল, কি সুন্দর এক ঢাল চুল।
কিছু দিন আগে পড়া একটা ইংবেজী উপন্যাসেব একটা লাইন বাব বাব তাহার
মনে আসিতে লাগিল—Do they breed goddesses at Slocum
Magna? Do they...breed...at Slocum Magna?

এ বাতটাব কথা অপূর চিরকাল মনে ছিল।

পবদিন প্রণবেব সঙ্গে অপূ তাহার মামাব বাড়ির সবটা ঘুরিয়া দেখিল। পাচীন
ধনীবাংশ বটে। বাড়িব উত্তর দিকে পুৰাতন আমলের আবাস বাটি ও প্রকাণ্ড
সাতঃস্নানী পূজাব দালান ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ওপাশে অন্যতম শাবক,
রামদল ভ বাঁড়ুঘোব বাড়ি। পুৰাতন আমলেব বসতবাটি বর্তমানে বিতাক্ত
রামদলভেব ছোট ভাই সেখানে বাস কবিতেন। কি কাবণে তাহার
একমাত্র পুত্র নিকলেশ হইয়া থাকিয়া তাহার বেচিয়া কিনিয়া কাশীবাসী
হইয়াছেন।

এ সব কথা প্রণবেব মুখেই ক্রমে ক্রমে শোনা গেল।

দ্বানের সময়ে সে নদীতে স্নান কবিতো চাহিলে সকলেই বাবণ কবিল—এখান-
কাব নদীতে এ সময়ে কুমীরেব উৎপাত খুব বেশী, পুকুরে স্নান করাট
নিরাপদ।

বৈকালে একজন রক্ত ভদ্রলোক কাচারী-বাড়িব বারান্দাতে বসিয়া গল্প
করিতেছিলেন, দিন-পনেবো পবে নিকটস্থ কোন গ্রামেব জনৈক তাঁতির
ছেলে হঠাৎ নিকলেশ হইয়া যায়, সম্প্রতি তাহাকে রায়মঙ্গলেব এক নিজন চরে
অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। - ছেলেটি বলে, তাহাকে নাকি পরীতে
ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রমাণস্বরূপ সে আঁচলেব খুঁট খুলিয়া কাঁচা লবঙ্গ
এলাচ ও ভায়দল বাহিব করিয়া দেখাইয়াছে, এ-অপলেব ত্রিসীমানায় এ
সকলের গাছ নাই পরী কোথা হইতে আনিয়া উপহার দিয়াছে।

প্রণবেব মামীমা ওপূরে কাছে বসিয়া ওজনকে খাওয়াইলেন, অনেকদিন
অপূর অদৃষ্টে এত ক্ষুদ্র আদব বা এত ভাল খাওয়া-দাওয়া হোটে নাই। চিনি,
ক্ষীর, মশলা, কপূর, ঘৃত, ভীবে কখনও তাহাদেব দরিদ্র গৃহস্থালিতে এ
সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। মায়ের সংসারে চালের গুঁড়া, গুড় ও
সরিষার তৈলের কারবার ছিল বেশী।

পরদিন বিবাহ। সকাল হইতে নানা কাজে সে বাড়ির ছেলের মত খাটিতে লাগিল। নাটমন্দিরে ববাসন দাডানোর ভার পড়িল তাহার উপর। প্রাচীন আমলের বড় জামি ও স্তরক্ষি উপর সাদা চাদর পাতিয়া দবাস বিছানো, কাচের সেজ ও বাতিব দুম টাঙ্গানো, দেবদারু পাতার ফটক বাঁধা, কাগজ কাটিয়া দম্পতিব দেহে আশীষবাণী বচনা, সকাল আটটা হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এসব কাজে কাটিল।

সন্ধ্যার সময় বব আসিবে। বরের গ্রাম এ নদীরই পারে, তবে দশ বারো ক্রোশ দূরে, নদীপথেই আসিতে হইবে। বরের পিতা ও-অঞ্চলের নাকি বড় গাতিদার, তাহা ছাড়া বিস্তৃত মহাজনী কববারও আছে।

বরের নোকা আনিতে একটু বিলম্ব হইতে পারে, প্রথম লগ্নে বিবাহ যদি না হয় বাত্রে দশটার লগ্ন বাদ যাইবে না।

বাবার বুঝিয়া অণু বলিল—বাত তো আজ ভাগতেই হবে দেখছি, আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নি ভাই, বব এলে আমাকে ডেকে ডুলো এখন।

প্রণব তাহাকে তেওলাব চিলে-কোঠার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—এখানে হে .চ কমা, এখানে ঘুম হবে এখন, আমি ঘন্টা দুই পরে ডাকবো।

দবতা ছোট, কিন্তু পব হওয়া, দিনের শ্রান্তিতে সে শুইয়া না শুইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সে ঠিক জানে না, ক'হ'দেব ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে তাড়াগাতি উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বব এসেছে বুঝি? উঃ, বাত অনেক হয়েছে তো। কিন্তু প্রণবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাব মনে হইল—একটা কিছু কেন ঘটিয়াছে। সে বিস্ময়ের সুবে বলিল—কি—কি প্রণব—কিছু হয়েছে নাকি?

উত্তরের পরিবর্তে প্রণব তাহাব বিছানার পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতব মুখে তাহার দিকে চাহিল, পবে ছু-ছু-চোখে তাহাব হাত দু'টি ধরিয়া বলিল—ভাই আমাদের মান বন্ধাব ভাব তোমাব হাতে আজ বাত্রে, অপর্যাকে এখুনি তোমায় বিয়ে করিতে হবে, আব সময় বেশী নেই, বাত খুব অল্প আছে, আমাদের মান রাখো ভাই।

আকাশ হইতে পড়িলেও অণু এত অবাক হইত না।

প্রণব বলে কি?...প্রণবের মাথা বাবাপ হইয়া গেল নাকি? না—কি সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে।

এই সময়ে দু'জন গ্রামের লোকও ঘুরে ঢুকিলেন, একজন বলিলেন—

আপনার সঙ্গে যদিও আমার পবিচয় হয় নি, তবুও আপনার কথা :সব পুণ্য মুখে শুনেছি—এদের আজ বড় বিপদ, সব বলছি আপনাকে, আপনি না বাঁচালে আর উপায় নেই—

ততক্ষণ অপু ঘুমের ঘোবটা অনেকখানি কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে না-বুঝিতে পারার দৃষ্টিতে একবার প্রণবের, একবার লোক দুইটির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি।

ব্যাপার অনেক।

সন্ধ্যার ঘন্টাবানেক পর বরপক্ষের নেকা আসিয়া ঘাটে লাগে। লোক-জনের ভিড় খুব, দু-তিনখানা গ্রামের প্রজাপত্র উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। বরকে হাঙ্গামা মুখো সেকেলে বড় পাল্‌কিতে উঠাইয়া বাজনা-বাছ ও মৃদামের সহিত মহা সমাদরে ঘাট হইতে নাটমন্দিরে বসাসনে আনা হইতেছিল—এমন সময় এক অদ্ভুতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। বাড়ির উঠানে পাল্‌কিখানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, হঠাৎ বর নাক পাল্‌কি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চোঁচাইয়া বলিতে থাকে—হুকা বোলাও, হুকা বোলাও ?

সে কি বেভায় চাৎকার।

একমুহূর্তে সব গোলমাল হইয়া গেল। চাৎকার হঠাৎ থামে না, বরকতা স্বয়ং দৌড়িয়া গেলেন, বর পক্ষের প্রবীণ লোকেরা ছুটিয়া গেলেন,—চারিদিকে সকলে অবাঞ্ছিত, প্রজারা অবাঞ্ছিত, গ্রামসুন্দর লোক অবাঞ্ছিত। সে এক কান্ড। চোখে না দেখিলে, বুঝানো কঠিন—আব কি যে লজ্জা, সাবা উঠান জুড়িয়া প্রজা, প্রাতবেশী আল্লীসুচুতু, পাডাব ও গ্রামের ছোট বড় সকলে উপস্থিত, সকলের সামনে—বাড়ুয়ো বাড়ির মেয়ে ববিবাহে এ ভাবে ঘটনা ঘটিবে। তাহা স্বপ্নাতীত, এ উদ্ধার মুখ চাওয়া চাওয়া করে, মেয়েদের মদ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বর যে প্রকৃষ্টস্থ নয়, একথা বুঝিতে কাহাবও বাকী রহল না।

বরপক্ষ যদিও নানাভাবে কথাটা ঢাকিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কেহ বলিলেন, গরমে ও সারাদিনের উপবাসের কষ্ট—ও কিছু নয়, ও-রকম হইয়া থাকে,...কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে চাপা দেওয়া গেল না, ক্রমে ক্রমে নাকি প্রকাশ হইতে লাগিল যে, বরের একটু সামান্য ছিট আছে বটে,—কিংবা ছিল বটে, তবে সেটা সব সময় যে থাকে তা নয়, আজকার গরমে, বিশেষ উৎসবের উদ্বেজনায়—ইত্যাদি। ব্যাপারটা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিতেছিল, নানা পক্ষের বোঝানোতে আবার সোজা হওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল, মেয়ের বাপ শশীনারায়ণ বাড়ুয়োও মন হইতে সমস্তটা ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাহা ছাড়া উপায়ও অবশ্য ছিল না—কিন্তু এদিকে মেয়ের মা অর্থাৎ প্রণবের বড় বাবীমা মেয়ের হাত ধরিয়া নিজের বরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছেন,—তিনি বলেন, জানিয়া-তিনিয়া তাঁহার সোনার প্রতিমা মেয়েকে তিনি ও পাগলের হাতে কখনই তুলিয়া দিতে পারিবেন না, যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটবে। সকলের

বহু অনুনয় বিনয়েও এই তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে তিনি ঘরের দরজা খোলেন নাই, নাকি তেমন তেমন বুঝিলে মেয়েকে রাম-দা দিয়া কাটিয়া নিভের গলায় দা বসাইয়া দিবেন এমনও শাসাইয়াছেন, সত্যি? কেহ দরজা ভাঙিতে সাহস করে নাই। অপর্ণাও এমনি মেয়ে, সবাই জানে, যা তাহার গলায় যদি সত্যি রাম দা বসাইয়া দেয়ও, সে প্রতিবাদে মুখে কখনও টু শব্দটি উচ্চারণ করিবে না, মায়ের ব্যবস্থা শাস্ত-ভাবেই মানিয়া লইবে।

পিছনের ওদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি না রক্ষা করলে আর কেউ নেই, হয় এদিকে একটা খুনোখুনি হবে, না হয় সকাল হলেই ও-মেয়ে দো-পা হয়ে যাবে—এ সব দিকের গতিক তো জানানো না, দো-পা হ'লে কি আব ও মেয়েব বিয়ে হবে মশাই ১০০০ আঁহা, অমন সোনার পুতুল মেয়ে, এত বড় ঘর, ওই অদূরে শেষে কিনা এই কেলেকারী। এ ব্যতীর মধ্যে আপনি ছাড়া আব এ অঞ্চলে ও-মেয়ের পাত্র কেউ নেই—বাচান আপনি—

অপুর মাথায় যেন কিসের দাপাদাপি মাতামাতি...মাথার মধ্যে যেন চৈতন্য-দেবের নগর সংকীর্ণ শুক হইয়াছে।...এ কি সবটে তাহাকে ভগবান দেখিলেন। সকল প্রকার বন্ধনকে সে ভয় করে, তাহার উপর বিবাহের মত বন্ধন।...এই তো সেদিন যা তাহাকে খুঁজি দিয়া গেলেন... আবাব এক বৎসব ঘুরিতেই—একি।

মেয়েটির মুখ মনে হইল...আঙঠি সকালে নিচেব ঘবে তাহাকে দেখিয়াছে... কি শাস্ত, সুন্দর গতিভক্তি। দোনার প্রতিমাই বটে, তাহার অদূরে উৎসবের দিনে এই বাপার।...তাহা ছাড়া রাম-দা-এর কাণ্ডটা... কি করে সে এখন? ..

কিছু ভাবিবার অবসর কোথায়? পিছনে প্রণব দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে, সেই ওদ্রলোক দু'টি, তার হাত ধরিয়াছেন—তাহাও সে চেলিয়া ফেলিয়া দিতে পাবিত—কিছু মেয়েটিও যেন শাস্ত প্রণব চোখ দু'টি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সেই যে কাল সন্ধ্যায় প্রণবের আস্থানে ছাদেব উপরে যখন তাহার পানে চাহিয়াছিল তেমনি অপক্লপ দ্বিধ চাহনিতে...নিবাক মিনতির দৃষ্টিতে সেও যেন তাহার উত্তবেব অপেক্ষা করিতেছে..

সে বলিল, চল ওই, যা করতে বলবে, আমি তাই করব, এসো।

নিচে কোথাও কোন শব্দ নাই, উৎসব-কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, বরপক্ষ এ বাড়ি হইতে সদলবলে উঠিয়া গিয়া ইহাদের শরিক রামকৃষ্ণ ভাঁড়ুয়ার উত্তর বারান্দাব স্থানে স্থানে দু-চারজন জটলা করিয়া কি বলাবলি করিতেছে, আশ্চর্য এই যে, সম্প্রদান-সভায় পুৰোহিত মহাশয় এত গোলমালের মধ্যেও ঠিক নিজেব কুশাসনখানির উপর বসিয়া আছেন, তিনি নাকি সেই সন্ধ্যায় সমস্ত আসনে বসিয়াছেন আর উঠেন নাই।

সকলে মিলিয়া লইয়া গিয়া অপূকে বরাসনে বসাইয়া দিল।

এসব ঘটনাগুলি পরবর্তী জীবনে অপূর তত মনে ছিল না, বাংলা খবরের

কাগজের ছবির মত অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকিত। তাহার মন তখন এত দিশাহারা ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল, চারিদিকে কি হইতেছে, তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

আবার দু-একটা যাহা লক্ষ্য করিতেছিল, যতই চুড়্‌ হোক গম্ভীরভাবে মনে আকিয়া গিয়াছিল, যেমন—সামিয়ানার কোণের দিকে কে একজন দাব কাটিতেছিল, ভাবটা গোল ও বাড়া, কাটাখিঁব বাটটা বাঁশেব—অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল।

বেশম-চেলী-পবা সালস্কাবা কন্যাকে সভায় আনা হইল, বাড়ির মনো হঠাৎ শাঁখ বাড়িয়া উঠিল, উল্লসনি শোনা গেল লোকে ভিড় করিয়া সম্প্রদান-সভার চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল। বুঝিহেন কপায় অল্প চেলী পালিল, নতুন উপবাস্ত পাবন করিল, কলেবর, গলেব মত মনপাঠ করিয়া গেল। স্বা আচারের সময় আসিল, তখনও সে অনুমান, নববধূর মত দেও খাড বাড়িয়া আছে, যে বাপারটা ঘটিতেছে চাটনায়ে তখনও যে সে সমাকৃতিয়া কাটিতে পাবে নাই—কানো নাশ দিয়া কি যেন একটা শির শির করিয়া উল্লসের দিকে উঠিতেছে—না—ঠিক উপরে দিকে নয়, যেন নিচের দিকে নামিতেছে।

প্রণবের বড় মাঝীমা কাঁদিতেছিলেন তাহা মনে আছে, তিনিই আবার গণদের শাখিও অঁচল দিয়া তাহার মুখে ঘাম মুছাইয়া দিলেন, তাহাও মনে ছিল। কে একজন মহিলা বলিলেন—মেয়ের শিবসংসার ছেঁদ ছিল বড়বে তাই এমন বর মিললো। ভাড়া দালান দেবে আলো করেছে।

সুভদৃষ্টিব সময় সে এক অদ্ভুত বাপাব। মেয়ে লুপায় পংকর চোখটি নত করিয়া আছে, চপ্পু কেঁচুলেব সহিত চাটিয়া দেখিল, ভাল করিয়াই দেখিল, যতক্ষণ কাপড়ের ঢাকানো ছিল, ততক্ষণ সে সুমস্বেটব মুখ ভাড়া অন্যদিকে চাহে নাই—চিব্বকের গঠন-ভঙ্গিটি এক চমক দেখিয়াই সঠিক ও সন্দেহ মনে হইল। প্রতিমার মত রূপট বটে, চূর্ণ অলকের দু-একগাছা কানের আশেপাশে পড়িয়াছে, হিম্মল রঙের ললাটে ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কানে লোনাব ঢুলে আলো পড়িয়া অলিতেছে।

বাসর হইল পুং অল্লক্ষ, রাত্রি অল্লক্ষ ছিল। মেয়েদের ভিড়ে বাসর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাহাদের মনো অনেকেই বিবাহ ভাঙিয়া যাইতে নিজেব নিজেব বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন, কোথা হইতে একজনকে দিয়া আনিয়া অপর্যাব বিবাহ দেওয়া হইতেছে শুনিয়া তাহারা পুনরায় বাপারটা দেখিতে আসিলেন। একটাত্রে এত মড়া এ অঞ্চলেব অসিবাঙ্গীরা ভাগো কখনও জোটে নাই—কিন্তু পুং হইতে-দুনিয়া-আনা বরকে দেখিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন এটবার অপর্যাব উপযুক্ত বন কইয়াছে বটে।

প্রণবের বড় মাঝীমা তেজস্বিনী মহিলা, তিনি কাকিয়া না বসিলে ওই বায়ু-রোগগ্রস্ত পাত্রটির সহিতই আজ তাহার মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত নিশ্চয়ই।

এমন কি তাঁহার এমন রাশ-ভারী স্বামী শশীনারায়ণ বাড়ুযো যখন নিজে বন্ধ-দরজায় কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—বড়বো, কি কর পাগলের মত, দোর খোলো, আমার মুখ বঁধো—ছিঃ—তখনও তিনি অচল ছিলেন। তিনি বলিলেন—মা, যখনই একে পুত্র সঙ্গে দেখেছি, তখনই আমার মন খেন বলেছে এ আমার আপনার লোক ছেলে তো আরও অনেক পুত্র সঙ্গে এসেছে গিয়েছে কিন্তু এত মায়ী কারোব উপব হয়নি কখনও—ভেবে ঘ্যাখো মা, এ মুখ আব লোকালয়ে দেখাবো না ভেবেছিলাম—ও ছেলে যদি আজ পুত্র সঙ্গ এ বাড়ি না আসতো—

পূর্বের সেই প্রোচা বাপা দিয়া বললেন—তা কি করে হবে মা, ওই যে তোমাব অপর্ণা স্বামী, তুমি আমি কেনারাম যুগ্মদোর ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ঠিক করতে গেলে কি হবে, ভগবান যে ওদেব দুজনকে জগো দুজনকে গড়েছেন ও ছেলেকে যে আজ এখানে আসতেই হবে মা—

প্রবেশ মামীমা বলিলেন—আবার যে এমন কবে কথা বলব তা আজ দু'ঘণ্টা আগেও ভাবিনি—এখন আপনাব পাঁচজনে আশীর্বাদ করুন, যাতে—

চোখের জলে তাঁহার গলা আড়ক্ট হইয়া গেল। উপস্থিত কাহারো চোখ শুক ছিল না, অপুও অতি কষ্টে উদগত অশ্রু চাপিয়া বসিয়া রহিল। প্রবেশ মামীমাব উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাঁহার মন...মায়ের পুত্রই বোধ হয় এখন আর কাহারও উপব...কবল আর একজন আছেন—মেজ বো—রাণী—
তিনি লীলার মা—

তা ছাড়া মায়ের উপব—তাঁহার মনোভাব, শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নয়, তাহা আবও অনেক ঘনিষ্ঠ, অনেক গভীর, অনেক আপন—বহির্ন নাড়ীর বাঁধনের সঙ্গে সেপানের খেন যোগ—সে-সব কথা বুঝিয়া বলা যায় না...যাক সে কথা বিগ্ৰাসঘাতক প্রণব কোথা হইতে আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে নূতন জামাই খুব ভাল গান গাহিতে পারে। অপুও মা তখনই বাসর হইতে চলিয়া গেলেন; বালিকা ও তকণীব দল একে চায় তো আরে পায়, এদিকে অপু ঘামিয়া বাঙা হইয়া উঠিয়াছে। না সে পারে ভালো করিয়া কাহারো দিকে চাহিতে, না মুখ দিয়া বাহির হয় না কোন কথা। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে একটা রবিবাবু গান গাহিল, তাবপব আর কেহ ছাড়িতে চায় না—সুতরাং আর একটা। মেয়েরাও গাহিলেন, একটি বধূব কর্ণস্বব ভাবী সুমিষ্ট। প্রোচা ঠান্ডি নববধূব গা ঠেলিয়া দিয়া বলিলে—ও নাতনি, তোর বর ভেবেছে ও বাঙাল দেশে এসে নিজেই গান গেয়ে আসব মাতিলে দেবে—তুলিলে দে না তোর গলা—জারিজুরি একবার দে না ভেঙে—

অপু মনে মনে ভাবে—কার বর?...সে আবার কার বর?...এই সুসজ্জিতা সুন্দরী নভমুখী মেয়েটি তাহার পাশে বসিয়া, এ তার কে হয়?...স্ত্রী...তাঁহারই স্ত্রী?

পরদিন সকালে পূর্বভ্রম বরপঞ্চের সহিত তুমুল কাণ্ড বাধিল। উভয় পক্ষে বিস্তর তর্ক, বগড়া শাপাশাপি, মামলার ভয় প্রদর্শনের পর কেনারাম মুখুযো দলবলসহ নৌকা কবিত্তা স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রণব বড়মাকে বলিল—ওসব বড় লোকেব মুখা জডভরত ছেলেব চেয়ে আমি যে অপূর্বকে কত বড় মনে করি। ...একা কলকাতা শহবে সহায়হীন অবস্থায় ওকে যা হুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে দেখেছি আজ তিন বছর ধরে, ওকে একটা সত্যিকার মানুষ বলে ভাবি।

অপূর্ব ঘব-বাড়ি নাই, ফুলশয্যা এখানেই হইল। রাত্রে অপূর্ব ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের চারিশর ফুল ও ফুলের মালায় সাজানো। পালঙ্কের উপর বিছানায় মেয়েটা একরাশ বৈশাখী চাঁপাফুল ছড়াইয়া বাঁধিয়াছে ঘরের বাতাসে পুষ্প-সারেব মৃদু সৌবভ। অপূর্ব সাগ্রহে নববধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাসব রাত্রেব পব আর মেয়েটিব সহিত দেখা হয় নাই বা এ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কথাবার্তা হয় নাই আদৌ—আচ্ছা বাপাবটা কি রকম ঘটিবে? অপূর্ব এক কোঁতুহলে ও আগ্রহে চিপ্ চিপ্ কপিতেছিল।

খানিক রাত্রে নববধূ ঘবে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব মনে আর একদফা একটা অবাস্তবতার ভাব জাগিয়া উঠিল। এ মেয়েটি তাহাবই স্ত্রী? স্ত্রী বলিতে য'হা বোঝায় অপূর্ব ধাবণা ছিল, তা মেন এ নয়। কিংবা হয়ত স্ত্রী বলিতে ইহাই বোঝায়, তা'হার ধারণা ভুল ছিল। মেয়েটি দোবেব কাছে নখখোঁ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল—অপূর্ব অতিক্রমে সঙ্কোচ কাটাইয়া মৃদুস্ববে বলিল—আপনি—তু—তুমি দাডিয়ে কেন? এখানে এসে বস—

বাহিবে বহু বালিকাকণ্ঠেব একটা সন্মিলিত কলহাস্যধ্বনি উঠিল। মেয়েটিও মৃদু হাসিয়া পালঙ্কের একদারে বসিল—লজ্জায় অপূর্ব নিকট হঠতে দূরে বসিল। এই সময় প্রণবের ছোট মামীমা আসিয়া বালিকাব দলকে বকিয়া-ঝকিয়া নিচে নামাইয়া লইয়া যাইতে অপূর্ব খানিকটা দ্বিগ্ধি বোধ করিল। মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার নাম কি?

মেয়েটি মৃদুস্ববে বলিল—শ্রীমতী অপূর্ণা দেবী—সঙ্গে সঙ্গে সে অল্প একটু হাসিল। যেমন সুন্দর মুখ তেমন সুন্দর মুখের হাসিটা—কি রং! ... কি গ্রীবার ভঙ্গি। চিবুকের গঠনটি কি অপরূপ—মুখের দিকে চাহিয়া উজ্জল ব্যতির আলোয় অপূর্ব মেন কিসের নেশা লাগিয়া গেল।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ। অপূর্ব গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল। কুঁঠা হঠতে জল ঢালিয়া এক গ্লাস জলই সে খাইয়া ফেলিল। কি কথা বলিবে—সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিল—আচ্ছা আমার সঙ্গে বিয়েতে তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েছে—না?

বধূ মৃদু হাসিল।

—বুঝতে পেরেছি ভারী কষ্ট হয়েছে—তা আমার—

—যান্—

এই প্রথম কথা, তাহাকে এই প্রথম সন্দোহন। অপূর্ব সারাদেহে যেন বিহ্বল
বেলিয়া গেল, অনেক মেয়ে তো ইতিপূর্বে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, এ
রকম তো কখনও হয় নাই?...

দক্ষিণের জানালা দিয়া মিঠা হাওয়া বহিতেছে, চাঁপাফুলের সুগন্ধে ঘরের
বাতাস ভরপ, ব।

অপূ, বলিল—রাত দুটো বাজে, শোবে না? ইয়ে—এখানেই তো
শোবে?

মা ও দিদিব সঙ্গে ভিন্ন অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় সে শোয়
নাই, একা একঘরে এতবড় খনা গ্রীষ্ম নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে এক বিছানায়
শোওয়া—সেটা ভাল দেখাইবে? কেমন যেন বাদ বাদ ঠেকিতেছিল।
একবার তাহাব হাতখ না মেয়েটিব গায়ে অসাবধানতাবশত ঠেকিয়া
গেল—সঙ্গে সঙ্গে সারা গা শিহরিয়া উঠিল। কোঁহলে ও ব্যাপাবের
অভিনবতার তাহাব শরীরেব বড় টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল—ঘরের উজ্জল
আলোয় ঐ সুন্দব মুখ রাঙা ও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিম্পন্ন
দেখাইতেছিল।

ইহাৎ সে কিসের টানে পাশ ফিরিয়া মেয়েটিব গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত
তুলিয়া দিল। বলিল—সেদিন যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল, তুমি কি
ভেবে ছিলে?

মেয়েটি মুহূ হাসিয়া তাহাব হাতখ না আস্তে আস্তে সরাইয়া দিয়া বলিল—
আপনি কি ভেবেছিলেন আগে বলুন?...সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের সুঠাম,
পুষ্পেলব হাতখানি বাতির আলোয় তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—গায়ে
কাঁটা দিয়ে উঠেছে—এই দেখুন কাঁটা দিয়েছে—কেন বলুন না?...কথা শেষ
করিয়া সে আবাব মুহূ হাসিল।

এতগুলি কথা একসঙ্গে এই প্রথম? কি অপূর্ব বোমাল এ। ইহার অপেক্ষা
কোন বোমাল আছে আর এ জগতে, না চিনিয়া, না বুঝিয়া সে এতদিন
কি হিজিবিজি ভাবিয়া বেড়াইয়াছে।...জীবনের জগতেব সঙ্গে এ কি অপূর্ব
ঘনিষ্ঠ পরিচয়।...তাশাব মাথাব মধ্যে কেমন যেন করিতেছে, মদ বাইলে
বোংহয় এরকম নেশা হয়...ঘরের হাওয়া যেন...ঘরের মধ্যে যেন আর থাকা
যায় না...বেজায় গরম। সে বলিল—একটু বাইরের ছাদে বেড়িয়ে আসি,
থুব গরম না? আসছি এখুনি—

বৈশাখের জোৎস্না রাত্রি—রাত্রি বেশী হইলেও বাড়ির লোক এখনও ঘুমা
নাই, কাল এখানে বোভাত হইবে, নিচে তাহারই উত্তোগ আয়োজন চলি-
তেছে। দালানের পাশে বড় রোয়াকে ঝিয়েরা কচু শাক কুটিতেছে, রান্না-
কোঠার পিছনে নতুন খড়ের চালা বাঁধা হইয়াছে, সেখানে এত রাত্রে পান-
তুল্লার ভিড়ান হইতেছে—সে ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিল।

ছাড়ে কেহ নাই, দূরের নদীর দিক হইতে একটা ঝিরঝির হাওয়া বহিতেছে। কি যে ঘটয়াছে তাহা যেন সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই—আজ বুঝিয়াছে কয়েকদিন পূর্বেও সে ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য ভগতে সম্পূর্ণ একাকী, মুখের দিকে চাহিবার ছিল না কেহই। কিন্তু আজ তো তাহা নয়, আজ এই মেনেটি যে কোথা হইতে আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে যেন ও জীবনের পরম বন্ধু।

যা এ-সময় কোথায়? মায়ের যে বড সাধ ছিল মনসাপোতার বাড়িতে শুইয়া শুইয়া কত রাত্রে কত সে-সব সাধ, কত আশার গল্প...মায়ের সোনার দেহ কোন্ দালাতীরের শাশানে চিতায়িতে পুড়িবার বাত্ৰি হইতে সে আশা-আকাঙ্ক্ষার তো সমাধি হইয়াছিল...মাকে বাদ দিয়া জীবনের কোন উৎসব...

তপ্ত অকুল চোখের জলে চারিদিকে ঝাপসা হইয়া আসিল।

বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী রাত্রির ছোৎনা যেন তাহার পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীবাদের মত তাহার বিভ্রান্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া সংল গুহ্র বহিষ্যত স্বর্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

কলিকাতার কর্মকঠোর, কোলাহল-মুখর, বাস্তব ভগতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গত কয়েকদিনের জীবনকে নিতান্ত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল অপূর্ব। একথা কি সত্য—সত্য শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমান শেষরাত্রে সে অনেক দূরো নদী তীর-বর্তী এক অজানা গ্রামেব অজানা গৃহস্থবাটীর রূপসী মেয়েকে বলিয়াছিল—আমি এ বছর যদি আর না আসি অপূর্ণা?...

প্রথমবার মেয়েটি একটা হাসিয়া মুখ নিচু করিয়াছিল, কথা বলে নাই।

অপূ আবার বলিয়াছিল—চূপ করে থাকলে হবে না, তুমি যদি বলো আসব, নৈলে আসব না, সত্যি অপূর্ণা। বলে কি বলবে?

মেয়েটি লজ্জারক্রমুখে বলিয়াছিল—বা বে, আমি কে? যা রসেছেন, বাবা রসেছেন, ঐদের—আপনি ভারী—

—বেশ আসব ন' তবে। তোমার নিজের ইচ্ছে না থাকে—

—আমি কি সে কথা বলেছি?

—তা হলে?

—আপনারা ইচ্ছে যদি হয় আসতে, আসবেন—না হয় আগবেন না, আমার কথায় কি হবে?

ও-কথা ইহার বেশী আর অগ্রসর হয় নাই, অন্য সময় এ ক্ষেত্রে হয়ত অপূর্ব অভ্যন্ত অভিমানে হইত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোতুহলটাই তাহার মনের অন্য সব প্ররক্তিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভালবাসার চোখে মেয়েটিকে সে এখনও

দেখিভে পারে নাই, যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে অভিমানও নাই।

সেদিন বৈকালে গোলদীঘি মোড়ে একজন ফেরিওয়াল। চাপাফুল বেচিতেছিল। সে আগ্রহের সহিত গিয়া ফুল কিনিল। ফুলটা আত্মাণের সঙ্গে সঙ্গে কিঃ মনের মধ্যে একটা বেদনা সে সুস্পষ্ট অনুভব করিল, একটা কিছু পাইয়া হারাইবার বেদনা, একটা শূন্যতা, খালি-খালি ভাব...মেয়েটির মাথায় চুলের সে গন্ধটাও যেন আবার পাওয়া যায়।...

অন্যমনস্কভাবে গোলদীঘির এক কোণে ঘাসের উপর অনেকক্ষণ একা বসিয়া বাসিয়া সেদিনের সেই রাতটি আবার সে মনে আনিবার চেষ্টা করিল। মেয়েটির স্থান কি রকম যেন...ভারী সুন্দর মুখ...কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সব যেন মুছিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—মেয়েটির মুখ মনে আনিবার ও পরিয়া রাখিবার যত বেশী চেষ্টা করিতেছে সে, ততই সে-মুখ দ্রুত অস্পষ্ট হইয়া যাউতেছে। শুধু নতপল্লব কৃষ্ণতারা-চোখ-চাঁচি টি ভঙ্গি অল্প অল্প মনে আসে, আর মনে আসে সম্পূর্ণ নতুন পরনেব সিন্ধু হাসিটুকু। প্রথমে ললাটে লজ্জা ঘনাইয়া আসে, ললাট হঠাৎ নামে ডাগর চাঁচি চোখে পরে কপোলে... তাবপবই যেন সারা মুখখানি অল্পক্ষণেব জন্য অন্ধকাব হইয়া আসে...ভারী সুন্দর দেখায় সে সমস্ত। তারপরই আসে সেই অপূর্ব হাসিটি, ওরকম হাসি আবার কাবও মুখে অপু কখনও দেখে নাই। কিন্তু মুখের সব আদলটা তো মনে আসে না—চোখ মনে আনিবার জন্য সে ঘাসের উপর শুইয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, অনেকক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেবিল—না কিছুতেই মনে আসে না—কিংবা হয়ত আসে অতি অল্পক্ষণেব জন্য, আবার তখনই অস্পষ্ট হইয়া যায় অর্ণা—কেমন নামটি?...

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি প্রবেশ কলিকাতায় আসিল। বিবাহের পর এই তাহাব সঙ্গে প্রথম দেখা। সে হাসিয়া গল্প বলিল, অপর্ণাব মা বলিয়াছেন—তাহাব কোন্ পুণ্ডে এবকম তরুণ দেবতাব মত রূপবান জামাই পাইয়াছেন জানেন না—তাহাব কেহ কোথাও নাই শুনিয়া চোখের ভল রাখিতে পাবেন নাই।

অপু খুশী হইল, হাসিয়া বলিল—তবুও তো একটা ভাল জামা গায়ে দিতে পাশ্চাম না, সাদা পাশারী গায়ে বিয়ে হ'ল—দূব।...না খেয়ে-দেয়ে একটা সিন্ধেব জামা করালুম, সেটা গেল ছিঁড়ে-ছুটে, তখন তুমি এলে তোমার মাঝার বাড়িতে নিয়ে খেতে, আগে আসতে পাবেনা—আচ্ছা সিন্ধের জামাটাতে আমায় কেমন দেখাতো?

—ওঃ—সাক্ষাৎ স্নাপোলো বেল্‌ভেডিয়াব।...চের চের হামবাগ দেখেছি, কিন্তু তোর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার—বুঝলি?

না—কিন্তু একটা কথা। অপর্ণার মা কি বলেন তাহা জানিতে অপু তত কৌতূহল নাই—অপর্ণা কি বলিয়াছে—অপর্ণা?...অপর্ণা কিছু বলে নাই।...হয়ত কেনারাম মুখুয়ার চেলের সঙ্গে বিবাহ না হওয়াতে মনে মনে হুঃখিত

হইয়াছে—না ?

প্রণবের মামা এ বিবাহে তত সন্তুষ্ট হয় নাই, জ্ঞীর উপরে মনে মনে চটিয়াছেন এবং তাঁর মনে খাবণা—প্রণবই তাহাব মামীমার সঙ্গে যত্নসহ করিয়া নিজের বন্ধুব সঙ্গে বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছে। নাম নাই, বংশ নাই, চালচুলা নাই—চেহাবা লইয়া কি মানুষ ধুইয়া খাইবে...কিন্তু এসব কথা প্রণব অপুকে কিছু বলিল না।

একটা কথা শুনিয়া সে দুঃখিত হইল।—কেনারাম মুখুয্যের ছেলেটি নিজে দেখিয়া যেয়ে পছন্দ কবিস্থাছিল। অপর্ণাকে বিবাহ করিবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল তাহাব—কিন্তু হঠাৎ বিবাহ-সভায় আসিয়া কি যেন গোলমাল হইয়া গেল, সারাবাত্রি কোথা দিয়া কাটিল, সকালবেলা যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দাদা, আমাব বিশ্বে হ'ল না ?

এখনও তাহাব অশ্রু ঘোব কাটে নাই...বাড়ি ফিবিবাব পক্ষেও তাহাব মুখে ওই কথা—এখন নাকি সে বদ্ধ উন্মাদ। যবে তালা দিয়া রাখা হইয়াছে।

অপু বলিল—হাসিস কেন, হ'সবাব কি আছে?...পাগল তো নিজেব ইচ্ছে হয় নি, সে বেচাবির আব দোষ কি ? ও নিজে হাসি ভাল লাগে না।

ব'ত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হয় না—কেবল অপর্ণাব কথা মনে আসে। প্রণব এ কি কবিস্থা দিল তাহাকে ? সে যে বেশ ছিল, এ কোন সোনার শিকল তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন হাতে পায়ে অদৃশ্য নাগপাশের মত দিন দিন জড়াইয়া পড়িতেছে ? লাইব্রেরীতে বসিয়া কেবল আজকাল বাংলা উপন্যাস পড়ে দেখিল, তাহাব মত বিবাহ নভেলে অনেক ঘটয়াছে, অভাব নাই।

পূজার সময় শ্রুতবাবাডি খাওয়া ঘটিল না। একে তো অর্থভাবে সে নিজের ভাল ভাষা-কাপড় কিনিতে পারিল না, শ্রুতবাবাডি হইতে পূজাব তথ্যে যাঁহা পাওয়া গেল, তাহা পবিস্থা সেখানে খাইতে তাহার ভারী বাসবাব ঠেকিল। তাহা ছাড়া অপর্ণাব মা চিঠিব উপর চিঠি দিলে কি হইবে, তাহাব বাবাব দিক হইতে জামাইকে পূজাব সময় লইয়া যাটবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না বরং তাহাব নিকট হইতে উপদেশপূর্ণ পত্র পাওয়া গেল যে, একটা ভাল চাকুরি-বাকুরি যেন সে শাস্ত্র দেখিয়া লয়, এখন অল্প বয়স, এই তো অর্থ উপার্জনের সময়, এখন আলস্য ও বাসনে কাটাইলে এমনি ধরনের নানা কথা। এখানে বলা আবশ্যিক, এ বিবাহে তিনি অপুকে একেবারে ফাঁকি দিয়াছিলেন, কেনারাম মুখুয্যের ছেলেকে খাছা দিবাব কথা ছিল তাহাব সিকিও এ জামাইকে দেন নাই।

ছুটি পাওয়া গেল পুনরায় বৈশাখ মাসে। পূবদিন রাত্রে তাহার কিছুতেই ঘুম আসে না, কি রকম চুল ছাঁটা হইয়াছে, আয়নায় দশবার দেখিল। ওই সাদা পাঞ্জাবিতে তাহাকে ভাল মানায়—না, এই তসরের কোটটাতে ?

অপর্ণাব মা তাহাকে পাইয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলেন। সেদিনটা খুব স্বস্তি, অপু নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ির বাহিরের উঠানে পা দিতেই, কে

পূজার দালানে বসিরাছিল ছুটিয়া গিন্না বাড়ির মশো, খবর দিল। এক মুহূর্তে বাড়ির উপরের নিচের সব জানালা খুলিয়া গেল, বাড়িতে বি-বৌয়ের সংখ্যা নাই, সকলে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—মুঘলদারার বৃষ্টিপাত অগ্রাহ করিয়া অপর্ণার মা উঠানে তাহাকে লইতে ছুটিয়া আসিলেন, সারা বাড়িতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

ফুলশয্যার সেই ঘরে, সেই পালঙ্কেই রাত্রে শুইয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় রহিল।

এক বৎসরে অপর্ণার এ কি পরিবর্তন! তখন ছিল বালিকা—এখন ইহাকে দেখিলে যেন আর চেনা যায় না। লীলার মত চোখ-কলসানো সৌন্দর্য ইহার নাই বটে, কিন্তু অপর্ণার গাছা আছে; তাহা উহাদের কাহারও নাই। অপূর মনে হইল দু-একখানা প্রাচীন পটে আঁকা-তরুণী দেবীমূর্তির, কি দশমহাবিচার ষোড়শী মূর্তির মুখে এ-ধরনের অনুপম, মহিমময় দ্বিধ সৌন্দর্য সে দেখিয়াছে। একটু প্রাচীন ধরনের সৌন্দর্য...সুতরাং দুস্প্রাপ্য। যেন মনে হয় এ খাঁটি বাংলাব জিনিস, এই দূর পল্লীপ্রান্তের নদীতীরের সকল শ্যামলতা সকল সরসতা, পথপ্রান্ত বনফুলের সকল সবলতা ছাড়িয়া ও মুখ গড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার পল্লীর চূত-বকুল-বীড়ি ছায়ায় ছায়ায় কত অপর্ণাকে নদীঘাটের যাওয়া-আসার পথে এই উজ্জলশ্যামবর্ণা, রূপসী তরুণী বৃন্দেব লক্ষ্যের মত আলতা-বাঙা পদচিহ্ন কতবার পড়িয়াছে, মুহিয়াছে, আবার পড়িয়াছে—ইহাদেরই স্নেহ-প্রেমের, হৃৎসুখের কাহিনী, বেহুলা লখিন্দেবের গানে, ফুল্লরার বারোমাসায়, সুবচনীর ব্রতকথায়, বাংলাব বৈষ্ণব-কবিদের রাসিকান-রূপবর্ণণায়, পাডাগাঁয়ের ছড়ায়; উপকথায় সুয়েরানী দুয়েরানীর গল্পে।...

অপূ বলিল—তোমাব সঙ্গে কিম্ব নাড়ি, সারা বছবে একখানা চিঠি দিলে না কেন?—

অপর্ণা সলজ্জ মত একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর একবার ডাগর চোখ চিঠি তুলিয়া সামার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল। খুব মৃদুধরে মুখে হাসি চিপিয়া বলিল—আর আমার বৃদ্ধি রাগ হতে নেই?...

অপূ দেখিল—এতদিন কলিকাতায় সে জারুল কাঠের তরুপোশে শুইয়া অপর্ণার যে মুখ ভাবিত—একেবারেই তাহা নহে—ঠিক এই অনুপম মুখই সে দেখিয়াছিল বটে ফুলশয্যার রাত্রে; এমন ভুলও হয়!

—পূজার সময় আসিনি তাই?—তুমি ভাবতে কি না?—ও-সব মুখের কথা; চাই ভাবতে।—

—না গো না। মা বললেন, তুমি আসবে ষষ্ঠীর দিন, ষষ্ঠী গেল, পূজা গেল, তখনও মা বললেন তুমি একাদশীর পর আসবে—আমি—

অপর্ণা হঠাৎ থামিয়া গেল, অল্প একটু চাহিয়া চোখ নিচু করিল।

অপূ আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি কি, বললে না?

অপর্ণা বলিল—আমি জানি নে, বলব না—

অপু বলিল—আমি জানি আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তুমি মনে মনে—

অপর্ণা য়েহপূর্ণ তিরস্কারের সুরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—আবার ওই কথা ?

—ও-সব কথা বলতে আছে ?—ছিঃ—বলো না—

—তা কৈ, তুমি খুশী হয়েছ, একথা তো তোমার মুখে শুনি নি অপর্ণা—

অপর্ণা হাসিমুখে বলিল—তারপর কতদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে গো শুনি ?—সেই আর-বছর বোশেখ আর এ বোশেখ—

—আচ্ছা বেশ, এখন তো দেখা হ'ল, এখন আমার কথার উত্তর দাও ?

অপর্ণা কি—একটা হঠাৎ মনে পড়িবার ভঙ্গিতে তাহার দিকে চাহিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি নাকি যুদ্ধে য়াচ্ছিলে, পুন্ডা বলছিল, সত্যি ?—

—যাই নি, এবার ভাবছি যাবো—এখান থেকে গিয়েই যাবো—

অপর্ণা ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক্ গো, আর রাগ করতে হবে না, আচ্ছা তোমার কথার কি উত্তর দেব বলো তো ?—ওসব আমি মুখে বলতে পারব না—

—আচ্ছা, যুদ্ধ কাদের মধ্যে বেধেছে, জানো ?

—ইংরেজের সঙ্গে আর জার্মানির সঙ্গে—আমাদের বাড়িতে বাংলা কাগজ আসে। আমি পড়ি যে।

অপর্ণা রূপার ঘিবাতে পান আনিয়াছিল, খুলিয়া বলিল—পান খাবে না ?

বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। এতটুকু গরম নাই, ঠাণ্ডা রাতটির ভিজ্রা মাটির সুগন্ধে বির্-বিরের দক্ষিণ হাওয়া ভরপুর, একটু পরে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল।

অপু বলিল—আচ্ছা অপর্ণা, চাঁপাফুল পাওয়া যায় তো কাউকে কাল বলো না, বিছানায় রেখে দেবে ?—আছে চাঁপাগাছ কোথায় ?

—আমাদের বাগানেই আছে। আমি কাউকে বলতে পারব না কিন্তু—তুমি বলো কাল সকালে ওই নূপেনকে, কি অনাদিকে—কি আমার ভোট বোনকে বলো—

—আচ্ছা কেন বল তো চাঁপাফুলের কথা তুললাম ?—

অপর্ণা সলজ্জ হাসিল। অপূর বুদ্ধিতে দেরি হইল না যে, অপর্ণা তাহার মনের কথা ঠিক ধরিয়াকে। তাহার হাসিবার ভঙ্গিতে অপু একথা বুলিল। বেশ বুদ্ধিমতী তো অপর্ণা

সে বলিল—ইয়া একটা কথা অপর্ণা, তোমাকে এবার কিন্তু নিয়ে যাব দেশে, যাবে তো ?

অপর্ণা বলিল—মাকে বলো, আমার কথায় তো হবে না—

—তুমি রাজী কি না বলো আগে—সেখানে কিন্তু কষ্ট হবে। অপু একবার ভাবিল—সত্য কথাটা খুলিয়াই বলে। কিন্তু সেই পুরাতন গর্ব ও বাহ্যিকের ঝোঁক !—বলিল—অবিশ্রি একদিন আমাদেরও সবই ছিল। দেখানে থাক-

তুমি—আমার পৈতৃক দেশ—এখন তো দোতলা মস্ত বাড়ি—মানে সবই—তবে শরিকানী মামলা আর মানে ম্যালেরিয়ায়—বুঝলে না ? এখন যেখানে থাকি, সেখানে দু'খানা মেটে চালাঘর, তাও মা মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যাই নি, তোমাদের মত ঝি-চাকর নেই, নিজের হাতে সব করতে হবে—তা আগে থেকেই বলে রাখি। তুমি হলে জমিদারের মেয়ে—

অর্ণা কোতুকের সুবে বলিল—খাড়াই তো জমিদারের মেয়ে। হিংসে হচ্ছে বুঝি ? একটু খামিয়া শাস্ত সুবে বলিল—কেন একশ'বার ওকথা বোলো ? ...তুমি কাল মাকে বাবাকে বলে রাজী ক'বাও, আমি তোমার সঙ্গে যেখানে নিয়ে যাবে যাবো, গাছ-তলাতেও যাবো, আমি তোমার সব কথা জানি, পুণ্ডা মায়েব কাছে বলছিল, আমি সব শুনেছি। যেখানে নিয়ে যাবে, নিয়ে চল, তোমার ইচ্ছে আমায় তাতে মতামত কি ?
গায়ে দুজনে কেহ দুমাইল না।

বধূকে লইয়া সে বওনা হইল। প্রথমটা অর্পণি তুলিয়াছিলেন নিয়ে তো যেতে চাচ্ছ বাবাজী, কিন্তু এখন নিয়ে গিয়ে তুলবে কোথায় ? চাকরি-বাকি ৬০ জন ঘর-দোর ওঠাও নিয়ে যাবার এত তাড়াতাড়িটা কি ? সি ডিন ঘরে অর্ণণা মা মামীকে বলিলেন—হ্যাঁগা, তোমার বুদ্ধি সুন্দর লে'পে যে য'চ্ছে দিন দিন—না কি ? জামাইকে ও-সব কথা বলেছ ? আজ-কালকার ছেলেমেয়েদের মন খ'লাদা, তুমি জান না। ছেলেমানুষ জামাই, চাকাকড়ি, চাকিবাকবি ভগবান এখন দেবেন তখন হবে। আজকালের মেয়েটা ও-সব বোঝে না। বিশেষ ক'রে তোমার মেয়ে সে খবরবই নয়, ওব মন খুব ভাল বুঝি। দাও গিয়ে পাঠিয়ে ওকে জামাইয়ের সঙ্গে ওদেব সুখ নিশ্চই দুখ।

উৎসাহে অর্ণণা গায়ে দুম হয় না এমন অবস্থা, ক'ল সাবাদিন অর্ণণাকে লইয়া রেল স্টীমারে কাতানো—উঃ...শুধু সে, আর কেউ না। রাত্রে অল্পক্ষণ খালোকে অর্ণণাকে ভাল করিয়া দেখিবারই সুযোগ হয় না, দিনে দেখা হওয়া এ বাড়িতে অসম্ভব—কিন্তু কাল সকালটি হইতে তাহারা দুজনে—মাবে আর কোন বাধা বাবধান থাকিবে না।

কিন্তু সন্ধ্যারে অর্ণণা বহিল মেয়েদের জামগায়। তিন ঘণ্টা কাল সেভাবে কাটিল। তার পরেই রেল।

এখানেই অর্ণণা সবপ্রথম হুস্থালী পাতিল স্ত্রীর সঙ্গে। ট্রেনের তখনও অনেক দেরি। যাত্রীদের বান্ধা-বাঁধার জন্য স্টেশন হইতে একটু দূরে ভৈরবের ধারে ছোট ছোট খেড়ের ঘর অনেকগুলি—তারই একটা চার আনার ভাড়া পাওয়া গেল। অর্ণণা দোকানে খাবার কিনিতে যাইতেছে দেখিয়া বধু বলিল—তা কেন ? এই তো এখানে উন্ন আচে, যাত্রীরা সব বেঁধে খায়, এখনও তো তিন-চার ঘণ্টা দেরি গাড়ির, আমি রাঁধব।

অপু ভারী খুশী। সে ভারী মজা হইবে! এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মনে আসে নাই। মহা উৎসাহে বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে ইতিমধ্যেই কখন বধু স্নান সারিয়া ভিজা চুলটি পিঠের উপর ফেলিয়া, কপালে সিন্দুরের টিপ্ দিয়া লাল-জরিপাড মচকার শাড়ি পরিয়া বাস্তবসম্মত অবস্থায় এটা-ওটা ঠিক করিতেছে। হাসিমুখে বলিল—বাড়িওয়ালী জিগোস করেছে উনি তোমার ভাই বুঝি? আমি হেসে ফেলতেই বুঝতে পেরেছে, বলেছে—জামাই। তাই তো বলি।—আবও কি বলিতে গিয়া অপর্ণা লজ্জায় কথা শেষ না করিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অপু মুখমন্ডলে বধু বদিকে চাহিয়াছিল। কিশোরীও তত্বেদেহটি বেড়িয়া ফটোনোমুখ যৌবন কি অপূর্ব সুসমায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সুন্দর নিটোল গোর বাহু ছুটি, চুলের খোঁপার ভিত্তি কি অপরূপ। গভীর পাণ্ডে শোবার ঘরে এ পর্যন্ত দেখাশোনা, দিনেব আলোয় স্নানের পরে এ অবস্থায় তাহার স্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই—আজ দেখিয়া মনে হইল অপর্ণা সত্যিই সুন্দরী বটে।

কাঁচা কাঠ কিছুতেই ধরে না, প্রথমে বধু, পরে সে নিজে, ফুঁ দিয়া চোখ লাল করিয়া ফেলিল। প্রোটা বাড়িওয়ালী ইহাদেব জন্য নিজেও ঘরে বাটনা বাটিতে গিয়াছিল। কিনিয়া আসিয়া ছুঁজনেব হৃদশা দেখিয়া বলিল—ওগো মেয়ে, সরো বাছা, জামাইকে যেতো বলো। তোমাদের কি ও কাজ যা? সরো আমি দি ধরিয়ে।

বধু ভাগিদ দিয়া অপুকে স্নানে পাঠাইল। নদী হইতে কিনিয়া সে দেখিল—ইহার মধ্যে কখন বধু বাড়িওয়ালীকে দিয়া বাজার হইতে এসগোল্লা ও ছানা আনাইয়াছে, রেকাবিতে পৈঁপে কাটা, খাবার ও গ্রাসে নেবুর রস মিশানে চিনির শরবৎ। অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, ভারী গিন্নীপনা যে...আচ্ছা তরকারীতে নুন দেওয়ার সময় গিন্নীপনার দৌড়টা একবার দেখা যাবে।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা গো দেখো—পরে ছেলেমানুষের মত ঘাড় ঝলাইয়া বলিল—ঠিক হ'লে কিহু...আমায় কি দেবে?

অপু কোতুকের দুরে বলিল,—ঠিক হলে যা দেব, তা এখুনি পেতে চাও?
—যাও, আচ্ছা ছুঁতো।

একবার সে রক্ষনরত বধু পিছনে আসিয়া চুপি চুপি দাঁড়াইল। দৃষ্টিটা এত নতুন, এত অভিনব ঠেকিতেছিল তাহার কাছে। এই সূচাম, সুন্দরী পরের মেয়েটি তাহার নিতান্ত আপনায় জন—একমাত্র পূজিবীতে আপনার জন। পরে সে সম্ভরণে নিচু হইয়া পিঠের উপরে এলানো চুলের গিঠটা ধরিয়া অত্যন্ত এক টান দিতেই বধু পিছনে চাহিয়া কৃত্রিম কোপের সুরে বলিল—উঃ! আমার লাগে না বুঝি...ভারি ছুঁতো...রাগা পড়ে থাকবে বলে দিচ্ছি যদি আবার চুল ধরে টানবে—

অপু ভাবে, যা ঠিক এই ধরনের কথা বলিত—এই ধরনের স্নেহ-প্রীতি-স্বরা

চোখ। সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রাণুদি, কি লীলা, কি অপর্ণা—
সকলেরই যথো যা যেন অল্পবিস্তর মিলিয়া আছেন—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায়
ইচ্ছা? একই মনের কথা বলে, চোখে-মুখে একই মনের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।
একটি ভদ্ৰলোক অনেকক্ষণ হইতে প্লাটফর্মে পায়চারী করিতেছিলেন।
ট্রেনে উঠিবার কিছু পূর্বে অণু তাহাকে চিনিতে পারিল। দেওয়ানপুরের মাস্টার
সেই সন্তানবাবু। অণু পার্ভক্লাসে পড়িবার সময়ই ইনি আইন পাশ করিয়া
কুলের চাকুরি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনও দেখা হয় নাই।
পরাতন ছাত্রকে দেখিয়া খুশী হইলেন। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, অন্যান্য
ছাত্রদের যথো কে কি করিতেছে শুনিবার আগ্রহ দেখাইলেন।

তিনি আগকাল পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। চালচলন দেখিয়া
অণুর মনে হইল—বেশ চম্পসী উপার্জন করেন। তবুও বলিলেন, পুনানো
দিনই ছিল ভাল, দেওয়ানপুরের কথা মনে হইলে কষ্ট হয়। ট্রেন আসিলে
তিনি সেকেন্ড ক্লাসে উঠিলেন।

অপর্ণাকে সব ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া অণু
একখানা সিটিন গাড়ি ভাড়া করিয়া খানিকটা ঘুরিল।

অণু একটা জিনিস লক্ষ্য করিল। অপর্ণা কখনও কিছু দেখে নাই বটে,
কিন্তু কোনও বিষয়েও কোন আশোভন বাগতা দেখায় না। দীর্ঘ স্থির, সংযত,
বুদ্ভিমতা—এই বয়সেই চবিত্রগত একটা কেমন সহজ গাভ্রীয়—যাহার পরিণতি
সে দেখিয়াছে ইহানই মায়ের মধ্যে। উচ্চলিয়া-৭৬১ মাতৃহের সঙ্গে চরিত্রের সে
কিছু ঘটিল তা।

মনদাপোতা দৌটিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অণু বাড়িঘরের বিশেষ কিছু
ঠিক করে নাই, কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই, কিছু না—অথচ হঠাৎ স্ত্রীকে
আনিয়া হাঙ্গির কদিয়াছে। বিবাহের পর মাত্র একবার ‘খানে দু’দনের জন্য
আসিয়াছিল, বাড়িঘর অপরিষ্কার, রাত্রিবেসের অশুভ্রুত, উঠানে ঢুকিয়া
পেয়ায়া গাছটার তলায় সন্ধ্যাব অন্ধকারে বধু দাঁড়াইয়া রহিল, অণু গরুর গাড়ি
হইতে তোরঙ্গ ও কাঠের হাতবাগ্গটা নামাইতে গেল। উঠানের পাশের ডাঙলে
নানা পতঙ্গ কুস্বব করিয়া ডাকিতেছে, ঝোপে-ঝোপে জোনাকির ঝাঁক
অলিতেছে।

কেহ কোথাও নাই, কেহ তরুণ দম্পতিকে সাদবে বরণ ও অভ্যর্থনা করিয়া
ঘবে তুলিয়া লইতে চুটিয়া আসিল না, তাহাবাই দুজনে টানাটানি করিয়া
নিজেদেব পেটরা-তোরঙ্গ মাত্র দেশলাইয়ের কাঠির আলোর সাহায্যে ঘরের
দাওয়ায় তুলিতে লাগিল। সে আজ কাহাকেও ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই,
ভাবিয়াছিল—মা যখন বরণ কবে নিতে পারলেন না আমার বৌকে, কত সাধ,
ছিল যার—তখন আর কাউকে বরণ করতে হবে না, ও অধিকার আর কাউকে
বুঝি দেব?

অপর্ণা জাকিত তাহার স্বামী দরিদ্র—কিন্তু এরকম দরিদ্র তাহা সে ভাবে

বাই। তাহাদের পাড়ার বাপিভ-বাড়ির মত নিচু, ছোট চালাঘর। দাওয়ার একধারে গরু বাছুর উঠিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে...ছাঁচতলায় কাঁই-বীচি ফুটিয়া বর্ষাব জলে চারা বাহির হইয়াছে...একস্থানে খড় উড়িয়া চালের বাথারি ঝুলিয়া পড়িয়াছে...বাড়ির চাৰিধারে কি পোকা একত্রে ডাকিতেছে...এ-রকম ঘবে তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে...অপর্ণাব মন দমিয়া গেল। কি করিয়া থাকিবে সে এখানে? যাবের কথা মনে হইল...খুড়ীমাদের কথা মনে হইল...ছোট ভাই বিনুব কথা মনে হইল...কান্না ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল...সে মিয়া যাইবে এখানে থাকিলে...

অপু খুঁজিয়া পাতিয়া একটা লঠন আলিল। ঘবের মাটির মেঝেতে পোকায় খুঁজিয়া মাটি জড় করিয়াছে। তক্তপোশের একটা পাশ ঝাড়িয়া তাহাব উপর অপর্ণাকে বসাইল...সবে অপর্ণাকে অন্ধকার ঘবে বসাইয়া লঠনটা হাতে বাহিরে হাতবাক্সটা আনিতে গেল...অপর্ণাব গা ছম ছম করিয়া উঠিল অন্ধকারে...পরক্ষণেই অপু নিজের ভুল বুঝিয়া আলো হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—ভাখো কাণ্ড, তোমাকে একা অন্ধকারে বসিয়ে রেখে—পাক্ লঠনটা এখানে—অপর্ণাব কান্না আসিতেছিল।

আথঘন্টা হবে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঘরটা একবকম রাত্রি কাটানোর মত দাঁড়াইল। কি খাওয়া যায় রাত্রে? —রান্নাঘর ব্যবহারের উপযোগী নাই তো বটেই, তা ছাড়া চাল, ডাল, কাঠ কিছুই নাই। অপর্ণা তোবড় পুলিয়া একটা পুঁটলি বার কবিতা বলিল—ভুলে গিয়েছিলাম তখন, মা ন'ড দিমোছিলেন এত বেঁধে—অনেক আছে—এই খাও।

অপু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। সংসার কখনও কবে নাই—এট নতুন—নিতান্ত আনাড়ী—অপর্ণাকে এ অবস্থায় এখানে আনা ভাল হয় নাই, সে এত-ক্ষণে বুঝিয়াছে। অপ্রতিভের সুখে বলিল—বাণাঘাট থেকে কিছু খাবার নিলেই হ'ত—তোমাকে একলা বসিয়ে রেখে যাই কি ক'বে—নৈলে ক্ষেত্র কাপালীর বাড়ী থেকে চিঁড়ে আর ডুধ—খাব?...

অপর্ণা ঘাড় নাড়িয়া বারণ করিল।

তেলিদের বাড়িতে কেউ ছিল না তিন-চারি মাস হইতে তাহারা কলিকাতায় আছে, বাড়ি ভালাবন্ধ, নতুন কাল রাত্রে ইহাদের কথাবাতা শুনিয়া সে-বাড়ির লোক আসিত। সকালে সংবাদ পাঠিয়া ও-পাড়া হইতে নিরুপমা, চুটিয়া আসিল। অপু কোতুকের সুখে বলিল—এসো, এসো নিরুদিদি এখন মা নেই, তোমরা কোথায় বরণ ক'রে ঘরেই তুলবে, তুমি-আলতায় পাগরে দাঁড় করাবে, তা না তুমি সকালে পান চিবুতে চিবুতে এলে। বেশ খা হোক।

নিরুপমা অশ্রুযোগ করিয়া করিয়া বলিল—তুমি ভাই সেই চোদ্দ বছরে যেমন পাগলটি ছিলে, এখনও ঠিক সেই আছে। বৌ নিয়ে আসছো তা একটা খবর না, কিছু না। কি ক'রে জানব তুমি এ অবস্থায় একজন ভদ্রলোকের

যেয়েকে এই ভাঙা-ঘরে ভপ ক'রে এনে ডুলবে ? ছি ছি, তাখ ভো কান্ত-
খানা ? রাত্রে যে রইলে কি ক'রে এখানে সে, কেবল ভুমিট পার ।

নিরুপমা গিনি দিয়া বৌ-এর মুখ দেখিল ।

অপু বলিল—তোমাদের ভরসাভেই কিম্বা ওকে এখানে রেখে যাব নিরুদি ।
আমাকে সোমবাবে চাকরিতে যেতেই হবে । নিরুপমা বৌ দেখিয়া খ, ব খ, না
বলিল—আমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেব বৌকে, এখানে থাকতে
দেব না । অপু, বলিল—তা হবে না, আমার মায়ের ভিটেতে সঙ্কো দেবে কে
তাহলে ? রাত্রে তোমাদের ওখানে শোবার জন্যে নিয়ে যেও । নিরুপমা তাতেই
বাজী । চৌদ্দ বছরের ছেলে এখন প্রথম চেলী প্রিয়া তাহাদের বাড়ি পূজা
করিতে যাচ্ছিল, এখন হইতে সে অপুকে সত্য সত্য স্নেহ করে তাহার দিকে
চান্নে । অপু, ঘরবাড়ি চাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় সে মনে মনে খুব উঃখিত
হইয়াছিল । মেয়েটা গতিকে বোঝে না, বাহিবকে বিশ্বাস করে না, মানুষের
উদ্দাম হৃদিবৎ বহিনুবী আকাজ্জকে শাস্ত সংযত করিয়া তাহাকে গৃহস্থালী
পাঠাইয়া, বাসা বাঁটাইবার প্ররুতি নানামনের সহজাত ধর্ম, তাহাদের সকল
মানুষ, সেই প্রেমের প্রয়োগ-নৈপুণ্য এখানে । সে শক্তিও এত বিশাল যে
পবন কম, তাহাব বিকল্পে দাঁড়াইয়া জম্মী হইবার আশা করিতে পারে ।

অপু বড় ফিফিয়া নীড় বাদাতে নিরুপমা দ্বন্দ্বিত্ব নিঃশাস ফেলিল ।

কালক'রায় ফিফিয়া অপু, আব কিছু ভাল লাগে না কেবল শনিবাবের
অপেক্ষায় দিন গতি, ও একে । বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাহাবা নব-বিবাহিত
তাহাদের সঙ্গে কেবল বিবাহিত জীবনের গল্প করিতে ও শুনিতে ভাল লাগে ।
কিন্তু একদিন এক সপ্তাহ কাটাইয়া শনিবাব দিন সে বাড়ি গেল । অপূর্ণার
ফিফিয়া নয় সে মনে মনে আশ্চর্য না হইয়া পাবিল না । এই সাত-আট দিনের
মধ্যেই অপূর্ণা বাড়ির চোখা একেবাবে বদলাইয়া ফেলিয়াছে । তেলি-বাড়ির
একটা ফিকে দিয়া নিজেও ওড়াবখানে ঘবের দেওয়াল লেপিয়া ঠিক কবাইয়াছে ।
দাওয়ায় মাটি পুসিয়া দিয়াছে বাড়া এলম'টি আনিয়া চারিদিকের রঙ
ক'রাইয়াছে, নিজেও হাতে এখানে তাক, ওখানে কুলুঙ্গি গাঁথিয়াছে, তক্ত-
নে শের ওলাকাব বাশীক'ত ইঁটুবেব মাটি নিজেই উঠাইয়া বাহিরে ফেলিয়া
গোবর-মাটি লেপিয়া দিয়াছে । সাড়া বাড়ি খেন ঝক্ ঝক্ তক্-তক্ করিতেছে ।
অপু অপূর্ণা জীবনে এই প্রথম মাটির ঘবের পা দিল । পূর্ব গৌরব যতই ক্ষুণ্ণ,
হটক, ওড় সে পুনঃপুনঃ মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরে লালিত, বাড়ি থাকিতে
নিজেও হাতে তাহাকে কখনও বিশেষ কিছু করিতে হইত না ।

মাসখানেক ধরিয়া প্রতি শনিবাবে বাড়ি খাতায়্যাত কবিবাব পর অপু দেখিল
তাহাব যাহা অয় ফি শনিবারে বাড়ি যাওয়ার খরচ তাহাতে কুলান্ন না ।
সংসাধে দশ বাবো টাকার বেশী মাসে এ পর্যন্ত দিতে পারে নাই । সে বোঝে
—ইহাতে সংসাধ চালাইতে অপূর্ণাকে দস্তবমতো বেগ পাইতে হয় । অভাব
ঘন ঘন বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিল ।

ডাকপিয়নের খাকির পোশাক যে বৃক্কের মধ্যে হঠাৎ একপ চেউ তুলিতে পারে।
বাগ্র আশার আশ্বাস দিয়াই পরমুহুর্তে নিরাশা ও দুঃখের অতলতলে নিমজ্জিত
করিয়া দিতে পারে, পনেরো টাকা বেতনের আমহাস্ট ফিট পোস্টাফিসের
পিওন যে একদিন তাহার দুঃখ সুখের বিধাতা হইবে, এ কথা কবে ভাবিয়া-
ছিল। পূবে কালে-ভদ্রে মায়ের চিঠি আসিত, তাহার জন্য একপ বাগ্র
প্রতীক্ষাব প্রয়োজন ছিল না। পবে মায়ের মৃত্যুর পর বৎসরখানেক তাহাকে
একখানি পত্রও কেহ দেয় নাই! উঃ, কি দিনই গিয়াছে সেহ এক বৎসর।
মনে আছে, তখন বোজ সকালে চিঠির বাস্ক রূখা আশায় একবার কবিয়া
খোঁজ করিয়া হাসিমুখে পাশের ঘরের বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্ববে বলিত
—আবে, বীরেন বোসের জন্যে তো এ বাসায় আর থাকা চলে না দেখছি?—
রোজ বোজ যত চিঠি আসে তাব অধেক বীরেন বোসের নামে।

বন্ধু হাসিয়া বলিত—ওহে পাঁচজন থাকলেই চিঠিপত্র আসে পাঁচদিক থেকে।
তোমার নেই কোনও চুলোয় কেউ, দেবে কে চিঠি?

বোধ হয় কথাটা রূচ সত্য বলিয়াই অপূর্ব মনে আঘাত লাগিত কথাতায়।
বীরেন বোসের নানা ছাঁদের চিঠিগুলি লোপুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত
—সাদা খাম, সবুজ খাম, হলদে খাম, মেয়েলি হাতেব লেখা পোস্টকার্ড, এক
একবার হাতে তুলিয়া লোভ দমন করিতে না পারিয়া দেখিয়াও—হৃতি
তোমার দিদি, ইতি তোমার মা, আপনাব স্নেহের ছোট বোন সুশী, ইত্যাদি।
বীরেন বোস মিথ্যা বলে নাই, চাপিদিকে আশ্রয় বন্ধু থাকিলেই বোজ পত্র
আসে—তাহার চিঠি তো আর আকাশ হইতে পড়িবে না? আজকাল আর
সে দিন নাই। পত্র লিখিবার লোক হইয়াছে এতদিনে।

জন্মান্তরীণ ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা, কিন্তু দিনগুলো মাসের মত দীর্ঘ।

অবশেষে জন্মান্তরীণ ছুটি আসিয়া গেল। এডিটারকে বলিয়া বেলা তিনটাব
সময় আফিস হইতে বাহির হইয়া সে টেশনে আসিল। পথে নব-বিবাহিত
বন্ধু অনাধবাবু বৈঠকখানা বাজাব হইতে আম কিনিয়া উল্লস্বাসে হাম দ্বিতে
ছুটিতেছেন। অপূর্ব কথার উত্তরে বলিলেন সময় নেহ, তিনটে পনেরো
ফেল করলে আবার সেই চাবটে পঁচিশ, দুঃখটা দেবী হয়ে যাবে বাড়ি
পৌঁছিতে—আচ্ছা আসি, নমস্কার।

বাড়িটা ঠিক কামানো হইয়াছে তো?

মুখ রোদ্রে, ধূলান ও ঘামে যে বিবর্ণ হইয়া যাইবে তাহার কি? কী গাধাবোট-
গাড়িখানা, এতক্ষণে মোটে নৈহাটি? বাড়ি পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইতে
পারে। খুশির সহিত ভাবিল, চিঠি লিখে তো যাচ্ছি নে, হঠাৎ দেখে অপণা
একেবারে অবাক হয়ে যাবে এখন—

বাড়ি যখন পৌঁছিল, তখনও সন্ধ্যার কিছু দেরি। বধু বাড়ি নাই, বোধ
হয় নিকরপাদের বাড়ি কি পুকুরের ঘাটে গিয়াছে। কেহ কোথাও নাই। অপূর্ব

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পুঁটলি নামাইয়া রাখিয়া সাবানখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া
আগে হাত মুখ ও মাথা ধুইয়া ফেলিয়া স্নাতকের আয়না ও চিরুণীর সাহায্যে
চোখী কাটিল। পরে নিজের আগমনের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া বাড়ি হইতে
বাহির হইয়া গেল।

আশঘলটা পরেই সে ফিরিল। বধু ঘরের মধ্যে প্রদীপের সামনে মাহুর পাতিয়া
বসিয়া 'ক বই পড়িতেছে। অপু পা টি-সিয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।
এটা অপূর পুরানো রোগ; মায়ের সঙ্গে কতবার একরকম করিয়াছে। হঠাৎ
কি একটা শব্দে বধু পিছন ফিরাইয়া চাহিয়া ভয়ে দড়মড় করিয়া উঠিবার চেষ্টা
করিতে অপু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বধু অপ্রতিভের সুরে বলিল—ওমা তুমি। কখন—কে—তোমার তো—
অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন জুড়। আচ্ছা তো ভীতু।

বধু ততক্ষণে সামলাইয়া হাসি মুখে বলিল—বা বে, ওই বকম করে বুঝি
আচমকা ভয় দেখাতে আছে? কটার গাভিতে এলে এখন—তাই বুঝি আজ
ছ-সাত দিন চিঠি দেওয়া হয় নি—আমি ভাবছি—

অপু বলিল তারপর, তুমি কি রকম আছ। বল? মায়ের চিঠিপত্র
পেয়েছ?

—তুমি কি স্থরোগা হয়ে গিয়েছ, অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বুঝি?

—আমার এবাবকণ চিঠির কাগজটা কেমন? ভালো না? তোমার ভুলে
এনেছি পাঁচশখানা। তাবপর রাতে কি খাওয়াবে বল?

—কি খাবে বলো? ঘি এনেছি, আলুপটলেব ডালনা করি—আব তুপ
আছে—

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু দেখিয়া অশ্রু হইল, বাড়ির পিছনের উঠানে
অপর্ণা ছোট ছোট বেড়া দিয়া শাকের ক্ষেত, বেগুনব ক্ষেত করিয়াছে। দাও-
স্নাব মাঝে মাঝে গাঁদাব চাবা বসাইয়াছে। বান্নাঘরের চালায় পুঁইলতা,
লাউলতা উঠাইয়া দিয়াছে। দেখাইয়া বলিল,—আজ পুঁইশাক খাওয়াব
আমাব গাছেব। ওই দোপাটিগুলো ছাখো? কত বড়, না? নিকুপনা
দিদি বীজ দিয়েছেন। আর একটা জিনিস ছাখো নি? এসো দেখাব—
অপূব সাবা গবীরে একটা আনন্দেব শিহরণ বহিল। অপর্ণা যেন তাহাব
মনেব গোপন কথাটি জানিয়া বুঝিয়াই কোথা হইতে একটা ছোট চাঁপা
গাছের ডাল আনিয়া মাটিতে পুঁতিয়াছে, দেখাইয়া বলিল—ছাখো কেমন—
হবে না এখানে?

—হবে না আব কেন? আচ্ছা, এত ফুল থাকতে চাঁপা ফুলের ডাল যে
পুঁতে গেলে?

অপর্ণা স্লজ্জমুখে বলিল—জানি নে—যাও।

অপু তো লেখে নাই, পত্রে তো একথা অপর্ণাকে জানাব নাই যে, মিত্তির
বাড়ির কম্পাউণ্ডের চাঁপাফুল গাছটা তাহাকে কি কষ্টই না দিয়াছে, এই

হুঁশাস। চাঁপা ফুল যে হঠাৎ তাহার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, একথাটি মনে মনে অনুমান করিবার জন্য এই কর্মবাস্তু, সদা-হাসিমুখ মেয়েটির উপর তাহার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

অপর্ণা বলিল—এখানে একটু বেড়া দিলে যিরে দেবে? মাগো, কি ছাগলের উৎপাতই তোমাদেব দেশে। চাবাগাছ থাকতে দেয় না, বোঙ খেয়েদেয়ে সারা দুপুর কঞ্চি হাতে দাওয়ায় বসে ছাগল তাড়াই আব বই পড়ি—দুপুরে বোজ নিকুদি আসেন, ও-বাড়ির মেয়েরা আসে, ভারী ভাল মেয়ে কিন্তু নিকুদিদি।

আজ সাবাদিন ছিল বধা। সন্ধ্যাব পর একটানা রুটি নামিয়াছে, হয়ত বা সারাদিন রাত্রি খবিয়া বধা চলিবে। বাহিরে কুম্ভাক্ষমীর অন্ধকাবে মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। বধু বলিল—রান্নাঘরে এসে বসবে? গবম গরম সেকৈ দি—। অপূ বলিল—তা হবে না, আজ এসো আমার দু'জনে এক পাতে খাও। অপর্ণা প্রথমটা রাজী হইল না, অবশেষে স্বামীর দীড়ানুভিতে বাধ্য হইয়া একটা থালায় রুটি পাড়িয়া খাবার ঠাই করিল।

অপূ দেখিয়া বলিল,—ও হবে না? তুমি আমার পাশে বসো, ও-একম বসলে চলবে না। আবও একটু—আবও—পবে সে বাঁ-হাতে অপর্ণার গলা ধরাইয়া খবিয়া বলিল—এবার এসো দু'জনে খাই—

বধু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তোমার বদখেয়ালও মাথায় আসে, মাগো মা। দেখতে তো খুব ভালমানুষটি।

লাভের মধ্যে বধুর একরূপ পাওয়াই হইল না সেবাত্রে। অন্যমনস্ক অপূ গল্প কবিতা কবিতা খালাস কাট উঠাইতে উঠাইতে প্রায় শেষ কবিতা ফেলিল—পাছে স্বামীর কম পড়িয়া যায় এই ভয়ে সে বেচাবী খান-তানব বেশী নিভের জন্য লইতে পারিল না। খাওয়া-পাওয়ার পর অপর্ণা বলিল—কই, কি এনেছ বললে, দেখি?

দু'জনেই কৌতুকপ্রিয় সমবয়সী সুস্থমন, বালকবালিকাব মত প্রামোদ কবিতা গল্প কবিতা, সাবাত্ত জাগিতে, অকারণে অর্থহীন বকিতে দু'জনেবই সমান আগ্রহ, সমান উৎসাহ। অপ, একখানা নতুন-আনা বই খুলিয়া বলিল—পড়ো তো! এই পট্টা?

অপর্ণা প্রদীপের সল্‌তেটা চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়া উদ্ধাইয়া দিয়া পিলসুজটা আরও নিকটে টানিয়া আনিла। পরে সে লজ্জা করিতেছে দেখিয়া অপূ উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—পড়ো না, কই দেখি?

অপর্ণা যে কবিতা এত সুন্দর পড়িতে পারে অপূর তাহা জানা ছিল না। সে দ্বিধা লক্ষ্যভিত্তি মরে পড়িতেছিল—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা—

অপূ পড়ার প্রসংশা করিতেই অপর্ণা বই মুড়িয়া বন্ধ করিল। স্বামীর

দিকে উজ্জলমুখে চাহিয়া কৌতূকের ভলিতে বলিল—থাকগে পড়া, একটা গান করো না।

অপু বলিল, একটা টিপ পরো না খুকী। ভারী সুন্দর মানাবে তোমার কপালে—

অপর্ণা সলজ্জ হাসিয়া বলিল—যাও—

—সত্যি বলছি অপর্ণা, আছে টিপ ?—

—আমার বয়সে বুঝি টিপ পরে ? আমার ছোট বোন শান্তির এখন টিপ পরবার বয়স তো—

কিন্তু শেষে তাহাকে টিপ পরিতেই হইল। সত্যি ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল, প্রতিমার চোখের মত টানা, আরত সুন্দর চোখ-দুটির উপর দীর্ঘ, ঘনকালো, ভোড়াভুকব মাঝখানটিতে টিপ মানাইয়াছে কি সুন্দর। অপু যেনে হইল—এই মুখের জন্যই ভগতের টিপ সৃষ্টি হইয়াছে—প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় এই টিপ-পরা মুখখানি বার-বার সহস্র চোখ চাহিয়া দেখিবার জন্যই।

অপর্ণা যেনে চাই দেখাচ্ছে, এ বয়েসে কি টিপ মানায় ? বি—করি পেরে চলে, বললে তো আর কথা শুনবে না তুমি। ভারী দুটু—এত জ্বালাতনও তুমি করতে পার।

অপু বলিল—আচ্ছা, আমার দেখতে কেমন দেখায় বলো না সত্যি—কেমন মুখ আমার ? ভাল, না পেরঁচার মত ?

অপর্ণার মুখ কৌতুকে উজ্জল দেখাইল নাক সিঁটকাইয়া বলিল—বিশ্রী, পেরঁচার মত।

অপু কৃত্রিম অভিমানের সুবে বলিল আব তোমার মুখ তো ভাল, তা হলেই হয়ে গেল। যাই, শুইগে যাই—রাত কম হয় নি—কাল ভোরে আবার—

বধু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই বাত্রিটা গভীর দাগ দিয়া গিয়াছিল অপু যেনে। মাটির ঘরের অনাচে কানাচে, গাছপালায় বাঁশবনে, ঝিম্-ঝিম নিশীথের একটানা বর্ষাব ধারা। চাষিগারই নিশ্চক। পূর্বদিকেব জানালা দিয়া বর্ষার জল বাদল বাতের দমক হাওয়া মাঝে মাঝে আসে—মাটিব প্রদীপেব আলোতে, ঝড়েব ঘরের মেজেতে মাড়ব বিছাইয়া সে শু অপর্ণা।

অপু বলিল—ছাখো আজ রাতে মায়েব কথা মনে হয়—মা যদি আজ থাকতেন ?

অপর্ণা শান্ত সুরে বলিল—মা সবই জানেন,—যেখানে গিয়েছেন, সেখান থেকেই সবই দেখছেন। পবে সে কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ছাখো, আমি মাকে দেখেছি।

অপু বিষ্ময়ের দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। অপর্ণার মুখে শান্ত, স্থির

বিব্রাহস ও সরল পৰিভ্রতা ছাড়া আর কিছু নাই।

অপর্ণা বলিল—শোন, একদিন কি আসটায়, তোমার সেদিন চিঠি এল
হুপ্পুর বেলা। বিকেলে আচল পেতে পানচালার পিঁড়িতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি
—সেদিন সকালে উঠোনের ঐ লাউগাছটাকে পড়েছি, কঞ্চি কেটে তাকে
উঠিয়েছি, যেতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, বুঝলে? স্বপ্নে দেখছি—এক-
জন কে দেখতে বেশ সুন্দর, লালপেড়ে শাড়ি-পরা, কপালে সিঁদুর, তোমার
মুখের মত আদল, আমার আদর করে মাথার চুলে হাত বুলািয়ে বললেন—ও
আবাগীব মেয়ে, অবেলায় শুয়ো না, ওঠো, অসুক-বিসুক হবে আবার।
তারপর তিনি তাঁর হাতেব সিঁদুরেব কৌটো থেকে আমার কপালে সিঁদুর
পরিয়ে দিতেই আমি চমকে ভেগে উঠলাম—এমন স্পষ্ট আর সত্যি বলে মনে
হ'ল যে, তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম সিঁদুর লেগে আছে
কি না—দেখি কিছুই না—বুক ধড়াস করে উঠল—চাবিদিকে অথাক হয়ে
চেয়ে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে—বাড়িতে কেউ নেই—খানিকক্ষণ না পাবি
কিছু কবতে—হাত পা যেন অবশ—তাবপব মনে হল, এ মা—আব কেউ না,
ঠিক মা। মা এসেছিলেন এয়োতির সিঁদুর পরিয়ে দিতে। কাউকে বলি নি,
আজ বললাম তোমায়।

বাহিরের বসাদারাব অবিশ্রান্ত বিনয়িন শব্দ একটা কি পতঙ্গ গতিব শব্দেব
সঙ্গে তাল বাজিয়া একটানা ঢাকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে পূবে হাঙ্গর
ছমকা, অপর্ণাব মাথাব চুলেব গন্ধ। জীবনেব এই সব মুহূর্ত বড় অদ্ভুত।
অনভিজ্ঞ হইলেও অল্প তাহা বুঝিল। হঠাৎ ক্ষণিক বিদ্রোহ-চমকে যেন অন্ধকার
পথের অনেকখানি নড়রে পড়ে। এমন সব চিন্তা মনে আসে, মাথাগ অবস্থায়,
সুস্থ মনে সারাজীবনেও সে-সব চিন্তা মনে আসিত না।...কেমন একটা বহু
...আম্মার অদ্ভুতলি... একটা বিবর্ত অসীমতা...

কিছু পরক্ষণেই সোখ ভলে ভসিয়া আসিল। সে কোনও কথা বলিল না।
কোন যন্তব্য প্রকাশ করিল না, কেহই কোন কথা বলিল না।

খানিকটা পরে সে বলিল, আর একটা কবিতা পড়ে—শুনি বরং—

অপর্ণা বলিল—তুমি একটা গান করো—

অপূরবিঠাকুবেব গান গাহিল একটা, দুইটা, তিনটা। তারপর আবার কথা
আবার গল্প। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আর রাত নেই কিছু—ফসাঁ হয়ে এল—
—ঘুম পাচ্ছে?

—না। তুমি একটা কাজ করো না? কাল আর দেখ না—

—আফিস কামাই করব? তা কি কখনো চলে?

ভোর হইয়া গেল। অপর্ণা উঠিতে যাইতেছিল, অপূর কোন সময় ইতিমধ্যে
তাহার আচলের সঙ্গে নিজের কাপড়ের সঙ্গে গিঁট বাঁধিয়া রাখিয়াছে, উঠিতে
দ্রিষ্টা চান পড়িল। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ওমা তুমি কি। আচ্ছা হুটু তো—
এখনি হারানের যা কাজ করতে আসবে—বুড়ী কি ভাবে বল দিকি? ভাবেবে,

এত বেলা অবধি ঘরের মধ্যে—মাগো মা, লজ্জা করে—ছিঃ ।

অপু ততক্ষণে অন্যদিকে সুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে ।

—ছাডো, ছাডো, লক্ষ্মী—ছিঃ—এখনি এল বলে বুড়ী, পায়ে পড়ি তোমার ছাডো—

অপু নির্বিকার ।

এমন সময়ে বাহিরে হারাণের মাসের গলা শোনা গেল । অপর্যায় বাস্তবাবে মিনতির সুরে বলিল—এই এসেছে বুড়া—ছাডো ছিঃ—লক্ষ্মীটি—ওরকম দুর্ঘটনা করে না—লক্ষ্মী—

হারাণের মা কপাটের গায়ে দাকা দিয়া বলিল—ও বৌমা, ভোর হয়ে গিয়েছে । ওঠা, ওঠা, ঘড়া ঘটিগুলো বাব করে দেবে না ?

অপু হাসিয়া উঠিয়া আচলেব গিঁট খুলিয়া দিল ।

আবস কামাহ কারমা সে-দিনটা অপু বাড়িতেই রহিয়া গেল ।

অপরাজিত

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে স্নাত্ত প্রদর্শনী উপলক্ষে গুব ভিড । অপু অনেক দিন হইতে ইনস্টিটিউটেব সভা, তাহাদেব জনকস্বের উপর শিল্পমঙ্গল ও খাচা বিভাগেব তত্ত্বাবধানের শাব আছে । দুপুং হইতে সে এই কাজে লাগিয়া আছে । মন্যব বি-এ পাশ কবিয়া এটনিব খাটকুন্ড ক্লাক হইয়াছে । তাহার সহিত একদিন ইনস্টিটিউটেব বসিবাব ঘবে ঘোব তক । অপু দুট বিশ্বাস—যুদ্ধের পর ভাবতবন স্বাধীনতা পাইবে । বিলাতে লয়েড জু বসিয়াছেন, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে আমবা আব পদানত কবিয়া বাধিব না । ভারতকে দিয়া আর কীতদাসেব কার্য কবাইয়া লইলে চলিবে না । Indians must not remain as hewers of wood and drawers of water.

এই সময়েই একদিন ইনস্টিটিউটেব লাব্রেব্রিতে কাগজ খুলিয়া একটা সংবাদ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল । জোয়ান অব্ আর্কে রোমান্ কাথলিক যাজক-শক্তি তাহাদের ধর্মসম্প্রদায়েব সাধুর তালিকাভুক্ত কসিয়াছেন ।

তার শেষেবর আনন্দ-মুহুর্তের সঙ্গিনী সেই পল্লীবালাকা জোয়ান—ইছামতীর পারে শান্ত বাবলা-বনের ছায়ায় বসিয়া শৈশবেব সে হৃৎকলিত দিনগুলিতে যাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় । ইছামতীর পর সে একদিন সিনেমাতে জোয়ান অব্ আর্কের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব দেখিল । ডুমুরের নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ফ্রান্সের সকল প্রদেশ হইতে লোকজন জড়ো হইয়াছে—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে কত নরনারী আসিয়াছে...সামরিক পোশাকে সজ্জিত ফরাসী সৈনিক কর্মচারীর দল...সবসুস্থ মিলিয়া একমাইল দীর্ঘ বিরাট শোভাযাত্রা...জোয়ানের সঙ্গে তার নাতীর কি যেন খোঁগ—জোয়ানের সম্মানে তার নিজের বুক ঘেন গর্বে

ফুলিয়া উঠিতেছিল শৈশবের স্বপ্নের সে-মোহ অপু এখনও কাটাটয়া উঠিতে পারে নাই।

বড় হইয়া অবশি সে এই মেন্সেটিকে কি শ্রদ্ধার চোখে ভক্তির চোখে দেখিয়া আসিয়াছে এতদিন, সে কথা জানিত এক অনিল—নতুবা কল্পনা যাহাদের পঙ্কু মন মিনমিনে, পান্সে—তাহাদের কাছে সে-কথা তুলিয়া লাভ কি ? কলেজে পড়িবার সময় সে বড় ইতিহাসে, জ্ঞানানের বিস্তৃত বিবরণ পড়িয়াছে

—অতীত শতাব্দীর সেই অবুঝ নিষ্ঠুরতা, ধর্মমতের গোঁড়ামি, খুঁটিতে বান্ধিয়া হৃদয়হীন দাহন—সূর্যদেবের রথচক্রেব দ্রুত আবর্তনে অসীম আকাশে যেমন দুপুর হয় বৈকাল, বৈকাল হয় রাত্রি, রাত্রি হয় প্রভাত—মহাকালের রথচক্রেব আবর্তনে এক শতাব্দীর অন্ধকারপঙ্ক্ত তেমনি পবের শতাব্দীতে দ্বীবীভূত হইয়া যাইতেছে। সত্যের শুকতারা একদিন যে প্রকাশ হইবেই, জীবনের দুঃখদৈন্যের অন্ধকার শুধু যে প্রভাতেরই অগ্রদূত—কাল-কাকলিময়, ফুল-ফোটা অমৃত-ঝরা প্রভাত।

অন্যমনস্ক মনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে বাজ-বিভাগের ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে, কে তাহাকে ডাকিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া প্রথমটা চিনিতে পারিল না—পবে বিশ্বম্বেব দুরে বলিল—প্রীতি, না ? এগ্ি বিশন দেখে এ এসেছিলে বুঝি ? ভাল আছ ?

প্রীতি অনেক বড় হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিল, বিবাহ হইয়াছে। সে সঙ্গিনী একটি প্রৌঢ়া মহিলাকে ডাকিয়া বলিল—মা, আমার মাস্টার মশায় অপূর্বাবু—সেই অপূর্বাবু।

অপু প্রশ্ন করিল। প্রীতি বলিল—আচ্ছা আপনার বাগ তো ? এক কথায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, দেখুন। কত ছোট ছিনুম, বুঝতুম কি কিছু ? তারপর আপনাকে কত খোঁজ করেছিলুম, আর কোনও সন্ধানই কেউ বলতে পারলে না। আপনি আজকাল কি করছেন মাস্টার মশায় ?

—ছেলেও পড়াই, রাত্রে খবরের কাগজেব আফিসে চাকরিও করি—

—আচ্ছা মাস্টার মশাই, আপনাকে যদি বলি, আমাদের বাড়ি আপনি আর যাবেন না ?

অপুর মনে পূর্বতন ছাত্রীর উপর কেমন একটা স্নেহ আসিল। কথা শুচাইয়া বলিতে জানিত না, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল সে সময়...তাহারও অত সহজে রাগ করা ঠিক হয় নাই। সে বলিল—তুমি অত অপ্রতিভ ভাবে কথা বলছ কেন প্রীতি। দোষ আমারই, তুমিই হয় ছেলেমানুষ ছিলে, আমার রাগ করা উচিত হয় নি—

ঠিকানা বিনিময়ের পর প্রীতি পায়ের ধূলা লইয়া প্রশ্ন করিয়া বিদায় লইল।

আবার অপু এ-কথা মনে না হইয়া পারিল না—কাল, মহাকাল, যাহারই মধ্যে পারবওব আনিয়া দিবে...তাহার বিচারের অধিকার কি ?

আরও মাস দুই কোন রকমে কাটাইয়া অপু পূজার সময় দেশে গেল। সেদিন
ষষ্ঠী, বাড়ির উঠানে পা দিয়া দেখিল পাড়ার একদল মেয়ে ঘরের দাওয়ায়,
মাহুর পাতিয়া বাসিয়া হাসিকলরব করিতেছে—অপু উপস্থিত হইতে অপর্ণা
ঘোমটা টানিয়া ঘরে মধ্যে ঢুকিল। পাড়ার মেয়েদের সে আজ ষষ্ঠী উপলক্ষে
বৈকালিক জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের হাতে সকলকে আন্থা সিঁহুর
পরাইয়াছে। হাসিয়া বলিল—ভাগ্যিস এলে। ভাবছিলাম এমন কলার
বডাটা আজ ভাঙলাম—

—সত্যি, কৈ দেখি ?

—বা রে, হাত মুখ ধোও—ঠাণ্ডা হও—এমন পেটুক কেন তুমি ?... পেটুক
গোপাল কোথাকার।

পবে সে রেকাবিতে খাবার আনিয়া বলল—এগুলো খেয়ে নে লো, তারপর
আবও দেব—ছাখো তো খেয়ে, মিষ্টি হয় নি তো ? তোমার তো আবার
একটুখানি গুড়ে হবে না।

খাইতে খাইতে অপু ভাবিল—বেশ তো শিখেছে করতে। বেশ—

পরে দেওয়ালেও দাঁক চোব পাতে বলিল—বাঃ, ও-বকম আলপনা দিয়েছে
কে ? ভাবী সুন্দর তো। অপর্ণা মূহু হাসিল বলিল—ভাদ্র-মাসেব লক্ষ্মী-
পূজাতে তো এলে না। আমি বাড়িতে পূজা করলাম—মা করতেন, সিঁহুর
মাথা কাটা দেখি তোলা বসছে, তাতে নতুন পান পেতে—বামুন খাওয়ালাম।
তুমি এলেও দু'টি খেতে পেতে গো—তাবই ঐ আলপনা—

- তাই তো। তুমি ভারী গিন্নী হয়ে উঠেছ দেখছি। লক্ষ্মীপূজা, লোক
খাওয়ানো—আমার কিন্তু এসব ভাবী ভাল লাগে অপর্ণা—সত্যি, মাও খুব
ভালবাসতেন—একবার তখন আমবা এখানে নুন এসেছি—একজন বুড়োমত
লোক আমাদের উঠানের ধারে দাঁড়িরে বললে—খোকা ক্ষিদে পেয়েছে,
দুটো মুড়ি খাওয়াতে পাবো ? —আমি যাকে গিয়ে বললাম, মা একজন মুড়ি
খেতে চাচ্ছে, ওকে খানকতক কটি খাওয়ালে ভাবী খুশী হবে—খাওয়াবে মা ?
মা কি কবলেন বলো তো ?

—দুটি তৈরি করে বুরি

—তা নয়। মা একটু কয়েকের খিকবে রাখতেন, আমি বোর্ডিং থেকে
বাড়িটাড়ি এল পাতে দিতেন। আমায় খুশী করবার জন্য মা সেই ঘি দিয়ে
আটা-দশখানা পবোটা ভেজে লোকটাকে ডেকে, দাওয়াব কোলে পিঁড়ি পেতে
খেতে দিলে। লোকটা তো অবাক, তার মুখেব এমন ভাব হল।

রাত্রে অপর্ণা বলিল—ছাখো, মা চিঠি লিখেছেন, পূজোর পব মূবারি-দা আস-
বেন নিতে, পাঁচ-ছ'মাস যাইনি, তুমি যাবে আমাদের ওখানে ?

অপু বড় অভিমান হইল। সে এত আশা করিয়া পূজার সময় বাড়ি আসিল,
আব এদিকে কিনা অপর্ণা বাবার বাড়ি যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া আছে
সে-ই তাহা হইলে ভাবিয়া মনে অপর্ণার কাছে বাপের বাড়ি যাওয়াটাই অধি-

কতর লোভনীয়।

অপু উদার সুরে বলিল—বেশ, যাও। আমার যাওয়া ঘটবে না, ছুটি নেই এখন। কথাটা শেষ করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বই পড়িতে লাগিল। অপর্ণা খানিকক্ষণ পরে বলিল—এবার যে বইগুলো এনেছ আমার জন্যে, ওর মধ্যে একখানা ‘চম্বনিকা’ তো আনলে না? সেই যে সে-বার বলে গেলে কনস্টান্টিনার সময়? এক-আধ কথার জবাব পাইয়া ভাবিল সারাদিনের কষ্টে স্বাবীর হয়ত ঘুম আসিতেছে। তখন সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

দশমীর পরাদনই মুরাবি আসিয়া হাজির। জামাইকেও যাইতে হইবে, অপর্ণার মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি নানা পীড়াপীড়ি শুধু কবিল। অপু বলিল—পাগল। ছুটি কোথায় যে যাব আমি? বোনকে নিতে এসেছ, বোনকেই নিয়ে যাও ভাই—আমরা গবীর চাক্বে লোক, তোমাদের মত জমিদার নই—আমাদের কি গেলে চলে?

অপর্ণা বুঝিয়াছিল স্বামী চটয়াছে, এ অবস্থায় তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। আদৌ, কিন্তু বড় ভাই লইতে আসিয়াছে সে কি করিয়াই বা ‘না’ বলে? দো-টানাব মধ্যে সে বড় মুশকিলে পড়িল। জামীকে বলিল—জামো আমি যেতাম না। কিন্তু মুরাবি-দা এসেছেন, আমি কি কিছু বলতে পারি?...বাগ করো না লক্ষ্মীটি, তুমি এখন না যাও, কালীপুজোর ছুটিতে অবিশিষ্ট হবে যেও—ভুলো না যেন।

অপর্ণা চলিয়া যাইবার পূর্ব মনসাপোতা আর একদিনও ভাল লাগিল না। কিছু বাধা হইয়া সে রাত্রিটা সেখানে কাটাইতে হইল, কারণ অপর্ণাও গেল বৈকালেব টেনে। কোনদিন লুচি হয় না কিন্তু দাদার কাছে স্বামীকে ছোট হইতে না হয়, এই ভাবিয়া অপর্ণা দুইদিনই বাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়াছিল—আজও স্বামীর খাবার আলাদা করিয়া ঘরের কোণে ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। লুচি ক’খানা খাইয়াই অপু উদাস মনে জানালায় কাছে আসিয়া বসিল। পূর্ব ভোৎস্না উঠিয়াছে, বাড়ির উঠানের গাছে এখনও কি পাখি ডাকিতেছে, শূন্য ঘর, শূন্য শয্যাশ্রাস্ত—অপূর্ব চোখে প্রায় ভল আসিল। অপর্ণা সব বুঝিয়া তাহাকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া গেল। বডলোকেই মেয়ে কিনা?...আচ্ছা বেশ।...অভিমানের মুখে সে একথা ভুলিয়া গেল যে, অপর্ণা আজ ছ’মাস এই শূন্য বাড়িতে শূন্য শয্যায় তাহারই মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে।

পরদিন প্রত্যয়ে অপু কলকাতা রওনা হইল। সেখানে দিনচারেক পবেই অপর্ণার এক পত্র আসিল,—অপু সে পত্রের কোনও জবাব দিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে অপর্ণার আর একখানা চিঠি। উত্তর না পাইয়া ব্যস্ত আছে, শরীর ভাল আছে তো? অসুখ-বিসুখের সময়, কেমন আছে পত্রপাঠ যেন জানায়, নতুবা বড় দুর্ভাবনার মধ্যে থাকিতে হইতেছে। তাহারও কোন জবাব গেল না।

বাসখানেক কাটিল।

কার্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন একখানা দার্প পত্র আসিল। অপর্ণা লিখিয়াছে—ওগো, আমার বৃকে এমন পাখাণ চাপিয়ে আর কতদিন বাখবে, আমি এত কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে? আজ একমাসের ওপর হ'ল তোমার একচত্র লেখা পাঠ নি, কি ক'বে দিন কাটাচ্ছি, তা কাকে জানাব? ছাখো, যদি কোন দোষই ক'বে থাকি, তুমি যদি আমার উপর রাগ কববে তবে ত্রিভুবনে আর কাছে দাঁড়াই বল তো?

অপু ভাবিল,—বেশ জদ কেন, যাও বাণেশ বাড়ি ১০০০ আমাকে চাইবার দরকাব কি, কে আমি? সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূব পুলকের ভাব মনের কোণে দেবা দিল—পথে, ট্রামে, আফিসে, বাসায় সব-সময়, সকল অবস্থাতেই মনে না হইয়া পারিল না যে পুণিবীতে একজন কেহ আছে, যে সর্বদা তাহার জগ্য ভাবতেছে, তাহারই চিঠি না পাঠিলে সে-জনের দিন কাটিতে চাহে না, জীবন বিষাদ লাগে। সে যে হঠাৎ এক সুন্দরী তরুণীর নিকট এতটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে—এ অশ্রিতা সম্পূর্ণ অভিনব ও মৃদু তাহার কাছে। অত-এব তাহাকে আবও ভাবাও আবও কষ্ট দাও তাহার বজনী আবও বিন্দ্র করিয়া গেল।

সুতরাং অপর্ণার মিনতি প্রথা হইল। অসু চিঠিব ছব ব দিল না।

এদিকে অপূব অফিসেব অবস্থা বড খ'বাপ হইয়া আসিল। কাগজ উঠিয়া যাইবাব গোগাড, একদিন সজ্ঞাদিকারী তাহাদেব কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কি করা উচিত সে-সম্বন্ধে পরামর্শ। কথাবার্তার গতিকে বৃথিল কাগজেব পরমাষু আব বেশীদিন নয়। তাহার একজন সহকর্মী বাহিরে আসিয়া বলিল—এ বাজাবে চাকরিটুকু গেলে মশাই দাঁড়াবাব যে নেই একে-বাবে—বোনের বিষেতে টাকা দাব সুদে-আসলে অনেক দি দিয়েছে, সুদটা দিয়ে পামিয়ে বাখাব উপায় যদি না পাকে, মহাজন বাড়ি ক্রোক দেবে মশাই, কি এে করি।

ইতিমধ্যে সে একদিন লীলাদেব বাড়ি গেল। যাওয়া সেখানে ঘটে নাই প্রায় বছর দুই, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে দেখিয়া লীলা আনন্দ ও বিস্ময়েব সুবে বলিয়া উঠিল—একি আপনি। আজ নিতান্তই পথ ভুলে বৃথি এদিকে এসে পড়লেন? অপূ যে শুধু অপ্রতিভ হইল তাহা নয়, কোথায় যেন সে নিজে কে অপরাণী বিবেচনা করিল। একটুখানি আনাড়ী মত হাসি ছাড়া লীলার কথাব কোন উত্তর দিতে পারিল না। লীলা বলিল—এবাব না হয় আপনার পরীক্ষার বছর, তার আগে তো অনায়াসেই আসতে পারতেন? অপূ মুহ হাসিয়া বলিল—কিসেব পরীক্ষা? সে সব তো আজ বছর দুই ছেড়ে দিয়েছি। এখন খববেব কাগজেব অফিসে চাকরি কবি।

লীলা প্রথমটা অবাক হইয়া তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া বহিল। কথাটা যেন বিশ্বাস করিল না, পবে দুঃখিতভাবে বলিল,—কেন, কি জগ্য ছাড়লেন পড়া,

কুনি ? আ প-নি গড়া ছেড়েছেন !

লীলার চোখের এই দৃষ্টিটা অপূর প্রাণে কেমন একটা বেদনার সৃষ্টি করিল, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার দৃষ্টি, তবুও সে হাসিমুখে কৌতুকের সুরে বলিল—
এমান দিলুম ছেড়ে, ভাল লাগে না আর, কি হবে পড়ে ? তাহার এই হালকা কৌতুকের সুরে লীলা মনে আঘাত পাইল, অপূর্ব কি ঠিক সেই পুরানো দিনের অপূর্বই আছে ? না যেন ?

অপূর্ব বলিল—তুমি তো পড়ছ, না ?

লীলা নিজের সম্বন্ধে কোন কথা হঠাৎ বলিতে চায় না, অপূর্ব প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবে বলিল—এবার আই-এ পাশ কবেছি, থার্ড ইয়ারে পড়ছি। আপনি আজকাল পুণোনো বাসায় থাকেন, না, আর কোথাও উঠে গিয়েছেন ?

লীলা মা ও মাসীমা আসিলেন। লীলা নিজের আঁকা ছবি দেখাইল। বলিল—এবার আপনার মুখে স্বর্গ হইতে বিদায়টা শুনব, মা আর মাসীমা সেই জন্য এসেছেন।

আরও খানিক পরে অপূর্ব বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল, লীলা বৈঠকখানা দোর পশ্চস্ত সঙ্গে আসিল, অপূর্ব হাসিয়া বলিল,—লীলা, আচ্ছা, ছেলেরেলায় তোমাদের বাড়িতে কোন বিয়েতে তুমি একটা হাসি কবিতা বলেছিলে মনে আছে ? মনে আছে সে কবিতাটা ?

—উঃ। সে আপনি মনে ক'বে রেখেছেন এতদিন। সে সব কি আত্মকের কথা ?

অপূর্ব অনেকটা আপন-মনেই অনুমনস্তভাবে বলিল—আব একবার তুমি তোমার জন্যে-আমার জন্যে অর্ধেকটা খাওয়ালে আমার জীবন ক'বে, শুনলে না কিছুতেই —ওঃ, দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল।

বলিয়া সে হাসিল, কিন্তু লীলা কোনও কথা বলিল না। অপূর্ব একবার পিছন দিকে চাহিল, লীলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন দেখিতেছে।

ফিরিবাব পথে একটা কথা তাহার বাব ব'ব মনে আসিতেছিল। অপূর্ব সুন্দরী বটে, কিন্তু লীলাব সঙ্গে এ-পশ্চস্ত দেখা কোন মেয়েই তুলনা হয় না, হওয়া অসম্ভব। লীলাব রূপ মাপ্রাণের মত নয় যেন, দেবীর মত রূপ, যুগের অন্তিম শ্রীতে, যে পব ও পব ভজিতে, গায়ের ব'—এ, গল'ব সুগে, গতিব চন্দ্র।

অপূর্ব বুঝিল সে লীলাকে ভালবাসে, গভীর ভাবে ভালবাসে, কিন্তু তা আবেগহীন, শাস্ত, দীর্ঘ ভালবাসা। মনে তৃপ্তি আনে, শ্লিঙ্ক আনন্দ আনে, কিন্তু শিরায় উপশিবায় বড়োব তৃপ্তব নর্ভন তেলে না। লীলা তাহার বালোর সাধী, তাহার উপর মায়ের চেঁটের বোনের মত একটা যমতা, স্নেহ ও অনু-কম্পা, একটা মাধুর্যভরা ভালবাসা।

দিন কয়েক পরে, একদিন লীলাব দ'দামশায়ের এক দারোয়ান আসিয়া তাহাকে একখানা পত্র দিল, উপরে লীলার হাতের ঠিকানা লেখা। পত্রখানা

সে খুলিয়া পড়িল। দু-লাইনে পত্র, একবার বিশেষ প্রয়োজনে আজ বা কাল ভবানীপুরের বাড়িতে যাইতে লিখিয়াছে।

লীলা সাদাসিধা লালপাড শাড়ি পড়িয়া মাঝেব ছোট ঘবে তাহার সঙ্গে দেখা করিল। যাহাই সে পবে, তাহাতেই তাহাকে কি সুন্দর না মানায়। সকাল আটটা, লীলা বোধ হয় বেশীক্ষণ ঘুম হইতে উঠে নাই, রাত্রির নিদ্রালুতা এখনও মনে পড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার চোখ হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, মাপার চুল অবিচল, ঘাড়ের দিকে দৃষ্টি এলাইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের পদ্মের মত মুখের পাশে চাঁকুগুলির ও এক গাছা। অহা, হাসিমুখে বলিল—‘পাড’ ইয়ার ব’লে বাব লেখাপড়া বুটেছে। আটটার সময় ঘুম ভাঙল? না এখনও ঠিক শায়েনি?’

লীলা যেকোন পছন্দ করে অপেক্ষে তাহার এই সহজ আনন্দ, খুশী ও হালকা হাসি আবহাওয়ায় জগা। ছেলেবেলাতেও সে দেখিয়াছে, শত দুঃখের মধ্যেও অসুখ ও অনন্দ উজ্জলতা ও কোকপ্রবণ মনের খুশী কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিত না, এখনও তাই, একরাশ বাহিরের আলো ও তারুণ্যের সজীব জীবন নন্দ সে যেন শ্রমিয়া জানে যেন, যখনই আসে—আপনা-অপনিই এসব কথা লীলার মনে হইল। তাহার মনে পড়িল, মাঝেব মৃত্যুর খবরটা সে এই একম হাসিমুখেই দিয়াছিল লালদাখির মোড়ে।

—আসুন, বসুন, বসুন। ‘সেডমি’ ক’বে ঘুমুই নি, কল বাত্রে বড় মামীমার সঙ্গে বয়োম্মোপে গিয়াছিলাম সাড়ে-ন’টার শো’তে। ফিরতে হয়ে গেল, ‘সেডমি’ বাবো, ‘সেডমি’ আসতে দেউতা। বসুন, চা খানি।

ভাপানী গালাব সুদৃশ্য চাষের ব’সনে সে চা আনিল। সঙ্গে পাঁড়কটি-টোঁক, খেলাসুক ডিম কি একপ্রকার শাক, গাধখানা ভাঙা আলু—সব সিদ্ধ ধোঁয়া উড়িতেছে। অহা বলিল—এসব সাহেবা বন্দোবস্ত বোব হয় তোমার দাদা-মশায়ের, লীলা? ডিম, ও আবার খেল’সুদ্ধ, এ শাকটা কি?

লীলা হাসিমুখে বলিল—ওটা লেহুস। দাঁড়ান ডিম চাডিয়ে দি। আপনাব দাড়িব ক’ছে ও ক’টা দাঁড় কিসেব? কাম’মার সময় কেটে ফেলেছেন বুঝি? অহা বলিল,—ও কিছু না, এমনি কিসেব। বসো দাঁড়িয়ে বইলে কেন? তুমি চা বাবে না?

লীলার ছোটভাই ঘবে ঢুকিয়া অপর দিকে চাহিয়া হাসিল, নাম বিষলেন্দু, দশ এগাবো বছরের সুন্দর বালক। লীলা তাহাকে চা ঢালিয়া দিল, পরে তিন-জনে নানা গল্প করিল। লীলা নিজেব আঁকা কতকগুলি ছবি দেখাইল, নিজেব আঁকা-আঁকা কথো বলিল। সে এম. এ. পাশ করিবে, নয় তো বি. এ. পাশ করিয়া বিদেশে যাইতে চায় দাদামশায়কে বাজী করাইয়া লইবে, ইউরোপের বড় আর্ট গ্যালারিগুলির ছবি দেখিবে, ফিরিয়া আসিয়া অজ্ঞাতা দেখিতে যাইবে, তার আগে নয়। একটা আলমারী দেখাইয়া বলিল—দেখুন না এই বইগুলো?...ভাসারির লাইভস্...এডিশনটা কেমন?...ছবিগুলো

দেখুন—সেক্ট্‌গ্যাক্টনির ছবিটা আমার বড় ভাল লাগে, কেমন একটা তপস্যা-
স্তব্ধতা, না ? ইন্সটলমেন্ট সিস্টেমে এগুলো কিনেছি—আপনি কনবেন কিছু
ওদের কার্ণিভার আমাদের বাড়ি আসে, তাহলে বলে দি—

অপু বলিল—কত কবে আসে ?...ভাসারির এডিশনটা তা'হলে না হয়—

—এটা কেন কিনবেন ? এটা তো আমাব কাছেই রয়েছে—আপনার যখন
দরকার হবে, নেবেন—আমাব কাছে যা যা আছে, তা আপনাকে কিনবে হবে
কেন ? দাঁড়ান, আর একটা বইয়ের একখানা ছবি দেখাই—

অপু ছবিটার দিক হইতে আব একবার লীলার দিকে চাহিয়া দেখিল—বতি-
চেলির প্রিন্সেস দেস্ত্‌ খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু বাতচেলির বা ভু-ভিঞ্চ প্রতিভা
লইয়া যদি লীলাব, এই অপু সুন্দর মুখ, যৌবন-পুষ্পিত দেহলতা ফুটাইয়া
তুলিতে পারিত কেউ।—

কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল—আমি কি ভাবছি বলব লীলা ? আমি যদি ছবি
আঁকতে পারতাম, তোমাকে মডেল কবে ছবি আঁকতাম—

লীলা সে কথার কোন জবাব না দিয়া হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, আচ্ছা, অপু
বাবু একটা ভাল চাকরি যদি কোথাও পাওয়া যায়, তো করেন ?

অপু বলিল—কেন কবব না, কিসেব চাকরি ?

লীলা বিবরণটা বলিয়া গেল। তাহ'র দাদামশায় একটা বড় স্টেটেব এটর্নি
তাদের অফিসে একজন সেক্রেটারী দরকার—মাইনে দেড় শো টাকা, চাকরীটা
দাদামশায়ের হাতে, লীলা বলিলে এখনই হইয়া যায়, সেই জন্যে তা
তাহাকে ডাকিয়া আনা।

অপু মনে পড়িল, সেদিন ক'ন্স কব'য সে লীলার কাছে নিচে বস'ন
চাকুরি'র ব্যবস্থা ও খবরের কাগজখানা উঠিয়া যাওয়া'র ওয়া'র কথাটা অন্য
কি সম্পর্কে একবারটি তুলিয়াছিল।

লীলা বলিল—সেদিন বাত্রে আমি তাঁর মুখে কথাটা শুনলাম, অ'চ্ছ সকালেই
আপনাকে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি বাজা আছেন তো ? আসুন দাদা
মশায়ের ক'ছে আপনাকে নিয়ে যাই, ওঁর একখানা 'চঠিতে হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতার অপু মন ভবিয়া গেল। এত কথার মনে লীলা চাকুরি পাওয়ার
কথাটাই কি শাবে মনে প'ন্নিয়া ব সয়াছিল।—

লীলা বলিল—আপনি আজ দুপুরে এখানে না থেয়ে যাবেন না। আসুন
পাখাটা দয়া করে টিপে দিন না।

কিন্তু চাকুরি হইল না। এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা না থাকায় লীলা একটু ভুল
করিয়াছিল, দাদামশায়কে বলিয়া রাখে নাই অপু কথা। দিন দুই আগে
লোক লওয়া হইয়া গিয়াছে। সে খুব হুঃখিত হইল, একই অপ্রতিভও হইল।
অপু হুঃখিত হইল লীলার জন্য। বেচারী লীলা। সংসারের কোন অভিজ্ঞতা
তাহার কি আছে ? একটা চাকুরি খালি থাকিলে যে কতখানা উমেদারীর
দরখাস্ত পড়ে, বড়লোকের মেয়ে, তাহার খবর কি করিয়া জানিবে।

লীলা বলিল—আপনি এক কাজ করুন না, আমার কথা রাখতে হবে কিন্তু ছেলেবেলার মত একগুয়ে হলে কিন্তু চলবে না—প্রাইভেটে বি. এ. টা দিয়ে দিন। আপনার পক্ষে সেটা কঠিন না কিছু।

অপু বলিল—বেশ দেব।

লীলা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—ঠিক? অনাব ব্রাইট?

—অনাব ব্রাইট।

শীতের অনেক দেবী, কিন্তু এবই মনো লীলাদের গাড়িবারান্দার পাশে জাক-রিতে ঐঠানো মার্শালনীলের লতায় ফুল দেখা দিয়েছে, বারান্দার সিঁড়ির দুপাশের টেবে বড বড নিরোন ও গ্লাস প্রিন্স ফুটিয়াছে। বর্ষাশেষে চাইনিজ ফান পায়ের পাতাগুলো ঘন সবুজ।

পদ্মপুস্কর রোদে পা দিয়াই অপূর চোখ ভলে ভবিয়া অঙ্গিল। লীলা ছেলে-মাণুষ লীলা—সে কি জানে সংসারের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠুর সঙ্গর্ষের কাহিনী? আত্ম তাহাব মনে হইল, লীলার পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে সেটা তুলিয়া দিবার জন্য সে নিজেব সুখশান্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিতে পারে।

বিবাহের ৭৭ লীলাব সঙ্গে এই প্রথম দেখা, কিন্তু দু-একবার বলি বলি করিয়াও অপূ. বিবাহের কথা বলিতে পারিল না, অথচ সে নিজে ভালই বোঝে যে, না বলিতে পারিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

অপরাজিত

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় পড়াব বিলম্ব অতি সামান্যই।

শনিবার। অনেক আফিস আজ বন্ধ হইবে, অনেকগুলি সম্মুখের মজলবারে বন্ধ। দোকানে দোকানে খুব ভিড—ঘন্টাখানেক পথে হাঁটিলে হাণ্ডবিল হাত পাতিয়া লইতে লইতে বুড়িখানেক হইয়া উঠে। একটা নতুন স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানা পথে পথে জঁকাল বিজ্ঞাপন মারিয়াছে।

আমড়াতলা গলিব বিখ্যাত ধনী বাবসাদাব নকুলেশ্বর শীলের প্রাসাদোপম সুরহং অটালিকার নিম্নতলেই ইছাদের আফিস। অনেকগুলি ঘর ও ছুটা বড হল কর্মচর্চাতে ভর্তি। দিনমানেও ঘরগুলির মধ্যে ভালো আলো যায় না বলিয়া বেলা চারটা না বাড়িতেই ইলেক্ট্রিক আলো জলিতেছে।

ছোকরা টাইপিস্ট নূপেন সম্ভরণে পদাি ঠেলিয়া মানেজাবের ঘরে ঢুকিল। মানেজার নকুলেশ্বর শীলের বড জামাই দেবেন্দ্রবাবু। ভারী কড়া মেজাজের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়াছে, দোহাবা ধরনের চেহারা। বেশ ফর্সা, মাধন্য ঢাক। এক কলমের খোঁচায় লোকের চাকরি খাইতে এমন পারদর্শী লোক খুব অল্পই দেখা যায়। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন—কি হে নূপেন?

নূপেন ভূমিকায়রূপ হুইখানা টাইপ-ছাপা কি কাগজ মঞ্জুর করাইবার ছলে ঠাহার টেবিলের উপর রাখিল।

দহি শেষ হইলে নূপেন একটু উশখুশ করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আরক্ত-

মুখে বলিল—আমি—এই—আজ বাড়ি যাব—একটু সকালে, চারটেতে গাড়ি
কি না? সাড়ে তিনটেতে না গেলে—

—তুমি এই সেদিন তো বাড়ি গেলে মজলবারে। রোজ রোজ সকালে
ছেড়ে দিতে গেলে অফিস চলবে কেমন করে? এখনও তো একখানা চিঠি
টাইপ করনি দেখছি—

এ অফিসে শনিবারে সকাল ছুটির নিয়ম নেই। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পূর্বে
কোনদিন অফিসের ছুটি নাই। কি শনিবার, কি অন্যদিন। কোনও পাল-
পার্বণে ছুটি নাই, কেবল পূজার সময় এক সপ্তাহ, শ্রামাপূজায় একদিন ও
সরস্বতী পূজায় একদিন। অবশ্য রবিবারগুলি বাদ। ইহাদের বন্দোবস্ত
এইরূপ—চাকরি করিতে হয় কর, নতুবা যাও চলিয়া। এ ভয়ানক বেকার
সমস্যার দিনে কর্মচারিগণ নবমীর পাঠার মত কানিতে কানিতে চাণক্যলোকের
উপদেশ মত চারিদিকে পূবোভাগে বজায় ও ছুটিছাটা, অসম্মান অসুবিধাকে
পশ্চাদিকে নিক্ষেপ করতঃ কালক্রমে দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।
নূপেন কি বলিতে খাইতেছিল—দেবেনবাবু বামা দিয়া বলিলেন—মাসিক স্নাও
চৌধুরীদের মত—গেজখানা টাইপ কবেছিলে?

নূপেন কাদ-কাদ মুখে বলিল—আজ্ঞে, কই ওদের অফিস থেকে তো পাঠিয়ে
দেন্নি নি এখনও?

—পাঠিয়ে দেন্নি নি তো ফোন কব নি কেন? আজ সাতদিন থেকে বলছি—
কচি খোকা তো নও? যা আমি না দেখব তাই হবে না?

নূপেনের ছুটির কথা চাপা পড়িয়া গেল এবং সে বেচাবী পুনরায় সাহস
করিয়া সে-কথা উঠাইতেও পাবিল না।

সন্ধ্যার অল্প পূর্বে ক্যাশ ও ইংলিশ ট্রিপার্টমেন্টের কেরানীরা বাহির হইল—
অন্য অন্য কেরানীগণ আবও ঘন্টাধানেক থাকিবে। অত্যন্ত কম বেতনের
কেরানী বলিয়া কেহই তাহাদের মুখের দিকে চায় না, বা তাহারা নিজেরাও
আপাত্ত উঠাইতে ভয় পায়।

দেউড়ীতে দারোয়ানেরা বসিয়া খেদী খাইতেছে, ম্যানেজার ও সুপারিন্টেন্ডে-
ন্টের যাতায়াতের সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফোজের কামদায় সেলায় করে,
ইহাদিগকে পৌছেও না।

ফুটপাথে পা দিয়া নূপেন বলিল—দেবলেন অপরূবাবু, ম্যানেজার বাবুর ব্যাপার
একদিন সাড়ে তিনটের সময় ছুটি চাইলাম, তা দিলে না—অন্য সব অফিস
দেখুন গিয়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা সব একরূপ ভেবে যে
যার বাড়ি পৌছে গা বাচ্ছে আর আমরা এই বেকলাম—কি অত্যাচারটা
কলুন দিকি?

প্রবোধ মুহুরী বলিল—অত্যাচার বলে মনে কর ভায়া কাল থেকে এস না,
মিটে গেল। কেউ তো অত্যাচার পোয়াতে বলে নি। ওঃ, কিদে যা পেয়েছে
ভায়া, একটা বামুণ পেলে ধরে বাই এমন অবস্থা। রোজ রোজ এমনি—

হাটের রোগ জন্মে গেল ভায়া, শুধু না খেয়ে খেয়ে—

অপু হাসিল। বলিল—দেখবেন প্রবোধ দা, আমি পাশে আছি, এ যাত্রা আশাকে না হয় রেহাট দিন। ধরে বেতে হয় রাত্তার লোকের ওপর দিয়ে আজকের ক্ষিদেটা শাস্ত করুন। আমি আজ তৈরি হয়ে আসি নি। দোহাই দাদা।

তাহার হুংখেন কথা লইয়া একপ ঠাট্টা কবিত্তে প্রবোধ মুহুরী খুব খুশী হইল না। বিবক্তমুখে বলিল, তোমাদের তো সব তাতেই হাসি আর ঠাট্টা, ছেলেছোকরার কাছে কি কোন কথা বলতে আছে—আমি যাই, তাই বলি। হাসি মোড়া ভাই, কই দাও দিকি মানেজারকে বলে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে? হঁ, তার বেলা—

অপুকে হাঁটিতে হয় বোজ অনেকটা। তার বাসা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে গোলদৌঘিব কাছে। তেব টাকা ভাডাতে নীচু একতলা ঘর, ছোট রান্নাঘর। সামান্য বেতনে হুঁজায়গান্ন সংসার চালানো অসম্ভব বলিয়া আজ বছর-খানেক হইল সে অপর্ণাকে কলিকাতায় আনিয়া বাসা করিয়াছে। তবু এখানে চাকরিটি কুটিয়াছিল তাই রক্ষা।—

শেষবেব স্বপ্ন এ ভাবেই প্রায় পূর্ববসিত হয়। অনভিজ্ঞ তরু মনেব উচ্ছ্বাস, উৎসাহ—ম্যাপুখভণা বঙান ভবিষ্যতেব স্বপ্ন-স্বপ্ন থাকিয়া যায়। যে ভাবে বড় সওদাগর হইবে, দেশে দেশে বাণিজ্যেব কুটি খুলিবে, তাহাকে হইতে হয় পাড়াগায়ের হাটুডে ডাক্তার, যে ভাবে ওকালতি পাশ করিয়া বাসবিহারী ঘোষ হইবে, তাহাকে হইতে হয় কল্লাব দোকানী, যাহার আশা থাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইবে, কি দ্বিতীয় কলঙ্গসু হইবে, তাহাকে হইতে হয় চল্লিশ টাকা বেতনের স্কুলমাস্টার।

শতকথা নিবানন্দই জনেব বেলা যা হয়, অপুও বেলাও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এখানিয়মে সংসারখাত্রা, হুঁস্থালী। কেবানীগিবি, ভাড়া বাড়ি, মেলিন্স ফুড ও ওয়েলক্লথ। তবে তাহার শেষোক্ত দুটিব এখনও আবশ্যক হয়ে নাই এই খা।

অপর্ণা ঘরের দোরের কাছে বঁটি পাতিয়া কুটনা কাটিতেছে, স্বামীকে দেখিয়া বলিল—আজ এত সকাল সকাল যে? তারপব সে বঁটিখানা ও তবকারীর চুপড়ি একপাশে সরাইয়া বাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপু বলিল, খুব সকাল আর কৈ, সাতটা বেজেছে, তবে অন্য দিনের তুলনায় সকাল বটে। হ্যাঁ, তেলওয়ালা আব আসে নি তো?

—এসেছিল একবার দুপবে, বলে দিয়েছি বুধবাবে মাইনে হলে আসতে, তোমার আসবার দেরি হবে ভেবে এখনও আমি চান্নেব জল চড়াই নি।

কলেব কাছে অন্য ভাডাতেদেব বি-বোয়েবা এ সময়ে থাকে বলিয়া অপর্ণা স্বামীর হাত-মুখ ধুইবার জল বারান্দার কোণে তুলিয়া রাখে। অ দুখ দুইজনে গিয়া ঝিলিল, রজনীগন্ধা গাছটা হেলে পড়েছে কেন বল তো? একটু বেঁধে

দিও ।

চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময়ে কলেব কাছে কোন প্রৌঢ়া-কণ্ঠের কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল—তা হলে বাবু একশো টাকা বাড়িভাড়া দিয়ে সাহেব পাড়ায় থাক গে । আজ আমার মাথা ধবেছে, কাল আমার ছেলের সর্দি লেগেছে—পালাব দিন হলেই যত ছুতো । নাও-না, সাবা ওপরটাই তোমবা ভাড়া নাও না; দাও না পুঁয়ষটি টাকা—আমবা না হয় আব কোথাও উঠে খাই রোজ রোজ হাঙ্গামা কে সহ্য করে বাপু ।

অপু বলিল—আমাব বাবু আজ বেগেছে গাঙ্গুলা-গিন্নীর সঙ্গে ?

অপর্ণা বলিল—নতুন কবে বাপবে কি, বেগেই আছে । গাঙ্গুলী-গিন্নীরও মুখ বড় খাবাপ, হালদারের বোটা ছেলেমানুষ, কোলের মেয়ে নিয়ে পেবে ওঠে না, সংসারে তো আর মানুষ নেই, তবুও আমি একদিন গিয়ে বাটনা বেটে দিয়ে আসি ।

সিঁড়ি ও রোয়াক ধুইবার পালা লইয়া উপবেব ভাড়াটেদেব মগো এ রেযারেশি বন্দ—অপু আসিয়া অবসি এই এক বৎসরের মগো মিটল না । সকলের অপেক্ষা তাহার ব্যাপ লাগে ইহাদেব এই সংস্কারতা, অশুদ্ধতা । কট্ কট্ করিয়া শক্ত কা শুনাইয়া দেয়—বাঁচিয়া, বাঁচাইয়া কবা বলে না, কোন কথায় লোকের মনে আঘাত লাগে, সে কথা ভাবিয়াও দেখে না ।

বাড়িটাতে হাওয়া খেলে না, বাবান্দাটাতে বসিলে হয়ত একটু, পাওয়া যায়, কিন্তু একটু দূরেই বাঁঝরি-ড্রেন, সেখানে সারা বাসাব তরকাখোর খোদা, মাছের অঁশ, আবজনা, বাসি ভাত-তরকাবি পচিতেছে, বধাব দিনে বাড়িময় ময়লা ও আদময়লা কাপড় শুকাইতেছে, এখানে গোবডানো টিনের বাগ, ওখানে কয়লার ঝুড়ি । ছেলেমেয়েগুলো অপবিত্র, ময়লা পেনী বা ফক পরা । অপুদের নিভেদের দিকটা ওই মধ্যে পবিত্রাব-পরিচ্ছন্ন থাকিলে কি হয়, এই ছোট্ট ব্যান্ডার টবে দু-চারটে বজনা গন্ধা, বিছাপাতার গাছ বাখিলে কি হয়, এই একবৎসব এখানে আসিয়া অপু বুঝিয়াছে, জীবনের সকল সৌন্দর্য, পবিত্রতা মাধুর্য এখানে পলে পলে নষ্ট করিয়া দেয়, এই আবহাওয়ায় বিষাক্ত বাস্পে মনের আনন্দকে গলা টিপিয়া মারে । চোখে পীড়া দেয় যে অসুন্দর, তা ইহাদের অঙ্গের আভরণ । থাকিতে জানে না, বাস করিতে জানে না, শূকর-পালের মত শয়র আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়া মহা আনন্দে দিন কাটায় । এত কুশ্রী বেফেনীর মধ্যে দিন দিন যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে । কিন্তু উপায় নাই, মনসাপোতা থাকিলেও আর কুলায় না, অথচ তের টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল ঘর শহরে কোথাও মেলে না । তবুও অপর্ণা এই আলো-হাওয়াবিহীন স্থানেও শ্রীহৃদ আনিয়াছে, ঘরটা নিজের হাতে সাজাইয়াছে; বাস্পেটরাতে নিজের হাতে বোনা বেগাটোপ, জানালায় ছিটের পর্দা, বালিশ মশারী, সব ধপ ধপ করিতেছে, দিনে দু-তিনবার ঘর ঝাঁট দেয় ।

এই বাড়ির উপরের তলার ভাড়াটে গাছ, লীদের একজন দেশস্থ আত্মীয় পীড়িত অবস্থায় এখানে আসিয়া ৩-তিন মাস আছেন। আত্মীয়টি প্রোচ, সঙ্গে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় অতি দরিদ্র, বডলোক আত্মীয়ের আশ্রয়ে এখানে রোগ সারাতে আসিয়াছেন ও চোরের মত একপাশে পড়িয়া আছেন। বোটি যেমন শান্ত তেমন নিরীহ,—ইতিপূর্বে কখনও কলিকাতায় আসে নাই—দিনব্যাপ্ত ভ্রমণ মত হইয়া আছে। সারাদিন সংসারের খাওয়ান খাটে সময় পাঠলেই, কগ-স্বামীর মুণের দিকে উদ্ভিগ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার উপর গাছ, লী-বোয়ের বন্ধার, বিবাক্ত প্রদর্শন, মনুষ্যগণ তো আছেই। অত্যন্ত গদ্যব, অল্প বেগা দেখিতে যাটবার ছলে মাঝে মাঝে বেদানা, আত্মব, লেবু দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও বড ছেলে-টিকে ডামা কিনিয়া দিয়াছে।

এদিকে তাহারও চলে না। এ দামাণ্ডা আসে সংসার চালাইনা একরূপ অস-স্থব। অর্ণা অন্যদিকে ভাল গ্রহিনী হইলেও পয়সা-কড়ির ব্যাপাবটা ভাল বোঝে না—দুজনে মিলিয়া মহা আমোদে মাসের প্রথম দিকটা খুব খরচ করিয়া ফেলে—শেষের দিকে কত পায়।

কিছু সকলের মধ্যে। কষ্টকর হইয়াছে আদ্যন্তে এক ভুগণ্ড খাটুনি। ছুটি বালয়া কোনও জিনিস নাই এখানে। ছোট ঘরটিতে বেবিলের সামনে ঘাট পড়িয়া বসিয়া থাক সকাল এগারোটা হইতে বৈকাল সাতটা পর্যন্ত। আজ দেড় বৎসর পরিয়া এই চলিতেছে। এই দেড় বৎসরের মধ্যে সে শহরের বাহিরে কোথাও যায় নাই। আফিস আর বাসা বন্দা আর আফিস। শীলবাবুদের দমদমাব বাগান-বাড়িতে সে একবার গিয়াছিল, সেই হইতে তাহার মনের সাধ নৈজব মনের মত গাছ-পালায় সাজানো বাগান-বাড়িতে বাস করা আফিসে যখন কাজ থাকে না, তখন একখানা কাগজে কাগজক বাগান-বাড়ির নক্সা আঁকে। বাড়িতে যেমন তেমন হটক, গাছপালা বৈচিত্র্যই থাকিবে বেশী। গেটের দুধাবে দুটো চীনা বাশের ঝাড় থাকক। রাঙা সুগন্ধী নন্দেব ধারে ধারে বজ্রগন্ধা লাভেণ্ডার ঘাসের পাড় বসানো বকুল ও কুমুদার ছায়া।

বাড়িতে কিংবা চাও শাবাব বাইয়া স্ত্রী সঙ্গ গল্প কবে—হাঁ, তাবপর কাঁটালি চাঁপার পাবগোলাটা কোন দিকে হবে বলো তো?

অর্ণা স্বামীকে এই দেড় বছরে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। স্বামীও এই-সব ছেলেমানুষিতে সেও সোৎসাহে যোগ দেয়। বলে,—ভুখু কাঁটালি চাঁপা? আর কি কি থাকবে, জানলাব জাফরিতে কি উঠিলে দেব বল তো?

যে আমডাতলার গলিব ভিতর দিয়া সে আফিস যায় তাহার মত নোংরা স্থান আব আছে কি-না সন্দেহ। চুক্তিতেই স্ট্রটকী চিংড়ি মাছের আডত সারি দশ-পনেরোটা। চড়া রোদ্দের দিনে যেমন তেমন, বৃষ্টির দিনে কার সাধা সেখান দিয়া যায়? স্থানে স্থানে মাদোয়ারীদের গরু ও বাঁড় পথ রোধ

করিয়া দাঁড়াইয়া—পিচপিচে কাদা, গোবর, পচা আপেলের খোলা।

নিভা হু'বেলা আজ দেড় বৎসর এই পথে যাতায়াত।

তা ছাড়া বোজ বেলা এগারটা হইতে সাতটা পর্যন্ত এই দারুণ বন্ধতা।

আফিসে অন্য যাহারা আছে, তাহাদের ইহাতে তত কষ্ট হয় না। তাহারা প্রাণীণ, বহুকাল ধরিয়া তাহাদের খাগের কলম শীলবাবুদের সেরেস্তায় অক্ষয় হইয়া বিরাজ কবিতেছে, তাহাদের গবও এইখানে। রোকড-নবীশ রামধন-বাবু বলেন—হেঁ হেঁ, কেউ পাববে না মশাই, আজ এক কলমে বাউশ বছর হ'ল বাবুদের এখানে—কোন বাটার ফুঁ খাটেবে না বলে দিও—চার সালেঃ ভূমিকম্প মনে আছে? তখন কত'ী বেঁচে, গদী থেকে বেকছি, ওপর থেকে কত'ী হেঁকে বললেন, ওহে রামধন, পোস্তা থেকে ল্যাণ্ডা আমার দরটা জেনে এসো দিকি চট কবে। বেরুতে যাবো মশাই—আব খেন মা বাসুকি একেবারে চৌদ্দ হাজাব ফণা নাড়া দিলে উঠলেন—সে কি কাণ্ড মশাই? হেঁ হেঁ আজকের লোক নই—✓

কষ্ট হয় অপূব ও ছোকরা টাইপিস্ট নূপেনের। সে বেচাবী উঁকি মাঝিয়া দেখিয়া আসে মানোজাব ঘরে বসিয়া আছে কিনা। অপূব কাছে নূলের উপর বসিয়া বলে, এখনও মানোজাব হাইকোর্ট থেকে ফেরেন নি বুনি, অপূব-বাবু—ছুটা বাজে, ছুটি সেই সাতটায়—

অপূব বলে, ও-কথা আব মনে করিয়ে দেবেন না, নূপেনবাবু। বিকেল এত ভালবাসি, সেই বিকেল দেখি নি যে আজ কতদিন। দেখুন তো বাইবে চেয়ে, এমন চমৎকার বিকেলটি, আব এই হৃদয়কাণ্ড যবে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে ঠায় বসে আছি সেই সকাল দশটা থেকে।

মাটির সঙ্গে যোগ অনেকদিনই তো হাবাইয়াছে, সে সব বৈকাল তো এখন দূরের স্মৃতি মাত্র। কিন্তু কলিকাতা শহরের যে সাধারণ বৈকালগুলি তাও তো সে হারাইতেছে প্রতিদিন। বেলা পাঁচটা বাড়িলে এক-একদিন লুকাইয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে বাড়ির উঁচু কার্গিসের উপর যে একটুখানি বৈকালের আকাশ চোখে পড়ে তারই দিকে বড়ুফুর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। সামনেই উপবের ঘরে মেজবাবু বন্ধুবান্ধব লইয়া বিলিয়াড খেলিতেছিল, মার্কান্ড গেলিংসের শবে দাঁড়াইয়া সিগারেট খাইয়া পুনরায় ঘরে ঢুকিল। মেজবাবুর বন্ধু নীলবর্তনবাবু একবার বাবান্দায় আসিয়া ক'হাকে ঠ'ক দিলেন। অপূব মনে হয় তাহান জীবনের সব বৈকালগুলি এমনি পরমা দিয়া কিনিয়া লইয়াছে, সবগুলি এখন ওদের জিন্মায়, তাহার নিজের আব কোন অধিকার নাই উহাতে।

প্রথম জীবনের সে-সব ম'ধুগীভবা মুহূর্তগুলি যৌবনের কলকোলাহল কোদায় বিলাইয়া গেল? কোদায় সে নীল আকাশ, মাঠ, আমার বউলের গন্ধওরা জ্যাংলারাত্রি? পাখি আর ডাকে না, ফুল আর ফোটে না, আকাশ আর নবুজ বাঠের সঙ্গে মেলে না—বেঁটুফুলের কোপে সন্ধ্যাফোটা ফুলের ভেতো

গন্ধ আর বাতাসকে তেতো করে না। জীবনে সে যে রোমান্সের স্বপ্ন দেখিয়াছিল—যে স্বপ্ন তাহাকে একদিন শত দুঃখের মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়াছে, তার সন্ধান তো কই এখনও মিলিল না? এ তো একরক্সা ছবির মত বৈচিত্রাহীন, কর্মব্যস্ত, একঘেয়ে জীবন—সারাদিন এখানে অফিসের বন্ধজীবন, বোকড, খতিয়ান, মর্টগেজ, ইন্সুর্যান্সের কাগজের বোঝার মধ্যে মধ্যে পক্ষকেশ প্রবীণ এমনো সংসারাত্তিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সপিনা ধানোর প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করা, এটর্নিদের নামে বড বড চিঠি মুশাবিদা করা—সন্ধ্যায় পায়বাব খোপের মত অপরিষ্কার নোনা বাসাবাডিতে ফিরিয়াই তখনি আবার ছেলে পড়াইতে ছোটা।

কেবল এক অপরাহ্নই এই বন্ধ জীবনের মধ্যে আনন্দ আনে। অফিস হইতে ফিরিলে সে যখন হাসিমুখে চা লইয়া কাছে দাঁড়ায়, কোনদিন হালুয়া, কোনদিন ৩ চাংখানা পেরোটা, কোনদিন বা মুড়ি নারিকেল বেকাবিতে সাজাইয়া সামনে ধরে, তখন মনে হয় এ যদি না থাকিত। ভাগ্যে অপরাহ্নকে সে পায়ছিল। এই ছোট পায়বাব খোপকে যে ঘৃহ বলিয়া মনে হয় সে শুধু অপরাহ্ন এখানে আছে বলিয়া, নুহা ১ কী, টুল, বাসন-কোসন, জানলাব পর্দা, এসব সংসার নয়; অপরাহ্ন যখন বিশেষ ধরনের শাড়িটা পড়িয়া ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, অপু ভাবে, এ স্নেহনীড় শুধু ওই চাবিদেবে ঘিরিয়া ওই মুপের হাসি বুকে স্নেহ বেন প্রথম আশ্রয়। নীড় বচনা সে ওই ইঙ্গিত।

অফিসে সে নানা স্থানের ভ্রমণকাহিনী পড়ে, ডেস্কে মধ্যে পুসিয়া রাখে। পুসি নো বইয়ের দোকান হইতে নানা দেশের ছবিওয়ালা বর্ণনাগূণ বই কেনে—নানা দেশের গেলঙয়ে বা ফিমা কোম্পানী যে সব দেশে যাইতে সাধারণকে পল্লুর কবিতোছে—কেহ বলিতেছে, হাওয়াই দীপে এস একবার—এখনকার নারিকেল কুঞ্জে, ওয়াকিফি বাসুময় সমুদ্রবেলায় জোয়ারপাত্রে যদি তারান্ভি-মুখা উর্মমালার সঙ্গীত না শুনিয়া মর, তবে তোমার জীবন রথা।

এলো পাশো দেখ নাট। দক্ষিণ কলিফোর্নিয়ার চুনাপাথরের পাহাড়ের ঢালুতে, শান্ত বাত্মি তাগাভা আকাশের তলে কখন বিহাইয়া একবারটি ঘুমাইয়া দেখিও...নীতের শেষে হুডিভা উঁচুনিচু প্রান্তরে ককর্শ ঘাসের ফাঁকে ৩-এক পনের মাত্র বসন্তের ফুল প্রথম ফুটিতে শুরু করে, তখন সেখান-কাব সোডা-আলকালি পলিমাটপডা বৌদ্রদীপ্ত মুক্ত তরুবলয়ের বহুসময় রূপ—কিংবা ওয়ালায়ো হুদে তীবে উন্নত পাইন ও ডগলস ফারের ঘন অবশ্য, হুদে স্বচ্ছ বরফগলা জলের তুষারকিণীটা মাজামা আয়েয়গিবি প্রতিছায়ার কম্পন—উত্তর আমেরিকার ঘন, স্তব্ধ, নির্জন আরণ্যভূমির নিয়ত পবিতর-নীল দৃশ্যরাজি, ককর্শ বন্ধুর পবতমালা, গম্ভীরনিদা জলপ্রপাত, ফেনিল পাহাড়ী নদীতীরে বিচরণশীল বল্গা হরিণের দল, ভালুক, পাহাড়ী ছাগল, ভেড়ার দল, উষ ঐশ্বর্য, তুষারপ্রবাহ, পাহাড়ের ঢালুর গায়ে সিডার ও মেন্সল

গাছের বনের মধ্যে বুনো ভ্যালেরিয়ান্ ও ভ্যালোলেট্ ফুলের বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ—দেখ নাই এসব ? এস এস।

টাহিটি। টাহিটি। কোথায় কত দূরে, কোন্ জ্যোৎস্নালোকিত বহুসময় কুলহীন ঝপ্সসুনের পাবে, শুভবাগ্রে গভীর জলের ওলায় যেখানে মুক্তার ভগ্ন হয়। সাগরওহায় প্রবল দল ফুটিয়া থাকে, কানে শুধু দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত তাহাদের অধুব আল্পন ভাসিয়া আসে। অফিসের ঘেঙ্গে বসিয়া এক একদিন সে ঝপ্পে ভোগ হইয়া থাকে—এই সবেব ঝপ্পে। এই একম নির্জন স্থানে, যেখানে লোক লয় নাই, ঘন নারিকেল বৃক্ষের মধ্যে ছোট কুটিরে, খোলা জানালা দিয়া দূরের নীল সমুদ্র চোখে পড়িবে—এব ও বাবে মরকতশ্যাম নোট ছোট দীপ, বিচিত্র পক্ষীগণ অজানা দেশের অজানা আকাশের তলে এগার আলোয় উজ্জল মাঠটা একটা বহুসময় বাতী বহিয়া আনিবে—কুটিরের দারে ফুটিয়া থাকিবে ছোট ছোট বনফুল—শুধু সে ছাড়া অপর।

এই সব বহুলোকের টাকা আছে, কিন্তু জগৎকে দেখিবার জীবনকে বন্দিবার পিঙ্গালা কই এদের ? এ সিমেন্ট বাধানো উঠান চেয়ার, কোচ মোটর—এ ভোগ নয়, এই শৌখীন বিলাসিতার মধ্যে জীবনের সবদিকে খালো বাতাসের বতায়ন আটকাইয়া এ রাখিয়া থাকা—কে বলে ইহাকে জীবন ? তাহার যদি টকা থাকিত কিছও যদি থাকিত, সামান্য কিছ। অথচ ইহারা তো লাভ ক্ষতি চাড়া অথচ কিছু শেষে নাই বোঝেও নাই, জানে না, জীবনে আগ্রহও নাই কিছতেই, বহুদৈব সিদ্ধান্ত-ভগ্না নোংরা গাড়া।

এই অফিস-জীবনের বহুতাকে অপর শাস্ত্রভাবের নিরুপায়ের মত প্রবল মত মাথা পাতিয়া রাখার কসিয়া লগতে পারে নাই। ইহাব বিরুদ্ধে, এই মানসিক দাবিদ্রা ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা যুদ্ধ চলিতেছে অনববর্ত, সে হঠাৎ দমিবার পাত্র নয় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে—ফেনোচ্ছল দুরার মত জীবনের প্রাচুর্য ও মাদকতা তাহার সারা অঙ্গের শিয়ার উপশিরায়—বাগ্র, আগ্রহভরা তরুণ জীবন বুকের নকে উদ্ভাঙালে স্পন্দিত হইতেছে দিনরাত্রি—তাহার স্বপ্নকে আনন্দকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিয়া ফেলা পূর্ব সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু এক এক সময় তাহারও সন্দেহ আসে। জীবন যে এই একম হইবে, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পদন্তু প্রতি দণ্ড মল যে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বেচিভ্রাহান ঘটনার ভরিয় উঠিবে, তাহার কল্পনা তো তাহাকে এ আভাস দেয় নাই। তবে কেন এমন হয়। তাহাকে কাঁচা, অনভিজ্ঞ পাইয়া নিষ্ঠুর জীবন তাহাকে এতদিন কি প্রভারণাই করিয়া আসিয়াছে ? ছেলেবেলায় মা যেমন নগ্ন দারিদ্র্যের রূপকে তাহার শৈশবচক্ষু হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিত তেমনই।...

দেখিতে দেখিতে পূড়া আসিয়া গেল। আজ হ'বৎসর এখানে সে চাকরি করিতেছে, পূজার পূর্বে প্রতিবারই সে ও নৃপেন টাইপিষ্ট কোথাও না

কোথাও যাইবার পরামর্শ আঁটিয়াছে, নস্রা আঁকিয়াছে, ভাড়া কষিয়াছে, কখনও পূর্ণালিয়া, কখনও পুরী—যাওয়া অবশ্য কোথাও হয় না। তবুও যাইবার কল্পনা করিয়াও মনটা খুশী হয়। মনকে, বোঝায় এবার না হয় আগামী পূজায় নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

শনিবার আদিস বন্ধ হইয়া গেল। অপূর্ব আজকাল এমন হইয়াছে—বাড়ি কিনিয়া অঙ্গার মুখ দেখিতে পারিলে যেন বাঁচে, কতক্কে সাতটা বাজিবে, ঘন ঘন ঘড়ির দিকে সজ্জা চোখে চায়। পাঁচটা বাজিয়া গেলে অকূল সময়—সমুদ্রে যেন ধে পাওয়া যায়—আর মোটে ঘণ্টা দুই। ছটা—আব এক। হোক পাল্লবার খোপের মত বাসা, অপূর্ণা যেন সব দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। তাহাব কাছে গেলে আব কিছু মনে পাকে না।

অপূর্ণা চাও খাবাব আনিল। এ সময়টা আদঘন্টা সে স্বামীর কাছে থাকতে পায়, গল্প কবিতো পায়, আব সময় হয় না, এবনি আবার অপূর্ণা ছেলে পড়াইতে বাহিব হইতে হইবে। অপূর্ণা এ-সময় তাহাকে সব দিন পরস্পর পরিলক্ষ্য দেখিয়াছে, খবসা লাল ১৬ শাড়িটি পরা, চুলট বাঁধা, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টি—মূর্তিমতী হুহলক্ষ্মীর মত হাসিমুখে তাহার জন্য চা আনে, গল্প কবে, বাত্রে কি পান্না হইবে রোজ জিজ্ঞাসা করে, সাবাদিনের বাসাব ঘটনা বলে। বলে, গিবে এসো, দুজনে আজ মহারানী বিন্দন খাব দিল্লী নিংহের কথাটা পড়ে শেষ কবে ফেলব।

বাব-দুই অপূর্ণা তাহাকে সিনেমায় লহিয়া গিয়াছে, হাবি কি কিনিয়া নড়ে অপূর্ণা বুকিতে গাবে না, অবাক হইয়া দেখে, গল্পটাও ভাল বুঝিতে পাবে না। বাড়ি আসিয়া অপূর্ণা বুঝাইয়া বলে।

চাষের বাটতে চুমুক দিয়া অপূর্ণা বলিল—এবার তো তোমায় নিয়ে যেতে লিখেছেন শশু মশায়, কিছু অবিসেব ছুটিব যা গতিক—বান এসে কেন নিয়ে যাক না? তারপর আমি কাতিক মাসের দিকে না হয় দু-চাবদিনের জন্য যাব? তা ছাড়া যদি যেতেই হয় তবে এ সময় যত সকালে যেতে পারা যায়—এ সময়টা বাপ-মায়েব কাছে থাকা ভাল, ভেবে দেখলাম।

অপূর্ণা লজ্জাবস্ত্র মুখ বলিল—বাম ছেলেমানুষ, ও কি নিয়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া মা তোমায় কতদিন দেখেন নি, দেখতে চেয়েছেন।

—তা বেশ চলো আমি যাই। বামের হাতে ছেড়ে ভবসা হয় না, এ অবস্থায় একটু সাবধানে ঠাঠা-নামা কবতে হবে কিনা। দাঁও তো ছাতাটা ছেলে পড়িয়ে আসি। যাওয়া হয় তো চলো কালই যাই,—হ্যাঁ একটা সিগারেট দাঁও না?

—অববার সিগারেট। আটটা সিগারেট সকাল থেকে খেয়েছো—আর পাবে না

—আবার পড়িয়ে এলে একটা পাবে।

—দাঁও দাঁও লক্ষ্মাটি—রাতে আর চাইব না—দাঁও একটি।

অপূর্ণা জুঁকিষ্ঠ করিয়া হাসিমুখে বলিল—আবার রাতে তুমি কি ছাড়বে আর

একটা না নিয়ে? তেমন ছেলে তুমি কি না!...

বেশী সিগারেট খায় বলিয়া অপুই সিগারেটের টিন অপর্ণার জিন্মায় রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। অপর্ণার কডাকডি বন্দোবস্ত সব সময় খাটে না, অপু বরাদ্দ অনুযায়ী সিগারেট নিঃশেষ করিবার পৰ আরও চায়, পীড়াপীড়ি করে, অপর্ণাকে শেষকালে দিতেই হয়। তবে ঘরে সিগারেট না মিলিলে বাহিরে গিয়া সে পাবতপক্ষে কেনে না—অপর্ণাকে প্রবঞ্চনা করিতে মনে বড় বাধে—কিন্তু সবদিন নয়, দুটি-ছাটাব দিন বাড়িতে প্রাপ্য আদায় করিয়াও আরও দু-এক বাস্তু কেনে, যদিও সে কথা অপর্ণাকে জানায় না।

ছেলে পড়াইয়া আসিয়া অপু দেখিল উপরে কণ্ঠ ভদ্রলোকটির ছোট মেয়ে পিঁটু তাহাদের ঘরের এককোণে ভীত, পাংস্ত মুখে বসিয়া আছে। বাড়ি-সুদ্ধ হৈ-চৈ। অপর্ণা বলিল ওগো এই পিঁটু গাঙ্গু লীদের ছোট বুকীকে নিয়ে গোলদীঘিতে বেড়াতে বেয়িয়েছিল। ও-বুঁদি চ'নে বাদাম খেয়ে কলে জল খেতে গিয়েছে; আব ফিরে এসে জ'বে বুকী নেই, তাকে আব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর মা তো একেই ছুঁ হুঁয়ে থাকে, অহা সে বেচাণী তো নবমীর পাঁটার মত কাঁপছে আব মাথা ঝুঁছে। আমি পিঁটুকে এখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, নইলে ওর মা ওকে খাচ ড়ো কবে দেবে। আব গাঙ্গুলী-গিন্নী কে কি কাণ্ড করতে জানেই তো তাকে, তুমিও একটু দেখো না গো।

গাঙ্গুলী গিন্নী মশাক খাণ্ডে অণ্ডায়াজ করিতেছেন, ক'নে গেল।—ওগো আমি তুমি দিলে কি কালস' পুঁতেছিলাম গো। অ'মাব এ কি সদ'নাশ হ'ল গো মা, ওগো তাই অ'মাদের বিদেয় হয় না অ'মাব পাড় থেকে এতদিনে মনো-বাগ্গা—ইত্যাদি।

অপু তাড়াওড়ি বাহির হইয়া গেল—পিঁটু, খেয়েচ কিছু?

—খাবে ক' ও-কি ওতে আছে? গাঙ্গুলী গিন্নী দাঁত দিঘছে অহা, ওর কোন দোষ নেই, ও কিছুতেই নিয়ে যাবে না, সেও গাডবে না, তাকে আগলে রাখা কি ওর কাজ।

সকলে মিলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে বুকীকে ক'খুটোলা খানায় পাওয়া গেল। সে পথ হারা ঠায়া খুঁজিতেছিল, বাড়ি নখর, পাস্তার নাম বলিতে পারে না, একজন কনস্টেবল এ অবস্থায় তাহাকে পাঠয়া পানায় লইয়া গিয়াছিল।

বাড়ি আসিলে অপু বলিল—পাওয়া গিয়েছে ভালই হ'ল, বৌটাকে আর মেয়েটাকে কি ক'বেই গাঙ্গুলি-গিন্নী দাঁতে দিঘছে গো। মানুষ মানুষকে এমনও বলতে পারে। কাল নাকি এখন পেকে বিদেয় হ'তে হবে—ওহুম হয়ে গিয়েছে।

অপু বলিল—কিছু দরকার নেই। কাল আমরা তো চলে যাচ্ছি, আমার তো আসতে এখনও চার-পাঁচ দিন দেরি। ততদিন ওরা রংগী নিয়ে আমাদের ঘরে এসে থাকুন, আমি এলেও অসুবিধা হবে না, আমি না হয় এই

পাশেই বরদাবাবুদের মেসে গিয়ে রাত্রে শোব। তুমি গিয়ে বলো বৌ-ঠাকরুনকে। আমি বুঝি অপণা। আমার মা আমার বাবাকে নিয়ে কাশীতে আমার ছেলেবেলায় ওই রকম বিপদে পড়েছিলেন—তোমাকে সে সব কথা কখনও বলি নি, অপণা। বাবা মারা গেলেন, হাতে একটা সিকি-পয়সা নেই আমাদের, সেখ নেই একজন লোক কিছু কিছু সাহায্য করলে, হাবাখা খাচ জোটে না—মা তে আমাতে বাত্রে শুধু অডরের ডাল-ভিজে খেয়ে কাটিয়েছি। আমি তখন ছেলেমানুষ, বছর দশকে মোটে বয়েস—গরীব হওয়ার কট খে কি, তা আমার বুঝতে বাকী নেই—কাল সকালেই ওঁরা এখানে ত্যাগ।

অপণা যাইবাব সময় পিক্টু-ব-মা খুব কাঁদিল। এ বাড়িতে বিপদে-আপদে অপণা যথেষ্ট কান্নাছে। শেগাঁব সেবা কান্না ছেলেমেয়েকে দেখিতে সময় পাইত না, তাহাদের চুল বাধা, টিপ পর্বানো খাবাব খাওয়ানো, সব নিজেব ঘবে ঢাকিয়া আনিয়া অপণা করিত। পিক্টু তো মাসীমা বলিতে অজ্ঞান, সকালব কান্না পামে তো পিক্টু কে আব পামানো যায় না। বউয়ের বয়স অল্প যে অনেক বেশী। সে শাদিতে শাদিতে বলিল, চিঠি দিও ভাই, হঠাৎ দু'চার ডালয় পাঁচলয় হয়ে গেলে আমি ময়ে পড়ো দেবো। এবো চা ব পিক্টু মাঝে কাছে বহিল।

বেলে ওঁ সন্ধ্যাবে অনেকদিন পর চন্দা। তুজনেই হাঁচ ছাড়িয়া দাঁচিল। তুজনেই খুব খুশী। অপণাও পানীগ্রামেব মেয়ে, শহর তাহার ভাল লাগে না। অত্যাধিক কৈনদিন থাকে নাও সকাল ও সন্ধ্যাবেলা যখন সব বাসাডে মিলিয়া একসঙ্গে কল্যাণ সনে ত্যাগ দিত, সোঁসায় অপণাব নিঃশ্বাস বন্ধ হইত। আসিত, চোখ জ্বালা করিত, সে কী ভীষণ যন্ত্রণা। সে নদীৰ ধারের মুণ্ড অ'লো বাতাসে প্রকাণ্ড বাড়িতে মাতুষ হইয়াছে। এসব কষ্ট জীবনে এই প্রথম—এক একদিন তাহার গো কান্না পাইত। কিন্তু এই দুই বৎসর সে নিজেব মুখ সুবিনাব কথা বড় একটা ভাবে নাই। অপূর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলেব উপর মায়ের স্নেহেব মত। অপূর কে তুঁকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি, খেলাল, সংসাবানভিজতা, হাদি-খুশি, এসব অপণাব না তুঁকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর স্বামীর দুঃখময় জীবনেব কথা, তাহার স্থান দাবিদা ও অনাহারেব সঙ্গে সংগ্রাম—সে সব শুনিয়াছে। সে-সব অধু বলে নাই, সে সব বলিয়াছে প্রণব। বৎ অপূ নিজেব অবস্থা অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছিল—নিশ্চিন্দিপুরেব নদীৰ ধারে পৈতৃক বৃহৎ দোতালা বাড়িটাব কথা—আবও দু-একবার না তুলিয়াছিল এমন নহে—নিজে কলেজ হোস্টেলে ছিল এ কথাও বলিয়াছে। কুদ্বিমতী অপণার স্বামীকে চিনিতে বাকী নাই। কিন্তু স্বামীর কথা সে যে সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছে এ ভাব একদিনও দেখায় নাই। বরং স্নেহে বলে—ত্যাখো,

ভোমদের দেশের বাড়িটাতে যাবে যাবে বললে, একদিনও ভো গেলে না—
ভাল বাড়িখানা, —পুলুদাব মুখে শুনেছি জমিজমাও বেশ আছে—একদিন
গিয়ে ববং সব দেখে-শুনে এসো। না দেখলে কি ও-সব থাকে ?..

অপু আমতা আমতা করিয়া বলে—তা যেতামই তো কিন্তু বড মালেরিয়া।
তাতেই তো সব চাডলাম কিনা ? নৈলে আজ এভাবে কি ?..

কিন্তু অসতর্ক যুহুতে হু একটা বের্ফাস কথা মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলে,
ভুলিয়া যায় আগে কি বলিয়াছিল কোন সময়। অর্ণা কখনও দেখায় নাই
যে, এ সব কথাব অসামঞ্জস্য সে বুঝিতে পারিয়াছে। না খাইয়া যে কষ্ট পায়
অর্ণার এ কথা জানা ছিল না। সচ্ছল ঘবেব ছাদবে লালিতা মেয়ে, দুঃখ-
কষ্টের সন্ধান সে জানে না। মনে মনে ভাবে এখন হইতে স্বামীকে সে সুখে
রাখিবে।

এটা একটা নেশাব মত তাহাকে পাইয়াছে। অর্গাদিনেই সে আবিষ্কার করিয়া
ফেলিল, অপু কি কি খাইতে ভালবাসে। তালের ফুলবি সে কবিত্তে জানিত
না, কিন্তু অপু খাইতে ভালবাসে বলিয়া মনসাপোতাষ নিরুপমার কাছে
শিখিয়া লইয়াছিল।

এখানে সে কতদিন অপুকে কিছু না জানাইয়া বাজাব হইতে তাল আনাইয়াছে,
সব উপকরণ আনাইয়াছে। অপু হয়তো বদার ভলে ভিজিয়া শাকিস হইতে
বাসায় ফিরিয়া হাসিমুখে বলিত—কোপায় গেলে অর্ণা ? এত সকলে
রান্নাঘরে কি, দেখি ? পরে উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিত তলেব বড়া নাজা
হচ্ছে বুঝি। তুমি জানলে কি করে—বা ?

অর্ণা উঠিয়া স্বামীর শুকনো কাপড়ের বাবুতা করিয়া দিত, বলিত, এসো না,
ওখানেই বসে বাবে, গরম গরম ভেজে দি—। অপু ব একটা ছাঁৎ করিয়া
উঠিত। ঠিক এইভাবেই কথা বলিত মা। অপু ব অদ্ভুত মনে হয়, মায়েব মত
স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকমই অশ্রুামিনী। বাদকোব কর্মজাত্র মা
যেন ইহারই নবীন হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মেয়ে-
দের দেখিবার চোখ তাহাব নতুন করিয়া ফোটে। প্রত্যেককে দেখিয়া মনে হয়,
এ কাহারও স্ত্রী, কাহারও মা, কাহারও বোন। জীবনে এই তিনকপটে
নারীকে পাইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হস্তের পবিত্রেশনে এই ছানিাশ বৎসরের
জীবন পুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কি চিনিতে বাকী আছে তাহার ?

সীমার চাডিয়া ওতনে নোকায় চড়িল। অর্ণার খুড়ুতো ভাট মুরারী উহা-
দের নামাইয়া লইতে আসিয়াছিল, সে-ও গল্প কবিত্তে কবিত্তে চলিল। অর্ণা
ঘোমটা দিয়া একপাশে সরিয়া বসিয়াছিল। হেমন্ত-অপরাক্তের স্নিগ্ধ ছায়া
বদীর বুকে নামিয়াছে, বা দিকের ভীরে সারি সারি গ্রাম, একখানা বড হাঁড়ি-
কলসী বোঝাই শুড যশাটকাটির ঘাটে বাধা।

অপু মনে একটা মুক্তির আনন্দ—আর মনেও হয় না যে জগতে শীলদের
অকিসের মত ভয়ানক স্থান আছে। তাহার সহজ আনন্দ-প্রবণ মন আবার

নাচিয়া উঠিল, চারিধারের এই জ্বালালতা, প্রসার, নদীতলের গন্ধের সঙ্গে যে নাজীর যোগ আছে।

কৌতুক দেখিবার জন্য অপর্ণাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল—ওগো কলাবো, ঘোমটা খোলো, চেয়ে ছাখো, বাপের বাড়ির ছাশ্টা চেয়ে ছাখো গো—

মুরারি হাসিমুখে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অপর্ণা লজ্জায় আরও ভুড়-সুড় হইয়া বলিল। আর পানিকটা আসিয়া মুরারি বলিল—তোমরা যাও, এইখানের হাটে যদি বড় মাছ পাওয়া যায়, জ্যাঠাইমা কিনতে বলে দিয়েছেন। এইটুকু হেঁটে যাব এখন।

মুরারি নামিয়া গেলে অপর্ণা বলিল—আচ্ছা তুমি কি? দাদার সামনে ওইবকম কবে আসায়—তোমার সেই দুটো মি এখনও গেল না? কি ভাবলে বল তো দাদা—ছিঃ। পবে রাগের সুখে বলিল—দুটো, কোথাকার, তোমার সঙ্গে আমি আর কোপাও কখনো যাবো না—কখনো না, থেকে একলা বাসায়।

—বয়েই গেল। আমি তোমাকে মাথাব দিয়া দিয়ে দেখেছিলাম কিনা? আমি নিজে মতা কবে বেঁধে দাব।

—তাই খেও। আহা হা, কি রান্না চাঁদ, তবু যদি আমি না জানতাম। অন্য ভাতে বেগুন ভাতে, সাত রকম তরকারী সব ভাতে—কি বাঁপুনী।

—নিজে দিকে চেয়ে কথা বলো। প্রথম যেদিন খুলনার ঘাটে রেঁপেছিলে, মনে আছে সব আলুনি?

—ওমা আমার কি হবে? এত বড় মিথোবন্দা তুমি, সব আলুনি। ওমা আমি কোথায়—

—সব। বিলকুল। মাঘ পটলভাঙা পর্যন্ত।

অপর্ণা বাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তুমি ভাঙন মাছ খাও নি? আমদের এনোনা গাঙের ভাঙন মাছ ভারী মিষ্টি। কাল মাকে বলে তোমায় খাওয়াব।

—লজ্জা করবে না তাব বেলায়? কি বলবে মাকে—ওমা, এই আমার—অপর্ণা স্বামীব মুখে হাত চাট দিয়া বলিল—চুপ।

ঠিক সন্ধ্যার সময় অপর্ণাদের ঘাটে নৌকা লাগিল। দুজনেবই মনে এক অপূর্ব ভাব। শ্রুতিবৈদ্য সুগন্ধ্যের দ্বিধা হেমন্ত-অপবাহু তাব সবটা কাবন নয়, নদী-তীরে সুশ্রুতি হইয়া থাকি গোলগাছেব সবুজ সাবিত্রী নয়, কারণ—তাহাদের আনন্দ প্রশ্ন অনাবিল যৌবন—বাগ্ন নবীন, আগ্রহভরা যৌবন।

কোৎলাবাত্রে উপরের ঘবে ফুলশয্যায় সেই পালকে বাতি আলিয়া বসিয়া পড়িতে পড়িতে সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় থাকে। নাটিকেশাখায় দেবীপঙ্কজ বকেব পালকেব মত শুভ্র চাঁদেব আলো পড়ে, বাহিরের রাত্রি, দিকে চাহিয়া

কত কথা মনে আসে, কত সব পুরাতন স্মৃতি—কোথায় যেন এই ধরনের সব পুরানো দিনের কত জোৎস্না-ঝরা রাত। এ যেন সব আরবা-উদ্যাসের কাহিনী, সে ছিল কোন কুঁড়ে ঘরে, পেট পুরিয়া সব দিন খাইতেও পাইত না—সে আজ এত বড় প্রাচীন জমিদার ঘরের জামাই, অথচ আশ্চর্য এই যে, এইটাই মনে হইতেছে সত্য। পুরানো দিনের জীবনটা অবাস্তব, অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়।

হেমন্তের রাত্রি। ঠাণ্ডা বেশ। কেমন একটা গন্ধ বাতাসে, অপূর্ণ মনে হয় কুন্ডাসার গন্ধ। অনেক রাত্রে অর্ণা আসে। অপূ বলে—এত রাত বে!—আমি কতক্ষণ ভেগে বসে থাকি।

অর্ণা হাসে। বলে—নীচে কাকাবাবুর শোবার ঘর। আমি সিঁড়ি দিয়ে এলে পায়ের শব্দ ওঁর কানে যায়—এই জন্য উনি ঘবে ছিল না দিলে আসতে পারি নে। ভারি লজ্জা কবে।

অপূ জানলার বডখড়িটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। অর্ণা লজ্জুক মুখে বলিল—এই শুরু হল বুঝি টুটিমি? টুটিমি কী!—কাকাবাবু এখনও ঘুমোয় নি যে!...

অপূ আবার খটাস্ করিয়া বডখড়ি খুলিয়া অপেক্ষাকৃত উদ্ভুদুরে বলিল—অর্ণা, এক মাস ভাল খানতে হুলে গেলে যে। ...ও অর্ণা—অর্ণা। অর্ণা লজ্জায় বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজাইয়া পড়িয়া গেল।

ভোর রাত্রেও দুজনে গল্প করিতেছিল।

সকালের আলো ফুটিল। অর্ণা বলিল—তোমার কটা'য় সীমা'র ৭... সারারাত তো নিড়েও ঘুমুলে না। আমাকেও ঘুমতে দিলে না—এখন বানিকটা ঘুমিয়ে থাকো—আমি অন্যদিকে পাঠিয়ে হুলে দেব'খন বেলা হ'লে। গিয়েই চিঠি দিও কিন্তু। জানালা'র পদ্ম'গুলো মোপার বাড়ি দিও—আমি না গেলে আর সাবান কে দেবে? সঙ্গেই জামীর গ'য়ে হাত গুলাইয়া বলিল—কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছ—এখন তোমাকে কাচছাড়া করতে ইচ্ছে করে না—কলকাতায় না মেলে হুপ, না মেলে কিছু। এখানে এসময় কিছুদিন থাকলে শরীরটা সারত। গোছ অকিস পেকে এসে মোহনভোগ খেও—পিক্টুর মাকে বলে এসেছি—সে-ই করে দেবে। এখন তো খরচ কমল? বেশী ভেলে পড়ানোতে কাজ নেই। যাই ত'হাল।

অপূ বলিল—ব'স ব'স—এখনও কোপ'য় তেমন ফ'সী হয়েছে, —কাকার উঠতে এখনও দেরি।

অর্ণা বলিল—হাঁ আর একটা কথা—ঢাবো, মনসাপোতার ঘরটা এবার খুঁচি দিয়ে রেখো। নইলে বর্ষার দিকে বড় খরচ পড়ে যাবে, কলকাতার বাসায় তো চিরদিন চলবে না—ওই হল আপন ঘরদোর। এবার মনসাপোতায় ফিরব, বাস না ক'লে খেড়ের ঘর টেকে না। যাই এবার, কাকা উঠবেন। যাই?

অপর্ণা চলিয়া গেলে অপূর মত খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এখনও বাড়ির কেহই উঠে নাই—কেন সে অপর্ণাকে ছাড়িয়া দিল? কেন বলিল—যাও! তাহার সম্মতি না গাইলে অপর্ণা কখনই বাত না।

কিছু অপর্ণা আর একবার আসিয়াছিল ঘন্টাখানেক পরে, চা দেওয়া হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে—অপূ তখন ঘুমাইতেছে। খোলা জানালা দিয়া মুখে রেড লাগিতেছে। অপর্ণা সন্তুর্গে জানালাচা বন্ধ করিয়া দিল। ঘুমন্ত অবস্থায় আমোকে এমন দেওয়া—এমন একটা মায়্যা হয় শুণ্ডপরে। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ভাবিল, যা সত্যিই বলে বটে, পটেব মুখ—পটে আঁকা ঠাকুর দেবতার মত মুখ—

চলিয়া আসিবার সময়ে কিছু অপূর সঙ্গে দেখা হইল না। অপূর আগ্রহ ছিল, কিছু আট্টায় কুতূহল পাবজনে বাড়ি সবগবম—কাহাকে যে বলে অপর্ণাকে একবার পাকিয়া দিতে? মুখচোরা অপূ ইচ্ছাটা কাহাকেও জানাইতে পারিল না। নৌকায় গিয়া যাবারি ছোট ভাঙ বিস্তু বলিল—আসবার সময় দিদির সঙ্গে দেখা হবে ওলেন না কেন, জানাইবাবু? দিদি সিঁড়ির ঘরে জানলাব পাবে নাড়িয়া খুঁজিল, পাপনি এখন চলে আসেন—

কিছু নৌকা তখন ভাগ্যে গানে শাইকটি দাঁকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এবার কলিকাতা যাত্রা সিয়া অনেকদিন পরে দেওয়ানপুরেব বালাবন্ধু দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমেরিকা যাত্রীতে। অবসর দেওয়া-সাক্ষাৎ না হওয়ায় কেহ কাহাও ঠিকানা জানত না। অপূর দেবব্রত এখানেই কলেজে পড়িতেছিল, এবার বিদ্যালয় পাস্ করিয়াছে। অপূর কাছে ব্যাপাবটা আশ্চর্য্য ঠেকিল অনেক হইল, হিঁসাত হইল। প্রতি শনিবারে বাড়ি না গিয়া পাবত না, সেদিন ঘর পাগল দেবব্রত আমেরিকা চলিয়া যাইতেছে।

মাস দুই-তিন বড় কটেক টিল। আত এক বছরেব অভ্যাস—আফিস হইতে বাসায় গিয়া অর্গার হানিওবা মুখ দেখিয়া কমকান্ত মন শান্ত হইত; আজকাল, এমন কত হয়। বাসায় না ফিিয়াই সোজা ছেলে পড়াইতে যায় আজকাল, বাসায় মন লাগে না, খালি খালি ঠেকে।

লীলাবা কেহ এখানে নাই। বহুদিনেব বিষয় লইয়া কি সব মামলা মকদ্দমা চলিতেছে, অনেকদিন হইতে তাহারা সেখানে।

একদিন রবিবারে সে বেলায় মঠ বেড়াইতে আসিয়া অপর্ণাকে এক লম্বা চিঠি দিল, ভাবী ভাল লাগিয়াছিল জামগাটা, অপর্ণা এখানে আসিলে একদিন বেড়াইয়া আসিবে। এসব যত্ন উত্তর অপর্ণা খুব শীঘ্রই দেখ, কিন্তু পত্রখানার কোন জবাব আসিল না—৫ দিন, চারদিন, সাতদিন হইয়া গেল। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল—কি ব্যাপার? অপর্ণা হয়ত নাই, সে মারা গিয়াছে—ঠিক তাই? রাত্রে নানা রকম স্বপ্ন দেখে—অপর্ণা ছলছল চোখে

বলিতেছে—তোমায় তো বলেছিলাম আমি বেশীদিন বাঁচব না, মনে নেই ?... সেই মনসাপোতায় একদিন রাতে ?—আমার মনে কে বলত । যাই—আবার আর ওয়ে দেখা হবে ।

পরদিন পড়িবে শনিবার । সে আফিসে গেল না, চাকুরি ব মায়া না করিয়াই সুটকেস ওছাইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এমন সময় শব্দবাদের পত্র পাইল । সকলেই ভাল আছে । যাক্—বাঁচা গেল । উঃ, কি ভয়ানক দুর্ভাবনার মক্ষ্মে ফেলিয়াছিল উহা বা । অপণাব উপর একটু অভিমানও হইল । কি কাণ্ড, মন ভাল না থাকিলে এমন সব অদ্ভুত কথাও মনে আসে । কয়দিন সে ক্রমাগত ভাবিয়াছে, 'ওগো মাঝি তরী ছেঁখা' গানটা কলিকাতায় আজকাল সবাই গায় । কি দু গানটার স্বপ্নকার সঙ্গে তার শব্দবাদের এত ভাব মিল হয় কি করিয়া ? গানটা কি তাহাব বেলান্ন খাটিয়া যাইবে ?

শনিবার অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মুবাণি তাহাব বাসায় বাববাবান্দায় চেয়ারখানাতে বসিয়া আছে । শ্যালককে দেখিয়া অপু খুব খুশী হইল—হাসিমুখে বলিল, এ কি, বাসুরে । সাক্ষাৎ বড়কুটুম যে । কাব মুখ দেখে না জানি যে আজ সকালে—

মুরারি খামে-আটা একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল—কোন কথা বলিল না । অপু পত্রখানা হাত বাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিল, মুবাণি ব মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে । সে যেন চোখের ভল চাটিতে প্রাণের চেষ্টা করিতেছে । অপু ব বকের ভেতবটা হঠাৎ যেন হিম হইয়া গেল । কেমন কবিয়া আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—অপণা নেই ?

মুরারি নিজে কে আর সামলাইতে পাবিল না ।

—কি হয়েছিল ?

—কাল সকালে, আটটার সময় প্রসব হ'ল—সাদে ন'টার সময়—

—জান ছিল ?

—আগাগোড়া । ছোট কাকীয়ার কাছে চুপি চুপি নাকি বলেছিল তেলে হওয়ার কথা তোমাকে তাব কবে জানাতে । তখন ভালই ছিল । হঠাৎ ন'টার পব থেকে—

ইহার পরে অপু অনেক সময় ভাবিয়া আশ্চর্য হইত—সে তখন স্বাভাবিক সুরে অতগুলি প্রঃ একসঙ্গে করিয়াছিল কি করিয়া । মুবাণি বাড়ি ফিরিয়া গল্প কবিয়াছিল—অপুকে কি কবে খবরটা শোনাব, সারা বেল আব স্টামাবে শুধু তাই ভেবেছিলাম—কিন্তু সেখানে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আমায় বলতে হ'ল না—ওই খবর টেনে-বার করলে ।

মুরারি চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে একবার অপু মনে হইল, নবজাত পুত্রটি বাঁচিয়া আছে, না নাই ? সে কথা তো মুরারিকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বা সেও কিছু বলে নাই । কে জানে, হয়ত নাই ।

কথাটা ক্রমে বাসার সকলেই শুনিল। পরদিন যথারীতি আফিসে গিয়াছিল, আফিস হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতেছে, উপরের ভাড়াটে বন্ধু সেন মহাশয় অপুদের ঘরের বারান্দাতে উঠিলেন। অপু বলিল—এই ঘে সেন মহাশয়, আসুন, আসুন।

সেন মহাশয় জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা চুঃসূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া টুলখানা টানিয়া লইয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

—আহা-হা, রূপে সবস্বতী গুণে লক্ষ্মী। কলের কাছে সেদিন মা আমার সাবান নিয়ে কাপড় ধুচ্ছেন, আমি সকাল সকাল ঘান করব বলে ওপরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি। বললাম—কে বৌমা? তা মা আমার একটু হাসিলে—বলি তা থাক, মায়ের কাপড় কাচা হয়ে থাক। ঘানটা না হয় ন'টার পরেই কথা দাবে এখন—একদিন ইলিশ মাছের দইমাছ রেংগেছেন, আমি তা বাটি কে বে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আহা কি রকম কথা, কি লক্ষ্মীশ্রী,—সবই শীহদিব হচ্ছে। সবই তাঁব—

তিনি উঠিয়া বাইবার পর আসিলেন গাঙ্গুলী-গৃহিণী। বয়সে প্রবীণা হইলেও ইনি কখনও অপু বসে সাম্মাৎভাবে কথাবার্তা বলেন নাই। আধ-ঘোমটা দিয়া ঘন দোবের আড়াল হইতে বলিতে লাগিলেন—আহা, ডলজ্যাক্ত বেটা, এমন হবে তা তো কখনও জানি নি, ভাবি নি—কাল আমার আমার বড় ছেলে নবীন বলছে বাত্তিবে, যে, মা শুনেছ এটরকম, অপূর্ববাবু স্বীকারী গিয়াছেন এই মাওব খবর এল—তা বাবা বিশ্বাস করি নি। আজ সকালে আবার বাটুল বললে—তা বলি, খাই জেনে আসি—আসব কি বাবা, দুই ছেলের আফিসে গাত, বাটুলের আজকাল আবার দমদমার গুলীয়ার কারখানায় কাজ, হুগো নাকে-মুখে গুজেই দৌড়ায়, এখন আড়াই টাকা হস্তা, সাহেব বলেছে বোশেখ ম'স থেকে দেড় টাকা বাড়িয়ে দেবে। ওই এক ছেলে রেখে ওব মা মাঝা যায়, সেই থেকে আমারই কাছে—আহা তা ভেবো না বাবা—সবাই ও কফি আছে,—তুমি পুরুষ মানুষ তোমার ভাবনা কি বাবা? বলে—

বজায় থাকুক চুডো-বাঁশী

মিলবে কত সেবাদাসী—

—একটা চেঁচে দশটা বায়ে ক'ন না কেন?—তোমার বয়েসটাই বা কি এমন—অপু ভাবিল—এবা লোক ভাল তাই এসে এসে বলছে। কিন্তু আমার কেন একটু একা থাকতে দেয় না? কেউ না আসে ঘরে সেই আমার ভাল। এরা কি বুঝবে?

সন্ধ্যা হইয়া গেল। বারান্দায় যে কোণে ফুলের টব সাজানো, দু-একটা মশা সেখানে বিন বিন করিতেছে। অন্যদিন সে সেই সময়ে আলো জ্বালে, স্টোভ জালিয়া চা ও হালুয়া করে, আজ অন্ধকারের মধ্যে বারান্দার চেয়ার খানাভে বসিয়াই রছিল একমনে। সে কি একটা ভাবিতেছিল—গভীরভাবে

‘ভাবিতেছিল।

‘ঘরের মধ্যে দেশলাই জ্বালার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—মুহূর্তের জন্য মনে হইল যেন অপর্ণা আছে। এখানে থাকিলে এই সময় সে স্টোভ ধরাইত, সন্ধ্যা দিত। ডাকিয়া বলিল—কে ? পিটু আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু—মা আপনাদের কেরোসিনের তেলের বোতলটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে—

অপু বিশ্বাসের সুরে বলিল—ঘরে কে বে পিটু ? তোর মা ?...ও। বৌ-ঠাকরুণ ?—বালিতে বালিতে সে উঠিয়া দেবিল পিটুর মা ঘরের মেঝেতে স্টোভ মুছিতেছে।

—বৌ-ঠাকরুণ, তা’ আপনি আবার ক’ট ক’বে কেন মিথো—আমিই বরং ওটা—

তেলেব বোতলটা দিয়া সে আবার আসিয়া বারান্দাতে বসিল। পিটুর মা স্টোভ জালিয়া চা ও খাবার তৈরী করিয়া পিটুর হাতে পাঠাইয়া দিল ও রাত্রি নয়টার পূর্ব নিজেব ঘর হইতে ভাত বাড়িয়া আনিয়া খা’দেব ঘরের মেঝেতে খাইবার ঠাঁই করিয়া ভাতে থালা ঢাকা দিয়া বাগিয়া গেল। পিটুর বাবা মাগিয়া উঠিয়াছেন, তবে এখনও বড় ঢুল, লাঠি দিয়া সকালে বিকালে একটু-আদটু গোলদাঁঘিতে বেড়াইতে যান, নিজে একঘর ভাড়াটে উঠিয়া খাওয়াতে সেই ঘবেই আডকা’ল ইহাশা দ’কেন। ডাকাব বলয়াছে, আর আসনানেকের মধ্যে দেশে যো’ চ’লবে। প’দিন সকালেও পিটুর মা ভাত দিয়া গেল। বৈকালে খ’দিস হইতে আসিয়া কাপড় ছা’মা না ছা’য়াই বাহিরে বারান্দাতে বসিয়াছে। বউটি স্টোভ ধরাইতে আসিল।

অপু উঠিয়া গিয়া বলিল—রোজ রোজ আপনাকে এক কষ্ট করতে হবে না, বৌদি। আমি এই গোলদাঁঘির ধারের দোকান থেকে খেয়ে আসব চা।

বউটি বলিল—আপনি যত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ঠাকরুণে, আমার আর কি কষ্ট ? টুলটা নিয়ে এসে এখানে বসুন, দেখুন চা তৈরী করি।

এই প্রথম পিটুর মা তাহার সহিত কথা ক’হল। পিটু, বলিল—কাক’বাবু, আমাকে গোলদাঁঘিতে বেড়া’তে নিয়ে যাবেন ? একটা ফুলের চা’বা টুলে আন’ব, এনে পু’তে দেব।

বউটির বয়স ত্রিশের মধ্যে, পাত’লা একহারা গ’ডন, জামব’, মাঝামাঝি দেখিতে, খুব ভালও নয়, মন্দও নয়। অপু টুলটা টুলারের কাছে টানিয়া বসিল। বউটি চায়েব ডল নামাইয়া বলিল—এক কাছ করি ঠাকরুণে, একেবারে চাট্রি ময়দা মেখে আপনাকে খানকতক লুচি ভেজে দি—ক’পানাত বা খান—একেবারে রাতের খাবারটা এষ্ট সঙ্গেই খাইয়ে দি—সারাদিন ক্ষিদেও তো পেয়েছে।

মেয়েটির নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে তাহার নিজের সঙ্কোচ ক্রমে চলিয়া যাইতে-ছিল। সে বলিল—বেশ ! করুন যন্দ কি। ওরে পিটু, ওই পেয়ালাটা

নিম্নে আর—

—থাক, থাক ঠাকুরপো, আমি ওকে আলাদা দিচ্ছি। কেটলিতে এখনও চা আছে—আপনি খান। আপনাদের বেলুনটা কোথায় ঠাকুরপো?

—সত্যি আপনি বড় কট করছেন, বৌ-ঠাকুরণ—আপনাকে—এত কষ্ট দেওয়াটা—

পিট্টে ব মা বলিল—আপনি বাববার ও-রকম বলছেন কেন? আপনারা আমার যা উপকার করেছেন, তা নিজের আত্মীয়ও করে না আজকাল। কে পরকে পাকবার জন্যে খব চেড়ে দেয়? কিন্তু আমার সে বলবার মুখ তো দিলেন না পগবান, কি কবি বলুন। আমি কুগাঁ সামলে মেন্নেকে যদি খাওয়াতে না পারি, তাহা সে ওবেলা আপনি খেন্নে অফিসে গেলেই পিট্টুকে নিয়ে গিয়ে ঢেকে এনে আপনার পাতে খাওয়াত। এক একদিন—

কপা শেষ না কম্বাই পিট্টে ব মা হঠাৎ চুপ করিল। অপূর মনে হইল ইহার সঙ্গে অপূর কপা কহিয়া দুখ আছে, এ বুঝিবে অন্য কেহ বুঝিবে না। সাশাদিন অপূর কাজকর্মে খুলিয়া থাকিতে প্রাণের চেষ্টা কবে, যখনই একটু মনে আসে তিনি একটা কিছু কাজ দিয়া সেটাকে চাপা দেয়। আগে সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া কি ভাবিত, খাতাপত্রে গল্প কবিতা লিখিত—কাজ নাকি দিয়া অন্য বই পড়িত। কিন্তু অপূরার মৃত্যুর পর হইতে সে দশম খাতাপত্র লাগিল, সকলের কাছে কাজের তাগাদা কবিতা, সাবা-দিলেন কাজ পিট্টে ব মা কম্বাই গেলে, তাহাব লেখা চিঠি টাইপ কবিতা করিতে কোন বিশ্রাম হইয়া উঠিল।

পূর্ণিমা পূর্ণিমা। অশ্রু চাদের আলিসার পাশে দাঁড়াইয়া, এই তো গত কোভাগণী পূর্ণিমা পাত্রিতে লম্বাব মত মহিমময়ী, কি সুন্দর ডাগব চোখ দুটি কি সুন্দর মুখশী। অপূর মনে হইয়াছিল, ওব ঘাড ফেরাবান ভাস্কটা যেন বানীর মত এক এক সময় সময় আসে মনে। অপূর হাসিয়া বলে—আমাব পেলজা কবে, নটিলে সকলে তোমাব খাবাব কবে দিতে ইচ্ছে কবে, আমাব ছোট বোন নুচি ভাঙতে জানে না—সেজ খুড়ীমা ছেলে সামলে সময় পান না—মা—থাকেন ভাড়াশে, তোমাব খাবাব কষ্ট হয়—না? হঠাৎ অপূর মনে হয়—বড় ভাঙ—কি লিখে যাচ্ছি মিছে—কি হবে আব এসবে?

কি বিবাহ অন্যথা—কি যেন এক বিবাহ কতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আব কখনও ওহা ন হইবার নহে—কখনও না, কাহারও দ্বারা না—সমুখে রক্ত নই, লতা নাই, ফুলগুলি নাই—শুধু এক কুক্ক, ধূসর বালুকাময় বহু-বিশ্রাম মরুভূমি।

মাসখানেক পরে পিট্টে ব মা বলিল—কখনো ভাই দেখি নি ঠাকুরপো। আপনাকে সেই ভাইয়েব মত পেলুম, কিন্তু করতে পাবলাম না কিছু—দিদি বলে যদি মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যান—তবে জানব সত্যিই আমি ভাই পেয়েছি।

অপু সংসারের বহু দ্রব্য পিষ্টকুদের জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল—ডালা, কুলো, শামা, ঝটি, চাকী, বেলুন। পিষ্টকুর মা কিছুতেই সে সব লইতে বাজী নহ—অপু বলল, কি হবে বৌদি, সংসাৰ তো উঠে গেল, ওসব আর হবে কি, অন্য কাউকে বিলিয়ে দেওয়াব চেয়ে আপনারা নিয়ে যান, আমার মনে হুঁপ্তি হবে তবুও।

মৃত্যুর পূর্বে কি হয় কেহই বলিতে পারে না?—একজনকে জিজ্ঞাসাও করিল—ওসব কথা ভাবিয়া তো তাহাদের ধুম নাই। মেসে বরদাবাপুর উপর তাহাব প্রহা ছিল, তাহার কাছেও একদিন কথাটা পড়িল। বরদাবাপু তাহাকে মামুলি সাধুনার কথা বলিয়া কতটা সম্মান করিলেন। একদিন পল ও ভাজিনিয়ার গল্প পড়িতে পড়িতে দেখিল মৃত্যুর পূর্বে ভাজিনিয়া প্রণয়ী পলকে দেবী দিয়াছিল—হতাশ মন এইটুকু সূত্রকেই বাগ্র গ্রহণে আকড়াইয়া ধরিতে বাস্তব হইয়া উঠিল। তবুও তো এতটুকু আলো—সে আকিসে, মেসে, বাসায় যে সব লোকেব সঙ্গে কাংবার কবে—তাহার নিতান্ত মামুলি দাবনের সাংসারিক জীব—অপু প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা আড়ালে হ'সে, চোখ চোঁচাটাই কবে—কণ্ঠস্বর হা'স হাসে। এইটাই অপু বরদাস্ত করিতে পাবে না আদে। এক দল একজন সন্ন্যাসীর সন্ধান পাইয়া দশমাহটাও এক গলিতে তাহাব কাছে সকালের দিকে গেল লোকের খুব ভাঙ, কেহ দশনপ্রার্থী কেহ ওষধ লইতে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পূর্বে অপু ডাক খাটল। সন্ন্যাসী গেরুয়াধারী নহেন, সাদা পুতি পর্বত, গয়ে হাত কাটা বেঁধে ন্যান, চল-চৌকিব উপর আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। অপু প্রশ্ন শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—আপনার স্বামী কতদিন মাঝে মাঝে গেছেন? মাস দুই?—তাঁর পুনঃ, হয়ে গিয়েছে।—অপু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করে আপনি—মানে—

সন্ন্যাসী বলিলেন—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়। এতদিন থাকে না—আমাকে বলে দিচ্ছি, বিশ্বাস করতে হয় এসব কথা। ইংরিজি পড়ে আপনারা তো এসব মানে ন। তাই হতে হবে।

অপু একথা আদে বিশ্বাস হইল না। অপর্যাপ্ত তাহার আর মাস আট-নয় পরে অন্য দেশে কোন গৃহস্থের ঘরে সব জুলিয়া ছোট পুকী হইয়া ফুটবে? ...এত ঘেহ, এত প্রেম, এত মমতা—এসব জুলিয়া যি? অসম্ভব। ...সারারাত্তি কিছু এই চিন্তায় সে ছটফট করিতে লাগিত—একবার ভাবে, হয়ত সন্ন্যাসী ঠিকই বলিয়াছেন—কিন্তু তার মন সত্য দেয় না, মন বলে, ও-কথাই নহ—বিখ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা...দুঃখ পিতামহ ত্রুজা আসিয়া বলিলেও সে-কথা বিশ্বাস করিবে না। ওষেধ মথো হাসিও পাইল।—ভাবিল অপু পুণর্জন্ম হয়ে গেছে, ওর কাছে টেলিগ্রাম এসেছে। হাম্বাগ কোথাকার—জাণ না কাণ।...

এত ভয়ানক সঙ্গীহীনতার ভাব গভীর দশ এগারো মাস তাহার হয় বীহী।

পিটুরা চলিয়া যাওয়ার পর বাসাও ভাল লাগে না, অপর্ণার সঙ্গে বাসাটা এতখানি জড়ানো যে, আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তত্পরি বিপদ, গাঙ্গুলী-গিন্নী তাহার কোন বোনঝির সঙ্গে তাহার বিবাহের যোগা-যোগের জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহাকে একা একটু বসিতে দেখিলে সংসারের অসারত্ব, কপিত বোনঝিটির রূপগুণ, সম্মুখের মাঘ মাসে মেয়েটিকে একবার দেখিয়া আসিবার প্রস্তাব, নানা বাঞ্ছা কথা।

নিচে রাঁদিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা—অবশ্য ইতিপূর্বে সে বরাবরই রাঁদিয়া খাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এবার যেন রাঁদিতে গিয়া কাহার উপর একটা দ্বিতীয় অভিমান। ঘরটাও বড় নির্জন, রাত্রিতে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। পাষণ্ডভারের মত দারুণ নির্জনতা সব সময় বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। এমন কি, শুধু ঘরে নয়, পথে-ঘাটে, অফিসেও তাই—মনে হয় জগতে কেহ কোথাও গাফিলত নাই।

তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঠিকানা নাই—প্রণবও নাই এখানে। মুখের আলাপী ছ'চাবজন বন্ধু আছে বটে কিন্তু ও-সব বে-দবদী লোকেব সঙ্গে ভাল লাগে না। রবিবার ও ছুটির দিনগুলি তো আর কাটেন না—অপুর মনে পড়ে বৎসরখানেক পূর্বেও শনিবারের প্রত্যাশায় সে-সব গ্রাহহভরা দিন গণনা—থার আজকাল? শনিবার যত নিকটে আসে তত ওয় বাড়ি।

বোঝারের এক গলির মধ্যে তাহার এক কলেজ বন্ধুর পেটেন্ট ঔষধের দোকান। অপর্ণার কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া বসে। এ রবিবার দিনটাও বেড়াইতে গেল। কারবারের অবস্থা খুব ভাল নয়। বন্ধুটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও, তুমি?—আমার আজকাল হয়েছে ভাই—‘কে আসিল বলে চমকিয়ে চাই, কাননে থাকিলে পাখি’ সকাল থেকে হরদম পাওনাদার আসছে আর যাচ্ছে—আমি বলি বুঝি কোন পাওনাদার এল ব'স ব'স।

অপু বসিয়া বলিল—কাবুলার টাকাটা শোধ দিয়েছ?

—কোথা থেকে দেব দাদা? সে এলেই পালাই, নয় তো মিথ্যা কথা বলি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের দেনার দরুন—ছোট আদালতে নালিশ করেছিল, পরশু এসে বাজাপত্র আদালতের বেলিফ সীল করে গিয়েছে। তোমার কাছে বলতে কি, এবেলায় বাজার খরচটা পর্যন্ত নেই—তার ওপর ভাই বাড়িতে সুখ নেই। আমি চাই একটু ঝগড়াঝাটি হোক, মান-অভিমান হোক—তা নয়, বোঁটা হয়েছে এমন ভাল মানুষ সাত চড়ে রা নেই—

অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বল কি হে, সে তোমার ভাল লাগে না বুঝি?...

—রামো:—পান্সে লাগে, ঘোর পান্সে। আমি চাই একটু হুঙ্কু হবে, একগুয়ে হবে—স্মার্ট হবে—তা নয় এত ভাল মানুষ, যা বলছি তাই করছে—

সংসারের এই কষ্ট হয়তো একবেলা খাওয়াই হ'ল না—যুখে কথাটি নেই। কাপড় নেই—তাই সহি, পাইনে বললে তক্ষি ডাইনে, বায়ে বললে বায়ে—নাঃ অসহ্য হয়ে পড়েছে।—বৈচিত্র্য নেই বে ভাই। পাশের বাসায় ষোটা সেদিন কেমন স্বামীব উপব রাগ ক'বে কাচের প্লাস, হাতবান্স দুন্দাম্ ক'রে আছাড় মেবে ভাঙলে, দেখে হিংসে হল, ভাবলাম হাস্য পে, আর আমায় কি কপাল। না, হাসি না—আমি তোমাকে সত্যি সত্যি প্রাণের কথা বলছি ভাই—একম পান্সে ঘবকরা আর আমাব চলছে না—বিলিভ্ মি—এসমুখ ১০০ ভালমানুষ নিয়ে ধুয়ে ধাব ? একটা দুফু মেয়েব সন্ধান দিতে পার ১০০

—কেন অবাব বিয়ে কাবে না কি ?—একটাকে পার না বেতে দিতে—তোমার দেখছি দুখে থাকতে খুতে কিলোয়—

—না ভাই, দুখ আমাব আর—দীবনটা এখন দেখছি একেবারে বার্থ হ'ল, মনো কোনও সাপ মিটল না—এক এক সময় ভাবি ওং সাজ আমাব ঠিক মিলন হয় নি—মিলন যদি ঘটে তাহলে দ্বন্দ্বও হত—বুঝলে না ১০০ কে, টেঁপি ?—এই আমাব বড় মেয়ে—শে'ন, তোমার কাছ থেকে দুটো পয়সা দিয়ে দু'পয়সার বেগুনি কিনে নিয়ে আয় তো আমাদের জন্যে, আর অমনি চান্সেব কথা বলে দে—

—আচ্ছা ম'নো পর মানুষ কোপায় যাব জান ? বলতে পার ?

—ও সব বাপাব নিয়ে মাথা ঘামাই নি কখনও। পাওনাটার কি কবে তাড়ানো যায় বলতে পার ? এগুনি কাব্‌সিওয়ালা একটা আসবে নেবুতলা থেকে। মাঠাবো টাকা পাও নিয়েছি, চাব ঠানা টাকা কিছু সুদ হওয়ায়। ৩-হপ্তাব সুদ বাকী, কি যে অ'জ তাকে বলি ? মাট্টেগু লটা এল বলে—দিতে পার দুটো টাকা ভাই ?

—এখন তো নেই ক'ছে, একটা আছে বেখে দাও। কাল সকালে আর একটা টাকা দিনে যাব এখন। এই যে টেঁপি, বেশ বেগুনি এনেচিস—না না, আমি সব না, তোমরা প'ও, আচ্ছা এই এই একখানা তুলে নিলাম, নিয়ে যা টেঁপি।

বন্ধুব দোকান হটতে বাহির হইয়া সে ঋণিকটা লক্ষহীনভাবে ঘুরিল। লীলা এখানে আছে ? একবার দেখিয়া আসিবে ? প্রায় একবৎসর লীলাও এখানে নাই, তাহার দাদামশায় মামলা করিয়া লীলাব পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু উদ্ধার করিয়াছেন, আত্মকাল লীলা ম'য়েব সঙ্গে আবার বর্ষগানের বাড়িতেই কিবিয়া গিয়াছে। খাউ ইয়াং ভর্তি হইয়া একবৎসর পড়িয়াছিল—পরীক্ষা দেয় নাই, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

সন্ধান কিছু পূর্বে ভবানীপুরে লীলাদের ওখানে গেল। রামলগন বেয়াবা তাহ'কে চেনে, বৈঠকখানায় বসাইল; মিঃ লাহিড়ী এখানে নাই, রাঁচি গিয়াছেন। লীলা দিদিমণি ? কেন, সে-কথা কিছু বাবুর জানা নাই ? দ্বিদিমণির তো বিবাহ হইয়া গিয়াছে গত বৈশাখ মাসে। বাগপুরে জামাইবাবু

বন্ধু হইলিয়ার, বিলাতকের—একবারে বাঁটি বাঁধে, কেবিলে চিমিবার লো
বাই। খুব বড় লোকের ছেলে—এদের সমান বড় লোক। কেন বাবুর কাছে
নিবন্ধনের চিঠি যায় নাই?

অপু বিবর্ণরূখে বলিল—কই না, আমার কাছে, হ্যাঁ—না আর বস'ব না—
আচ্ছা।

বাহিরে আসিয়া জগৎটা যেন অপূর কাছে একেবারে নির্জন, সঙ্গীহীন, বিষাদ
ও বৈচিত্র্যহীন ঠেকিল। কেন এরকম মনে হইতেছে তাহার? লীলা বিবাহ
করিবে ইহার মধ্যে অসম্ভব তো কিছু নাই? সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে তাহাতে
মন খারাপ করিবার কি আছে? ভালই তো। জামাই ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত,
অবস্থাপন্ন—লীলার উপযুক্ত বর জুটিয়াছে, ভালোই তো।

‘রাস্তা ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের মাঠটাতে অর্ধ অন্ধকারের
মধ্যে সে উদ্ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল।

লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভাল কথা। ভালই তো।

অপরাজিত

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা আর ভাল লাগে না, কিছুতেই না—এখানকার ধরাবাঁধা রুটিন-
মাসিক কাজ, বন্ধতা, একঘেয়েমি—এ যেন অপূর অসহ্য হইয়া উঠিল। তা
ছাড়া একটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে ক্রমেই
গড়িয়া উঠিতেছিল—কলিকাতা ছাড়িলেই যেন সর্ব দুঃখ দূর হইবে—মনের
শান্তি আমার ফিরিয়া পাওয়া যাইবে!

শীলেন্দর আফিসের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে সে চাঁদনীর কাছে একটা
গ্রাম্য স্কুলে মাস্টারি লইয়া গেল। জায়গাটা না-শহর, না-পাভার্গা গোছের—
চারিধারে পাটের কল ও কুলিবস্তি, টিনের চালাগুলা দোকানঘর ও বাজার,
কল্লার গুড়োফেলা রাস্তার কালো ধূলা ও ধোঁয়া, শহরের পারিপাট্যও নাই,
পাভার্গার সহঃ শ্রীও নাই।

বড়দিনের ছুটিতে প্রণব ঢাকা হইতে কলিকাতার অপূর সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আসিল। সে জানিত অপু আজকাল কলিকাতার থাকে না—মজার
কিছু আগে সে গিয়া চাঁপদানী পৌছিল।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অপূর বাসাও বাহির করিল। বাজারের একপাশে একটা
ছোট ঘর—তার অর্ধেকটা একটা ডাক্তারখানা, স্থানীয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার
সকালে বিকালে রোগী দেখেন। বাকী অর্ধেকটাতে অপূর একখানা তক্তাপোশ,
একটা আধময়লা বিছানা, খানকতক বই, একটা বাঁশের আলনাত খানকতক
কাপড় বুলানো। তক্তাপোশের নীচে অপূর ফিলের তোয়কটা।

অপু বলিল—এসো এসো, এখানকার ঠিকানা কি ক’রে জানলে?

—সে কথার দরকার নেই। তারপর কলিকাতা ছেড়ে এখানে কি মনে ক’রে?

—বাস্! এখন আরগার মানুষ থাকে?

—খারাপ জায়গায় কি দেখলি ? তা হ্যাঁ কলকাতার বেব আর ভবন সাদে
না—দিনকতক এখন হ'ল যে, বাইরে যেখানে হয় বাব, সেই সময় এখান-
কার বাস্তুরি জুটে গেল, তাই এখানে এলুম। দাঁড়া, ভোর চারের কথা বলে
আসি—।

পাশেই একটা বাঁকুড়ানিবাসী বাহনের ডেলেভাজা পরোটার দোকান। রাতে
তাহারই দোকানে অতি অপকৃষ্ট খাত্ত কলহ-খরা পিভলের থালায় আনীত
হইতে দেখিয়া প্রশ্ন অবাক হইয়া গেল—অপুর কুচি অভ্যাস্ত: যাজিত ছিল
চিরদিন, হয়ত তাহা সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু অযাজিত ছিল না।
সেই অপূর এ কি অবনতি ! এ-রকম একদিন নয়, রোজই রাতে নাকি এই
ডেলেভাজা পরোটাই অপূর প্রাণ খারণের একমাত্র উপায়। এত অপরিহার্য
তো সে অপূরকে কস্মিন্ কালে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।

কিন্তু প্রশ্নবের সবচেয়ে বৃকে বাজিল যখন 'পরদিন বৈকালে অপূ তাহাকে সঙ্গে
লইয়া গিয়া পাশের এক স্মাক্রা দোকানে নীচ শ্রেণীর তাসের আড্ডায় অতি
ইতর ও স্থল ধরনের হ্যাগ-পরিহাসের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা খরিয়া মহা-
নন্দে তাস খেলিতে লাগিল।

অপুর ঘরটাতে ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন বলিল—কাল আমার সঙ্গে চল অপূ
—এখানে তোকে থাকতে হবে না—এখান থেকে চল।

অপূ বিশ্বস্তের সুরে বলিল—কেন রে, কি খারাপ দেখলি এখানে ? বেশ
জায়গা তো, বেশ লোক সবাই। ওই যে দেখলি বিশ্বস্তর স্বর্ণকার—উনি
এদিকের একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক, ওঁর বাড়ি দেখিস নি ? গোলা কত !
মেয়ের বিয়েতে আমার নেমস্তন্ন করেছিল, কি বাঙালানোটা বাঙালেন—
উঃ। পরে খুশীর সহিত বলিল—এখানে ওঁরা সব বলছেন আমার ধানের জমি
দিয়ে ঋণ করাবেন—নিকটেই বেগমপুরে ওঁদের—বেশ জায়গা—কাল
তোকে দেখাব চল—ওঁরাই ঘরদোর বেঁধে দেবেন বলেছেন—আপাতত মাটির,
বানে বিচুলির ছাটনি, এদেশে উলুখড় হয় না কিনা !

প্রশ্ন সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য খুব পৌড়াপৌড়ি করিল—অপূ তর্ক করিল,
নিজের অবস্থার প্রাধান্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে নানা যুক্তির অবতারণা
করিল, শেষে রাগ করিল, বিরক্ত হইল—যাহা সে কখনও হয় না। প্রকৃতিতে
তাহার রাগ বা বিরক্তি ছিল না কখনও। অবশেষে প্রশ্ন বিরূপায় অবস্থার
পরদিন সকালের ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

যাইবার সময় তাহার মনে হইল, সে অপূ যেন আর নেই প্রাণশক্তির
প্রাচুর্য একদিন বাহার মধ্যে উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, আর সে যেন
প্রাণহীন নিস্তম্ভ। এমনতর স্থল ভক্তি বা সন্তোষ-বোধ, এ ধরনের ভাবের
আঁকড়াইয়া খরবার কাঙ্ক্ষালপনা কই অপূর প্রকৃতিতে তো ছিল না
কখনও ?

কুন হইতে কিরিয়া রোজ অপু বিজের ঘরের দেয়াকে একটা হাডলার
চেনার পাড়িয়া বসিয়া থাকে। এখানে সে অভ্যস্ত একা ও সঙ্গীহীন মনে
করে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা। সেটা এত অসহনীয় হইয়া উঠে, কোথাও
একটু বসিয়া গল্প ওজব করিতে ভাল লাগে, যাহুয়ের সঙ্গ স্পৃহবীর মনে
হয়, কিন্তু এখানে অধিকাংশই পাটকলের সদর, বাবু, বাজারের দোকানদার,
তাও সবাই তাহার অপরিচিত। বিত্ত সাক্ষার দোকানের সান্না আড্ডা
সে নিজে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তবুও বটা-দশটা পর্যন্ত রাত একরকম
কাটে ভালই।

অপুর ঘরের রোয়াকটার সামনেই মাটিন কোম্পানীর ছোট লাইন, সেটা
পার হইয়া একটা পুকুর, জল যেমন অপরিষ্কার, তেমন বিষাদ।
পুকুরের ওপারে একটা কুলিবস্তি, দু'বেলা যত ময়লা কাপড় সবাই এই
পুকুরেই কাচিতে নামে। রোজ উঠিলেই কুলি লাইনের ছাপ-মারা বয়েদী
রংয়ের বারো-হাতী শাড়ি পুকুরের ও-পারের ঘাসের উপর রৌদ্রে বেলানো
অপুর রোয়াক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কুলিবস্তির ও-পাশে গোটা-
কতক বাদাম গাছ, একটা ইটখোলা, খানিকটা ধানক্ষেত, একটা গাঁটবন্দী
কল। এক একদিন রাত্রে ইটের পাঁজার ফাটলে রাঙা ও বেগুনী আলো অলে,
যাঝে যাঝে নিভিয়া যায়, আবার অলে, অপু নিজের রোয়াকে বসিয়া বসিয়া
মনোযোগের সঙ্গে দেখে। রাত দশটায় মাটিন লাইনের একখানা গাড়ি
হাওড়ার দিক হইতে আসে—অপুর রোয়াক ঘেঁষিয়া যায়—পৌটলা-পুঁটলি,
লোকজন, মেয়েরা—পাশেই স্টেশনে গিয়া থামে, একটু পরেই বাঁকুডাবাসী
ব্রাহ্মণটি তেলেছাড়া পরোটা ও তরকাবী আনিয়া হাজির করে, খাওয়া শেষ
করিয়া শুইতে অপূর প্রায় এগারোটা বাজে। দিনের পর দিন একই ক্রটিন।
বৈচিত্র্যও নাই, বদলও নাই।

অপু কাহারো সহিত গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে যায় যে, কোন
মতলব আঁটিয়া তাহা নহে, ইহা সে যখনই করে, তখনই সে করে নিজের
অজান্তারে—নিঃসঙ্গতা দূর করিবার অচেতন আগ্রহে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা
কাটিতে চায় না সব সময়! যাইবার মত জায়গা নাই, করিবার কত কাজও
নাই চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না। ছুটির দিনগুলি তো অসম্ভব-রূপ
দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

নিকটেই ব্রাঞ্চ পোস্টঅফিস। অপু রোজ বৈকালে ছুটির পরে সেখানে গিয়া
বসিয়া প্রতিদিনের ডাক অতি আগ্রহের সহিত দেখে। ঠিক বৈকাল
পাঁচটার সময় :সাব্-অফিসের পিণ্ডন চিঠিপত্র-ভরা সীল-করা ডাক-ব্যাগটি
ঘাড়ে করিয়া আনিয়া হাজির করে, সীল ভাঙিয়া বড় কাঁচি দিয়া সেটার
মুখের বাঁধন কাটা হয়। এক একদিন অপুই বলে—ব্যাগটা খুলি
চরণবাবু?

চরণবাবু বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুলুন না, আমি ততক্ষণ ইস্টাম্পের হিসেবটা

বিলিয়ে কেনি—এই বিশ্ব কাঁচি ।

পোস্টকার্ড, খাম, খবরের কাগজ, পুস্তিকা, বহি-অর্ডার । চরণবাবু বলেন—
বহি-অর্ডার সাতখানা? দেখেছেন কান্ডটা বশাই, এদিকে টাকা দেই
বোটে । চৌচালটা দেখুন না একবার দরজা ক'রে—সাতাল টাকা ন' আনা?
তবেই হয়েছে—রইল পড়ে, আবি তো আর ইঞ্জির গরবা বন্ধক দিয়ে টাকা
এনে বহি-অর্ডার ভাবিল করতে পারি না বশাই? এদিকে ক্যাশ বৃকে
নেওয়া চাই বাবুদের রোজ রোজ—

প্রতিদিন বৈকালে পোস্ট মাস্টারের টহলদারী করা অপূর কাছে অত্যন্ত
আনন্দদায়ক কাজ । সাগ্রহে ফুলের ছুটির পর পোস্টাফিসে ঘোড়াবো চাই-ই
তাহার । তাহার সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু খামের চিঠিগুলি । প্রতিদিনের
ডাকে বিস্তর খামের চিঠি আসে—বানাদিরনের খাম, সাদা, গোলাপী,
সবুজ । চিঠি-প্রাপ্তিটা চিরদিনই জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা বলিয়া চিরদিনই
চিঠির, বিশেষ করিয়া খামের চিঠির প্রতি তাহার কেমন একটা বিচিত্র আক-
র্ষণ । যথো হু' বৎসর অপর্ণা সে পিপাসা মিটাইয়াছিল—এক একখানা খাম বা
তাহার উপরের লেখাটা এতটা হুবহু সে রকম, যে প্রথমটা হঠাৎ মনে হয় বৃষ্টি
বা সেই-ই চিঠি দিয়াছে । একদিন শ্রীগোপাল মলিক লেনের বাসার এই রকম
খামের চিঠি তাহারও কত আসিত ।

তাহার নিজের চিঠি কোনদিন থাকে না, সে জানে তাহা কোথাও হইতে
আসিবার সম্ভাবনা নাই—কিন্তু শুধু বানা ধরনের চিঠির বাহ্যদৃশ্যের মোহটাই
তাহার কাছে অত্যন্ত প্রবল ।

একদিন তাহার একখানি মালিকশূন্য সাক্ষিমশূন্য পোস্টকার্ডের চিঠি ডেড-
লোটার অফিস হইতে খুরিয়া গার। অঙ্গে ভর বৈজ্ঞবের বড় বহু ডাক বোঝারের
ছাপ লইয়া এখানে আসিয়া পড়িল । বহু সন্ধান করিয়াও তাহার মালিক
জুটিল না । সেখান। রোজ এ-গ্রাম ও-গ্রাম হইতে খুরিয়া আসে—পিওন
কৈফিয়ৎ দেয়, এ নামে কোন লোকই নাই এ অঞ্চলে । ক্রমে—চিঠিখানা
অবাহৃত অবস্থায় এখানে-ওখানে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল—একদিন
ঘরবাঁট দিবার সময় জমালের সঙ্গে কে সামনের বাঠের খামের ফেলিয়া দিয়া-
ছিল, অপু কৌতুহলের সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল—

প্রীতরশকবলেশু,

দেখদাদা, আজ অনেকদিন বাবু আপনি আশাঘের নিকট কোন পত্রাধি
দেন না এবং আপনি কোথায় আছেন, কি ঠিকানা বা জানিতে পারার
আপনাকেও আমরা পত্র লিখি নাই । আপনার আগের ঠিকানাতেই এ
পত্রখানা দিলাম, আশা করি উত্তর দিতে ছুলাবেন না । আপনি কেন আশাঘের
নিকট পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝিতে সক্ষম হয় নাই ।
আপনি যোধ হয় আশাঘের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা না হইলে আপনি

আমাদের এখানে না আনিলেও একবার। পত্র দিতে পারেন। এতদ্বিধ আপনার ঘর না জানিতে পারিরা কি ভাবে দিন বাপন করিতেছি তাহা বাহ্য পত্রে লিখিলে কি বিশ্বাস করিবেন, মেজদাদা? আমাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে? সে যা হোক, বেক্রপ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেইরূপ ফল! আপনাকে বুঝা দোষ দিব না। আশা করি আপনি অসন্তোষ হইবেন না। যদি অপরাধ হইয়া থাকে, ছোট বোন বলিরা ক্ষমা করিবেন। আপনার শরীর কেমন আছে, আপনি আমার সতর্কতা প্রণয় জানিবেন, খুব আশা করি পত্রের উত্তর পাইব। আপনার পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি—

সেবিকা

কুসুমলতা বসু

কাঁচা মেয়েলি হাতের লেখা, লেখার অপটুত্ব ও বানান-ভুলে ভরা। সহোদর বোনের চিঠি নয়, কারণ পত্রখানা লেখা হইতেছে জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামের কোন লোককে। এত আগ্রহপূর্ণ, আবেগভরা পত্রখানার শেষকালে এই গতি ঘটিল? মেয়েটি ঠিকানা জানে না, নয় তো লিখিতে ভুলিয়াছে। অগত্যা লেখার ছত্রে ছত্রে যে আন্তরিকতা ফুটিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য পত্রখানা সে তুলিয়া লইয়া নিজের বাগ্জে আনিয়া রাখিল। মেয়েটির ছবি সম্মুখে চোখের ফুটিয়া উঠে—পনেরো-ষোল বৎসর বয়স, সুঠাম গঠন, ছিপ-ছিপে পাতলা, একরাশ কালো কৌকুড়া কৌকুড়া চুল ঝাঞ্ঝায়। ডাগর চোখ।...কখন সে তাহার মেজদাদার পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বুঝাই পথ চাহিয়া আছে! বানবসনের এত প্রেম, এত আগ্রহভরা আহ্বান, পবিত্র বালিকাহৃদয়ের এ অমূল্য অর্থ কেন জগতে এভাবে ধূলান্ন অনাদরে গঁড়াগড়ি যায় কেহ পৌছে না, কেহ তা লইয়া গর্ব করে না?

বিশ্বস্তর স্নাক্ষার দোকানে সেদিন রাত এগারটা পর্যন্ত জোর তাসের আড্ডা চলিল—সবাই উঠিতে চায়, সবাই বলে রাত বেশী হইয়াছে, অথচ অণু সকলকে অহুরোধ করিয়া বসায়, কিছুতেই খেলা ছাড়িতে চায় না। অবশেষে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিতেছে, কলুদের পুকুরের কাছে স্কুলের ঘাড পণ্ডিত আশু স্যাক্সাল লাঠি ঠক ঠক করিতে করিতে চলিয়াছেন। অণুকে দেখিয়া বলিলেন, কি অপূর্ববাবু যে, এত রাত্রে কোথায়?

—কোথাও না; এই বিস্তৃত স্নাক্ষার দোকানে তাসের—

ঘাড পণ্ডিত এদিক-ওদিক চাহিয়া নিম্ন-সুরে বলিলেন—একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি বিদেশী লোক—পূর্ণ দীর্ঘাঙ্গীত খল্লরে পড়ে গেছেন কি করে বলুন তো?

অণু ক্রোধিত না পারিরা বলিল, খল্লরে-পড়া কেমন বুঝতে পারছি নে—কি ব্যাপারটা বলুন তো?

পণ্ডিত আরও সুর বীচু করিয়া বলিলেন—এখানে ঘর-ঘর বাঙলা-আশু

আপনার কি ভাল দেখাচ্ছে, ভাবছেন ? ওদের টাকাকড়ি বেওয়া ও-সব ? আপনি হচ্ছেন ইকুলের বাস্টার, আপনাকে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে, তা বোধ করি জানেন না ?

—না ! কি কথা ?

—কি কথা তা আর বুঝতে পারছেন না মশাই ? হঁ—পরে কিছু খামিয়া বলিলেন—ও সব ছেড়ে দিব, বুঝলেন ? আরও একজন আপনার আগে ঐ রকম ওদের খপ্পরে পড়েছিল, এখানকার নন্দ গুইয়ের আবগারী দোকানে কাজ করত, ঠিক আপনার মত অল্প বয়স—মশাই, টাকা শুবে শুবে তাকে একেবারে—ওদের ব্যবসাই ঐ । সমাজে একঘরে করবার কথা হচ্ছে—খার্ড পণ্ডিত একটু খামিয়া একটু অর্থসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন,—আর ও-ময়ের এমন মোহই বা কি, শহর অঞ্চলে বরং ওর চেয়ে ঢের—

অপু এতদূর পর্যন্ত পণ্ডিতের কথাবার্তার গতি ও বক্তব্য-বিষয়ের উদ্দেশ্য কিছুই ধরিতে পারে নাই—কিন্তু শেষের কথাটাতে সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন যেন, পটেশ্বরী ?

—হা হা হা, থাক থাক, একটু আস্তে—

—কি করেছে বলছেন—পটেশ্বরী ?

—আমি আর কি বলছি কিছু, মশাই যা বলে আমিও তাই বলছি । নতুন কথা আর কিছু বলছি কি ? যাবেন না ও-সবে, তাতে বিদেশী লোক, সাবধান করে দি । ভদ্রলোকের ছেলে, নিজের চরিত্রটা আগে রাখতে হবে ভাল, বিশেষ যখন ইকুলের শিক্ষক এখানকার ।

খার্ড পণ্ডিত পাশের পথে নামিয়া পড়িলেন, অপু প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসার ফিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল ।

পূর্ণ দ্বীপডীর বাড়িতে যাওয়া-আসার ইতিহাসটা এইরূপ—

প্রথমে এখানে আসিয়া অপু কয়েকজন ছাত্র লইয়া এক দেরা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল । একদিন সে স্কুল হইতে ফিরিতেছে, পথে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার হাত হুঁটা জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় ডাক ছাড়িয়া কানিয়া বলিল, আপনারা না দেখলে আমার ছেলেটা মারা যেতে বসেছে আজ পরেরো দিন টাইফয়েড তা আমি কলের চাকরি বজায় রাখব, না রুগীর সেবা করব ? আপনি দিন-রাতটার জন্যে জনকতক ভ্রাম্যন্তর্য্য যদি আমার বাড়ি—আর সেই সঙ্গে যদি হুঁ-একদিন আপনি—

তেজস্বী-দিনে রোগী আরাম হইল । এই তেজস্বী দিবের অধিকাংশ দিনই অপু নিজে ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণপণে খাটিয়াছে । রাত্রি তিনটার ঊষব খাওয়াইতে হইবে, অপু ছাত্রদ্বয়কে জাগিতে বা দিয়া নিজে জাগিয়াছে, তিনটা বা বাজা পর্যন্ত বাহিরের দ্বারের একপাশে বই পড়িয়া সময় কাটাইয়াছে, পাছে এবার

বসিয়া থাকিলে বুঝাইয়া পড়ে ।

একদিন দুপুরে টাল খাইয়া রোগা খন্ন-খন্ন হইয়াছিল । দীঘ্‌ড়ী মশায় পাট-কলে, সে দিন ভলাটিয়া-দলের আবার কেহই ছিল না, দুপুরে ভাত খাইতে গিয়াছিল । অপু দীঘ্‌ড়ী মশায়ের স্ত্রীকে ভরসা দিয়ে বুঝাইয়া শান্ত রাখিয়া মেয়ে দুটির সাহায্যে গরম জল করাইয়া বোতলে পুরিয়া সৈক-তাপ ও হাত পা বসিতে বসিতে আবার দেহের উষ্ণতা ফিরিয়া আসে ।

ছেলে সারিয়া উঠিলে দীঘ্‌ড়ী মশায় একদিন বলিলেন—আপনি আমার ২১ উপকারটা করেছেন মাস্টার মশায়—তা এক মুখে আর কি বলব । আমার স্ত্রী বলছিল, আপনার তো রেঁধে খাওয়ার কষ্ট—এই একমাসে আপনি তো আমাদের আপনার লোক হয়ে পড়েছেন—তা আপনি কেন আমাদের ওখানেই থান না ? আপনি বাড়ির ছেলের মত থাকবেন, থাকবেন, কোনও অসুবিধে আপনার হবে না ।

সেই হইতেই অপু এখানে একবেলা কবিতা খায় ।

পরিচয় অল্প দিনের বটে, কিন্তু বিপদের দিনেও মধ্য দিয়া সে পরিচয়—কাঁচের বনিষ্ঠতা—এই আশ্রয়তায় পরিণত হইতে চলিয়াছে । অপু পূর্ণ দীঘ্‌ড়ীর স্ত্রীকে শুধু ‘মাসিমা’ বলিয়া ডাকে তাহাই নয়, মাসের বেতন পাইলে সবটা আনিয়া নতুন-পাতানো মাসিমার হাতে তুলিয়া দেয় । সে-টাকার হিসাব প্রতি মাসের শেষে মাসিমা মুখে বুঝাইয়া দিয়া আরও চার-পাঁচ টাকা বেশী খরচ দেবাইয়া দেন এবং পবের মাসের মাহিনা হইতে কাটিয়া রাখেন । বাজারে বিত্ত স্যাকুরা একদিন বলিয়াছিল—দীঘ্‌ড়ী বাড়ি টাকা রাখবেন না অমন করে ওরা অভাবী লোক । বিশেষ করে দীঘ্‌ড়ী গিন্নী ভারী খেলোয়াড় মেয়েছেলে । বিদেশী লোক আপনি আপনাকে বলে রাখি, ওদের সঙ্গে অত মেলামেশার দরকার কি আপনার ?

মেয়ে-দুইটিরও মেয়ে সে মেশে বটে । বড় মেয়েটির নাম পটেশ্বরী, বয়স বছর চৌদ্দ-পনেরো হইবে, রং উজ্জল শ্যামবর্ণ, তবে তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলিয়া কেন দিনই মনে হয় নাই অপু র । তবে একটু সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার সুবিধা অসুবিধার দিকে বাড়ির এই মেয়েটিই একটু বেশী লক্ষ্য রাখে । পটেশ্বরী না রাখিয়া দিলে তর্কেক দিন বোকাহয় তাহাকে না খাইয়াই কুলে যাইতে হইত । ভাতার ময়লা কুমালগুলি নিজে চাহিয়া লইয়া সাবান দিয়া রাখে, ছোট ভাইয়ের হাতে টিকিনের সমস্ত তাহার জন্য আটার কুটি পাঠাইয়া দেয়, অপু খাইতে বসিলে পান সাঁজিয়া তাহার কুমালে জড়াইয়া রাখে । কি একটা তের সময় বলিয়াছিল, আপনার হাত দিয়ে ত্রুটটা নেব মাস্টার মশায় ! এ সবের জন্য সে মনে মনে মেয়েটির উপর কৃতজ্ঞ—কিন্তু এ সব জিনিস যে বাহিরের দিক হইতে একপাশে দেখা যাইতে পারে, একথা পর্যন্ত তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই—সে জানেই না, এ ধরনের সন্ধি ও অন্তি

কবোভাবের খবর।

সে বিস্মিতও হইল, রাগও করিল। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন হইতে পূর্ণ বীষড়ীর বাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ করিল। ভাবিল...কিন্তু না, যাকে পড়ে পটেশ্বরীকে বিপদে পড়তে হবে।

ইতিমধ্যে বাকুডাবানী বায়ুনটি রাস্তাকূড় বাজার-ঘেঁষা ফেলিয়া একদিন কাঁকরা, হাতা ও বেলুনখানা যাত্রা সহল করিয়া চাঁদাবীর বাজার হইতে রাতরাতি উঠাও হইয়াছিল। সুতরাং আহাৰাদির খুব কষ্ট হইতে লাগিল।

বীষড়ী-বাড়ি হইতে ফিরিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ-রকম বাবা-মা তো কখনও দেখিনি? বেচারীকে এ-ভাবে কষ্ট দেওয়া—হিঃ—খাক্, ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আর রাখব না।

সেদিন ছুটির পর অপু একখানা খবরের কাগজ উন্টাইতে উন্টাইতে দেখিতে পাইল একটা শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধের লেখক তাহার বন্ধু জানকী এবং নামের ভদ্রা ত্রাকেটের মধ্যে লেখা আছে—On deputation to England.

জানকী ভাল করিয়া এম-এ ও বি-টি পাশ করিবার পর গবর্ণমেন্ট স্কুলে মাস্টারি করিতেছে এ-সংবাদ পূর্বেরই সে জানিত কিন্তু তাহার বিলাত যাওয়ার কোন খবরই তাহার জানা ছিল না। কে ই বা দিবে? দেখি দেখি—বা রে। জানকী বিলাত গিয়াছে, বাঃ—

প্রবন্ধটা কোঁতুলের সহিত পড়িল। বিলাতের একটা বিখ্যাত স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা সংক্রান্ত আলোচনা। বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে, উঃ, জানকী যে জানকী সেও গেল বিলেত।

মনে পড়িল কলেজ-জীবনের কথা—বাগবাজারে সেই স্ত্রামরায়ের মন্দির ও ঠাকুরবাড়ি—গম্ভীর ছাত্রজীবনে জানকীর সঙ্গে কতদিন সেখানে খাইতে খাওয়ার কথা। ভালই হইয়াছে, জানকী কম কষ্টটা করিয়াছিল কি একদিন। বেশ হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।

এ-অকলের রাস্তায় বড় ধুলো, তাহার উপর আবার কল্লার গুঁড়ো দেওয়া—পথ হাঁটা ঘোটেই শ্রীতিকর নয়। হুদারে কুলিবাতি; ময়লা দড়ির চারপাই পাতিয়া লোকগুলো ভাষাক টানিতেছে ও গল্প করিতেছে। এ-পথে চলিতে চলিতে অপরিস্রব, সম্মীর্ণ বস্তিগুলির দিকে চাহিয়া সে কতবার ভাবিয়াছে, বাহুব কোন্ টানে, কিসের লোভে এ ধরনের নরককূণ্ডে বেহুদার বাস করে? জানে না, বেচারীরা জানে না, পুরে পলে এই নোংরা আবহাওয়া তাহাদের বহুভ্রমকে, ক্রাচকে, চরিত্রকে, ধর্মসুহাকে গলা টিপিয়া খুন করিতেছে। সূর্যের জ্বলন্ত কি ইচ্ছা কখনও জোপ করে বাই? কব-বহুরির ভাবিলকে ভাল-বাসে বাই? পৃথিবীর বৃক রূপকে প্রত্যক্ষ করে বাই?

বিকটে বাঠ বাই, বেগবপুয়ের বাঠ অনেক দূরে, রবিকার ভিন্ন সেখানে যাওয়া চলে না। সুতরাং খাবিকটা বেড়াইয়া সে ফিহিল।

অনেকদিন হইতে এ-অকলের বাটে ও পাতারগারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এদিকের

দাঁহ-পাল্লা ও বনকুলের একটা আশ্রয় ও বর্ণনা যে একখানা দৃক-বাজার
 সংগ্রহ করিয়াছে। কুলের দু-একজন বাস্টারকে দেখাইলে তাঁহার হাসি
 উড়াইয়া দিলেন। ও-সবের কথা লইয়া আবার বই। পাগল আর কাকে বলে।
 বাসার আসিয়া আজ আর সে বিস্তৃত স্মারক আর আড্ডায় গেল না। বসিয়া
 বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে আনন্দের কথা বনে পড়িল। বিলাতে—তা বেশ। কত
 দিন গিয়াছে কে জানে? ব্রিটিশ মিউজিয়াম-টিউজিয়াম এতদিনে সব দেখা
 হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। পুরানো নর্ম্যান দুর্গ দু-একটা, পাশে পাশে জুবি-
 পারের বন, দূরে ঢেউ খেলানো মাঠের সীমান্ত খড়িমাটির পাহাড়ের পিছনে,
 সর্দারগুণের আটলাটিকের উদার বৃক্ষে অন্ত আকাশের রঙীন প্রতিচ্ছায়া, কি কি
 গাছ, পাড়ারগুণের মাঠের ধারে বনের কি কি ফুল? ইংল্যান্ডের বনকুল
 বাকি ভারী দেখিতে সুন্দর—পরি, ক্রিয়াটিস, ডেজী।
 বিস্তৃত স্মারক দোকান হইতে লোক ডাকিতে আসে, আসিবার আজ এত
 ঘেরি কিসের? খেলুড়ে ভীম সাধুখাঁ, মহেশ সাবুই, নীলু মল্লা, ফকির আড্ডি
 —ইহারা অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া আছে—বাস্টার মশায়ের যাইবার অপেক্ষায়
 এখনো থেলা যে আরম্ভ হয় নাই।

অণু যায় না—তাঁহার মাথা ধরিয়াছে—না—আজ সে আর খেলার যাইবে
 না।

ক্রমে রাত্রি বাড়ে, পদ্মপুকের ওপারে কুলিবস্তির আলো নিবিয়া যায়, নৈশ-
 যাত্রী শীতল হয়, রাত্রি সাড়ে দশটার আপ টেনে হেলিতে-হলিতে বন্ধ-বন্ধ
 শব্দে রোয়াকের কোল ঘেঁসিয়া চলিয়া যায়, পরের সন্ধ্যায় আধারে-লঠন হাতে
 আসিয়া সিগন্যালের বাড়ি নায়াইয়া লইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে—বাস্টার-
 বাবু, এখনও বসিয়া আছেন?

—কে ভজিয়া? হ্যাঁ—সে এখনো বসিয়া আছে।

কিসের ক্ষুণ্ণ। কিসের যেন একটা অতৃপ্ত ক্ষুণ্ণ।

ও-বেলা একখানা পুরানো জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই লইয়া বাড়ীচাড়া করিতেছিল
 —একখানা খুব ভাল বই এ-সম্বন্ধে। শীলদের বাড়ির চাকরি-জীবনে কিনি-
 য়াছিল—এখানা হইতে অপর্য্যাক্ষে কতদিন নীহারিকা ও নক্ষত্র-পুঞ্জের ফটো-
 গ্রাফ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত—ও-বেলা যখন সেখানা লইয়া পড়িতেছিল,
 তখন তাহার চোখে পড়িল। অতি ক্ষুদ্র, সাদা রংয়ের—খালি চোখের খুব ভেজ
 না থাকিলে দেখা অসম্ভব—এরূপ একটা পোকা বইয়ের পাতায় চলিয়া
 বেড়াইতেছে। ওর সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল—এই বিশাল জগৎ, নক্ষত্রপুঞ্জ, উদ্ভা,
 নীহারিকা, কোটি কোটি দৃশ্য-অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব—ও-ও তো
 এরই একজন অধিবাসী—এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই
 ওর জীবনাবলী—কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু?

কিন্তু মানুষেরই বা কতটুকু? এই নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা
 কি? আজকাল তাহার যেন একটা মৈরাশ ও সম্বন্ধবাদের ছায়া ঘাবে ঘাবে

কেনে ভাবি নাহে। এই বর্ষাকালে যে দেবিদাহে, ভিঁজা জুতার 'উপর' এক
 রকম কুহ কুহ ছাতা গজার—কতদিন যবে হইয়াছে বাত্মনও তেমনি পৃথিবীর
 পৃষ্ঠে এই রকম ছাতার মত জন্মিয়াছে—এখানকার উচ্চ বারু মণ্ডল ও তাহার
 বিভিন্ন গ্যান্ডলা প্রাপণোবণের অমুকুল একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে
 বলিয়া। এরা নিভাত্তই এই পৃথিবীর, এরই সঙ্গে এদের বন্ধন আঁকেপৃষ্ঠে
 জড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতই হঠাৎ গজাইয়া উঠে, লাখে লাখে, পালে পালে
 জন্মায়, আবার পৃথিবীর বুকেই যার বিলাইয়া। এরই বধ্য হইতে সহস্র কুহ
 ও তুচ্ছ ঘটনার আনন্দ, হাসি খুশিতে বৈদ্য-কুহতাকে চাকিয়া রাখে—গড়ে
 চল্লিশটা বছর পরে সব শেষ। যেমন ঐ পোকাকার সব শেষ হইয়া গেল
 তেমনি।

এই অবোধ জীবগণের সঙ্গে ঐ বিশাল নক্ষত্র জগতের ঐ গ্রহ, উদ্ধা, ধূমকেতু
 —ঐ নিঃসীম নাক্ত্রিক বিরাট শুল্কের কি সম্পর্ক? সুদূরের পিপাসাও যেমন
 মিথ্যা, অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা—ভিঁজা জুতার বা পচা বিচালা-
 গজার ব্যাঙের ছাতার মত যাহাদের উৎপত্তি—এই বহনীয় অনন্তের সঙ্গে
 তাহাদের কিসের সম্পর্ক?

স্বভাপারে কিছুই নাই, সব শেষ। যা গিয়াছেন—অপর্ণা গিয়াছে—অনিল
 গিয়াছে—সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে—পূর্ণচ্ছেদ।

ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইখানাতে যে বিশ্বজগতের ছবি ফুটিয়াছে, এ
 পোকাটার পক্ষে যেমন তাহার কল্পনা ও ধারণা হ্রস্বতর, এমন সব উচ্চতর
 বিবর্তনের প্রাণী কি নাই যাহাদের জগতের তুলনায় মানুষের জগৎটা ঐ
 বইয়ের পাতায় বিচরণশীল প্রায় আনুভূতিক পোকাটার জগতের মতই কুহ,
 তুচ্ছ, নগণ্য?

হয়ত তাহাই সত্য, হয়ত মানুষের সকল কল্পনা, সকল জ্ঞান-বজ্ঞান বিলিয়া
 যে বিবর্তার কল্পনা করিয়াছে সেটা বিরাট বাস্তবের অতি কুহ এক ভয়াংক নর
 —তাহা নিভাত্ত এ পৃথিবীর মাটির...মাটির...মাটির।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতের তুলনায় ঐ পোকাটা এই জগতের মত।
 হয়ত তাহাই, কে বলিবে হ্যাঁ কি না?

মানুষ বসিয়া কোথায় যার? ভিঁজা জুতাকে রোম্বে দিলে তাহার উপরকার
 ছাতা কোথায় যার?

মোক্ষ রিচ্ছেদ

কুলের সেক্রেটারী স্থাবীর বিখ্যাত চাউল ব্যবসারী রামতারন:ওইয়ের বাড়ি
 এখার পূজার ঘর ধুমধাম। কুলের বিদেশী মাটির মহাপরোয়া কেহ বাড়ি যান
 নাই, এই বাজারে চাকুরিটা যদি বা জুটিয়া গিয়াছে, এখন সেক্রেটারীর দল-
 ভক্তি করিয়া সেটা তো বজায় রাখিতে হইবে! তাহার পূজার কতদিন
 সেক্রেটারীর বাড়িতে প্রাপণ পরিগ্রহ করিয়া লোকজনের আদর-অভ্যর্থনা,

খাওয়াবোর বিজি-বন্দোবস্ত প্রভৃতিতে বহাবাস্ত, সকলেই বিজ্ঞানী কর্তৃক পরদিন বাড়ি বাইবেন। অপূর হাতে ছিল ভাঙার ঘরের চাক—করতিন রাতি ঘণ্টা এগারোটা পর্যন্ত খাটিবার পর বিজ্ঞানীমণ্ডলীর বৈকালে সে ছুটি পাইয়া কলিকাতার আসিল।

প্রায় এক বৎসরের একঘেয়ে ওই পাড়ারগায়ে জীবনের পর বেশ লাগে শহরের এই সজীবতা। এই দিনটার সঙ্গে বহু অতীত দিনের নানা উৎসব-চপল আনন্দস্মৃতি জড়ানো আছে, কলিকাতার আসিলেই যেন পুরানো দিনের সে-সব উৎসবরাজি তাহাকে পুরাতন সঙ্গী বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়া। প্রীতিবধুর কলহাস্যে আবার তাহাকে বাগ্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। পথে চলিতে চলিতে নিজের ছেলের কথা মনে হইতে লাগিল বারবার। তাহাকে দেখা হয় নাই—কি জানি কি রকম দেখিতে হইয়াছে। অপর্ণার মত, না তাহার মত ?... ছেলের উপর অপূ মনে মনে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, অপর্ণার মুত্বার জন্য সে মনে মনে ছেলেকে দাস্ত্রী করিয়া বসিয়াছিল, বোধ হয়। ভাবিয়াছিল, পূজার সময় একবার সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিবে—কিন্তু যাওয়ার কোন তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। চক্ষুলাক্ষার খাতিরে ধোকার পোশাকের দরুন পাঁচটি টাকা খন্ডুর .বাড়িতে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া পিতার কর্তব্য সমাপন করিয়াছে।

আজিকার দিনে শুণু আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু তাহার কোনও পূর্বপরিচিত বন্ধু আজকাল আর কলিকাতার থাকে না, কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়ইয়া প্রতিমা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—কোথায় যাওয়া যায় ?

ভার পরে সে লক্ষ্যহীনভাবে চলিল। একটা সরু গলি, দুজন লোক পাশাপাশি যাওয়া যায় না, দুধাবে একতলা নীচু সাতসেঁতে ঘরে ছোট ছোট গৃহস্থেরা বাস করিতেছে—একটা রান্নাঘরে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি বোঁ লুচি ভাজিতেছে, দুটি ছোট মেয়ে ময়দা বেলিয়া দিতেছে—অপূ ভাবিল, একবৎসর পর আজ হয়ত ইহাদের লুচি খাইবার উৎসব-দিন। একটা উঁচু রোয়াকে অনেকগুলি লোক কোলাকুলি করিতেছে, গোলাপী সিন্ধের ফকপরা কৌকড়াচুল একটি ছোট মেয়ে দরজার পর্দা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। একটা দৃশ্যে তাহার ভারী দুঃখ হইল। এক মুড়ির দোকানে প্রোট মুড়িওয়ালীকে একটি অল্পবয়সী নীচুশ্রেণীর পতিতা মেয়ে বলিতেছে—ও দিদি—দিদি ? একটু পানের খুলো দ্যাও ? পরে পানের খুলো লইয়া বলিতেছে, একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, শোনো—ও দিদি ? মুড়িওয়ালী তাহার কথায় আদৌ কান না দিয়া সোনার মোটা অনন্ত-পরা সিন্ধের সহিত কথাবাতী করিতেছে—মেয়েটি তাহার মনোযোগ ও অনুগ্রহ আকর্ষণ-করিয়া কত আবার প্রণয় করিতেছে ও আবার বলিতেছে—দিদি, ও দিদি ?... একটু পানের খুলো দ্যাও। পরে হাসিয়া বলিতেছে—একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না

‘ও দাঁদি ?’

অপু ভাবিল, এ রূপহীনা : হতভাগিনীও হয়ত কলিকাতার ভাষার বহু একাকী, কোন খোলার ঘরের অন্ধকার গর্ভগৃহ হইতে আজিকার দিনের উৎসবে বোগ দিতে ভাহার চুহুরি শাড়িখানা পরিত্যাগ বাহির হইয়াছে। পাশের দোকানের অবস্থাপন্ন মুড়িওয়ালীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে, উৎসবের অংশ হইতে বাহাতে সে বঞ্চিত না হয়। ওর চোখে ওই মুড়িওয়ালীই হয়ত কত বড়লোক।

ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কবিরাজ-বন্ধুটির দোকানে গেল। বন্ধু দোকানেই বসিয়া আছে, খুব আদর করিয়া বলিল—এসো, এসো ভাই, ছিলে কোথায় এতদিন ? বন্ধুর অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও খারাপ, পূর্বের বাসা ছাড়িয়া নিকটের একটা গলিতে শাড়ে তিন টাকা ভাড়াতে এক খোলার ঘর লইয়াছে—নতুবা চলে না। বলিল—আর ভাই পারি নে, এখন হয়েছে দিন-আনি দিন-খাই অবস্থা। আমি আর স্ত্রী দুজনে মিলে বাড়িতে আচার চাটনি, পয়সা প্যাকেট চা—এই সব ক’রে বিক্রি করি—অসম্ভব ফ্র্যাগল করতে হচ্ছে ভাই, এসো বাসায় এসো।

বৌচু স্যাভসে’তে ঘর। বন্ধুর বৌ বা ছেলেমেয়ে কেহই বাড়ি নাই—পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিবা দেখিতেছে। বন্ধু বলিল—এবার আর ছেলেমেয়েদের কাপড়-চাপড় দিতে পারি নি—বলি ঐ পুরানো কাপড়ই খোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে পর। বৌটার চোখে জল দেখে শেষকালে ছোট মেয়েটার জন্য একখানা ড্রে শাড়ি—ভাই। ব’স ব’স, চা খাও, বাঃ, আজকের দিনে যদি এলে। দাঁড়াও ডেকে আনি ওকে।

অপু ইতিমধ্যে গলির মোড়ের দোকান হইতে আট আনার খাবার কিনিয়া আনিল। খাবারের চোঙা হাতে যখন সে ফিরিয়াছে তখন বন্ধু ও বন্ধুপত্নী বাসায় ফিরিয়াছে।—বাঃ রে, আবার কোথায় গিয়েছিলে—ওতে কি ? খাবার ? বাঃ রে, খাবার তুমি আবার কেন—

অপু হাসিমুখে বলিল—তোমার আমার জন্য তো আনি নি ? থুঁকী রয়েছে, ঐ থোকা রয়েছে—এস তো বাহু—কি নাহ ? রমলা...ও বাবা, বাপের শখ দাখ—রমলা। বৌ ঠাকুরপু—ধরুন তো এটা।

বন্ধুপত্নী আখখোষটা টানিয়া প্রসন্ন হাসিভরা মুখে চোঙাটি হাত হইতে লইলেন। সকলকে চা ও খাবার দিলেন। সেই খাবারই।

আখখোটাক পর অপু বলিল—উঠি ভাই, আবার চাপদানীতেই ফিরব—বেশ ভাল ভাই—কন্ঠের সঙ্গে তুমি এই যে লড়াই করছ—এতেই তোমাকে ভাল করে চিনে নিলাম—কিন্তু বৌ-ঠাকুরপুকে একটা কথা বলে বাই—অন্ত ভাল-মানুষ হবেন না—আপনার স্বামী তা পছন্দ করেন না। হু-একদিন একটু-আধটু চুলোচুলি, হাতা-যুঁড়, বেলুন-যুঁড়—জীবনটা বেশ একটু সরস হয়ে

উঠবে—বুকলেন না ? এ আবার বড় বয়স, কিন্তু আমার এই বুদ্ধির বড়—
আচ্ছা আসি, নবদ্বার ।

বড়ুটি পিছু পিছু আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওহে তোমার বৌ-ঠাকরুণ
বলছেন, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস কর, উনি বিশেষ করবেন, না, এই রকম শ্রমাসি
হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন ?...উত্তর দাও ।

অপু হাসিয়া বলিল—দেখে শুনে ইচ্ছে নেই ভাই, বলে দাও ।

বাহিরে আসিয়া ভাবে—আচ্ছা, তবুও এরা আজ ছিল বলে বিজ্ঞার আনন্দটা
করা গেল । সত্যিই শাস্ত বোটি । ইচ্ছে করে এদের কোনও হেল্প করি—
কি ক'রে হয়, হাতে এদিকে পরসী কোথায় ?

ভাষার পর কিসের টানে সে ট্রামে উঠিয়া একেবারে ভবানীপুরে লীলাদের
বাড়ি গিয়া হাজির হইল । রাত তখন প্রায় সাড়ে-আটটা । লীলার
দাদামশায়ের লাইব্রেরী-ঘরটাতে লোকজন কথাবার্তা বলিতেছে, গাড়ি-
বারান্দাতে দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে—পোকার উপদ্রবের ভয়ে হলের
ইলেকট্রিক আলোগুলিতে রাঙা সিল্কের ঘোঁটোপ্ বাঁধা । মর্বলের সিঁড়ির
খাপ বাহিয়া হলের সামনের চাতালে উঠিবার সময় সেই গজ্জটা পাইল—
কিসের গঙ্গ ঠিক ঠিক ভানে না, হয়ত দামা খাসবাব-পত্রের গজ্জ, হয়ত লীলার
দাদামশায়ের দামী চুকটের গজ্জ—এখানে আসিলেই ওটা পাওয়া যায় ।

লীলা—এবার হয়ত লীলা...অপুর বুকটা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল ।

লীলার ছোট ভাই বিমলেন্দু তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া হাত
ধরিল ।

এই ভালকটিকে অপূর বড় ভাল লাগে—মাত্র বার দুই ইহার আগে সে অপূকে
ঘেঁষিয়াছে, কিন্তু কি চোখেই যেন দেখিয়াছে ! এটুকু বিশ্বাসমাখানো আনন্দের
সুরে বলিল—অপূর্ববাবু, আপনি এতদিন পর কোথা থেকে ? আসুন, আসুন,
বসবেন । বিজ্ঞার প্রশ্নটা, দাঁড়ান ।

—এসো এসো কল্যাণ হোক, না কোথায় ?

—না গিয়েছেন বাগবাড়ারের বাড়ীতে—আগবেন এখুনি—বসুন ।

—ইয়ে—তোমার দিদি এখানে তো ?—না ?—ও ।

এক মুহূর্তে সারা বিজ্ঞা দশমীর উৎসবটা, আজিকার সকল ছুটীছুটি ও
পরিশ্রমটা অপূর কাছে বিবাদ, নীরস, অর্থহীন হইয়া গেল । শুধু আজ
বলিয়া নয়, পূজা আরম্ভ হইবার সময় হইতেই সে ভাবিতেছে—লীলা পূজার
সময় নিশ্চয় কলিকাতায় আসিবে—বিজ্ঞার দিন গিয়া দেখা করিবে । আজ
চাঁপদানীর চটকলে পাঁচটার ভেঁা বাজিয়া প্রভাত সূচনা । হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
সে অসীম আনন্দের সহিত বিছানায় শুইয়া ভাবিয়াছিল—বৎসর দুই পরে
আজ লীলার সঙ্গে ওবেলা দেখা হইবে এখন ! সেই লীলাই নাই এখানে !...
বিমলেন্দু তাহাকে উঠিতে দিল না । চা ও খাবার আনিয়া খাওয়াইল ।
বলিল—বসুন, এখন উঠতে দেব না, নতুন আইসক্রিমের কলটা এসেছে—বড়-

বাবার বন্ধুত্বের জন্যে সিঁড়ির আইসক্রিম হচ্ছে—বাবার সিঁড়ির আইসক্রিম ?
 বোজ দেওয়া—আপনার জন্যে এক ডিস আনতে বলে এসু। আপনার গান
 শোনা হয় নি কতদিন, না সন্ধ্যা, একটা গান করতেই হবে—ছাড়ছি নে।

—লীলা কি সেই রানপুরেই আছে ? আসবে-টাসবে না ?...

—এখন তো আসবে না দিদি—দিদিব নিজের ইচ্ছেতে তো কিছু হবার জো
 নেই—দাদামশ'র পত্র লিখেছিলেন, জামাইবাবু উত্তর দিলেন এখন নয়, দেখা
 যাবে এর পব।

তাহার পব সে অনেক কথা বলিল। অপু এ-সব জানিত না।—জামাইবাবু
 লোক ভাল নয়, খুব বাগী, বদমেজাজী। দিদি খুব তেজী মেয়ে বলিয়া
 পারিয়া উঠে না—তবু বাবহার আদৌ ভাল নয়। নিচু সুরে বলিল—নাকি
 খুব মাতালও—দিদি তো সব কথা লেখে না, কিন্তু এবার বর্ডাদির ছেলে
 কিছুদিন বেড়াতে গিয়েছিল নাকি গরমেব ছুটিতে, সে এসে সব বললে।
 বডদিদিকে আপনি চেনেন না ? সুজাতা দি ? এখানেই আছে, এসেছেন
 আজ—ডাকব তাঁকে ?

অপুর মনে পড়িল সুজাতাকে। বড়বোয়ানীর মেয়ে বালোর সেই সুন্দরী,
 তলী সুজাতা—বর্ধমানের বাড়িতে তাহাবই যে বনপুষ্টিত তুলতাজি একদিন
 অপূর অনাভিজ্ঞ শেখবচন্দ্রের সমুখে নারী-সৌন্দর্যের সমগ্র ভাণ্ডার খেন নিঃশেষে
 উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল—বাবো বৎসব পবের সে উৎসবের দিনটা
 আজও এমন স্পষ্ট মনে পড়ে।

একটু পরে সুজাতা হাসিমুখে পলাঠে লিয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু একজন অপরি-
 চিত, সুদর্শন, তরুণ যুবককে ঘরের মধ্যে দেখিয়া প্রথমতঃ সে তাড়াতাড়ি কিছু
 হট্টয়া পলাঠি পুনরায় টানিতে গাইতেছিল—জিমলেন্দু হামিয়া বলিল—বা
 রে, ইকিই তো অপ্রবঞ্চ, বডদি চিনতে পারেন না ?

অপু উঠিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। সে সুজাতা আর নাই, বয়স
 ত্রিশ পার হইয়াছে, খুব মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার সামনের দিকে দু-এক
 গাছা চুল উঠিতে শুরু হইয়াছে, ঘোবনের চটুল লাবণ্য গিয়া মুখে মাহুতের
 কেশমতা। বর্ধমানে থাকিতে অপূর সঙ্গে একদিনও সুজাতার আলাপ হয়
 নাই—রাধুনীর ছেলের সঙ্গে বাড়ির বড মেয়ের কোন আলাপই বা সম্ভব
 ছিল ? সবই তো আর লীলা নয়। তবে বাড়ির রাধুনী বামনীর ছেলেটিকে
 ভয়ে ভয়ে বড়লোকের বাড়ির একতলা দালানের বাটান্দাতে অনেকবার সে
 বেড়াইতে, ঘোরাকেরা করিতে দেখিয়াছে বটে।

সুজাতা বলিল—এসো এসো, ব'স। এখানে কি কর। মা কোথায় ?

—মা তো অনেকদিন মারা গিয়াছেন।

—তুমি বিয়ে-খাওয়া করেছ তো—কোথায় ?

সে সংক্ষেপে সব বলিল। সুজাতা বলিল—তা আবার বিয়ে কর নি ? না
 না, বিয়ে ক'রে ফেল, সংসারে থাকতে গেলে ও-সব আছেই, বিশেষ যখন

তোমার মা-ও নেই। সে বাড়ির আর মেয়ে-টেকে নেই ?

অপুর মনে হইল লীলা থাকলে, সে ‘তোমার মা’ এ-কথা না বলিয়া শুধু ‘মা’ বলিত, তাহাই সে বলে। লীলার মত আর কে এমন দয়াময়ী আছে যে তাহার জীবনে, তাহার সকল দারিদ্র্যকে, সকল হীনতাকে উপেক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ করুণার ও মমতার স্নেহপাণি সহজ বন্ধুত্বের মাধুর্যে তাহার দিকে এমন প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল ? সুজাতার কথার উত্তর দিতেই এ-কথাটা ভাবিয়া সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

সুজাতা ভিতরে চলিয়া গেলে অপূর মনে হইল, শুধু মাতৃত্বের শাস্ত কোমলতা নয়, সুজাতার মধ্যে গৃহিণীপনার প্রবীণতাও আসিয়া গিয়াছে।

বলিল—আস ভাই বিমল, আমার আবার সাড়ে দশটায় গাড়ি।

বিমলেন্দু তাহাকে :আগাইয়া দিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর আসিল।

বলিল—আর বছর ফাল্গুন মাসে দিদি এসেছিল, দিন পনেরো ছিল। কাউকে বলবেন না, আপনার পুরানো অফিসে একবার আমার পাঠিয়েছিল আপনার থোঁড়ে—সবাই বললে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, কোথায় কেউ জানে না। আপনার রুখা আমি লিখব, আপনার ঠিকানা দিন ?...দাঁড়ান, লিখি।

মাঘীপূর্ণিমার দিনটা ছিল ছুটি। সারাদিন সে আশেপাশের গ্রামগুলো পায়ের হাটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যাব অনেক পরে সে বাসায় আসিয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কত রাত্রে জানে না, তরুণপোশের কাছের জানালাতে কাহার মুহূ করাঘাতের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শীত এখনও বেশী বলিয়া জানালা বন্ধই ছিল, বিছানার উপর বসিয়া সে জানালাটা খুলিয়ে ফেলিল। কে যেন বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া। কে ?...উত্তর নাই। সে তাড়াতাড়ি হুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া অবাধ হইয়া গেল—কে একটি স্বীলোক এতরাত্রে তাহার জানালার কাছে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

অপূ আশ্চর্য হইয়া কাছে গিয়া বলিল—কে ওখানে ? পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটেশ্বরী ? তুমি এখানে এত রাত্রে ! কোথা থেকে—তুমি স্বপ্তরবাড়ি ছিলে, এখানে কি করে—

পটেশ্বরী নিঃশব্দে কঁাদিতেছিল, কথা বলিল না—অপূ চাহিয়া দেখিল, তাহার পায়ের কাছে একটা ছোট পুঁটুলি পড়িয়া আছে। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কৈদো না পটেশ্বরী কি হয়েছে বল। আর এখানে এভাবে দাঁড়িয়েও তো—

—কেনি কি হয়েছে ? তুমি এখন আসছ কোথেকে বল তো ?

পটেশ্বরী কঁাদিতে কঁাদিতে বলিল—বিষ্ণু :থেকে হেঁটে আসছি—অনেক রাত্তিরে বেরিয়েছি, আমি আর সেখানে যাব না—

—আচ্ছা, চলো চলো, তোমায় বাড়িতে দিয়ে আসি—কি বোকা মেয়ে !

এত রাতিরে কি এ ভাবে বেরুতে আছে।...ছিঃ—আর এই কথকবে খীতে, গায়ে একখানা কাপড় নেই, কিছু না—এ কি ছেলেমানুষি !

আপনার পায়ে পড়ি বাস্তার মশাই, আপনি বাবাকে বলবেন, আর যেন সেখানে না পাঠায়—সেখানে গেলে আমি মরে যাব—পায়ে পড়ি আপনার—বাড়ির কাছাকাছি গিয়া বলিল—বাড়িতে যেতে বড় ভয় করছে, মাস্টার মশায়—আপনি একটু বলবেন বাবাকে মাকে বুঝিয়ে—

সে এক কান্ড আর কি এত রাত্রে ! ভাগ্যে রাত অনেক পথে কেহ নাই। অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া দীঘ্‌ডী-বাড়ী আসিয়া পটেশ্বরীর বাবাকে ডাকিয়া তুলিয়া সব কথা বলিল। পূর্ণ দীঘ্‌ডী বাহিরে আসিলেন, পটেশ্বরী আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িয়া ইন্টার্মে মুখ শুঁজিয়া কানিতেছে ও হাড়ভাঙ্গা শীতে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে—না-একখানা শীতবস্ত্র, না-একখানা মোটা চাদর। বাড়ির মধ্যে গিয়া পটেশ্বরী কানিয়া মাকে ডাইয়া শ্রিল—একট, পরে পূর্ণ দীঘ্‌ডী তাহাকে ডাকিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া দেখাইলেন পটেশ্বরীর হাতে, পিঠে, ঝাড়ের কাছে প্রহাবের কলশিরার দাগ, এক এক জায়গায় রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে—মাকে ছাড়া দাগগুলি সে আর ক'হাকেও দেখায় নাই, তিনি আবার স্বামীকে দেখাইয়াছেন। ক্রমে জানা গেল পটেশ্বরী নাকি রাত বারোটাই হইতে পুকুরের ঘাটে শীতের মধ্যে বসিয়া ভাবিয়াছে কি করা যায়—২ ঘণ্টা শীতে ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিবার পরও সে বাড়ি আসিবার সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া মাস্টার মহাশয়ের ডানালয় শব্দ করিয়াছিল। যেসকলে আর সেখানে পাঠানো চলিতে পারে না এ কথা ঠিক। দীঘ্‌ডী মশায় অপুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কোন উকিল বন্ধু আছে কি-না, এ সম্বন্ধে একটা আইনের পরামর্শ বিশেষ আবশ্যিক—যেহেতু ভরণপোষণের দাবী দিয়া তিনি স্খামাইয়ের নামে নালিশ করতে পারেন কিনা। অপু দিন দুই শুধুই ভাবিতে লাগিল একেত্রে কি করা উচিত।

সুতরাং বভাবতই সে খুব আশ্চর্য হইয়া গেল; যখন স্বামীপুণিবার দিনপাঁচেক পরে সে শুনিল পটেশ্বরীর স্বামী আসিয়া পুনরায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে আরও বেশী আশ্চর্য হইতে হইল, সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপারে। একদিন সে স্কুল হইতে ছুটির পরে বাহিরে আসিতেছে, স্কুলের বেহাড়া তাহার হাতে একখানা খামের চিঠি দিল—খুলিয়া পড়িল, স্কুলের সেক্রেটারী লিখিতেছেন, তাহাকে আর বর্তমানে আবশ্যক নাই—এক মাসের মধ্যে সে যেন অল্প চাকুরী দেখিয়া লয়।

অপু বিস্মিত হইল—কি ব্যাপার। হঠাৎ এ নোটিশের মানে কি? সে তখনই হেডমাস্টারের কাছে গিয়া চিঠিখানা দেখাইল। তিনি নানাকারণে অপূর উপর সন্দেহ ছিলেন না। প্রথম সেবাসমিতির দলগঠন অপুই করিয়াছিল, বড়বড় করিত সে। ছেলেদের সে অভ্যস্ত প্রিয়পাত্র, তাহার কথায় ছেলেরা ওঠে বসে। তিনিসকল হেডমাস্টারের চক্ষুশূল। অনেকদিন হইতেই তিনি

রান্না-খাওয়ার কাজ শেষ হইতে মার্টিন কোম্পানীর রাত দশটার গাড়ি আসিয়া পড়িল, বাজারের দোকানে দোকানে কাঁপ পড়িল। অপু পত্রখানা খুলিয়া দেখিল—দুখানা চিঠি, একখানা ছোট চার-পাঁচ লাইনের, আর একখান মোটা সাদা কাগজে—পরক্ষণেই আনন্দে, বিস্ময়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া তাব বুকেব রক্তা যেন চলকাইয়া উঠিয়া গেল মাথায়—সবনাশ, কাণ চিঠি এ। চোথকে নেন বিশ্বাস করা যায় না—লীলা তাহাকে লিখিতেছে। সমস্ত চিঠিখানা তাব ছোট ভাইয়ের—সে লিখিতেছে, দিদির এ পত্রখানা তাহার পত্রের মধ্যে আসিয়াছে, অপুকে পাঠাইবার অনুমতি ছিল দিদির, পাঠানো হইল। অনেক কথা, ন' পৃষ্ঠা হোট হোট অক্ষরের চিঠি। বার্নিকটা ডিগ্রা সে খোলা হাওয়ায় আসিয়া বসিল। কি অবশ্যীয় মনোভাব, বোঝানো যায় না, বলা যায় না। আবশ্যতা এই বকম—

ভাই অপু,

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি—তুমি কোথায় আছ, আজকাল কি কর, ভাববার ইচ্ছা হইয়াছে অনেকবার কিন্তু কে বলবে, কাণ কাছেই বা খবর পাব? সেবার কলকাতায় গিয়ে বিস্ময়ে একদিন তোমার দু'বানো ঠিকানায় তোমার সন্ধান পাইয়াছিলাম—সে বাড়িতে অন্য লোকে আজকাল থাকে, তোমার সন্ধান দিতে পাবে নি, কি করেই বা পাববে? একথা বিগ্ণ বলে নি তোমায়?

আমি বড় অশাস্তিতে আছি এখানে, কখনও ভাবি নি এমন আমায় হবে। কখনও যদি দেখা হয় তখন সব বলব। এত সব অশাস্তির মধ্যে এখন আমার মনে হয় তুমি হয়ত মলিনমুখে কোথাও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তখন মনেও যন্ত্রণা আবণ্ড বেড়ে যায়। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন বিস্ময় পড়ে ভাবলাম বিজয়া দশমীর দিন তুমি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলে, তোমার ঠিকানাও পেলাম।

বর্ধমানের কথা মনে হয়? অত আদরের বর্ধমানের বাড়িতে আজকাল আঁ যাবার জো নেই। জ্যাঠামশায় মারা যাওয়ার পর থেকেই রমেন-দাবড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছিল। আজকাল সে যা করছে, তা তুমি হয়ত কখনও শোনও নি। মানুষের দাপ থেকে সে যে কত নীচে নেমে গিয়েছে, আর যা কীতিকারখানা, তা লিখিতে গেলে দু'পি হয়ে পড়ে। কোন মারোমারি ডার কাছে নিজেব অংশ বন্ধক রেখে ঢাকা দাব করেছিল—এখন তার পরামর্শে পার্টিশন দুটি আরম্ভ করেছে—বিস্ময়ে কীকি দেবার উদ্দেশ্যে। এ সব তোমার মাথায় আসবে কোনও দিন?

কত রাত পর্যন্ত অপু চোখের পাতা বুঝাইতে পারিল না। লীলা যাঁহা লিখিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী যেন লেখে নাই। সারা পত্রখানিতে একটা শান্ত সহানুভূতি, স্নেহ, প্রীতি, করুণা। এক মুহূর্তে আজ দু'বৎসরব্যাপী এই নিঃশব্দতা অপূর যেন কাটিয়া গেল—এইমাত্র সে ভাবিতেছিল সংসারে সে একা

—তাহার কেহ কোথাও নেই। লীলার পত্রে জগতের চেহারা যেন এক মুহূর্তে বদলাইয়া গেল। কোথায় সে—কোথায় লীলা!...বহুদূরের বাবধান ভেদ করিয়া তাহার প্রাণের উষ্ণ প্রেমময় স্পর্শ অপুর প্রাণে লাগিয়াছে—কিন্তু কি শূন্য বসায়ন এ স্পর্শটা—কোথায় গেল, অপূর চাকুরি খাইবার ভুখ—কোথায় গেল গোটা—এই বসবের পাশাপাশির মত নিজনতা—নারীসদস্যের অপূর বসায়নের প্রলেপ তাহাব সকল মনে, সকল অঙ্গে, কী যে আনন্দ ছড়াইয়া দিল। লীলা যে আছে!...সব সময় তাহাব জন্য ভাবে—ভুখ করে, জীবনে অপূর থাকি কি চায়?—সাক্ষাতেব আবগুক নাই, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া এই স্পর্শ। অক্ষয় হইয়া বিবাহ করুক।

লীলার পত্র পাইবার দিন-বাতো পবে তাহাব খাইবার দিন আসিয়া গেল।

ছেলেবা সভা কবিতা তাতাকে বিদায়-সম্বর্ধনা দিবার উদ্দেশ্যে চাঁদা উঠাইতেছিল—হেডমাস্টার খুব বাগ দিলেন। বাহাতে সভা না হইতে পায়, সেইজন্য দলের চাইদিগকে ডাকিয়া টেস্ট পরীক্ষার সময় বিপদে ফেলিবেন বলিয়া শাসাইলেন—পবিশেষে স্কুল-ঘরে সভাব স্থানও দিতে চাহিলেন না, বলিলেন—তোমরা ফেল্লাবওবেল দিতে যাচ্ছ, ভাল কথা। কিন্তু এসব বিষয়ে আয়রন্ ড্রিনিং চাই—যাব চবিত্র নেই, তাব কিছুই নেই, তার প্রতি কোনও সম্মান তোমরা দেখাও, এ আমি চাই নে, অন্ততঃ স্কুল-ঘরে আম তাব ভাষণ দিতে পারি নে।

সেদিন আবার ঝড় রফি। মহেন্দ্র সাঁবুই—এব আটচালার জনবিশেক উপবেব ক্রাসেব ছেলে হেডমাস্টারের ভয়ে লুকাইয়া হাতে লেখা অভিনন্দনপত্র পড়িয়া ও গাঁদাফুলের মালা গলায় দিয়া অপূকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাইল, সভা ভেবে পব জলযোগ করাইল। প্রত্যেকে পায়ের ধূলা লইয়া, তাহার বাড়ি আসিয়া বিছানাপত্র গুছাইয়া দিয়া, নিজেবা তাহার বৈকালে ট্রেনে হুগিয়া দিল।

অপূ প্রথমে আসিল কলিকাতায়।

একটা খুব লম্বা পাড়ি দিবে—যেখানে সেখানে—যেদিকে ছুই চোখ যায়—এতদিনে সভাই মুক্তি। আব কোনও জালে নিজে কে জড়াইবে না—সব দিক হইতে সতর্ক থাকিবে—শিকলেব বাধন অনেক সময় অলক্ষিতে জড়ায় কিনা পায়ে।

ইম্পিবিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া সাবা ভারতবর্ধের ম্যাপ ও গ্ল্যাটলাস কন্সদিব ধরিয়া দেখিয়া কাটাইল—ড্যানিয়েলের ওবিয়েন্টাল সিনাবি ও পিস্কার্টনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেব নানাস্থান নোট কবিতা লইল—বেঙ্গল নাগপুর ও ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলবেব নানাস্থানেব ভাড়া ও শ্রম্যাত্ত তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইল। সত্তর টাকা হাতে আছে, ভাবনা কিসের?

কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ছেলেকে চোখে দেখা দেখিয়া যাওয়া দরকার না? সেই দিনই বৈকালের ট্রেনে সে স্বপ্তবাব রওনা হইল।

অপর্ণার বা জায়াইকে এতটুকু ভিন্নত্ব করিলেন না, এতদিন ছেলেকে না
 দেখিতে আসার দরুন একটি কথাও বলিলেন না। বরং এত আদর-যত্ন
 করিলেন যে অপূ নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। অপূ
 বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেছে, এমন সময়ে তাহার খুঁশান্তা
 একটি সুন্দর খোকাকে কোলে করিয়া সেখানে আসিলেন। অপূ ভাবিল—
 বেশ খোকাটি তো? কাদের? খুঁশান্তা বলিলেন—যাও তো খোকন,
 এবার তোমার আপনাব লোকের কাছে। ধান্না যা হোক, এমন মিষ্ট বান
 কখনও দেখি নি। যাও তো একবার কোলে—

ছেলে তিন বৎসর প্রায় ছাড়াইয়াছে—ফুটফুটে সুন্দর গায়ের রং—অপর্ণার
 বত ঠোঁট ও মুখের নীচেকার ভর্তী, চোখ বাপের মত ডাগর ডাগর। কিছু
 সবসুদ্ধ ধরিলে অপর্ণার মুখের আদলই বেশী ফুটিয়া উঠে খোকার মুখে। পথয়ে
 সে কিছুতেই বাবার কাছে আসিবে না, অপর্ণাও মুখ দেখিয়া ভয়ে দ্বিধামাকে
 জড়াইয়া রহিল—অপুর মনে ইচ্ছাতে আঘাত লাগিল। সে হাসিমুখে হাত
 বাড়াইয়া বার বার খোকাকে কোলে আনিতে গেল—ভয়ে শেষকালে খোকা
 দ্বিধামার কাঁধে মুখ লুকাইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় বানিকটা ভাব হঠল।
 তাহাকে দু-একবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিলও। একবার কি একটা গাণি
 দেখিয়া বলিল—ফাপি, ফাপি, উই এরা ফাপি নেবো বাবা—

'প'কে কচি ডিব ও ঠোঁটের কি কোশলে 'ফ' বলিয়া উচ্চারণ করে, কেমন
 অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আব এত কথাও বলে খোকা!

কিছু বেশীর ভাগই বোকা যায় না—উল্টো পালটা কথা, কোন কথার
 উপর ভোর দিতে গিয়া কোন কথার উপর দেয়—কিছু অপুর মনে হয় কথা
 কহিলে খোকার মুখ দিয়া যেন মানিক ধরে—সে যাহাই কেন বলুক না,
 প্রত্যেক ভাঙা, অসুন্দর, অপূর্ণ কথাটি অপূর মনে বিস্ময় জাগায়। সৃষ্টির আদম
 যুগ হইতে কোন শিশু যেন কখনও 'বাবা' বলে নাট, 'ভল' বলে নাট, -
 কোন্ অসাধা সাদনই না খোকা করিতেছে!

পথে বাবার সঙ্গে বাহির হইয়াই খোকা বকুনিত কবিল। হাত-পা নাড়িয়া
 বুঝাইতে চায়—অপূ না বুঝিয়াই অন্তমনস্ক দূরে ঘাট নাড়িয়া বলে—ঠিক
 ঠিক। তারপর বিহ্বল হইয়া খোকা?

একটা বড় সাঁকো পথে পড়ে, খোকা বলে—বাবা খাব—ওই দেখব।

অপূ বলে—আন্তে আন্তে নেমে যা—নেমে গিয়ে একটা কু-উ করাব—

খোকা আন্তে আন্তে ঢালু বাহিয়া নীচে নামে—ভলনিবানের পদটার দাঁকে
 ওদিকের গাছপালা দেখা যাউতেছে—না বুঝিয়া বলে—বাবা, এট মতো একতা
 বাগান—

—কু করো তো খোকা, একটু কু করো।

খোকা উৎসাহের সহিত বাণীর মত সুয়ে ডাকে—কু-উ-উ। পরে বলে—
 তুমি কলুন বাবা?—

অপু হাসিয়া বলে—কু-উ-উ-উ—

খোকা আমোদ পাইয়া নিজে আবার করে—আবার বলে—ভুমি কলুন ?
বাড়ি পরিবার পথে বলে, খবিছাক এনো বাবা—দিদিমা খবিছাক আঁড়বে—
খবিছাক ভালো—সন্ধ্যাবেলা খোকা আরও কত গল্প করে। এখানকার চাঁদ
গোল। মাদিমার বাড়ি একবার গিয়াছিল, সেখানকার চাঁদ ছোট—এতটুকু !
অতঃকু চাঁদ কেন বাবা ? শীঘ্রই অপু দেখিল খোকা হুটুও বড়। অপু পকেট
হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিতেছে, খোকা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া
সবাইকে বলে—দাখ, কত টাকা।—আম্ন আয়—

পবে একটা টাকা তুলিয়া বলে—এতা আমি কিছুতি দেবো না। হাতে মুঠো
দাখিয়া থাকে—আমি কাঁচবে ভাতা কিনব—অপু ভাবে খোকা হুটুও তো
হয়েছে না—দে—টাকা কি করবি ?

—না কিছুতি দেব না—হি-হি ঘাড ঢলাইয়া হাসে।

অপু টাকাটা হাত হইতে লইতে কষ্ট হয়—তবু লয়। একটা টাকার ওর
কি দরকার ? মিচিমিচ্চ নফ।

কলিকাতা পরিবার সময়ে অর্পণার মা বলিলেন—বাবা আমার মেয়ে গিয়েছে
যাক—কিষ্ট তোমার কষ্টই হয়েছে আমার বেশী। তোমাকে যে কি চোখে
দেখেছিলাম বলতে পারি নে, তুমি যে এ-বকম পথে পথে বেড়াচ্ছ, এতে আমার
বুক পেটে যায় তোমার মা বেঁচে থাকলে কি বিয়ে না করে পারতে ? খোক-
নের কথাটাও তো ভাবতে হবে, একটা বিয়ে কর বাবা।

নৌকায় আবার পৌঁছবে ঘাটে আসা। অপর্ণার ছোট খুড়তুত ভাই ননী
ওহাকে তুলিয়া দিতে আনিতোছিল।

খবরশোনে বড়দলের নোনাডল চক্চক্ করিতেছে। মাঝ নদীতে একখানা
বাদাম গোলা মহাজনী নৌকা। দূবে বড়দলের মোহানার দিকে সুন্দরবনের
দোয়া দোয়া অস্পষ্ট সীমাবেশ।

আশ্চর্য। এবই মধ্যে অর্পণা যেন কত দূরের হইয়া গিয়াছে। অসীম ভল-
রাশির প্রান্তরে ওই অনতিস্পষ্ট বনবেশাব মতই দূরেব—অনেক দূরের।

অপুদেব ডিঙখানা দক্ষিণতীর ঘেঁষিয়া যাইতেছিল, নৌকায় তলায় ছায়া
ছায়া শব্দে ঢেউ লাগিতেছে, কোথাও একটা উঁচু ডাঙা, কোথাও পড
দাখিয়া নদীগর্ভে পড়িয়া যাওয়ায় কাশঝোপের শিকডঙলা বাহির হইয়া খুলি-
তেছে। একটা জায়গায় আসিয়া অপু হঠাৎ মনে হইল, জায়গাটা সে
চিনিতে পারিয়াছে—একটা ছোট খাল, ডাঙার উপরে একটা হিজল গাছ।
এই খালটিতেই অনেকদিন আগে অপর্ণাকে কলিকাতা হইতে আনিবার সময়ে
সে বলিয়াছিল—এ কলা-বো, ঘোন্টা খোল, বাপের ছাপটা চেয়েই
দাখ—

তাবপর ঘোমার চড়িয়া খুলনা, বাঁ দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিয়া লইল ওই
যে ছোট ঘরটি—প্রথম যেখানে সে ও অপর্ণা সংসার পাতে।

সেদিনকার সে অণুব আনন্দমুহূর্তটিতে সে কি মগ্নেও ভাবিয়াছিল যে, এমন একদিন আসিবে, যেদিন শূন্যত্বটিতে হৃদে ঘবখানার দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘটনাটা মনে হইবে মিথ্যা স্বপ্ন ?

নির্নিমেষ, উৎসুক, অবাক চোখে সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অণুব কেমন এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল—একবার ঘবখানার মধ্যে যাইতে, সব দেখিতে। হঠাৎ অণুব হঠাৎ উত্থানে মাটির ঝিকট। এখনও আছে—আব হেথানে বসিয়া সে অণুব হাতের জলখাবার খাইয়াছিল। প্রথম যেখানটিতে অণুব ঠাক হইতে আয়না চিকনি বাঁহব কবিয়া তাহার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল ..

ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়া থাকে। স্টেশনের সব স্টেশন আসে ও চলিয়া যায়, অণু শুধু ভাবে বদলেই তীব্র, চাঁদাকাঁটার বন ভাঁটার জল কলকল কবিয়া নামিয়া যাইতেছে .. একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর মতো হাসি—অন্ধকার রাত্রে বিকীর্ণ জলবাশির ওপারে, কাপায় নাড়াইয়া অণুব মনে সেই মনসাপোতাব বাড়ির পুরাতন দিনগুলির মত স্ট্রিমিং চেয়ে হাসিতে বসে। তেছে—আব কক্ষনো যাবো না তোমার সঙ্গে। আব কক্ষনো না। দেখে নিও।

ফাল্গুন মাসে। কলিকাতায় সুন্দর দক্ষিণ হওয়া বহিঃছে, সকালে কে? শীতও, বোর্ডিংয়ের বাবান্দাতে অণু বিছানা পাতিয়াছিল। সব চেয়ে দুই ভাসিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়াই তাহার মনে হইল, আজ অবসর নাহ, তিড শনি নাই আব বেলা দশটায় নাকে মুখে গুজিয়া কোথাও ছুটিতে হইবে না—আজ সমস্ত সময়টা তাহার নিজেই তাহা লইয়া সে বাহ্য দৃশ্য করিতে পারে—আজ সে মুক্ত ১০০ মুক্ত ১০০ মুক্ত—আব কাহাকেও গ্রাস করে না সে। ...কথাটা ভাবিতেই সারা দেহ অণুব উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল—বান ডেই মুক্তির উল্লাস। বহুকাল পর স্বাধীনতার আনন্দন আজ পাওয়া গেল। ৭ আকাশের ক্রমবিলীর্ণমান নক্ষত্রটাব মতই আজ সে দুই পদেব পদিক অণুব নার উদ্দেশ্যে যে যাত্রাব আবন্ত হয় ত আজই হয়, কি কালই হয়।

পুলকিত মনে বিছানা উঠিয়া নাপিত ডাকাইয়া কামাইল দর্শনা, কান্ড পরিল। পুরাতন শৌখিনতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠাব দর্শন দরজিব দোকানে একটা মটকার পাঞ্জাবি তৈয়ারি কবিতো দিয়াছিল, সেটা নিজে গিয়া লইয়া আসিল। ভাবিল—একবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে আসি নতুন বই কি এসেছে, আবার কতদিনে কলিকাতায় ফিবি, কে জানে? বৈকালে মিউজিয়ামে রক্তফেলার ট্রাফেঁর পক্ষ হইতে মশক ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। অণুব গেল। বক্তৃতাটি সচিত্র। একটি ছবি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মশকের জীবনেতিহাসের প্রথম পর্ধ্যায়ে সেটা থাকে কীট—তারপরে হঠাৎ কীটের খোলস ছাড়িয়া সেটা পাখা গজাইয়া উঠিয়া যায়। ঠিক যে সময়ে কীটদেহটা অসাড়, প্রাণহীন, অবস্থায় জলের তলায়

ডুবিয়া যাইতেছে - নব-কলেবরধারী মশকটা পাখা ছাড়িয়া জল হইতে শূন্যে উড়িয়া গেল।

মাগধেও তো এমন হইতে পারে। জলের তলায় সম্ভরণকাণী অন্যান্য মশক কীটের চোখে তাদের সম্মুখিতা মণিয়াই গেল - তাদের চোখের সামনে দেহটা তলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু জলের উদ্দেশ্যে যোগতে মশক নবজন্মলাভ করিল, এরা তো আর কোনও খবর গ্রহণে না, সে জগতে প্রবেশের অধিকার তখনও তাগা তো অর্জন করে নাই - মুহুরা ছাড়া অন্যতঃ তাদের চোখে যা মুহুরা তাই দ্বারা। এই মশক নিম্নস্তরের জীব, তার পক্ষে যা বৈজ্ঞানিক সভ্য মানুষের ক্ষেত্রে তা কি মিশ্রণ

কপাটী সে আবিষ্কারে আবিষ্কারে দিল।

যাইবার আগে একবার পরিচিতি বন্ধদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া পরদিন সকালে সে সেই কবিগায় বন্ধুটির দোকানে গেল। দোকানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না, উড়িয়া ছোকরা-চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইয়া পরে সে বাসায় মগ্নে ঢুকিল।

সেই বেলায় বাড়ি - সেই বাড়িটাই আছে। সন্ধ্যা উঠানের একপাশে দু-খানা বেলাঘরবোঝে মিলিত। বন্ধুটি নেড়া দিয়া কি বিষিতেছে, পাশে বসে একখানা খবরের কাগজের দৃশ্য একাংশ ধূসর হয়ে উঠে। সন্ধ্যা ঘন ঘন কুলস্ক-কুলস্ক নানা শিকড় বকড় বোনে শুকনো হইয়াছে।

বন্ধু হাসিয়া বলিল, এসে এসে, তারপর এতদিন কোথায় ছিলে? কিছু মনে করেনা না ভাই খাবার হাত, মৎস্য ইত্যাদি করছি - এই দেখ না ছাপানো লেবেল চন্দ্রখণী মাছ, মহিলা হোম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিন্ডিকেট - আজকাল মেয়েদের নাম না দিলে গুলিকের নিমন্ত্রণ পাওয়া যায় না, তাই এই নাম দিয়ে। বস বস - ওগো, বাব হুয়ে এসে না। অগতঃ এসেছে, একটু চাটা করো।

অগু হাসিয়া বলিল, সিন্ডিকেটের সভা তো দেখছি আপাতত মোটে দুজন, দুই খাণ্ডোমার স্ত্রী এবং পুং স্নাতকটিও সভা তও বুঝি।

হাসিমুখে বন্ধু হঠাৎ ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, তাহার অবস্থা দেখিয়া অপর মনে হইল, অগা শিলখানাতে তিনিও কিছু পূর্বে মাছন-চোখা কাখে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার আসিবার সংবাদ পাইয়াই শিল ছাড়িয়া ঘবেব মধ্যে পলাইয়াছিলেন। হাতে-মুখেও শুঁড়া ধুইয়া ফেলিয়া সভা ভাষা হইয়া বাহির হইলেও মাথাব এলোমেলো উত্তপ্ত চুলেও কপালের পাশে ঘামে সে কথা জানাইয়া দেয়।

বন্ধু বলিল কি কবি বল তাই, দিনকাল যা গড়েছে, পাণ্ডনাদারের কাছে দুবেলা অপমান হুঁচি, ছোট আদালতে নালিশ করে দোকানের কাশখাস্তটা সীল করে রেখেছে! দিন একটা টাকা খরচ - বাসায় কোন দিন খাওয়া হয়,

কোন দিন—

বন্ধু-পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি ও-কাঁহুনি গেলো অল্প সময়। এখন উনি এলেন এতদিন পর, একটু চা খাবেন, ঠাণ্ডা হবে, তা না তোমার কাঁহুনি শুরু হ'ল।

আহা আমি কি পথের লোককে ধবে বলতে যাই? ও আমাব ক্লাসফ্রেণ্ড, ওদের কাছে দুঃখের কথাটা বললেও—ইস্কে, পাতা চায়ের প্যাকেট একটা খুলে নাও না? আটা আছে নাকি? আর ছাখ, না হয় ওকে খান চারেক রুটি অন্তত—

—আচ্ছা, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। পরে অপূর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি বিজয়া দশমীর পর আর একদিনও এলেন না যে বড?

চা ও পরোটা খাইতে খাইতে অপূ নিজের কথা সব বলিল—শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছে, সে কথাটাও বলিল। বন্ধু বলিল, তবেই ছাখ ভাই, তবু তুমি একা আর আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই কলকাতা শহরের মধ্যে আজ পাঁচ পাঁচটি বছর যে কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি তা আর—এই সব নিয়ে একরকম চালাই, পয়সা-প্যাকেট চা আছে, খদিবাদি মোদক আছে। মাজনের লাভ মন্দ না, কিন্তু কি জান, এই কোঁটোটা পড়ে যায় দেড় পয়সার ওপর মাজন, লেবেলে ক্যাপসুলে তাও প্রায় দু'পয়সা—তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি কবব, স্বামী-স্ত্রীতে খাটি কিন্তু মজুরী পোষায় কই? তবুও তো দোকানীর কমিশন ধরি নি হিসেবের মধ্যে। এদিকে চার পয়সার বেশী দাম করলে কম্পিট করতে পারব না।

খানিক পরে বন্ধু বলিল—ওহে তোমাব বৌঠাককণ বলেছেন, আমাদের তো একটা খাওয়ানো পাওনা আছে, এবার সেটা হয়ে থাক না কেন?—বেশ একটা ফেন্সারওয়েল ফিট হয়ে যাবে এখন, তবে উল্টো, এই যা—

অপূ মনে মনে ভারী কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল বন্ধু-পত্নীর প্রতি। ইহাদের মলিন বেশ ও ছেলেমেয়েগুলিব শীর্ণ চেহারা হইতে ইহাদের ইতিহাস সে ভালই বুঝিয়াছিল। কিন্তু ভালো খাবার আনাইয়া খাওয়ানো একটু আয়োন আশ্রাদ করা—কিন্তু হস্ত সেটা দরিদ্র সংসারে সাহায্যের মত দেখাইবে। যদি ইহারা না লয় বা মনে কিছু ভাবে ১০০০ পক্ষ হইতে প্রাপ্যবটা আসাতে সে ভারী খুশী হইল।

ভোজের আয়োজনে ছ-সাত টাকা ব্যয় করিয়া অপূ বন্ধুর সঙ্গে ঘুরিয়া বাজার করিল। কই-মাছ, গলদা-চিংড়ি, ডিম, আলু, ছানা, দই, সন্দেশ।

হয়তো গুব বড ধরনের কিছু ভোজ নয়, কিন্তু বন্ধু-পত্নীর আদরে হাসিমুখে তাহা এত মধুর হইয়া উঠিল। এমন কি এক সময়ে অপূর মনে হইল আসলে তাহাকে খাওয়ানোর জন্যই বন্ধু-পত্নীর এ চল। লোকে ইচ্ছদেবতাকেও এত যত্ন করে না বোধ হয়। পিছনে সব সময় বন্ধুব বোটি পাখা হাতে বসিয়া

তাহাদের বাতাস করিতেছিলেন, অপু হাত উঠাইতেই হাদিমুখে বলিলেন—ও হবে না, আপনি আর একটু ছানার ভালনা নিন—ও কি, মোচার চপ পাতে রাখলেন কার জন্যে ? সে শুনব না—

এই সময় একটি পনেরো-ষোল বছরের ছেলে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধু বলিল—এসো, এসো কুঞ্জ, এসো বাবা, এইটি আমার শালীর ছেলে, বাগবাজারে থাকে। আমার সে ভাস্কেরা-ভাই মারা গেছে গত শ্রাবণ মাসে। পাটের প্রেসে কাজ করত, গঙ্গার ঘাটে রেললাইন পেরিয়ে আসতে হয়। তা রোজই আসে, সেদিন একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তা ভাবলো আমার অতখানি দূরে যাবে ? এমন গাড়ির ওলা দিলে গলে আসতে গিয়েছে, আর এমন গাড়িখানা দিয়েছে ছেড়ে। তারপর চাকর কেটে-কটে একেবারে আর কি—হুঁটি যেয়ে, আমার শালী আর এই ছেলেটি, একরকম করে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে চলছে। উপায় কি ?...তাই আজ ভাল খাওয়াটা আছে, কাল খুঁ বললে, যাও কুঞ্জকে বলে এসো—ওবে বসে যা বাবা, থালা না থাকে বসে যা না একখানা পাতা দেও। হাত-মুখটা ধুয়ে আর বাবা—এত দেরি করে বেললি কেন ?

বেলা বেশা ছিল না। খাওয়া-দাওয়া পর গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। অপু বলিল, আচ্ছা, আজ উঠি নাই, বেশ আনন্দ হ'ল আজ অনেকদিন পরে—

বন্ধু বলিল, ওগো, অপুকে ভালোটা হবে গলির মুখটা পার করে দাও তো ? আমি আর উঠতে পারিনে—

একটা ছোট কেবোসিনের টেমি হাতে বোটি অপু পিছনে পিছনে চলিল। অপু বলিল, থাক, বো ঠাকরণ, আর এগোবেন না, এমন আর কি আশ্চর্য্য যান আপনি—

- আবার কবে আসবেন ?

ঠিক নেই, এখন একটা লগা পাড়ি তো দি —

- কেন, একটা বিষয়ে-খা করুন না ? পপে পপে সমাসি হয়ে এ রকম বেডানো কি ভাল ? যাও তো নেই শুনেছি ! কবে যাবেন আপনি ?... যাবার আগে একবার আসবেন না, যদি পারেন।

তা হয়ে উঠবে না বৌ-ঠাকরণ। ফিরি যদি আবার তখন বরং—আচ্ছা নমস্কার।

বোটি টেমি হাতে গলির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সে সকালে উঠিয়া ভাবিয়া দেখিল, হাতের পয়সা নানারকমে উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন দেরি করিলে যাওয়াই হইবে না। এখানেই আবার চাকরির উমেদার হইয়া দোরের দোরের ঘুরিতে হইবে। কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কিছু ঠিক হইল না। একবার মনে হয় এটা ভাল, আবার মনে হয় ওটা ভাল। অবশেষে স্থির করিল স্টেশনে গিয়া সম্মুখে যা

পাওয়া যাইবে, তাহাতেই উঠা যাইবে। জিনিস-পত্র বাঁধিয়া ওছাইয়া হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখিল, আব মিনিট পনেরো পরে চাব নম্বর প্ল্যাটফর্ম হইতে গয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়িতেছে। একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া মোজা ট্রেনে উঠিয়া জানলাব ধাবের একটা ভাষগায় সে নিজেব বিছানাটি পাতিয়া বসিল।

অপু কি জানিত এই যাত্রা তাহাকে কোন পথে চালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে? এই চারটা বিশ মিনিটের গয়া প্যাসেঞ্জার—‘বর্তী’ জীবনে সে কতবার ভাবিয়াছে যে সে তো পাঁজি দেখিয়া যাণ শুরু কবে নাই কিন্তু কোন মহাশুভ মাহেন্দ্রক্ষণে সে হাওড়া স্টেশনে থার্ড ক্লাস টিকিট খাব ঘুলঘুলিতে ফিবিজি মেসের কাছে গিয়া একখানা টিকিট চাহিয়াছিল—দশ টাকার একখানা নোট দিয়া সাড়ে পাঁচ টাকা ফেরৎ পাইয়াছিল। মানুষ যদি তাহাব ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত।

অপু বর্তমানে এসব কিছুই ভাবিতেছিল না। এত বয়স হইল, কখনও সে গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনে বেড়ায় নাই, সেই ছেলেবেলায় এটিয়ার চাপা ইস্যু ইণ্ডিয়ান রেলও আব কখনও চড়ে নাই বেল চড়িয়া দূরদেশে যাত্রার আনন্দে সে ছেলেমানুষের মতই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাস্তার ধারে গাছপালা ক্রমশঃ ক্রিপ দলাইয়া যায়, লক্ষ্য করিয়া ইচ্ছা অনেকদিন হইতে তাহাব আছে বর্ধমান নগর দেখিতে দেখিতে গেল কিন্তু তার পবই অঙ্গতাবে আব দেখা গেল না।

অপরাজিত

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পবদিন বৈকালে গয়ায় নামিয়া সে বিপ্লবমন্দ্রমে গিও দিল। ভাবল আমি এসব মানি, বা না মানি কিন্তু সবদুর্কৃত্যের জন্যে যদি নিকট থাকে বাঁশমায়ের উপকায়ে লাগে। পিণ্ড দিবস সময়ে ভাবিয়া ভাবিয়া গেলবেল য বা পরে যে দেখানে মাঝা গিয়াছে বলিয়া জানা ছিল তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্যে গিও দিল। এমন কি, পিসিয়া হিন্দী ঠাকুরকে সে মনে করিত না পারিলেও দ্বিদিব যুগে শুনিয়াছে, তাঁর উপদেশ—অত্যাচারী আইনা বুড়ির উপদেশও।

বৈকালে বৃদ্ধ গয়া দেখিতে গেল। অপু যদি কাহারও ভাবের কথা পকে তবে তাহার আবালা কথা এই সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর। ছেলের নাম তাই দে রাখিয়াছে অমিত্যভ।

বাষে ক্ষীণশ্রোতা কল্প কটা বয়েব বাঁশমায় ক্লাসদেহ এলাইয়া দিয়াছে, ওপারে হাজারিবাগ হেলাব সোমাস্তবর্তী পাহাড়শ্রী, সারাপদে ভাবী সুন্দর চায়, গাছপালা, পাখির ডাক, ঠিক এমন বাংলাদেশ। মোজা বাধানো রাস্তাটি ফলুর ধারে ধারে ডালশালার চায়ায় চায়ায় চলিয়াছে, সাবাপথ অপু যপ্লাস্তিত্বের মত একার উপর বসিয়া রহিল। একজন হালফাশানের কাপড়-

প্রাচীনকালের সেই পাঠস্থানটি এমন সন্ত্রাসে দেখিতে আদিয়াছিল? মনে পড়ে সেই অশ্রু বারি, নবজাত শিশুর টানমুখ...চন্দক...গয়ান জঙ্গলে দিনের পর দিন সে কি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ মোচর গাড়ি? শতাব্দীর ঘন অরণ্য পার হইয়া এমন একদিন নামিয়াছে পৃথিবীতে পুরাতনের সবই চূর্ণ করিয়া উল্টাওয়া-পাল্টাইয়া নবযুগের পঙ্কন করিয়াছে। রাজা শুকেশ্বরের কমলাবস্ত্র মহাকালের শ্রোতব মুখে ফেনাব ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোন চক্রে রাখিয়া যায় নাই—কিন্তু তাঁহার দ্বিগুণী পুত্র দিকে দিকে যে রহস্য কমলাবস্ত্রের অঙ্গুষ্ঠ সি হাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পুত্রে নিকট এই খাড়াই হাভাব বৎসর পবেও কে না ম'থা নত করিবে।

[illegible]

গাছপালা, খাল, নদী, পাহাড়, কাঁকর-ভরা, ভূমি, গোটী শাহাবাদ জেলাটা তাহাৰ পায়ৈৰ ওলা দিয়া প্লাটীত আছে। অনেক দূৰ পৰ্যন্ত শোণ নদেৰ বালুব ঢাৰী জোংৰোম অংশ দেখাটোৱা আছে। নীলনদ ঠিক এটা মেনে নীলনদ। এনেদৰে সাত আঠ মাইল গাৰ পিঠৈ চড়িয়া গেলে ফাৰাও বামেসিসেৰ তৈৰিৰ আৰু সিহঁতলো বিয়াট প্ৰাণৰ মন্দিৰ—ধৰম অম্পষ্ট কুমাৰাৰ ঘেৰা মৰুভূমিৰ মনো থাওঁওকালোৰ বিস্মৃত দেবদেৱীৰ মন্দিৰ, এপিস, আইসিস, হোৱাস, হাথৰ, বা—নীলনদ যেমন গতিৰ মুখে উপলব্ধিও পাশে ঠেলিয়া ৰাখিয়া প্লা-ইয়া চলে—মহাকালোৰ বিয়াট ৰথচক্ৰ তাত্ৰ-নৃত্যচন্দে সব স্থাৰব অস্থাৰৰ জিনিসকে পিচু ফেলিয়া মহাবেগে চলিবাৰ সময় এই বিয়াট গ্ৰানাইট মন্দিৰকে পদেৰ পাশে ফেলিয়া ৰাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, জনহীন মৰুভূমিৰ মনো বিস্মৃত সভ্যতাৰ চিহ্ন—মন্দিৰটো কোন বিস্মৃত ও বাতিল দেবদেৱীৰ উদ্দেশে গঠিত

ও উৎসর্গীকৃত !

একটু রাতে ভদ্রলোকটি বলিলেন, এ লাইনে ভাল খাবার পাবেন না। আমার সঙ্গে খাবার আছে, আসুন খাওয়া যাক।

তাহার স্ত্রী কলার পাতা চিরিয়া সকলকে বেষ্ট্রির উপর পাতিয়া দিলেন—লুচি, হালুয়া ও সন্দেশ,—সকলকে পরিবেশন করিলেন। ওদলোকটি বলিলেন, আপনি একতক বেশী লুচি নিন, আমরা তো আজ মোগলসরাইয়ে ত্রেক-ভানি করব, আপনি তো সোজা দিল্লী চলেছেন।

এ-ও অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা। পথে বাহির হইলে এত শীঘ্রও এমন ঘনিষ্ঠতা হয়! এক গলির মধ্যে শহবে শত বয়স বাস করলেও তো তাহা হয় না? ভদ্রলোকটি নিজের পরিচয় দিলেন, নাগপুরের কাছে কোন গবর্নমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট-এ কাজ করেন, ছুটি লইয়া কালীঘাটে শস্তরবাড়ি আসিয়াছিলেন, ছুটি আস্তে কর্মস্থানে চলিয়াছেন। অপূকে ঠিকানা দিলেন। বার বার অনুবোধ করিলেন, সে যেন দিল্লী হইতে ফিরবার পথে একবার অতি অবশ্য অবশ্য যান, বাঙালীর মুখ ঘোটে দেখিতে পান না—অপু গেলে তাহা বা তো কথা কহিয়া বাঁচেন। মোগলসরাই-এ গাড়ি দাঁড়াইল। অপু মালপত্র নামাইতে সাহায্য করিল। হাদিয়া বলিল—আচ্ছা বৌ-ঠাকরুণ, নমস্কার শীগগিরই আপনাদেব ওখানে উপস্থিত কবছি কিন্তু।

দিল্লীতে ট্রেন পৌছাইল রাত্রি সাড়ে এগারোটায়।

গাজিয়াবাদ স্টেশন হইতেই সে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া দেখিল—যে-দিল্লীতে গাড়ি আসিতেছিল তাহা এস. কপূর কোম্পানীর দিল্লী নয়, লেডিস্‌লেটিভ স্ন্যাসেমন্ট্রীক মেম্বারদের দিল্লী নয়, এডিসিয়াটিক পেট্রোলিয়মের এজেন্টের দিল্লী নয়—সে দিল্লী সম্পূর্ণ ভিন্ন—বহুকালের বহুযুগের নরনারীদের—মহাভারত হইতে শুরু করিয়া রাজসিংহ ও মাদবাক্ষণ,—সমুদয় কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পনা ও ইতিহাসের মাল মশলায় তাহার প্রতি ইটখানা তৈরি, তার প্রতি ধূলিকণা অপূর মনের রোমাসে সকল নায়ক-নায়িকার পূণ্যপাদপূত—ভীষ্ম হইতে আশুরজ্জ্বেব ও সদাশিব রাও পর্যন্ত—গান্ধারী হইতে জাহানারা পর্যন্ত—সাধারণ দিল্লী হইতে সে দিল্লীর দূরত্ব অনেক!—দিল্লী কেনোজ দূর অন্ত, বহুদূর—বহুশতাব্দীর দূর পারে, সে দিল্লী কেহ দেখে নাই। আজ নয়, মনে হয় শৈশবে মায়ের মুখে মহাভারত শোনার দিন হইতে, ছিরের পুকুরের ধারের বাঁশবনের ছায়ার কাঁচা শেওড়ার ডাল পাতিয়া ‘রাজপুত জীবন-সঙ্ঘা’ ও মহাফুজ জীবন-প্রভাত’ পড়িবার দিনগুলি হইতে, সকল ইতিহাস যাত্রা, থিয়েটার, কত গল্প, কত কবিতা, এই দিল্লী, আগ্রা, সমগ্র রাজপুতানা ও আর্ধাবর্ত—তাহার মনে একটি অতি অপকূপ, অভিনব, স্বপ্নময় আসন অধিকার করিয়া আছে—অন্ত কাহারও মনে সে রকম আছে কিনা, সেটা প্রশ্ন নয়, তাহার মনে আছে এইটাই বড় কথা।

কিন্তু বাহিরে খন অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না—অনেকক্ষণ চাছিয়া কেবল কতকগুলি সিগন্যালের বাতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, একটা প্রকাণ্ড ইয়ার্ড কেবিন, লেখা আছে ‘দিল্লী অ সন ইন্সট’—একটা গ্যাসোলিনের ট্যাক— তাহার পরট চারিদিকে আলো কিও প্রাটফর্ম— প্রকাণ্ড দোতলা স্টেশন—সেই পিয়াস সোপ, ক্রিচিংস পাউডার, হলুস ডিস্টেম্পার, লিপটনের চা। আবল আফ্রিক হাকিমের বে সেনেসেকাৎ ডাক্তার দাদে মলয়।

নিজের ছোট কানভাসের সূঁচকেন ও ছোট বিছানাটা হাতে লইয়া অপু স্টেশনে নামিল—বাঁও অনেক শহর সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ওয়েস্ট রুম দোতলায়, রাণি সেখানে কাঁচানোই নিবাস্ত মনে হইল। সকালে ঠাণ্ডা জিনিসপত্র স্টেশনে জমা দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। খন মার্চল-বাপ্পী দাঁড় শোভাযাত্রা করিয়া সুসজ্জিত হস্তীপুত্রে সোনার হাওদার কোন শাহজাদী নগর সম্মুখে বাহির হইয়াছেন কি? হঠাৎ অবদৈনিকারী ও ভয়ানকদল আশ্রয় ওসলীম করিয়া অগ্রহভিক্ষাব অপেক্ষায় কবচোড় পাড় আছে কি? নব আগন্তুক নবোদনাথ পাংশাংগেমের কোন সবাইখানায় ধূমপানরও রক পারস্যদেশীয় মেয়ের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কিন্তু এ যে কেবল কলিকাতার মতই সব। এমন কি মল্লিক জুয়েলাসের বিজ্ঞান পরীক্ষা। দুজন লোক কলিকাতা হইতে বেড়াইতে আসিয়াছিল টাঙাটা সস্তা পড়িবে বলিয়া তাকে তাহ বা সঙ্গে লইবার প্রস্তাব কাল। অপুবেব পথে একজন বলিল, মনে ই আবও বার দুই দিল্লী এসেছি সুতবেব মুনগী কটিলেট খান নি কখনও না? আঃ—সে এ জিনিস, চন্দ্র, এক ন কানিলেই চড়াব দিয়ে ওবে উঠব নতবমিনাবে।

বালাকালে দেওয়ানপুবে পড়িবার সময় পুনো দিল্লীর কথা পড়িয়া তাহার কল্পনা কবিত্তে গিয়া বাব বাব স্থলের পাশেব একটা পুরাতন ইটবেলাব ছবি অপু মনে উদয় হইত। আজ অপু দেখিল পুরাতন দিল্লী বেলোব সে ইটের পাড়টা নম। সুতবমিনার নতুন দিল্লী শহর হইতে যে এতদূর তাহা সে ভাবে নাই। সুতবমিনা সে দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই দাঁড় পথের দুধারে মুকচুমির মত অগ্রবব কাটাগাছ ও ফগিমনসায় ঝোপে ভরা বৌদদম প্রান্তবের এখানে ওখানে সবত্র ভাঙা বাড়ি, মিনার মসজিদ, কবর, খিলান, দেওয়াল। সাতটা প্রাচীন মৃত বাজধানীর মুক কঙ্কাল পথের দুধাবে উঁচুনিচু জমিতে বাবলাগাছ ও কাণ্টাস গাছেব ঝোপ-ঝাপের আড়ালে হতগোরব নিস্তব্ধতায় আগ্রগোপন করিয়া আছে—পৃথীরায় পিখোবার দিল্লী, লালকোট, দাসবংশের দিল্লী, তোগলকদের দিল্লী, আলাউদ্দিন খিলজার দিল্লী, শিরি ও জাহানপনহা, মেগলদের দিল্লী। অপু জীবনে এরকম দৃশ্য দেখেব নাই, কখনো কল্পনাও করে নাই, সে অবাক হইল, অভিভূত হইল, নীরব হইয়া গেল, গাইড-বুক উন্টাইতে ভুলিয়া গেল, মাপের নম্বর মিলাইয়া দেখিতে ভুলিয়া গেল—মহাকালের এই বিরাট শোভাযাত্রা একটার পর একটা বায়োকোপের ছবির মত

যুগ্মে দ্বারতে প্রবেশ করিলে গেল কুতব হইতে অনেক দূরে গিয়াসউদ্দীন
তোগলকো এসমাপ্ত নগর—তোগলকাব দে। গ্রীষ্মে এদূরবেব স্বর্ণোদে তখন
চাষন দেব উষভূমি আশ্রন-রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে তোগলকাবদে
দেখিয়া মনে হইল যে কোন দেতোর হাতে গাথা এক বিরাট পাশা-দ্রুম।
তখন বিশাল উষভূমি পত্রহান বাবুল ও কটকময় কাণ্ডাসের পটভূমিতে সব
বেগে সে ঘন এক বন—অনুবর্ষীয় সু উচ্চ পাশা চূর্ণপ্রাচীর হইতে সিদ্ধ,
কাঞ্চিষাভ, মালব, পাশাব,—সারা আদ্যবত্রে প্রকটি করিয়া দাড়াইয়া
আছে। কোথাও সূক্ষ্ম কারকাণ্ডের প্রচোফা নাই বটে, নিচু বটে, কক্ষ
বটে, কক্ষ সবা মিলিয়া এমন বিশালভার সৌন্দর্য পৌরষে, সৌন্দর্য,
ববনভার সৌন্দর্য—এমনকে ভীষণভাবে আশ্রিত করে, হৃদয়কে বজ্রমুগ্ধিতে
আঁকড়াইয়া ধরে। সব আছে, কিন্তু দহে পাশ নাই চাষিগণে বনসমুদ্র,
কাঁটাগাছ বিশালতা, বড় বড় পাথর গড়াইয়া উঠিয়া স্বয়ং বৃজাহ্মা বাঁধিয়াছে
—মৃতমুখের প্রকটি মাত্র।

পৃথিবীর দুই প্রান্তের চব্বতরাব্ ড ন এখন সে দাঁড়াইয়া—হি-হি কি মুশকিল,
কি অদ্ভুতভাবে নিশ্চিন্দ পুন্সে সেই বনের ধারের ছিবে পুণ্ডা এ পুণ্ডা সঙ্গে
জড়িত হইয়া আছে, বালো তাহারই ধারের শেওড়ার বন বাসিয়া জীবন-প্রভাত
পড়িতে পড়িতে কতবার কল্পনা করিত, পৃথিবীর দুই প্রান্তে পুণ্ডার ডাঁড়া
ও-দিকের পাড়ার মত বৃষ্টি। এখনও ছাড়া দেখিতে পাইতেছে—কতকগুলি
গুগলি শামুক, ও-পারের বাঁশঝাড়। এক চব্বতরাব্ ডের দাঁড়াইয়া থাকিতে
থাকিতে দূর পশ্চিম আকাশের চাবিগারের মহাশ্মশানের উপর ধূসর ছায়া
ফেলিয়া দাড়াইবার উত্থান-পতনের কাহিনী আকাশের পটে আভনের অন্ধরে
লিখিয়া দৃষ্টি অন্ত গেল। সে সব অতি পবিত্র গোপনীয় মুহূর্ত্ত অপূর্ণ জীবনে
—দেবতার তখন কানে কানে কথা বলেন, তাহার জীবনে একপ সূর্যাস্ত আর
কটা বা আসিয়াছে? ভয় ও বিস্ময় দুইই হইল, সারা গায়ে যেন কাঁটা
দিয়া উঠিল, কি অপূর্ণ অসুস্থিতি। জীবনের চক্রবালনেমি এতদিন যেন কত
ছোট, অপরিপূর্ণ ছিল, আজকার দিনটির অপূর্ণ তাহা জারিত হইল।

२७५

ছড়াইতে ছড়াইতে অপূৰ্ণ অশ্রু বাধা মানিল না। ঐশ্বৰ্যের মধ্যে, ক্ষমতার দস্তাবেজ মধ্যে লালিত হইয়াও পূর্ণাবর্তী শাহাজাদীর এ দীনতা ভাবুকতা, তাহার কল্পনাকে যুগ্ম বাণীয়াছে চিরদিন। এখনও মনে বিশ্বাস হয় না, যে সে যৌবনে দীড়াইয়া আছে সেটা সত্যই জাভানাবর কবর-ভূমি। পরে সে মসজিদ হইতে একজন প্রৌঢ় মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া কবরের শিবো-দেশের মাঝে মলকের নেই বিখ্যাত ফার্সী কবিতাটি দেখাইয়া বলিল, 'যেহ'ব নি কবকে পুয়ে হাম লখ লেছে।

প্রৌঢ়টি কিঞ্চিৎ বকনিশের লোভে বামপ্লেয়া বাডালীবাটুকিকে ধুশী করার জন্য ভোবে ভোবে পড়িল।

বিহুস গাহ্ কসে ন-গোশদ মজাব-ইমা-গ।

কি কব-গোশ-ত-গাহান হামি-মীগাহ্ বস অস্ত্।

পরে সে কবি আমায় খসকা কবের উপাও পুণ ছড়াইল।

পনদিন বৈকালে শাহজাহানের লালপায়ের কেলা দেখিতে গিয়া অপূর্ণের পূসব ছায়ায় দেওয়ান-ই-খাসের পাশের খোলা ছাদে একখানা পাখরের বেঞ্চিতে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। মনে হইল এসব স্থানের জীবন-ধারার কাহিনী লেখা লিখিতে পারে নাই। গড়ে, উল্লাসে, নাটকে, কবিতায় যাহা পড়িয়াছে, সে সব সত্যি কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে ছেব উল্লিসা, উদিপুণী বেগম, সে সমতাভমহল, সে জাহানারা—আবালা তাহাদের সঙ্গে পরিচয়, সবাগুলিই কল্পনা-সৃষ্টি প্রাণী। বাস্তবজগতের সমতাভ বেগম, উদিপুণী ছেব উল্লিসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কে জানে এখানকার সে সব বহুভাষা ইংরেজি? যুগ যুগী তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞে, চুহিভাষার পতি পাখা স্বপ্ন তারসাক্ষী আছে কিঞ্চিৎ তাহা তো কথা বলিতে পারে না।

তিনদিন পর সে বৈকালের দিকে কান্দী লাইনের একটা ছোট স্টেশনে নিজের বিছানা ও সুটকেসটা লইয়া নামিয়া পড়িল। হাতে পয়সা বেশী ছিল না, বলিয়া প্যাসেঞ্জার টেনে এলাহাবদ আসিত বাধা হয়—তাই এত দেরি। কয়েকদিন যান নাই, চুল বন্ধ উঠ-পড়—জার পশ্চিমা বাতাসে ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে।

চেন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র স্টেশন, সমুখে একটা ছোট পাহাড়। দোকান-বাড়াবও চোখে পড়িল না।

স্টেশনের বাহিরের বাধানে চাতালে একটু নির্জন স্থানে সে বিছানার বাঙালটা ধুলিয়া পাতিল। কিছুই ঠিক নাই, কোথায় যাইবে, কোথায় শুইবে মনে এক অপূৰ্ণ অজানা আনন্দ।

সত্তরঞ্চি উপর বসিয়া সে খাটা ধুলিয়া খানিকটা লিখিল, পরে একটা সিগারেট খাইয়া সুটকেসটা ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। টোকা মাথায় একজন গোড় যুবককে কাঁচা শালপাতার পাইপ খাইতে খাইতে কৌতূহলী

চোখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অপু বলিল, উমেরিয়া হিন্নাসে কেতঃ
দুব হোগা ?

প্রথমবার লোকটা কথা বুঝিল না। দ্বিতীয়বারে ভাড়া হিন্দীতে বলিল,
তিশ মীল।

ত্রিশ মাইল বাস্তা। এখন সে যায় কিসে? মহামুশকিল। জিঙাসা কবিয়া
জানিল, ত্রিশ মাইল পথের দুধাবে শুধু বন আর পাহাড়। কথাটা শুনিয়া
অপু ভাবি আনন্দ হইল। বন, কি একম বন? দুব ঘন? বাঘ পাণ্ড
আছে। বাঃ—কিস্ত এখন কি কবিয়া যাওয়া যায়?

কথায় কথায় খোঁড় লোকটি বলিল, তন টাকা পাইলে সে নিজের ঘোড়াটা
ভাড়া দিতে বাজী আছে।

অপু বাজী হইয়া ঘোড়া আনিতে বলতে লোকটা বিস্মিত হইল। আর
বেলা কতটুকু আছে, এখন কি জঙ্গলের মধ্যে যাওয়া যায়? অপু নাছোড়-
বান্দা। সামনের এই সুন্দর জোৎস্নাওবা বায়ে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়ায় চাওয়া
যাওয়ার একটা দুঃস্বপ্নীয় লোভ তাহাকে পাইয়া বলিল—জীবনে এ দুঃস্বপ্ন
কটা আসে, এ কি ছাড়া যায়?

গৌড় লোকটি জানাইল, আরও একটা একটাকা খোরাকি পাইলে সে তলুপি
বহিতে রাজী আছে। সম্ভাব্য কিছু পথে অপু ঘোড়ায় চাওয়া বওনা হইল—
পিছনে মোট-মাথায় লোকটা।

দ্বিধা রাত্রি—ফেঁশন হইতে অল্পদূরে একটা বস্তি, একটা পাহাড়ী নাল, বাক
ঘুবস্বাই পথটা শাল-বনের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। চারিদিকে জোনাকি কোকা
অলিতেছে—রাত্রির অপূর্ব নিশ্চকতা, ত্র্যমদশাব চাদের আলো শাল ল'শের
পাতার ফাকে ফাঁকে মাটির উপর যেন আলো-আঁধারের দৃষ্টি-কটা
ভাল বুনিয়া দিয়াছে। অপু পাহাড়ী লোকটার নিকট হইতে একটা শাল
পাতার পাইপ ও সে-দেশী তামাক চাহিয়া লইয়া ধরাইল বটে, কিন্তু তখন
দিতেই মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—শালপাতার পাইপটা ফেলিয়া দিল।

বন সত্যি ঘন—পথ আঁকা বাঁকা ছোট ঝরণা এখনে-ওখানে, উপল বিতানো
পাহাড়ী নদীর তীরে ভোট ফার্নের ঝোপ, কি ফুলের সুবাস, বাত্রিচর
পাখির ডাক। নির্জনতা, গভীর নির্জনতা।

মাঝে-মাঝে সে ঘোড়াকে ছুটাইয়া দেয়, ঘোড়া-চড়া অভ্যাস তাহার অনেক
দিন হইতে আছে। বালাকালে মাঠের ছুটা ঘোড়া দরিয়া কত চাড়
স্বাছে, চাপদানোতেও ডাক্তারবাঁটুর ঘোড়ায় প্রায় প্রতিদিনই চড়িত।

সারারাত্রি চলিয়া সকাল সাড়ে সাতটার উমেরিয়া পৌঁছিল। একটা ছোট
গ্রাম,—পোস্টাফিস, ছোট বাজার ও কয়েকটা গালার আডত। ফরেস্ট রেঞ্জার
ভদ্রলোকটির নাম অবনীমোহন বসু। তিনি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন
আসুন, আসুন, আপনি পত্র দিলেন না, কিছু না, তাবলুম বোধ হয় এখনও
আসবার ঘেরি আছে—এতটা পথ এলেন রাতারাতি? ভয়ানক লোক তো

আপনি।

পথেই একটা ছোট নদীর জলে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সে ফিট ফিট হইয়া আসিয়াছে। তখনই চা বাবাবের বন্দোবস্ত হইল। অপর লোকটিকে নিজের মনিবাগ পুণ্য করিয়া চাব টাকা দিয়া বিদায় দিল।

দুপুরের আহারের সময় অবনোবাব স্বীয় ভজনকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। অপর হানিমুখে বলিল এখন আপনাদের আলাতন করতে এগুয় বোঁঠাকরুণ।

অবনোবাব স্বীয় হাসিয়া বলিলেন, না এলে তুমিও হতাম—আমরা কিছু জানি আপনি আসবেন। কাল ওকে বলেছিলাম আপনার আসবার কথা, এমন কি আপনি নাব থাকবার জন্যে সে হবে বা বোলোটা এঁট দিয়ে দুয়ে পাখার কথাও হল—ওটা এখন খালি ডে আছে কিনা।

এখানে আর কোন বাঙালি কি অন্য কোন দেশের শিক্ষিত লোক নিকটে নেই?

অবনোবাব বলিলেন, আমরা এক বন্ধু দ্বিয়ার সাহায্যে তামার নদীর জন্যে প্রস্তুতি করছেন—মিঃ বসন্তে দুইটি গির্জাও বসেতে ছিলেন অনেকদিন তিনি এখানেই তাঁর বাড়িতে থাকেন—মাঝে মাঝে তিনি আসেন।

একদিনই ইহাঙ্গের সঙ্গে কেমন একটা সহজ মনঃসম্মত গড়িয়া উঠিল—এই কেবল এই সব স্থানে এই সব বসন্তেই সম্ভব, কৃষ্ণ সামাজিকতার মর্মিক এখানে নাগুণে সঙ্গে হাঙ্গের সাংবিদ্য বন্ধুত্বের দাবিকে ঘাট গুঁজিয়া থাকিতে বান্ধা করে না বলিয়াই। একদিন বদিয়া বসিয়া সে খেলার বসে ক'রে একটা বন্ধকতার পালা লিপিয়া গেলিল। দেদিন সকালে চা খাইবার সময় বলিল, দিদি, আজ শুকনো আনারদের একটা নতুন জিনিস শোনাব। অবনোবাব স্বীকে সে দিদি বলিতে শুকনো করিয়া। তিনি সাহসে বলিলেন, কি, কি বলুন না? আপনি গান জানেন—না আমি অনেকদিন ওকে বলেছি আপনি গান জানেন।

—গানও গাইব, কিন্তু একটা কথকতার পালা শোনাব। আমার বাবাব মুখে শোনা শুভভবতের উপাখ্যান।

দিদির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া স্বামীকে কহিলেন, দেখলে গো—গাথ। বলি নি আমি, গলাব স্বর অমন, নিশ্চয় গান জানেন—খালি না কথা?

দুপুর বেলা দিদি তাহাকে তাস খেলাব জগু পীড়াপীড়ি শুরু করিলেন।

—লেখা এখন থাক। তাস ভোড়াটা না বেলে খেলে পোকায় কেটে দিলে—এখানে খেলার লোক মেলে না—এখন শুঁক বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসেন তখন মাঝে মাঝে খেলা—আসুন আপনি। উনি আর আপনি—

—আর একজন?

—আর কোথায়? আমি আর আপনি বসব—উনি একা হুঁহাত নিয়ে

খেলবেন।

জ্যোৎস্না রাতে বাংলার বাবান্দাতে সে কথকতা আরম্ভ করিল। জড়-
ভরতের বাল্যকীর্ত্তন করুণ কাহিনী নিজেরই শৈশব স্মৃতিব চায়্যাপাতে, সত্য
ও পুত্ৰ হইয়া উঠে, কাশীর দশাশ্বমেধ যাতে বাবার গলাব সব কেমন করিয়া
জলাক্ৰিতে তাহার গলায় আসে—শালবনের ১৭-মর্মবে, নৈশ পাখিব গানের
মধো বাজমি ভাঙের সঙ্গল বৈবাগা ও নিস্কৃহ আনন্দ যেন প্রতি সুবমূচ্চ নাকে
একটি অহির্নব মহিমাময় কপ দিয়া দিল। কথকতা থামিলে সকলেই
চুপ করিয়া বহিল। অপু বানিকটা গব হাসিয়া বলিল—কেমন লাগল?
অবনীবাণ একই প্রাণ লোক, তাহার খুবই ভাল লাগিয়াছে—কথকতা দু-
একবার শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু এ কি জিনিস। ইহার কাছে সে সব লাগে
না।

কিন্তু সকলো চেয়ে দুঃ হইলেন অবনীবাণের স্ত্রী। জ্যোৎস্নার আলোতে
তাঁহার চোখ ও কপালে অশ্রু চিক্‌চিক্‌ করিতেছিল। অনেকক্ষণ তিনি কোন
কথা বলিলেন না। স্বদেশ হইতে দূরে এই নিঃসন্তান দম্পতির জীবনযাত্রা
এখানে একেবারে বৈচিত্র্যহীন, বহুদিন এমন অনন্দ তাঁহাদের কেহ দেয়
নাই।

দিন দুই পরে অবনীবাণ বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসিলেন, তাঁরী মনখোলা
ও অমায়িক ধবনের লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কানের দু'শে চুলে
পাক ধবিস্থাছে, বলিষ্ঠ গঠন ও পুষ্ট। একই অতিবিক্রমাদ্রাঘ মদ বান।
জবলপুর হইতে গৃহিণী আনাইয়াছেন কিংবা কট সহ্য করিয়া, বানিকশ্রম
তাঁহার বর্ণনা করিলেন। অবনীবাণও যে মদ খন অপু তাহা ইতিপবে
জানিত না। মিঃ রায়চৌধুরী অপুকে বলিলেন, আঁনার এবে কথা সব
স্তনলীম অপ্ৰবাবু। সে আঁনাকে দেখেই আমাব মনে হইছে। আঁনার
চোখ দেখলে কে-কোন লোক আপনাকে ভাবুক বলবে। তবে কি জনৈন,
আমরা হয় পড়েছি মা'টার-অফ-ফার্ট। আজ আপনাকে আব একবার
কথকতা করতে হবে, ছাড়াচি নে আঙ।

কথাবার্ত্তা, গানে হাসিখুশীতে সেদিন প্রায় সারারাত কাটিল। মিঃ
রায়চৌধুরী চলিয়া যাইবার দিন তিনেক পরে একজন চাপরাসা তাঁহার নিকট
হইতে অপু নামে একখানা চিঠি আনিল। তাঁহার ওখানে একটা খ্রিষ্ট
তীবুর তত্ত্বাবধনের জন্য একজন লোক দরকার। অপুর্বাণু কি আসতে
রাজী আছেন? আপাতত মাসে পঞ্চাশ টাকা ও বাসস্থান। অপুর্বাণু নিকট
ইহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। ভাবিয়া দেখিল, হাতে থানা দশেক পয়সা
মাত্র অবশিষ্ট আছে, উহারে অবগু যতই আলস্যতা দেখান, গান ও কথকতা
করিয়া চিরদিন তো এখানে কাটানো চলিবে না? আশ্চর্যের বিষয়, এতদিন
কথাটা আদৌ তাঁহার মনে উদয় হয় নাই যে কেন।

মিঃ রায়চৌধুরীর বাংলা প্রায় বাইল কুড়ি টু। তিনদিন পরে ঘোড়া ও

লোক আসিল। অবনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অভ্যস্ত দুঃখের সহিত তাহাকে
 বিদায় দিলেন। পণ অতি দ্রুত, উষেরিয়া হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিম-
 দিকে গেলেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া খাইতে হয়। দুই-তিনটি ছোট ছোট
 পাহাড় নদী, আবার ছোট ছোট ফান্ য়োপ, ঝরণা—একটার ভলে অপর মুখ
 মুখা দেখিল ভলে গন্ধকেব গন্ধ। পাহাড়িয়া কববা ফুটিয়া আছে, বাতাস
 নবান মাদকতায় ভরা, পূব দিক, এমন কি নৈঋত এক গা শির-শির করে—এই
 চেত্র মাসেও।

সন্ধ্যার পূর্বে সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া গেল। বর্নন কার্যকারিতা ও লাভা-
 লাভের বিষয় এখনও পরীক্ষণীয়, মাত্র বান চার-পাঁচ চণ্ডা বড়ের ঘর।
 দুইটা বড় বড় তাঁবু, কলীদের থাকিবার ঘর, একটা অফিস ঘর। সবসুন্দর
 আটদশ বিঘা জমির উপর সব। চারিদিক ঘেরিয়া ঘন, প্রগম অবশ্য, পিছনে
 পাহাড় আবার পাহাড়।

মিঃ রায়চৌধুরী বলিলেন—দুব সাহস আছে আপনার এ আমি বুঝিছি, যখন
 সুনাম আপনি বাত্রে ঘোড়ায় চড়ে উষেরিয়া এসেছিলেন। ও পথে ব'লে
 এদেশের লোকও বেতে সাহস পায় না।

অপরাজিত

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপর এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু হইল এ দিনটি হইতে। এমন এক জীবন
 তাহা যে চরকাল ভালবাসিয়া যে, তাহা বন্দ দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু
 কোনদিন যে হাতেই মুঠায় নাগাল পাওয়া যাইবে তাহা ভাবে নাই।

তাহাকে যে মিল তাঁবুর তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে, তাহা এখন হইতে
 আশে সতরো-আঠাশে মাইল দূরে। মিঃ রায়চৌধুরী নিজের একটা ঘোড়া
 দিয়া তাহাকে প্রদিনই কমস্থানে পাহাড়া দিলেন। নতুন স্থানে আসিয়া
 অপর আবাস হইয়া গেল। বন ভালবাসিলে কি হইবে, এ ধরনের বন কখনও
 দেখে নাই। নিবিড় বনানীর প্রান্তে উচ্চ তৃ-ভূমি, তাবই মধ্যে বড়ের বাংলো-
 ঘর, একটা পাঠশালা, কলীদের বাসের দুপাড়, পিছনেও দক্ষিণে পাহাড়,
 সোদকের ঘন বন কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহা চোখে দেখিয়া আন্দাজ করা
 যায় না—কোশেব পর কোশ ঘিয়া পাহাড়, একটার পিছনে আর একটা,
 আর গভীর জনমানবহীন অবশ্য, সীমা নাই, কুল-কিনারা নাই। চারিদিকেব
 দৃশ্য অতি গভীর। তাঁবুর ঠিক পিছনেই পাহাড় শ্রেণীর একটা স্থান আবার
 অনারত, বেজায় খাড়া ও উঁচু—বিঘটকায় নম্র গ্রানাইট চূড়াটা বৈকালের শেষ
 রোদে কখনও দেখায় রাঙা, কখনও ধূসর, কখনও ঈষৎ তাম্রাভ কালো রংয়ের
 —একপ গজীর-দৃশ্য অরণ্যভূমির কল্লনাও জীবনে সে করে নাই কখনও!

অপর সারাদিনের কাজও খুব পরিশ্রমের, সকালে স্নানের পর কিছু খাইয়াই
 ঘোড়ায় উঠিতে হয়, মাইল চারেক দূরের একটা জায়গায় কাজ তদারক করি-
 বার পর প্রায়ই মিঃ রায়চৌধুরীর ষোলো মাইল দূরবর্তী তাঁবুতে গিয়া রিপোর্ট

করিতে হয়—তবে সেটা রোজ নয়, দু’দিন অন্তর অন্তর। ফিরিতে কোন দিন হয় সন্ধ্যা, কোন দিন বা বাত্মি একপ্রহর দেড়প্রহর। সবটা মিলিয়া কুড়ি-পঁচিশ মাইলের চক্র, পথ কোথাও সমতল, কোথাও ঢালু, কোথাও দুর্গম। ঢালুটাতে ঝপল আছে তবে তাব তলা অনেকটা পবিষ্কার, ইংরাজীতে যাকে বলে open forest—কিন্তু পোয়াটাক পথ খাইতে না খাইতে সে মানুষের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘন অবণোব নির্জনতার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায়—সেখানে জন নাই, মাংস নাই, চাবিপাশে বড় বড় গাছ, ডালে পাতায় নিবিড় জডাজড়ি, পথ নাই বলিলেও হয়, কখনও ঘোড়া চালাইতে হয় পাহাড়ী নদীৰ শুক বাত বাহিয়া, কখন গভীর ঝপলেব ত্রুর্ভেদ বেত বন ঠৌলিয়া—সেখানে বন্যশূকর বা শশব হবিণেব দল যাতায়াতের সুড়ি পথ ঠিকি কবিয়াছে—সে পথে। কত ধবনেব গাছ, লতা, গাছেব ডালে এখানে ওখানে বিচিত্র বড়ের অঁকিড নিচে স্নাজোলিয়াব হৃদয় ফুল ফুটিয়া পড়াতেব বা গাসকে ছন্দ ভাবাকান্ত করিয়া তোলে। ঘোড়া চালাইতে চালাইতে অদূর মনে হয় সে যেন জগতে সম্পূর্ণ একা, সারা দিনিয়ার সঙ্গে তাব কোন সম্পর্ক নাই শুধু আছে সে, আর আছে তাহার ঘোড়াটি ও চাবিপাশের এই অবদূত বিজন বন আর কি সে নিজনতা। কলিকাতার বাসায় নিজেব বন্ধু হুয়ার ঘবটাৰ সক্রিয় নির্জনতা নয়, এ ধবনেব নির্জনতার সঙ্গে তাহার কখনও পরিচয় ছিল না। এ নির্জনতা বিলাট, এডুত, এমন কি, বাহা পূব হইতে ভাবিয়া অসম্মান করা যায় না, অশিক্ষিতাব অপেক্ষা বাবে।

ভারী পছন্দ হয় এ জাবন, গল্লেব বইয়ে-টাইয়ে যে বকম পড়িত, এ যেন ঠিক তাহাই। খেলা ভায়গা পাইলেই ঘোড়া ছাড়িয়া দেয়, গতিব আনন্দে সাবং দেহে একটা উত্তেজনা আসে, বানাকন্দ, শিলা পাইওবাচতে স্তূপ কে মানন নত শাল শাখা এড়াইয়া দোহুলামান অজানা লগাব পাশ কাটায়ে যে ঘষ ভরা উদ্দামতাব আনন্দে ভীৰবেগে ঘোড়া উড়াইয়া চলে।

ঠিক এই সব সময়েই তাহার মনে পড়ে—প্রায়ই মনে পড়ে—শীলেন্দেব অফিসের সেই তিনবৎসর-ব্যাপী বন্ধ, সঙ্গার, অন্ধকার কেরানী-জীবনের কথা। এখনও চোখ বুজিলে অফিসটা সে দেখতে পায়, বায়ে নুপেন চাইপট বসিয়া খট-খট করিতেছে, বামখন নিকাশনবিশ বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে, সেই বাঁদানো মোটা কাইলের দপ্তরটা—নিকাশনবিশের পেছনের দেওয়াল চুণ বালি খসিয়া দেখিতে হইয়াছে যেন একটি পূজা-নিরত পুরুতঠাকুর। রোজ সে ঠাট্টা করিয়া বলিত, ‘ও রামধনবাবু, আপনার পুরুতঠাকুর আজ ফুল গেললেন না?’ উঃ সে কি বন্ধতা—এখন যেন সে সব একটা হৃদয়ের মধ্যে মনে হয়। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে বাংলায় ফিবিয়া পাতকুয়াৰ ঠাণ্ডা জলে ধান করিয়া এক প্রকার বন্য লেবুর রস মিশানো চিনির শরবত খায়—গরমের দিনে শরীর যেন জুড়াইয়া যায়—তার পরই রাশচরিত মিশ্র আসিয়া রাত্রেব খাবার দিয়া যায় আটার কুটি, কুমড়া বা ঢাণ্ডাশের তরকারী ও অডহরের

ডাল। বারো-তেরো মাইল দূরের এক বস্তি হইতে ভিনিস-পত্র সপ্তাহ অন্তর কুলীরা লইয়া আসে—মাছ একেবারেই মেলে না, মানে-মানে অপু পাষা শিকার কবিতা আনে। একদিন সে বনের মধ্যে এক হরিণকে বন্দুকে পাল্লার মধ্যে পাঠিয়া অবাধ হওয়া গেল—বর্ডশিফা কিংবা শব্দর হরিণ ভারী সতর্ক, মানুষের গন্ধ পাহলে তার ত্রিদীমানায় থাকে না—কিন্তু তাহার ঘোড়ার বাবো-গজের মধ্যে এ হরিণটা আসিল কিরূপে? খুশী ও আগ্রহেব সহিত বন্দুক ডঠাইয়া লক্ষ্য করিতে গিয়া সে দেখিল লতাপাতার আড়াল হইতে শুধু মুখটি বা হব কবিতা হরিণটিও অবাধ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ঘোড়ায় চড়া মানুষ দেখিয়া ভাবিতেছে হয়ত, এ আবার কোন ভাব। হঠাৎ অপূর বৃকেব মদ্যতা চাৎ করে উঠল—হবিণেব চোখ দুটি খেন তাহার পোকাক চোখের মত। অমনি ডাগর ডাগর, অমনি, অবোস নিস্পাশ, সে উদ্বৃত্ত বন্দুক নামাইয়া তখন টোটাগুল পুলিয়া লহল। এখানে ৭৩ দিন ছিল আর কখনও শিকাবের চেষ্টা করে নাই।

বাওয়া দাওয়া কেস হয় সন্ধ্যার পবেই, তাব পবে সে নিজের খডের বাংলোব কম্পাউণ্ডে চেয়ার পাকিয়া বসে। অপূব নিস্তক্কা। হস্পট জোংলা ও আঁপায়েব চিহনকাব বাহাডের গস্ত্রদর্শন অনারও গ্রানাইট প্রাচীরটা কি অদৃত দেখায়। শালপুত্রুমব দুবাসভবা অন্ধকাব মাপাব উপকার আকাশে শর্গা ও নশ নশ্বত্র। এখানে অন্য কোন সাদী নাই, তাহাব মন ও চিন্তাব ডার অন্য কাহাবও দাবা দাওয়া নাই, উওজন নাই, উৎকণা নাই—আছে শুদু সে, আন ও বিশল অবন প্রসতিব কবিশ, বন্দুব, বিনাটী সৌন্দর্য—আর আছে এত নশ্বত্র ভরা নেশ আকাশতা।

বাল্যকাল হইতেই সে হ'কাশ ও হ'হ নশ্বত্রের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু এখানে তাঁদের এ কি নদ। কুলীয়া সকাল সকাল বাওয়া সাবিয়া ঘুমাইয়া পড়ে—বামচ্যুতি মিশ মায়ে মায়ে অপূকে সাবধান কবিতা দেয়, তামকা বাহাব মৎ বৈঠিষে বাবুজী—শেরকা বড়া ডব হায়—পরে সে কাঠকুটা আলিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া গীত্রেব রাত্রিও বসিয়া অ'ভন পোহ'স্ন—অবশেষে সেও যাইয়া শুইয়া পড়ে, তাহাব অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায়—স্তব বাহি, হ'কাশ অন্ধকার ... পূবিবা অন্ধকার। আকাশে বা'তাসে অদৃত নীরবতা, আবলুসেব তালপাতার ফাঁকে ২-একটা তা'বা খেন অসীম রহস্যভবা মহাবোমেব বৃকেব স্পন্দনের মত দিপ্দিপ করে, বৃহস্পতি স্পষ্টতব হয়, উত্তর-পূব কোণের ১৫তাসূর বনের উপবে কালপুরুষ উঠে—এখানে-ওখানে অন্ধকারের বৃকে আঙনের আঁচড় কাটিয়া উঠাপিণ্ড বসিয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নশ্বত্রগুলি ক্রমশঃ নিচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পবতসান'র'দিক হইতে মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশালাকায় ছায়াম'র্ষটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়, বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে চলিয়া পড়ে। রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক কদ

গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার সূক্ষ্মতা ও সনাতনত্বের আড়ালে সে সূক্ষ্মকে অপূর্ব মন সচেতন হইয়া উঠিল—অদৃষ্টভাবে সচেতন হইয়া উঠিল। জীবনে কখনও তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই বিশাল নক্ষত্র জগৎটার সঙ্গে, এ-ভাবে হইবার আশাও কখনও কি ছিল?

অপূর্ব বাংলা ঘবেব পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, পিছনকার পাহাড়তলী অধ-মাইলের কম, দক্ষিণের পাহাড় মাইল দুই দূরে। সামনের বহুদূর বিস্তৃত ঢাঁচু নীচু ভূমিটা পাল ও পপবেল চাবা ও এক প্রকার অর্ধশুষ্ক হুণ্ডে গুয়া অনেক দূর পর্যন্ত খোলা। সারা পশ্চিম দিকচক্রবাল চড়িয়া বহুদূরে, বিষ্কা পর্বতের নীল অস্পষ্ট সীমাবেলা, হিন্দুগুয়া ও মহাদেও শৈলশ্রেণী—পশ্চিমা বাতাসের ধূলা-বালি যেদিন আকাশকে আরত না করে সেদিন বড় স্পষ্ট দেখায়। মাইল এগারো দূরে ন-মা বিন বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, খুব সকলে ঘোড়ায় উঠিয়া গান কবিতা গেলে বেলা নয়টার মধ্যে ফিফি আসা যায়। দক্ষিণে পর্বতসমূহ ঘন ঘন নিবিড়, জনমানবহীন, রক্ত ও গম্ভীর। দিনের শেষে পশ্চিম গগন হঠাৎ অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়া পিছনের পাহাড়ের যে অংশটা বড় ও অনাবত তাহার প্রানাই দেওয়ালটা পথে হয় হ-দে পথে হয় যেটে সিঁড়ির ব-পথে জনদা পথে হঠাৎ হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীর ও পাবে-পবেই কালো হইয়া যায়। শুদিকে দিগন্তলগ্ন ললাটে পাল্প টিপের মত সজ্জাতা হুটীয়া উঠে, অবলম্বনীয় এক প্রকার পশিয়া বার, শাল ও গাছের ডালপালায় বা প্রাস লাগিয়া এক প্রকার মন হু—বামচিহ্ন ও গভীর সিঁনেডে বাধের ভয়ে অগুনত আলো, চাবিদাবে শিয়াল ডাকিতে শুক করে, বন দোঙ্গা একে একে প্রকার আকাশ দেখিতে দেখিতে গহ, তার, ছোচিন্দ, ছায়াপথ একে একে দেখা দেয়। পিঁবী, প্রকাশ-বাতাস ও বহুদূর নিস্তরতায ভিয়া আসে, প্রাণ পালের দীর্ঘ পথে বন পল্লীয়া এক একদিন বন্যবাহ পল্লীয়া পায়, পবে কোপার জায়েনা উদ্ভাসের মত হামিয়া টে, গভীর বাত্রে কুমপক্ষে ভাঙা টান্দ পাহাড়ের চিন হঠাৎ পবে পবে টিপে থাকে, এ যেন সগতি গল্পের বইয়ে—১৩১ জীবন।

এক এক দিন বেকালে সে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াতে যায়। শুদে ঢাঁচু-নীচু অর্ধশুষ্ক; ভূমি ছোটবড় শিলাখণ্ড ছড়ানো মানে-মায়ে শাল ও বাদাম গাছ। আব এক ভাতীয় বড় বন্য গাছের কি অপূর্ব আকাংক্ষা ডালপালা, চৈত্রের রোদে পাণ্ডা পশিয়া গিয়াছে, নীল আকাশের পটভূমিতে পত্রশূন্য ডালপালা যেন ছবির মত দেখা যায়। অপূর্ব প্রাণ হঠাৎ মাইল-তিনেক দূরে একটা ছোট পাহাড়ী নদী গাঁকিয়া থাকিয়া গিয়াছে, অপূর্ব তাহার নাম রাখিয়াছে বক্রতোয়া গ্রীষ্মকালে জল আদৌ পাকে না, তাহারই ধারে একটা শাল-ঝাড়ের নিচের একটানা পাথরের উপর সে একদিন গিয়া বসে, ঘোড়াটা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখে—হানটা ঠিক ছবির মত।

বর্ণাশ বালুর উপর অন্তহিত বন্য প্রাণ উপল-চাকা চরণ-চিহ্ন—হাত কয়েক

যাত্র প্রশান্ত নদীখাত, উত্তর তীরেই পাষাণময়, ওপারে কঠিন ও দানাদার কোয়ার্টজাইট ও ফিকে হলুদে রঙের বড় বড় পাথরের টাইয়ে ভরা, অতীত কোন হিম যুগের ঝুঁকান নদীর শেষ প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া এখানে হ্রত আটকাইয়া গিয়াছে, সোনারলী বয়েব নদী-বালু হ্রত সুবর্ণবর্ণে বিশালো, অশ্রু-সূতের পাণ্ডা আলোয় অত চক্ চক্ করে কেন নুবা? নিকটে দুগন্ধ লতা-কম্ববীর ভাজল, স্বর বৈশাখা বোদে শুধু শুষ্কটিগুলি ফাটিয়া অগ্ন্যভির গন্ধে অপরোক্ষে বাতাস ভাবাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। বক্রতোয়া হঠাতে পানিকটা দুবে ঘন বনের মধ্যে পাহাড়েব গায়ে একটা ছোট ঝরণা, যেন উঁচু চৌবাচ্চা ছাপাইয়া চল পড়িতেছে এমন মনে হয়। নীচের একটা খাতে গ্রীষ্মদিনেও জল থাকে। বাবে ওখানে হরিণদের দল চল ঝাইতে আসে শুনিয়া অপু কতবার দেড় পহর পায়ে গোডায় চটিয়া সেখানে গিয়াছে, কখনও দেখে নাহ। গায়ে গেল, বাক্য কাটিল, শব্দকালে বগা শেফালীবনে অজস্র ফুল ফুটিল, বক্রতোয়া শাল-ঝাড়টাব কাছে বসিলে তখনও অপর শব্দ পাওয়া যায়—এমন সময়েব এক ভোংরাবাত্রে সে জুই দিগ্গে সঙ্গে লইয়া জামগা-টোং : ল। দশমীর ভোংরা ডালে-পাতায়, পাহাড়ী বদাম বনের মাধ্যম—
—দ্বিখ বাত্রে সে সোনারলী বনে যিষ্টি গন্ধ। এই ভোংরা-মাথা বনভূমি, এই বাবির শুষ্কতা, এই শিশিরা : শেষ বায়। এখানে কত কালের কথা মনে করাইয়া দেয়, যেন দুই কোনও জন্মাত্রেব কথা।

হরিণের দল কিম্বা দেয়া গেল না।

এই সব লিন নতানে অপু দেখিল মনের ভব সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়। শহবে বা লোক লম্বে মন আত্মদমসী লইয়া ব্যাপৃত থাকে, ambition লইয়া বাস্তব থাকে, এখানকার উদার নক্ষত্রবচিত আকাশেব তলস্র সে-সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, দমসী প্রতিফলিত ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। মন আরও ব্যাপক হয়, উদার হয়, পৌনঃপুন্য হয় angle of vision একদম বদলাইয়া যায়। এইজন্য অনেক অনেক বচন—পার্বত্য সমাজে যা পূর্ব ঘোরতর সমস্যাশূলক ও প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়—এখানকার নিঃশব্দ ও বিশতোমুখী জীবনে তা অতি বেলা, রসহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এখানে ভাল লাগে সেই সব, যাহা শান্ত কালের। এই অন্তরেব সে যাহা যোগ আছে। অপূর্ব সেই হৃদয়জ্ঞানের বইখানা যেমন—এখন যেন তাদের নতুন অর্থ হয়। এত ভাবিতে শেখায়। চৈতন্যের কোন নতুন দ্বার যেন খুলিয়া যায়।

ফায়ুনমাসে একজন ফরেস্ট সার্ভেয়ার আসিয়া মাইল দশেক দূরে বনের মধ্যে তাঁবু ফেলিলেন। অপু তাহার সহিত ভাব করিয়া ফেলিল। মাদ্রাজ ভদ্রলোক বেশ লেখাপড়া-জানা। অপু প্রায়ই সন্ধ্যাটা সেখানে কাটাইত, ঝাইত, গল্পগুজব করিত, ভদ্রলোক ডিওডোলাইট পাতিকা এ-নক্ষত্র ও-নক্ষত্র চিনাইয়া দিতেন, এক-একদিন আবাব দুপূবে নিঃশব্দ করিয়া একরকম ভাঙে পিঠা খাওয়াইতেন, অপু সকালে উঠিয়া যাইত, দুপূবেব পর খাওয়া সারিক

ঘোড়ায় নিজের তাঁবুতে ফিরিত।

ফিরিবার পথে ডানদিকের পাহাড়ী ঢালুতে বহুদূর ব্যাঙ্গিয়া শীতের শেষে লোহিয়া ও বিজনীর ফুলের বন। ঘোড়া থামাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিত, তাঁবুতে ফিরিবার কথা ভুলিয়া যাইত। যে কখনও এমন নির্জন অরণ্যভূমিতে—যেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ খাও লোক নাই, জন নাই, গ্রাম নাই, বসতি নাই—সে-সব স্থানের যুক্ত আকাশের তলে কঠিন ব্যাসাল্ট কি গ্রানাইটের ক্রঙ্ক দুগ্ধবত-পাচীরের ছায়ায়, নিম্নভূমিতে, ঢালুতে, ঝাঁ-ঝাঁ হুপুরের রাশি বাশি অগণিত বেগুনি, জবদা ও শেতাভ হৃদয় বড়ো বন্য লোহিয়া ও বিজনীর ফুলের বন না দেখিয়াছে—তাহাকে এ দৃশ্যের ধারণা করানো অসম্ভব হইবে। এমন কত শত বৎসর ধরিয়া প্রতি বসন্তে বাশি-বাশি ফুল ফুটিয়া ঝরিতেছে, কেহ দেখিবার নাই, শুধু ভোমরা ও মৌমাছিদের যাহোঁবসব!

একদিন অমবকটক দেখিতে যাইবার জন্য অপুর মিঃ রায়চৌধুরী নিকট ছুটি চাহিল।

মনটা ইহার আগে অত্যন্ত উত্তলা হইয়াছিল, কেন যে উত্তলা হইল, কারণটা কিছুতেই ভাল ধরিতে পারিল না। প্রাণিল এই সময় একবার ঘুরিয়া আসিবে।

মিঃ রায়চৌধুরী শুনিয়া বলিলেন—যাবেন কিম্বে? পদ কয় অতাপ্ত যাত্রাপ, এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূর হবে, এ দূর যাত্রা মাইল ডেন্স ভার্জিন ফরেস্ট—বাগ ভাঙুক, নেকডেও দল সব আছে। বিনা বন্দকে যাবেন না, ঘোড়া সহস্র নিয়ে যান—যাত্রা হবার আগে আশ্রয় নবেন কোথাও—সন্ট্রাল ইন্ডিয়ান বাগ, বসন্তে হাতিরা মত পুড়ে নেনে নইলে। এ জন্তে কত দিন আপনাকে বারণ করেছি এখানেও সন্ধ্যার পর প্রাণ বাচিয়ে বসবেন না—বা অন্ধকারে বনের মধ্যে একা যে এ ঢালাবেন না—এ খানি বড় রেক্লেস।

তখন সে উৎসাহে পড়িয়া বিনা ঘোড়াতেই বাহির হইল বটে, কিন্তু যাত্রায় দ্বিধা সন্ধ্যার সময়ে সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—সারাল পথেরের প্লাডেতে জুতার তলা কাটিয়া চাচিয়া গেল, অতদূর পদ প্রতিবার অভ্যাস নাষ্ট, পায়ে এক বিরাট কোন্ডা উঠিয়াছে। দিছনে গ্রামেরিত বোচকা লইয়া আর্গিভেঁছিল, সে সামনে পদ হাঁটিয়া চলিয়াছে, মুখে কথাটি নাষ্ট। বত পূর্বের একটা পাহাড় দেবাইয়া বলিল, ওর পাশ দিয়া পদ। পাহাড়টা দোঁয়া দোঁয়া দেবা যায়, বোকা যায় না, যেখ না পাহাড়—এত পূর্ব। অপুর ভাবিল পায়ে হাটিয়া গন্তদূরে সে যাইবে ক'দিনে?

এ ধরনের ভীষণ অরণ্যভূমি, অপূর মনে হইল এ অঞ্চলে এতদিন আসিয়াও সে দেখে নাই। সে যেখানে থাকে, সেখানকার বন ইহার তুলনায় শিশু।

নিভাস্ত অবোধ শিল্প । ত্রপুরের পর যে বন শুরু হইয়াছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা হইয়া আসিল ।

অন্ধকার নামিবান আগে একটা উঁচু পাহাড়ের উপরকার চড়াই পথে উঠিতে হইল—উঠিয়াই দেখা গেল—সর্বনাশ, সামনে আবার ঠিক এমন আর একটা পাহাড় । অথবা পায়ের বাগাটা খুব বাড়িয়াছিল, অন্যথা পড়িয়াছিল বেজায় --- অনেকক্ষণ হইতে জলের সন্ধান মেলে নাই, আবলুস গাছের তলা বিছাইয়া অমম্বুর নৈদখল পাড়িয়াছিল —সারা ত্রপু তাহাই চুষিতে চুষিতে কাটিয়াছে — কিয়ৎ জল অভাবে আর চলে না ।

দূরে দূরে, উত্তরে দশিষ্টমে নীল পর্বতমালা । নিম্নে উপত্যকার ঘন বনানী-সম্ভার ডায়ায় মৃদব হওয়া আসিতেছে, সরু পথটা বনের মধ্যে দিয়া আঁকিয়া বাকিয়া নামিয়া গিয়াছে । সৌভাগ্যের বিষয়, সন্ধ্যার পাহাড়টার ওপারে এক মাইলের মধ্যে বন-বিভাগেব একটা ডাকবাংলো পাওয়া গেল । চারিদিকে নিবিড় শাল বন, মধ্যে ছোট বড়ের ঘর । বনি ও বনবিভাগের লোকেরা মাঝে মাঝে বাঁধ কাটায়া ।

এ বাড়ির স্ত্রীও ভাবি অদ্ভুত ও বিচিত্র । বাংলাতে অপুরা একটি প্রৌঢ় লোককে পাইল, সে ইহাঙ্গই মধ্যে খিল দিয়া বসিয়া কি পড়িতেছিল, দাক্ষিণ্যে উঠিয়া দবড়া দুলিয়া দিল । স্ত্রীও কবিয়া জানা গেল লোকটা মদিলা গ্রামে নম আজবলাল ঝা । বয়স ষাট বা সত্ত্ব হইবে । সে সেই গায়ে নিজেব ভাগ্যব হইতে আটা ও ঘৃত বাঁধন করিয়া আনিয়া ... নিমেষ মধ্যেও উৎসাহে দুই ভাঙিয়া আঁল--স্বরে অতিথি-সংকার সাধিয়া । সন্ধ্যার মধ্যে বসিয়া দুইবে সংস্কৃত বামায়ণ পড়িতে আবস্ত করিল । কিছু বেধে পুণ্য লোকটা সন্ধ্যুত ভাল জানে--নানা কাব্য উৎস-সংগ্রহে । নানাস্থান হইতে কোক মুখস্থ বলিতে লাগিল--কাব্যচচায় ... সন্ধ্যুত ... হুলসাদানো বামায়ণ হইতেই অনল দে' হা আরম্ভ করিয়া ।

পড়িতে লাগিল

এমনি ও 'ভা' নিজেব কাহিনী বলিল । দেশ ছিল দ্বাবভাঙ্গা জেলায় । সেখানেও বসব করে, তেব-বৎসব বসস উৎসবনব পব এক বেনিয়ার কাছে চাকরী লইয়া কাশী আসে । স্ত্রীও সেইখানেই--তারপবে কয়েক ভাগ্যগায় তোলা দলিয়া ছাত্র স্ত্রীবার চেঁচা কবিয়াছিল--কোপাও সুবিধা হয় না । স্ত্রীর ভাঙে না, নানা স্থানে ঘুরিবার পব এই ডাকবাংলোয় আজ সাত আট বছর বসবাস করিতেছে । লোকজন বড় এখানে কেহ আসে না কালেও এক-আদ-জন, সে ই একা থাকে, মাঝে মাঝে তের মাইল দূরের বাঁধ হইতে বাবার ডিনিস ভিক্ষা করিয়া আনে, বেশ চলিয়া যায় । সে আছে আর আছে তাহার কাব্যগ্রন্থগুলি--তাহার মধ্যে দুখানা হাতে লেখা পুঁথি, যেখানুও কয়েক সগুণ ।

অপুর অত সুললিত লাগিল এই নিরীহ, অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্তা ও

ভাহাব আগ্রহভবা কাবাপ্রীতি—এই নির্জন বনবাসেও একটা শান্ত সন্তোষ ।
তবে লোকটি যেন একদু বেশী বকে, বিছাটা যেন বেশী ভাঙ্গি কবিতা চায়
—কিন্তু এত সবলভাবে করে যে, দোষ ধরাও যায় না । অপু বলিল—পণ্ডি-
তজ্ঞী আপনাকে থাকতে দেয়, কেউ কিছু বলে না ।

—না বাবুজী, নাগেশ্বরপ্রসাদ বলে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তিনি আমাকে
খুব মানেন, সেই জন্য কেউ কিছু বলে না ।

কথায় কথায় সে বলিল—আচ্ছা পণ্ডিতজী, এ বন কি অমরকন্টক পথের এমন
ঘন ?

—বাবুজী, এট হচ্ছে প্রসিদ্ধ বিষ্ণুবাগা । অমরকন্টক ছাড়িয়া বন্দব পথস্থ
বন, এমনি ঘন—চিত্রনাট্য ও দণ্ডকাব্য এই বনের পশ্চিম দিকে । এর বন্য
স্তম্ভন তবে নৈষাচবিধে—দময়ন্তী রাজ্যে নলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে
এই বনে পপ হাবিয়ে ঘুরছিলেন—কুবান পবতের পাশের প দিয়ে তিনি
বিদর্ভ দেশে যান । বামায়ণেও এই বনের স্তম্ভবন অথাকাত্তে । স্তম্ভন
তবে ।

অপু ভাবিল লোকটা বহমানের কোন দাব দাবে না প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষায়
একেবারে ডুবিয়া আছে—সব কথায় প্যানোর কবা পানিয়া মেলে । লোক-
টিকে ভাবী অদূত পানিতে হল—সামাজিক খোনে ওখানে দুনিয়া কিছুই
করিতে পারে নাই—এই বনবাসে নিজে প্রিয় পুদিয়া লইয়া বৎসরের পর
বৎসর কটাইয়া চলিয়াছে, কোন গুণ নাই, কত নাই । এ বনের লোকেব
দেখা মেলে না বেশী ।

ওগাজী দূরে রামায়ণের বনবাসা দেখিতেছিল । এক অদূতভাবে চান্দ্র
পাশের দৃশ্যের সঙ্গে পানীয় নিজন শলবনে অস্পষ্ট জোয়া উঠিয়াছে,
তেন্দু ও চিত্রগাছের পাতাগুলি এক এক কানায় ঘন কালো দেখাইতেছে,
বনের মধ্যে শিয়ালের দল পানিয়া উঠিয়া পহর দোহা করিল

কৈপায় মেল, মোটর, এবোল্লেন, ১০০ ইটনিয়ন ? শুকাজীব যুগে অবা
কাণ্ডের শ্লোক স্তম্ভিতে স্তম্ভিতে সে যেন অনেক নরেন কে সুপাচীন ভাটির
অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পড়িল একেবারে । ১৩ তের গিরিভাটিয়া
তীরবর্তী ত্রোপন হোমদৃশ্যবির গোদলির আকাশে বিদ্যুত অগ্নিশালা,
সুগভাঙ্গ অগ্নি, শ, সমিধ, ভলকলস, চা-কন্যাজিন, বিহিত নজা মুনি-
গণের বেদপাঠনি শান্ত গিরিসা...বনজ কুমোয় সগন্ধ...গোদাবরীতে
পুষ্কাগ নাগকেশরের বনে পুষ্প-আহরণতা সুখশা শশমবালকগ...কুশাজী
রাগবধুগ...কো-জোৎস্নায় নদাভল আলো হইয়া উঠিয়াছে, তাইবে স্থলবেতসের
ধনে ময়ূর ডাকিতেছে...

সে যেন স্পষ্ট দেবিল, এট নিবিড় অজানা অরণ্যানীর মধ্য নিভীক, কবাটকক,
ধনুস্পাণি, প্রাচীন রাজপুত্রগণ সকল বিপদকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন ।
দূরে নীল মেঘের মত পরিদৃশ্যমান ময়ূর নির্বাদিত ঘন বন, ভ্রগম পথের নান

স্বাপদ, রাক্ষসে পূর্ণ খন্দ, গুহা, গঙ্গর, মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত—
অজানা মৃত্যুসঙ্কুল—চারিদিকে পর্বতরাশির ধাতুরঞ্জিত শৃঙ্গ-সকল আকাশে মাথা
তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কন্দুগুয়া, সিন্দুবার, শিরীষ, অঙ্কুর, শাল, নীপ,
বেতস, তিলিশ ও তমাল গুরুতে শ্যামায়মান গিরিসাগর...শরদ্বারা বিদ্ধ কুরু
ও পুষত যুগ আগুনে ঝলসাইয়া যাওয়া, বিশাল ঈজুদী তরুমূলে স্তব্ধ,
বাক্সি যাপন...

ওঝাজী উৎসাহ পাঠিয়া অণুকে একটা পুঁটলি থুলিয়া একরাশ সংস্কৃত কবিতা
দেখাইলেন, গর্বেব সহিত বলিলেন, বাবুজী, ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত
কবিতায় আমার হাত আছে, একবার কাশী-নবোদয়ের সভায় আমার গুরুদেব
ঈশবংশবর্ণ আমায় নিয়ে যান। একজোড়া দোশালা বিদায় পেয়েছিলেন, এখনও
আছে। দিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।—তাবৎ তিনি অনেকগুলি
কবিতা জমাটালেন, বিভিন্ন চন্দেব সৈন্দর্য ও তাহাতে ঠাঁহাব বচিত শ্লোকের
কৃতিত্ব সকল উৎসাহে বর্ণনা কবিলেন। এই ত্রিশ বৎসর ধবিয়া ওঝাজী বহু
কবিতা লিখিয়াছেন, ও এখনও লেখেন, সবগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াও
দিয়াছেন, একটাও নষ্ট হইতে দেন নাই, তাহাও জানাইলেন।

একটি অদৃষ্ট ধরনের দঃপ ও বিষাদ অপর চন্দ্র অধিকার কবিল। কত কথা
মনে আসিল, তাহাব বাবা এই নকন গান ও পাঁচালি লিখিতেন তাহাব ছেলে-
বেলায়। কোথায় গেল সে সব? যুগ যে বদল হইয়া যাঠিতেছে ঈহাব তাহা
ধবিত পাবে না। ওঝাজীও এত আগ্রহেব সহিত লেখা কবিতা কে পড়িবে?
কে শাজকাল ঈহাব আদব কবিবে? কোন আশা ইহাতে পুবিবে ওঝাজীর?
অপেক্ষ কং ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহাদেব পিছনে আছে। চাঁপদানীর
গোন্দাফিসে বসাইয়া ওঝা সেট ছোট্ট মেয়েটির নাম টীকানা-ভুল পত্রখানার
মতট তাহা বার্থ ও নিবর্ণক হইয়া যাঠিবে।

সকালে উঠিয়া সে ওঝাজীকে একখানা দশটাকাব নোট দিয়া প্রণাম করিল।
নিজেব একখানা ভাল বাঁশনো খাতা লিখিবাব জন্য দিল—কাছে আব টাকা
বেশী ছিল না, থাকিলে হয়ত আবও দিত। তাহাব একটা দ্বলতা এই যে, যে
একবার তাহাব হৃদয় স্পর্শ কবিতো পারিয়াছে তাহাকে দিবার বেলায় সে
যুক্তহস্ত নিজেব সবিশা-অসুবিধা তখন সে দেখে না।

ডাকবাংলো হইতে মাইল খানেক পবে পথ ক্রমে উপবের দিকে উঠিতে
লাগিল, ক্রমে আরও উপবে, উচ্চ মালভূমিৰ উপর দিয়া পথ—শাল, বাঁশ,
খয়ের ও আঁবলুসের ঘন অরণা—ডাইনে বামে উঁচুনীচু ছোট বড় পাহাড় ও
টিলা—শালপুস্পসুৰভি সকালেব হাওয়া যেন মনের আশু বাড়াইয়া দেয়।
চতুর্থ দিন বৈকালে অমরকন্টক হইতে কিছু দূবে অপেক্ষ সৌন্দর্যভূমির সঙ্গে
পরিচয় হইল—পথটা যেখানে নীচের দিকে নামিয়াছে, দুই দিকে পাহাড়ের
মধ্যে সিকিমাটল চওড়া উপত্যকা, হৃদয়ের সানুদেশের বন অক্স ফুলে ভরা—
পলাশের গাছ যেন জ্বলিতেছে। হাত দুই উঁচু পাথরের পাড, মধ্যে গৈরিক

বালু ও উপজলযায় শিশু শোণ—নির্মল জলের দ্বারা হাসিয়া খুশিয়া আনন্দ বিলাইতে বিলাইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা ময়ূব শিলাখণ্ডের আড়াল হইতে নিকটের গাছের ডালে উঠিয়া বসিল। অপর পা আঁব নড়িতে চায় না। তার মুখ ও বিম্বিত চোখের সম্মুখে শৈশব কালার স্বর্ণকে কে আবার এভাবে বাস্তবে পরিণত করিয়া খুশিয়া বিচাইয়া দিল।

এত দূরবিস্তৃতি দিগ্‌বলয় সে কখনও দেখে নাই। এত নিজনতা কখনও খারণা ছিল না তাহাব—বহুদূরে পশ্চিম আকাশের অনতিক্ষু সূদীর্ঘ নীল শৈলরেখাব উপবকাব আকাশটাতে সে কি অপরূপ বসুন্ধর।

কি অপর দৃশ্য চোখের সম্মুখে যে খুশিয়া যায়। এমন সে কখনও দেখে নাই—জীবনে কখনও দেখে নাই।

এ বিপুল আনন্দ তাহার প্রাণে কোথা হইতে আসে।

এই সন্ধ্যা, এই শ্যামলতা, এই মুক্ত প্রসারের দর্শনে যে অমত মাখানো আছে, সে মুখে তাহা কাহাকে বলিবে? ...কে তাহাব এ চোখ ফুটাইল, কে সাঁক-সকালের, সূর্যাস্তের, নীল বনানীর শ্যামলতাব মায়া-কাছল তাহাব চোখে মাখাইয়া দিল?

দূরবিস্তৃতি চক্রবালবেশা দিগন্তেব যতটুকু বিবিসাছে, তাহাবই কোন কোন অংশে, বহুদূরে নেমিব শ্যামলতা অনতিক্ষু সন্ধ্যা দিগন্তে বিলীন, কোন কোন অংশে দোয়া দোয়া দেখা-খাওয়া বনবেশায় পবিস্ফুট, কোন দিকে সানা দাদা বকের দল আকাশের নালপটে ডানা মেলিয়া দা হইতে দূরে চলিয়াছে—মন কোথাও বাধে না। (অবাস, উদার দৃষ্টি, পরিচয়ের গতি পাব হইয়া গিয়া অদৃশ্য অভ্যন্তর উদ্দেশে ভাসিয়া চলে)

তাহার মনে হইল সত্য, সত্য সত্য—এই শান্ত নিজন আবশ্যভূমিকে মনের ভালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদাবের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নব জগতের জন্ম হয়—এ দূর চায়্যাপ্রদেব মত তাহা দূরবিস্তৃতি, এটুকু শেষ নয়, এবান্নে আবৃত্তও নয়—তাহাকে দূর যায় না। অপচ এই সব নীরব জীবনযুদ্ধে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত তাহাব বহুসময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়। এই এক বৎসর মধ্যে মাঝে মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছেও—এই অদৃশ্য জগতাব মোহস্পর্শ মাঝে মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জুরীর উন্মাদ সুবাসে, সন্ধ্যা-দুসর অনতিক্ষু গিবিমালাব সোয়া-রেখায়, নেকড়ে বাঘের ডাকেভরা গোয়াল্লাত শুভ্র জনহীন আরণ্যভূমির গাঙ্গীর্ষে, অগণিত তাগাখচিত নিঃসম শূন্যের ছবিতে। বৈকালে ঘোড়াটি দাঁধিয়া যখনই বক্রতোল্লার ধারে বসিয়াছে, যখনই অপরূপ মুখ মনে পড়িয়াছে, কতকাল ছুটিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন শৈশব-মধ্যাহ্নে মায়েব-মুখে শোনা মহাভারতের দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়াছে—তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইয়াছে যে, (যে-জীবন যে-জগৎকে আমরা প্রতিদিনর কাতকর্মে ছাটে-ছাটে হাতের কাছে পাঠেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মবাস্ত

অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা সৌন্দর্য
জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী,
যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে, দুঃখকে তাহা করিয়াছে অন্ততঃের পাশে,
অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসস্রাব...

আজ তাহার বসিরা বসিয়া মনে হয়, শীলেন্দেব বাড়ীর চাকুরি তাহা দৃষ্টিকে
আপণ্ড শাক দিয়াছিল, অন্ধকার অন্ধিস খবে একটুখানি ভায়গায় দশটা হইতে
সাতটা পর্যন্ত আবহ থাকিয়া একখানি খোলা ভায়গার জন্য সে কি ভীত
লোন্স তা, বৃত্তান্ত—এই টিউশনির দাঁকে গড়ের মাঠের দিকের বড় গির্জাটার
চুড়ার শিচনকা আকাশের দিকে প্রতি চোখে চাহিয়া থাকার সে কি
খালিম। কিছু সেই বন্ধ জীবনই নিম্পদাকে আরও বাড়াইয়া রাখিয়াছিল।
শক্তি খপচয় হইতে দেয় নাই, পশিয়া বাঁধিয়া সহ্য করিয়া দিয়াছিল,
আজ মনে হয় চাঁদানীর হেঁচ মাটার যতীশবাড়ী ও তাহার বন্ধু—জীবনের প্রথম
বন্ধু—সেই নিম্পদ দাঁদ দেরে উৎসাহিতা মেয়ে পটেককাঁও। ভগবান
তাহাকে নিমিওদয় করিয়াছিলেন—তাহার সকলে মিলিয়া চাঁদানীর সেই
কলোবস্ত্র জীবন হইতে তাহাকে ভাব করিয়া দূর করিয়া না দিলে আজও যে
সেখানেই থাকিয়া যাত। এমন সব অপরাধে সেখানে বিস্তৃত স্নাকবার
দোকানের সাক্ষা অভ্যাস মহা যুগেতে হাজিও বসিয়া তাস খেলিত।

একথাও প্রায়ই মনে হয় জীবনকে দূর কম মানুষেই চেনে। জগত ভুল
সুন্দরবে চোখে সবাই জীবনকে বুঝবার চেষ্টা করে, দোষবার চেষ্টা করে,
দেখাও হয় না, বোঝাও হয় না। তা ছাড়া সে চোখই বা ক'জন করে...

অমংকটক তখনও কিছু দূর। অপু বলিল, বামচরিত, কিছু শুকনো ডাল
আমি শালশা তাড়িয়ে আন চা করি। বামচরিতের ঘোব আপত্তি তাহাতে।
নে বলল, গুরু এসব বনে বড় ভালুকের হয়। অন্ধকার হবার আগে অমর-
কটকের দাকবাংলোয় যেতে হবে। অপু বলিল, তাডাতাড়ি চা হয়ে যাবে,
যাও না তুমি। তবে সে বড় লোটাটায় শোণের জল আনিয়া তিন টুকরা
পাপরো উপর চাটাইয়া আঙন জালিল। হাসিয়া বলিল, একটা ভজন গাও
বামচরিত যে খণ্ডন জলেছে, এব কাছে তোমাব ভালুক এগোবে না, নির্ভয়ে
গাও।

জোৎস্না উঠিল। চাবিধারে অধৃত, গম্ভীর শোভা। কলাকার কাবা-পুরাণের
বেশ তাহার মন হইতে এখনও যায় নাই। বসিয়া বসিয়া মনে হইল সত্যি
যেন কোন্ সুন্দরী, চাকুনেত্রী রাজবধূ—নব-পুষ্পিতা মল্লীলতার মত তব্বী
লীলাময়ী—এই জনহীন নিষ্ঠুর আরণ্যভূমিতে পথ হারাইয়া বিপন্নাব মত
ঘুরিতেছে—তাহার উদ্ভ্রান্ত স্বামী ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া
চলিয়া গিয়াছে—দূরে স্বয়ংবানু পবতের পার্শ্ব দিয়া বিদর্ভ যাইবার পথটি কে
তাহাকে বলিয়া দিবে!

নন্-কো-অপারেশনের উদ্দেশ্যপূর্ণ দিনগুলি তখন বছর তিনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে একদিন প্রণব বাঙসাহী জেল হইতে খালাস পাইল। জেলে তাহাব স্বাস্থ্যাহানি হয় নাই, কেবল চোখের কেমন একটা অসুখ হইয়াছে, চোখ কর্কক্ কবে, জল পড়ে। জেলের ডাক্তার মিঃ সেন চশমা লইতে বলিয়াছেন এবং কলিকাতার এক চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞের নামে একটি পত্রও দিয়াছেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া সে ঢাকা বণ্ডনা হইল এবং সেখান হইতে গেল ঝগ্রামে। এক প্রোটা খুড়ীমা ছাড়া তাহাব আর কেহ নাই, বাপ মা শেষবেই মাঝা গিয়াছেন, এক বোন ছিল, সেও বিবাহের পর মাঝা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে বাড়ি পৌঁছিল। খুড়ীমা ভাড়া বোয়াকেব দারে কত্থলেব আসন পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। খুড়ীমাব নিজের ছেলেটি মাতুষ নয়, গাছা খাইয়া বেডায়, প্রণবকে ছেলেবেলা হইতে মাতুষ করিয়াছেন, ভালোওবাসেন, কিন্তু লেখাপড়া জানিলে কি হইবে, তাহাব পুনঃ পুনঃ সঙ্গদেশ সত্ত্বেও সে কেবলই নানা হাস্যময় পড়িতেছে, ইচ্ছা করিয়া পড়িতেছে।

এ বন্ধবয়সে শুধু তাহাবই মরণ, নাঃ, ইত্যাদি নানা কথা ও ত্রিবন্ধার প্রণবকে বোয়াকেব ধাবে দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। বাগানের বড় কাঠাল গাছেব একটা ডাল কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, খুড়ীমা চৌক দিয়া বেড়ান কখন, তিনি ও-সব পাবিবেন না, তাহাকে নেন কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ কর্তাদের অত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি চোখের উপর নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দেখাও তাহার পক্ষে অসম্ভব।

দিনচারেক বাড়ি থাকিয়া খুড়ীমাকে একটু শান্ত করিয়া চশমার ব্যবস্থার দোহাই দিয়া সে কলিকাতায় রওনা হইল। সোদপুরে খুড়ীমাব একজন ছেলেবেলার-পাতানো গোলাপফুল আছেন, তাহাবা প্রণবকে দেখিতে চান একবার, সেখানে যেন সে অবশ্য অবশ্য যায়, খুড়ীমাব মাপায় দিবা। প্রণব মনে মনে হাসিল। বৎসর-চার পূর্বে গোলাপ-ফুলের বড় মেয়েটিব মরণ বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তখন খুড়ীমা এটী কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রণব যাওয়ার সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তারপরই আসিল নন্-কো-অপারেশনের চেউ, এবং নানা দুঃখ-দুর্ভোগ। যেটির বিবাহ হইয়াছে, এবার বোধ হয় ছোটটির পালা।

কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে অপূর খোঁজ করিল, পরিচিত স্থানগুলিতে গিয়া দেখিল, দু-একদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে খুঁজিল, কারণ যদি অপূ

কলিকাতায় থাকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। কোথাও তাহার সম্মান মিলিল না। টাঙ্গানীতে যে অণু নাই তাহা তিন বৎসর আগে জেলে ঢুকিবার সময় জানিত, কাবণ তাহারও প্রায় এক বৎসর আগে অণু সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

একদিন সে ময়ূখদেব বাড়ি গেল। তখন রাত প্রায় আটটা, বাহিরের ঘরে ময়ূখ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছে, সে আজকাল এটর্নি, গুড-ফ্রন্ডের বড় নামদার ও শাণের সাহায্যে নতুন বাসিলেও ৬ মাস উপার্জন করে। ময়ূখ যে ব্যবসাসে উন্নত করিবে, তাহার প্রমাণ প্রণব সেইদিনই পাইল।

ঘণ্টাব্যবসায় কথাব্যবসায় পূর্বে রাত সাড়ে সাতটায় কাছাকাছি ময়ূখ ঘের একটু ডসগুস কবিত্তে লাগিল—এমন কাহার প্রতীক্ষা কবিত্তেছে। একটু পরেই একখানা বড় মোটরগাড়ি আসিয়া দরজায় লাগিল, একটা পয়ত্রিশ-চত্রিশ বছরের যুবকের হাত ধরিয়া ঠাণ্ডন লোক ঘরে প্রবেশ করিল। প্রণব দেখিয়াই ঝুঁকিল, যুবকটি মাতাল অবস্থায় আসিয়াছে। সঙ্গে লোক দুইটির মধ্যে একজনের একটা চোখ বাবা, ঘোলাটে পনের—বোপ হয় সে-চোখে দেখিতে পায় না, অপর লোকটি বেশ সুপুরুষ। ময়ূখ হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে মল্লিক মশায়, আসুন, ইনিই মিঃ সেন শর্মা ৭০ বসুন, নমস্কার। গোপাল-বাবু, বসুন এইখানে। আর ওকে আমাদের কনভিশন্স সব বলেছেন তো?

এবং প্রণব বুঝিল মল্লিক মশায় বড় পাকা লোক। উত্তর দিবার পূর্বে তিনি একবার প্রবেশ দিকে চাহিলেন। প্রণব উঠিতে বাটতেছিল, ময়ূখ বলিল—না, না, বসো হে। ও আমায় ক্লাসেও, একসঙ্গে কলেজে পড়ুয়—ও ঘরের লোক, বসুন আপনি। মল্লিক মশাই পুতুলি খুলিয়া কি সব কাগজ বাহির করিলেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নসুবে বানিকসং কি কথাবাতা হইল। সঙ্গে লোকটি দু'বার যুবকটির কানে কানে ইং-বিস্ কবিত্তা কি কি বলিল, পরে যুবক একটা কাগজে ন'ম সই করিল। ময়ূখ দু'বার সইটা পরীক্ষা করিয়া কাগজখানা একটা বামের মধ্যে পুবিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল ও একবার নোটের তাড়া মল্লিক মশায়কে গুণিয়া দিল। পরে দলটি গিয়া মোটরে উঠিল।

প্রণব খপ্পর মত নিবেদন নয়, সে বাপাবাটা বুঝিল। যুবকটির নাম অজিত-লাল সেন-শর্মা, বেনও জমিদারের ছেলে। যে-জন্মই হউক, সে দুই হাজার টাকার হাণ্ডনে ৮ কবিয়া দেড় হাজার টাকা লইয়া গেল এবং মল্লিক মশায় গাহার দাপাল, কাবণ, সকলকে মোটরে উঠাইয়া দিয়া তিনি আবার ফিবিয়া ও পুনরায় প্রণবের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে চাহিয়া ময়ূখের সঙ্গে কিসের তর্ক উঠাইলেন—সাড়ে সাত পাসেন্টের জন্য তিনি যে এতটা সুলভ করেন নাই, এ কথা কয়েকবার শুনাইলেন। ঠিক সেই সময়েই সন্ধ্যা লইল।

পরদিন মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা আবার দেখা। মধ্যাহ্ন হাসিয়া বলিল—কালকের সেই কাপ্তেন বাবুটি হে—আবার শেষরাত্রে তিনটের সময় ঘোঁটরে এসে হাজির। আবার চাই হাজার টাকা,—খোকে খাটফাইভ পার্সেন্ট লাভ যেরে দিলুম। মল্লিক লোকটা ঘুঘু দালাল। বডলোকের কাপ্তেন ছেলে যখন শেষরাতে হাণ্ডনোট কাটছেন, তখন আমবা যা পারি ক'রে নিতে—আমার কি, লোকে যদি দেউহাজার টাকার হাণ্ডনোট কেটে এক হাজার নেয় আমবা তাতে কি? দোষ কি? এই-সব চব্বিয়েই তো আমাদের খেতে হবে। কত বাত এমন আসে ছাখ না, টাকার যা বাজার কলকাতায়, কে দেবে?

প্রণব খুব আশ্চর্য হইল না। ইহাদের কাযকলাপ সে কিছু কিছু জানে, এক অপ্রকৃতিস্থ মাতাল যুবকদের নিকট হইতে ইহারা এক বাত্রেতে হাজার টাকা অসং উপায়ে উপাভন করিয়া বড় গলান্ন সেইরাগ আবার বাহ্যিক কাপিয়া জাহির করিতেছে। হতভাগা যুবকটির জন্য প্রণবের কণ্ঠ হইল—মও অবস্থায় সে যে কি সহ্য করিল, কত টাকা তাহার বদলে পাইল, হয়ত বা তাহা সে বুঝিতেও পাবিল না।

কলিকাতা হইতে সে মামার বাড়ি আসিল। মাঃসমা বড় মামীমা আর ইহজগতে নাই। গত বৎসর জুড়ার সময় তিনি—প্রণব তখন ছেলে। সেইখানেই সে সংবাদটা পায়। গঙ্গানন্দকাটির ঘাটে নৌকা ভিড়িতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাল রোনে সারা রাত ঘুম হয় নাই খাদে। তাড়াতাড়ি দ্বানাহার সাব্বিয়া দোতলার কোণের ঘরে বিশ্রামের জন্য দায়িয়া দৌবিল, বিছানার উপর একটা পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে কুঁকিয়া শুইয়া। দেখিয়া মনে হইল, একবাশ বাসি গোলাপফুল কে বেন বিছানার উপর উদ্গুড় করিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছে—ঠ্যা, সে যাহা ভাবিয়াছে তাই—অবে ছেলেটিব গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে মুখ অরেক দমকে লাল, ঠোঁট ঠাণ্ডিতেছে, কেমন যেন দিশেহারা ভাব। মাপার দিকে একখানা প্রেকাষিতে দুখানা খাদ-খাওয়া ময়দার কড়ি ও খানিকটা চিনি। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাছল না? খোকা যেন হঠাৎ চমক ভাঙিয়া কতকটা ভয় ও কতকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া বহিল, কোনও কথা বলিল না।

প্রণবের মনে বড় কষ্ট হইল—ইহাকে ইহারা এ-ভাবে একা উপরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। অসহায় বালক একলাটি শুইয়া যুগ বৃজিয়া অরেক সঙ্গে যুক্তিতেছে, পদ্মা দিয়াছে কি—না, দুখানা ময়দার হাতে—গাখ রুটি ও খানিকটা লাল চিনি। আর কিছু জোটে নাই ইহাদের? অরেক ঘোরে তাহাই বালক যাহা পারিয়াছে খাইয়াছে। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—খোকা কুটি কেন, সাং
দেয় নি তোমায়? পলেন

খোকা বলিল—চাবু নেই।

—নেই কে বলল?

—মা—মামীমা বললে চাবু নেই।

সুয়ে
খোক
ব বিদু

সে আরে হাঁপাইতেছে দেখিয়া প্রণব ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহার মাথাটা বেশ করিয়া ধুইয়া দিয়া পাখাব বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ একপ করিতেই আরটা একটু কমিয়া আসিল, বালক একটু সুস্থ হইল। দিশেহারা ও হাঁস-কঁাস ভাবটা কাটিয়া গেল। প্রণব বলিল—বল তো আমি কে?

খোকা বলিল—জা-জা-জা জানি নে তো?

প্রণব বলিল,—আমি তোমার মামা হই খোকা। তোমার বাবা বুঝি আসে নি এব মথো?

কাঞ্চল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ন-ন-না তো, বাবা কতদিন আসে নি।

প্রণব কৌতূহলের সুবে বলিল—তুমি এত তোলা হ'লে কি ক'নে, কাঞ্চল?

সে অপূর ছেলেকে খুব চোটেবেলায় দেখিয়াছিল। আজ দেখিয়া মনে হইল, অপূর ঠোঁটের সুসুন্দর বেষ্টাকু ও গায়ের সুন্দর বড়ট বাদে ইহার মুখের বাকী সবটুকু মায়ের মত।

কাঞ্চল ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—আমার বাব, আসবে না?

—আসবে না কেন? বাঃ।

—ক-ক কবে আসবে?

—এই এল বলে। বাবার জন্যে মন কেমন করে থাক?

কাঞ্চল কিছু বলিল না।

অপূর উত্তরে প্রণবের খুব লাগ হইল। ভাবিল আচ্ছা পাশে তো? মামা কচি বাচ্চাটাকে বেদোবে ফেলে রেখে কে'দায় নিকরেশ ছস্বে বসে আছে। ওকে এখানে কে দেখে তার নেই ঠিক—দয়া মাস্তা নেই শবীরে?

শশীনাথায়ণ বাঁড়মো প্রণবের নিকট কামাইয়ের খেঁচো নিন্দা কবিলেন—বন্ধু সঙ্গে বিয়েবা যোগাযোগটি তো ঘটয়েছিলে, ভেবে ছাতো তো সে আজ পাঁচ বছরের মথো নিজের ছেলেকে একবার চোখের দেখা দেখতে এল না, ত্রিশ-চল্লিশ টাকাব মাইনেব চাকরি করছেন আর খুবে বেড়াচ্ছেন ভবঘুবের মত, চাল নেই চুলো নেই, কোন জন্মে যে করবেন সে আশাও নেই—ব'লো না, হাতে চটে'ছ আমি—এদিকে ছেলেটি কি অবিকল তাই।...এই বয়েস থেকেই নির্বোধ, অচা যেমনি চঞ্চল যেমনি একঙয়ে। চঞ্চল কি একটু-আধটুকু এটুকু গো ছলে, একদিন করেছে কি, একদল গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে চলে গিয়েছে সেই দৌরপুরের বাজাবে—এদিকে আমা খুঁজে পাই নে, চাবদিকে লোক পাঠাই—শেষে মাখন মুহুরীৰ সঙ্গে দেখা, সে ধরে নিয়ে আসে। খাওয়াও, দাওয়াও, মেয়েব ছেলে কখনও আপনাব হয় না, যে পর সে-ই পর।

খোকা বাপের মত লাজুক ও মুখচোরা—কিন্তু প্রণবের মনে হইল, এমন সুন্দর ছেলে সে খুব কম দেখিয়াছে। সারা গা বহিয়া যেন লাবণ্য বসিতেছে, সদাসর্বদা মুখ টিপিয়া কেমন এক করুণ, অপ্রতিভ ধরনের হাসি হাসে—মুখখানা এত লাজুক ও অবোধ দেখান্ন সে সময়।...কেমন যে একটা করুণ

হয়। এখানে কয়েক দিন থাকিয়া প্রণব বুঝিয়াছে, দিদিমা মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতে বালককে যত্ন করিবার আব কেহ নাই—সে কখন যায়, কখন শোয়, কি পবে—এ সব বিষয়ে বাড়ির কাহারও দৃষ্টি নাই। শশীনারায়ণ বাড়িথো তো নাতিকে দু'চক্ষে দেখিতে পাবেন না, সর্বদা কড়া শাসনে রাখেন। তাঁহ'ব বিদ্ভাস এখন হইতে শাসন না করিলে এ-ও বাপের মত ভবঘুবে হইয়া যাইবে। অথচ বালক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, দাদামহাশয় কেন তাহাকে এমন উঠিতে-ত্যাগী বসিতে-ত্যাগী দেন—ফলে সে দাদামহাশয়কে যমের মত ভয় করে, তাহার ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটিতে চায় না।

কলিকাতায় কিবিয়া প্রণব দেবব্রতের সঙ্গে দেখা করিল। দেবব্রত একট, বিষয়—বিলাত যাইবাব পূর্বে সে একটি মেয়েকে নিজের চোখে দেখিয়া বিবাহের জন্য পছন্দ করিয়াছিল—কিন্তু তখন নানা কারণে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়—সে আজ তিন বৎসর পূর্বের কথা। এবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া সে নিছক কেতৃহলের বশবর্তী হইয়া সন্ধান লইয়া জানে মেয়েটির এখনও 'ববাহ হয় নাই। মেয়েটির ডান পায়ের হাঁটুতে নাকি কি হইয়াছে, ডাক্তার সন্দেহ করিতেছেন বোধ হয় তাহাতে চিরজীবনের জন্য ঐ পা খাটো হইয়া থাকিবে—এ অবস্থায় কে ই বা বিবাহ করিতে অগ্রসর হইবে? শুনিয়া মাত্র দেবব্রত খিঙ্কা বসিয়াছে সে ঐ মেয়েকেই বিবাহ করিবে—মায়ের ঘোব আপনি, পিসেমহাশয়ের আপত্তি, ম'মাদের আপত্তি—সে কিম্ব নাছোড়বান্দা। হয় এ মেয়েকে বিবাহ করিবে, নতুবা দবকার নাই বিবাহে।

দেবব্রতের সঙ্গে প্রণবের খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না। অল্প সঙ্গে ইতিপূর্বে বার-দুই-তিন তাহার কাছে গিয়াছিল এই মাত্র। এবার সে যাত্রা অপূর্ণ কোন সন্ধান দিতে পাবে কিনা তাহাই জানিবাব জগ্য। কিন্তু এই বিবাহ-বিভ্রান্তিকে অবলম্বন করিয়া মাস-দুইয়ের মধ্যে দু'জনের একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিল। দেবব্রত এই সব গোলমালের দরুন পিসেমহাশয়ের বাসা ছাড়িয়া কলিকাতায় হোটেলেরে উঠিয়াছিল—বৈকালে দেখানে একদিন প্রণব বেড়াইতে গিয়া শুনি, দেবব্রতের মা এ বিবাহে মত 'দয়াছেন। দেবব্রত বলিল—ঠিক সময় এসেছেন। আমি ভাবছিলাম আপনার কথা—কাল পিসেমহাশয় আব বড ম মা খাবেন মেয়েকে আশীর্বাদ করতে, আপনিও যান ওঁদের সঙ্গে। ঠিক বিকেল পাঁচটার এখানে হ'সবেন।

মেয়ের বাড়ি গোয়াবাগান। ছোটো দোতলা বাড়ি নিচে একটা প্রেস। মেয়ের বাপ গভর্ণমেন্টের চাকরি করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া খুব সুন্দরী বলিয়া মনে হইল না প্রণবের, গায়ের রং যে খুব ফর্সা তা'ও নব্ব তবে যুখে এমন কিছু আছে যাতে একবার দেখিল বার বার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। বাড়ির কাছে ঘোড়ুকচিহ্ন, চুল বেশ বড় বড় ও কৌকডানো। বিবাহের দিনও উত্তর পক্ষের সম্মতিক্রম ধার্য হইয়া গেল।

দেবব্রত সঙ্গীতের গৃহস্থ-পরের ছেলে। দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে জানে না,

এ.পর্যন্ত বরাবর যথেষ্ট পয়সা হাতে পাইয়াছে, তাহার পিসেমহাশয় অপুত্রক, তাহার সম্পত্তি ও কলিকাতার দু'খানা বাড়ি দেবব্রত পাইবে। কিন্তু পয়সা অপব্যয় করার দিকে দেবব্রতের ঝোঁক নাই, সে খুব হিসাবী ও সতর্ক এ বিষয়ে। সাংসারিক বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার—পাটনায় যে চাকরিটা সে সম্প্রতি পাইয়াছে, সে শুধু তাহার যোগাড়-খরচ ও সুপারিশ ধরিবার কৃতিত্বের পুরস্কার—নতুবা কুড়ি-বাইশ জন বিলাত ফেরত অভিজ্ঞ 'ইঞ্জিনীয়ারের দরখাস্তের মধ্যে তাহার মত তরুণ ও অভিজ্ঞ লোকের চাকুরি পাইবার কোনই আশা ছিল না। শাখারিটোলায় পিসেমহাশয় তারিণী মিত্রের বাড়ি হইতেই দেবব্রত বিবাহ করিতে গেল। পিসিমার ইচ্ছা ছিল খুব বড় একটা মিছিল করিয়া বর রওনা হয়, কিন্তু পিসেমহাশয় বুঝাইলেন ও—সব একালের ছেলে—বিশেষ করিয়া দেবব্রতের মত বিলাত-ফেরত ছেলে—পছন্দ করিবে না। মায়ের নিকট বিবাহ করিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার সময় দেবব্রতের চোখ ভিজিয়া উঠিল—স্বর্গগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া, দেবব্রতর মা—ও চোখের জল ফেলিলেন—সবাই বকিল, তিরস্কার করিল। একজন প্রতিবেশিনী হাসিয়া বলিলেন—দোর-ধরুণীর টাকা কৈ?...

দেবব্রতর পিসিমা বলিলেন—আমার কাছে গুণে নিও মেজবো। ও—কি দোর-ধরা হ'ল? আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাঙ্গাল দেশে নিয়ম ছিল দেবোত্ত সাতজন এয়ে আর সাতজন কুমারী এই চৌদ্দজনকে দোর-ধরুণীর টাকা দিয়ে তবে বর বেরুতে পেত বাড়ি থেকে। একালে তো সব দাঁড়িয়েছে—

দেবব্রত একটুখানি দাঁড়াইল। ফিরিয়া বলিল—মা শোন একটু।...

আড়ালে গিয়া চুপি চুপি বলিল—চাটুখো বাড়ির মেয়েটা দোর ধরার জন্মে দাঁড়িয়েছিল, আমি জানি, ছোট পিসিমা তাকে সরিয়ে দিলেছেন—এ সবেতে আমায় মনে বড় কষ্ট হয়, মা। এই দশ টাকার নোটটা রাখো, তাকে তুমি দিও—কেন তাকে সরালে বল তো—আমি জানি অবিগ্নি কেন সরিয়েছে—কিন্তু এতে লোকের মনে কষ্ট হয় তাও ওরা বোঝে না।

মা বলিলেন—ও—কথা তোর ওদের বলবার দরকার নেই—টাকা দিলি আমি দেবো এখন। ছোট চাকুরির দোষ কি, বিধবা মেয়েকে কি বলে আজ সামনে রাখে বল না? হিঁর নিয়মগুলো তো মানতে হবে, সবাই তো তোমার মত বেক্সতাবী হয়নি এখনো। মেয়েটার দোষ দিইনি, তার আর কিসের দোষ—ছেলেমানুষ—সে না—হয় অত বোঝে সোঝে না, আশোদ নেচে দোর আঁকবে বলে দাঁড়িয়েছে—তার বাপ-মায়ের তো এটা দেখতে হয়। শুভকাজের নিয়ম বিধবা মেয়েকে কেন এখানে পাঠানো বাপু? তা নয়—গরীব কিনা, কষ্ট পাইয়েছে—যা কিছু ঘরে আসে—শাক। আমি দেবো এখন—তা হ'ল যে প্রণীটাকা দিলেই তো হত—এত কেন?

—মা এ শাক। ছোটপিসিমাকে ব'লো বুঝিয়ে ওতে শুভকাজ এগোয়

না, আরো শিঙিয়ে যান।

হু-তিনখানা বাড়ির মোড়ে চাটুখো বাড়িটা। ইহার সবাই ছাপাখানায় কাজ করে, বৃদ্ধ চাটুখোমশায়ও আগে কম্পাউজিটরের কাজ করিতেন, আজকাল চোখে দেখেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজকাল তাঁহার কাজ প্রতিবেশীদের নিকট অভাব জানাইয়া আধুলি ধার করিয়া বেড়ানো। দেবব্রত ইহাদের সকলকেই অনেক দিন হইতে চেনে। তাহার গোলাপফুল সাজানো মোটরখানা চাটুখোবাড়ির সম্মুখে মোড় ঘুরিবাব সময় দেবব্রত কেবলই ভাবিতেছিল, কোনও জানালার ফাঁক দিয়া তের বৎসরের বিধবা মেয়েটা হয়ত কোতুলকেব সহিত তাহাদের মোটর ও ফিটন গাড়ির সারির দিকে চাহিয়া আছে।

রাত্রের গোড়ার দিকেই বিবাহ ও বরযাত্রীভোজন মিটিয়া গেল।

দেবব্রত বাসাব গিয়া দেখিল, দেখানে অত্যন্ত গিড—বাসবেব ঘব খুব বড় নয়—সামনের দালানেও স্থান নেই, অন্য ঘরের বাস্র তোরঙ্গ সব দালানে বাহির করা হইয়াছে, অথচ মোরদের ভিড এত বেশী যে বসাতো দুয়ের কথা, সকলেব দাঁড়াইবার জায়গাও নাই। সে বড় শালকে বলিল—দেখুন, যদি অনুমতি করেন, একটু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যে জাহির করি। এই ট্রাকগুলো এখানে রাখাব কোন মানে নেই—লোক ডাকিয়ে দেওয়ার লেব দিকে এক সারি এখানে, আর এক সারি করে দিন সিঁড়ির ধাপে ধাপে—বুঝলেন না?—যাবাব আসবাবও কট হবে না অথচ এদেব জায়গা হবে এখন। তাহার চোট শালীরা ব্যাপাবটা লইয়া তাহাকে কি একটা ঠাট্টা কবিল। সবাই হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি একটার পর কিছু বে—যাহার স্থানে চলিয়া গেল। দেবব্রত বাসব হইতে বাহির হইয়া দালানের একটা ফিলের তোরঙ্গের উপর বসিয়া একটা সিগারেট পরাইল। তাহার মনে আনন্দের সঙ্গে কেমন একটা উত্তেজনা।... মনে মনে খুব একটা তৃপ্তিও অশ্রুওব করিল।... জীবন এখন সুনির্দিষ্ট পথে চলিবে—লক্ষ্মীছাড়াব জীবন শেষ হইল। পাটনার চাকুরিতে একটা সুবিধা এই যে, জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর, বাড়িভাড়া সস্তা, বছরে পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িবে—তবে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের সুদ কিছু কম। সে ভাবিল—যাই তো আগে, কৈজুদীন হোসেনকে একটু হাতে রাখতে হবে, ওর হাতেই সব—অন্য সব ডিরেক্টর তো কাঠের পুতুল। ক্যান্টনমেন্টের ক্লাবে গিয়েই ভর্তি হলে যাবো—ওরা আবার ওসব দেখলে ভেজ্ঞে কিনা।

নববধু এখনও ঘুমায় নাই, দেবব্রত গিয়া বলিল—বাইরে এসো না সুনীতি, কেউ নেই। আগবে?

নববধু চেলীর পুঁজী নয়, কিন্তু পায়ের জল তার উঠিতে কষ্ট হয়—দেবব্রত তাহাকে সম্বন্ধে ধরিয়া দালানে আনিয়া তোরঙ্গটার ওপর ধীরে ধীরে বসাইয়া দিল। নববধু হাসিয়া বলিল—ওই দোরটা বন্ধ করে দাও—সিঁড়ির ওইটে

—শেকল উঠিয়ে দাও—হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে—নৈলে একুশি কেউ এসে পড়বে।
দেবব্রত পাশে বসিয়া বলিল—রাভজেকে কষ্ট হচ্ছে খুব—না ?

—কি এমন কষ্ট, তা ছাড়া ছপুরবেলা আমি ঘুমিয়েছি খুব।

—আচ্ছা, তুমি কেনে—চন্দন পরো নি কেনে সুনৌতি ? এখানে সে চলন নেই ?
মেয়েটি সলজ্জমুখে বলিল—মা পরাতে বলেছিলেন—

—তবে ?

—জ্যাঠাইমা বললেন. তুমি নাকি পছন্দ করবে না।

দেবব্রত হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কেন বল তো—বিলেত-ফেরত বলে ?
বা তো—

পরে সে বলিল—আমি সাত তারিখে পাটনায় যাব, বুঝলে, তোমাকে আর
মাকে এসে নিলে যাব মাস-দুই পরে, সুনৌতি। তোমার বাবাকে বলে
গেয়েছি।

মেয়েটি নতমুখে বলিল—আচ্ছা একটু কথা বলব ? কিছু মনে কববে না ?...

—বল না, কি মনে করব ?—

—আচ্ছা, আমার এই পা নিয়ে তুমি যে বিয়ে করলে, যদি আমার পা না
সাবে ? ছাখ, তোমার গা ছুঁয়ে সত্যি বলছি আমার হচ্ছে ছিল না বিয়ের।
মাকে কতবার বুঝিয়ে বলেছি, মা এই তো আমার পায়ের দশা, পরেও ওপর
অনর্থক কেন বোঝা চাপানো সারাজীবন—তা মা বললেন তুমি নাকি খুব—
তোমাব নাকি খুব ইচ্ছে। আচ্ছা কেন বল তো এ মতি তোমার হল ?

দেবব্রত বলিল—স্পষ্ট কথা বললে তুমিও কিছু মনে কববে না সুনৌতি ?
তাহলে বলি শোন. তোমার এই পায়ের দোষ যদি না হত তবে আমি অন্য
জায়গায় বিয়ে কবে ফেলতুম—যেদিন থেকে শুনেছি পায়েব দোষের জন্য
তোমাব বিয়ে এই তিন বছরের মধ্যে হয় নি—সেদিন থেকে আমার মন বলেছে
ওখানেই বিয়ে কবব, নয় তো নয়। অন্য জায়গায় বিয়ে কবলে মনে শাস্তি
পেতাম না সুনৌতি। সেই যে তোমাকে দেখে গিয়েছিলুম, তারপর বিয়ে
তখন ভেঙে গেল, কিন্তু তোমাব মুখখানা কতবার যে মনে হয়েছে !.. কেন কে
জানে—আমি কাব্য করছি নে সুনৌতি, ওসব আমার আসে না. আমি সত্যি
কথা বলছি।

তারপর দে আজ ওবেলার চাটুযো-বাড়ির বিধবা মেয়েটির কথা বলিল।
বলিল—ছাখ এও তো কাব্যের কথা নয়—আজ বিয়ের আসনে বসে কেবলই
গেই ছোট মেয়েটার কথা মনে হয়েছে। ছোট পিসিমা তাকে ভাড়িয়ে দিয়ে
আজ আমার অর্ধেক আনন্দ মাটি করেছেন, সুনৌতি—তোমার কাছে বলছি,
আর কাউকে ব'লো না যেন ! এ কেউ বুঝবে না, আমার মা-ও বোঝেন নি।
খড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল।

কাজলের মুশকিল বাধে রোজ সন্ধ্যায় সময়। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে

ভাহার মাসীয়া বলেন, ওপরে চলে বাও, শুয়ে পড় গিয়ে। কাজল বিপন্নমুখে রোম্বাকের কোণে দাঁড়াইয়া নীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ওপরে কেউ নাই, মধ্যে একটা অন্ধকার সিঁড়ি, তাহার উপর দোতলার পাশের ঘরটাতে আলনায় একরাশ লেপকাঁথা বাঁধা আছে। আস-অন্ধকারে দেগুলো এমন দেখায়।

আগে আগে দিদিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইয়া বাখিয়া আসিতেন। দিদিয়া আর নাই, মাসীয়াও বাওয়াইয়া দিয়াই খালাস। সেদিন সে সেজ দিদিয়াকে বলিয়াছিল। তিনি বন্ধার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আবার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এখন তোমায় খাই শোওয়াতে। একা এটুকু আর যেতে পারেন না, সেদিন তো পৌষপূর্বের হাটে একা পালিয়ে যেতে পেরেছিলে? ছেলের ন্যাকরা দেখে বাঁচিলেন।

নিরুপায় হইয়া ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠে। কিন্তু ঘনে ঢুকিতে আর সাহস না করিয়া প্রথমটা দোবের কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। কোণে কড়ির আলনাব নীচে দন্দামহাশয়ের একবাশ পূবানো চঁকাব ঝোল ও চঁকা-দান। এককোণে মিটমিটে তেলের প্রদীপ, তাতে সামান্য একটুখানি আলো হয় মাত্র, কোণের অন্ধকার তাহাতে আরও বেশ সন্দেহজনক দেখায়। এখানে একবার আসিলে আর কেহ কোথাও নাই, ছোট মাসীয়া নাই ছোটদিদিয়া নাই, দলু নাই, টাটি নাই—শু- সে আর চারিপাশের এই-সব অজানা বিভীষিকা। কিন্তু এখানেই বা সে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকিবে? ছোট মাসীয়া ও বিন্দু-ঝি এতদূর শেষ, তাহাদের আসিতে এখনও বহু দেরি, কতক হাওয়ার হাড়-কাঁপুনি ধরিয়া যায় যে। অগত্যা সে অন্যান্য দিনের মত চোখ বুজিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিজের বিছানাব উপর উঠিয়াই ছোট লেপটা একে-বাবে মুড়ি দিয়া ফেলে। কিন্তু বেশীক্ষণ লেপমুড়ি দিয়া থাকিতে পারে না—ঘরের মধ্যে কোন কিছু নাই তো? মুখ খুলিয়া একবার ভীতচোখে চারিদিকে-চাহিয়া দেখিয়া আবার লেপমুড়ি দেয়—আর তত রাজ্যের ভূতের গল্প এক ঠিক ছাট এই সময়টাতেই মনে আসে?

দিদিয়া থাকিতে এ-সব কষ্ট ছিল না। দিদিয়া তাহাকে ঘুম না পাড়াইয়া নামিতেন না। কাজল উপরে আসিয়াই বিছানার উপরকার সাফানো লেপ-কাঁথার স্তূপের উপর গুশী ও আমোদের সহিত বার বার লাফাইয়া পড়িয়া চৈতাইতে থাকিত—আমি জলে ঝাঁপাই—হি-হি—আমি জলে ঝাঁপাই—ও দিদিয়া—হি-হি—

কোবোরকমে দিদিয়া তাহার লাফানো হইতে নিবৃত্ত করিয়া শোয়াইতে কৃতকার্য হইলে সে দিদিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত,—এইবার একতা গ-গ-অ-অ—কথার শেষের দিকে পাভলা রাঙা ঠোট ঢুটি ফুলের কুঁড়ির মত এক জায়গায় জড় করিয়া না আনিলে কথা মুখ দিয়া বাহির হইত না। তাহার দিদিয়া হাসিয়া বলিত—যে শুড় বাস, খেয়ে-খেয়ে এমন তোৎলা। গল্প বলব,

নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে, সে সময়ে অনেক আবির্ভাবে, কিছু ঠিক করিতে পারে নাই।

আত্মকাল আর কেহ কাছে বসিয়া খাওয়ায় না, সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসে না, গল্প করে না। একলাটি এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়া আসিয়া উপরের ঘরে শুইতে হয়। সকলের চেয়ে মুশকিল হইয়াছে এইটাই বেশী কি-না।

অপরাজিত

অন্যোদয় পরিচ্ছেদ

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাস যান্ন যান্ন।

অপু অনেকদিন পরে দেশে ফিবিতেছিল। গাড়ির মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোক লঙ্কো-এর খরমুজাব গুণবর্ণনা কবিতেছিলেন, অনেকে মন দিয়া শুনিতেছিল—অপু অগ্ন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল। কতকণ্ঠে গাড়ি বাংলা দেশে আসিবে? সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের রূপকথার রাজ্য বাংলা। আজ দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর সে বাংলার শাস্ত, কমনীয় রূপ দেখে নাই। এই বৈশাখে বাঁশের বনে বনে শুকনো বাঁশখোলার তলা-বিছাইয়া পড়িয়া থাকে, কানুনফুলে ভরা সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটে সচল নতমুখী তরুণীর মূর্তি—কলিকাতার মেস-বাটা, দালানের রেলিং-এ কাপড় মেলিয়া দেওয়া, বাবুরা সব আফিসে, নিচের বালতিতে বৈকাল তিনটার সময় কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছে—এ সব সুপরিচিত প্রিয় দৃশ্যগুলি আর একবার দেখিবার জন্য—উঃ, মন কি ছটফটই না করিয়াছে গত ছ'বছর। বাংলা ছাড়িয়া সে ভাল করিয়া বাংলাকে চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে। কতকণ্ঠে বাংলাকে দেখা যাইবে আজ? সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময়।

রাণীগঞ্জ ছাড়িয়া অনেক দূর আসিবার পরে। বালুময় মাঠের মধ্যে সিংহারণ নদীর গ্রীষ্মের জল খররোজে শুকাইয়া গিয়াছে—দূর গ্রামের মেয়েরা আসিয়া নদীবাতে বালু খুঁড়িয়া সেই জলে কলসী ভর্তি করিয়া লইতেছে—একটি কৃষক-বধূ জল-ভরা কলসী কাঁধে রেলের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ি দেখিতেছে—অপু দৃশ্যটা দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল—সারা শরীরে একটা অপূর্ণ আনন্দ-শিহরণ। কতদিন বাংলার মেয়ের এ পরিচিত ভঙ্গিটি সে দেখে নাই। চোখ, মন জুড়াইয়া গেল।

বর্ষমান ছাড়াইয়া নিদাঘ অপরাহ্নের ঘন ছায়ায় একটা অল্পত দৃশ্য চোখে পড়িল। একটা ছোট পুকুর ফটকস্থ ক্ষুদ্রফুলে একবারে ভরা, ফুলের পাতায় জল দেখা যায় না—ওপারে বিচালি-ছাওয়া গৃহস্থের বাড়ি, একটা প্রাচীন সজিনা গাছ জলের ধারে ভাঙিয়া পড়িয়া গুলিয়া বসিয়া যাইতেছে, একটা গোবরগাদা—আজ সারাদিনের আশু-বৃষ্টির পরে, বিহার ও সাঁওতাল পরগণার বজ্র, আগুন-রঙা ভূমিস্ত্রীর পরে ছান্ধাভরা পদপুকুরটা যেন সারা বাংলার কমনীয় স্থানের প্রতীক হইয়া তাহার চোখে দেখা দিল।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে যেন খানিকটা অবাধ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এত আলো, এত লোকজন, এত ব্যস্ততা, এত গাড়ি-বোড়া জীবনে এই প্রথম দেখিতেছে, হাওড়া পুল পার হইবার সময় ওপারের আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর দৃশ্যে যেন সে মুগ্ধ হইয়া গেল—ওঙলা কি ? মোটর বাস ? কই আগে তো ছিল না কখনও ? 'ক বড় বড় বাড়ি কলিকাতায়, ফুটপাতে কি লোকজনের গিড়। বাড়ির মাথায় একটা কিসের বিজ্ঞাপনের বিজলী আলোর রঙীন ছরপ একবার অলিতেছে, আবার নিভিতেছে—উঃ, কী কাণ্ড।

থাবিসন রোডের একটা বোর্ডিং—এ উঠিয়া একা একটা ঘর লইল—মানের ঘর হইতে সাবান মানিয়া স্নান সারিয়া সারাদিনের ধুমধূলি ও গরমের পর ভারী আরাম পাইল। ঘরের আলোর সুইচ টিপিয়া ছেলেমানুষের মত আনন্দে আলোটাকে একবার জ্বালাইতে একবার নিভাইতে লাগিল—সবই নতুন মনে হয়। সবই অদ্ভুত লাগে।

প্ৰতিদিন সে কলিকাতার সবত্র ঘুরিল—কোন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা হইল না। বোবাজারের সেই কবিরাজ বন্ধুটি বাসা উঠাইয়া কে ধান চাষিয়া গিয়াছে, পূর্বপরিচিত মেসঙলিতে নতুন লোকেরা আসিয়াছে, কলেজ ক্লোয়ারের সেই পুরাণ চাষের দোকানটি উঠিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় সে একটা নতুন বাংলা থিয়েটারে গেল বাংলা গান শোনার লোভে। বেশী দামের টিকিট কিনিয়া বঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের সারির আসনের বসিয়া পলকিত ও উৎসুক চোখে চাষিদের দর্শকের ভিড়টা দেখিতেছিল। একটা অঙ্কের শেষে সে বাহিবে আসিল, ফুটপাতে একজন বুড়ী পান বিক্রী করিতেছে, অপুকে বলিল, বাবু, পান নেবেন না ? নেন না। অপু ভাবিল, সবাই যিঠে পান কিনেছে বড় আয়নাওয়ালার দোকান থেকে। এ বুড়ীর পান বোধ হয় কেউ কেনে না—আহা, নিই এর কাছে থেকে।

সকলেরই উপর কেমন একটা করুণার ভাব, সবারই উপর কেমন একটা ভালবাসা, সহানুভূতির ভাব—অপুর মনে বর্তমান অবস্থায় বুড়ী পানওয়ালী হ'ল পাতিয়া দশটা টাকা চাহিয়া বসিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা নিতে পারিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সে বাহিব হইয়া বুড়ীটার কাছে পান কিনিতে যাইতেছে, এমন সময় পিছনের আসনের দিকে তাহার নজর পড়িল।

সে একটু আগাইয়া গিয়া কাখে হাত দিয়া বলিল—সুরেশ্বরদা, চিনতে পাবেন ?

কলিকাতায় প্রথম ছাত্র-জীবনের সেই উপকারী বন্ধু সুরেশ্বর, সঙ্গে একটা ডকুণী মহিলা। সুরেশ্বর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ওডেনস গ্রেসাস। আমাদের সেই অগ্ৰূপ না ?

অগ্ৰূপ হাঙ্গিয়া বলিল—কেন, সন্দেহ হচ্ছে না কি ? ওঃ, কতদিন পরে

আপনার সঙ্গে, ওঃ ?

—দেখে সন্দেহ হবার কথাই বটে। মুখের চেহারা বদলেছে, রঙটা একটু তামাটে—যদিও you are as handsome as ever—ও, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—ইনি আমার বেটাব-হাফ-আর ইনি আমার বন্ধু, অগুর্নবাবু—কবি, ভাবুক, লেখক, ভবঘুরে এ্যাণ্ড হোয়াট নট—তারপর, কোথায় ছিলে এতদিন ?

—কোথায় ছিলুম না তাই বং জিজ্ঞেস করুন—in all sorts of places—তবে সভা জগৎ থেকে দূরে—ছ'বছর পর কাল কলকাতায় এসেছি। ও ডুপ উঠল বুঝি, এখন থাক, বলব এখন।

মোর্স বাজে প্লে। তাব চেয়ে চলো, তোমার সঙ্গে বাইবে যাই।

অপু বন্ধুকে সিগারেট দিয়া নিজে সিগারেট পরাইতে ধাইতে বলিল—আপনাব এ-সব দেখে একবেয়ে হয়ে গিয়েছে, তাই ভাল লাগছে না বোধ হয়। আমার চোখ নিজে যদি দেখতেন, তবে ছ'বছর বনবাসেব পব উড়িয়াদেব রাম-যাত্রাও ভাল লাগত। জানেন সুরেশ্বরদা, সেখানে আমার ঘব থেকে কিছু দূরে এক জামগায় একটা গিঁগিটি থাকত—সেটা এবেলা-ওবেলা রঙ বদলাত, দু'টি বেলা তাই শব ক'বে দেখতে যেতুম—তাই ছিল একমাত্র তামাশা, তাই দেখে আনন্দ পেতুম।

রাত সাড়ে ন'টার পিয়েটার ভাঙিল। তারপর সে পিয়েটার-ঘর হইতে নিঃসৃত সুবেশ নরনারীৰ স্রোতঃ দিকে চাহিয়া রহিল—এই আলো, লোকজন সাজানো দোকানপসবা—এসব সে সেলমানুষেব মত আনন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

স্ট্রাকে মালিকতলায় শব্দবর্ষাতে নামাইয়া দিয়া সুবেশ্বর আপুৰ সহিত কর্পোরেশন স্ট্রাটের এক রেষ্টোরাঁয় গিয়া উঠিল। আপুৰ কথা সব শুনিয়া বলিল—এই পাঁচ বছর ওখানে ছিলে ? মন-কেমন কবত না দেশের জন্যে ? —Oh at times I felt so terribly homesick—homesick for Bengal—শেষ ছ'বছর দেশ দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলুম—

ফুটপাথ বাহিয়া কয়েকটি ফিরিঙ্গি মেয়ে ঠাঁনি কলাব করিতে কবিতে গাধ চলিতেছে, অপু সাগ্রহে সেদিকে চাহিয়া রহিল। মানুষের গলাব সুব মানুসেব কাছে এত কামাও হয়। রাস্তাভরা লোকজন, মোট গাড়ি, পাশেব একটি একতলা বাড়িতে সাজানো গোছানো ছোট ঘরে কয়েকটি সাহেবেব ছেলে-মেয়ে ছুটোছুটি করিয়া খেলা করিতেছে—সবই অদ্ভুত, সবই সুন্দর বলিয়া মনে হয়। আলোকোজ্জ্বল রেষ্টোরাঁটার অনবরত লোকজন চুকিতেছে, বাহির হইতেছে, মোটর হর্ণের আওয়াজ, মোটর বাইকের শব্দ, একখানা রিক্সা গাড়ি ঠুং ঠুং করিতে করিতে চলিয়া গেল—অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—যেন এসব সে কখনও দেখে নাই।

সুরেশ্বরকে বলিল—দেখুন জানালায় ধারে এসে—এ যে বন্ধুটা দেখছেন,

আজ ক'বছর ধরে ওটাকে উঠতে দেখিছি ঘন বন-ভঙ্গল-ভরা পাহাড়ের মাথার ওপরে। আজ ওটাকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর বাড়ির মাথার ওপরে উঠতে দেখে কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। এই তো পৌনে দশটা রাত ? এ সময় গত পাঁচ বৎসর শুধু আমি জঙ্গল পাহাড়—আর ভেড়িয়ার ডাক, কখনো কখনো বাঘের ডাকও—। আর কি loneliness ! শহরে বসে সে সব বোঝা যাবে না।

সুবেশ্বরও নিজের কথা বলিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন কলেজের অধ্যাপক, বিবাহ করিয়াছে কলিকাতায়। সম্প্রতি শালীর বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছে। বলিল—চাখ ভাই, তোমার ও জীবন একবার আত্মদ কবতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু তখন কি জানতুম বিয়ে এমন জিনিস হয়ে দাঁড়াবে ? যদি কিছু করতে চাও জীবনে বিয়ে ক'বো না কখনও, বলে দিলুম। বিয়ে কবো নি ত ? অপু হাসিয়া বলিল—ওঃ, আমি ভাবছি আপনার এ লেখচার যদি বৌদি শুনতেন।...

—না না, শোনো। সত্যি বলছি সে উনিশ-শো পনের সালের সুরেশ্বর আন নই আমি। সংসারের হাড়িকাঠে ঘোঁরন গিয়েছে, শক্তি গিয়েছে, স্বপ্ন গিয়েছে। জীবনটা বুঝা খুইয়েছি—কত কি করবার ইচ্ছে ছিল—ওঃ, যেদিন এম. এ. ডিপ্লোমাটা দিয়ে কনভোকেশন হল থেকে বেরুলাম, মনে হ'ছে মাঘের শেষ, গোলদীঘির দেবদাক গাছে নতুন পাতা গড়িয়েছে, সবে দ খনা হাওয়া শুরু হয়েছে, গাউন সমেত এক দোকানে গিরে ফটো ওঠালুম, কি খুশী। মনে হ'ল, সারা পৃথিবীটা আমাব পায়ের তলায়। ফটোখানা আঙু আচ্ছে—চেয়ে দেখে ভাবি, কি ছিলুম, কি হয়ে দাঁড়িয়েছি। পাড়ারগায়ের কলেজে তিন শো চব্বিশ দিন একই কথা আঙুডাই, দল'দলি কবি, প্রিন্সিপালের মন খোঁগাই, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া কবি, ছেলেদেব ডাক্তার দেখাই, এব মধ্যে মেয়েব বিষের ভাবনাও ভাবি—না না, তুমি হেসো না, এসব ঠাট্টা নয়।

অপু বলিল—এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লেন কেন হঠাৎ সুবেশ্বরদা—এক পেয়লা কফি—

—না না তোমাকে পেয়ে সব বললুম, কারুব কাছে বলি নে, কে বুঝবে, তাঁরা সবাই দেখছে, দিবা চাকরি করছি, মাইনে বাড়ছে, তবে বেশই আছি। আমি যে মরে যাচ্ছি, তা কেউ বুঝবে না।

রেস্তোরী হইতে বাহির হইয়া পরস্পর বিদায় লইল। অপু বলিল—জানেন তো বলেছে—In each of us a child has lived and a child has died—এ child তা promise, who never grew up—কিন্তু জীবনটা অল্পত জিনিস সুরেশ্বরদা—যত সহজে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আচ্ছা আমি, বড় আনন্দ পেলাম আজ। যখন প্রথম কলিকাতায় পড়তে

আসি, জামগা ছিল না, তখন আপনারা জামগা দিয়েছিলেন, সে কথা ভুলি
নি এখনও।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে ঘুমাইয়া কাটাইল। বৈকালের দিকে ভবানীপুরের
লীলাব মামার বাড়ি গেল। অনেক দিন সে লীলাব কোন সংবাদ জানে
না—দূর হইতে লাল ইটের বাড়িটা চোখে পড়তেই একটা আশা ও উদ্বেগে
বুক চিপ চিপ কবিতা উঠিল, লীলা এখানে আছে, না নাই—যদি গিয়া দেখে
সে আছে। সেই একদিন দেখা হইয়াছিল অর্ণার মৃত্যুর পূর্বে। আজ
আট বৎসর হইতে চলিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন দিন দেখা হয়
নাই।

প্রথমেই দেখা হইল লীলাব ভাই বিমলেন্দুর সঙ্গে। সে আর বালক নাই,
খুব লম্বা হইয়া পড়িয়াছে মুখে চেহারা অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে।
বিমলেন্দু প্রথমটা ঘেন্না অপূর্ণে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বৈঠকখানার
পাশের ঘরে লইয়া বসাইল। দু-পাঁচ মিনিট—কথা ও-কথার পবে অপূ
যতদূর সম্ভব সহজ স্বরে বলিল—তারপর তোমার দিদির খবর কি—এখানে
না শুল্লুরবাড়ি?

বিমলেন্দু কেমন একটা আশ্চর্য্য সুরে বলিল—ও, ইয়ে ঠাসুন আমার সঙ্গে—
চলুন।

কেমন একটা অজানা অশঙ্কায় অপূর মন ভবিয়া উঠিল, বাপাব কি? একটু
পরে গিয়া বিমলেন্দু রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া নীচু সুরে বলিল—দিদির কথা
কিছু শোনেন 'ন আপনি?

অপূ উদ্বিগ্নমুখে বলিল—না—কি? লীলা আছে তো?

—আছেও বটে, নেই ও বটে। সে সব অনেক কথা, আপনি ফামিলির
ফ্রেণ্ড বলে বলছি। দি দ ঘর ছেড়েছে। স্বামী গোড়া থেকেই ঘোর মাতাল
—অতি ক-চরিত্র। বেক্টিক স্ট্রীটের এক ইহুদী মেয়েকে নিয়ে বাড়াবাড়ি
আরম্ভ ক'রে দিলে—তাকে নিজের বাসাতে রাখে নিয়ে যেতে শুরু করলে।
দিদিকে জানেন তো? তেজী মেয়ে। এ সব সহ্য করার পাত্রী নয়—সেই
রাত্রেই ট্যাক্সি ডাকিয়ে পদ্মপুকুরে চলে আসে নিজের ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে।
মাস দুই পর একদিন দাদাবাবু এল, মেয়েকে সিনেমার দেখাবার ছুতো ক'রে
নিয়ে গেল ভবলপুরে—আর দিদির কাছে পাঠায় না। তারপর দিদি যা
করেছে—সে যে আমার দিদি করতে পারত তা কখনও কেউ ভাবে নি।
হীরক সেনকে মনে আছে? সেই যে ব্যারিস্টার হীরক সেন, আমাদের
এখানে পার্টিতে দেখেছেন অনেকবার। সেই হীরক সেনের সঙ্গে দিদি
একদিন মিলুফেন হয়ে গেল। একবৎসর কোথায় রইল—আজকাল ফিরে
এসেছে, কিন্তু হীরক সেনকে ছেড়েছে। একা আলিপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে
থাকে এ বাড়িতে তার নাম আর করার উপায় নেই। না কাশীবাগিনী

হয়েছেন আর আসবেন না।

একা শেষ করিয়া বিমলেন্দু নিজেকে একটু সংযত করার জন্য বোধ হয় একটু চুপ করিয়া রহিল। পবে বলিল,—হীৰক সেন কিছু না—এ শুধু তার একটা শোশ তোলা মাত্র, সেন তো শুধু উপলক্ষ। আচ্ছা, তবে আসি অপূর্ববাবু, এখন কিছু দিন থাকবেন তো এখানে?—বিমলেন্দু চলিয়া যায় দেখিয়া অপূ কথ্য খুঁকিয়া পাইল, তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিয়া অকারণে বলিল,—শোনো, শোনো লীলা আলিপুরে আছে তা হলে?

এ প্রশ্ন সে করিতে চাহে নাই, সে জানে এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। কিন্তু এক সঙ্গে এত কথা জিজ্ঞাসা কবিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কোনটা সে জিজ্ঞাসা কবিলে?

বিমলেন্দু বলিল,—এতে আমাদের যে কি মর্মান্তিক—বর্ধমানে আমাদের বাড়ির সেই নিস্তারিণী বিকে মনে আছে? সে দিদিকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছে, প্ৰভোর সময় বাড়ি গেলুম, সে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল। সে বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত করার জো নেই। রমেনদা আজকাল বাড়ি মালিক বুলছেন না? দিদিও সুখে নেই, বলবেন না কাউকে, আমি লুকিয়ে যাউ, এত কাঁদে মেন্নের জন্যে। হীৰক সেন দিদির টাকাগুলো দু হাতে টে ড়য়েছে, আবাব বলছিল বিলেতে বেড়াতে নিষে যাবে। সেই লোভ দেখিয়েই নাকি ঠানে—দিদি আবাব তাই বিশ্বাস করত। জানেন তো দি দরও ঝাঁক আছে, চিরকাল।

বিমলেন্দু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, অপূ আবাব গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল। তুমি মাঝে মাঝে কোন সময়ে যাও?—বিমলেন্দু বলিল,—বোজ যে যাই তা নয়, বিকেলে দিদি মোটাবে বেড়াতে আসে ভিক্টোরিয়ার মেমোয়ালের সামনের মাঠে, এখানে দেখা কবি।

বিমলেন্দু চলিয়া গেলে অপূ অনমনস্ক ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে রসা বোডে আসিয়া পড়িল—কি ভাবিতে ভাবিতে সে শুধুই হাঁটিতে লাগিল। পথেই শবে একটা পার্ক, ছেলেমেয়েবা খেলা করিতেছে। দড়ি ঘুবাইয়া ছোট মেয়েবা লাফাইতেছে, সে পার্কটার চুকিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিল। লীলাব উপর রাগ বা অভিমান কোনটাই হইল না, সে অনুভব করিল, এত ভালবাসে নাই সে কোনদিনই লীলাকে। এই আট বৎসরে লীলা তো তাহার কাছে অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ পর্যন্ত ভাল মনে হয় না, পথচ মনের কোন গোপন স্বপ্নকার কোণে এত ভালবাসা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার জন্য। ভাবিল দাদামশাইয়ের যত দোষ, কে এ বিয়ে দিতে মাথার দিবি দিয়ৈছিল তাঁকে? বেচারী লীলা। সবাই মিলে ওর জীবনটা নষ্ট করে দিলে!

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবার পরে সে বাসা বদলাইয়া অন্য এক বাড়ি—এ গিয়া উঠিল। পুরানো দিনের কষ্টগুলো আবাব সবই আসিয়া কুটিরাছে—

একা এক ঘরে থাকিবার যত পন্থা হাতে নাই, অথচ দুই তিনটি কেরানী-বাবু সজে এক ঘরে থাকা আত্মকাল তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। লোক তাঁহার ভালই, অপূর চেয়ে বয়স অনেক বেশী, সংসারী, ছেলেমেয়েব বাপ। বাবহাবও তাঁহাদের ভাল। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদের মনের খাবা যে-পথ অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে অপূ তাহার সহিত আদৌ পরিচিত নয়। সে নির্জনতাপ্রিয়, একা চুপ কবিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, সেইটাই এখানে হইবার জো নাই। হয়ত সে বৈকালের দিকে বারান্দা-টাতে সবে আসিয়া বসিয়াছে—কেন্দ্রবাবু হঁকা হাতে পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—এই যে অপূবাবু, একাটি বসে আছেন? চৌধুরী-ব্রাদার্স বুঝি এখনও অফিস থেকে ফেরেন নি? আজ শোনেন নি বুঝি মোহনবাগানের কাণ্ডটা? আরে বামোঃ—ভুন তবে—

কালকাতা তাহার পুৰাতন রূপে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই ধূলা, ধোয়া, গোলমাল, একঘেয়েমি, সঙ্কীর্ণতা সব দিনগুলো এক রকমের হওয়া—সেই সব।

সে চলিয়া আসিত না, কিংবা হয়ত আবার একদিন চলিয়া যাইত, মুশকিল এই যে, যিঃ রাস্তা চৌধুরীও ওখানকার কাজ শেষ করিয়া; কলিকাতায় ফিরিয়া একটি ফ্রেন্ড স্টক কোম্পানী গড়িবার চেষ্টায় আছেন, অপূকে তাঁহার অফিসে কাজ দিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু অপূ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল গত ছ বছরের জীবনের পরে আবার কি সে অফিসের ডেস্কে বসিয়া কেবানী-গিরি করিতে পারিবে? এাদকে পন্থা ফুরাওয়া আসিল যে। না কবিলেচ বা চলে কিসে?

সেখানে থাকিতে এই ছয় বৎসরে যা হইয়াছিল, অপূ বোঝে এখানে তা চব্বিশ বৎসরেও হইত না। আটের নতুন স্বপ্ন সেখানে সে দেখিয়াছে।

ওখানকার সর্বান্তের শেষ আলোয়, জনহীন প্রান্তরে, নিস্তক আবগাভূমির, মায়ার, অন্ধকার-ভরা নিশীথ রাত্রির আকাশের নীচে, অশ্রমজরীর ঘন সুকাস-ভরা দুপুরের রোদে সে জীবনের গভীর রহস্যময় সৌন্দর্যকে জানিয়াছে।

গভীর কলিকাতার-বেসে তাহা তো মনে আসে না—সে চব্বিকে চিন্তায় ও কল্পনায় গড়িয়া তুলিতে গভীরভাবে নির্জন চিন্তার দরকার হয়—সেইটাই তাহার হয় না এখানকার মেস-জীবনে। সেখানে তাহার নির্জন প্রাণের কভীর, গোপন আকাশে সত্যের বে নক্ষত্রগুলি স্তব্ধ-স্মৃত জ্যোতিঃস্নান হইয়া, বেধা দিয়াছিল, এখানকার তরল জীবনানন্দের পূর্ণ ছোয়াসায় হয়ত তাহার চিরদিনই অপ্রকাশ-রহিয়া যাইত।

মনে আছে সে ভাবিয়াছিল, ঐ 'সৌন্দর্যকে, জীবনের ঐ অপূর্ব রূপকে সে যতদিন কালিকলমে বন্দী করিয়া দৃশ্যজনের চোখের সামনে না ফুটাইতে পারিবে—ততদিন সে কিছুতেই কাণ্ড হইবে না—

আর একদিন সেখানে সে কি অল্প শিক্ষানুভব পাইয়াছিল।

ঘোড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। এক জায়গায় বনের ধারে ঝোপের মধ্যে অনেক লতাগাছে গা লুকাইয়া একটা তেলাকুচা গাছ! তেলাকুচা বাংলার ফল—অপরিচিত মূলে একমাত্র পরিচিত বন্ধু, সেখানে দাঁড়াইয়া গাছটাকে দেখিতে বড় ভাল লাগিতেছিল।...তেলাকুচা লতার পাতাগুলি সব শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল অগ্রভাগে ফুলিতেছিল একটা আধ-পাকা ফল। তারপর দিনের পর দিন সে ঐ লতাটার মৃত্যু-দয়না লক্ষ্য করিয়াছে। ফলটা যতই পাকিয়া উঠিতেছে, বোটার গোড়ায় যে অংশ সবুজ ছিল, সেটুকু যতই রাঙা সিঁড়রের রং হইয়া উঠিতেছে, লতাটা ততই দিন দিন হৃদে শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া উঠিতেছে।

একদিন দেখিল গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটাও বোটা শুকাইয়া গাছে ফুলিতেছে, তুল-তুলে পাকা, সিঁড়রের মত টুক-টুকে রাঙা—যে কোন পাখি বনের বানব কি কাঠবিড়ালীর অতি শোভনীয় আহাৰ্য। যে লতাটা এতদিন ধরিয়া ন' কোটি মাইল দূরের সূর্য হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল হইতে উপাদান লইয়া মৃত জড়পদার্থ হইতে এ উপাদেয় খাবার তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে—ঐ পাকা টুকটুকে ফলটাই তাহার জীবনের পরম পবিত্রি। ফলটা পাখিতে কাঠবিড়ালীতে খাইবে, এজন্য গাছটাকে তাহার ধন্যবাদ দিবে না, তেলাকুচা লতাটা, অজ্ঞাত, অখ্যাতই থাকিয়া যাইবে। তবুও জীবন তাহার সার্থক হইয়াছে—ঐ টুকটুকে ফলটাতে গুর জীবন সার্থক হইয়াছে। যদি ফলটা কেউ না-ই খায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, মাটিতে করিয়া পড়িয়া আরও কত তেলাকুচার জন্ম ধোষণা করিবে, আরও কত লতা, কত ফল-ফল, কত পাখির আহাৰ্য।

মন ভখন ছিল অদ্রুত বকমের তাজা, সবল, গ্রহণশীল, সহজ আনন্দময়। তেলাকুচা-লতার এই ঘটনাটা তাহার মনে বড় থাক্সা দিয়াছিল—সে কি ঐ সামান্য বন-ঝোপের তেলাকুচা-লতাটার চেয়েও হীন হইবে?...তাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নাই? সে এগতে কিছু দিবে না?

সেখানে কদিন শালবনের চারিদিকের উপর বসিয়া দুপুরে এ প্রশ্ন মনে ডাগিয়াছে।...কিন্তু তারিফ রাতে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁবুর বহিরের ঘন নৈশ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই সব প্রশ্নই মনে ডাগিত। বহু দূর, দূর ভবিষ্যতের শিরীষফুলের পাপড়ির মত নরম ও কচি-মুখ কত শত অনাগত বংশধরদের কথা মনে পড়িত, ষোকার মুখখান কি অপূর্ব প্রেরণা দিত সে সমস্ত! ওদেবও জীবনে কত দুঃখরাত্রে বিপদ আসিবে, কত সঙ্কার অন্ধকার ঘনাইবে—তখন যুগান্তের ওপার হইতে দৃঢ় হৃদে বাড়াইয়া দিতে হইবে তোমাকে—তোমার কত শত বিনীত রজনীর যৌন সেবা, যে বিস্মৃত পথের মহাজন পথিক, একদিন সার্থক হইবে—অপরের মনে।)

হুঃখের নিশীথে তাহার প্রাণের আকাশে গভীর যে বক্ষতরঙ্গি উদ্বেল
হইয়া ফুটিয়াছে—তা সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে, জীবনকে যে কি
ভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে—

নিজের প্রথম বইখানির দিনে দিনে প্রবর্তমান পাণ্ডুলিপিকে সে সমুদ্র
প্রতীকার চোখে দেখে—বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথা তাহার আগ্রহভরা
বক্ষস্পন্দনে আশা, আনন্দেব সঙ্গীত জাগায়—যেমন শিশুকে চোখের সম্মুখে
কান্নাহাসিব মধ্য দিয়া বাড়িতে দেখেন, তুফ-তুফ বক্ষে তাহার ভবিষ্যতের কথা
ভাবেন—তেমনি ।

বই-লেখাব কষ্টটুকু কবার চেয়ে বইয়েব কথা ভাবিতে ভাল লাগে ।
কাদের কথা বইয়ে লেখা থাকিবে ?—কত লোকের কথা । গরীবদের কথা
ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না ।

পথে ঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, বেলে কত অদ্ভুত পনের লোকের সঙ্গে
প্রিচয় ঘটয়াছে জীবনে—কত সাধু-সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারী,
গায়ক, পুতুল-নাচওয়াল, আম-পাড়ানি, ফেরিওয়াল, লেখক, কাব, ছেলে-
মেয়ে—এদের কথা ।

আজিকাব দিন হইতে অনেক দিন পরে—হয়তো শত শত বৎসর পবে
তাহার নাম যখন এ বছরের-ফোটা-শাঙ্গুলের মঞ্জরীব মত—কিংবা তাহার
ঘরের কোণেব মাকডসার ভালের মত—কোথায় মিলাইয়া যাইবে, তখন
তাহার কত অনাগত বংশধর কত সকালে সন্ধ্যায়, মাঠে, গ্রাম্য নদীতীরে,
হুঃখের দিনে, শীতের সন্ধ্যায় অথবা অন্ধকার গহন নিস্তর দুপুর-বাত্রে, শিশির-
ভেজা ঘাসেব উপর তারার খালের নীচে শুইয়া-শুইয়া তাহার বই পড়িবে
—কিংবা বইয়ের কথা ভাবিবে ।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশঙ্কাও জাগে । যদি কেউ না পড়ে ? আবার
ভাবে, পৃথিবীর কোন্ খণ্ডে আদিম যুগের শিল্পীদল দৃগম গিরিগুহার
অন্ধকারে রথ, বাইসন, মায়থ আঁকিয়া গিয়াছিল—প্রাচীনদিনের বিস্মৃত
প্রতিভা এককাল পর তাহার দাবি আদায় করিতেছে—নতুবা ক্যান্টাব্রিয়া,
দর্দ্র ও পিরনিজের পর্বতগুহাগুলায় দেশবিদেশের মনোবী ও ভ্রমণকারীদের
এত ভিড় কিসের ? তেলাকুচা লতাটা শুকাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু সে জীবন
দিয়া ফলটাকে মানুষ করিয়া গিয়াছে যে । আশ্বদানের ফল রখা যাইবে না ।
কত গাছ গড়াইবে বীজে—

নিজের প্রথম বইখানি—মনে কত চিন্তাই আসে । অনভিজ্ঞ মন সবটাতেই
অবাক হইয়া যায়, সবটাতেই গাঢ় পুলক অনুভব করে ।

এই তাহার বই লেখার ইতিহাস ।

কিন্তু প্রথম থাকা খাইল বইখানার পাণ্ডুলিপি হাতে দোকানে দোকানে

ঘুরিয়া। অজ্ঞাতনামা লেখকের বই কেহ লওরা দূরে থাকুক, ভাল করিয়া কথাও বলে না। একটা দোকানে খাতা রাখিয়া ঘাইতে বলিল। নি পঁচেক পরে তাহাদের একখানা পোস্টকার্ড পাইয়া অপু ভাল কাপড় পরিয়া, জুতা বুরুশ করিয়া বন্ধু চশমা দাব করিয়া দ্রুত-দ্রুত বন্ধে দেখানে গিয়া হাজির হইল। অত ভাল বই তাহা—পড়িয়া হয়ত উহারা অবাধ হইয়া গিয়াছে।

দোকানের মালিক প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বলিল—ও। ওহে সত্যীন্দ্ৰ, এঁর সেই খাতাখানা এঁকে দিয়ে দাও তো—বড় আলমারির দেয়ালে দেখো।

অপু কপাল ঘামিয়া উঠিল। খাতা ফেরত দিতে চায় কেন? সে বিবর্ণ মুখে বলিল—আমার বইখানা কি

না। নতুন লেখকের বই নিজেব খবচে তাহা—চাপাইবে না। তবে যদি সে পাঁচ শত টাকা খবচ দেয়, তবে সে অন্য কথা। অপু অত টাকা কখনও এক জায়গায় দেখে নাই।

পরদিন সন্ধ্যায় বিমলেন্দু অপু ব'স'য় আসিয়া হাজির। বৈকালে পাঁচটার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে মাঠে লীলা আসিবে, বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে তাহাকে লইয়া ঘাইতে।

বৈকালে বিমলেন্দু আবার আসিল। ৬ জনে মাঠে গিয়া ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিবার পর বিমলেন্দু একটা হলদে 'ওব' মাটির দেখাইয়া বলিল, ঐ দিদি আসছে—আসুন, গাছতলায় গাড়ি পার্ক করবে, এখানে ত্রাদিক পুলিশে হাড-কাল বড় কডাকড়ি করে।

অপু বুক চিপিচপি কঁপিতেছিল। কি বলিবে, কি বলিবে সে লীলাকে? বিমলেন্দু আগে আগে, অপু পিছনে পিছনে। লীলা গাড়ি হইতে নামে নাই, বিমলেন্দু গাড়ি জানালার কাছে গিয়া বলিল,—দিদি, অপু বাবু এসেছেন, এই যে। —পরক্ষণেই অপু গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল—এই যে, কেমন আছ, লীলা?

সত্যি অপু সুন্দরী। অপু মনে হইল, যে-কবি বলিয়াছেন, সে সৌন্দর্যই একটা মহৎ গুণ, যে সুন্দর তাহার আর কোন গুণের দরকার হবে না, তিনি সত্যদর্শী, অন্ধবে অন্ধবে তাহার উজ্জ্বল সত্য।

তবুও আগের লীলা হয় নাই একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে, মুখেব সে তরুণ লাবণ্য আর কই? মুখের পবিত্র সৌন্দর্য ঠিক তাহার মা মেডবোরানোর এ বয়সে যাহা ছিল তাই, সেই ছেলেবেলার বর্ষমানের বাটীতে দেখা মেডবোরানীর মুখের মত। উদ্ধার লালসামাখা সৌন্দর্য নয়—শান্ত, বরং এমন কিছু বিষম।

বাড়ির বাহির হইয়া গিয়াছে যে মেয়ে, তাহার ছবির সঙ্গে অপু কিছুতেই এই বিষমবয়সী দেবীমূর্তিকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। লীলা বাস্তব হইয়া

হাসিমুখে বলিল—এসো, অপূর্ব এসো। তুমি তো আবারে ভুলেই গিয়েচ একেবারে। উঠে এসে বসো। চলো, তোমাকে একটু বেড়িয়ে দিচ্ছে আসি। শোভা সিং. লেক—

লীলা মধ্যে বসিল, ও-পাশে বিমলেন্দু, এ-পাশে অপূ, অপূর মনে পড়িল বাল্যকাল ছাড়া লীলার এত কাছে সে অপর কখনও বসে নাই। বার বার লীলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। এতকাল পরে লীলাকে আবার এত কাছে পাইয়াছে—বার বার দেখিয়াও যেন তৃপ্তি হইতেছিল না। লীলা অনঙ্গল বকিতেছিল, নানা বকম মোটরগাড়ির তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছিল, মাঝে মাঝে অপূর সম্বন্ধে এটা-ওটা প্রশ্ন কবিত্তেছিল। লেক দেখিয়া অপূ কিস্তি নিরাশ হইল। সে মনে মনে ভাবিল—এই লেক। এরই এত নাম। এ কলকাতার বাবুদের ভাল লাগতে পারে—ভারী তো। লীলা আবার এরই এত সুখ্যাতি করছিল—আহা, বেচারী কলকাতা ছেড়ে বিশেষ কোথাও তো যায় নি।—লীলা পাছে অপ্রতিভ হয় এই ভয়ে সে নিজের মতটা আর বাক্ত করিল না। একটা নাবিকেল গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা—সেখানে দু'জনে বসিল। বিমলেন্দু মোটর লইয়া লেক ঘুরিতে গেল। লীলা হাসিমুখে বলিল—তারপর, তুমি নাকি দ্বিথড্রয়ে বোরয়েছিলে?

—তোমার শ্বশুর বাড়ির দেশে গিয়েছিলুম—জব্বলপুরের কাছে।—বলিয়া ফেলিয়া অপূ ভাবিল কথাটা বলা ভাল হয় নাই, হয় তো লীলার মনে কণ্ট হইবে—ছিঃ—

কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা ঐ দ্বীপ-মতন ব্যাপারগুলো—ওতে যাবার পথ নেই...

—সাঁতার দিচ্ছে যাওয়া যায়। তুমি তো ভাল সাঁতার জানো—না? ও-সব কথা থাঁক—এতদিন কোথায় ছিলে, কি করছিলে বলে। তোমাকে দেখে আজ এত খুশী হইছি।...আমার বাসায় এসো আলিপুরে—চা খাবে। একটু তামাটে রঙ হইছে কেন?...রোদে ঘুরে ঘুরে বৃষ্টি—আচ্ছা, আমার বণা তোমার মনে ছিল?

অপূ একটু হাসিল। কোন নাটুকে ধরনের কথা সে মুখে বলিতে পারে না। আর এই সময়েই যত মুখচোরা রোগ আসিয়া জোটে। কতকাল পরে তো লীলাকে একা কাছে পাইয়াছে—কিন্তু মুখে কথা জোগায় কৈ?...কত কথা লীলাকে বলিবে ভাবিয়াছিল—এখন লীলাকে কাছে পাইয়া সে সে-সব কথা মুখ দিয়া তো বাহির হয়ই না—বরং নিতান্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হয়।

হঠাৎ লীলা বলিল—ই্যা, ভালো কথা, তুমি নাকি বই লিখেছ? একদিন আমাকে দেখাবে না, কি লিখলে? আমি জানি, তুমি একদিন বড় লেখক হবে, তোমার সেই চেলেবেলার গল্প লেখার কথা মনে আছে? তখন থেকেই জানি।

পরে সে একটা প্রস্তাব করিল। বিমলেন্দুর মুখে সে ভবিষ্যৎ, বইওয়ালার

বই লইতে চায় না—ছাপাইতে কত খরচ পড়ে ? এ বই ছাপাইয়া বাহির করিবার সমুদয় খরচ দিতে সে রাজী ।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে অপূর সারা শরীরে যেন একটা বিছাতির ঢেউ বেলিয়া গেল । সব খরচ ? যত লাগে । তবুও আজ সে মুখে কিছু বলিল না ।

অপূর মনে লীলার জন্য একটা করুণা ও অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল, ঠিক পুৰাতন দিনের মত । লীলারও কত আশা ছিল অ্যাটর্নি হইবে, ছবি আঁকিবে অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সে তাহারই মত কত কি স্বপ্নের জাল বুনিত । এখন শুধু নতুন নতুন মোটর গাড়ি কিনিতেছে, সাহেবী দোকানে লেস্ কিনিয়া বেড়াইতেছে—পুৰাতন দিনের যজ্ঞবেদীতে আগুন কই, নিভিয়া গিয়াছে । যজ্ঞ পর্বত অসমাপ্ত । রূপার পাত্র লীলা ! অভাগিনী লীলা ।

ঠিক সেই পুৰাতন দিনের মত মনটি আছে কিন্তু । তাহাকে সাহায্য করিতে মায়ের-পেটের-মমতাময়ী-বোনের স্বপ্ন, স্বপ্ন বাড়িয়া দিয়াছে অমনি । আশৈশব তাহার বন্ধু.....তাহার সম্বন্ধে অন্ততঃ ওর মনের তারটি খাঁটি সুরেই বাজিল চিরদিন । এখানেও হয়ত করুণা, মমতা, অনুকম্পা—ওদেরই বাড়িতে না তাহার মা ছিল ঐ ধুনী, কে জানে হয়তো কোন্ শুভ মুহূর্তে তাহার হীনতা দৈন্য, অসহায় বালাজীবন, বডলোকের মেয়ে লীলার কোমল বালা-মনে ঘা দিয়াছিল, সহানুভূতি, করুণা, মমতা জাগাইয়াছিল । সকল সত্যকার ভাল-বাসার মশলা এরাই—এরা দেখানে নাই, ভালবাসা দেখানে মাদকতা আনিতে পারে, মোহ আনিতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়িত্বের স্নিগ্ধতা আনে না ।

সে ভাবিল, লীলার মনটা ভাল বলে সেই সুযোগে সবাই ওর টাকা নিচ্ছে । ও বেচারী এখনও মনে সেই ছেলেমানুষটি আছে—আমি ওকে exploit করতে পারব না । দরকার নেই আমার বই-ছাপানোয় ।

এদিকে মুশকিল । হাতের টাকা ফুরাইল । চাকুরিও জোটে না ।

মিঃ রায়চৌধুরী অনবরত ঘুরাইতে ও ইঁটাইতে লাগিলেন । অপূর যেখানে ছিল সেখানে আবার এঁরা ম্যাগাজিনজের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, অপূর ধরিয়া পড়িল তাহাকে আবার সেখানে পাঠানো হউক । অনেকদিন ঘোরানোর পর মিঃ রায়চৌধুরী একদিন প্রস্তাব করিলেন, সে আরও কম টাকা বেতনে সেখানে যাইতে রাজী আছে কি না ? অপমানে অপূর চোখে জল আসিল, মুখ রাঙা হইয়া উঠিল । একথা বলিতে উহারা আজ সাহস করিল শুধু এইজন্য যে, উহারা জানে যতই কমে হউক না কেন সে সেখানে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইবে, অর্থের জন্য নয়—অর্থের জন্য এ অপমান সে সহ্য করিবে না নিশ্চয় ।

কিন্তু...

শরভের প্রথম—নিচের অধিত্যকার প্রথম আবলুস ফল পাকিতে শুরু করিয়াছে বটে, কিন্তু মাথার উপরে পর্বত সান্ন্য উচ্চস্থানে এখনও বর্ষা শেষ হয় নাই । টেঁপারী-বনে এখনও ফল পাকিয়া হলুদে হইয়া আছে, ভালুক ফল এখনও সন্ধ্যার পরে টেঁপারী খাইতে নানে, টিরা পাখির বাক সারাক্ষণ

কলরব করে, আরও উপরে যেখান হইতে বাদাম ও সেগুন বনের গুরু, সেখানে অভ্র সাধা মাজুল। আরও উপরে রিঠাগাছে ধোলো ধোলো ফুল ধরিয়াছে, এমন কি, ভাল কবিতা খুঁজিয়া দেখিলে হু একটা রিঠাগাছে এখনও হু এক ঝাড় দেহিতে কোটা রিঠা ফুলও পাওয়া যাইতে পারে।

সেখানকার সেই বিরাট কক্ষ আরণ্যভূমি, নক্ষত্রালোকিত আলো-আধার, উদার গুনহীন বিশাল ভূগভূমি, সেই টানা একঘেয়ে পশ্চিমে হাওয়া, সেই অবাধ জ্যোৎস্না, স্বাধীনতা, প্রসাবতা, সেই বিরাট নির্জনতা তাহাকে আবার ডাকিতেছে।

এক এক সময় তাহাব মনে হয় কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় নিউজিল্যান্ডে আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস কারতেছে সত্য, গাচ-পালাকে দূব করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রিক্স-এর অবগা আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারাতাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিবিবে। ধরাবিদ্রাবণকাণী সভাতাদর্শী মানুষ যে দ্রানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পবতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশেব বাজার নামে, হুদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে, ওর গুপ্তক, পাখি, শিল, বলগা হবিং, ভালুককে খুন করিয়াছে—তৈল, বাবসা, চামড়াব লোভে ওর মহিমায় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠেব কারখানা খুলিয়াছে, এ সবেব প্রতিশোধ একদিন আসিবে।

এ খেন এমন একটা শক্তি যা বিপুল, বিশাল, বিরাট। অসীম শৈশবের ও গান্ধীধের সহিত সে সংহত শক্তিতে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, কারণ সে জানে তাহাব নিজ শক্তির বিপুলতা। অপু একবার ছিন্তওয়ার জঙ্গলে একটা খনির সাইটিং লাইন তৈরি হওয়ার সময়ে তৎসম্প্রদ, কুদ্রদেবের মত এই যৌন, গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। এ শক্তিতা ধীরভাবে শুধু সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।

অপুর কিন্তু চাকরি হটল না। এবার একা মিঃ রান্নচৌধুরীর হাত নয়। জয়েন্ট-স্টক কোম্পানীর অন্যান্য ডাইরেক্টররা নাকি রাজী হইল না। হয়ত বা তাহারা ভাবিল, এ লোকটার সেখানে ফিরিবার এত আগ্রহ কেন? পুরানো লোক, চুরির সুলুক-সন্ধান জানে, সেই লোভেই যাটতেছে। তা ছাড়া ডাইরেক্টররাও মানুষ, তাদেরও প্রত্যেকেরই বেকার ভাগনে, ভাইপো, শালীর ছেলে আছে।

সে ভাবিল, চাকরি না হয়, বইবানা বাহির করিয়া দেখিবে চলে কিনা। মাসিক পত্রিকায় হু-একটা গল্পও দিল, একটা গল্পের বেশ নাম হইল, কিন্তু টাকা কেহ দিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল—অপর্ণার গহনাগুলি খুন্তর-বাড়িতে আছে, সেগুলি সেখান হইতে এই সাত-আট বৎসর সে আনে নাই। সেগুলি বেচিয়া তো বই বাহির করার খরচ যোগাড় হইতে পারে! এই সহজ

উপায়টা কেন এতদিন মাথায় আসে নাই ?

সে লীলার কাছে আরও কয়েকবার গেল, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করিল না। উপন্যাসের খাতাখানা লইয়া গিয়া পড়িয়া শোনাইল। লীলা খুব উৎসাহ দেয়। একদিন লীলা হিগাব করিতে বসিল বই ছাপাইতে কত লাগিবে। অপু ভাবিল—অন্য কেউ যদি দিত হইত নিতুম, কিন্তু লীলা বেচারীর টাকা নেব না।

একদিন সে হঠাৎ খবরের কাগজে তাহার সেই কবিরাজ বন্ধুটির ঔষধের দোকানের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল। সেইদিনই সন্ধ্যার পর সে ঠিকানা খুঁজিয়া গেল, সুকিয়া স্ট্রীটের একটা গলিতে দোকান। বন্ধুটি বাহিরেই বসিয়া ছিল, দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ—তুমি। তুমি বেঁচে আছ দাদা ?

অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, কম খুঁজি নি তোমায়। ভাগ্যিস আজ তোমার শিল্পাশ্রমের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল তাই এলুম। তাবপব কি খবর বল ? দোকানের আসবাবপত্র দেখে মনে হচ্ছে, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছ।

বন্ধু খানিকটা কবিতা বহিল। খানিকটা এ-গল্প ও গল্প করিল। পরে বলিল—এসো, বাসায় এসো।

ছোট সাদা বঙের দোতলা বাড়ি, নীচেব উঠানে একটা টিনের শেডের তলায় আট দশটি-লোক কি সব জিনিস প্যাক করিতেছে, লেবেল আঁটিতেছে, অন্যদিকে একটা কল ও চৌবাচ্চা, আর একটা টিনের শেডে গুদাম। উপরে উঠিয়াই একটা মাঝারি হলঘর, দু'পাশে দু'টা ছোট-ছোট ঘর, বেশ সাফল্য। একটা সেট টমাসের বড় ব্লক ঘড়ি দালানে টক্ টক্ করিতেছে। বন্ধু ডাকিয়া বলিল—ওরে বিন্দু, শোন, তোর মাকে বল, এক্ষণি হুঁপেয়ালা চা দিতে।

অপু হুঁসুক ভাবে বলিল—তাব আগে একবার বোঁঠাকরুর সঙ্গে দেখাটা কর—বিন্দুকে বল তাঁকে এদিকে একবার আসতে বলতে ? না কি, এখন অবস্থা ফিরেছে বলে তিনি আর আমার সঙ্গে দেখা কববেন না ?

কবিরাজ বন্ধু স্নানমুখে চুপ কবিয়া বহিল—পবে নিম্নসূবে অনেকটা যেন আপন মনেই বলিল—সে আর তোমার সঙ্গে দেখা কববে না ভাই। তাকে আব কোথায় পাবে ? বমলা আব সে দুজনেই ফাঁকি দিয়েছে।

অপু অবাক মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া বহিল।

—এ মাঘে রমলা গেল, পবের শ্রাবণে সে গেল। ওঃ সে কি সোজা কটু গিয়েছে ভাই ? তখন ওদিকে কাবুলীব দেনা, এদিকে মহাজনের দেনা—যমে মানুষে টানাটানি চলছে। তোমার কথা কত বলত। এই শ্রাবণে পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে। তারপরে যিরে করব, না, করব না,—আজ বছর তিনেক হ'ল বদিবাটিতে—

তারপর বন্ধুর কথায় নতুন-বোঁ চা ও খাবার লইয়া অপু সন্মানেই আসিল।

কান্না বঁধা বঁধা, কান্না বঁধা, তোব খুব বেঁধা কনে হয় খুব চটপটে :
চতুর । বাবার বাইতে গিয়া বাবারেই দলা খেন অপুর গলায় আটকাইয়া
যায় । বহুটি মিত্রের কোন্ কালির বড়ি ও পাতা চারের পাতেটের খুব বিক্রী
ও বাবসায়ের দিক হইতে এ-জুটি দ্রব্যের সাফল্যের গল্প করিতেছিল ।

উঠিবার সময় বাহিরে আসিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—নতুন বোটি দেখতে
তো বেশ, এ-দিকেও বেশ গুণবতী, না ?

—নন্দ না কিন্তু মুখরা ভাই । আগের তাকে তো জানতে ? সে ছিল ভাল
মানুষ এব পান থেকে চুণ খসলেই—কি করি ভাই, আমার ইচ্ছে ছিল না
যে আবাব—

ফুটপাথে একা পড়িয়া অপুর মনে পড়িল পটুয়াটোলার সেই খোলাব বাড়ির
দরভায় প্রদীপহাতে হাস্যমুখী, নিরাভরণ, দরিদ্র হুল্লুকীকে—আজ ছ'বছর
কাটিয়া গেলেও মনে হয় যেন কালকার কথা ।

অপরাজিত

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কাজল বড় হইয়া উঠিয়াছে, আজকাল গ্রামের সীতানাথ পণ্ডিত সকালে
একবেলা কলিয়া পড়াইয়া যান, কিন্তু একটু ঘুমকাতুরে বলিয়া সন্ধ্যার পরে
দাদামশায়ের অনেক বকুনি সত্ত্বেও সে পড়িতে পারে না, চোখের পতো যেন
জড়াইয়া আসে, অনেক সময় দেখানে—সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে—পাত্রে কেহ যদি
ডাকিয়া খাওয়ায়, তবেই খাওয়া হয় । তা ছাড়া বেশী রাত্রে খাইতে হইলে
দাদামশায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়—সে এক বিপদ ।

দাদামশায়ের সহিত পাবতপক্ষে কাজল খাইতে বসিতে চাহে না । বড়
ভাত ফেলে, ছডায়—গুহাইয়া খাইতে জানে না বলিয়া দাদামশায় তাকে
খাইতে বসিয়া সহবৎ শিক্ষা দেন ।

কাজল আলুভাতে দিয়া শুকনা ভাত খাইতেছে—দাদামশায় হাঁকিয়া
বলিলেন—ভাল দিলে মাখো—শুধু ভাত খাচ্ কেন ?—মাখো—মেখে খাও—
তাড়াভাতি কল্লিত ও অনাড়ী হাতে ভাল মাখিতে গিয়া থালার কানা চাড়াইয়া
কিছু ভাল-মাখা ভাত মাটিতে পড়িয়া গেল । দাদামশায় খসক দিয়া উঠিলেন
—পড়ে গেল, পড়ে গেল—আঃ, চোঁড়া ভাতটা পর্যন্ত যদি গুছিয়ে খেতে জানে
—তোল্ তোল্—খুঁটে খুঁটে তোল্—

কাজল ভয়ে ভয়ে মাটি মাখা ভাতগুলি থালার পাশ হইতে আবার থালার
তুলিয়া লইল ।

—বেগুন পটোল ফেলেছিস্ কেন ?—ও খাবার জিনিস না ?—সব একসঙ্গে
মেখে নে—

খানিকটা পরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, কাজল উচ্ছেভাজা খায় নাই—তখন অস্থল
দিয়া খাওয়া বইয়া গিয়াছে—তিনি বলিলেন—উচ্ছেভাজা খাস্নি ?—খাও—

ও অতলমাথা ভাত ঠেলে রাখো। উচ্ছেভাজা তেতো বলিয়া কাজলের সুখে ভালো লাগে না—সে ভাতে হাতও দেয় নাই। দাদামশায়ের ভয়ে অতল-মাথা ভাত ঠেলিয়া রাখিয়া তিক্ত উচ্ছেভাজা একটি একটি করিয়া খাইতে হইল—একটিও ফেলিবার জো নাই—দাদামশায়ের সতর্ক দৃষ্টি। ভাত খাটবে কি কামায় কাজলের গলায় ভাতের দলা আটকাইয়া যায়। খাওয়া হইয়া গেলে মেজ মামীয়ার কাছে গিয়া বলিয়া কহিয়া একটা পান লয়—পান খুলিয়া দেখে কি কি মশলা আছে, পরে মিনতির সুবে একবার মেজ মামীয়ার কাছে একবার চোট মামীয়ার কাছে বলিয়া বেড়ায়—ইতি একটু কাৎ, ও মামীমা তোমার পায়ে পিঁ একটু কাৎ দাও না—। কাঠি অর্থাৎ দারুচিনি। মামীমারা বন্ধার দিয়া বলেন—রোজ রোজ ডালচিনি চাই—ছেলে আবার শৌখিন কত।...উঃ, তার আবার জিব দেখা চাই—মুখ রাঙা হ'ল কিনা—

তবে পড়াশুনার আগ্রহ তাহার বেশী ছাড়া কম নয়। বিশ্বেশ্বর মুন্ডারী হাত-বান্ধে কেশরঞ্জনব উপহাসের দরুন গল্পের বই আছে অনেকগুলি। খুনী আসামী কেমন করিয়া ধরা পড়িল, সেই সব গল্প। আর পড়িতে ইচ্ছা করে আরবা উপন্যাস, কি ছবি। কি গল্প। দাদামশায়ের বিজ্ঞানার উপর একদিন পড়িয়া ছিল—সে উলটাইয়া দেখিতেছে, টের পাইয়া বিশ্বেশ্বর মুন্ডারী কাড়িয়া লইয়া বলিল, এঃ, অ'ট বছরবে ছেলেব আবার নভেল পড়া ? এইবার একদিন তোমাব দাদামশায় শুনতে পেলে দেবো'কি কববে।

কিছু বইখানা কোথায় আছে সে জানে—দোতল'র গেরবার ঘরের সেই কাঁঠাল কাঠেব সিঁদুকটার মধ্যে—একবার যদি চাবিটা পাওয়া যায়। সাবানাত জাগিয়া পড়িয়া ভোবের আগেই তাহা হইলে তুলিয়া কাবে।

এ কয়েকদিন বৈকালে দাদামশায় বসিয়া বসিয়া তামাক খান, আর সে পণ্ডিত-মশায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া পড়ে। সেই সময় পণ্ডিতমশায়ের পেছনকার অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপেব উওর-ধারের সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা অদ্রুত ঘটনার রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়, ঘটনাটাও হয়ত খুব স্পষ্ট নয়, সে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে তো পারে না। কিন্তু দিদিয়ার মুখে শোনা নানা গল্পের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রেরা নায-না-ডানা নদীর ধাবে ঠিক এই সন্ধ্যা-বেলাটাতেই পৌঁছায় কোন রাজপুত্রকে বাপাইয়া রাজকন্যাদের সোনার বথ বৈকালের আকাশপানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—সে অন্তরমনস্ক হইয়া দেওয়ালের পাশে বুকিয়া আকাশটার দিকে চাহিয়া থাকে, কেমন যেন হুঃখ হয়—ঠিক সেই সময় সীতানাথ পণ্ডিত বলেন—দেখুন, দেখুন বাঁড়ুখোমশায়, আপনার নাতির কাণ্ডটা দেখুন, স্নেটে বৃড্কে লিখতে দিলাম, তা গেল চলো—ইঁ কবে তাকিয়ে কি দেখছে দেখুন—এমন অনন্যবোধগী ছেলে যদি—

দাদামশায় বলেন—দিন না খাঁ করে এক খাপড় বসিয়ে গালে—হতভাগা ছেলে কোথাকার—হাড আলিয়েছে, বাবা করবে না খোঁজ, আমার ঘাড়ে এ বয়সে যত বুঁকি।

তবে কাজল যে দুট হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা সবাই বলে। একদণ্ড সুস্থির নয়, সর্বদা চঞ্চল, একদণ্ড চুপ করিয়া থাকে না, সর্বদা বকিতেছে। পণ্ডিতমশায় বলেন—দেখতো, দলু কেমন অঙ্ক কষে? ওর মধ্যে অনেক জিনিস আছে—আর তুই অঙ্কে একেবারে গাশ।—পণ্ডিত পিছন ফিরিলেই কাজল মামাতো-ভাই দলুকে আজুল দিয়া ঠেলিয়া চুপি চুপি বলে,—তো-তোয় মধ্যে অনেক জিনিস আছে, কি জিনিস আছে বে, ভাত ডাল খি-খিচুড়ি...খিচুড়ি? হি-হি হিল্লি। খিচুড়ি বাবি, দলু?

দাদামশায়ের কাছে আবার নালিশ হয়।

তখন দাদামশায় ডাকিয়া শান্তিস্বরূপ বানান জিজ্ঞাসা করিতে আবন্ত করেন—বানান কর সূর্য। কাজল বানানটা জানে, কিন্তু ভয়জনিত উত্তেজনায় দরুন হঠাৎ তাহার তোতলামিটা বেশী করিয়া দেখা দেয়—‘হু’ একবার চেঁচা করিয়াও ‘দন্ত স্য’ কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিবে না বুঝিয়া অবশেষে বিপন্ন মুখে বলে—তা-তালবা শয়ে দীঘা উকাব—

ঠাস করিয়া এক চড় গালে। ফবদা গাল, তখনই দাড়িমের মত রাঙা হইয়া ওঠে, কান পর্যন্ত বাঙা হইয়া যায়। কাজলের ভয় হয় না, একটা নিঃফল অভিমান হয়—বাঃ রে, বানানটা তো সে জানে, কিন্তু মুখে যে আটকাইয়া যায় তা তার দোষ কিসেব? কিন্তু মুখে অত কথা বলিয়া বুঝাইয়া প্রতিবাদ বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার মত একটা জ্ঞান তাহার হয় নাই—সবটা মিলিয়া অভিমানের মাত্রাটাই বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু অভিমানটা কাহার উপর সে নিজেও ভাল বোঝে না।

এই সময়ে কাজলের জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

সীতানার ‘পণ্ডিতমশায়’ একটু-আধটু ভ্যোতিষেব চর্চা করিতেন। কাজলের পড়িবার সময় তাহার দাদামশায়ের সঙ্গে সীতানার পণ্ডিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন—পাঁজি দেখিয়া ঠিক তৈয়ারী, জন্মের লগ্ন ও যোগ গণনা আরু, দ্বাল নির্ণয় ইত্যাদি। আশ বছরখানেক ধরিয়া কাজল প্রায়ই এসব শুনিয়া আসিতেছে—যদিও সেখানে সে কোন কথা বলে না।

কার্তিক মাসের শেষ, শীত তখনও ভাল পড়ে নাই। বাড়ির চারিপাশে অনেক বেছুরবাগান, শিউলিরা কার্তিকের শেষে গাছ কাটিয়াছে। শীতের ঠাণ্ডা সজ্জা বাতাসের টাটকা বেজুর-বসের গন্ধ মাথানে থাকে।

কাজলদের পড়ার ব্রহ্মঠাকরুন এই সময় কি রোগে পড়িলেন। ব্রহ্মঠাকরুনের বয়স কত তা নির্ণয় করা কঠিন—যুড়ি ভাজিয়া বিক্রয় করিতেন, পতি-পুত্র কেহই ছিল না—কাজল অনেকবার মুড়ি কিনিতে গিয়াছে তাঁহার বাড়ি। অত্যন্ত গিটখিটে মেজাজের লোক, বিশেষ করিয়া ছেলেপিলেদের হুচন্দ্র পাড়িয়া দেখিতে পারিতেন না—দূর দূর করিতেন, উঠানে পা দিলে পাছে গাছটা ভাঙে, উঠানটা খুঁড়িয়া ফেলে—এই ছিল তাঁহার ভয়। কাজলকে বাড়ির কাছাকাছি দেখিলে বলিতেন—একটা যেন মগ-মগ একটা—বাড়ি

যা বাপু—কঞ্চি-টঞ্চির খোঁচা মেরে বসবি—যা বাবু এখান থেকে। খালের চারাগুলো মাডাস নে—

সেদিন দুপুরের পর তাহার মামাতো-বোন অরু বলিল—ব্রহ্ম ঠাকুরা মর-মর হয়েছে, সবাই দেখতে যাচ্ছে—যাবি কাজল?

ছোট্ট একতলা বাড়ির ঘর, পাড়ায় অনেকে দেখিতে আসিয়াছে—মেজিতে বিছানা পাতা, কাঙাল ও অরু দোরের কাছে দাঁড়াইয়া উঁকি মাড়িয়া দেখিল। ব্রহ্মঠাকরুনকে আর চেনা যায় না, মুখের চেহারা যেমন শীর্ণ তেমন ভয়ঙ্কর, চক্ষু কোঠরগত, তাহার ছোট মামা কাছে বসিয়া আছে, হাক কবিরাজ দাওয়ায় বসিয়া লোকজনের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে।

বৈকালে দু-তিনবার শোনা গেল ব্রহ্মঠাকরুনের রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।

কাজল কিছু বিস্মিত হইল। এমন দোদুলপ্রতাপ ব্রহ্মঠাকরুন যাহাকে গামছা পরিয়া উঠানে গোবরজল ছিটাইতে দেখিয়া সে তখনই ভাগিত— তাহার দাদামশায়ের মত লোক পর্তু যাহাকে মানিয়া চলে—তাহার একি দশা হইয়াছে আজ!...এত অসহায়, এত দুবল, তাহাকে কিসে করিয়া ফেলিল?

ব্রহ্মঠাকরুন সন্ধ্যার আগে মাথা গেলেন। কাজলের মনে হইল পাড়ায় একটা অনশু কতা—কেমন একটা ভয়ানক বিভীষিকা! ছান্না ঘেন সারা পাঠাকে ব্রহ্মকাব্যে মত গ্রাস করিতে আসিতেছে সকলেরই মুখে যেন একটা ভয় ভাব।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়াছে। পাড়ার সকলে ব্রহ্মঠাকরুনের সংকারের বাবস্থা করিতে তাহার বাড়ির উঠানে সমবেত হইয়াছে। কাজলের দাদামহাশয়ও গিয়াছেন। কাজল ভয়ে ভয়ে বানিকটা দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল—কিছু ব্রহ্মঠাকরুনের বাড়ি পশ্চু খাইতে গািল না—কিছু দূরে একটা বাঁশ কাণ্ডের নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। সেখান হইতে উঠানটা বা বাড়িটা দেখা যায় না—কথাবার্তার শব্দও কানে আসে না। বাতাস লাগিয়া বাঁশ ঝাড়ের কঞ্চিতে শব্দ হইতেছে—চাবিবার নিজন...কাজলের বুক দুক-দুক করিতেছিল... একটা অদ্ভুত ধবনের ভাবে তাহার মন পূর্ণ হইল—ভয় নয়, একটা বিস্ময়-মাখানো বহুশ্বেব ভা...অন্ধকাবে গা লুকাইয়া দু-একটা বাতুড আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে...অল্পদিন এমন সময়ে বাতুড দেখিলেই কাজল বলিয়া উঠে—বাতুড বাতুড মেঘের, যা খাৰি তাঁ তেঁতব—

আজ উডনশীল বাতুডের দৃশ্য তাহার মনে কৌতুক না জাগাইয়া সেই অজানা রহস্যের ভাবই যেন ঘনীভূত করিয়া তুলিল।—

ব্রহ্মঠাকরুন মাথা গেলেন বটে—কিন্তু যত্নকে কাজল এই প্রথম চিনিল। দিদিমা মারা গিয়াছিলেন কাজলের পাঁচবছর বয়সে—তাহাও গভীর রাত্রে কাজল ওখন ঘুমাইয়া ছিল—কিছু দেখে নাই—বোঝেও নাই। এবার যত্নের বিভীষিকা, এই অপূর্ব রহস্য তাহার শিশু-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একা

একা বেড়ান, ডেমন নদী-সেজুড নাই—আর ঐ সব কথা ভাবে। একদিন তাহার মনে হইল যদি সেও ব্রহ্মঠাকরনের মত মরিয়া যায়। হাত-পায়ে যেন সে বল হারাইয়া ফেলিল, - সত্য, সে-ও হয়তো মারা যাইবে।...

দিনের পর দিন ভয়টা বাড়িতে লাগিল। একলা শুইয়া শুইয়া কথাটা ভাবে—নদীর বাধ, ঘাটের পৈঠায় সন্ধ্যার সময় বসিয়া ঐ কথাই মনে ওঠে।... এই বডদলের তীবে দিদিমার মত, ব্রহ্মঠাকরনের মত ভাব দেহও একদিন পুড়াইতে -

কথাটা ভাবিতেই ভয়ে সবশবীর যেন অবশ হইয়া আসে...

কাজল তাহার ভয়ের সালটা জানিত, কিছুদিন আগে তাহার দাদামশায় সীতানাথ পণ্ডিতের কাছে কাজলের ঠিকুজি করাইয়াছিলেন—সে সে-সময় সেখানে ছিল। কিন্তু তারিখটা জানে না—তবে মাঘ মাসের শেষের দিকে, তা জানে।

একদিন সে হুপুরে চুপি চুপি কাছারি ঘবে ঢুকিল। তাকের উপরে রাশীকৃত পুরানো পাঁজি সাফানো থাকে। চুপি চুপি সবগুলি নামাইয়া ১৩৬০ সালের পাঁজিখানা বাছিয়া লইয়া মাঘ মাসের শেষের দিকের তারিখগুলো দেখিতে লাগিল—কি সে বুঝিল সে-ই জানে—তাহার মনে হইল ২৫শে মাঘ বড খাবাপ দিন। ঐ দিন জন্মিলে আরু কম হয়, খুব কম। তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল ঐ দিনটাকেই হয়ত সে ভুলিয়াছে।...ঠিক...

বড মামীমাকে বৈকালে জিজ্ঞাসা করিল—আমি জন্মেছি কত তারিখে মামীমা ? ...বড মামীমার ভো তাহা ভাবিয়া ঘুম নাই। তিনি জানেন না। বড মামাতো ভাই পটলকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি কবে জন্মেছি জানিস পটলদা ? ...পটলের বয়স বছর দশেক, সে কি করিয়া জানিবে ? দাদামশায়ের কাছে ঠিকুজি আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ভংসা হয় না। একদিন সীতানাথ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলেছেন—কেন, সে খোঁজে তোমার কি দরকার ? সে থাকিতে না পারিয়া সোজা দুজি বলিয়াই ফেলিল—আ-আমি ক-কতদিন বাঁচব পণ্ডিত মশায় ?...

সীতানাথ পণ্ডিত অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন—এমন কথা কোন ছেলের মুখে কখনও তিনি শোনেন নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয়ো-কে ডাকিয়া কহিলেন ...ভুনেছেন ও বাঁড়ুয়োমশাই, আপনার নাতি কি বলছে ? শশীনারায়ণ শুনিয়া বলিলেন—এদিকে জে বেশ ঈচ্ছ-পাকা ? তুমি সেব মধ্যে আঙ্গু তো দ্বিতীয় নামতা রপ্ত হলে না—বলো বারো পোনেরং কত ?

কাজলের ভয়কে কেহই বুঝিল না। কাজল ধমক খাইল বটে, কিন্তু ভয় কি ভাতে যায় ? এক এক সময়ে তাহার মন হাঁপাইয়া ওঠে—কাহাকেও বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না...এখন সে কি করে ? এখানে তাহার কথা কেহ শুনিবে না, রাখিবে না তাহা সে বোঝে। তাহার বাবাকে বলিতে

পারিলে হয় তো উপায় হইত ।

বর্ধাকালে শেষের দিকে দু-একবার জরে পড়ে । অর আসিলে উপরের ঘরে একলাটি একটা কিছু টানিয়া গায়ে দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে । কাহারও পায়েল শব্দে মুখ তুলিয়া বলে—ও মায়ীমা অর এয়েচে—একটা লে-এ এ-প বের করে দাও না ? ইচ্ছা করে কেহ কাছে বসে, কিন্তু বাড়ির এত লোক সবাই নিজের নিজের কাজে বাস্ত । জরের প্রথম দিকে কিছু চমৎকার লাগে, কেমন যেন একটা নেশা, সব কেমন অন্তত লাগে । ঐ জানালার গরাদটাতে একটা ডেও-পিপড়ে বেড়াইতেছে, চুনে-কালিতে মিশা-ইয়া জানালার কবাটে একটা দাড়িওয়ালা মজার মুখ । জানালার বাহিরের নানিকেল কাছে নানিকেলদুই একটা কাঁদি ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে । নিচে তাহার চোট মাঝতো বোন অর, ‘ভাত ভাত’ করিয়া চিংকার শুত্র করিয়াছে বেশ লাগে । কিন্তু শেষের দিকে বড় কষ্ট, গা জালা করে, হাত পা ব্যথা করে, শরীর ঝিম ঝিম করে, মাথা যেন ভার বোঝা, এ সময়টা কেহ কাছে আসিয়া যদি বসে !

কাচারিবে উঠব গায়ে পথেব ধাবে এক বুড়ীর খাবারের দোকান, বারো মাস খুব সন্দেশে দিমা সে তেলেভাজা বেগুনি ফুলবি ভাঙে । কাজল তাহার বাঁশ খনিদার । অনেকবার বকুনি খাইয়াও সে এ লোভ সামলাইতে সমর্থ হয় নাই । সাবিসাব দিন-দুই পনেই কাজল সেখানে গিয়া হাজির । অনেকক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া ফুলবিভাজা দেখিল, পুঁইপাতার বেগুনি, ভবাপাতার তিল-পিটুলি । অবশেষে সে অপ্রতিভ মুখে বলে—আমায় পুঁইপাতার বেগুনি দাও না দিদিমা ? দেবে ? এই নাও পয়সাটা । বুড়ী দিতে চায় না, বলে—না থোকা দাদা, সেদিন অব থেকে উঠেছ, তোমার বাড়ির লোক সুনলে আমায় বকবে—কিন্তু কাজলের নিবন্ধাতিশয্যে অবশেষে দিতে হয় ।

একদিন বিশেষ মজবীর কাছে ধরা পড়িয়া যায় । বুড়ী ব দোকান হইতে বাহির হইয়া ভবাপাতার তিল-পিটুলির ঠোঙা-হাতে খাইতে খাইতে পুকুর পাড় পর্যন্ত গিয়াছে—বিশেষেব আসিয়া ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল বলিল—আচ্ছা পাঞ্জি ছেলে তো ? আবার ঐ তেলেভাজা খাবারগুলো রোজ রোজ খাওয়া ?

কাজল বলিল—আমি খা-খা-খাচ্ছি তা তো-তোমার কি ?

বিশেষ মজবীর হঠাৎ আসিয়া তাহার কান ধরিয়া একটা বাঁকুনি দিয়া বলিল—আমাব কি, বটে ? —বাগে অপমানে কাজলের মুখ রাঙা হইয়া গেল । ইহাদের হাতে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা তাহার এই প্রথম । সে ছেলেমানুষি সুরে চিংকার করিয়া বলিল—মুখপুড়ি, হতচ্ছাঁড়া তু-তুমি মারলে কেন ?

বিশেষ মজবীর তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—আমি কেন, এসো ভোঁ কতীর কাছে একবার—এসো ।

কাজল পাগলের মত যা-তা বলিয়া গালি দিতে লাগিল । চড়ের চোটে

অথন তাহার কান মাথা বাঁ বাঁ করিতেছে, এবং বোধ হয় এ অপমানের কোনও প্রতিকার এখানকার কাহারও নিকট হইতে হইবার আশা নাই, যুদ্ধ মনো ঠাণ্ডারাইয়া ব্রিটিশ চিৎকার করিয়া বলিল—আমার বা-বাবা আসুক, বলে দেব, দেখো—দেখো তখন—

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা যাও, তোমার বাবার ভয়ে আমি একেবারে গভেব মনো খাব অ'ব কি ? আঙ পাঁচ বছরের মনো খোঁজ নিলে না, ভারী ভো—। হয়ত একটা বলিতে বিশ্বেশ্বর সাহস করিত না, যদি সে'না জানিত তাহার এ ভাষাইটি প্রাত কতর মনোভাব কিরূপ ।

কাঙাল বাগেব মাথায় ও কতকটা পাছে বিশ্বেশ্বর দাদামশায়ের কাছে খরিয়া লইয়া যায় সেই ভয়ে, পুকুরের দক্ষিণ-পালের নারিকেল বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—দেখো না, দেখো তুমি, বাবা আসুক না—পরে পিছন দিকে চাহিয়া খুব কড়া কথা শুনানো হইতেছে এমন সুবে বলিল—তোমার পেটে খি খিচুড়ি আছে, খি-খিচুড়ি খাবে—খিচুড়ি ?

নদীর বাঁধাঘাটে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ দিদিয়ার কথা ভাবিল । দিদিমা থাকিলে বিশ্বেশ্বর মুছরী গারে হাত তুলিতে পারিত ? সে জবাপাতার বেঙনি যায় হো ওর কি ?

ঐ একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল । দিদিমা বলত নক্ষত্র খসিয়া পড়িলে সেই সময় পৃথিবীতে কেউ না কেউ ভয়াম যশিয়া কি নক্ষত্র হয় ? সে যদি মারা যায়, হয়তো এমনি নাক'লের গায়ে নক্ষত্র চইয়া ফুটিয়া পাকবে ।

আরও হাস কয়েক পরে ভাদ্রমাসের শেষের দিকে । দাদামশায়ের বৈকালিক মিছরির পান খাওয়ার দ্বৈত পাথরের গেলাসটা তাহার বড় মামীমা মাড়িয়া ধুইয়া উপরেব ঘরের বাগনের জলাচাকতে রাখিতে তাহার হাতে দিল । সিঁড়িতে উঠিবার সময় কেমন কবিয়া গেলাস হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল । কাঙালের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের গতি খেন মিনিটবানেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল যাঃ সবনাশ । দাদামশায়ের মিছরিপানার গেলাসটা যে । সে দিশেহারা অবস্থায় টুকণো-গুলো তাডাতাড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিল : পরে অন্য জায়গায় ফেলিলে পাছে কেহ টের পায়, তাই তাডাতাড়ি আরবা উপন্যাস যাহার মধ্যে আছে সেই বড় কাঠের সিঁদুকটার পিছনে গোপনে রাখিয়া দিল । এখন সে কি করে । কাল খখন গেলাসের খোঁজ পড়িবে বিকালবেলা, তখন সে কি জবাব দিবে ?

কাহারও কাছে কোন কথা বলিল না, বাকী দিনটুকু ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতেও পারিল না । এক জায়গায় বসিতে পারে না, উদ্বিগ্ন মুখে চট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায়—ঐ রকম একটা গেলাস আর কোথাও পাওয়া যায় না ? একবার সে এক খেলুড়ে বন্ধুকে চুপি চুপি বলিল,—ভাই তো-তোদের বাড়ি একটা পাণরের গে-গেলাস আছে ?

কোথায় সে এখন পায় একটা খেত পাথরের গেলান ? রাত্রে একবার ভাবের মনে হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে । কলিকাতা কোন দিকে ? সে বাবার কাছে চলিয়া যাইবে কলিকাতায়—কাল বৈকালের পূর্বেই ।

কিন্তু রাত্রে পালানো হইল না । নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে সকালে দুম ভাড়িয়া উঠিল, দুই-তিন বার কাঠের সিন্দুকটার পিছনে সম্বর্ণে ডাকি মারিয়া দেখিল, গেলানের টুকরাগুলো সেখান হইতে কেহ বাহির করিয়াছে কিনা । বড় মামামান সামনে আর যায় না, পাছে গেলানটা কোথায় ঝিঁজাসা করিয়া বসে । উপবেশ করি পূন বাড়ির রাস্তা দিয়া কে একজন সাইকেল চড়িয়া যাত্ৰা দেখিয়া সে-নাট-মন্দিরের বেড়ার কাছে ছুটিয়া দেখিতে গেল—কিন্তু সাইকেল দেখা তাহার হইল না নদীর বাঁধাঘাটে একখানা কাহাদের ডিঙি নৌকা লাগিয়াছে, একজন কসী চেহারার লোক একটা ছিঁড়ি ও বাগ হাতে ডিঙি হইতে নামিয়া বাগে সিঁড়িতে পা দিয়া মাঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে—কাজল খবর হওয়া ভাবিতেছে, লোকটা কে, এমন সময় লোকটা মাঝির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া এদিকে মুখ ফিরাইল । সঙ্গে সঙ্গে কাজল অলক্ষ্যে একটা চোখে খেন গোয়া দেখিল পরক্ষণেই সে নাটমন্দিরের বেড়া গলাইয়া বাহ্যের নদীর ধারে পাতাটা বাহিয়া বাঁধাঘাটের দিকে ছুটিল । যদিও অনেক বছর পরে দেখা তবুও কাজল চিনিয়াছে লোকটিকে—তাহার বাবা ।

অপু পুনরায় সোনার গেলান ক'িয়াছিল নতুবা সে কাল রাত্রেই এখানে পৌঁছিত । সে মাঝির দি'জাসা করিতেছিল, পরন্তু ভাবে নৌকা এখানে আসিয়া তাহাকে ব'শ'লের সোনার খবর দিতে পারিবে কিনা । কথা শেষ করিয়াই গিয়া চাহিয়া সে দেখিল একটি ছোট সুশ্রী বালক ঘাটের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে । পরক্ষণেই সে চিনিল । হাঃ সারা পথ, নৌকায় সে লেগে কথা ভাবিয়াছে, না জানি সে কত বড় হইয়াছে, কেমন দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া গিয়াছে, না মনে রাখিয়াছে । ছেলের আগেকার চেহারা তাহার মনে ছিল না । এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া সে যুগপৎ প্রাণ ও বিস্মিত হইল—তাহার সের তিন বছরের ছোট্ট খোকা এমন সুদর্শন লাগাওরা বালকে পরিণত হইল কবে ?

সে হাসিমুখে বলিল—কি বে খোকা, চিনতে পারিস ? কাজল তৎক্ষণে আসিয়া অসীম নিষ্ঠুরতার সহিত তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—ফুলের মত মুখটি তুঁচু করিয়া হাসি-ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না বৈ কি ? আমি বেড়ার ধার থেকে দেখেই ছুট দিইছি—এতদিন আস নি কে-কেন বাবা ?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল । এতদিন তো ভুলিয়া ছিল, কিন্তু আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবারাত্রি—অপু বৃকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল । কি আশ্চর্য, এই ক্ষুদ্র বালকটি তাহারই ছেলে, জগতে নিতান্ত অসহায় হাত-পা হারা, অবাধ—জগতে সে ছাড়া ওর আর কেউ নেই

মাই ! কি করিয়া এতদিন দে ডুলিয়া ছিল ।

কাজল বলিল—ব্যাগে কি বাবা ?

—দেখবি ? চল দেখাব এখন । তোর জন্যে কেমন শিশুল আছে, এক সঙ্গে হুম্ হুম্ আঙুলাজ হয়, ছবির বই আছে দুখানা । কেমন একটা রবারের বেলুন—

তো-তো-তোমাকে একটা কথা বলব বাবা ? তো-তোমার কাছে একটা পাথরের গে গেলাস আছে ?

—পাথরের গেলাস ? কেন রে, পাথরের গেলাস কি হবে ?

কাজল চুপি চুপি বাবাকে গেলাস ডাঙা কথা সব বলিল । বাবাব কাছে কোন ভয় হয় না । অপু হাসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—আচ্ছা চন্, কোনো ভয় নই । সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সব গল্পটা কাটিয়া গেল, একজন অসীম শক্তিশালী বজ্রপাণি দেবতা যেন হঠাৎ বাহুদ্বয় মেলিয়া তাহাকে আশ্রয় ও অভয়দান করিয়াছে—মাইঃ ।

রাত্রে কাজল বলিল—আমি তোমাব সঙ্গে যাবো বাবা ।

অপুর আনন্দা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় এখন নিজেরই অচল । সে ডুলাইবার জন্য বলিল—আচ্ছা হবে, হবে । শোন একটা গল্প বলি শোকা । কাজল চুপ করিয়া গল্প শুনিল । বলিল—নিয়ে যাবে তো বাবা । এখানে সবাই বকে, মারে বাবা । তুমি নিয়ে চল, তোমার কত কাজ করে দেব ।

অপু হাসিয়া বলে, কাজ করে দিব ? কি কাজ করে দিব রে শোকা ?

তারপর সে ছেলেকে গল্প শোনায়, একবার চাচ্ছা দেখে, কখন সে দুমাইয়া পড়িয়াছে । খানক রাত্রি পর্যন্ত সে একখানা বই পড়িল, পরে আলো নিভাইবার পূর্বে ছেলেকে ভাল করিয়া শোয়াহতে গেল । দুমন্ত অবস্থায় বালককে ক্রি অন্তত ধরনের অবোধ, অসহায়, দুর্বল ও পরাধীন মনে হইল অপু । কি অসহায় ও পরাধীন । সে ভাবে এই যে ছেলে, পৃথিবীতে এ তো কোথাও ছিল না, যাচিয়াও তো আসে নাই—অপর্ণা ও সে, দু'জনে যে উহাকে কোন্ অনন্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার পর সংসারে আনিয়া অবোধ নিষ্পাপ বালককে একা এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে ? কিন্তু এখন কোথায়ই বা লইয়া যায় ?

প্রাচীন গ্রীসের এক সমাধির উপর সেই যে স্মৃতিফলকটির কথা সে পড়িয়াছিল ফ্রেডারিক হ্যারিসনের বই-এ—

This child of ten years

Philip, his father laid here

His great hope, Nikoteles.

দে ছয় কালের ছোট বালকটির সুন্দর মুখ, সুন্দর রং, দেব-শিশুর মত সুন্দর দৃশ্য বংশরের বালক নিকোটিলিসকে আজ রাত্রে দে যেন নির্জন প্রাসাদের বেলা করিতে দেখিতে পাইতেছে—সোনারী চুর্ন, ডাগর ডাগর চোখ ।

তাহার স্নেহস্বভি গ্রীসের সে নির্জন প্রান্তরের সমাধিক্ষেত্রের বৃক্কে অমর হইয়া আছে। শত শতাব্দী পূর্বে সেই বিরহী পিতৃ-হৃদয়ের সঙ্গে সে যেন আজ নিজের নাড়ীর যোগ অনুভব করিল। মনে হইল মানুষ সব কালে, সব অবস্থায় এক, এক। কিংবা... দেবতার মন্দির-দ্বারে আরোগ্যাকাশী বহু যাত্রী জুড় হইয়াছে নানা দিক্দেশ হইতে... ছোট ছেলেটির গরীব বাবা তাহাকে আনিয়াছে... ছেলেটি অসুখে ভোগে, রুগ্ণ, যন্ত্রে দেবতা আসিয়া বলিলেন—যদি তোমার রোগ সারিয়ে দিই, আমার কি দেবে ইউফেনিস্ ? উঃ, সত্যি। অসুখ সারিলে সে বাঁচে! ছেলেটি উৎসাহের সুরে বলিল—দশটা মাবেল আমার আছে, সব কটাই দিয়ে দেব—দেবতা খুশীর সুরে বলিলেন—স-ব-ক-টা! বলো কি?—বেশ বেশ, রোগ সারিয়ে দেব তোমার।
বাৎসল্যরসেব এমন গভীর অনুভূতি জীবনে তাহার এই প্রথম...

অনেক দিন পরে উপরের ঘরটাতে শুইল। সেই তাহার ফুলশয্যার খাটটাতে। কাজল পাশেই ঘুমাইতেছে—কিন্তু কত রাত পর্যন্ত তাহার নিজের ঘুম আসিল না। জানালার বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। গত পাঁচ ছয় বৎসর বিদেশে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবনযাত্রা ও নবতর অনুভূতিরাজির ফলে পুরাতন দিনের অনেক অনুভূতিই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—এখানকার তো আরও, কারণ আট নম্বর বৎসর এখানকার জীবনের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তাই আজ এই চিলে-কোঠার বহু পরিচিত ঘরটা, এই পাশফটা, ঐ সুপারি বনের সারি—এসব যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। ঠিক আবার পূর্বানো দিনের মত জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ঠিক সেই সব দিনের মত নাটমন্দির হইতে নৈশ কাতনের খোলার আওয়াজ আসিতেছে—কিন্তু সে অপু নাই—বদলাইয়া গিয়াছে—বেমালুম বদলাইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বই ছাপাইয়া ফেলিল পূজার পবেই।

কেবল হার ছাড়াটা বেচিতে পারিল না। অপর্ণার অন্যান্য গহনার অপেক্ষা সে এই হার ছাড়াটার সঙ্গে বেশা পরিচিত। তাই হারটা সামনে খুলিয়া ঝানিকক্ষণ ভাবিল, অপর্ণার সেই হাসি-হাসি মুখখানা যেন বাপসা-মত মনে পড়ে—প্রথমটাকে হঠাৎ যেন খুব সুস্পষ্ট মনে আসে—আধ সেকেণ্ড কি সিকি সেকেণ্ড মাত্র সময়ে। উল্লেখ্য—তারপরই বাপসা হইয়া যায়। ঐ আধ সেকেণ্ডের জন্য মনে হয়, সে-ই সেরকম ঘাও বাঁকাইয়া মুখে হাসি টিপিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

ছাপানো বই-এর প্রথম কপিখানা দপ্তরীর বাড়ি হইতে আনাইয়া দেখিয়া সে দুঃখ ভুলিয়া গেল। কিছু না, সব দুঃখ দূর হইবে। এই বই-এ সে নাম করিবে।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হইতে সে নিশ্চিন্দপূরের পোড়া ভিটাকে অভিনন্দন পাঠাইল মনে মনে। যেখানেই থাকি, জুলি বি!

৪ বাহাদুর বেহরার বড় ভাইরা বইখানা বড়ী, কত দ্বন্দ্ব, কত অবস্থা
 বাহাদুর সজে পরিচয়, হয়ত কেউ বাঁচিয়া আছে, কেউ বা নাই। তাহার
 আত্ম কোথায় সে জানে না, এই নিম্নক বাক্তির স্বাক্ষর-শক্তির মধ্যে দিন্ন সে
 মনে মনে সকলকেই আত্ম তাহার শ্রাব্য কানাইতেছে।

মাসকয়েকব ভগ্ন একটা ছোট অফিসে একটা চাকরি জুটিয়া গেল তাই
 বন্ধ। এক জায়গায় আবার ছেলে পড়ায়। এসব না করিলে খবচ চলে
 বা কিসে, বই-এব বিজ্ঞাপনের টাকাই বা আসে কোথা হইতে। আবার
 সেই সাড়ে নয়টার সময় অফিসে দৌড় সেখান হইতে বাহির হইয়া একটা
 গলিব মধ্যে একতলা বাসার ছোট ঘরে দুটি ছেলে পড়ানো। বাড়ির কর্তাব
 কিসের ব্যবস্থা আছে এই ঘরে তাঁহাদের বড় বড় পাকবান্ন চাদর কডি
 পর্যন্ত সাজানো। তাহারই মাঝখানে ছোট তরুণপাশে মাছ পাতিয়া ছেলে
 দুটি পড়ে—সন্ধ্যার পবে অশ্রু যখনই পড়াইতে গিয়াছে, তখনই দেখিয়াছে
 কল্লাব ধোঁয়ায় ঘবটা ভবা।

শীতকাল কাশিয়া পুনরায় গ্রীষ্ম পড়িল। বই-এব অবস্থা খুব সুবিধা নয়
 নিজে না খাইয়া বিজ্ঞাপনের খবচ যোগায় তবু বই-এব কঠিন নাই।
 বইওয়ালারা উপদেশ দেয় এন্টিবদেব কাছে, কি বড় বড় সাহিত্যিকদের
 কাছে যান, একটু যোগাযোগ করে ভাল সমালোচনা বার কান, মাঝে মাঝে
 চেনে কে, বই কি হাওয়ায় কাঁপে মশাই? অপর সে সব পানিবে না, নিজে
 লেখা বই বগল করিয়া দোবে দোবে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার কর্তব্য নয়। এতে
 বই কাঁটে ভাল, না কাঁটে সে কি করিবে?

অতএব জীবন পুনরায় পরিচিত পথ পরিষাই বহিয়া চলিল—অসি স আর
 ছেলেপড়ানো। রাত্রে আর একটা নতুন বই লেখে। ও যেন একটা নেশা,
 বই বিক্রী হয় না-হয়, কেউ পড়ে না পড়ে, তাহাকে যেন লিখিয়া বাইতেই
 হইবে।

মেসে লেখার অন্তান্ত অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সে একটা ছোট একতলা
 বাড়ির নৌচকার একটা ঘর আট টাকায় ভাড়া লইয়া সেখানে ঠাঠিয়া গেল।
 মেসের ব্যবস্থা লোক বেশ ভালই—কিন্তু তাঁহাদের মানসিক দাবী যে-পথ
 অবলম্বনে চলে অপূর পথ তা নয়। তাঁহাদের সুখভা, সংস্কার, সীমারহিত ও
 সর্ববকমে মানসিক দৈন্য অপূরকে পীড়া দেয়। বানিক্য দিওলাপ হয়তো
 এদের সঙ্গে চলিতে পারে—কিন্তু বেশীক্ষণ আড্ডা দেওয়া অসম্ভব—বরং
 কারখানার ননী মিত্র, কি চাঁপদানীর বিত্ত শ্যাকরার আড্ডাভাব লোকজনকে
 ভালই লাগিত—কারণ তাহারা যে জগৎটাতে বাস করিত—অপূর কাছে সেটা
 একবারেই অপরিচিত—তাঁহাদের মোহ ছিল, সেই অজানা ও অপরিচয়ের
 মোহ, কাশীর কপকঠাকুর কি অমরকটকের আত্মবলাল ঝাঁকে যে কারণে
 ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু এরা সে ধরনের অনন্তসাধারণ নয় বিভাস্তই সাধারণ
 ও নিভাস্ত কুন্ত। কাজেই বেশীক্ষণ থাকিলেই হাঁপ ধরে। অপূর নতুন

ঘরটাতে নরজা জানালা কম, দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খুলিলে পাশের বাড়ির ইঁট-বার-করা দেওয়ালটা দেখা যায় মাত্র। ভাবিল—তবুও তো একা থাকতে পারব—লেখাটা হবে।

বাড়ি বদল করার দিনটা জিনিষপত্র সরাইতে ও ঘর গুছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল।

আজ রবিবার ছেলে পড়ানো নাট। বাপু। নিশ্বাস ফেলিয়া ঝাঁচিল। সেই অতটুকু ঘব, কয়লার ধোঁয়া আর রাজ্যের প্যাকবাক্সের টার্পিন তেলের মত গন্ধ। আজ কয়েক দিন হইল কাজলের একখানা চিঠি পাইয়াছে, এই প্রথম চিঠি কাটাকুটি বানান ভুলে ভর্তি। আর একবার পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল—বার-পনেবো হহল। এইবার লইয়া। বাবার জন্য তাহার মন কেমন কবে, একবার ঘাইতে লিখিয়াছে, একখানা খাবার উপন্যাস ও একটা লঠন লইয়া ঘাইতে লিখিয়াছে, যেন বেশী দেরি না হয়। অপর ভাবে ছেলেটা পাগল, লঠন কি হবে? লঠন? ছাখ তো কাণ্ড। উঠিয়া ঘবে আলো জালিয়া ছেলের পত্রের ভাব লিখিল। সে আগামী শনিবার তাহাকে দেখিতে ঘাইতেছে। সোম ও মঙ্গল বাব ছুটি, ট্রেনে স্ট্রিমারে বেড়ায় ভিড়। গুলনার স্ট্রিমার এবারও বেল কবিল। স্বস্তব্যাডি পের্ ছিতে বেলা গড়াইয়া গেল।

নৌকা হইতে দেখে কাজল ঘাটে তাহার অপেক্ষায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া—নৌকা থামিতে-না-থামিতে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। মুখ উঁচু করিয়া বলিল—বাবা,—আমার খাবার উপন্যাস?—অপু সে-কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কাজল কঁাদ-কঁাদ দুরে বলিল—হ-উঁ বাবা, এত কবে লিখলাম, তুমি ভুলে গেলে—লঠন...অপু বলিল,—আচ্ছা তুই পাগল নাকি—লঠন কি কবাব?—কাজল বলিল, সে লঠন নয় বাবা!...হাতে খুলানো খায়, বাঙা কাচ, সবুজ কাচ বেব করা খায় এমনি গা। হ-উঁ, তুমি আমার কোন কথা শোনো না। একটা আশি আনবে বাবা?

--আশি?—কি করবি আশি?

—আমি আশিতে ছিঁয়া দেখবো—

অপনার দিদি মনোবমা অনেকদিন পবে বাপের বাড়ি আসিয়াছেন। বেশ সুন্দরী, অনেকটা অপনার মত মুখ। ছোট ভগ্নপতিকে পাইয়া খুব আত্মাদিত হইলেন, স্বর্গগত মা ও বোনের নাম করিয়া গোখের জল ফেলিলেন। অপু তাঁহাব কাছে একটা সত্যকার স্নেহ-ভালবাসা পাইল। সন্ধ্যাবেলা অপু বলিল—আসুন দিদি, ছাদের উপর বসে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।

ছাদ নির্জন, নদীর ধারেই, অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অপু বলিল—আমার বিশ্বের রাতের কথা মনে হয় মনোরমা দি?

মনোরমা যত হাসিয়া বলিলেন—সেও যেন এক স্বপ্ন। কোথা থেকে কি যেন সব হচ্ছে গেল ভাই—এখন ভেবে দেখলে সেদিন তাই এই ছাদের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম—তোমাকেও তো আমি সেই বিশ্বের পর আর

কখনও দেখি নি। এবার এসেছিলুম ভাগিন, তাই দেখাটা হ'ল।

হাসির ভঙ্গি অপূর্ণ মত, মুখে কত কি ভাব, ঠিক তাহারই মত -
বিস্মৃতি জগৎ হইতে সে-ই যেন আবার ফিবিয়া আসিয়াছে।

মনোবম্! অযোগ্য কবিতা বলিলেন—তুমি তো দিদি বলে খোঁজও কর
না ভাই। এবার পড়োব সমস্ত বসিলালে ও—বলা বইল, মাথার দিবি।
আর তোমার ঠিকানাটা আমার লিখে দিও তো।

কোথা হইতে কাজল আসিয়া বলিল—বাবা একটা অর্থ জান ?...

—অর্থ ? কি অর্থ ?

কাজলের মুখ তাহার খুব সুন্দর মনে হয়—কেমন একধরনের খাঁড়
একধারে বাঁকাইয়া চোখে খুঁচিৎ হাসি হাসিয়া কথাটা শেষ করে, আবার তখন
বোকাব মতই হাসে—হঠাৎ যেন মুকখানা কলগ ও তপ্রতিভ দেখায়। ঠিক
এই সময়েই অপূর্ণ মনে ওই রেহের বেদনাটা দেখা দেয়—কাজলেব ঐ পনের
মুখভঙ্গিতে।

—বল দেখি, বাবা, এখানে পেকে দিলাম সাড়া, সাড়া গেল সেই বামন-
পাড়া ? কি অর্থ ?

অপূর্ণ ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—না।

কাজল ছেলেমানুষি হাসি দই দুটাইয়া বলিল, ইলি। পাখি বুঝি ?
শাঁক তো—শাকের ডাক। তুমি কিছু জানো না বাবা।

অপূর্ণ বলিল—ছিঃ বাবা, ওকম ইলি টিলি বলো না, বলতে নেই
ও-কথা, ছিঃ।

—কেন বলতে নেই বাবা ?...

—ও ভাল কথা নয়।

আদিবাস্তব জগের দিন বাত্রে কাজল চুপি চুপি বলিল—এবার আমায় নিয়ে
যাও বাবা, আমার এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগে না।

অপূর্ণ অবিল—নিশ্চই যাই এবারে, এখানে ওকে কেউ দেখে না, তাছাড়া
লেখাপড়াও এখানে থাকল না হ'ব।

প্রদিন সকালে ছেলেকে লগ্না সে নৌকায় উঠিল অপূর্ণার তোরঙ্গ ও
হাতবাঁধতা এখানে আট-নয় বৎসর পড়িয়া আছে, তাহার বড় শালী সঙ্গে দিয়া
দিলেন। ইহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া চোখের তল
ফেলিলেন। অপূর্ণকে বার বার বরিশালে খাইতে অনুরোধ করিলেন। সকালের
নবীন বোদ ভাঙা নান্দ্রিদের গায় পড়িয়াছে। নদীতল হইতে একটা
আমিষ গন্ধ আসিতেছে। গ্রস্তর মহাশয়ের তামাক-বাওয়ার কয়লা পোড়ানোর
জগ্য শুকনা ডালপালার আগুন দেওয়া হইয়াছে নদীর ধারটাতেই। কুণ্ডলী
পাকাইয়া ধোয়ার রাশ উপরে উঠিতেছে। সকালের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা।
আজ বহু বৎসর আগে যেদিন বন্ধু প্রণবের সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে এ বাটা
আসিয়াছিল তখন সে কি ভাবিয়াছিল এই বাড়িটার সহিত তাহার জীবনে

এখন একটি অদ্ভুত যোগ সাধিত হইবে, আজও সেদিনটার কথা বেশ স্পষ্ট মনে হয়। মনে আছে, আগের দিন একটা গ্রামোফোনের দোকানে গান শুনিয়াছিল — ‘ববিষ ধবা মাঝে শান্তির বাণি।’ শুনিয়া গানটা মুখস্থ করিয়াছিল ও সারাপথে ও স্টামারে আনমনে গাহিয়াছিল—এখনও ওন্ ওন্ করিয়া গানটা গাহিলে সেই দিনটা আবার ফিরিয়া আসে।

ছেলেকে সঙ্গে লইয়া ধপু প্রথমে মনসাপোতা আসিল। বছর ছয়-সাত এখানে আসা ঘটে নাই। এই সময়ে দিনকয়েকের ছুটি আছে, এইবার একবার না দেখিয়া গেলে খাব আসা ঘটিবে না অনেকদিন।

ঘবদোরের অবস্থা খুব খারাপ। ধপু মনে পড়িল, ঠিক এই রকম অপরিষ্কার ভাঙা ঘবে এই বালকের মাকে সে একদিন আনিয়া তুলিয়াছিল। তেলিদের বাড়ি হইতে চাষ আনিয়া ঘরের তালি খুলিয়া ফেলিল। খড় নানান্থানে উড়িয়া পড়িয়াছে, হঠবেগত, পাড়ার গরু-বাছুর উঠিয়া দাওয়া ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া কোলিয়াছে, উঠানে বন জঙ্গল।

কাজল চাষদিকে চাহিয়া চাহিয়া অবাক হইয়া বলিল—বাবা এটো তোমাদের বাড়ি।

অপহাস্য বলিল—তোমারও বাড়ি বাবা। নামক বাড়ির কোঠা দেখেছ জন্মে অবধি, তাতে তো চলবে না, ঠিক সম্প্রতি তোমার এই।

সকালে উঠিয়া একটি খববে সে গুপ্তিত হইয়া গেল। নিক-না আর নাট। সে গত পৌষ মাসে তাঁর কবিতা গিয়াছিল, পথে কল্যাণ হয়, সেখানেই মারা যায়। নিকম্মাব জাঠা রক্ত সবকার মহাশয় বলিতেছিলেন—আর দাদা-ঠাকুর, তোমরা লেখা-ভাষিতে দেশেও আর আসবে না? মেয়েটার কথা মনে হলে আর অন্ন মুখে ওঠে না। হ’ল কি জান, বললে কুড়ুলের পাটে মেলা দেখতে যাব। তাব তো জানো পূজো-ঘাচ্চা এক ব্যাতক ছিল। পাড়ার সবাই থাকে, আমি বলি, তা যাও। ওমা তিন দিন পর সকালে খবর এল নিকম্মা মর মর, শান্তিপূর্বের পথে একটা দোকানে—কি সমাচার, না কল্যাণ। গেলুম সবাই ছুটে। পৌছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমবা এখন গেলুম তখন বাকুবোধ হয়ে গিয়েছে, চিনতে পাবলে, চোখ দিয়ে হ-হ জল পড়তে লাগল। দাদাঠাকুর—মা আমাব পাডাসুদ্ধ সবাই উপকার করে বেডাত—তুমি সবই জান—আব অসুখ দেখে সেই পাড়ার লোকই... যাবা সঙ্গে ছিল, পথেব ধারের একটা দোচালা ভাঙা ঘরে মাকে আমায় ফেলে সবাই পাליয়েছে। পাশেব দোকানীটা লোক ভাল—সেই একটু দেখাশুনা করছে। চিকিৎসে হয় নি, পত্তরও হয় নি, বেঘোরে নিক-মাকে হারালাম। সরকার বাড়ি হইতে ফিরিতে একটু বেলা হইয়া গেল। উঠানে পা দিয়া ডাকিল—ও থোকা—কাজল দুপুরে ঘুমাইতেছিল, কখন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে এবং তেলি-বাড়ি হইতে আঁকশি যোগাড় করিয়া আনিয়া উঠানের গাছের চাপাফুল পাড়িবার জন্য নিচের একটা ডালে আঁকশি বাঁধিয়া টানাটানি

করিতেছে।

দৃশ্যটা তাহার কাছে অদ্ভুত মনে হইল। অপর্ণার পোতা সেই চাঁপাফুল গাছটা। কবে তাহার ফুল ধবিয়াছে, কবে গাছটা মানুষ হইয়াছে, গত সাত বৎসরের মধ্যে অণু সে খোঁজ লওয়ার অবকাশ ছিল না—কিন্তু খোঁজ কেমন করিয়া—

সে বলিল—খোঁজা ফুল পাড়হিস, গাছটা কে পুঁতেছিল জানিস?

কাজল বাবার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি এসো না বাবা, ঐ ডালটা চেপে ধরো না। মোটে দুটো পড়েছে।

অণু বলিল—কে পুঁতেছিল গাছটা? তোর মা!

কিন্তু মা বলিলে কাজল কিছুই বোঝে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে দিদিমা ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না, দিদিমাই তাহার সব। মা একটা অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাপাব মাত্র। মায়ের কথায় তাহার মনে কোনও বিশেষ সুখ বা দুঃখ জাগায় না।

অনেক দিন পবে মনসাপোতা আসা। সকলেই বাড়িতে গকে, নানা সহপ-দেশ দেয়। ক্ষেত্র কপালী অণুকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল, দুখ পাঠাইয়া দিল—ঘব ছাইবার জন্য ভাঙে একগাডি উলুখড় দিতে চাহিল।

রাত্রে আবাব কি কাজে সবকাব বাড়ির সামনেব পথ দিয়া আসিতে হইল। বাড়িটার দিকে চাওয়া যায় না। গোটা মনসাপোতাটা নিরুদির অভাবে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। নিরুদি আজ খোকাকে নিয়ে এসেছি, তুমি এসো ওকে দেখবে না, আদব করবে না, খাওয়া-দাওয়াব বন্দোবস্ত ক'বে দেবে না?

রাত্রে অণু কিছুতেই ঘুমাইতে পাবে না। চে'খেন সামনে নিরুদ্যাব সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই অনুখোগের সুব কানে। আর একটা বার দেখা হয় না তার সঙ্গে?

কাজলকে সে কলিকাতায় লইয়া আসিল পরদিন বেকালের ত্রেনে। সন্ধ্যার পর গাড়িখানা শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকিল। এত আলো, এত বাড়িঘর, এত গাড়িঘোড়া—কি কাণ্ড এসব। কাজল বিষ্ময়ে একেবারে নিবাক হইয়া গেল। সে শুধু বাবার হাত ধবিয়া চারিদিকে ডাগর চোখে চাহিতে চাহিতে চলিল।

হারিসন গোড়ে বড বড বাড়িঙলা দেখাইয়া এইবার সে বলিল—ওগুলো কাদের বাড়ি, বাবা? অত বাড়ি?

বাবার বাসায় ঢুকিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বড রাস্তাটার গাড়ি-ঘোড়া দেখিতে লাগিল। অবাক-জলপান জিনিসটা কি? বাবার দেওয়া দুটো পয়সা কাছে ছিল, এক পয়সার অবাক জলপান কিনিয়া খাইয়া সে সত্যিই অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এখন অণু জিনিস সে জীবনে আর কখনো খায় নাই। চাল-ছোলা ভাজা সে অনেক খাইয়াছে।

কিন্তু কি মশলা দিয়া ঠৈরী করে এই অবাক্ জলপান ?

অপু তাহাকে ডাকিয়া বাসার মধ্যে লইয়া গেল—ওরকম একলা কোথাও যাস্ নে থাকা । হাবিবে যাবি কি, কি হবে । যাওয়ান্ন দরকার নেই ।

কাজলের ঝংস্প কাটিয়া গিয়াছে । আর দাদামশায়ের বকুনি খাইতে হইবে না, একা গিয়া দোতলার ঘবে রাত্রিতে শুইতে হইবে না, মামীমাদের ভয়ে পাতের প্রত্যেক ভাতটি খুঁটিয়া শুছাইয়া খাইতে হইবে না । একটি ভাত পাতের নিচে পড়িয়া গেলে বড মামীমা বলিত—পেয়েছ পরের, দেদার ফেল আর ছড়াও—বাবাব অন্ত তো খেতে হ'ল না কখনো ।

চেলেশাঃ হইলেও সব সময় এই বাবার খোঁটা কাজলের মনে বড ব্যক্তি ।

অপু বাসায় আসিয়া দেখিল, কে একখানা চিঠি দিয়াছে তাহার নামে—অপরচিত হস্তাক্ষর । আজ পাঁচ-ছয় দিন পত্রখানা আসিয়া চিঠির ব্যস্ত পড়িয়া আছে । খুলিয়া পড়িয়া দেখিল একজন অপরচিত ভদ্রলোক তাহাকে লিখিতেছেন, তাহার বই পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, শুধু তিনি নহেন, তাঁহার বাড়িসুদূর সবাই—প্রকাশকের নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া এই পত্র লিখিতেছেন, তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন ।

৩-তিনবাব চিঠিখানা পড়িল । এতদিন পবে বোঝা গেল যে অন্ততঃ একটি লোকেবও ভাল লাগিয়াছে তাহার বইখানা ।

পবেব প্রশংসা শুনিতে অপু চিবকালই ভালবাসে তবে বহু দিন তাহার অদৃষ্টে সে ভিনিষটা জোটে নাই—প্রথম যোবনেব সেই সরল হামবড়া ভাব বশসেব অভিজ্ঞতার ফলে দুব হইয়া গিয়াছিল, তবুও সে আনন্দেব সহিত বন্ধুবান্ধবেব নিকট চিঠিখানা দেখাইয়া বেড়াইল ।

পরের দিন কাজল চিঠিয়াখানা দেখিল, গডের মাঠ দেখিল । মিউজিয়ামে অধুনানুপু সেকালের কচ্ছপের প্রস্তরীভূত রহৎ খোলা দুটি দেখিয়া সে অনেকক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল । পরে অপু ফিবিয়া খাইতেছে, কাজল বাবাব কাপড ধবিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া বলিল—শোন বাবা ।—কচ্ছপ দুটোর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আচ্ছা এ দুটোব মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় তবে কে জেতে বাবা ?...অপু গম্ভীর মুখে ভাবিয়া ভাবিয়া বলে—ওই বাঁ দিকেবটা জেতে ।—কাজলের মনের দ্বন্দ্ব দুব হয় ।

কিন্তু গোলদীঘিতে মাছেব ঝাঁক দেখিয়া সে সকলের অপেক্ষা খুশী । এত বড বড মাছ আর এত এক সঙ্গে ' মেলা চেলেশেয়ে মাছ দেখিতে জুটিয়াছে । বৈকালে সেও বাবার কথায় এক আসাব মুড়ি কিনিয়া জলে ছড়াইয়া দিয়া অধীর আগ্রহে মাছের খেলা দেখিতে লাগিল । তুমি ছিপে ধরবে বাবা ? কত বড বড মাছ ? অপু বলিল—চূপ চূপ—ও মাছ ধরতে দেয় না

ফুটপাতে একজন ভিখারী বসিয়া । কাজল ভয়ের সুরে বলিল—শিগগির

একটা পয়সা দাও বাবা, নইলে ছুঁয়ে দেবে। তাহার বিশ্বাস—কলকাতার যেখানে ২৩ ভিখারী বসিয়া আছে ইহাদের পয়সা দিতেই হইবে, নতুবা ইহারা আসিয়া ছুঁইয়া দিবে, তখন তোমাকে বাড়ি ফিরিয়া শান করিতে হইবে সন্ধ্যাবেলা কাপড় ছাড়িতে তখন হইবে—সে এক মহা হাজারী।

বয়াকালের মাঝামাঝি অপূর্ব চাকরিটি গেল। অথো এমন কষ্ট সে অনেক দিন ভোগ কবে নাই। ভাল স্থলে দিতে না পারিয়া সে ছেলেকে কর্পোরেশনের ফ্রি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ছেলেকে দু' পয়সা দিতে পাবে না, ভাল কিছু খাওয়াইতে পাবে না। বইয়ের কিছু খায় নাই। হাত এদিকে কপর্দকশূন্য।

কাজলো মশো অল্প একটা পুথক ডগং দেখিতে পায়। ছাটা টিনের চাকতি, গোটা দুই ম'বেল, একটা কল টোপা খেলনা, মোটর গাড়ি, শান 'ই বট—হইতে যে মানুষ কিসে এত আনন্দ পায়—অল্প তাহা বুঝিতে পারে না। চঞ্চল ও দুর্ভিক্ষে—পাছে হাশইয়া যায়, এত ভয়ে অল্প তাহাকে মাঝে মাঝে ঘবে চাবি দিয়া রাখিয়া নিভেব কাছে বাহির হইয়া যায়—এক একদিন চাব পাঁচ ঘণ্টাও হইয়া যায়—কাজলের কোনো অসুবিধা নাই—সে বাস্তব পাবেন জানালাটার ষাঁড়ইয়া পের লোকজন দেখিলে—না হয়, বাবাব বইগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া ছবি দেখিতেছে—মোটর উল্লস আনন্দে আছে।

এই বিরাট নগরীর ভাবনামাত্রে কাজলের কাছে অজানা হইয়া। কিছু তাহার নবীন মন ও নবীন চক্ষু—সকল জিনিস দেখে ও দেখিয়া আনন্দ পায়—বয়স্ক লোকের দ্বারা নীতিগত তাহা অতি দূর হইয়া গিয়া দিয়া দেখাইয়া বলে—দাদাশো বাবা, ওই চিলটা একটা কিসের ভাল মুখে কবে নিয়ে থাকিল, সামনের ছাদের আলসেতে গেলে ভালগা—ওই দাদাশো বাবা রাস্তায় পড়ে গিয়েছে—

বাবাব সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া এত রাম, মোটর, লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে কোদায় একটা কাক ফুটপাথের ধারে ধুনের ভলে দান ইকবিত্তেছে তাই দেখিয়া তাহার মহা আনন্দ—তাহা তাহার বাবাকে না দেখলে কীভাবে মনে হুপি হইবে না। সব বিষয়েই বাবাকে আনন্দের ভাগ না দিতে পারিলে কাজলের আনন্দ দু' হয় না। বাইতে বাইতে বেড়ানিটা, কি তেলে-ভাজা কচুপিখানা এককায় হইয়া ভাল লাগিলে বাবাকে আনন্দান বাবার মুখে শুভিলা দিবে—অপু তাহা তখনি খাইয়া ফেলে—ছিঃ আমাব মুখে দিতে নেই—একথা বলিতে তার প্রাণ কেমন করে—কাজেই পিতৃভ্রের গান্ধীমতরা বাবদান অকারণে গড়িয়া উঠিয়া পিতা-পুত্রের সহজ সরল মৈত্রীকে বাধাদান করে নাই, কাজল ভাবনে বাবার মত মছর পায় নাই—এবং অপুও বোধ হয় কাজলের মত বিশ্বস্ত ও একান্ত নির্ভরশীল তরুণ বন্ধু খুব বেশী পায় নাই ভাবনে।

আর কি সরলতা!...পথে হরত হুজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কাজল

বলিল—শোনো বাবা একটা কথা—শোনো, চুপি চুপি বলব—পরে পথের এদিক ওদিক চাহিয়া লাড়ুক মুখে কানে কানে বলে—ঠাকুর বড় ছোটোখানি ভাত ছায় হোট্টেলে আমায় খেয়ে পেট ভরে না—তুমি বলবে বাবা ? বললে আদ্য ভট্টো দেবে না ।

দিনক এক গলি একটা হোট্টেলে তিতাপুত্র তখনে যায়—হোট্টেলের ঠাকুর হয়ত শহবেব ছেলের হিসেবে ভাত দেয় কাড়লকে—কিন্তু পাণ্ডারগায়ের ছেলে কাড়ল বয়সেব অতপাতে দুটি বেশী ভাতই খাইয়া পাকে ।

অপু মনে মনে হাসিয়া ভাদে—এই কথা আবার কানে কানে বলা ।... রাস্তায় মনো ওকে সেনেই বা কে খার শুনছেই বা কে ।... ছেলেটা বেজায় বোকা ।

আব একদিন কাড়ল লাড়ুক মুখে বলিল—বাবা একটা কথা বলব ?...

—কি ?

—নাঃ বাবা—বলব না—

—ব-না কি ?

কাড়ল সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি লাড়ুক সুবে বলিল—তুমি মদ খাও বাবা ?

অপু বিস্মিত হইয়া বলিল—মদ . কে বলেছে তোকে ?

—সেই যে সেদিন খেলে ? সেই রাস্তায় ঘোড়ে একটা দোকান থেকে ? পান কিনলে আর সেই যে—

অপু প্র মনে অবাক হইয়া গিয়াছিল—পরে বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—দ্যা বোকা—সে হলো লেমনেড—সেই পানের দোকানে তো ?...তোমার ঠাণ্ডা লেগেছিল বলে তাকে দিই নি।...খাওয়া'র তোকে একদিন, ও একসকল মিষ্টি শবৎ । দূর—

কাড়লের কাছে অনেক ব্যাপার শ্রিত্য হইয়া গেল । কলিকাতায় আসিয়া সে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল যে এখানে মোড়ে মোড়ে মদের দোকান—পান ও মদ এক সঙ্গে বিক্রয় হয় প্রায় সর্বত্র । সেও লেমনেড সে কখনো দেখে নাই ইহাও আগে, জানিত না—কি কথিয়া সে শ্রিয়া লইয়াছে বোতলে ওগুলো মদ । তাই তো সেদিন বাবাকে খাইতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল—এত দিন লজ্জায় বলে নাই । সেই দিনই অপু তাহাকে লেমনেড খাওয়া তাহার ভ্রম বুচাইয়া দিল ।

এই অবস্থায় একদিন সে বিমলেন্দু পত্র পাইল, একবার আলিপুরে লীলার ওখানে পত্রাঠা আসিতে । লীলার ব্যাপার সুবিধা নয় । তাহাও অর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয় । নিজের যাহা কিছু ছিল গিয়াছে, আব কেহ দেয়ও না, বাপের বাড়িতে তাহার নাম কবিবার পয়স্তু উপায় নাই । ইদানিং তাহার মা কানী হইতে তাহাকে টাকা পাঠাইতেন । বিমলেন্দু নিজের খরচ হইতে বাচাইয়া কিছু টাকা দিদির হাতে দিয়া যাইত । তাহার উদার মুষ্টি এই যে,



লীলা বডমানুষের মেয়ে, কষ্ট করা অভ্যাস নাই, হাত ছোট করিতে জানে না।

এই রকম কিছুদিন গেল। লীলা যেন দিন দিন কেমন হইয়া যাইতেছিল। অমন হাস্যময়ী লীলা, তাহার মুখে হাসি নাই, মনমরা বিষম ভাব। শরীবও যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে। গত বধাকাল এই ভাবেই কাটে, বিমলেন্দু পূজার সময় পৌড়াপৌড়ি করিয়া ডাক্তার দেখায়। ডাক্তার বলেন, থাইসিসের সূত্রপাত হইয়াছে, সতর্ক হওরা দরকার।

বিমলেন্দু লিখিয়াছে—লীলার খুব অর। ভুল বকিতেছে, কেহই নাই, সে একা ও একটি চাকর সারাবাত জাগিয়াছে, আগ্নীয়স্বজন কেহ ডাকিলে আসিবে না, কি করা যায়। এ অবস্থায় অপু এখানে আশ্রয়লাভ তত আসিতে পারে না, অনেকদিন লীলাকে দেখে নাই। লীলার মুখ যেন রাঙা, অস্বাভাবিকভাবে বাঙা ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

বিমলেন্দু শুকনুখে বলিল—কাল বয়ুয়ার মুখে খবর পেয়ে এসে দেখি এই অবস্থা। এখন কি করি বলুন তো? বাড়ির কেউ আসবে না, আমি কাউকে বলতেও যাব না, মাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দেব?

অপু বলিল—মা যদি না আসেন?

—কি বলেন? এতুণি ছুটে আসবেন—দিদি-অন্ত প্রাণ তাঁর। তিনি যে আজ চার বছর কলকাতামুখো হন নি, সে এই দিদির কাণ্ডই তো। মুঞ্চিল হয়েছে কি জানেন, কাল ব'তেও বকেছে, শুধু দুকা দুকা, অচত তাকে আনানো অসম্ভব।

অপু বলিল,—আব এক কাজ করতে হবে, একজন নাস আমি নিয়ে আসি ঠিক হবে। মেয়ে মাগুষের নাসি পুরুষকে দিয়ে হয় না। বসো তোমরা। দুই তিন দিনে সবাই মিলিয়া লীলাকে সাবাইয়া তুলিল। জ্ঞান হইলে সে একদিন কেবল অপুকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া কাছে ডাকিয়া ক্ষণ সুরে বলিল—কখন এলে অপু?

রোগ হইতে উঠিয়াও লীলার দ্বাস্তা ভাল হইল না। শুইয়া আছে তো শুইয়াই আছে, বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে। মাপার চুল উঠিয়া যাইতে লাগিল। আপন মনে গুম হইয়া বসিয়া থাকে, ভাল করিয়া কথাও বলে না, হাসেও না। কোথাও নড়িত চহিতে চায় না। ইতিমধ্যে কাশী হইতে লীলার মা আসিলেন। বাপের বাড়ি থাকেন শোভ মোটরে আসিয়া দু তিন ঘণ্টা থাকেন—অ'বার চলিয়া যান। ডাক্তার বলিয়াছে, দ্বাস্তাকর জয়গায় না লইয়া গেলে রোগ সারিবে না।

হুপুর বেলাটা—কিছু একটু ঘেঘ করার দরুন নৌদ্র নাই কোথাও। অপু লীলার বাসায় গিয়া দেখিল লীলা জানালা দ্বারে বসিয়া আছে। সে সব দরুন আসিতে পারে না, কাজলকে একা বাসায় রাখিয়া আসা চলে না। ভারী চঞ্চল, ও রীতিমত নির্বোধ ছেলে। তাহা ছাড়া রান্নাবান্না ও সমুদ্র কাজ

করিতে হয় অপুর, কাকলকে দিয়া কুটাগাছটা ভাঙিবার সাহায্য নাই, সে
বেলাখুলা লইয়া সারাদিন মহাবাস্ত—অপু তাহাকে কিছু করিতে বলেও না
ভাবে—আহা, খেলুক একটু। পুণ্ডর মাদারলেস্ চাইল্ড।

সীলা স্নান হাসিয়া বলিল—এস।

—এরা কোথায়? বিমলেন্দু কোথায়? মা এখনও আসেন নি?

—বসো। বিমলেন্দু এই কোথায় গেল। নাস' তো মিচে, বোধ হয় খেয়ে
একটু ঘুমুচ্ছে।

—তারপর কোথায় যাওয়া ঠিক হ'ল—সেই ধরমপুনেই? সঙ্গে যাবেন কে—

—মা আর বিমল।

খানিকক্ষণ একনেই চুপ করিয়া রহিল। পরে সীলা তাহার দিকে ফিরিয়া
বলিল—আচ্ছা অপু, বর্ধমানের কথা মনে হয় তোমার?

অপু ভাবিল, কি হয়েছে গিয়েচে লীলা।

মুখে বলিল—মনে থাকবে না কেন—খুব মনে আছে।

সীলা অশ্রুমনস্কভাবে বলিল—তোমরা সেই ওদিকের একটা ঘরে থাকতে—
সেই আমি যেতুম—

—'রুমি' নামকে একটা ফাউন্টেন পেন দিয়েছিলে মনে আছে সীলা? তখন
ফাউন্টেন পেন নতুন উঠেছে।—মনে নেই তোমার?

সীলা হাসিল।

অপু হিসাব করিল। বলিল—তা ধর প্রায় আশ্বইশ বাইশ বছর আগেকার
কথা।

সীলা খানকটা রূপ কাবয়া থাকিয়া বলিল—অপু, কেউ মোটরটা কিনবে
বলেতে পারো, তোমার সঙ্গীনে আছে?

সীলাব অত সাপের গাড়িটা...এত কষ্টে পড়িয়াছে সে।—

সীলা বলিল—আমি সে সব গ্রাহ্য করি নে কিন্তু মা-ও ভাবেন—যাক সে সব
কথা। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে অপু?

কোথায়?

—খানেক হোক। তোমার সেই পোতো প্লাতায়—মনে নেই, সেই যে
সমুদ্রের মধ্যে কোন ডুবো জাহাজ উদ্ধার করে বসেছিলে সোনা আনবে? সেই
যে 'মুকুলে' পড়ে সলেছিলে?

কথাটা অপু মনে পড়িল। হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ সেই—ঠিক। উঃ, সে কথা
মনে আছে তোমার।

—আমি বলেছিলাম, কেমন করে যাবে? তুমি বলেছিলে, জাহাজ কিনে
সমুদ্রে যাবো।

অপু হাসিল। শেষবের সাধ-আশার নিষ্ফলতা সত্ত্বেও সে কি একটা বলিতে
খাইতোছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, সীলাও এ ধরনের নানা
আশা পোষণ করিত, বিদেশে যাইবে, বড় আর্টিস্ট হইবে ইত্যাদি—ওর সামনে

আর সে কথা বলার আবশ্যক নাই।

কিন্তু লীলাই আবার খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যাবে না? যাও
যাও—পরে—হি-হি করিয়া হাসিয়া কেমন একটা অদ্ভুত সুবে বলিল—সমুদ্র
থেকে সোনা আনবে তো তোমাবাই—পোতোঁ প্লাতা থেকে, না? ...জাখো,
এখনও ঠিক মনে কবে বেবেছি—রাখি নি? হি-হি—একট, চা
যাবে?

লীলার মুখে শোণ হাসি ও তাহার বাঁখনীশাশী উদ্ভ্রান্ত আলগা পরনের
কথাবাতী অপুর বুকে তীক্ষ্ণ তীব্রের মত বিঁটল। সঙ্গে সঙ্গে বুকিল এত
ভালবাসে নাই যে লীলাকে আর কোনো দিন আশ্রিত বাসিয়াছে।

—হুপুর বেলা চা খাব কি?—সেজন্তো বাস্তব হইয়া না লীলা।

লীলা বলিল—তোমাব মুখে সেই পূর্ণনা গানটা শুনি নি অনেকদিন—সেই
‘আমি চঞ্চল হে’—গাও তো?

মেঘলা দিনেব হুপুর। বাহিরের দিকে একটা সাহেব-বাড়ির কম্পাউণ্ডে
গাছেব ডালে অনেকগুলি পাখি কলবব করিতেছে। অপু গান আবিস্ক করিল,
লীলা জানালাব ধবংসেই বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ বাকিয়া গানটা শুনিতে
লাগিল। লীলার মনে অনেক দিনাব জন্য অপু গানটা হৃদয়বিরত করিয়া
ফিরাইয়া গাছিল। গান শেষ হইয়া গেল, তবু লীলা জানালাব বাহিরেই
চাহিয়া আছে। অনামনমনাবে যেন কি চিনিস লক্ষ্য করিতেছে

খানিকক্ষণ কানিয়া গেল। এতদৈই ২' করিয়া ছিল। হঠাৎ লীলা বলিল—
একটা কথাব উত্তর দেবে?

লীলাব গলাব ধরে অপু বিড়িত হইল। বলিল—কি কথা?...

—আচ্ছা, বেঁচে লাভ কি?

অপু এ প্রশ্নেব জন্য প্রস্তুত ছিল না—বলিল—এ কথাব কি—এ কথা কেন?

—বল না?...

—না লীলা। এ ধরনের কথাবাতী কেন? এত দরকার নেই।

—আচ্ছা, একটা সত্য কথা বলবে?...

—কি বল?...

—আচ্ছা, আমাকে লোকে কি চাবে?

সেই লীলা। তাহার মুখে এরকম প্রবল ধরনের কথাবাতী, সে কি কখনও
স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল। অ, এক মুহূর্তে সব বুকিল—অভিমানিনী তেজস্বিনী
লীলা আর সব সজ্ঞা করিতে পারে, লোকের জন্য তাহার অসহ্য। গত কয়েক
বৎসরে ঠিক তাহাটী জুটিয়াছে তাহার কপালে। এতদিন সেটা বোঝে নাই—
মস্ত্রীতি বৃদ্ধিয়াছে—জীবনের উপর তান হারাষ্টতে বাসিয়াছে।

অপুর গলাব যেন একটা প্লেয়া আটকাইয়া গেল। সে যতদূর সম্ভব সহজ
দুরে বলিল—এ ধরনের কথা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন লীলার কাছে বলে
নাই, কোনো দিন না—জাখো লীলা, অন্য লোকের কথা জানি নে, তবে

আমার কথা শুন্বে ?... আমি তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বড় তো ভাবিই—
—অনেকের চেয়ে বড় ভাবি— তোমাকে কেউ চেনে নি, চিনলে না, এই কথা
ভাবি।—আজ নয় লীলা, এতটুকু বেলা থেকে তোমায় জানি, অন্য লোকেরা
ভুল করতে পারে, কিন্তু আমি—

লীলা খেন অবাঞ্ছিত হইয়া গেল, কখনও সে এরকম দেখে নাই অপুকে। সে
জিজ্ঞাসা করিতে গাঠিতেছিল—সত্যি বলছ ? কিন্তু অপূর মুখ দেখিয়া হয়ত
বুকিল প্রশংসা প্রদান করিল। পরক্ষণেই খেয়ালী অপ, আর একটা কাজ করিয়া
বসিল—এটাও সে ইচ্ছা খাণ্ডে কখনো করে নাই—লীলার খুব কাছে সরিয়া
গিয়া ত-তান হাতখানা নিজের হাতের মতো লইয়া লীলাকে নিজের দিকে
টানিয়া তার মুখ ফিরাইল। পরে গভীর হেহে তার উত্তপ্ত ললাটে, কানের
পাশের চূর্ণ কৃষ্ণলোহিত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়ভাবে বলিল—তুমি আমি ছেলে-
বেলায় সাথী, লীলা—আমরা কেউ কাউকে ভুলব না—কোনো অবস্থাতেই
না। এতদিন ভুলি নি ও কখনো লীলা।

লীলা সাগরেই শিহরিয়া উঠিল...হ্যাঁ আজ অপূর মুখে, কথার সুরে ডাগর
চোখের অক্ষয় দৃষ্টিতে পাইল—জীবনে কোনোদিন ক'হাবও কাছ হইতে
তাহা সে কখনও পায় নাই—আজ সে দেখিল অপকে সে চিরকাল ভালবাসিয়া
আসিয়াছে—বিশেষ করিয়া অপের মাতৃবিয়োগের পর লালদীঘির সামনের
ফুটপাথে তাকে যেদিন শুষ্ক নিবাসের ভাবে বেড়াইতে দেখিয়াছিল—সেদিনটি
হইতে।

...অপূর চমক ভাঙিল—লীলা কখন তাহাব বন্ধে মুগ্ধ লুকাইয়াছিল—তাহার
অশ্রুপ্লাবিত, পাণ্ডুর মুখখানি।

অপূ বাহিরে চলিয়া আসিল—সে অনুভব করিতেছিল লীলার মত সে
কাহাকেও ভালোবাসে না—সেই গভীর অনুকম্পামিহীন ভালবাসা, যা
মানুষকে সব ভুলাইয়া দেয় আত্মবিসর্জনে প্রণোদিত করে।

লীলাকে যে কাবয়াই হউক সে সুখী করিবে। লীলাকে এতটুকু কষ্টে
পড়িতে দিবে না, নভেকে ছোট ভাবিতে দিবে না। তাহাব ইচ্ছা লীলাকে
চাডুক, সে লীলাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে লীলাকে কোথাও লইয়া
যাইবেই—এ অবস্থায় কলিকাতায় থাকিলে লীলা বাঁচিবে না। বিশ্ব একদিকে
—লীলার মুখের অনুবেশ খাব একদিকে।

সাগরপাশে ভাবিতে ভাবিতে ফিঙ্গিল।

দিন তিনেক পরে।

বেলা আটটা। অপূ সকালে হান সাথিয়া কাজলকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে
বাহির হইবে—এমন সময় মিঃ লাহিড়ীর ছোট নাতি অরুণ ঘবে ঢুকিল।
এককোণে ঢাকিয়া লইয়া চুপি চুপি উত্তেজিত সুরে বলিল—শিগ্গির আসুন,
দ্বিদি কাল, রাত্রে বিষ খেয়েছে।

বিষ। সর্বনাশ।—লীলা বিষ খাইয়াছে।

কাজলকে কি কবা যায়?—খোকা তুই—বরং—ঘরে থাক একা। আমি একটা কাজে যাচ্ছি। দেবি হবে ফিবতে।

কিন্তু কাজলের চোখে ধূলা দেওয়া অত সহজ নয়। কেন বাবা? কি কাজ কোথায়? কত দেরি হইতে পাবে?...কোনমতে ভুলাইয়া তাহাকে রাখিয়া দুজন চ্যাঙ্গি ধবিয়া লীলাব বাসায় আসিল। আরও দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। চুকিতেই লীলাদের বাড়ির ডাকার রক্ত কেদারবাবু সঙ্গে দেখা। একণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি অবস্থা এখন?

কেদারবাবু বলিলেন—অবস্থা তেমনি। খাব একটা ইনজেক্শন করেছি। হিলক্কু সাহেব এলে যে বুঝতে পারি। অপূর্ব প্রস্নের উত্তরে বলিলেন—বড্ড স্যাড্‌ ব্যাপার—বড্ড স্যাড্‌। তিনিসটা? মরফিয়া। রাত্রে কখন খেয়েছে, তা তো বোঝা যায় নি, আজ সকালে তাও বেলা হলে তবে টের পাওয়া গেল। কণ্ঠে হিলক্কুকে হানতে লোক গিয়েছে—তিনি না আসা পর্যন্ত—অক্লান্ত সঙ্গে সঙ্গে উপরের সেই ঘরটাতে গেল—মাত্র দিন তিনেক আগে যেটাতে বসিয়া সে লীলাকে গান শুনাইয়া গিয়াছে। প্রথমটা কিন্তু সে ঘরে চুকিতে পারিল না, তাহার হাত কাঁপিতেছিল পা কাঁপিতেছিল। ঘরটা অন্ধকার, জানালার পদাঙ্গুলো বন্ধ, ঘরে বেশী লোক নাই, কিন্তু বাবান্নাতে আট দশজন লোক। সবাই পদ্মপুকুরের বাড়ি।—সবাই চুপি চুপি কথা কহিতেছে, পা টিপিয়া টিপিয়া ইঁটতেছে। কিছু বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিয়াছে এখানে, এমন বলিয়া কিন্তু অপূর্ব মনে হইল না। অথচ একজন পৃথিবীর সুখকে এত ভালবাসিত, আকাজ্জা কবিত, আশা করিত—উদ্দেশ্য মুখ বাকাইয়া পৃথিবী হইতে দীরে দীরে বিদায় লইতেছে।

সেদিনকার সেই জানালার পাশের লাটেই লীলা শুইয়া। সংজ্ঞা নাই, পাণ্ডুর, কেমন যেন বিবর্ণ—ঠোট ঈষৎ নীল। একখানা হাত বাটের বাহিরে ঝুলিতেছিল—সে তুলিয়া দিল। গায়ে রেশমের বরফি-কাটা বিলাতী লেপ।
কি অপূর্ব যে দেখাইতেছে লীলাকে!... মরণাহত যত্নাপাত্তুর মুখেব মৌল্য যেন এ পৃথিবীর নয়—কিংবা হরিদ্রাভ হাতীর দাঁতে খোদাই মুখ যেন। দেবীর মত সৌন্দর্য আরও অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার মনে হইল লীলা ঘামিতেছে। তবে বোধ হয় আর ভয় নাই, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। চুপি চুপি বলিল—ঘামছে কেন?

ডাক্তারবাবু বলিলেন—ওটা মরফিয়ার সিম্‌টম্‌।

মিনিট-দশ কাটিল। অপূর্ব বাহিরের বাবান্নাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের ঘরে লোকেবা একবার চুকিতেছে, আবার বাহির হইতেছে, অনেকই আসিয়াছে, কেবল মিঃ লাহিড়ী ও লীলার মা নাই। মিঃ লাহিড়ী দার্জিলিং—এ, লীলার মা মাত্র কাল এখান হইতে বর্ধমানে কি কাজে গিয়াছেন। লীলা সত্যিই অভাগিনী।

এমন সময় নীচে একটা গোলমাল। একখানা গাড়ীর শব্দ উঠিল। ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন—তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন, পিছনে কেদারবাবু ও বিমলেন্দু। অনেকই ঘরে ঢুকিতে খাইতেছিল, কেদারবাবু নিষেধ করিলেন। মিনিট সাতেক পরে ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—Too late, কোনও আশা নাই।

আবও আধঘণ্টা। এত লোক।—অপু ভাবিল, ইহারা এতকাল কোথায় ছিল?—আজ too late! too late!...

লীলা মাথা গেল বেলা দশটায়। অপু তখন খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ লীলা চোখ বুজিয়াই ছিল, সে সময়টা হঠাৎ চোখ মেলিয়া চাহিল—তাবাণ্ডা, বড বড, তাহার দিকেও চাহিল, অপু দেহ বিতাণ্ড খেলিয়া গেল—লীলা তাহাকে চিনিয়াছে বোঝ হয়।...কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল—দৃষ্টি অর্থহান, আভাহান, উদাসীন, অস্বাভাবিক। তাবপরই লীলা যেন চোখ তুলিয়া কড়িকাঠে, সেখান হইতে আরও অস্বাভাবিকভাবে মাথার শিয়রে কার্নিসের বিটের দিকে ইচ্ছা করিয়াই কি দেখিবার জন্য চোখ খুঁটাইল—স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওপকম চোখ খুঁটাইতে পারে না।

তার পরেই সবাই ঘবেব বাহির হইয়া আসিল। কেবল বিমলেন্দু ছেলে-মাংসের মত চাংকাব করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অপুও ফিবি। (হায়বে বাপ, হায় পুণা! কে মানদণ্ডে তৌল করিবে? মূখ...মূখ...মূখ...মূখ...লীলার বিচাব করিবে কে? এই সব মূখের দল? তুংখের মধ্যে তাহা হাঁস আসিল।)

অপরাজিত

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কাঙাল এই কয়মাসেই বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। বাড়িতেই পড়ে—অনেক সময় নিজেই বই বাবিয়া বাবাব বংগুলিব পাতা উল্টাইয়া দেখে। আজকাল বাবা কি কাঙে প্রায় সদাই বাহিবে বা হরে ঘুবিয়া বেড়ায়, এই জন্য বাবার কাঙও সে অনেক করে।

বাসায় অনেকগুলো বিড়াল জুটিয়াছে। সে যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন ছিল একটা মাত্র বিড়াল—এখন জুটিয়াছে আরও গোটা তিন। কাঙাল খাইতে বসিলেই পাতের কাছে সবগুলো আসিয়া ছোটে। তাহারা ভাত খায় না, খায় শুধু মাছ। কাঙাল প্রথমে ভাবে কাছকেও সে এক টুকরাও দিবে না—করুক মিউ মিউ। কিন্তু একটু পরে একটা অল্প বয়েসের বিড়ালের উপর বড দয়া হয় এক টুকরা তাহাকে দিতেই অন্য সবগুলো করুণসুরে ডাক শুরু করে—কাঙাল ভাবে—আহা, ওরা কি বসে বসে দেখবে—দিই ওদেরও একটু একটু। একে ওকে দিতে কাঙালের মাছ প্রায় সব ফুরাইয়া যায়। বাঁড়ুখোদের ছেলে অনু একটা বিড়ালছানাকে রাস্তার উপর দিয়া ইঞ্জিন যায়, ওরই তলায় ফেলিয়া

দিয়াছিল—ভাগো সেটা যবে নাই—যে ইঞ্জিন চালায়, সে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া ফেলে। কাজল আজকাল একটা কেরোসিন কাঠের বাস্কে বিডালগুলির থাকিবার জায়গা কবিয়া দিয়াছে।

রাত্রে শুইয়াই কাজল অমনি বলে,—গল্প বল বাবা। আচ্ছা বাবা, ওই যে বাস্তায় ইঞ্জিন চালায় যাগ, ওয়া কি এখন হয় থামাতে পাবে, যেদিকে ইচ্ছে চালাতে পাবে? সে মাঝে মাঝে গলিব মুখে দাঁড়াইয়া বড় বাস্তায় ধীরে ধীরে চালাইতে দেখিয়াছে। যে লোকটা চালায় তাহার উপর কাজলের মনে মনে হিংসা হয়। কি মজা ওই কাজ করা। যখন খুশি চালানো, যতদূর হয়, যখন খুশি থামানো। মাঝে মাঝে সিটি দেয়, একটা চাকা বসিয়া বসিয়া ঘোড়ায়। সব চুপ কবিয়া আছে, সামনের একটা ডাঙা বেই টোপে অমনি ঘটাং ঘটাং বিকট শব্দ।

এই সময়ে অপুর হঠাৎ অসুখ হইল। সকালে অন্য দিনের মত আর বিচানা হইতে উঠিতেই পারিল না—বাবা সকালে উঠিয়া মাতৃব পাতিয়া বসিয়া তামাক খায়। কাজলের মনে হয় সব ঠিক আছে—কিন্তু আজ বেলা দশটা বাজিল, বাবা এখনও শুইয়া—জগৎটা আর যেন স্থিতিশীল নয়, নিভা নয়—সব কি যেন হইয়া গিয়াছে। সেই বোধ উঠিয়াছে, কিন্তু বোধের চেহারা অন্য রকম, গলিটার চেহারা অন্য রকম, কিছু ভাল লাগে না বাবাব অসুখ এই প্রথম, বাবাকে আর কখনো সে অসুস্থ দেখে নাই—কাজলের ক্ষুদ্র জগতে সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। সারা দিনটা কাটিল, বাবাব সাড়া নাই,—সংজ্ঞা নাই—অবে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া। কাজল পাউরুটি কিনিয়া আনিয়া খাইল। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কাজল পরমানন্দ পাণ্ডুর লাব দোকান হইতে তেল পুরিয়া আনিয়া লণ্ডন জালিল। বাবা তখনও সেই একমুই শুইয়া। কাজল অস্থির হইয়া উঠিল—‘তাহার কোনও খাতিজতা নাই এ সব বিষয়ে, কি এখন সে কবে? হু—একবার বাবার কাছে গিয়া ডাকিল, জবের ধোরে বাবা একবার বলিয়া উঠিল—স্টোভটা নিম্নে আয়, ধরাই খোকা—স্টোভটা অর্থাৎ সে স্টোভটা ধরাইয়া কাজলকে বাঁঝিয়া দিবে।

কাজল ভাবিল, বাবাও তো সারাদিন কিছু খায় নাই—স্টোভ ধরাইয়া বাবাকে সাবু তৈরী করিয়া দিবে। কিন্তু স্টোভ সে ধরাইতে জানে না, কি করে এখন? স্টোভটা ঘরের মেঝেতে লইয়া দেখিল তেল নাই। আবার পরমানন্দের দোকানে গেল। পরমানন্দকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পাশেই একজন নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী। ডাক্তারটি একেবারে নতুন, একা ডাক্তারখানায় বসিয়া কড়ি-বরগা গুণিতেছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে বাসায় আসিলেন, অপুকে ডাকিয়া তাহার হাত ও বুক দেখিলেন, কাজলকে ঔষধ লইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিতে বলিলেন। অপু তখন একটু ভাল—সে বাস্তসম্মত হইয়া ক্ষীণসুরে বলিল—ও পাববে না, স্নানান্তরে এখন থাক্, ছেলেকানুহ, এখন থাক্—

এই সন্দের জন্য বাবার উপরে রাগ হয় কাজলের। কোথায় সে ছেলেমানুষ, সে বড় হইয়াছে। কোথায় সে না ঘাইতে পারে, বাবা পাঠাইয়া দেখুক দিকি সে কেমন পারে না? বিশেষতঃ অপনের সামনে তাহাকে কচি বলিলে, ছেলেমানুষ বলিলে, আদর কবিলে বাবাব উপর তাহার ভারী বাগ হয়।

বাবাব সামনে সোভ শব্দ হইতে গেলে কাজল জানে বাবা বাগ করিবে, বলিবে—উঃ কবিস নে খোকা, হাত পুড়িয়ে খেলবি। সে সুরু বাগা-পাতাব এক কোণে সোভটা লইয়া গিয়া কয়েকবার চেঁচা করিয়াও সেটা ফালিতে পারিল না। অপর একবার বলিল—কি করিস্ ও খোকা, কোথায় গেলি ও খোকা?—আঃ, বাবাব জালায় অস্থির।—ঘবে আসিয়া বলিল—বাবা কি খাবে? মিছবি আর বিস্কুট কিনে আনবো? অপর বলিল—না না, সে তুই পারবি নে। আমি খাবো না কিছু। লম্বা বাবা, কোথাও যেও না ঘর ছেড়ে বাহিরে কি কোপাওয়ায়? হারিয়ে যাবি—

ইহা, সে হারাইয়া যাইবে। ছাড়িয়া দিলে সে সব ভায়গায় ঘাইতে পাবে, পুপিবীর সত্ত্ব একা ঘাইতে পাবে, বাবাব কথা শুনিতে তাহার হাসি পায়। প্রদিন সকালে উঠিয়া কাজল প্রথমে ঔষদ খানিল। বাবার জন্য ফুট-পাতে দোকান হইতে খেজুর ও কমলালেবু কিনিল। একটু দুধের দুধের দোকান হইতে আল-দেওয়া গরম দুগু কিনিয়া খানিল। দুধের বাটি হাতে ছেলে ফিলিলে অপর বলিল—কথা শুনিবি নে খোকা? দুঃ আনতে গেলি রাস্তা পার হয়ে সেই আমহার্ট স্ট্রাটের দোকানে? এখন গাড়ি ঘোড়ার বড় ভিড—যেও না বাবা—দে বাকী পয়সা।

খুচরা পয়সা না থাকায় ছেলেকে সকালে ঔষদের দ্রবের জন্য একটা টাকা দিয়াছিল। কাজল টাকায় ভাড়াইয়া ওগুলি কিনিয়াছে, নিজে মাত্র এক পয়সার বেগুনি বাইয়াছিল, (তেলে-ভাজা বাবারের উপর তাহার বেজায় লোভ) বাকী পয়সা বাবাব হাতে দেবত দিল।

অপর বলিল—একখানা পাউরুট নিয়ে আর, ওই দুধের আমি অতটা তো খাবো না, তুই অধিকটা খাটি দিয়ে যা—

—না বাবা, ওই শো আছেই হোটেল, আমি ওখানে গিয়ে—

—না, না, যেও তো রাস্তা পার হয়ে, আফিসের সময় এমন মোটরের ভিড, এ বেলা ওঁ খাও বাবা, আমি তোমাকে ওবেলা ছুটো রেখে দেবো।

কিছু দুপবেশ পর অপর আবাব খুব জব আসিল। রাত্রেব দিকে এত বাড়িল, আব কোনও সংজ্ঞা বহিল না। কাজল দোবে চাৰি দিয়া ছুটিয়া আবাব ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার আবাব আসিলেন, মাথায় জল-টির ব্যবস্থা দিলেন, ঔষধও দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে আর কেউ থাকে না? তোমরা দুজন মোটে? অসুখ যদি বাড়ে, তবে বাড়িতে টোলগ্রাম করে দিতে হবে। দেশে কে আছে?

—দেশে কেউ নেই। আমার মা তো নেই...আমি আর বাবা শুধু—

—মুশকিল। তুমি ছেলেমানুষ কি করবে? হাসপাতালে দিতে হবে তা হলে, দেখি আজ রাতটা—

কাঙলের প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতাল। সে শুনিয়াছে সেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না। বাবার অসুখ কি এত বেশী যে, হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে?

ডাক্তার চলিয়া গেল। বাবা শুইয়া আছে—শিয়রের কাছে আপভাঙ্গা ডালিম, গোটাকতক লেবু কোয়া। পালং শাকের গোড়া বাবা খাওতে ভালবাসে, বাজার হইতে সেদিন পালং শাকের গোড়া আনিয়াছিল, ঘরের কোণে চুপাডতে শুকাইতেছে—বাবা যদি আর না ওঠে? না রাখে? কাঙলের গলায় কিনের একটা ডেলা ঠেলিয়া উঠিল। চোখ ফাটিয়া জল আসিল—ছোট বারান্দাটার এক কোণে গিয়া সে আকুল হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ভগবান বাবাকে দারাহিয়া তোল, পালং শাকের গোড়া বাবাকে বাইতে না দাখিলে সে বুঝি ফাটিয়া মারিয়া যাইবে—ভগবান বাবাকে ভাল করিয়া দাও।

যেহেতু তাহার পড়িবার মাত্রটা পাতিয়া সে শুইয়া পড়িল। ঘবে লণ্ডন! জালিয়া রাখিল—একবার নাড়িয়া দেখিল কতটা তেল আছে, সাবাবাতে জলিবে কিনা। অরুকারে তাহার বড় ভয়—বিশেষ বাবা আজ নড়ে না, চড়ে না, কথাও বলে না।

দেয়ালে কিসের সব খেন ছায়া। কাঙল চক্ষু বুজিল।

মাসদেড় হইল অপু সারিয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে খাওতে হয় নাট, এহ গলিরই মধ্যে বাঁড়ুখোয়া বেশ সজ্জিতপন্ন হইছে, উহাদের এক ছেলে শাল ডাক্তার। তিনি অপু বড়িওয়ালার মুখে সব শুনিয়া গছে দেখিতে আসিলেন—ইনজেক্সনের ব্যবস্থা করিলেন, শুশ্রূষার লোক দিলেন, কাঙলকে নিজের বাড়ি হইতে খাওয়াইয়া আনলেন। উহাদের ব্যাডের সঙ্গে পূর্ব ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়া গিয়াছে।

চৈত্রের প্রথম। চাকুরি অনেক খুঁজিয়াও মিলিল না। তবে আজকাল লিখিয়া কিছু আয় হয়।

সকালে একদিন অপু যেহেতু মাত্র পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কাঙলকে পড়াইতেছে, একজন কুড়ি-বাইশ বছরের চোখে-চশমা ছেলে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে আসতে পারি? আপনারই নাম অপুবাবু? নমস্কার—

—আসুন, বসুন বসুন। কোথেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার বই পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সবাই এত মুগ্ধ হয়েছে, তাই আপনার ঠিকানা নিয়ে—

অপু খুব খুশী হইল—বই পড়িয়া এত ভাল লাগিয়াছে যে, বাড়ি খুঁজিয়া দেখা করিতে আসিয়াছে একজন শিক্ষিত তরুণ যুবক। এ তার জীবনে প্রথম।

ছেলেটি চারি দিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে, ইয়ে, এই ঘরটাতে আপনি থাকেন বুঝি ?

অপু একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, ঘরের আসবাবপত্র অতি হীন, ছেঁড়া মাত্রে পিতাপুত্র বাসিয়া পড়িতেছে। খানিকটা আগে কাজল ও সে দুজনে মুড়ি খাইয়াছে, মেকের খানিকটাতে তার চিহ্ন। সে ছেলের ঘরে সব দোষটা চাপাইয়া দিয়া মলজ্বরে বলিল—তুই এমন ঢুটু হয়ে উঠেছিস খোকা, রোজ বোত তোকে বলি খেয়ে অমন করে ছড়াবিনে—তা তোর—আর বাটিটা অমন দোবের গোড়ায়—

কাজল এ অকারণ তীব্রতাবের হেতু না বুঝিয়া কাদ-কাদ মুখে বলিল—আমি কই বাবা, তুমিই তো বাটিটাতে মুড়ি—

—আচ্ছা, আচ্ছা ধান, লেখ, বানানগুলো লিখে ফেল।

যুবকটি বলিল—আমাদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে খুব আলোচনা—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওবেলা বাড়িতে থাকবেন? ‘বিভাবরী’ কাগজের এডিটর শ্যামা-চরণবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আমি—আরও তিন-চার জন সেই সঙ্গে আসব। তিনটে? আচ্ছা, তিনটেওই ভাল।

আরও খানিক কথাবার্তার পর যুবক বিদায় লইলে অপু ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল,—উস্-স্-স্-স্ খোকা।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না বাবা—
—না বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার, রাগ ক’রো না। কিন্তু কি করা যায় বল তো?

—কি বাবা?

—তুই এগুনি ওঠ, পড়া থাক এবেলা, এই ঘরটা ঝেড়ে বেশ ভাল ক’রে সাফাতে হবে—আব ওই তোর ছেঁড়া আমাটা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে রাখ দিকি।—ওবেলা ‘বিভাবরী’র সম্পাদক আসবে—

—‘বিভাবরী’ কি বাবা?

—‘বিভাবরী’ কাগজ রে পাগল, কাগজ—দৌড়ে যা তো পাশের বাসা থেকে বালতিটা চেয়ে নিয়ে আস তো।

বৈকালের দিকে ঘরটা একরকম মন্দ দাঁড়াইল না! তিনটার পরে সবাই আসিলেন। শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—আপনার বইটার কথা আমার কাগজে যাবে আসছে মাসে। ওটাকে আমিই আবিষ্কার করেছি মশাই! আপনার লেখা গল্পটল? দিন না।

পরের মাসে ‘বিভাবরী’ কাগজে তাহার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির

হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গল্পটাও বাহির হইল। শ্রামাচরণবাবু উদ্ভ্রতা করিয়া :
পঁচিশটি টাকা গল্পের মূল্যস্বরূপ লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া আর একটা গল্প
চাহিয়া পাঠাইলেন।

অপু ছেলেকে প্রবন্ধটি পড়িতে দিয়া নিজে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া
শুনিতে লাগিল। কাজল ঝানিকটা পড়িয়া বলিল—বাবা এতে তোমার নাম
লিখেছে যে। অপু হাসিয়া বলিল—দেখেছিস খোকা, লোকে কত ভাল
বলেছে আমাকে ? তাকেও একদিন ওই একম বলবে, “ভালুশো করবি ভাল
ক’রে ব্যাল ?

দোকানে গিয়া শুনিল ‘বিভাবরী’তে প্রবন্ধ বাহির হইবার পথে খুব বই কাটি-
তেছে—তাহা ছাড়া তিন বিভিন্ন স্থান হইতে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। বই-
খানার অঙ্গ প্রস্থঙ্গ।

একদিন কাজল বসিয়া পড়িতেছে, সে ঘরে ঢুকিয়া হাত দুখানি দ্বিধা দিকে
লুকাইয়া বলিল,—খোকা, বল তো হাতে কি ?...কথাটা বলিয়াই মনে
পড়িয়া গেল, শৈশবে একদিন তাহার বাবা—সেও এমনি বৈকাল বেলাটা
—তাহার বাবা এইভাবেই, ঠিক এই কথা বলিয়াই খবরের কাগজেব মোড়কটা
তাহার হাতে দিয়াছিল। শীষনের চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুতভাবেই
আবর্তিত হইতেছে, চিরদুগ ধরিয়া। কাজল দুইয়া গিয়া বলিল,—কি বাবা
দেখি ?—পবে বাবাব হাত হইতে তিনখানা লেখা দেখিয়া বিমিত ও পুলকিত
হইয়া উঠিল। অঙ্গ ছবিওয়ালা হাববা উৎসাহ। দাদামশায়ের বইয়ে তো
এত বড়ী ছবি ছিল না ? নাকের কাছে ধরিয়া দেখিল কিন্তু তেমন পুণ্যনো
গন্ধ নাই, সেই এক অভাব।

অনেক দিন পবে হাতে পয়সা হওয়াতে সে নিজের হৃদয় একাংশ বর্জ ও
ইংরেজী মাগাজিন কিনিয়া আনিয়াছে।

পরদিন সে বৈকালে তাহার এক সাহেব বন্ধুর নিকট হইতে একখানা চিঠি
পাইয়া গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সাহেবের
বাড়ি কানাডায়, চল্লিশ-বিশাল্লিশ বয়স, নাম এম. শ্বাটন। হিমালয়ের জঙ্গলে
গাছপালা খুঁজিতে আনিয়াছে, ছবিও আঁকে। ভাঃতবনে এই দুইবার
আনিল। স্টেটসমানে তাহার লেখা হিমালয়ের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া, অপু
হোটেলে গিয়া মাস-দুই পূবে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে। এই দু-মাসের
মধ্যে দু-জনের বন্ধুত্ব খুব ঘনিষ্ঠা উঠিয়াছে।

সাহেব তাহার জন্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল। ফ্রান্সের চিলা দুট পরা,
মুখে পাইপ, খুব দীর্ঘাকার, সুগ্ৰী মুখ, নীল চোখ, কপালের উপরের দিকের চুল
ঝানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। অপুকে দেখিয়া হাসিমুখে আগাইয়া আসিল,
বলিল—দেখ, কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ও-রকম কোনদিন
হয় নি। কাল একজন বন্ধুর সঙ্গে মোটরে কলিকাতার বাইরে বেড়াতে
গিয়েছিলুম। একটা জায়গায় গিয়ে বসেছি, কাছে একটা পুকুর, ও-পারে

একটা মন্দির, এক সার বাঁশগাছ, আর তালগাছ, এখন সময় চাঁদ উঠল, আলো আর ছায়ার কি খেলা ! দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে ! মনে হল, Ah, this is the East !...the eternal East, অমন দেখি নি কখনও ।

অপু হাসিয়া বলিল—And pray, who is the Sun ?...

আশ্বাচরন হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—না, শোন, আমি কাশী যাচ্ছি, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না কিঙ । আসছে হুগোতেই বাঙলা থাকে চলো । কাশী । সেখানে সে কেমন করিয়া যাইবে । কাশীর মাটিতে সে পা দিতে পারিবে না । শত-সহস্র স্মৃতি-জড়ানো কাশী, জীবনের ভাণ্ডারের অক্ষয় সঞ্চয়—ও এক তখন তখন গিয়া নষ্ট করা যায় !...সেবার পশ্চিম যাইবার সময় মোগলদরাসে দিয়া গেল, কাশী যাইবার অত ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারিল না কেন ?...কেন, তাহা অপরকে সে কি করিয়া বুঝায় ।...

বন্ধু বলিল, তুমি জাভান এসো না আমার সঙ্গে ?...বরোবুদরের স্কেচ আঁকব, তা ছাড়া মাউন্ট শ্যালাকো বনে যাব । ওয়েস্ট জাভাতে বৃষ্টি কম হয় বলে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট তত ভ্রমকালো নয়, কিন্তু ইস্ট জাভাব বন দেবলে তুমি মুগ্ধ হবে, তুমি তো বন ভালবাস, এস না ।...

বন্ধুর কাছে লালাদের বাড অনেকদিন আগে দেখা বিস্ময়প্রিয় দাঁষ্টের সেই ছাটো । অপু বলিল—বতিচেলিব, না ?

—না । আগে বলত লিওনার্ডো—আজকাল ঠিক হয়েছে আন্থ্রোপো ডা প্রেডিস-এব, বতিচেলিব কে বললে ?

লীলা বলিয়াছিল । বেচারী লীলা ।

সপ্তাহের শেষে কিন্তু বন্ধুটির আগ্রহ ও অনুবোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে কাশী রওনা হইতে হইল । কাশীতে পবদিন বেলা বাবোটার সময় পৌছিয়া বন্ধুকে কান্টনমেন্টের এক সাহেবী হোটেলে তুলিয়া দিল ও নিজে একা করিয়া শহরে ঢুকিয়া গোপুলিয়াব মোড়ের কাছে ‘পাবতী আশ্রমে’ আসিয়া উঠিল ।

গোপুলিয়াব মোড় হইতে একটু দূরে সেই বালিকা বিছালয়টা আজও আছে । ইহারই একটু দূরে তাহাদের সেই ফুলটা । কোথায় ? একটা গলির মধ্যে ঢুকিল । এখানেই কোথায় যেন ছিল । একটা বাড়ি সে চিনিল । তাহার এক সহপাঠী এই বাড়িতে থাকিত—হু—একবার তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল । বাসা নষ্ট নিজেদের বাড়ি । একটা বাঙালী ভদ্রলোক শশা কিনিতেছিলেন—সে জিজ্ঞাসা করিল—এই বাড়িতে প্রসন্ন বলে একটা ছেলে আছে—জানেন ?—ভদ্রলোক বিশ্বাসের সুরে বলিলেন—প্রসন্ন ? ছেলে !... অপু সামলাইয়া বলিল—ছেলে না, মানে এই আমাদেরই বয়সী । কথাটা বলিয়া সে অপ্রতিভ হইল—প্রসন্ন বা সে আজ কেহই ছেলে নয়—আর তাহাদের ছেলে বলা চলে না—একথা মনে ছিল না । প্রসন্ন ছেলে—বয়সের মূর্তিই মনে আছে কিনা । প্রসন্ন বাড়ি নাই, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল নে

আজকাল চারপাঁচটি ছেলেষয়ের বাপ।

ফুলটা কোথায় ছিল চিনিতে পারিল না। একজন লোককে বলিল—
মশায়, এখানে ‘ভুভঙ্করী পাঠশালা’ বলে একটা ফুল কোথায় ছিল জানেন?

—ভুভঙ্করী পাঠশালা? কৈ না, আমি তো এই গলিতে দশ বছর আছি—

—তাতে হবে না, সম্ভবত বাইশ-তেরিশ বছর আগেকার কথা।

—এ বসাক মশায়, বসাক মশায়, আসুন একবাংটি এদিকে। একে
জিন্বেস করুন, ইনি চল্লিশ বছরের খবর বলতে পারবেন।

বসাক মশায় প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন—বিলক্ষণ! তা আর জানিনে। ঐ
হরগোবিন্দ শেটের বাড়িতে ফুলটা ছিল। ঢুকেই নিচু-মত তো! হুধারে
উঁচু রোয়াক?

অপু বলিল—হাঁ—হাঁ ঠিক। সামনে একটা চৌবাচ্চা—

—ঠিক ঠিক—আমাদের আনন্দবাবু ফুল! আনন্দবাবু মারাও গিয়েছেন
আজ আঠার উনিশ বছর। ফুলও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। আপনি এসব
জানলেন কি করে?

—আমি পড়তুম ছেলেবেলায়। তারপর কাশী থেকে চলে যাই।

একটা বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহাদের বাড়ির মোড়েই। ইহাণ্ড
তখন শোলার ফুল ও টোপের তৈরী করিয়া বেঁচত। অপু বাড়িটার মধ্যে
চুঁকিয়া গেল। গৃহিণীকে চিনিল—বলিল, আমায় চিনতে পাবেন? ঐ গলির
মধ্যে থাকতুম ছেলেবেলায়—আবাব বাবা মারা গেলেন?—গৃহিণী চিনিতে
পারিলেন। বসিতে দিলেন, বলিলেন—তোমার মা কেমন আছেন?

অপু বলিল—তাহার মা বাচিয়া নাই।

—আহা! বড় ভালমানুষ ছিল! তোমার মার হাতে—সোড়ার বোতল
খুলতে গিয়ে হাত কেটে গিয়েছিল মনে আছে?

অপু হাসিয়া বলিল—খুব মনে আছে, বাবার অসুখের সময়।

গৃহিণীর ডাকে একটি বত্রিশ-তেরিশ বছরের বিধবা মেয়ে আসিল।
বলিলেন—একে মনে আছে?...

—আপনার ষেয়ে না? উনি কি জন্মে রোজ বিকেলে জানালার ধারে
ঘাটে শুয়ে কাঁদতেন! তা মনে আছে।

—ঠিক বাবা—তোমার সব মনে আছে দেখছি। আমার প্রথম ছেলে
তখন বছর-বানেক মারা গিয়েছে—তোমরা যখন এখানে এলে। তার জন্মই
কাঁদত। আহা, সে ছেলে আজ বাঁচলে চল্লিশ বছর বয়স হ’ত।

একবার মণিকর্ণিকার ঘাটে গেল। পিতার নখর দেহের রেণু-মেশানো
পবিত্র মণিকর্ণিকা।

বৈকালে বহুক্ষণ দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া কাটাইল।

ঐ সেই নীতলা মন্দির—ওরই সামনে বাবার কথকতা হইত সে-সব দিনে—

সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ বাঙাল কণক ঠাকুরের কথা মনে হইয়া অপুর মন উদাস হইয়া গেল। কোন্ জাহ্নবে তাহার বালকহৃদয়ের তুল্লভ স্নেহটুকু সেই বৃদ্ধ চুপি কপিয়াছিল—এখন এতকাল পরেও তাহাব উপর অপূর যে স্নেহ অক্ষুণ্ণ আছে—আজ তাহা সে বুঝিল।

পরদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে সে স্নান করিতে ন মিতেছে, হঠাৎ তাহাব চোখে পড়িল একজন রজা একটা পিতলের ঘটিতে গঙ্গাজল ভর্তি করিয়া লইয়া স্নান সাফিয়া উঠিতেছেন—চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া সে চিনিল—কলিকাতার সেই জ্যাঠাইমা। সুবেশের মা।...বৎসাল সে আর জ্যাঠাইমা-দেব বাপি খান্ন নাহি, সেই নববর্গের দিনটার অপমানের পর আর কখনও না। সে আগাইয়া গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—চিনিতে পারেন জ্যাঠাইমা? আপনাবা কাশীতে আছেন নাকি আজকাল?...বৃদ্ধা খানিকক্ষণ ফাল ফাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—শিচিন্দ্রপুরের হবি ঠাকুরপোর ছেলে না? এসো এসো, চিবছাবী হও বাবা—তাব বাবা চোখেও ভাল দেখেনে তাব ওপর দেখ এই বয়সে একা বিদেশে পড়ে থাকে...ভালী-ঘটিটা কি নিায় উত্তে পারি? ভাড়াটেদের মেয়ে ওলটুকু বয়ে দেয়—তো তার আজ তিনদিন আ—

—ও, আপনিই বুঝি একলা কাশীবাস—সুনীলদাবা কোথায়?

রজা ভাবী ঘটিটা ঘাটের পাশে উৎস নামায়া বলিলেন—সব কলকাতায়, আমায় দিয়েছে ভেল করে বাবা। ভাল ঘব দেখে বিশ্বে দিলুম সুনীলের, গুপ্তপাড়া মুখুযো—ওমা, বো এসে বাবা স সাবের হ'ল কাল—সে সব বলব এখন বাবা তিন-এক এক ত্রেজেনেব গ ল—মন্দিবে ঠিক বা গয়ে—এক থাক কাকব সঙ্গে দেখাভনো হয় না। দুরেশ এসেছিল, পূজোর সময় দু'দিন ছিল। থাকতে পারে না—তুমি এসো বাবা, আমাব বাস ম আজ বিকেলে, অবিশি অবিশি।

অপু বলল—দাঁড়ান জ্যাঠাইমা, চট ক'বে ডুব দিয়ে নি, আপনি ঘটিটা ওখানে রাখুন, পৌছে দিচ্ছি।

—না বাবা, থাক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তুমি বললে এই যথেষ্ট হ'ল—বৈচে থাকো।

তবুও অপু শুনিল না, স্নান সাফিয়া ঘটি হাতে জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাহাব বাসায় গেল। ছোট এক ওলা ঘবে থাকেন—পশ্চিম দিকের ঘবে জ্যাঠাইমা থাকেন, পাশের ঘবে আব একজন প্রৌচা থাকেন—তাহাব বাড়ি ঢাকা। অন্য ঘরগুলি একটি বাঙালী গৃহস্থ ভাড়া লইয়াছেন, ষাঁদেব ছোট মেয়ের কথা জ্যাঠাইমা বলিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন—সুনীল আমাব তেমন ছেলে না। ঐ যে হাড়হাভাভে ছোটলোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলাম, সংসাবটাসুদ্ধ উছন্ন মিলে। কি থেকে শুরু হ'ল হোল। ও বছর শেষ মাসে নবান্ন করেছি, ঠাকুরঘরের বারকোশে

নবান্ন বেখে ঠাকুরদের নিবেদন করে রেখে দিইছি। দুই বাড়িকে ডাকছি। ভাবলাম ওদের একটু একটু নবান্ন মুখে দি। বোটা এমন বদমাসেস, ছেলেদের আমার ঘরে আসতে দিলে না। শিখিয়ে দিয়েছে, ৬-ঘরে খাস নি, নবান্নর চাল খেলে নাকি ওদের পেট কামড়াবে। তাই আমি বললাম, বলি হাঁ। গা বোবা, আমি কি ওদের নতুন চাল খাইয়ে। যেবে ফেলবাব মতলব করছি ? তা শুনিয়া উনিয়া বলছে, সেকলে লোক ছেলেপিলে মানুষ করার কি বোঝে ? আমার ছেলে আমি খা ভাল বুঝব করব, উনি কেন তার ওপর কথা না কঠিতে আসেন। এই সব ঝগড়া শুরু, তারপর দেখি ছেলেও তো বোবার হয়ে কথা বলে। তখন আমি বললাম, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর তোমাব সংসারে থাকব না। বো রাত্রে কানে কি মস্তুর দিয়েছে, ছেলে দেখি তাতেই বাড়ী। তাহলেই বোবা বাবা, এত করে মানুষ কবে শেষে কিনা আমার কপালে—জ্যাঠাইমাব দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ কবিত্তা জল পড়িতে লাগিল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—কেন, সুরেশদা কি বললেন না ?

—আহা, সে আগেই বলি নি ? সে শস্তবাড়ির বিষয় পেয়ে সেখানেই বাস করছে, সেই বাড়িসাহী না দিনাজপুর। সে একশালা ৭০৬ দিয়েও খোঁজ কবে না, যা আছে কি মলো। তবে আব তোমাকে বলছি কি ? সুবশ কলকাতায় থাকলে কি আব কথা ছিল বাবা ?

অপুকে খাইতে দিয়া গল্প কবিত্তে কবিত্তে তিনি বলিলেন, ও ভুলে গিয়েছি তোমাকে বলতে আমাদের নিশ্চিন্দিপুত্রে ডুবন যুক্তিমের মেয়ে লীলা যে কাশীতে আছে, জান না ?

অপু বিস্ময়ে সুরে বলিল—লীলাদি। নিশ্চিন্দিপুত্রে ? কাশীতে কেন ? জ্যাঠাইমা বলিলেন—ওব ভাসুব কি চাকরি করে এখানে। বড় কষ্ট মেয়েটাব, স্বামী তো আজ ছ'সাত বছর পক্ষাঘাতে পড়ু, বড় ছেলেটা কাজ না পেয়ে বসে আছে, আরও চাব দু'চটি ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ, ভাসুবেব সংসারে ঘাড গুঁড়ে থাকে। যাও না দেখা করে এসো আজ বিকলে, কালীতলার গলিতে চুকেই বাদিকের বাড়িটা।

বাল্যভীবনের সেই বাগুদিব বোন লীলাদি। নিশ্চিন্দিপুত্রে মেয়ে। বৈকাল হইতে অপূর দেরি সহিল না, জ্যাঠাইমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই সে কালীতলার গলি খুঁজিয়া বাহির করিল—সকল পরনের তেতলা বাড়িটা। সিঁড়ি যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমন অন্ধকার, এত অন্ধকার সে পকেট হইতে দেশলাই এর কাঠি বাহির করিয়া না আলাইয়া সে এই বেলা দুইটার সময়ও পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

একটা ছোট দুয়ার পার হইয়া সকল একটা দালান। একটি দশ বায়ে বছরের ছেলের প্রসন্ন উত্তরে সে বলিল এখানে কি নিশ্চিন্দিপুত্রে লীলাদি আছেন ? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলো গিয়ে। অপূর কথা শেষ না

হইতে পাশের ঘর হইতে নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল কে রে বোকা ? সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতলা গড়নের গৌরবর্ণ মহিলা দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরনে আধ-ময়লা শাড়ি, হাতে শাঁখা, বয়স বড়র মাইত্রিশ, মাথায় একরাশ কালো চুল। অণু চিনিলা, কাছে গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, চিনতে পার লীলাদি ?

পরে লীলা তাহার মুখের দিকে বিশ্বস্তের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং চিনিতে পারে নাই দেখিয়া বলিল, আমার নাম অণু, বাড়ি নিশ্চিন্দীপুরে ছিল আগে—

লীলা ত তঁাডি আনন্দের সুবে বলিয়া উঠিল—ও। অণু, হরিকাকার ছেলে। এসো, এসো ভাই, এসো। পরে সে অণুর চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিল এবং কি বলিতে গিয়া পরে ফিরিয়া কাদিয়া ফেলিল।

অণুও মুহূর্ত। এমন সব অণু, দুঃখিত মুহূর্তও প্রবল আসে। লীলাদির ঘনিষ্ঠ আদরতুষ্ণ অণু সারা শরীরে একটা দ্রিক আনন্দের শিহরণ আনিল। গ্রামের মেয়ে, তাহাকে ছোট দেখিরাছে, সে ছাড়া এত আপনার জনের মত অন্তরঙ্গতা ক দেখাইতে পারে ? লীলাদি ছিল তাহাদের ধনী প্রতিবেশী ভুবন মুখুয্যের মেয়ে, বয়সে ও হার অপেক্ষা অনেক বড়, অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, তার সেই গুণ্ডর বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল ও সেইখানেই থাকত। শৈশবে মাত্র দশ মাসের উত্তমের সাক্ষাৎ, কিন্তু আজ অণুর মনে হইল লীলাদির মত আনন্দের জন সাধা কাশীতে আব কেহ নাই। শৈশব-রপের সেই নিশ্চিন্দীপুর। তাইই জলে বাতাসে হৃদয়ের দেহ পুষ্টি ও বর্ধিত হইয়াছে এক দিন।

তাবৎ লীলা অণুর জন্য আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, দাল নেই পাতিল ঘরোয়া বেনা নাই, বিশেষ করিয়া পরের সংসার নিজের নহে। সে নিজেকে কাছে বসিল, কত বোঝ-বব লইল। অণুর বাবঃ সন্তোষ ছেলেকে দিয়া জলখাবার আনাংল, চা করিয়া দিল।

তাবৎ লীলা নিজের অনেক কথা বলিল। বড় ছেলেটি চৌদ্দ বছরের হইয়া মাঝা গিয়াছে, তাহার উপর সংসারের এই হৃদয়। উনি পক্ষাঘাতে পড়ু, ভাসুয্যের সংসারে দোর হইয়া থাকা, ভাসু লোক মন্দ নন, কিন্তু বড় জা—পায়ের কোটি কোটি দণ্ডবৎ। হৃদয়বৎ একশেষ। সংসারের মত উজ্জ্বল সব তাহার ঘাড়ে, আনন্দের জন কেহ কোথাও নাই, বাপের বাড়িতে এমন কেহ নাই যাহা কাছে এই দিন আগ্রহ লইতে পারে। সন্তু মাণুষ নয়, লেখাপড়া শেখে নাই, গ্রামে মুদির দোকান করে, পৈতৃক সম্পত্তি একে একে বেচিয়া খাইতেছে—তাহার উপর দুইট বিবাহ করিয়াছে, একরাশ ছেলেপিলে। তাহার নিজের চলে না, লীলা সেখানে আব কি করিয়া থাকে।

অণু বলিল—ছুটো বিয়ে কেন ?

—পেটে বিদ্যো না থাকলে যা হয়। প্রথম পক্ষের বৌয়ের বাপের সঙ্গে কি

কগড়া হ'ল তাকে জব্দ করার জন্যে, আবার বিস্ময় করলে। এখন নিজেই জব্দ হচ্ছেন, দুই বৌ ঘাড়ে—তার ওপর দুই বোয়ের ছেলেপিলে। তার ওপর রাগুও ওখানেই কিনা।

—বাগুদি? ওখানে কেন?

—তারও কপাল ভাল নয়। আজ বছর সাত-আট বিধবা হয়েছে, তার আর কোনও উপায় নেই, সতুর সংসারেই কাছে। স্বস্তুর বাড়িতে এক দেওর আছে, মাঝে মাঝে নিস্ক্রিয় যায়, বেশির ভাগ নিশ্চিন্দিপুরেই থাকে।

অপু অনেকক্ষণ ধরিয়ে রাগুদির কথা জিজ্ঞাসা করবে ভাবিতেছিল, কিন্তু কেন প্রশ্ন করিতে পারে নাই সে-ই জানে। লীলার কথাব পবে অপু অগ্ন্য-মনস্ক হইয়া গেল। হঠাৎ লীলা বলিল—দাখ ভাই অপু, নিশ্চিন্দিপুবেব সেই বাঁশবাগানের ভিটে এত মিষ্টি লাগে, কি মধু ঘে মাখানো ছিল তাতে। ভেবে দাখ মা নেই, কিছু তো নেই,—তবুও তার কথা ভাবি। সেই বাগের ভিটে আজ দেখি নি এগাবো বছর। সেবার সতুকে চিঠি লিখলাম, উত্তর দিলে এখানে কোথায় থাকবে, থাকবার ঘরদোর নেই, পুবেব দলোন ভেঙে পড়ে গিয়েছে, পশ্চিমে কুঠা-বীহুটোও নেই, ছেলেপিলে কোথায় থাকবে, —এই সব একবাশ ওজব। বল থাক তবে, ভগবান যদি মধু তুলে চান কোনদিন, দেখব—নয় বাবা বিনা। তো চরণে শেখেছেন—

আবার লীলা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অপু বলিল, ঠিক বলেছ লীলা দ, আমারও গাঁয়ের কথা এত মনে পড়ে সত্যিই, কি মধুমাখানো ছিল, তাই এমন ভাবি।

লীলা বলিল, পদ্মপাতার খাবার বাস নি কতদিন বল দিদি? এ-সব দেশে শালপাতার খাবার খেতে খেতে পদ্মপাতার কথা ভুলেই গিয়েছি, না? আবার এক একদিন এক একটা দোকানে কাগজে খাবার দেয়। সে দান আম ব মেজ ছেলে এনেছে, আমি বলি দূর দূর, ফেলে দিয়ে আস, কাগজে আবার মিষ্টি খাবার কেউ দেয় আমাদের দেশে?

অপুর সারা দেহ স্মৃতির পুলকে বেন অবশ হইয়া গেল। লীলাদি মেয়ে-মানুষ কিনা, এত খুঁটিনাটি জিনিসও মনে রাখে। ঠিকই বলে, সেও পদ্মের পাতার কতকাল খাবার খায় নাই, ভুলিয়াই গিয়াছিল কথাটা। তাহাদেব দেশে বড় বড় বিল, পদ্মপাতা সস্তা, শালপাতার রেওয়াজ ছিল না। নিমগ্নতা বাড়িতে পদ্মপাতাতে ব্রাহ্মভোজন হইত, লীলাদির কথায় আজ আবার সব মনে পড়িয়া গেল।

লীলা চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কতদিন যাসুনি সেখানে অপু? তেইশ বছর? কেন, কেন? আমি না হয় মেয়েমানুষ—তুই তো ইচ্ছা করলেই যেতে—

—তা নয় লীলাদি, প্রথমে ভাবতুম বড় হয়ে যখন রোজগার করব, মাকে নিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুরের ভিটেতে গিয়ে বাস করব, মার বড় সাধ ছিল।

যা যাত্রা যাওয়ার পরেও ভেবেছিলুম কিন্তু তার পরে—ইয়ে—

ক্লীবিন্নোগের কথাটা অপু বয়োজ্যেষ্ঠা লীলাদির নিকট প্রথমটা তুলিতে পারিল না। পরে বলিল। লীলা বলিল, বৌ কতদিন বেঁচে ছিলেন ?

অপু লাজুক সুরে বলিল—বছর চারেক—

—তা এ তোমার অগ্ন্যায় কাজ ভাই—তোমার এ বয়সে বিয়ে করবে না কেন ?... তোমাকে তো এতটুকু দেখেছি, এখনও বেশ মনে হচ্ছে—ছোট, পাতলা টুকটুকু ছেলেটি—একটি কঁপ হাতে নিয়ে আমাদের ঘাটের পথের বাঁশ ওলাপায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্—কালকের কথা কেন সব—না, না, ও কি, ছিঃ—বিয়ে কর ভাই। খোকাকে কলকাতায় রেখে এলে কেন—দেখতাম একবারটি।

লীলাও উঠিতে দেন্ন না—অপুও উঠিতে চায় না। লীলার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিল—ছেলেমেয়েগুলিকে আদর করিল। উঠিবাব সময় লীলা বলিল—কাল আসিস অপু, নেমন্তন্ন রইল—এখানে খাবি। পরদিন নেমন্তন্ন রাখিতে গিয়া কিন্তু অপু লীলাদিব পরাধীনতা মনে মনে বুঝিল—সকাল হইতে সুদৃশ্য সংসারের বাংলায় ভার একা লীলা দর উপর কেশোরে লীলাদি দেখিতে ছিল খুব ভাল—এখন কিন্তু সে লাভণোর কিছুই অবশিষ্ট নাই—তুল ৫-চার গাছা এবই মধ্যে পাকিয়াছে, শীত মুখ শিবা-বাঁহির হওয়া হাত, অশ্রুশ্রবণ শাও পরনে, রাঁধিবাব আলাদা ঘরদোর নাই, ছোট্ট দালানের তর্পেবটা দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, তাবই ও-দ্বারে রান্না হয়। লীলাদি সমস্ত রান্না সাধিয়া তার ভগ্ন মাছেব পিঁমের বড়া ভাজিতে বলিল, একবার কড়াখানা উত্তুন হাতে নামায়, আবার তোলে, আবার নামায়, আবার ভাজে। আগুনের তাতে মুখ তাব রাঙা দেখাইতেছিল—অপু ভাবিল কেন এত কষ্ট করছে লীলাদি, আহা বোজ রোজ ওর এই কষ্ট, তার ওপর আমার ডন্যে আর কেন কষ্ট করা ?

বিদায় লইবাব সময় লীলা বলিল—কিছুই করতে পারলুম না ভাই—এলি যদি এত কাল পরে, কি করি বল, পরের ঘরকন্না, পরের সংসার মাথা নিচু করে থাকি, উদয়ান্ত খাটুনিটা দেখলি তো ? কি আব করি, তবুও একটা হবে আছি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠল, বিয়ে তো দিতে হবে ? ঐ বটঠাকুর ছাড়া আর ভরসা নেই। সন্ধেবেলাটা বেশ ভাল লাগে—দশাশ্রমেঘ ঘাটে সন্ধ্যার সময় বেশ কথা হয়, পাঁচালী হয়, গান হয়—বেশ লাগে। দেখিস নি ?... আসিস না আজ ওবেলা—বেশ জায়গা, আসিস, দেখিস এখন। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।—তারপর সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল—তোদের দেখলে যে কত কথা মনে পড়ে—কি সব দিন ছিল—

এবার অপু হঠিকটে চোখের জল চাপিল।

আর একটি কর্তব্য আছে তাহাঃ কাশীতে—লীলার মায়ের সঙ্গে দেখা করা। বাঙালীটোলার নারদ ঘাটে তাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে—খুঁজিয়া

বাড়ি বাহির করিল। মেজ-বৌরানী অপুকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। চোখের জল ফেলিলেন।

কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় ঘরে একটি ছোট মেয়ে ঢুকিল—বয়স ছয়-সাত হইবে, ফ্রক-পরা কৌকড়া কৌকড়া চুল—অপু তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—লীলাব মেয়ে। কি সুন্দর দেখিতে! এত সুন্দর মানুষ হয়? স্নেহে, স্মৃতিতে, বেদনার অপু চোখে জল আসিল—সে ডাক দিল—শোন থুকী মা, শোন তো।

থুকী হাসিয়া পালাইতেছিল, মেজ-বৌরানী ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া দিলেন। সে তাব দিদিমার কাছেই কাশীতে থাকে আড়কাল। গত বৈশাখ মাসে তাহার বাবা মারা গিয়াছে—লীলাব মৃত্যুর পূর্বে। কিছু লীলাকে সে সংবাদ জানানো হয় নাই। দেখিতে অবিকল লীলা—এ বয়সে লীলা যা ছিল তাই। কেমন করিয়া অপু মনে পড়িল শৈশবের একটি দিনে বর্ধমানে লীলাদের বাড়িতে সেই বিবাহ উপলক্ষে মেয়ে মজলিসের কথা—লীলা যেখানে হাসির কবিতা আরও কবিতা সকলকে হাসাইয়াছিল—সেই লীলাকে সে প্রথমে দেখে এবং লীলা তখন দেখিতে ছিল ঠিক এই থুকীর মত অবিকল।

মেজ-বৌরানী বলিলেন—মেয়ে তো ভাল, কিন্তু বাবা, ওর কি আর বিয়ে দিতে পাব? ওর মার কথা যখন সকলে শুনবে—আব তা না জানে কে। ওই মেয়ের কি আর বিয়ে হবে বাবা?

অপু বর্ধমনিয়র ইচ্ছা হইল একটি কথা বলিবার জন্য—সেটা কিছু সে চানিয়া রাখিল। মুখে বলিল—দেখুন, বিষয় জানে ভাবছেন কেন? লেখাপড়া শিখুক, বিয়ে নাই বা হ'ল, তাতে কি? মনে ভাবিল—এখন সে কথা বলব না, খোকা যদি বাঁচে, মানুষ হয়ে ওঠে—তবে সে কথা তুলব। তাইবাব সময় অপু লীলাব মেয়েকে আবার কাছে আঁকিল। এবার থুকী তাহার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ভাগর আগর উৎসুক চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিনের বাকী সময়টুকু অপু বন্ধু সঙ্গে সান্নাধ্য দেখিয়া কাটাষ্টল। সন্ধ্যার দিকে একবার কালোতলার গলিতে লীলাদের বাসায় বিদায় লইতে গেল—কাল সকালেই এখান হইতে শওনা হইবে। নিশ্চিন্দপুরের মেয়ে, শৈশব দিনের এক সুন্দর অনন্দ-মুহূর্তের সঙ্গে লীলাদির নাম ও ডানো—বাণ বার কথা कहিয়াও যেন তাহার হৃদয় হইতেছিল না।

আসিবার সময় অপু মুখ হইল লীলাদির আন্তরিকতা দেখিয়া। তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল, আবার চিবুক ছুঁইয়া আদর করিল, চোখের জল ফেলিল, যেন মা, কি মায়ের পেটের বড় বোন। কতকগুলো কাঠের খেলনা হাতে দিয়া বলিল—খোকাকে দিস—তার জন্যে কাল কিনে এনেছি।

অপু ভাবিল—কি চমৎকার মানুষ লীলাদি!...আহা পরের সংসারে কি কষ্ট-

টাই না পাচ্ছে। মুখে কিছু বললুম না—তোষার আমি বাণের ভিটে দেখাব
লীলাদি, এই বছরের মধ্যেই।

টেনে উঠিয়া সাং পথ কত কি কথা তাহার মনে যাওয়া-যাওয়া করিতে
লাগিল। বাজঘাটের স্টেশনে টেনে উঠিল কতকাল পরে। বাংলাকালে এই
স্টেশনেই সে প্রথম জলের কল দেখে, কাশী নামিয়াই ছুটিয়া গিয়াছিল আগে
জলের কলটার কাছে। চোঁচাইয়া বলিয়াছিল দেখো দেখো মা জলের কল।
—সে সব কি আজ?

আজ কতদিন হইতে সে আর একটি অদ্ভুত জিনিস নিজের মনের মধ্যে অনুভব
করিতেছে, কি ভীষণভাবেই অনুভব করিতেছে। আগে তো সে এ রকম ছিল
না? অন্ততঃ এ ভাবে তো কই কখনও এর আগে—সেটা হইতেছে ছেলের
জন্ম মন-কেমন কথা।

কত কথাই মনে হইতেছে এই কয়দিনে—পাশের বাড়ির বাঁড়ুয়ো-গৃহিণী
কাঁচলকে বড় ভালবাসে—সেখানেই তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। কখনও
মনে হইতেন, কাঁচল যে এ ছেলে, হয়ত গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল,
কোনও বদমাইন লোকে ভুলাইয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে কিংবা হয়ত চুপি
চুপি ব... বাহির হইয়া পাশ পার হইতে যাইতেছিল মোটর চাপা
পাশিাচ্ছিল। কিন্তু তাহা হইল কি বাঁড়ুয়োবা একটা তাব কবিতা? হয়ত
তাব কবিতা, ভাল টিকানা গিয়া পৌঁছিয়াছে। উহাদের আলিসাবিহীন
নেপা চাদে ঘূড়ি উড়িতে উঠিয়া উড়িয়া যায় নাই? কিন্তু কাঁচল তো কখনও
ঘূড়ি ওড়ায় না? একটা আনাড়ি ঘূড়ি ওড়ানো কাজ একেবারে পাবে না।
না—না সে উড়ানিতে যায় নাই, তবে হয়ত বাঁড়ুয়ো বাড়ির ছেলেদের দলে
মিথিয়া টোল ছিল, আশ্চর্য কি।

আস্টে বঙ্গ কণার মধ্যে সে খানিকটা আগে বলিয়াছিল সে জাভা, বালি,
সুমাট্রা দেখিবে, প্রশান্ত মহাসাগরের ছাপপুঞ্জ দেখিবে, আফ্রিকা দেখিবে—
ওদের বিষয় লইয়া উপন্যাস লিখিবে। সাহেববা দেখিয়াছে তাদের চোখে
—সে নিজের মধ্যে দেখিতে চায় তাব মনের বঙে কোন রঙ থাওয়—ইউ-
গাণ্ডার দিক্‌দিশাহীন চূর্ণচূর্ণ, কেনিয়া অবশ্য। বড়ো বেবুন বাত্রে কর্কশ
চীৎকার করিবে, হায়েনা না পচা জীবজন্তুর গন্ধে উন্মাদেব মত হানকি হি-হি
করিয়া হাসিবে ওপরে, অগ্নিবর্ষী স্ববৌদ্রে কম্পমান উত্তাপ ভবজ মাঠে প্রান্তরে
জনহীন বনের পারে কতকগুলি উঁচুঁচু সদাচঞ্চল বাঁকা বেঁকাব সৃষ্টি করিবে।
সিংহেরা দল পাকাইয়া ছোট কণ্টকরক্ষেব এতটুকু ক্ষুদ্র ছায়ার গোলাকারে
দাঁড়াইয়া অগ্নিরষ্টি হইতে আত্মবক্ষা কবে—পার্ক গ্যাশন্যাল আলাবার্ড...wild
celery-র বন...

কিন্তু থোকা যে টানিতেছে আজকাল, কোনও জায়গায় যাইতে মন চায় না
থোকাকে ফেলিয়া। কাঁচল, থোকা, কাঁচল, থোকন ও ঘূড়ি উড়াইতে
পারে না, কিছু পারে না, কিছু পারে না, বড় নিবোধ। কিন্তু ওর আনাড়ি

সুঠাতে বৃক্কের তার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। টানিতেছে, প্রাণপণে টানিতেছে—
—চোট ছবল ছাউ ছুটি নির্দলভাবে মুচড়াইয়া সরাইয়া লওয়া? সবনাশ।
খামা চাপা থাকুক বিদেশ যাত্রা।

টোন হ-হ চলিতেছে... মাঝে মাঝে আমবন, জলার শরে লালহাঁস বসিয়া আছে
আখের ক্ষেতে জল দিতেছে, গম কাটিতেছে। রেলের শরের বস্তুতে টু-
বলে শস্য কুটিতেছে, মহিষের পাল চবিয়া ফিবিতেছে। বড় বড় মাঠে দুপুর
গড়াইয়া গিয়া একে বেঁদ পড়িয়া আসিল। দূবে দূবে চক্রবাল-দীমান্ন এক-
আধটা পাহাড় ঘন নীল ও কালো হইয়া উঠিতেছে।

কি জানি কেন আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে, বিশেষ করিয়া
নিশ্চিন্দিপুরের কথা। হয়ত এককাল পরে লালাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার
জন্যই। ঠিক তাই। বহু দূরে আর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবন-সারা
বিশ্ববনের আমবনের ছন্নসান পাখির কলকাকলীর মধ্য দিয়া, জানা-অজানা
বনপুষ্পের সুবাসের মধ্য দিয়া সুখে-সুখে বহুকাল আগে বহিত—এককালে
যদি সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তার—আজ তা যথু, স্বপ্ন, এককাল আগে
দেখা যথু। গোটা নিশ্চিন্দিপুর, তার ছেলেবেলাকার দিদি, মা ও বাবা, দি-
দাতি বন, ইচ্ছামতী সব অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, পোয়া বোয়া মনে হয়, যথু
যতই আবাস্তব। সেখানকার সব কিছুই অস্পষ্ট স্মৃতিতে মাত্র আসিয়া পাড়া-
ইয়া গিয়াছে।

এই তো কালুন্—চত্র মাস—সেই বাশপাতা ও বাঁশের খোলার রাশি—
শৈশবের ভাঙা জানালাটার শরে বসিয়া বসিয়া এককাল আগে সে সব
কল্পনা, আনন্দপূর্ণ দিনগুলি, শীতরাত্রির সুখস্পর্শ কাঁধার তলা—অনন্ত কাল
সমুদ্রে সে সব ভাসিয়া গিয়াছে কত কাল আগে।...

কেবল যথু এক একদিন ঘেন বালোব সেই রঙে চেকিদার গভীর বাত্রেব
ঘুমের মধ্যে কড়া ঠাঁক দিয়া যায়—ও রাস্তা ম—শ—স—স, সঙ্গে সঙ্গে
নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া আসে, আবার বাড়ির পাশেই সেই পোড়ো ভিটাতে
বহুকাল আগের বসন্ত নামে, প্রথম চৈত্রেব নানা জানা-অজানা, ফুলে বনভূমি
ভরিয়া যায়, তাহাদের পুরানো কোঠাবাড়ির ভাঙা জানালাব শরে অতীত
দিনের স্মৃতি নুহুংখে পরিচিত পাখির দল কলকটে গান গাহিয়া উঠে ঠাঁক-
বাড়ির নারিকেল গাছে কাঠঠোকরার শব্দ বিচিত্র গোপন হাওয়া ওলাবত হইয়া
পড়ে... যথু দশ বৎসরের শৈশবটি আবার নবীন হইয়া ফিরিয়া আসে...

এতদিন সে বাড়িটাও আর নাই... এককাল আগে ভাঙিয়া চুলিয়া উঠ-কাঠ
ভূপাকার হইয়া আছে—ওহাও হয় তো বাড়ির তলার চাপা পড়িতে চলিল—
সে শৈশবের জানালাটার কোনও চিহ্ন নাই—দীর্ঘদিনের শেষে সোনালী রোদ
যখন বনগাছের চায়া দীর্ঘতর করিয়া তোলে, ফিঙে-দোয়েল ডাক শুরু করে—
তখন আর কোনও মুহূর্ত জানালাব শরে বসিয়া থাকে না—হায়ে জুলিয়া
অনুযোগের সুরে বলে বা—আজ রাতে যদি বা ঘরে জল পড়ে, কাল কিব

ঠিক বাণুদিদিদের বাড়ি গিয়ে শোবো—রোজ রোজ রাত জাগতে পারি কি বলে দিচ্ছি।

অপু একটা কথা মনে হঠাৎ হাসি পাইল।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার বছরখানেক আগে অপু, একরাশ কড়ি পাইয়াছিল। তাহার বাবা শিয়্যবাড়ি হইতে এগুলি আনেন। এত কড়ি কখনও অপু ছেলেবেলায় একসঙ্গে দেখে নাই। তাহার মনে হইল সে হঠাৎ অত্যন্ত বড়লোক হইয়া গিয়াছে—কড়ি খেলায় সে যতই হারিয়া থাক তাহার অফুরন্ত এতদেব শেষ হইবে না। একটা গোল বিস্কুটের ঠোঙায় কড়ির রাশি বাখিয়া দিয়াছিল। সে ঠোঙাটা আবার তোলা থাকিত তাদের বনের ধারের দিকের ঘরটার উঁচু কুলুঙ্গিতে।

গাংগা নানা গোলমালে খেলাধুলায় অপু উৎসাহ গেল কমিয়া, তারপরই গাম চাড়িয়া উঠিয়া আসিবার কথা হইতে লাগিল। অপু আব একদিনও ঠোঙা কড়ি লইয়া খেলা করিল না, এমন কি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার সময়েও গোলমালে ব্যস্ততায়। প্রথম দূর বিদেশে রওনা হইবার উত্তেজনা বৃহৎ নৌয়া কথা মনেও উঠে নাই। অত সাতের কড়িভরা ঠোঙা সে নৌয়া নিচেকাব বড় কুলুঙ্গিতেই রাখিয়া গিয়াছিল।

তার অনেককাল পরে সে কথা অপু মনে হয় আবার। তখন অপু মায়া গিয়াছে। এক দিন অন্যমনস্কভাবে ইডেন গার্ডেনের কেয়াঝোপে বসিয়া ছিল গাংগা ও সে দিক দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে।

আজও মনে হইল।

কিন্তু কোথায়? একবার সে মনে মনে হাসিল... বহুকাল আগে নিশ্চিহ্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাওয়া ছেলেবেলাব বাড়ির উত্তর দিকের ঘরের কুলুঙ্গিতে বসানো সেই টিনের ঠোঙাটি—দূবে সেটা যেন শূন্যে কোন্‌র এখনও বাজি-তেছে, তাহার শেষবজাবনের প্রত্যেকস্বরূপ... অস্পষ্ট, অস্বাভাব, স্বপ্নময় ঠোঙাটি সে স্পষ্ট দেখিতে পাওতেছে, সন্ধ্যায় চাং গাং কারিয়া মাকডসার ডিমের মত সেই যে ছোট ছোট বিস্কুট, তারই ঠোঙাটি—উপবে একটা বিবর্ণ-প্রাণ হাঁ-কবা বাক্সের মুখে ছাঁচ দূরের কোন্‌ কুলুঙ্গিতে বসানো আছে... তার পিছনে বাঁশবন, শিমুলবন, তার পিছনে সোনাডাঙার মাঠ, ঘুঘুর ডাক... তাদেরও পিছনে ত্রেইল বহুর আগেকাব অপু মায়ামাখানো নিখুম চৈত্র-হুপুরের বৌদ্ধ-ভরা নীলাকাশ...

অপরাজিত

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চৈত্র মাসের প্রথমে একটা বড় পাটিতে সে নিমজ্জিত হইয়া গেল। খুব বড় গাড়িবারান্দা, সামনের 'লনে' ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা, খানিকটা জামগা গামিরাটা টাঙানো। নিমজ্জিত পুরুষ মহিলাগণ যাহার যেখানে ইচ্ছা,

খেডাইভেছেন। একটা মার্বেলের বড় চৌবাচ্চায় গোটা কতক কুমড়া ফুল, টিক মাঝখানে একটা মার্বেলের ফোয়ারা—গৃহকর্তা তাহাকে জইয়া গিয়া জায়গাটা দেখাইলেন, সেটা নাকি তাদের বিলিগুণ্ড। জয়পুর হইতে ফোয়ারাটা তৈয়ারী কবাইয়া আনিতে কত খরচ পড়িয়াছে, তাহাও জানাইলেন।

পাট র সকল প্রায়োদ-প্রয়োদের মধ্যে একটি মেয়ের কষ্ট-সঙ্গীত সত্যপেক্ষা আনন্দদায়ক মনে হইল। ব্রিজের টেবিলে সে যোগ দিতে পারিল না, কারণ ব্রিজখেলা সে জানে না। গান শেষ হইলে খানিকটা বসিয়া বসিয়া খেলাটা দেখিল। চা. কেক, স্যাণ্ডউইচ, সন্দেশ, বসগোলা, গল্প-গুজব, আবার গান। ফিরবার সময় মনটা খুব খুশী ছিল। ভাবিল—এদের পাটিতে নেমওল পেন্সে আসা একটা ভাগ্যের কথা। আমি লিখে নাম করেছি, তাই আমার হল। যাব-তাব হোক দিকি? কেমন কাটল সন্ধ্যাটা। আহা, খোঁকা কে আনলে হ'ত, ঘুমিয়ে পড়বে এই ভয়ে আনতে সাহস হ'ল না যে।—খান-হু? কেক খোঁকাব জন্য দুটি প কাগজে ভডাইয়া পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দেখিল সেগুলি টিক আছে কি না।

খোঁকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ঢাকিয়া উঠাইতে গিয়া বলিল, ও খোঁকা, খোঁকা, ওঠ, খুব ঘুমুচ্ছি। বে—হি—হ—ওঠ, রে। ক'জলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। যখনই সে বোঝে বাবা আদর কবিতো'ছ মুখে কেমন ধানের মণ, তামির হাসি হাসিয়া ঘাড় কাৎ কবিয়া কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গী কপিয়া আদরের প্রতীক্ষায় থাকে, আর এত আদর খইতেও পাবে।

অপু বলিল, শোন খোঁকা গল্প করি,—ঘুমুসনে—

কাঁড়ল হাসিমুখে বলে, বলো দিকি বাবা একটা হর্থ?

হাত কন্ কন্ মালিকতলা, এ মন তুমি পেলে কোথা,
স্বাক্ষর ভাঙারে নেই, বেনের দোকানে নেই—

অপু মনে মনে ভাবে—খোঁকা, তুই—তুই আমার সেই বাবা। ছেলে-বেলায় চলে গিয়েছিলে, যখন তো কিছু বুঝি নি, বুঝতামও না—শিশু ছিলাম। তাই আবার আবার কোলে আদর কাঁধাতে এসেছে বুঝি? মুখে বলে, কি জানি, জাঁতি বুঝি?

—আহা হা, জাঁতি কি আর দোকানে পাওয়া যায় না। তুমি বাবা কিচ্ছ, জান না—

তাল কথা, কেক এনেছি, দাখ, বডলোকের বাড়ির কেক, ওঠ—

—বাবা তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে, ই বইখানা তোলো তো... আর্টিস্ট বন্ধুটির পত্র। বন্ধু লিখিয়াছে—সমসংসারের রহস্যর ভারতবর্ষ শুধু কুলী-আবদারীর সার্থকতা বোষণা করিয়া নীরব থাকিয়া যাইবে? তোমাদের বড় আর্টিস্ট লোকের এখানে আসার যে নিতান্ত দরকার। চোখ বাকিয়াও বাই শতকরা নিরানব্বই জনের, তাই চক্ষুস্থান যাপুষদের একবার এ-সব স্থানে

আসিতে বলি। পত্র পাঠ এসো। ফিজিতে মিশনারীরা স্কুল খুলিতেছে, হিন্দি জীনা ভারতীয় শিক্ষক চায়, দিনকতক মাস্টারী তো করো, তারপর একটা কিছু ঠিক হইয়া খাইবে কাণ চিরদিন মাস্টারী করিবার মত শাস্ত দাত তোমার নয়, তা জানি। আসিতে বিলম্ব করিও না।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিল, ছেলেকে বলিল, হাচ্ছা খোকা, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যদি চলে যাই, তুই থাকতে পারবি নে? যদি তোকে আমার বাড়ি দেখে খাই?—

কাজল কাদ কাদ মুখে, হাঁ। তাই যাবে বৈকি। তুমি ভারী দেরি কর, কাশীতে এস গেলে। তন দিন হবে, ক'দিন হবে এলে? না বাবা—

অপু ভাবিল অবোধ শিশু। এ কি কাশী? এ বন্দূর, দিনের কথা কি এখানে খেঁচে?—থাক, কোথায় খাইবে সে? ক'হাব কাছে রাখিয়া খাইবে থোকাকে? অসম্ভব।

কাজল খুঁটিয়া পড়িলে ছাদে উঠিয়া সে অনেকক্ষণ একা বসিয়া রহিল।

দূরে বাড়িটার মাথায় সাকুলার বোডের দিকে ভাঙা টাঁদ উঠিতেছে, রাত্রি বাবোটার বেশী—নিচে একটা মোটর লগী ঘস্ ঘস্ আওয়াজ করিতেছে। এই বকম সময়ে এই বকম ভাঙা টাঁদ উঠিত দূবে জঙ্গলের মাথায় পাহাড়ের একটা জায়গায়, যেখানে উটেব পিঠেব মত ফুলিয়া উঠিয়াই পরে বসিয়া গিয়া একটা খাঁড়ের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই খাঁড়টার কাছে, পাহাড়ী ঢালুতে বাদাম গাছেব বনে দিনযানে পাকা পাতায় বনশীর্ষ যেখানে রক্তাভ দেখায়। এতক্ষণে বনে মোংগেরা ডাকিয়া উঠিত, কক্ কক্ কক্—

সে মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল, সাকুলার বোড নাই বাড়িঘর নাই, মোটর লগী আওয়াজ নাই, ত্রিঙ্কের আড্ডা নাই, 'লিলি পণ্ড' নাই, তার ছোট ঝড়ের বাংলা ঘবখানায় রামচরিত মিশ্র মেতেতে ঘুঁটতেছে, সামনে পিছনে ঘন অরণ্যভূমি, নিজন, নিস্তর্র আধ-অন্ধকার রাত্রি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, শুপ উঁচু নীচ ডাঙ্গা, শুকনা ঘাসের বন, সাতা ও আবলুসের বন, শালবন, পাহাড়ী চামেলি ও লোহিয়াব বন—বনফুলের অকুরন্ত জঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল সে মুক্তি, সেই বহুতা, সে সব অনুভূমি, বোডার পিঠে মাঠের সব মাঠ উদ্ধার গতিতে ছুটিয়া চলা, সেই দৃঢ়-পৌরুষ জীবন, আকাশের সঙ্গে, চান্দ্রপথেব সঙ্গে, নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি বাত্রে সে অপূর্ব মানসিক সম্পর্ক।

এ কি জীবন সে যাপন করিতেছে এখানে? প্রতিদিন একই বকম একঘেয়ে নীরস, বৈচিত্রাহীন—আজ যা, কালও তা,। অর্থহীন কোলাহলে ও সার্থকতাহীন ত্রিঙ্কের আড্ডার আবহাওয়ায়, টাকা বোজগারের মৃগতৃষ্ণিকায় লুক-জীবন-নদীর শুক, সহজ, সাবলীল ধারা যে দিনে দিনে শুকাইয়া আসিতেছে এ কি সে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না?

ঘুঘের ঘোরে কাজল বিছানার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এক

পাশে সগাইয়া শোয়াইল। একেই তো সুন্দর, তার উপর কি যে সুন্দর
দেখাইতেছে খোকাকে ঘুমন্ত অবস্থায়।

কারী হইতে ফিরিবার সম্ভাব্য থাকে মনো অপু 'বিভাবরী' ও 'বঙ্গ সুন্দর'
দুখানা পত্রিকার তরফ হইতে উৎসাহ লিখিতে অনুরোধ হইয়াছিল। দুখানা
প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র, দুখানারই গ্রাহক সাশা বাংলা ছুটয়া এবং পুথিবার
যেখানে যেখানে বাঙালী আছে, সবত্র। 'বিভাবরী' তাহাকে সম্প্রতি আগাম
কিছু টাকা দিল—'বঙ্গ সুন্দর'-এব নিজেদের বড় প্রেস আছে—তাহারা নিজের
খরচে অপু একখানা ছোট গল্পের বই ছাপাতে রাজী হইল। অপু
বইখানি বিক্রয়ও হঠাৎ বাড়িয়া গেল, আগে যে সব দোকানে তাহাকে
পচ্ছিতও না—সে সব দোকান হইতে বই চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল। এই
সময়ে একটি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ফার্মে নিকট হইতে একখানা ১৫
পাইল, অপু তখন একবার গিয়া দেখা কবে।

অপু বৈকালের দিকে দোকানে গেল। তাহার বইখানি দ্বিতীয় সংস্করণ
নিজেদের খরচে ছাপাইতে ইচ্ছক—অপু কী চায়? অপু তা বয়সা দেখিল।
প্রথম সংস্করণ ছত্র কাটিতেছে—অপু গহন বিক্রয় কমিয়া বই ছাপাইয়া-
ছিল, লাভটা তার সবই নিজে। ইহাদের দিলে লাভ কমিয়া যাঠবে বটে,
কিন্তু দোকানে দোকানে ছুটাছুটি, তাগাদা—এসব হাঙ্গামাও কমবে। তা
ছাড়া নগদ টাকার একটা মোহ আছে, সত্য পাঁচ ভবিষ্যৎ সে বাজী হইল।
ফার্মের কর্তা তখনই একটা লেখাপড়া কমিয়া লইলেন—আপাততঃ চংশো
টাকায় কপাবর্তী মিটিল, না—ওই সে নগদ পাইল।

চংশো টাকা পুস্তক ও নোট। এক গাদা টাকা। হাতে মনে না। কি
করা যায় এত টাকায়? পুরানো দিন হইলে সে টাকায় কমিয়া খানিকটা
বেড়াইত, বেস্টমেনের পাইত, বায়স্কোপ দেখিত। কিন্তু আজকাল আগেই
খোকায় কথা মনে হয়। খোকাকে কি আনন্দ দেওয়া যায় এ টাকায়? মনে
হয় লীলার কথা। লীলা কত আনন্দ কবিত আজ।

একটা ছোট গল্প দিয়া যাঠিতে যাঠিতে একটা শবৎ—এব দোকান।
দোকানটাতে পান বিড়ি বিস্কুট বিক্রি হয়, আবার গোটা দুই তিন সিরাপের
বোতলও রহিয়াছে। দিনটা গুব গরম, অপু শরৎ শাওয়ার জন্য দোকানটাতে
দাঁড়াইল। অপু একটু পরেই দুটি ছেলেমেরে দেখানে কি কিনিতে আসিল।
গলিরই কোন গনিষ ভাড়াটে গৃহস্থ ঘরের ছোট ছেলে মেয়ে—মেয়েটি বছর
সাত, ছেলেটি একটু বড়। মেয়েটি আঙ্গুল দিয়া সিরাপের বোতল দেখাইয়া
বলিল—ওই ছাখ দাদা সবুজ—বর্ণ ভালো, না? ছেলেটি বলিল—সব
মিশিয়ে ছায়। বরফ আছে, ওই যে—

—ক' পরস্যা নেয়?

—তার পরস্যা।

অপু একদা দোকানী শবৎ শিখাইতেছে, বরফ ভাজিতেছে, ছেলেমেয়ে দুটি

যুদ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি অপূর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাকে ওই সবুজ বোতল থেকে দেবে না?

যেন সবুজ বোতলের মধ্যে শচীদেবীর পায়স পোবা আছে।

অপূর মন করুণাদ হইল। ভাবিল—এবা বোধহয় কখনও কিছু দেখেনি।

এই রং কবা টক চিনির বসকে কি ভাবে, ভালো সিরাপ কি জানে না।

বলিল—থুকী, পোকা গবে? পাও না—ওদের ছা'রাস শবৎ দাও তো—

প্রায়টা তাবা খাইবে বাণী হয় না, অনেক কবিতা অপূ তাহাদের লজ্জা

নাছিল। অপূ বলিল—ভালো সিরাপ তোমাব আছে? থাকে তো দাও,

খামিদ মদেব। কোন ভাষণ থেকে এনে দিতে পার না?

বো'লো বাহা আছে তাহাব হুগেটা ভাল সিরাপ এ অঞ্চলে নাকি কুত্ৰাপি

মেলা সম্ভব নয়। বশেষে স্টে শবৎট কে এক বড় হাস ছুই ভাই বোন

মহাঃঃঃ আনন্দের সহিত খাইয়া লেলিল সবুজ বোতলের সেই টক

চিনির বসট।

অপূ তাহাদের বিদ্রুট ও এক পয়সা মোড়কের বাজে চকলেট কিনিয়া দিল

—দোকানটার ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় ছাই। ওরুও অপূর মনে হইল

যদি ওর সখ হইয়াছে তাহ।

বাসময় নিমিয়া তাহাব মনে হইল বড় সাহিবের প্রেবণার ফলে এই মানব-

বেদনা। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বাশিয়ার প্রজাবহু আইন, 'সারফ' নাতি, ভার-

শাসিত বাশিয়ার সাইবেনিয়া শীত, অশান্তি, কুসংস্কার, দাবিদ্রা—গোগোল,

চেষ্টা, গোর্কি, ওলসন ও শেক্সপীর সাহিত্য সম্ভব কবিতাছে। সে বেশ

কচনা কবিতা পাবে দাসবাসময় দিন, আফ্রিকার এক মুকুবেক্তিত

১৯৩৩ সালে হইতে কোমল বয়সে এক নিগ্রো বালক পিতামাতার হেহঃকাল

হইতে নির্মূলভাবে বিচ্যুত হইয়া বড় দূর বিদেশের দাসেব

বিক্রান্ত হইল বড়কাল তাহাব সে বাপ-মাকে দেখিল না, ভাই-বোনেদের দেখিল

না—দেশে দেশে তাহাব অভিনব জীবনদার দিন, অত্যাচার ও গোপন

অশান্তির কবিতা, তাহাব জীবনের সে অপূর্ব ভাবাভূতির অভিজ্ঞতা সে যদি

লিখিয়া লিখিয়া হিত পাইত। আফ্রিকার নীচের নৈশ আকাশ তাহাকে

প্রেরণ দিত, তাহাব মনঃসংস্কারে স্বপ্নমায়ী তাহাব চোখে অঞ্জন মাখাইয়া

দিত কিঞ্চিৎ বিশ্বসাহিত্যের হুতাগ্ন তাহাবা নীচের অত্যাচার

বিশ হইতে বিদায় লইত

দিন এই পবে একদিন সন্ধ্যার পর গডেব মাঠ হইতে একা বেড়াইয়া

কিবিব মুখে হোয়াইটওয়ে লেডলব দোকানের সামনে একটুখানি

দাঁড়াইয়াছে—একজন আদাবয়সী লোক কাছে আসিয়া বলিল—বাবু প্রেমারা

খেলবেন? খুব ভাল জায়গা। আমি নিম্নে যাব, এখন থেকে পাঁচ মিনিট।

ভদ্র জায়গা, কোন হাঙ্গামার পডতে হবে না। আসবেন?

অপূ বিস্মিত মুখে লোকটার মুখের দিকে চাহিল। আশ্চর্য্য লাগিল

পড়শে, খোঁচা খোঁচা কড়া দাড়ি-গোঁফ, ময়লা দেশী টুইলের সার্ট, কজির
 বোতাম নাই—পানে ঘোঁট দুটো কালো। দোঁষিয়াই চিনিলা—সেই ছাত্র-
 জীবনের পরিচিত বন্ধু হবেন—সেই যে ছেলেটি একবার তাহাদের কলেজ-
 হইতে বই চুরি করিয়া শ্লাইতে গিয়া থা পড়ে। বহুকাল আর দেখা-সাক্ষাৎ
 নাই—অপু লেখা ডা ছাড়িয়া দিবার পর খা কখনো নয়। লোকটাও অণুকে
 চিনিলা, দত্তমত খাইয়া গেল, অণুও বিব্রত হইয়া গেল—এসব ব্যাপার
 অভিভূত তাহাব নাই—জীবনে কখনও না—তবুও সে ব্রিটিয়াছিল তাহাব এই
 ছাত্রজীবনের বন্ধুটি কোন্ পথে অসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কিছু উৎসর্গ কারবার
 পূর্বে হবেন আসিয়া তাহাব হাত দু'টি ধরিল—বলিল, মাপ কর ভাই, আগে
 টেব পাই নি। বহুকাল পরে দেখা—থাক কোথায়?—

অপু বলিল—তুমি থাক কোথায়—এখানেই আছ—কত দিন?...

—এই নিকটেই। তালতলা লেন—আসবে... অনেক কথা আছে—

—আজ আর হবে না; আসছে সোমবার পাঁচটার সময় যাব। নন্দবটা
 লিখে নি।

—সে হবে না ভাই—তুমি আস আসবে না—তোমার দেখা আর পাবার
 ভরসা রাখি নে আজই চলো।

অতি অপরিচ্ছন্ন বাসা। একটি মাত্র ছোট ঘর। অণু ঘবে ঢুকিতেই কেমন
 একটা ভাপ্পা গন্ধ তাহাব নাকে গেল। ছোট ঘর, ডিনিসপত্রে ভিত্তি, মেঝেতে
 বিছানা-পাখা, তাহাবই একপাশে হবেন অণুর বসিবার জায়গা কবিতা দিল।
 ময়লা চাদর, ময়লা কাঁথা, ময়লা বালিশ, ময়লা কাপড়, ছেঁড়া মাহুব—কলাটি
 করা গ্লাস, থালা, কাঁল-পাখা হারিকেন লর্ধন, দাঁধাব আঁচাল হইতে তিন-
 চারটি শীর্ষ কালো কালো ছোট হাত পা বাহির হইয়া আছে—একটি সাও
 আট বছরের মেয়ে ওদিকের দালানে দুস্রাঘের চৌকাঠের উপর বসিয়া।
 দালানের ওপাশটা বাঁধাঘর—হবেনের স্ত্রী সম্ভবতঃ বাঁধিতেছে।

হবেন মেয়েটিকে বলিল—ওরে টেঁপি, তামাক সাঙ তো—

অপু বলিল—ছোট ছেলে-মেয়েকে দিয়ে তামাক সাঙাও কেন? নিজে
 সাঙো—ও শিক্ষা ভালো নয়—

হরেন স্ত্রীর উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া বলিল—কোথায় রেল গেল, এদিকে
 এসো, ইনি আমার কলেজ-আমলের সকলের চেয়ে বড় বন্ধু, এত বড় বন্ধু খার
 কেউ ছিল না—এঁকে কাছে লজ্জা করতে হবে না—একটু চাট খাওয়াও—
 এসো এদিকে।

তারপর হরেন নিজের কাহিনী পাড়িল। কলেজ ছাড়িয়াই বিবাহ হয়—
 তারপর এই দুঃখ-দুর্দশা—বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ এই সব লেগি-
 গেণ্ডি। কত রকম করিয়া দেখিয়াছে—কিছুতেই কিছু হয় না। স্কুলমাফারী,
 দোকান, চালানো ব্যবসা, ফটোগ্রাফের কাজ, কিছুই বাকী রাখে নাই। আজ-
 কাল যাহা করে তা তো অপু দেখিয়াছে। বাসায় কেহ জানে না—উপায়

কি ?—এতগুলি মুখে অন্ন তো—এই বাজার ইত্যাদি ।

হরেনের কথাবার্তার মরন অপূর ভাল লাগিল না । চোখেযুখে কেমন যেন একটা—ঠিক বোঝানো যায় না—অপূর মনে হইল হরেন এই সব নীচ ব্যবসায়ের পোক্ত হইয়া গিয়াছে ।

হরেনের স্ত্রীকে দেখিয়া অপূর মন সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল । কালো শীণ চেহারা, হাতে গাচকতক কাচের চুড়ি । মাথার সামনের দিকে চুল উঠিয়া যাঁহেছে, হাতে কাপড়ে বাঁচনার হালদ-মাখা । সে এমন আনন্দ ও ক্ষিপ্ততার সহিত তা আনিয়া দিল যে, সে মনে করে যেন এত দিনে স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধু সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গিয়াছে—দুঃখ বৃদ্ধি ঘুচিল । উঠবার সময় হরেন বলিল—ভাই বাড়ি-ভাড়া কাল না দিলে অসুখ হ'ব পাঁচটা টাকা থাকে তো দাও তো ।

অপূ টাকাটা দিয়া দিল । বাহির হইতে যাঁহেছে, বড় ছেলেটিকে তার মা যেন কি শিখাইয়া দিল, সে দরজার কাছে আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু, আমার ঠাণ্ডানা ইঙ্কুলের বই এখনও কেনা হয় নি—কিনে দেবেন ? বই না কিনিলে মাষ্টার মারবে—

হরেন শ্রোত্রে সুখে বলিল—যা যা আবার বই—হ্যাঁঃ, ইঙ্কুলও দত—কি বছর বই বদলাইবে—যা এখন—

অপূ তাহাকে বলিল—এখন তো আব কিছু হাতে নেই খোকা, পকেট একে-বাঁদে খালি ।

হরেন অনেক দূর পদাশ্রয় সঞ্চে সঞ্চে আসিল । সে চাষবাস করিবার জন্য উত্তর পাড়ায় জমি দেখিয়া আসিয়াছে, দুই হাজার টাকা হইলে হয়—অপূব কি টাকাটা ধার দিতে পারিবে ? না হয়, আধাআধি বখরা—খুব লাভের ব্যবসা ।

প্রথম দিনের সাক্ষাতেই এ সব ?

কেমন একটা অপ্রীতিকর মনোভাব লইয়া অপূ বাসায় ফিরিল । শেষে কিনা জুয়া দালালী ? প্রথম যৌবনে ছিল চোর, আরও কত কত কি করিয়াছে, কে খোঁজ রাখে ? এ আর ভাল হইল না !

দিন তিনেক পর একদিন সকালে হরেন আসিয়া হাজির অপূর বাসায় । নানা বাজে কথা'র পর উত্তরপাড়ার জমি লওয়ার কথা পাড়িল । টিলব-ওয়েল বসাইতে হইবে । কারণ জলের সুবিধা নাই—অপূব কত টাকা দিতে পারে ? উঠবার সময় বলিল...ওহে, তুমি মানিককে কি বই কিনে দেবে বলেছিলে, আমায় বলছিল । অপূ ভাবিয়া দেখিল এক্ষণ কোন কথা মানিককে সে বলে নাই...যাহা হউক, না হয় দিয়া দিবে এখন । মানিককে বইয়ের দরুন টাকা হরেনের হাতে দিয়া দিল ।

তাহার পর হইতে হরেনের যাতায়াত শুরু হইল একটু ঘন ঘন । বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে ছেলে মানিকও আসিতে লাগিল । কখনও সে আসিয়া

—তুহন, দিদি মনে আছে তো ? দিদি আমায় পাঠিয়ে দিয়েচে—বলে দিয়েচে

যদি কলকাতায় যাস, তবে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করিস। আপনার কথা বড় বলে, আপনি কি একবার আসবেন চাঁপদানীতে।

—পটেশ্বরী? সে এখনও মনে করে বেঁচেছে আমার কথা?

বাসক খুব নীচু করিয়া বলিল আপনার কথা এমন দিন নেই—আপনি চলে এসেছেন আট দশ বৎসর হেল—এই আট দশ বছরের মধ্যে আপনার কথা বলোন—এমন একটা দিনও বোধ হয় যায় নি। আপনি কি কি খেতে ভালবাসতেন। সব দিদিব এখনও মুখস্থ। কলকাতায় এলেই আমায় বলে মাস্টার মশায়ের খোঁজ করিস না বে? আমি কোথায় ডানব আপনার খোঁজ—কলকাতা শহর কি চাঁপদানা? দিদি তা বোঝেন না। তাই এবার বিভাবীতে আপনার লেখা—

—পটেশ্বরী কেমন আছে? আজকাল আব সে সব শব্দব্যাতির অত্যাচার—

—শান্তী মায়া গিয়েচে, আজকাল কোন অত্যাচার নেই, দু তিনটি ছেলে-মেয়ে হয়েছে, সে ই আজকাল গিন্না, তবে সংসারের বড় কট। অমাকে বলে দেয় বোতলের চাটনি কিনতে—দশ আনা দাম—আমি কোথা থেকে পাব—এই একটা ছোট বোতল আজ এত দেখুন কিনে নিয়ে যাচ্ছি ছ' আনায়। টেপার আচার। ভালো না?

—এক কাজ করো। চলো আমি তোমাকে আচার কিনে দিচ্ছি, আমার আচার ভালবাসে? চলো দেখো চাঁপান কি না। ভিনিগার দেওয়া বিলিতি চাঁপান ইতো পড়তে হবে না।

—আপনি কবে আসবেন? আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে অর্থাৎ আপনাকে নিয়ে এসেছি শুনে দিদি অমাকে বাড়িতে এড়িয়ে দেবে না কি, আজই আসুন না?

—সে এখন হবে না, সময় নেই। সুবিধে মত দেখব

অপু অনেক ভাল ছেলেমেয়ে খেলনা, বাবা চাটনি কিনিয়া দিল। রসিককে বেশনে সুলিয়া দিয়া আদিল। বাসক বলিল আপনি কিছু ঠিক যাবেন এক দিন এসে মা—নেলে ওহ বলুন মে—

কি চমৎকার নীল আকাশ আজ। গঙ্গা আজ একটু কম।

চৈত্র পুণ্যে এই ঘন নীল আকাশে দিকে চাইলেই আজকাল কেন শৈশবের কথাই তাহার মনে পড়ে?

একটা জিনিস সে লক্ষ্য করিয়াছে। বাল্যে তখন অন্য কোনও স্থানে সে যায় নাই—খনন বা পড়িত—মনে মনে তাহার ঘটনাবলীর কল্পনা করিতে গিয়া নিশ্চিন্দপুণ্যেই বাঁশবন, আমবাগান, নদীর ঘাট, কুঠির মাঠের ছবি মনে ফুটিয়া উঠিত তাও আবার তাদের পাড়ার ও তাদের বাড়ির আশেপাশের জায়গার। তাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন তো রামায়ণ মহাভারত মাথানো ছিল—দশরথের রাজপ্রাসাদ ছিল তাদের পাড়ার ফণি মুখ্যোদের ভাঙা দোতলা বাড়িটা—মাধবীকঙ্কণে পড়া একলিঙ্গের মন্দির ছিল ছিরে পুকুরের পশ্চিমদিকের

সীমানার বড় বাঁশঝাড়টার তলায়—বজ্রবাসীতে পড়া জোয়ার অব-আঁক মেঘপাল চবাইত নদীপারের দেয়াডেব কাশবনের চরে, শিমুল গাছের ছায়ায়...
 তাবপব বড় হইয়া কত নতুন স্থানে একে একে গেল, মনের ছবি ক্রমশঃ পরি-
 বর্তিত হইতে লাগিল—ময়ূখ চিনিলা, ভুগোল পড়িল, বড় হইয়া যে সব বই
 পড়িল তাদের ঘটনা নিশ্চিন্দিপূরবে মাঠে, বনে, নদাব পথে ঘাট না কিন্তু
 এতকালের পবেও বালোব যে ছবিগুলি একবার অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তা
 অপরিবর্তিতই আছে—এতকাল পরও যদি বামায়ণ মহাভারতের কোনও ঘটনা
 কল্পনা করে—নিশ্চিন্দিপূরবে সেই অম্পদ, বিশ্বতপ্রায় স্থানগুলিই তাব রখা-
 ভূমি হইয়া দাঁড়ায়—অনেককাল পবে সেদিন আব একবার পুরানো বইয়ের
 দোকানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাধবীকঙ্কণ ও জীবন সঙ্গী পড়িতেছিল—কি
 অদ্ভুত!—পাতায় পাতায় নিশ্চিন্দিপূরব মাঝানো, বালোব ছবি এখনও সেই
 অম্পদ-ভাবে-মনে-হওয়া জঙ্গলে-ভাণ্ডা চোড়ো পুকুরটার পশ্চিম সীমানায়
 বাঁশঝাড়ের তলায়।...

এবার মাঝে মাঝে দু-একটি পূর্ব-পরিচিত বন্ধুব সঙ্গে অপূর্ব দেখা হইতে
 লাগিল। প্রায়ই কেহ ডাকিল, কেহ পাতায়—জানকী মফঃস্বলের একটা
 গবর্ণমেন্ট ইন্সট্রাক্টর হেডমাস্টার, ময়ূখ এটনি বাবস'য়ে বেশ উপাভাষন করে
 দেবব্রত একবার ইতিমধ্যে সন্ধ্যাক কলিকাতা আসিয়াছিল, স্ত্রীস পী দা'য়া
 গিয়াছে, দুটি মেয়ে হইয়াছে। চাকরিত বেশ নম করিয়াছে, এবচে তায়
 আছে কন্ট্রাক্টিং বাবস'য় স্থানীয়ভাবে আ'য়স কাপতে। দেওব'ন পূর্ব
 বালোবজু সেই সমীর আত্মকাল ইন্দ্রিওপেপে বড় দালাল। সে চাকাল
 পয়সা চিনিতি, হিসাবী ছিল—আত্মকাল অবস্থা কিবাইয়া গেলিয়াছে। কতক
 করিতে কবিতে একবারও সে ইহাদিগকে হিন্দা কবে না। তা'য়স এবার
 জানকীর সঙ্গে একদিন কলকাতায় দেখা হইল। মোটা হইয়া গিয়াছে বেজায়,
 মনের তেজ নাই, হস্থলাব কথাবাণী—অপূর্ব মনে হইল সে যেন একটা বন্ধ
 ঘরের দরজা জানালা বন্ধ কবিয়া বসিয়া আছে।

তাহার এটনি বন্ধু ময়ূখ একদিন বলিল—শাই, সকাল থেকে ত্রিণ নিম্নে
 বসি, সারাদিনের মধ্যে আব বিশ্রাম নেই—থেন্নেই হাইকোর্ট, পাচটায় দিবে
 একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি ঘণ্টা তিনেক—তাবপর বাড়ি
 কিরে আবার কাজ—ববের কাগজখানা পড়বাও সময় পাইনে, কিন্তু এত
 টাকা রোজগার করি, তবু মনে হয়, ছাত্রজীবনই ছিল ভাল। তখন কোন
 একটা জিনিস থেকে বেশী আনন্দ পেতুম—এখন মনে হয়, আই থাও লস্ট
 দি সস্ অফ্ লাইফ—

অপূর্ব নিজের কথা ভাবিয়া দেখে। কৈ, এত বিরুদ্ধ ঘটনার ভিতর দিয়াও
 তাহার মনে আনন্দ—কেন নষ্ট হয় নাই? নষ্ট হয় তো নাই—ই, কেন তাহা
 দিনে দিনে এমন অদ্ভুত ধরনের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যে বাড়িয়া চলিয়াছে? কেন
 পৃথিবীটা, পৃথিবী নয়—সারা বিশ্বটা, সারা নাস্ত্রিক বিশ্বটা এক অপক্লপ রঙে

তাহার কাছে রঙীন? আর দিনে দিনে এ কি গহন গভীর রহস্য তাহাকে
মুগ্ধ করিয়া প্রাতঃবিষয়ে অতি ভীষণভাবে সচেতন করিয়া দিতেছে?...

সে দেখিতে পায় তার ইতিহাস, তার এই মনের আনন্দের পগতির ইতিহাস,
তার ক্রমবদমান চেতনার ইতিহাস।

এই ভ্রমভেদে পিছনে আর একটা নৈঃসঙ্গতা আছে। এই দুঃখময় আকাশ,
পাখির দাক, এই সমস্ত সংসার জীবন যাত্রা—তারই ইঙ্গিত—অনৈমিত্তিক—দুঃখ
দিগন্তে বড়বড় ও বো কোয়াশ যেন সে সঙ্গীত—সিঁইয়াছেন একটা খোসার
মতো যেন আর একটা খোসা তার মতো আর একটা খোসা, সেটাও তেমনি
এই আকাশ, বাতাস, সংসারের আবরণে কোথাও নেটাকা আছে, কোন
জীবন পানের মনের পরের দেশ। স্থির সন্ধায় নির্জনে একা কোথাও বসিয়া
ভাবিলেই সেই ভ্রমভেদে একটু একটু নড়াই আসে।

সেই ভ্রমভেদে সঙ্গে গোপন প্রায় স্থাপিত হয় তার বালো—দিদি যখন
মাঝি দায়। তারপর অনিল—মা—অপা—সবশেষে লীলা। তখন অশ্রু
পানাবান সারাজীবন পরিয়া পাড়ি দিয়া আনিয়া আজ যেন বড় দুবে সে দেশের
তালিধনবেশা অস্পষ্ট নড়াই আসে।

এই জীবনকে বেধিয়া রাখা বসিয়া তাই সে ভাবিয়া দেখিল, অনেক দিন
যাগে তার বন্ধু ছিল। কণা বলয় ছিল এ জেনারেশনের হাত হাতে
কানে তার লওয়া—আর সবাই তা লইয়াছে, তার সকল সহ্যই এখন
জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা, দিকে দিকে জীবন সকল কণ্ঠেই তাবা নামিয়া
পাতিয়াছে কেবল ভবনুবে হইয়াছে সে ও পণব। কিন্তু সত্য কথা সে বলিবে?
মন তার কি বাল?

তার মন হবনে 'হা' পাতিয়াছে জীবনে, তাহাতেই তার জীবন হইয়াছে
সার্থক। সে চায় না অর্থ চায় না—কি সে চায়?

সেটাও তো খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে না। সে কি? অথ জীবন—পুলক এক
একদিন দুপুরে বোদে ছাদটাতে সে অনুভব করে, তাকে অভিজ্ঞত উত্তেজিত
করিয়া তোলে আকাশের দিকে উৎকৃষ্ট চোখে চাহিয়া থাকে, যেন সে
দেববানীর প্রকাশনা করিতেছে।

কাজল কি একটা বই আগের সঙ্গে পড়িতেছিল—অপু ঘরে ঢুকিতেই
চোখ তুলিয়া বাগ্ৰ উৎসাহেব সুখে উজ্জলমুখে বলিল—ওঃ, কি চমৎকার গল্পটা
বাবা। শোনো না বাবা—এখানে বসো—। পরে সে আরও কি সব বলিয়া
বাইতে লাগিল। অপু অনাময় মন ভাবিতেছিল—বিদেশ যাওয়াব ভাড়া
সে যোগাড় করিতে পারে—কিন্তু খোকা—খোকাকে কোথায় রাখিয়া
যায়? মাঝার বাড়ি পাঠাইয়া দিব? মন্দ কি?... কিছু দিন না হয় সেখানেই
থাকুক—বছর দুই তিন—তারপর সে তো ঘুমিয়া আসিবেই। তাই করিবে?
মন্দ কি?

কাজল অভিমানের সুরে বলিল—তুমি কিছু শুন না, বাবা—

—তুম্ব না কেন বে, সব শুন্ছি। তুই বলে যা না?

—হাই শুন্ছো, বল দিকি খেত পরী কোন্ বাগানে আগে গেল?

বলিল—কোন্ বাগানে?—আচ্ছা একটু আগে থেকে বগতো খোকা ওটা ভাল মনে নেই। খোকা অতশত ঘোবপাচ বুঝিতে পাবে না,—সে আবার গোড়া হইতে গল্প-বলা শুরু করিল—বলিল—এইবার তো রাজকন্যে শেকড় খুঁজতে যাচ্ছে, কেমন না? মনে আছে তো?—(অপু এক বর্ণও শোনে নাই) তারপর শোনো বাবা—

কাজলের মাথার চুলের কি সুন্দর ছেলেমানুষি গন্ধ!—দোলা, চুষিকাটি ঝিনুকবাটি, মাষের কোল—এই সব মনে করাইয়া দেয়—দিনতান্ত কচি। সত্যি ওর দিকে চাহিয়া দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না কি হাসে, কি চোখ দুটি—মুখ 'ক সুন্দর—এটুকু এক বাঁও ছেলে—যেন বাস্তব নয় যেন এ পৃথিবীর নয়—কোন্ সময় জোৎস্না বা আদিয়া শুকে যেন উড়াবয়া লয় কোনও স্বপ্ন প্রবব দেশে লইয়া যাইবে—দিনবাতা ক চঞ্চলতা, কি সব অত খেয়াল ও আব্দার—অথচ কি অবোধ অসহায়।—তাকে কি করিয়া প্রত্যাণা করা যাইবে?—ও তো একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—তাকে এক বলিয়া ভুলানো যায়?—অপু মনে মনে সেই ফণাটি ভাবিতে লাগিল।

ছেলেকে বলিল—চিনি নিয়ে আসতে খোকা একটু হুঁসুড়া দি।

কাজল মিনিট দশেক ম'এ বা'হবে গিয়াছে—এমন সময় গলির বা'হবে পাওয়ায় কিসের একজ্ঞা গোলমাল অপু ব'কেনে গেল। বা'হা হওয়া ব'বে দে'বে দাঁড়াইল—গলির ভিতর হতে লোক দো'ড়-স'র বা'হিরে। দিকে টুটে, ও

একজন বলিল—একটা শেলি চাপ। ডে'ছে—

অপু দোড়িয়া গলির ধূসে গেল? বে'স্ম মিন্ট, সব'ই শাশ'তে তায় সব'ই ঠেলাঠেলি করিতেছে। অপু বা' কান্দিতেছিল, ভিত্ত শুকা'য়া পাসিয়া'য়ে। একজন কে বলিল—কে চাপ। ডে'ছে ম'ং—

—ওই যে ওখানে একটা ছেলে—আহা নশায়, এখনই হয়ে গিয়ে চ' ম'বাতা আর নেই—

অপু ক'ক'সে জিজ্ঞাসা করিল—ক'য়স কত?

—বছর নয় দশ হবে—ভুলে'কেব ছেলে, বেশ ক'স। দেখতে—হা।

অপু এ প্রশ্নটা কিছূতেই দুখ দিয়া বা'হা করিতে পারিল না—তাহার গায়ে কি ছিল। কাজল তার নতুন তে'গী খপরের শাট-পিয়া এইম'এ বা'হা হইয়া গিয়াছে

কিন্তু এট সময়ই হঠাৎ অপু, হাতে পায়ে অত'ত ম'নের বল পাইল—বো'ল হয় সে যে খুব ভালবাসে, সে ছাড়া এমন বল আর কেহ পায় না এমন সময়ে। খোকার কাছে এখনি যাইতে হইবে—যদি একটুও বাঁচিয়া থাকে—সে বো'ল হয় ভাল থাইবে, হয়তো ভয় পাইয়াছে—

ওপারের ফুটপাথে গ্যাসপোস্টের পাশে ট্যান্ডি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পুলিশ

আসিয়াছে—ট্যান্ডিতে দরাদরি করিয়া দেহটা উঠাইতেছে। অণু খাকা মারিয়া সামনের লোকজনকে হঠাৎইয়া খানিকটা জায়গা ফাঁকা করিয়া ফেলিল। কিঞ্চ ফাঁকায় আসিয়া সামনে ট্যান্ডিটার দিকে চাহিয়াই তাহার মাথাটা এমন খারয়া উঠিল যে, পাশের লোকের কাশে নিজের অজ্ঞাসারে ভব না দিলে সে হয়তো পাড়িয়াহঁত। ট্যান্ডির সামনে যে ভিড় জমিয়াছে, তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া গিও মারিয়া কাণ্ডটা দেখবার রখা চেঁচা করিতেছে—কাজল। অণু ছুটিয়া গিয়া ছেলের হাত দাঁল—কাজল ভীত অথচ কৌতূহলী চোখে মত দেহটা দেখবার চেঁচা কাঁবতেছিল—অণু তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিল।—কি দেখছিলি শুধানে? আর বাসায়—

অণু অণু ভব কলি। তাহার মাথা যেন কিম্ কিম্ করিতেছে—সারা দেহে যেন এইমাত্র কে হলেকটিক ব্যাটারির শক্ লাগাইয়া দিয়াছে।

গাল পদে কামল একটু ইতস্ততঃ কানিয়া অপ্রতিভের সুরে বলিল—বাবা গোলমাগে আমায় যে সিকিটা দিয়েছিলে চিনি আনতে, কোথায় পড়ে গিয়েছে খুঁজে আনি।

—খাক শে। গিনানয়ে চলে আসতে পারিও কৈনিকালে—তুই বড চঞ্চল হলে বোকা।

দিন এই পরে সে কি ক'রে আঁসিন্ গোঃ দিরা। ১৭-রূপে দিকে ট্রনে চাওয়া বাহেছিল, মোড়ের কাছে শালেনে বারো কোজনবিগ সামান-বাবুকে হাত মদায় বাহেৎ দেখিয়া দে ত'া'গ'ত হাম হতে নানিল, কাছে গিয়া বলল, এক আমদনবাবু, চিনতে পারেন? আমদনবাবু হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বললেন, অণুবাবু যে! তারপর কোথা থেকে আজ এতকাল পড়ে। ভঃ আনি একঃ অণুকম দেহতে হয়ে গিয়েছেন, ওখন চলেন হোক।

অণু হাসিয়া বলল—তা বঃ। এ'নকেও চৌএশ স্মরণ হল—কতকাল হোকরা থাকব—আনি কোথায় চললেন?

—অফিস যাচ্ছি, বেলা প্রায় এসে গেছে। বাজে—নাঃ একটু দেরি হয়ে গেল। একদিন যাখুন না? কতদিন তো কাজ করেছেন, আপনার পুরনো অফিস, হঠাৎ চাকরিটা দিলেন হেঁত, তা হলে আজ প্রাস্ট্যান্ট মানেজার হ'তে পারেন, হ'তেনবাবু মায়া গিয়াছেন কিন।

স. তাই বটে বেলা সাঃ নগণ। আমদনবাবু পুরনো দিনের মত ছাতি মাথায়, লক্সের মরলা ও হাত-ছেঁচা পাঞ্জাবি গায়ে, ক্যাথিসের জুতা দিয়ে দিয়া, অণু দশ বৎসর পূবে যে অফিসটাতে কাজ করত, সেখানে গুটি গুটি চলিয়াছেন।

অণু জিজ্ঞাসা করিল, আমদনবাবু, কতদিন কাজ হ'ল ওদের ওখানে আপনার সবসুখ?

রামধনবাবু পুনরো দিনের মত গর্ভিতসুরে বলিলেন, এই সাঁইত্রিশ বছর যাচ্ছে। কেউ পাববে না বলে দিচ্ছি—এক কলমে এক সেরে শ্যায়। আমার ছাত্তায় পাঁচ পাঁচটা মানেভাব বদল হ'ল—কত এল, কত গেল—খামি ঠিক বজায় আছি। এ শমাব চাকরি ওখান থেকে কেউ নড়াতে পাবছেন না—যিনিই আসুন। হাসিয়া বলিলেন,—এবাব মাইনে বেড়েছে, এই পুঁয়গাল্লিশ হ'ল।

অপূব মাথা কেমন ঘূবিয়া উঠিল—সাঁইত্রিশ বছর এত অন্ধকার ঘরে একই হ'তবাক্সের উ'ব ভাবী খেপে-বঁাদানো বোকডের খাণ্ডা খুলিয়া কালি ও ঝিলপেনের সাহায্যে শীলেদেব সংসাবেব চালডালের হিসাব লিখিয়া চলা চাবিশাবে সেই একই দোকান পনবা, একই পরিচিত গাল একত সহকর্মী বদল, একই কথা ও আলোচনা—ব'বোমাস, তিনশো ষাট শব্দিন।—সে ভাবিতে পাবে না—এই বকুল, পঙ্কিল, পাচা পানা পুণ্যেব মত গতিহীন, প্রাণহীন, ক্ষুদ্র জীবনের কথা ভাবলেও তাহ'ব গা কেমন কবিয়া উঠে।

বেচারা রামধনবাবু—দাঁবা, বক, ও দোষ নাই, তাও সে জানে। কলকাতার বহাশক্তিভনমতে, হ'ত শ্মশ্রু, কাবে সে মিশিয়াছে। বোঁচরাহান, একঘোষ জীবন—অ'হান, চন্দহান পটনাহান দিনওলি। শু'টাকি, তাকি— শুদু খাওয়া, পানাসুচি, বিজ্ঞেয়, সমাধ, একই কুলা বিষয়ে একঘোষ অসাব বকুনি—ত'ব মনের স'চিতে নত ক'িয়া দেয়, অ'নন্ডকে ব'স করে, দৃষ্টিকে সফ'র্গ করে, শেষে ধোর স্মাশা অসিয়া সূদালোককে ক'ন ক'িয়া দেয়—জ'ব, পঙ্কিল, অ'কিঞ্চিদ'ব জীবন কোন বক'ম ব'ত বাহিয়া চলে। সে শাণ্ডহীন নয়—এই পরিণাম হইতে সে নিড়েকে ব'চাহবে—

তা'পব সে রামধনবাবুর অ'বোধে সে কতকটা স'হলেব বশব'র্গ হ'য়া শীলেদের বাড়ি গেল। সেই অ'সিস, ঘ'সদো'ব, বোকের দল বজায় আছে। প্রবেশ মুণ্ডবী বডলোক হ'তবার জন্য কোন ল'গা'তে প্রতি ব'সব একখানি টিকিট কিনিতেন, বলিতেন—ও পাঁচটা ট'কা বাজে খরচ'ব সা'মল স'রে বেবেছি দ'দা। যদি একবার লেগে যায়, তবে সুদে আসলে সব ট'তে আসবে। তাহা আজও আসে নাই, কারণ তিনি আজও দেবোত্র এন্টেটের হিসাব কাষতেছেন।

খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল সকলে। মেজবাবু কাছে বসাইয়া তিক্তসাবাদ করিলেন। বেলা এগারোটা বাজে, তিনি এই ম'ত্র পুয় হ'গেতে গঠিয়াছেন—বিলিয়াড ঘরের সামনের বারান্দাতে চাকা গ্রাহকে এখন ঠৌল মাখাইবে, বড রূপার গুডগুডিভে রেশমের গলবন্ধ ওয়ালা নলে বেহারী তামাক দিয়া গেল।

এ বাড়ির একটি ছেলেকে অপূ পূবে দিনকতক পড়াইয়াছিল, তখন সে ছোট ছিল, বেশ সুন্দর ছিল—ভারী পবিত্র যুগশ্রী, যতাবটিও ছিল ভারী মধুর। সে এখন আঠার উনিশ বছরের ছেলে, কাছে আসিয়া পায়ের

ধূলা লইয়া প্রণাম করিল অপর দেবীয়া বাণিত হইল যে, সে এই সকালেই
অন্ততঃ দশটা পান খাইয়াছে—পান খাইয়া খাইয়া ঠোঁট কালো—হাতে রূপা
পানের কোটা—পান ফর্দা। এবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে, খানিকক্ষণ
কেবল নানা শিলায় গড়া করিল, বা-বার ক্রিটনকে মাস্টারশিপের কেমন
লাগে? চার্লি চ্যাপলিন? নর্মা শিয়ারাব—ও সে অদ্ভুত।

শিয়ারাব সময় অপর মনটা বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বালক ওর দোষ
কি? এই আবহাওয়ায় পূব বড় পতিভাও শুকাইয়া যায়—ও তো অসহায়
বালক

গাম্বনবার বলিলেন, চললেন অপরবার? নমস্কার। আসবেন মাঝে মাঝে।
গলিব বাহিরে সেও চা খাচ্ছিল, পচা আলের খোলা স্টুটিকি
মাছেব গন্ধ।

বাড়িতে অপর মনে হইল সে একটা বড় অনায়াস করিতেছে, কাজলর প্রতি
একটা গুরুতর অবিচার করিতেছে। ওও তো সেই শৈশব। কাজলেব এই
অমল্য প্রশংসার দিনগুলিতে সে তাহাকে এই ইউ, কংক্রিট, সিমেন্ট ও বা-
কাম্পানীর যে টটোনে পানো কাবাগাবে আবদ্ধ রাখিয়া দিবে পর
দিন তাহার কাটা, উৎসুক, দগ্নপ্রবণ শিশুমন তুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অদ্ভুত
ভাষায় তুলে—তাহার জীবনে বন-বনানা নাই, নদীর মন নাই, পাখির
কলসর, মাঠ, জোংরা, দল-সংগঠনের সুযোগ—এসব কিছুই নাই, এত
কাজ পড়ি পুণ্ডা ভাবপন বালক—তাহার প্রতিদ্বন্দ্ব সে অনেকবার
পাইয়াছে।

কাজল যা! জাহুক, গানিয়া মাগুষ ইউক। তাই তার শৈশবে গল্পে-পড়া
সেই সেন-কথা যা ক। ছেঁড়া-খোঁড়া কা ড, ঝুলি ঘাড়ে বেড়ায়, এই
চাপ দড়ি, কোমর নাড়ে যেহে। কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কেউ পোছে না।
সকলে পাগল বল, পূঁচা কবে, পাঁচদিন হাপর জালায়, বাতদিন হাপব
জালয়।

শেতল থেকে, রাস থেকে, সীসে থেকে ও লোক কিছু সোনা কবতে জানে,
কিয়াও থাকে।

এই দিনটিতে বাসমা ভাবিতে ভাবিতে সবপ্রথম এককাল পবে একটা চিন্তা
মনে উদয় হইল। নিশ্চিন্দপুর একটিবার ফিলে কেমন হয়? সেখানে আর
কেউ না থাকে, শৈশব-সজিনী বাণুদিদি তো আছে। সে যদি বিদেশে চলিয়া
যায়, তার আগে থেকাকে তার পিতামহের ভিতাটা দেখাইয়া আনাও তো
একটা কথা?

পাঁচদিনই সে কাশীতে লীলাদিকে পাঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিল, সে
থেকাকে লইয়া একবার নিশ্চিন্দপুর যাইতেছে, থেকাকে পিতামহের গ্রামট;
দেখাইয়া আনিবে। পত্রপাঠ যেন লীলাদি তার দেওবকে সঙ্গে লইয়া সোজা
নিশ্চিন্দপুরে চলিয়া যায়।

টেনে উঠিয়াও যেন অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না, সে সতাই নিশ্চিন্দিপূর্বব মাটিতে আবাব পা দিতে পারিবে—নিশ্চিন্দিপূর্ব, সে তো শৈশবের অঙ্গলোক। সে তো মুছিয়া গিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে, সে শুধু একটা অনতিস্পষ্ট সুখ-স্মৃতি মাত্র, কখনও ছিল না, নাই-ও।

মাকেরপাড়া স্টেশনে টেন আসিল বেলা একটার সময়। খোকা লাগ দিয়া নামিল, কাবণ প্লাটফর্ম খুব নিচু। অনেক পবিত্র হইয়াছে স্টেশনটার, প্লাটফর্মের মাঝখানে জাহাজের মাংসুলের মত উঁচু যে সিগন্যালটা হেলেবেলায় তাহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল সেটা এখন আর নাই। স্টেশনের বাহিরে পথের উপর একটা বড় জাম গাছ, অপুর মনে আছে, এটা আগে ছিল না। ওই সেই বড় মাদার গাছটা, খেটান ওলাষ অনেককাল আগে তাহাদের এদেশ ছাড়িবার দিনটাতে মা খুঁড়ি বাঁিয়াছিলেন। গাছের ওলাষ দুখানা মোটর-বাদ খাত্তর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া, অপূর্ণ থাকিতে থাকিতে 'খানা পূর্বনো' কোর্ট টাক্সিও আসিয়া কুণিল। আঁক'ল নাকি নবাবগঙ্গা বঙ্গ বাস ও টাক্সি হইয়াছে ডিডামা ক'িয়া জানিল—'মিস্টা অ'র' কেমন যেন ভাল লাগিল না। ক'ল নবাব 'গুগে' ম'ং' হ, 'গ' হ বলিল—'মো'র' ক'তে ক'বে যাব বাবা? অ'পু ছেলেকে জিনিস'র' ম'ং' টাক্সিতে উঠাইয়া দিল, বটের ঝুরি দোল'নো, দিগ্গ চাষা'লা সে'ই পাচোন দিনের পথটা দিয়া সে নিজে মোটরে চড়িয়া দাইতে পারিবে না কখনই। এদেশের সঙ্গে 'ে' ল গা'সের গন্ধ কি খাপ খায়?

চৈত্র মাসের শেষ। বা'ল'য় সতীকা'র' বসন্ত এই সময়েরই ন'মে। '৭৭ চ'লিতে চ'লিতে পথের ধানের ফুলে'বা ঘেঁ'র'বনে'র' সৌন্দ'র্য' সে মু'ক্ হইয়া গেল। এষ্ট কম্পমান চৈত্রহৃদয়ের বোধের সঙ্গে, আকন্দ ফলের গন্ধের সঙ্গে শৈশব যেন মিশানো আছে—পশ্চিম বাংলা'র' প'ল্লীতে এ কমনীয় বসন্তের রূপ সে তো ভুলিয়াই গিয়াছিল।

এই সেই বৈষ্ণবতা। এমন মনুষ্য অঙ্গল'বা নামটি কোন নদীর আছে পৃথিবীতে? বেয়া পাব হইয়া আবার আবাচুর বা'লা'। 'ভ'ল ও 'দ'ল' টাক্সি'র' বিজ্ঞা'র-ওলা'লা পেট্রো'লের দোকান নদীর উপরেই। বাজারেরও চেহারা অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। তেঁই'র' ব'চ'র' আগে এত কোঠাবাড়ি ছিল না। আবাচ'র' হইতে হাঁটিয়া খাওয়া সহজ, মাত্র দু'মাংল, জিনিস ত্রের জন্য একটা মুটে পাওয়া গেল, মোটর'বাস ও টাক্সি'র' দরুন ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ি আজ-কাল নাকি এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মুটে বলিল—'ধ'ক'পলাশগাছ'র' ওই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যাবেন তো বাবু? 'ধ'ক'পলাশগাছ'ি?...নামটাই তো

কতকাল শোনে নাই, এতদিন মনেও ছিল না। উঃ, কতকাল পরে এই অতি সুন্দর নামটা সে আবার স্মরণেতে।

বেলা পড়িয়া আনিয়াছে এমন সময়ে পথটা সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে, ঢুকিয়া পড়িল—পাশেই মণ্ডখালির বিল—দ্ব্যবসে ভাবিয়া আছে। ~~এই সেই অশ্রু-দৌলৎভূমি, সোনাডাঙার সপ্নমাখা নামাটা—বদে হইল এত জায়গায় তো বেগাইল, এমন অশ্রু-মাত ও বন কই কোথাও তো দেখে নাই।~~ ~~মেই বন-ঝোপ, চিপি বন, ফুলে ভিত্তি বাবলা—বেকালের এ কি অপূর্ব রূপ।~~

তাবৎ এই দুঃ হইতে ঠান্ডা পুষ্করিণী সেহ ঠাণ্ডে বটগাছাব উঁচু ঝাঁকড়া মাথাটা নকশা করিল—যেন দিক্‌বদলে সুবিধা আছে—ওব পরেই নিশ্চিন্দ-পূর্ব। ~~এম বটগাছাটা~~ ~~নিহনে~~ ~~পড়িল~~—অশ্রু-বৃক্ষেব রক্ত-চলকাইয়া যেন মাথাষ উঠিতে চাহিতেছে সাণ দেহ এক অশ্রু-অশ্রুভূমিতে যেন অবশ হইয়া আনিতেছে। ~~এম মাত শেষ হইল, ঘাটের পথেব সেই আমবাগানগুলো—~~ ~~সেব মাল~~ ~~ডাইবাং~~ ~~চলে~~ ~~পথেব মাটি~~ ~~একটু~~ ~~তুলিয়া~~ ~~মাথায়~~ ~~ঠেকা~~ ~~ল।~~ ~~ছেলেকে~~ ~~বলিল~~—~~এই হল~~ ~~তোমাং~~ ~~ঠান্দাদান~~ ~~গা,~~ ~~থোকা,~~ ~~ঠান্দাদাদার~~ ~~নামটা~~ ~~মনে~~ ~~হাড়ে~~ ~~তো—~~ ~~বল~~ ~~তো~~ ~~বাবা~~ ~~কি ?~~

কাডে হুঁশিয়া বলিল—~~হুঁহু~~ ~~শায়~~ ~~আহা,~~ ~~তা~~ ~~কি~~ ~~আব~~ ~~মনে~~ ~~হাছে ?~~

অপু বলিল, ~~এ~~ ~~নয়~~ ~~বাবা,~~ ~~অশ্রুব~~ ~~বলতে~~ ~~হয়,~~ ~~শিপি~~ ~~য়ে~~ ~~দিলাম~~ ~~যে~~ ~~সেদিন ?~~

বাণুদিদিব সঙ্গে দেখা হইল পরদিন বেকালে।

সাম্রাৎ ~~এ~~ ~~পুষ্করিণী~~ ~~কোথাক~~ ~~কথাটা~~ ~~বানীব~~ ~~মুখেই~~ ~~শুনিল।~~

বানী ~~এ~~ ~~খানি~~ ~~বাং~~ ~~কা~~ ~~শুনে~~ ~~না~~ ~~নদী~~ ~~ঘাট~~ ~~হইতে~~ ~~বেকালে~~ ~~বিবিত্তেছে,~~ ~~শায়~~ ~~নয়~~ ~~এ~~ ~~কাল~~ ~~দাঁড়~~ ~~ইয়া~~ ~~আছে,~~ ~~সে~~ ~~একা~~ ~~গ্রামে~~ ~~বেড়াইতে~~ ~~বাহির~~ ~~হইয়া~~ ~~হইল।~~

বানী প্র মঃ পঃমঃ খাইয়া গেল—~~এ~~ ~~নেককাল~~ ~~অগেকা~~ ~~একটা~~ ~~ছবি~~ ~~অস্পষ্ট~~ ~~মনে~~ ~~পা~~ ~~ল—~~ ~~লেবেলায়~~ ~~ওই~~ ~~ঘাটের~~ ~~নামে~~ ~~জুজলে~~ ~~ভবা~~ ~~ভিতাটোতে~~ ~~হরি-~~ ~~কাকি~~ ~~বাং~~ ~~কি~~ ~~কো~~ ~~নাম~~ ~~নে~~ ~~ত~~ ~~হা~~ ~~গা~~ ~~উঠিয়া~~ ~~গিয়াছিল~~ ~~তাব~~ ~~পবে।~~

তাদেব বাডিব সেই অপু না? ছেলে বলিব সেই অপু? ~~পবক্ষণেই~~ ~~সম্মলা-~~ ~~ইয়া~~ ~~লি~~ ~~ইয়া~~ ~~সে~~ ~~কা~~ ~~ছি~~ ~~নিয়া~~ ~~ছেলে~~ ~~টির~~ ~~মুখে~~ ~~দিকে~~ ~~চাহিল—~~ ~~অপু~~ ~~ও~~ ~~বটে,~~ ~~নাও~~ ~~বটে।~~ ~~এ~~ ~~বয়সে~~ ~~সে~~ ~~গ্রাম~~ ~~ছাড়িয়া~~ ~~চলিয়া~~ ~~গিয়াছিল~~ ~~তাব~~ ~~সে~~ ~~সময়ের~~ ~~চেহারা~~ ~~খানি~~ ~~বানী~~ ~~মুখ~~ ~~আঁকা~~ ~~আছে,~~ ~~কখনও~~ ~~ভুলবে~~ ~~না—~~ ~~সেই~~ ~~বয়স,~~ ~~সেই~~ ~~চেহারা,~~ ~~অবিবল।~~ ~~বানী~~ ~~বলিল—~~ ~~তুমি~~ ~~কাদে~~ ~~বাডি~~ ~~এসেছ~~ ~~থোকা ?~~

কাল বলিল—গল্পলোদের বাডি—

বানী ~~খাবিল~~ ~~গল্প~~ ~~লো~~ ~~বাবা~~ ~~বডলোক,~~ ~~কলিকাতা~~ ~~হইতে~~ ~~কেহ~~ ~~কুটুম্ব~~ ~~আসিয়া~~ ~~থাকিবে,~~ ~~তাদেব~~ ~~হ~~ ~~ছেলে।~~ ~~কি~~ ~~মাতৃ~~ ~~যেব~~ ~~মত~~ ~~ও~~ ~~মানুষ~~ ~~হয় ?~~ ~~বৃকে~~ ~~ব~~ ~~ভিত~~ ~~বটা~~ ~~চাঁৎ~~ ~~কথিয়া~~ ~~উঠিয়াছিল~~ ~~একে~~ ~~বাবে।~~ ~~গাঙ্গুলী~~ ~~বাড়ির~~ ~~বড~~ ~~মেয়ের~~ ~~নাম~~ ~~করিয়া~~ ~~বলিল—~~ ~~তুমি~~ ~~বুঝি~~ ~~কাহু~~ ~~পিসির~~ ~~নাতি ?~~

কাজল লাজুক চোখে চাহিয়া বলিল—কাহ্নপিসি কে জানি নে তো ? আমার ঠাকুবদাদার এই গাঁয়ে বাড়ি ছিল—তার নাম ঈশ্বর হরিহর রায়—আমার নাম শ্রী অমি শঙ্ক রায় ।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রানীর মুখ 'দয়া কথা বাহিব হইল না অনেকক্ষণ । সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয়ও হইল । রুদ্রনিদ্রাসে বলিল—তোমার বাবা—খোকা ?...

কাজল বলিল—বাবার সঙ্গেই তো কাল এলাম । গাঙ্গুলীবাড়িতে এসে উঠলাম বাত্রে । বাবা ওদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করতে, মেলা লোক দেখা করতে এসেচে কিনা তাই ।...

রানী হুই হাতেব তালু বমো কাজলের সুন্দর মুখখানা লইয়া অদরের সুবে বলিল—খোকন, খোকন ঠিক বাবার মত দেখতে—চোখ দুটি অতিকল । তোমার বাবাকে এ পাড়ায় ঢেকে নিয়ে এসো খোকন । বলগে বাগুণিসি ডাকচে ।

সন্ধ্যা হাণেই ছেলের হাত ধরিয়া অপু বানীদের বাড়ি চুকিয়া বলিল—কোথায় গেলে বাগুদি, চিনতে পার ?... বাগু ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, অর্থাৎ হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া বহিল, বলিল—মনে করে যে এলি এককাল হবে ?—তা ও পাড়ায় গিয়ে ঝলি কেন ? গাঙ্গুলার আশ্রমের লোক হল তো ?... বো লীলাদির মত সেও কাঁদিয়া ফেলিল ।

কি অদ্ভুত পরিবর্তন ! অপুও অর্থাৎ হইয়া দেখিতেছিল চোদ বছরের সে বালিকা বাগুদি কোথায় । বদবার বেশ, বালোর সে লাগণের কোনও চিহ্ন না থাকিলেও রানী দেখনও সুন্দরী কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, শেষব-সজ্জা র'গুদির সঙ্গে ঠিক মিল কোথায় ?... এই সেই বাগুদি ।

কিন্তু সে সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য হইল হৃদয়ে বাডটার পরিবর্তন দেখিয়া । ভুবন মুখখোবা ছিলেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, ছেলেবেলার সে আট-দশটা গোলা, প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, গরুবাছুর, লোকজনের কিছই নাই । চণ্ডীমণ্ডপের ভিত্তি মাত্র পড়িয়া আছে, পশ্চিমের কোঠা ভাঙিয়া কাহারা ইট লইয়া গিয়াছে—বাড়িটার ভাঙা, ক্ষয়, ছন্নছাড়া চেহারা, এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন ?

রানী সজলচোখে বলিল—দেখছিস্ কি, কিছু নেই আর । মা বাবা মারা গেলেন, চুপ, বুড়ীমা এঁশও গেলেন, সবু মা-ও মারা গেল, সু মাথু হ ল না তো, এতদিন বিষয় বেচে বেচে চালাচ্ছে ।' আমায়ও—

অপু বলিল—হ্যাঁ, লীলাদির কাছে সব শুনলাম সেদিন কানীতে—

—কানীতে ? দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর ? কবে—কবে ?...

পরে অপু মুখে সব শুনিয়া সে ভারী খুশী হইল । দিদি আসিতেছে তাহা হইলে ? কতকাল দেখা হয় নাই ।

রানী বলিল—বো কোথায় ? বাসায়—তোর কাছে ?

অপু হাসিয়া বলিল—স্বপ্নে ।

—ও আমার কপাল! কত দিন? বিয়ে করিস্ নি আর?...

সেই দিনই অবার বৈকালে চডক। আর তেমন জাঁকজমক হয় না, চডক গাছ পুঁতিয়া কেহ ঘুরপাক খায় না। সে বালামন কোপায়, মেলা দেবার অঙ্গীর আন্দে ছুটিয়া বাওয়া। সে মনটা আর নাই, কেবল নে-সব অর্পহীন আশা, উৎসাহ, অপর অশ্রুভিত্তিক স্মৃতি মাত্র আছে। এখন যেন সে দর্শক আর। বচনক মাত্র, চন্দ্রিশ বৎসরে মনটা কেমন বদলাইয়া গিয়াছে, বাড়িয়াছে—তাহাবৎ একটা মাপ-কাটি আজ গুটিয়া পাইয়া দেখিয়া অর্থাৎ হইয়া গেল। চডকতলায় পুরানো আমলের কত পরিচিত বন্ধু নাই, নিবারণ গোলালা লাঠি খোলত, ক্ষেত্র কাপালী বজ্রকপাল সাজ দিত, হায়াণ মাল বাঁশের বাঁশি বাজাইয়া বিক্রয় করত, হায়াণ কেহ আর নাই, কেবল পুণাতনের সঙ্গে একটা খোগ এখনও আছে। চিনিবাস বেবাগী এখনও তেলভাড়া খাবারের দোকান করে।

আজ চন্দ্রিশ বছর আগে এই চডকেব মেলায় পরদিনই তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—তাবপর কত দুঃখ বিপদ, কত নূতন বন্ধুবান্ধব সব, গোটা জীবনটাই—কিন্তু কেমন করিয়া এত পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও সেই দিনটি অশ্রু ৩৩ লর স্মৃতি এত সজীব, টানকা, তাজা অবস্থায় আজ আবার ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চডকেব মেলা দেখিয়া হাসিমুখে ছেলেমেয়েবা ফিরিয়া যাইতেছে, কাণ্ড হাতে বাঁশের বাঁশি, কাণ্ড হাতে মাটির বৎ করা ছোবা পালাক। একদল গেল গাঙ্গুলীপাণ্ডাব দিকে, একদল সোনাডাঙ্গা মাঠের মাটির পথ বাহিয়া, ছাতিমবনের তলায় খুলজুড়ি মাংসপূরের খেয়াঘাটে—চন্দ্রিশ বছর আগে বাহারা ছিল ছোট, এই একম মেলা দেখিয়া ভেঁপ, বাগাইতে বাজাইতে তেলভাড়া, জিবে-গড়া হাতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহাও অনেকদিন বড় হইয়া নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঢুকিয়া গিয়াছে—কেউ বা মারা গিয়াছে; অতএব তাদের ছেলেমেয়েদের দল ঠিক আবার তাহাই কবিতা, মনে মনে আজিকার এই নিস্পাপ, দারিদ্র্যহীন জীবনকোরক-গুলিকে নে আশীর্বাদ কবিল।

বৈশাখের প্রথমেই লীলা তাব দেওনের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরে আসিল। দুই বোনে অনেকদিন পরে দেবা, দুই জনে গলা ডবাইয়া কাঁদিতে বসিল। অপুকে লীলা বলিল—তোব মনে যে এত ছিল, তা কি জানি? তোর কলাগেই বাপের ভিটে আবার দেখলুম, কখনও আশা ছিল না যে আবার দেখব। থোকাব গুণ্য কাশী হইতে একশাশ খেলনা ও খাবার আনিয়াছে, মহা খুশীর সহিত পাডায় ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিল।

অপু বৈকালে ছেলেকে লইয়া নৌকায় খাবাপোতার ঘাট পর্যন্ত বেড়াইতে গেল। তেঁতুলতলার ঘাটের পাশে দক্ষিণদেশের ঝিনুকতোলা বড় নৌকা বাঁধা ছিল, হাওয়ায় আলকাতরা ও গাবের রস মাখানো বড় ডিঙিগুলার শৈশবের

সেই আঁড়ি পুরাতন বিশ্বস্ত গন্ধ... নদীর উত্তর পাড়ে ক্রমাগত বলবন, ওকুড়া ও
বস্ত্রগুড়োর গাছ, চালু ঘাসের জমি ছলল কিনারা ছুঁইয়া আছে, যাবো যাবে
ঝিঙে পটলের ক্ষেতে উত্তরে মজুরেরা চৌকা মাথায় নিডান দেয়, এক এক
স্থানে নদীর জল ঘন কালো নিখর, কলাব পাটব মত সমতল - যেন মনে হয়,
নদী এখানে গহন, গভীর, অতলস্পর্শ - ফুলে ভরা টুলবুড়ো মাঠে, আকন্দবন,
উঁচু খেজুর বঁদি হলনো খেজুর গাছ, উটচিঁচি, ব. কা দল উঁচু শিমুল
ডালে চিলের বাসা—সবাই পূর্বের মতোই 'দিক ওঠে' বড় কখাঁক খামুট
পাখি মধুখালি বিলে দিকে গেল—একটা বাবলগায়ে অতল বন দুঁদল ফল
হালতে দেখিয়া খোকা আশ্রয় দিয়া দখাইয়া বলিল ওই দেখ বাবা, সেই
যে কলকাতায় আমাদের গলব মোটে বিক্রা হয় গায়ে দাবান মাথাবা তগো
কত ঝলচে দেখ, ও কি ফল বাবা ?

অপু কিছু নিবাক হইয়া বসিয়াছিল। কতকাল সে এসব দেখে নাই।
 ...পৃথিবীর এই মুক্ত দেশ তাহাকে যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দ উগ্রবীর যুগের
 মত নেশাব ঘোর আনন্দ তাহাব শিরায় বয়ে, তাহা অচুত করিয়া ফেলে,
 অক্ষর করিয়া ফেলে, তাহা অবশ্যই। ইহাদের যে গোপন বাণী শুধু
 তাহাদের মনের কানে কানে মুখে তাহা বলিয়া বুঝাইবে, সাক্ষ্যকে ?
দূর গ্রামের জাওয়া-বাঁশের বন অস্ত্র আকাশের রাঙা রং আতঙ্কায় লাগিয়া
পাখি পুচ্ছেব মত খাড়া হইয়া আছে, একবারে দু' দূর পাড়ে সাঁঝা পাড়-
শালিকেব গর্ত, কি অপর সংমলণ, কি সংস্কার-প্রাণ।

কাঁচল বলিল—বেশ দেশ বাবা না ?

—তুই এখানে থাক খোকা—আমি এদ থেকে এটি এখানে, পাক্তে পারব
 নে ? তোমার মিমার কাছে থাকবি কেমন তো ?

কাঁচল বলিল—হ্যাঁ, ফেলে বেথে যাবে, বাকি ? আমি তোমার সঙ্গে যাব
 বাবা।

অপু ভাবিতেছিল শৈশবে এটি ইহামতা ছিল তার কাছে, এ কলনায় ভরা।
 গ্রামের মশের বর্গদিনের তলকাদা মশ মদবাতি, ধোঁয়া-গাওয়া আঁচল
 মাটির গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাইয়া সে মুক্ত আকাশের তলে নদীর পাড়িতে
 আসিয়া বসিত। কত বড় নৌকা ওপ ওপ দিয়া দূর দেশে চলিয়া যািত।
 কোয়ার আলফাটি, কোয়ার বাঁশাল, কোয়ার রায়মসল—অজানা দেশের
 অজানা কলনায় মুগ্ধ মনে কতদিন সে না ভাবিয়াছে, সেও একদিন এটি একম
 নেশাল মন্দির বড় ভিত্তি করিয়া নিকুদেশ বা পতাকাওয়া ব'হা হইয়া
 যাইবে।

ইহামতী ছিল পাড়ারগ্নের গরীব ঘরের মা। তার ভাবের আকাশে-
 ব্যতাসের সঙ্গীত মায়েব মনের ঘুম-পাড়ান গানের মত শত স্নেহে তার নব-
মুকুলিত কচি মনকে মাণুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তার ভাবের সে সময়ের কত
আকাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্য, রোমাঞ্চ,—তার : তার ছিল দূরের অদেখা বিদেশ, বর্ধার

দিনে এই ইচ্ছামতীর কূলে-কূলে ভরা ঢলঢল গৈরিক রূপে সে অজানা মহাস-
 মুদ্রের গীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখিত—ইংরাজি বই—এ পড়া Cape Nun-
 এর ভদিকো দেশটা—যে দেশ হইতে লোক আর ফেরে না—He who
 passes Cape Nun will either return or not—মুগ্ধচেখে
 কুলচাপানো ইচ্ছামতী দেখিয়া তখন সে ভাবিত—ও, কত বড় আমাদের এই
 গাওঁটা ।...

এখন সে আর বালক নাই, কত বড় বড় নদীর ঢুকুল-ছাপানো লীলা
 দেখিয়াছে—গঙ্গা, শোণ, বড়দল, নর্মদা—তাদের অর্ধ সন্ধ্যা, অর্ধ বর্ণদস্তার
 দেখিয়াছে—সে বৈ চিত্রা, সে প্রথমতী ইচ্ছামতীর নাই, এখন তার চোখে
 ইচ্ছামতী ছোট নদী। এখন সে বুঝিয়াছে তার গরীব ঘরের মা উৎসবদিনের
 যে বেশভূষায় তার শৈশব-কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া দিত, এসব বনেদী বড় ঘরের
 যেয়েদে হারামুকাব ঘটা, বাগানদী শাড়ির বংচ—এর কাছে তার মায়ের সেই
 কাচের চুড়ি, শাঁখা কিছুই নয়।

কিন্তু তা বলিয়া ইচ্ছামতীকে সে কি কখনো ভুলিবে ?

দুপুরে সে ঘরে দাঁকিতে পাবে না। এই চৈতন্যপুরের বোদের উম্ম নিঃশ্বাস কত
 পরিচিত গন্ধ বাহিয়া আনে—শুকনো বাশের খোলাব, ফুটন্ত ঘেঁটুবনের,
 ঝাঝ পাতাব, সোঁদা সোঁদা বোদপোড়া মাটির, নিম ফুলের, আরও কত কি
 কত কি,—বালো এই সব দুপুরে তাকে ও তাহার দ্বিদ্ধিকে পাগল করিয়া দিয়া
 টোঁটো করিয়া শুধু মাঠে, বাগানে, বাঁশতলায়, নদীর ধারে বুঝাইয়া লইয়া
 বেড়াইত—আতও সেই বকমতী পাগল করিয়া দিল। গ্রামসুদ্ধ সবাই দুপুরে
 ধুয়ায়—সে একা একা বাহি হয়—উদ্ভ্রান্তের মত মাঠেব ঘেঁটুফুলের ভরা উঁচু
 ডাঙায়, পথে পথে নিগম দুপুরে বেড়াইয়া ফেবে—কিন্তু তবু মন হয়, বালোর
 স্মৃতিতে বঁটা আনন্দ পাইতেছে, বর্তমানের আসল আনন্দ সে ধবনের নয়—
 খানপ আছে, কিন্তু তার পরতি বদলাইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে দেব-
 দেবীরা নিমিদ্দিপুবে বাঁশবনের ছায়ায় এই সব দুপুরে নামিয়া আসিতেন।
 এক একদিন সে নদী ধাবের সুগন্ধ তুঁতু মতে চুপ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া
 শুইয়া থাকে ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা, কিছুই করে না, বোধহয় নাল আকাশটাব
 দিকে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া থাকে—কিছু ভাবেও না—সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ
 বুঝাইয়া মনে মনে বলে—ওগো ম'তুঁমি, তুমি ফেলেবোলায় যে অমৃতদানে
 ম'খ করেছিলে, সেই অমৃত হ'ল আমার জীবন-পথের পাথর—তোমার
 বনের ছায়ায় আমার সকল দুঃখ জন্ম নিয়েছিল একদিন, তুমি আমার শক্তি
 দাও, হে শক্তিকরমি—

তখন হয় কলিকাতার ছাত্রটিব জন। এদের বাপের বাড়ি বোঝাজারে,
 মামার বাড়ি পটুয়াটোলায়, পিসির বাড়ি বাগঝাজারে...বাংলাদেশকে দেখিল
 না কখনও। এরা কি মাসপুৰ গ্রামের উলুখড়ের মাঠের ও—এবের আকাশে
 রং-ধা দেখিল? শুক শবৎ-দুপুরেব ঘন বনানীর মধ্যে ঘুঘু ডাক শুনিয়াছে?
 বন-অপবাজিতা ফুলের নীরব মহোৎসব এদের শিক-আত্মায় তার আনন্দের

স্পর্শ দিয়াছে কোনও কালে ? ছোট মাটির ঘরের দাওয়ায় আসনপিঁড়ি হইয়া
বসিয়া নারিকেল পত্রাখায় জোৎস্নার কাঁপন দেখে নাই কখনও—এরা অতি
ইতভাগ্য ।

রানী যত্নে আদরে সে মুগ্ধ হইয়া গেল । সত্বদের বাঁতিব সে-ই আজকাল
বত্ৰী, নিজের ছেলেমেয়ে হয় নাই, ভাইপোদের মাথুষ করে । অপুকে রানী
বাঁড়িতে আনিয়া বাঁধল—কাঁড়কে দু দিনে এমন আপন কবিতা লইয়া
ফেলিয়াছে যে সে পিসিমা বলিতে অজ্ঞান । বানীব মনে মনে ধাবণ, অপু
সহবে থাকে যখন, তখন দুব চায়ের ভাঙ,—হুঁটি বেলা ঠিক সময়ে চা দিবার
জগ্য তাহার প্রাণপণ চেষ্টা । চায়ের কোন সবজ্যম ছিল না, লুকাইয়া নিজের
পল্লসায় সত্বকে দিয়া নবাবগজের বাজাব হইতে চায়ের ডিস্ প্লেসলা আনাংয়া
লইয়াছে—অপু চা তেমন খায় না কখনও, কিন্তু এখানে সে সেকথা বলে না ।
ভাবে—যত্ন করচে রাণুদি করুক না । এমন যত্ন আর ছুটেবে কোথায় ? হুঁ মও
যেমন ।

দুপবে একদিন খাইতে বসিয়া অপু চুপ কবিতা চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে ।
রানীর দিকে চাহিয়া হাঙ্গিয়া বলিল—একটা বড় চমৎকার ব্যাপার হ'ল—
দেখো এই টেকে-বাওয়া এঁচড-চচ্চি এতক'ল খাই নি—নিশিচিন্দ্রিপুর ছেড়ে
আর কখনও নয়—তাই মুখে দিয়েই ছেলেবেলা'র কথা মনে পড়ে গেল রাণুদি—
রাণুদি বোধে এসব কথা—তাই রাণুদির কাছে বলিয়াও সুব ।

এ কয়দিন আকাশটা ছিল মেঘ-মথ । কিন্তু হঠাৎ কখন মেঘ কাঁটিয়া
গিয়াছে দেখানে না—বৈকাল দুম নাড়িয়া টটিয়া সে অবাক চোখে চুপ
করিয়া বাহিরে বোয়াকে বসিয়া বসিল—বালাব সেই অপু বৈকাল—
যাহার জগ্য প্রথম প্রথম বিবহা বলক-মন কত হাঁপাইয়াছে বিদেশে—এমন
একটা সম্পত্তি মরুব স্মৃতিম ত্র মনে আঁকিয়া রাখিয়া দেও কবে মন হইতে
বেমানম অন্তহিত হইয়া গিয় ছিল—

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় এই সব সময়ে দুম ভাঙিয়া তাহার মনটা কেমন
অকারণে ব্যাপ্ত হইত—এক একদিন কেমন কান্না আনিবে, বিচান'য় বসিয়া
ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিত—গ্রাহর মা ঘাট হইতে আনিয়া বসে—ও ওট
উড়ে গেল...ও-ও ওট...কৈদো না খোকা, বাইরে এসে পাখি দেখসে ।
আহা হা, তোমার বড় দুখ'খু খে বন্—তোমার নাতি মরেছে, পুতি মরেছে,
সাত ডিঙ খন সমুদ্রের ডুবে গিয়েছে, তোমার বড় দুখ'খু কৈদো না কৈদো
না, আহা হা ।

রানী পাতকুয়া হইতে ডল হুগিয়া আনিতে যাইতেছে, অপু বলিল—মনে
পড়ে রাণুদি, এই উঠানে এমন সব বিকেলে বৌ-চুরি খেলা খেলতুম কত, তুমি
আমি, দাদি, সহু, নেডা—?

রাণু বলিল—আহা, তাই বুঝি ভাবচিস্ বসে বসে । কত মালা গাঁথতুম
মনে আছে বকুলতলায় ? সারাদিন বকুলতলাতেই পড়ে আছি, আমি, হুগুগা

— আজকাল ছেলেমেয়েরা আর মালা গাঁথে না, বকুল ফুলও আর তেমন পড়ে থাকে না—কালে কালে সবই যাচ্ছে।

কিছু পরে ওল লইয়া ফিরিবার সময় বলিল—এক কাজ করো না কেন অপু, সুতোর তোর নীলমণি জ্যাঠার দরুন জমাটা ছেড়ে দেবে, তুই কেন গিয়ে বাগানটা নিগে যা না? তোদেবই তো ছিল—ও যা, নিজের জমি-জমাই বিক্রী করে ফেললে সব, তা আবার জমা বাগান হবে—নিবি তুই?
অপু বলিল—মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, রাণুদি। মদবার কিছুদিন আগেও বলত বহলে বাগানখানা নিস্ অপু। আমায় আপত্তি নেই, যা দাম হবে আমি দেব।

প্রতি সন্ধ্যায় সতুদেব বোয়াকে মাতুর পাতা হয়, রানী, লীলা, অপু ছেলোপলদের মজলিস বসে। সতুও যোগ দেয়, তবে তামাকের দোকান বন্ধ করিয়া আসিতে তাহার রাত হইয়া যায়। অপু বলে—আচ্ছা, আজকাল তোমরা ঘাটের পথে ষাঁড়ভাওয়াল পিঠে দাও না রাণুদি? কই সেই ষাঁড়ভাওয়া ছটা তো নেই সেখানে? রানী বলে—সেটা মবে গিয়েছে তাব পাশেই একটা চাবা, দেখিস নি সিঁহর দেওয়া আছে?...নানা পুর্বনো কথা হয়। অপু জিজ্ঞাসা করে—ছেলেবেলায় একবার পঞ্চপালের দল এসেছিল, মনে আছে লীলাদি?...গ্রামের একটি বিবো যখন নববধূরূপে এ গ্রামে প্রথম আসেন, অপু তখন ছেলেমাথুষ। তিনিও সন্ধ্যার পবে এ বাড়িতে আসেন। অপু বলে—খুড়ীমা আপনি নতুন এসে কোথায় ভুপে-আলতার পাথবে দাঁড়িয়ে ছিলেন মনে আছে আপনার? বিবোটি বলেন—সে সব কি আর এ জন্মের কথা, বাবা? সে সব কি আর মনে আছে?

অপু বলে—আমি বলি শুনুন, আপনাদের দক্ষিণের উঠানে যে নীচ গোয়াল-ঘরটা ছিল, তাব ঠিক সামনে। বিবো মেয়েটি আশ্চর্য হইয়া বলেন—ঠিক, ঠিক, এখন মনে পড়েছে, এত দিনের কথা তোমার মনে আছে বাবা!

তৌদেবই বিবির আব এক বিবাহে কোবা হইতে তৌদেব এক কুটুম্বিনী আসেন খুব সুন্দরী—এতকাল পবে তাঁর কথা শুনে। সবাই তাঁকে দেখিয়াছিল সে সময়, কিন্তু নামটা কহাও মনে নেই এখন। অপু বলে—দাঁড়াও রাণুদি, নাম বলছি—তার নাম সুবাসিনী। সবাই আশ্চর্য হইয়া যায়। লীলা বলে—তোর তখন বয়েস আট কি নয়, তোর মনে আছে তার নাম?—ঠিক, সুবাসিনী বটে। সবারই মনে পড়ে নামটা। অপু যুহু হাসিমুখে বলে—আরও বলছি শোনো, ড্রি শাড়ি পরত, রাঙা জামার ওপর ডুরে দেওয়া—না? বিবো বধুটি বলেন, ধনি বাপু! হোক, রাঙা ডুরে পরত ঠিকই, বয়েস ছিল বাইশ-তেইশ। তখন তোমার বয়েস বছর আটেক হবে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেকার কথা যে!

অপু খুব মনে আছে, অত সুন্দরী মেয়ে তাদের গাঁয়ে আসে নাই ছেলেবেলায়। সে বলিল—রাঙা শাড়ির পরে আমাদের উঠানে কাঁঠালতলার জল সহিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখনও।

এখানকার বৈকালগুলি সত্যি অপরূপ। এত জামগায় তো সে বেড়াইল, মাস-
খানেক এখানে থাকিয়া মনে হইল এমন বৈকাল কোথাও দেখে নাই। বিশেষ
কবিতা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে। মেঘহীন এই বৈকালগুলিতে সূর্য যেদিন অন্ত
যাইবার পথে যোবারত না হয়, শেষ ঝড়ি আলোঁটু পথগত বড় গাছের মগডালে
বাঁশকাণ্ডের আগার হালকা দিহুবের বড় মাখাইয়া দেয়, সেদিনের বৈকাল।
এমন বিলুফুলের অপরূপ সুবর্ণ-মাখানো, এমন পাখি ডাকা উদ্ভাস বৈকাল—
কোথায় এর তুলনা? এত বেলগাছও কি এ দেশটায়, ঘাটে, পথে, এ-গাড়া,
ও-গাড়া সবত্র বিলুফুলের সুগন্ধ।

একদিন—জ্যৈষ্ঠের প্রথমটা, বৈকালে আকাশ অন্ধকার কবিতা ঈশান কোণ
হইতে কালবৈশাখীর মেঘ উঠিল, তাব পরেই খুব ঝড়, এ বছরের প্রথম
কালবৈশাখী। অপু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—তাদের
পোড়োভিটার বাঁশবনের মাথার উপরকার দৃশ্যটা কি সুপরিচিত! বালো
এই মাথাগুলানো বাঁশঝাড়ের উপরকারের নীলকুম্ভ মেঘসজ্জা মনে কেমন সব
অনতিশ্রুতি আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইত, কত কথা যেন বলিতে চাহিত, আহুও
সেই মেঘ, সেই বাঁশবন, সেই বৈকাল সবই আছে, কিন্তু সে অপরূপ জগৎটা আর
নাই। এখন যা আনন্দ সে শুধু স্মৃতির আনন্দ মাত্র। এবার নিশ্চিন্দ্রপূর্ব
ফিরিয়া অবধি সে ইহা লক্ষ্য করিতেছে—এই বন, এই ছপু, এই গভীর গায়ে,
চৌকিদারের হাঁকনি, কি লক্ষ্যপেঁচাব ডাকেব সঙ্গে এক অপরূপ স্বপ্ন মাখানো
হিল, দিগন্ত রেখার ওপরেব এক বহুসময় করলে কত বন সদানন্দা হ'ত ছানি
দিয়া আহ্বান করিত—তাদের সন্ধান আর মেল না।

সে পাখির দল মায়া 'গিন্ন'ে, তেমন তপু আর হয় না; যে ঠাঁয় এমন
বৈশাখীতে খেঁচের ঘরের দাওয়াব দায়ে নাকিল প্রতাপায় জোড়ায়
কম্পন আনিয়া এক ক্ষুদ্র করল প্রবণ গ'মা বালকের মনে মুহূর্ত, কাহ'ন
আনন্দের বান ঢাকাইত, সে সব চাঁদ নিশিয়া গিয়াছে। সেই বালকটি বা
কোথায়? পচিশ বৎসর আগেকার এক ছপু বা মায়ের সঙ্গে দেশ চ'ড়িয়া
চলিয়া গিয়াছিল, আর নেই নাই, জাওয়া-দায়েব বনের পথে তাব ছোট ছোট
পায়ের দাগ অক্ষয় হইয়া গিয়াছে বহুদিন।

তার ও তার দল সে সব আশা পূর্ণ হইয়াছিল কি?

হ'ল অর্ধেক বালক-মা লগা।

রোজ বোঝ বৈকালে যেন হয়, ঝড় ঝেঁ। অপু বলে, বাণ দি আম ক ডয়ে
আনি? রানো হায়ে। অপু সেলে ক লয়া ন গুন-কেনা ব'গানে আসিয়া
দাঁড়ায়—সবটিকে আম কুড়াইতে গকে, ক'ছাকেও বাঁশ দেয় না। বালোর
সেই পালে, টেঁকলতলা, নেকা, বাঁশতলা—খন ম'ঘর ছায়ায় সেলে গাডার
তো আ'লর ক'ব'নীতী নামা হ'তে আম কুড়াইতে আসে। অপু ভাবে, অ'হা,
জীবনে এত এদের কত আনন্দের কত সর্গকথাব জিনিস। চাখিনারে
চ'হিয়া দেখে, সমস্ত ব'গানের তল'টা দাবমান, কোতুকপন, চাৎকাররত বালক
বালিকাতে ভরয়া গিয়াছে।

দিদি ভুগা, ছোট যেয়েটি, এই কাজলের চেয়ে কিছু বড়, পরের বাগানে আম ফুটাইবার অপরাধে বনুনি খাওয়া কৃত্রিম উল্লাসভাষা হৃদয়যুক্ত একদিন ওই ফণিমন্সাব নোপের পাশের বেড়াটা গলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—বহু কালের কথা।

অপু কি কাবে আম বাগানে? এত সব গম্বীর ঘরের ছেলে মেয়ে! সাধ মিটাইয়া আম খেতে ইবে এ বাগানে, কেহ তাহাদের বাবু, কবিবার থাকিবে না বাবুবার থাকিবে না, অমান কবিবার থাকিবে না, ফণিমন্সাব নোপের আড়ালে অপর্যাপ্ত ছোট দুকাটি বুলুমাখা খাঁচল গুচ্ছাইয়া লইয়া ফিঙ্গিয়া দাড়াইয়া মৃত মৃত চন্দ্রি হাঁস হাঁস হবে...

এতদিন সে এখনে আসলেও নিঃশব্দেব ভিতাটতে ঢুকিতে পারে নাই, যদিও বাহির হইতে সেটা প্রতিদিনই দেখিত; কাবু ঘাটের পদটা তাব পাশ দিয়াত। বাকালের দিকে সে একদিন একা চুপ চুপ বনজঙ্গল তেলিয়া দেখানে ঢুকিল। বাঁটা আব নাট পিঁয়াজ ইট স্ত্রীপাকার হইয়া আছে—লতাগা, আঙুড়াবন, বনচলেতাগ গছ, ছেলেবেলাকাল মত কালমেঘের জঙ্গল। শিখনের বাশঝাঙুলো এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাড়িয়া চারিদারে ফুটিয়া উঠছে।

কোনও ঘরের চিহ্ন নাই, বন জঙ্গল, বাঙা গোধ বাঁশের মগধালে। পশ্চিমার পাতিলা গায়ে সেটা কলু গাও আছে, ছেলেবেলায় যে কলুগিটতে সে ভাঁটা বাতাবীলপু বন, কাড় পাখিত এত নিচু কলুগিটা তখন কত উঁচু বলিয়া মনে হইত, তাহাব মাঝা খাড়াইয়া উঁচু ছিল, ডিঙ্গাইয়া দাঁড়াইলে তবে নাগাল পাওয়া হইত। ঠেদেদেওয়ালের গায়ে ছুটি দিয়া ছেলেবেলায় একটা ভূত থাকাইয়াছিল, সেটা এখনও আছে। পাশেই নীলমণি জাঠামশায়ের গোড়োভিতা—সেও ঘন বনে ভাঁটা চারিদার নিঃশব্দ, নির্জন—এ পাড়াটাই জনহীন হইয়া গিয়াছে, এখান দিয়া লোকদের যাওয়াত বড় কম। এই সে স্থানটি, কতকাল আগে যেখানে দিদি ও সে একদিন চড়ুইভাতি করিয়াছিল। কটকাকাণি শেয়া'ল বনে দুর্গম দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছে সারা জায়গাটা। গোড়োভিতার সঙ্গে বেলগাছটা—একদিন যার তলায় ভীষ্মদেব শবশবা পাতিতেন তাহাব নয় বৎসরের শৈশবে—সেটা এখনও আছে, পুষ্পিত শাখা-প্রশাখা অপূর্ব দ্বাসে অ বাহুব বাতাস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

পাঁচলো ধুলবুলটা কত নিচু বলিয়া মনে হইতেছে, এইটাত্তই অপু আশ্চর্য হইল—বাব বাবা কথা তাম মনে হইতেছিল। কত ছোট ছিল সে তখন! পোকাব মত অতটুবে হইয়।

কাঁচাকলায়ে ডালের মত সেট কি লতাব গন্ধ বাহির হইতেছে!...কতদিন গন্ধটা মনে ছিল না, বিদেশে আব সব কথা হস্তত মনে পড়িত পাবে, কিন্তু পুরাতন দিনের গন্ধগুলো তো মনে পড়ে না—

এ অভিজ্ঞতায়া অপূর্ব এতদিন ছিল না। সে দিন বাঁওডের ঘাবে বেড়াইতে গিয়া পাক্কা বটফলের গন্ধে অনেকদিনের একটা স্মৃতি মনে উদয় হইয়াছিল—

ছোট কাচের পরকলা বসানো ঘোমবাতির সেকেন্দ্রে লঠন হাতে তাহার বাবা শশী খোগী দোকানে আলকাতরা কিনিতে আসিয়াছে—সেও আসিয়াছে বাবার কাঁচে চড়িয়া বাবার সঙ্গে—কাচের লঠনের ক্ষীণ আলো, আধ-অন্ধকার বাঁশবন, বাঁওড হইতে নাল ফুল তুলিয়া বাবা তাহার হাতে দিয়াছে—কোন্ শৈশবের অস্পষ্ট ছবিটা, অবাস্তব, ধোয়া-বোয়া। পাকা বটফলের গন্ধে কতকাল পরে তাহার সেই অত্যন্ত শৈশবের একটা সন্ধ্যা আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন।

পোডোভিটার সীমানায় প্রকাণ্ড একটা খেজুর গাছে কাদি কাদি ডাঁসা খেজুর ঝুলিতেছে—এটা সেই চাশা খেজুর গাছটা দি'দ যার ডাল কাটারি দিয়া কাটিয়া গোড়ার দিকে দড়ি বাঁধিয়া বেলাঘরের গরু কাঁবত—কত বড় ও উঁচু হইয়া গিয়াছে গাছটা।

এইখানে খিডকদোবটা ছিল, চিরুণ নাই কোনও। এইখানে দাঁড়াইয়া দিদির চুরি-কবা সেই সোনার কোঁটাটা ছুঁইয়া ফেলিয়া দিয় ছিল একদিন। কত সুবিচিত্র জিনিস এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আঁও আছে। সাতী গাছের বিচালি বাওয়ার মাটিব নদাটা কাঁঠালতল'য় বাঁশপাতা ও মাটি বোঝাই হইয়া এখনও পড়িয়া আছে। হেলেবেলায় ঠেসদেওয়ায় পাখান ডগা বাঁবা মজুর দিয়া এক ভায়গ'য় তট জুড় ক'িয়া বাঁখিখাছিলেন... অর্থাৎ বে পাঁপা হয় নাই। ইংগুলা এখনও বাঁশবনের ছায়ায় তেমনি পড়িয়া আছে। কংকাল আগে মা তাকে টান জলদ'নে পাওরা মেটে কলসী তুলিয়া বাঁখিখাছিল, সংসারের প্রয়োজনের জন্য—পড়িয়া মাটিতে অর্ধপ্রাণিত হইয়া আছে। সকলের ক্ষুধা সেই ঘন অন্ধ হইয়া গেল... পড়িলে সেই দলদলটা আজও নতুন অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়া—বালি... একটা খসে নাহি বেল কালকের তৈরী—এই ভঙল ও পদ'সত্ত্বের মধ্যে ক' হইবে ও ক'নসিটে ?

খিডকদোবের পাশে উঁচু ভূমিতে মায়েব হাতে পোঁতা সজ্জনে গাছ এখনও আছে। খাইবান বছরখানেক আগে মাত্র মা ডালটা পুঁয়াছিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গাছটা বাড়িয়া বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছে—ফল বাইতে আর কেহ আসে না—জঙ্গলে চাকিয়া পড়িয়া আছে এতকাল—অবাকের বাঁড়া রোদ গাছটার গায়ে পড়িয়া কি উদাস, বিষাদম'খা দৃশ্যটা ফুটাইয়াছে। ... ছায়া ঘন হইয়া আসে, কাঁচাকলায়েব ডালের মতো

ঘন হয়—অপূর শরীর যেন শিহরিয়া ওঠে—এ গন্ধ তো শুধু গন্ধ নয়—এই স্পন্দন এই গন্ধ সঙ্গে জড়ানো আছে মায়েব কত রাত্রেব আদিবের পাক, হিন্দির কত কথা বাবার পদাবলী গানের সুর, বালোর ঘরোয়ার সুগন্ধ ছায়া—কত কি—কত কি—

ঘন বনে ঘুঘু ডাকে, ঘুঘু—ঘু—

সে অন্ধ চোখে রাজারোদম'খানো সজ্জনে গাছটার দিকে আবার চায়—
বলেইয় এ বন, এ সুশকার হটের রাশি, এ সব যুগ—এ সব মাঝে হইতে
সন্ধ্যার গা ধুইয়া ফিরিয়া ফরসা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়খানা উঠানের

বাঁশের আনলায় খেলিয়া দিবে, তারপরে প্রদীপ হাতে নক্ষা দিতে দিতে
তাঁহাকে দেখিয়া ধমকাইয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিবে—
এত সন্ধো করে বাড়ি ফিরলি অপু?

ভিটাচ চারিদিকে খোলামুচি, ভাঙা কলসী, কত কি ছড়ানো—ঠাকুরমার
পোড়োভিটাতে তাঁঁ পা রাখিবান স্থান নাই, রক্তিম পোয়াটে কতদিনের ভাঙা
খাপ্পা, খোলামুচি বাহির হইয়াছে। এগুলি অপুকে বড় মুগ্ধ করিল,
সে হাত করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতদিনের গৃহস্থ-জীবনের
সুখ-দুঃখ এতলোব সঙ্গে ছড়ানো। না পিছনেব বাঁশবনে এক জায়গায়
সংসারের ছাড়াছাড়ি ফেলিত, সেগুলি এখনও সেইখানেই আছে। একটা
আন্ধে। ঠাণ্ডা গড়িবার মুচি এখনও অতঃপ অবস্থায় আছে। অপু, অবাক হইয়া
ভাবি, কোন আনন্দ-ভরা শৈশব-সন্ধ্যার সঙ্গে ও সব সম্বন্ধ ছিল না। জারি
উঠানের মাটির খোলামুচির মধ্যে সবুজ কাঁচের চুড়ি টুকরা পাওয়া গেল।
হয়ত তার দিদির হাতের চুড়ি টুকরা।—এ পরনের চুড়ি ছোট মেয়েরাই
পড়ে—টুকরাটা সে হাতে তুলিয়া লইল। এক জায়গায় আঁখানা বোতল
ভাঙা—ছেলেবেলায় এ পরনের বোতলে মা নানিকেল তৈল বাখিত—হয়ত
সেই

একটা দৃশ্য তা'র বড় মুগ্ধ করিল। তাদের বামাঘরের ভিটা ঠিক যে কোণে
মা বাঁশিবার হাঁতিড়ি রাখিত—সেখানে একখানা কড়া এখনও বসানো
অছে, মটিচা'র মা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, অংটা খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু
মাটিতে বসিয়া। ওষা'র দরুন একুও নড়ে নাই।

তাঁহা যেন বামা-খাওয়া সাবিতা এ'র ছাড়াই নওনা হইয়া ছিল—আজ
চন্দ্রিণ বৎসর পূর্বে, মা এঁটো কড়াখানাকে ওইখানেই বসাইয়া রাখিয়া
চলিয়া গিয়াছিল কে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওখানা ঠিক আছে
এখনও।

কত কথা মনে ওঠে। একজন মানুষের অন্তর্বর্তম কাহিনী কি অন্য মানুষ
বোঝে। বাহিরের মানুষের কাছে একটা জটলে ভরা পোড়ো-ভিটা
মাত্র—ডিপো। তুচ্ছ জিনিস। কে বুঝিবে চন্দ্রিণ বৎসর পূর্বেব এক
দরিদ্রঘরের অর্ধা। বালকের জীবনের আনন্দ-মুহুর্তগুলির সহিত এ
জায়গায় কত যোগ ছিল?

ত্রিণ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার, তিন হাজার বছর কাটিয়া যাঁইবে—তখন এ
গ্রাম লুপ্ত হইবে ইচ্ছামতাই চন্দ্রিণা যাঁইবে, সম্পূর্ণ নতুন মনুষ্য সভ্যতা, নতুন
ধর্মের বাজেনৈতিক অবস্থা—যাদের বিষয় এখন কল্পনা করিতেও কেহ সাহস
করেনা তখন য'নিরে জগতে। ইংরেজ জাতির কথা প্রাচীন ইতিহাসের
বিষয়ভূত হইয়া দাঁড়াইবে বর্তমান বাংলা ভাষাকে তখন হয়তো আর কেহ
বুঝিবে না, একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ অন্য ধর্মের ভাষা এদেশে
প্রচলিত হইবে।

তখনও এই বকম বৈকাল, এই বকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হা নাই'র

পুরের বৈশাখ দিনের শেষে। তখনও এই রকম পাখি ডাকিবে, এই রকম
 চাঁদ উঠিবে। তখন কি কেহ ডাকিবে তিন হাজার বছর পূর্বের এক, বিষ্মৃত
 বৈশাখী বৈকালে এক গ্রামা বালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম রম্য গন্ধে,
 ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব আনন্দে তুলিয়া দিঠি—এই দ্বন্দ্ব অপবাক্য তার মনে
 কি আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাগাইয়া তুলিত? তিন হাজার বছরের প্রাচীন
 ভোগ্য একদিন কে'ন মাস্তুলে তার শৈশব-মনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল?
 নিঃশব্দে শব্দে হুপরে বন খেঁজাডাত সে ক্ষুদ্র নয় বৎসরের বালকের মনের
 বিচিত্র অনুভূতিরাজিবি হাঁহুস কোথায় লেখা থাকিবে? কোথায় লেখা
 থাকিবে বিষ্মৃত অতীতে তার সে সব আনন্দভাণ্ডা ভাবন। এ, বদেশ হুহুতে
 বহুদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া আসিবে হাতে বেলেব শব্দে খাওয়াই সে মনঃমুগ্ধ চৈত্র
 অপরাহুতি, বাঁশবনের ছায়ায় অপবাক্যে নিদ্রা ভাঙিয়া গাঙ্গিয়ার সে
 মনমাতানো ডাক, কোথায় লেখা থাকিবে বর্ষাদিনের রক্তিসিঁড়ি বা ব্রতলব সে,
 সব আনন্দ-কাহিনী।

দূর ভবিষ্যতের যেসব তরুণ বালকবালিকা'ব মনে এইসব কালবৈশাখী নব
 আনন্দের বাতী আনিবে, কোন্ পথে তারা আসিবে?
 বাহির হইয়া তা'বাব সে ফিরিয়া চাহিল।

সারা ভিটার উপর অসন্ন সন্ধ্যা এক অদ্ভুত, করুণাযা ছায়া ফেলিয়াছে মনে
 হয়, বাড়টার এই অপূর্ব বেকাল কাহার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিয়া কবিতা
 ক্লাস্ত, জীর্ণ, অবসন্ন ও অনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে—আর সাড়া দেয় না, প্রাণ
 আর নাই।

বার বার করিয়া ঘুলঘুলিটার কথাই মনে পড়িতেছিল। ঘুলঘুলি প্রাচীন
 ভাল আছে এখনও, অথচ মানুষেরাই গেল চলিয়া।

সে নিশ্চিন্দিপুরও আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবার বাসও করে সে
 সে অপূর্ব আনন্দ আর পাইবে না—এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে
 সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ছেলেবেলায় যান ছিল সানী—এখন তা'দের
 সঙ্গে আর অপূর্ব কোনদিকেই মিশ যায় না—তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর
 সে সুখ নাই, তারা লেখা ভা' শিখে নাই, এই পশ্চিম বৎসরে গ্রাম ছা'য়া
 অনেকই কোথাও যায় নাই—দবারই বেশকিছু ভয় ভয়া আছে, তা'হাই
 হইয়াছে তা'দের কাল। তা'দের মন, তা'দের দুটি পশ্চিম বৎসর পূর্বের
 সেই বাল্যকালের কে'রায় অ'ভুত নিশ্চল।... কোনদিক হইতেই অপূর্ব আর
 কোন গোগ নাই তা'হাদের সহিত। ব'লো কিম্ব এদব দুটি খোলে নাই—
 সব ক্রিনিসেব উপর একটা অ'বিস্ময় নিভরতার ভাব লিলে—দব অবস্থাকেই
 মানিয়া লইত বিনা বিচা'বে। সত্যাকার ভাবন তখনই য'গন করিয়াছিল
 নিশ্চিন্দিপুরে।

তা'হা ছাড়া ব'লোর সুন্দরিত্তি ও অতি পিয় সাথীদের অনেকে বাচিয়া
 নাই। বোন্টব দা' নাই, জ্যাঠাইমা—গলুদির মা নাই, আশালগাদি
 ডা'র গাঁ পর মরিয়া গিয়াছে, পটু এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়া অন্য কোথায়

বাস করিতেছে, নেভা, রাজু রায়, প্রসন্ন গুরুমশায় কেহই আর নাই—যায়ী
মারা যাওয়ার পরে গোপালের বউ খুড়িমাকে তাহার ভাই আসিয়া হইয়া
গিয়াছে—দশ বারো বৎসর তিনি এখানে আসেন নাই, বাঁচিয়া আছেন কিনা
কেহ জানে না।

তবু মেয়েদের ভাল লাগে। বাণুদি, ভ-বাড়ির খুড়িমা, রাঙলক্ষ্মী, লীলাদি,
এবং মেহে, প্রেমো, দুঃখ, শোকে যেন অনেক বাড়িয়াছে, এতকাল পরে
অপুকে পাইয়া ইহাও সকলেই খুশী, কবায় কাছে এদের বাবহার মনুষ্য ও
অকপট। পূর্বাভূত দিনের কথা এদের সহিত কহিয়া সুখ আছে—বৎসালের
খুড়িমাটি সত্যি মনে বাঁচিয়াছে—হয়তো বা জীবনের পরিসি ইহাদের সর্গ
বলিয়াই, সুদ বলিয়াই এতটুকু দুঃখ জিনিসও আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে।

আজ সে কথা বুলিয়াছে, জীবনে অনবাত বিকৃত অবস্থার সঙ্গে লড়াই
করিয়া চলিতে ইহাও ভাল বলিয়াই আজ সে তাহা পাইয়াছে—এখানে পৈতৃক
ভূমি জমার মালিক হইয়া নিভাবনায় বসিয়া থাকিলে তাহা পাইত না। আজ
যদি সে বিদেশে যায়, সমুদপারে যায়—চোখ লইয়া সে যাইবে, নিশ্চিন্দ-
পূবে গত পাঁচশ বৎসর নিষ্কিন্ত জীবন যাপন কিলে সে চোখ খুলিত না।
একদিন নিশ্চিন্দ পূবে যেমন সে সুখ-দুঃখ দ্বারা অর্জন করিয়াছিল—আজ
তেমনি সুখ-দুঃখ দিয়া বাহিরকে অর্জন করিয়াছে।

নদীতে গাঁ পুঁতে গিয়া নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যায় এই সব কথাই ভাবিতেছিল।
সারাদিনটা খাও ভুট গরম, প্রতিদ তিথি—কাল গিয়াছে পূর্ণিমা। আজ
এখন জোৎস্না উঠিবে। এই নদীতে ছেলেবেলায় যে-সব বধূবা চল লইতে
আদিত, তা এখন প্রোণ, কত নাইও—মরিয়া হাড়িয়া গিয়াছে, যে-সব
কোকিল সেই ছেলে-বেলাকার রামনবমী দিনের পুলকহুতুঙলি ভরাইয়া
হুবে দু কু ডাক দিত, কচিপাতা ওঠা বাঁধবনে তাদের ছোল ময়েরা আবার
তেমনি গায়।

সুখ তাহা যদি শুইয়া আছে। রায়দাভাব ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন
ছাতিম গাছটার তলায় তাহাদের গ্রামের শয়ান. সেখানে। সে-দিদির বয়স
আর বাড়ে নাই, মুখের তাকশা বিলুপ্ত হয় নাই—তার কাচের চুড়ি, নাটাফলের
পুটুলি অক্ষয় হইয়া আছে এখনও। প্রাণের গোপন অন্তরে যেখানে অপুর
শৈশবকালের কাঁচা শুশুমনি প্রবৃত্ত জীবনের শত জ্ঞান, অজিজ্ঞতা, উচ্চাশা ও
কদম্বুদেব নিচে চাপা পিয়া হরিয়া আছে—সেখানে সে চিরবাসিকা, শৈশব
জীবনের সে সম্যকিতে জনহীন অন্ধকার রাতে—ই আসিয়া নীরবে চোখের,
জল ফেলে—শিশু প্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফেলে।

আচাশ্বিন বৎসর যিয়া সাঁঝ-সকালে তার আশ্রয়স্থলটিতে সোনার
সূর্যকিরণ পড়ে। বৎসকালের নিশাথে মেঘ বর বর জল ঢালে, ফাগুন দিনে
খেঁটফুল, হেমন্ত দিনে ছাতিমফুল ফোটে। জোৎস্না উঠে। কত পাখি
গান গায়। সে এ সবই ভালবাদিত। এ সব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই
কোথাও।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একবার কলিকাতা আসিল—ফিরিতে কুড়ি পঁচিশ দিন দেরি হইয়া গেল—আষাঢ় মাসের শেষ, বখা ইতিমধ্যে খুব পড়িয়াছিল, সম্প্রতি দু-একদিন একটু ধবং, কখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিন ঠাণ্ডা, কোনদিন বা সারাদিন স্বর বেঁধে।—

এই ক’দিনে দেশের চেহারা বদলাইয়াছে, গাছপালা খানও খন সবুজ উঁচু গাছেব মাথা হংগে কাচি মাকাল-লতা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—বাল্যের অতীত পরিচিত দৃশ্য, এখনও বউ-কথা-কণ্ড ডাকে, কিন্তু কোকিলও পাঁপিয়া আর নাই—এখনও বনে সৌদাল ফুলের ঝাড় অজানা, দুটি পত্টি ফলের থোণো বাহিয়াছে গাছে গাছে—কতু গন্ধ খেটেকোল গোধি বেলাশেষে কোন ঝোপঝাপেব অন্ধকারে ফোটে, ঘাটের পথে ফিবিবার সময় মেয়েটা নাকে কান্ড চাপা দেয়—কি পাবিচিত, কি অসুখ ঘবনেব পাবিচিত সবই, অথচ বেমানুম ভুলিয়া গিয়াছিল সবটা এতদিন।...বাহিরেব ম’ঠ সবুজ হইয়াছে নব’ন আউশ ধানে—এই সময় একদিন সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে খাব একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ কবিল।

খুব বৌদ্ধ, দু’খু বুরিয়া গিয়াছে, বেলা তিনটায় কম নয়, অপ, কি কাজে গ্রামের পিছনদিকেব বনেব পথ বাঁয়া যাইতেছিল। দু’খু ব’াব বনঝোপ বন সবুজ, বাঁশের একটা নকি হইতে হলদে পাখি উড়িয়া তার একটা ক’মিতে বসিতেছে। একটা ভান্সগায় ঘনবনেব মধ্যে সুঁড়ি পথ, বড়গাছের পাঠাব খাক দিয়া ঝলমল পরিপূর্ণ বৌঃ পাড়িয়া কচি, সবুজ পাতার পাশি দ্রুত দেখাটোচ্ছে, কেমন একটা অসুখ দুগন্ধ উঠিতেছে বনঝোপ হইতে—সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—মুদিকে চাহিয়াই ১০০ গাছাব সেই অসুখ শেখর জগৎটা।—

ঠিক এইবকম সুঁড়ি বনেব পথ বাহিয়া এনি রৌদ্রালোকিত খুড়াকা দোখ শ্রাবণ দিনে উপর ঘুরিয়া বেকাল অসিবার পূর্ব সময়টিতে সেও দিন চৌশালিকেব বাসা, পাকা মাকালফল, মিষ্টি রংগিঠাব ফল খুড়িয়া বেড়াইত—দু’খু রোদের গন্ধমাথানো কত লতা দোলানো, সেই রহস্যভরা, ককণ, মধুর আনন্দলোকটি ১০০ মাইল বাহিয়া এ গতি নয় সেখানে যাওয়ার অনবাহন নাই—পরিবার কোথায় বেন একটা পথ আছে। তাহা সময় বাহিরে বাহিয়া
মানুষকে লইয়া চলে তার অলক্ষিতে। ঘন ঘোবে নিঃশব্দে ম’ঠেই চকের নিমেষে তাহার চাঞ্চল্য বৎসর পূর্বের ঐশ্বর্যলোকটেতে আবার সে ফিবিয়া গেল, এখন এই বন এই নীল আকাশ উজ্জল আনন্দভরা এই বৌদ্ধ-মাথানো শ্রাবণ উপরটাট ছিল জগতের সবদুঃ—বাহিরের বিখটা ছিল অজানা, সে সম্বন্ধে কিছু জানিতও না, ভাবিতও না—রঙে রঙে রঙীন রহস্যঘন সেই তার প্রাচীন দিনের জগৎটা।...

এ যেন নববোধনের উৎস-যুগ, বন বার বার এক দারায় ঘান করিয়া হাটানো নবীনত্বকে ফিরিয়া পায়—গাছপালার সবুজ, রৌদ্রালোকের প্রাচুয় দুর্গাধুনটুনির

অবাক কাকলী—খন সুঁডিপথের দূরপারে শৈশবসঙ্গিনী দিদির ডাক যেন শুনা যায়।...

কতক্ষণ সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—বুঝাইবার ভাষা নাই, এ অনুভূতি মানুষকে বোঝা করিয়া দেয়। অপূর্ব চোখ আপস্যা হইয়া আসিল, কোন দেবতা তাব প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন? তাব নিশ্চিন্দিপূর্ব আসা সার্থক হইল।

আজ মনে হইতেছে যৌবন তাব স্বর্গের দেবতাদের মত অক্ষয়, অনন্ত—সে জগৎটা আছে—তাব মনেই আছে। হয়তো কোনও বিশেষ পাখির গানের সুবে, কি কোনও বনফুলের গন্ধে শৈশবের যে হাস্যের জগৎটা আবার ফিরবে। অপূর্ব কাছে সেটা একটা আশাশ্রিত অনুভূতি, মৌল্যের প্রায়ন বহাইয়া ও মুক্তিবিচিত্র বাতী বহন করিয়া তা আসে, যখনই আসে। কিন্তু য়ানে তাকে পাইতে হয়, শুধু অনুভূতিতেই সে বহস্য লোকের সন্ধান গিলে।

তাব ছেলে কাজল বর্তমানে সেই জগতের অধিবাসী। এজন্য ওর কল্পনাকে গল্প সম্ভাবিত রাখিতে প্রাণপণ করে শক ও হুগের মত বৈষয়িকতা ও পাকারদ্বি চায়ে সে-সব সোনার স্বপ্নকে কড়হস্তে কেহ পাছে ভাঙিয়া দেয়—তাই সে কাজলকে তার বৈষয়িক মন মহাশয়ের নিকট হইতে সশাইয়া আনিয়াছে— নিশ্চিন্দিপ বের বাঁশবনে, মাঠে ফুলে ভরা বনঝোপে, নদীতীরের উত্তরোত্তর নির্জন চরে সেই অদৃশ্য জগৎটাব সঙ্গে ওর সেই সংযোগ স্থাপিত হউক— যা একদিন বাল্যে তাব নিজেব একমাত্র পাখির ঐশ্বর্য ছিল...

নিশ্চিন্দিপ ব, ১৭৮ আষাঢ়

তাই প্রবে,

থেনেক দিন তোমাব কোনো সংবাদ পাই নি, কোনো সন্ধানও জানুই না হঠাৎ সেদিন কাগজে দেখলাম তুমি আদালতে কয়নিজম নিয়ে এক বক্তৃতা দিয়েছ, তা থেকেই তোমাব বর্তমান অবস্থা জানতে পাবি।

তুমি জান না বোম হয় আমি অনেকদিন পূর্ব আমাব গ্রামে নিবেছি। অবশ্য দু দিনের জন্য সে-সব কথা পূর্ব লিখব। খোকাকেও এনেছি। সে তোমায় বড় মনে বেবেছে, তুমি ওর মাথায় জল দিয়ে বাতাস করে জ্বব সারিয়েছিলে—কথা এখনও ভোলে নি।

দেখ পূর্ব, আজকাল আমাব মনে হয়—অনুভূতি আশা, কল্পনা স্বপ্ন এসবই জীবন। এবাব এখানে এসে জীবনটাকে নতুন চোখে দেখতে পাই, এমন সুবিধে ও অবকাশ আব কোথাও হয় নি—এক নাগপূর্ব ছাড়া। কত আনন্দের দিনেব যাওয়া আসা হল জীবনে। যেদিনটিকে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রথম কুঠির মাঠ দেখতে যাই সমস্ত পূজোব বিকেলে—যেদিন আমি ও দিদি বেলরাস্তা দেগতে ছুটে যাই—যেদিন আগের রাত্রে তোমাব মাথার বাড়ির ছাদটিতে বসেছিলুম সন্ধ্যায়,—জন্মার্তমীর তিমিরভবা বর্ষণসিক্ত রাত জেগে কাটিয়েছিলুম আমি ও অপর্ণা মনসাপোতার খড়ের ঘরে, জীবনের পথে

এবাই তো আনন্দের অক্ষয় পাত্রে - সে আনন্দ আর্থের উপর নির্ভর করে না
 ঐশ্ব্যের উপর নির্ভর করে না, মান-সম্মান বা সাফল্যের উপরও নির্ভর করে
 না যা সুখের কিরণের মত অক্ষয়, অক্ষিপাতী, উদার, স্নো দাঁড়ি বিচার করে
 না, উপকরণের স্বল্পতা বা বাহ্যিক উপর নির্ভর করে না। বহলোকে
 মেয়েমানুষ মেটর কিলো যে আনন্দ পায়, তা আঁকল সেই আনন্দই
 পেতেন যদি মেয়েতর থেকে আঁম চল ছাড়া যে আনন্দে গাংম, আমার
 দ্বিদি সেই আনন্দ যে যদি বনঝোলে কোথাও পাকা পলে তা মাঝালতা
 কি বৈচিত্র্যের সন্ধান তে।

জীবনে সংপ্রথম যোবার একা বিদেশে গেমারি সিংহ বাচি বিদেশী
 কালী পূজা দিতে, বছর কয়েক বয়স তখন হাজার বছর যদি নাও, কে
 ভুলে যাবে মৌদনের সে আনন্দ ও অশ্রুভিত্তিক কথা? বড় স্নায়ু পরচ করে
 মেরু পৃথিবীকে যা ঘূষাববষী শীতের বাত্রে, টপ-হুম-কটিবন্ধের বংগ ওয়া নদী
 ও অক্ষকায় আরো ভূমির নিভনগার মতো Northern light অলা আকাশে
 তলাই, অবাস্তব, হৃদয়ভেদ চন্দ্র আলোয়, শুশুম্নার পাইন ও মলভাব
 জুসেব ঘরো। নেকড়ে বাঘের ডাক শুনে সে আনন্দ পান না আমি সেদিন
 বালিশেষে বালিশাটি পদে শিশুল সেদিন লি বনের ছায়ায় ছায়ায় ভ্রু গায়ে
 বেতে বেতে যে আনন্দ পেয়ে চলুম। আমি তো বড় হয়ে জীবনে কত জামগায়
 গেলুম, কিন্তু জীবনের উপায় মুক্তির প্রথম পাদনের সে গালকটা আনন্দের
 সাক্ষ্য আর পাই নি... এই বেবাতের সেই বেতসতর গলেই অশ্রু মন বার
 বার ছুটে ছুটে যায় যদি, তাকে দেখা দিতে পারি কে?

আজ একটা বুঝি ভাই, দুখ ওঃ খুঁজি ই অপর। জীবন দুব বড় একটা
 রোমালি - বেঁচে থেকে একে ভোগ করা গোমালি - এত দুঃখ, হীনতম,
 একে দিয়ে জীবনও গোমালি। এ বিধাসা এতদিন আমাঃ ছিল না - শব্দম
 লাফালাফি করে বেডালেই বুঝি জীবন সাংক হয়ে গেল - তানয়, দেখনুম
 ভাই।

এর দুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা আগ্রাব যে কি বিচিত্র, অমূল্য স্নায়ু প্রেক্ষার
 জা বুঝে দেখতে মানদৃষ্টি প্রয়োজনীয়তা আছে তা আসে এই হৃদয়মাথা
 যাত্রা-পের অমানবীয় সৌন্দর্যের সঙ্গ থেকে।

জৈবের গ্রামখানাতে দিগে এসে জীবনের সৌন্দর্য্যে খাঁট শুধু চোখে দেখা
 এতদিনের জীবনই একসময়ে দেখবার এমন দুঃখি আর হয়নি কখনও।
 এত বিচিত্র অশ্রুভিত্তি, এত পরিবর্তন, এত সন্দেহনেক্ষণ জুয়ে শুয়ে চাপি-
 নারের গোদদাপ্ত মশালের অপর শাঃর মতো কত কথাই মনে আসে কত
 বছর আগেকার সে শিশু-সুদৃষ্ট মের ক্রমে বাছে, এক পূর্ণাঙ্গ শাঃ উপর
 রহস্যময় সু... কত দিগন্তবাণী মাঠের মধ্যে এত শান্ত উপরে কত বটের তলা
 রাখালের বাণির সূরের ওপারের দেশটি অনন্ত তার কথাই মনে ওঠে।

কিছুতেই আবারের দেশের লোকে বিশ্বিত হয় না কেন বলতে পার, প্রশ্ন?
 বিশ্বিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা। যে মানুষ কোনও কিছু দেখে

বিম্বিত হয় না, মুদ্র হয় না, সে তো প্রাণহান। কলকাতায় দেখেছি কি তুচ্ছ জিনিস নিয়েই সেখানকার বড় লোকে দিন কাটায়। জীবনকে খান করা একটা আর্ট—তা এরা জানে না বলেই দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসারে দেউলে হয়ে পড়ে।

দিনের মধ্যে খানিকটা অন্তত নিজনে বসে একে ভাবতে হয়—উঃ সে দেখে-ছিলুম নাগপুরে ভাই—সে কা অবর্ণনীয় আনন্দ পেতুম। বেকালটিতে খখন কোণো শালবনের চায়াম পাখরের ওপর গিয়ে বসতুম—লোকাতীত যে বড় জীবন—শত তপস্বীরূপের বীরপারে অক্ষুণ্ণ তার অস্তিত্বকে মন যেন চিনে নিত—ডি সিগারেট, আইনস্টাইনের বিপ্লবের চেয়েও তা বড়।

এখানে এসেও তাই মনে হচ্ছে প্রণব।...এখানে বুঝেছি জগতে কত সামান্য জিনিস কে কত গভীর আনন্দ আসতে পারে। তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ যশমান। আমার জীবনে এবাই হোক অক্ষয়। এত ছায়া, এত ডাঁদা খেজুরের আভা-ফুলের সুগন্ধ, এত স্মৃতির আনন্দ কোথায় আর পাব? হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারি এখানে তবু এ পুরানো হবে না কেন!

লীলাকে জানতে? আমার মুখে ছ' একবার শুনেছ। সে আর নেই। সে সব অনেক কথা। কিন্তু খখনই তাব কথা ভাবি, অপর্ণার কথা ভাবি, তখন মনে হয় এদের জ্বলন্ত সমুদ্রে আমার জীবন ধুয়ে গিয়েছে—বাইবেলে পড়ে গেছে—And I saw a new Heaven and a New Earth—এরা জীবন দিয়ে আমার সে চোখ খুলে দিয়েছে।

হ্যাঁ, তোমায় লিখি। আমি বাইবেল খাচ্ছি। খুব সম্ভব যাব ফিজি ও সামোয়া—এক বঙ্গুর কাঁচ থেকে ভ্রমসা হয়েছি। কাজলকে কোথায় বেখে যাই এই সমস্যা। তোমায় আমার বাড়ি বখব না—তোমায় মেডামোয়া লিখে-ছেন কাজলে গয় তালো মন খাপস, সে চলে গিয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। হোক অন্ধকার দেখ নে আর নয়। আমার এক বালাসজিনী এখানে আছে। তাঁর কাছেই শুকে বেখে যাব। তাঁর সন্ধান না পেলে বিদেশে যাওয়া কখনও ঘটে উঠত না, খোকাকে যেখানে সেখানে পেলে যেতে পারতুম না তো।

আজ আবার ত্রয়োদশীর তিথি, মেঘশূন্য আকাশ সুনীল। বুব জ্যোৎস্না উঠবে—চুচুা কয় তোমায় নিম্নে দেখাই এ-সব তে মার ঋণ শোধ দিতে পারব না জীবনে তাই—তুমি অপর্ণাকে ছুটিয়ে দিয়েছিলে...কত বড় দান যে সে জীবনে, তা তুমি বুঝবে না।

তোমারই চিরদিনের বন্ধু
অপূর্ব

অপরাজিত

ষড়াবংশ পরিচ্ছেদ

দুপুরে একাদশ রাগু বলিল, অপু তোর কিছু দেনা আছে—
—কি দেনা আছে রাগুদি?

—মনে আছে আমার খাতায় একটা গল্প শেষ করিস্ নি ?

রাণু একটা খাতা বাহির করিয়া আনিল। অপু খাতাটা চিনিতে পারিল না। রাণু বলল—এতে একটা গল্প আখ্যান লিখেছিল মনে আছে ছেলে-বেলায় ? শেষ লিখে দে এবাব ... অগু অবাক হইয়া গেল। বলিল—রাণুদি, সেই খাতাখানা এতকাল বেখে দিয়ছে তুমি ?

রাণু মুঃ হ'সিল।

—বেশ দ'ও ? এখন আমার লেখা কাগজে বেকছে, তোমার খাতাখানায় গল্পটা অর্ধেক রাখব না। কিন্তু কি ভেবে খাতাখানা রেখেছিল রাণুদি এতদিন ?

—জানবি ? একদিন তোব সঙ্গে দেখা হবেই, গল্প শেষ ক'বে দি বই জানতুম।

অপু মনে ভাবিল—তোমাদের মতো বালাসঙ্গিনী জন্ম এন্না যেন পাই রাণুদি।

মুখে বলিল—সত্যি ? দেখি—দেখি খাতাটা।

খাতা খুলিয়া বালোব হাতের লেখাটা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিল। রানীকে দেখাইয়া হাসিয়া বলিল—একটা পাতে সাঁচা বানান ভুল ক'রে বসে আছি ছ'খো।

সে এই মজলকিণী নারীকেই সারা জীবন দেখিয়া আসিয়াছে—এই মেহময়ী, ককুমায়ী নারীকে—হয়তো ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারী সঙ্গে তার পবিচয় এককালের ও ভাসা ভাসা ধনেনব ব'লিয়া ... অ'গু দু' ধনেনব জন্ম তার দ'ব ক'দিয়াছিল—লীলায় সহিত যে পবিচয় তা'হা সংস'বেব শত সুখ ও দুঃখ ও সদ'ভাগ্য ও স্বার্থহ্রদেব মধ্য দিয়া নহে—পটেশ'ণ, রাণুদি, নিন্দা, তিরু'দ, তেওষ'দী-বদু—সবই 'গুটি'। তাই যাদ হা অপু দঃখিত নয়—তাই ভালো, এই শ্রোতব' শেওল'ব মত ভাসিয়া বেড'নো ভবণ'বে পাকি জীবন সহচর-সহচরীগণের যে কলাগণাশি ক্ষুদার সময় তা'হ'কে সহিত বিবেশন করিয়াছে। তাহাতেই সে মন্য, আরও বেশী মেশামেশি ক'দিয়া তাহাদেব দুর্বলতাকে অ'রিকার ক'বি'বার শখ তা'হ'র নাই—সে যা'হা পাইয়াছে, চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া পাকিবে ইহার জন্য।

ভাদ্রের শেষে আর একবার ককুমায়ী আসিয়া খবরের কাগজে একদিন পড়িল, ফিফি প্রত্যাগত কয়েকজন ভারতীয় অ'র্যমিশনে আসিয়া উঠিয়াছেন। তখনই সে অ'র্যমিশনে গেল। নিচে কেহ নাই, জিজ্ঞাসা করিলে একজন উপরের তলায় যাউতে বলিল।

ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের একজন যুবক হিন্দীতে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। অপু বলিল—আপনারা এসেছেন শুনে দেখা করতে এলুম।

ফিজির সব খবর বলবেন দয়া ক'রে ? আমার খুব ইচ্ছে সেখানে যেতে।

যুবকটি একজন অ'র্যসমাজী মিশনারী। সে ইস্ট আফ্রিকা, টিনিডাড, বরিশস—নানা স্থানে প্রচার-কার্য করিয়াছে। অপুকে ঠিকানা দিল, পোস্ট বক্স ১১৭৫, লউটোকা, ফিজি। বলিল, অযোধ্যা জেলার আমার বাড়ি—

এবার যখন কিজি যাব একসঙ্গেই যাব।

অপু যখন আর্মিশন হইতে বাহির হইল, তখন বেলা সাড়ে দশটা।

বাসায় আসিয়া টিকিতে পারিল না। কাজল সেখানে নাই, ঘরটার সর্বত্র কাজলের স্মৃতি, ওঃ জানালাতে কাজল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাত্তার লোক দেখিত—দেওয়ালেব একে-রেকটা সেই পুঁতিয়াছিল, একটা টিনের ভেঁপু ঝুলাইয়া বাধিত—ওই কোণটাতে টুলটার উপর বসিয়া পা ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া মুড়ি খাইত—অপু যখন ইঁপ ধবে—ঘরটাতে সতাই থাকা যায় না।

বৈকালে ‘নিকটা বেড়াইল। বাকী চারণ’ টাকা আদায় হইল। আর কিছুদিন পর কলকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে—কত দূর, সপ্তসিন্ধু পারের দেশ।...কে জানে আর ফিরবে কিনা?...ভিটা-লেহু, ত্যানি-লেহু, নিউ হেব্রিডিস্—দামোয়া!—অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবালবাঁধে-ধেরা নিস্তরঙ্গ ঘন নীল উপসাগর, একদিকে সিন্ধু সীমাহারা, অকূল!—দক্ষিণ মেক পর্যন্ত বিস্তৃত—অন্যদিকে ঘেরায়া ছোট পুকুরের মত উপসাগরটির তীরে নারিকেল পত্র নির্মিত ছোট ছোট টিবি—মধ্যে লৌহ প্রস্তবের পাহাড়ের সূক্ষ্মাঙ্গ নাসা, উভয়কে বিধাবিভক্ত করিতেছে—বৌদ্ধলোকপ্রাণিত সাগরবেল! পথিক জীবনের যাত্রা আবার নতুন দেশের নতুন আকাশতলে শুরু হইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে!

পূর্বাতন দিনের সঙ্গে যে-সব জায়গার সম্পর্ক—আর একবার সে-সব দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল...

মায়ের মৃত্যুর পূর্বে যে ছোট একতলা ঘরটাতে থাকিত অভয় নিয়োগী লেনের মধ্যে—সেটার পাশ দিয়াও গেল। বহুকাল এইদিকে আসে নাই। গলির মুখে একটা গ্যাসেস্টোর কাছে সে চূপ করিয়া বানিকঙ্গ দাঁড়াইয়া রহিল—একটি ছিপছিপে চেহারা উনিশ কুড়ি বছরের প্যাডারগায়ের যুবক সামনের ফুটপাথে ইঁপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কিছু মুখচোরা, কিছু নির্বোধ—বোধহয় নতুন কলিকাতায় আসিয়াছে—বোস হয় পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—ক্ষুধাশীর্ণ মুখ—অপু ওকে চেনে—ও নাম অপূর্ব রায়।—তেরো বছর আগে ও এই গলিটার মধ্যে একতলা বাড়িটাতে থাকিত। এক মুঠো হোটেলের রান্না ভাল-ভাতের জন্য হোটেলওয়ালার কত মুখ-নাড়া সহ্য করিত—মায়ের সঙ্গে দেখা কবিবার প্রত্যাশায় পাঁচিলেব গায়ে দাগ কাটিয়া ছুটির আর কতদিন বাকি হিসাব রাখিত। দাগগুলি জামরুলগাছটার পাশে লোনাধরা পাঁচিলের গায়ে আড়ও হয় তো আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্যাস জলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের ছবি মিলাইয়া গেল।...

বাসার নির্জন ছাদে একা আসিয়া বসিল। মনে কি অদ্ভুত ভাব।—কি অদ্ভুত অনুভূতি!—নবমীর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—কেমন সব কথা মনে উঠে—বিচিত্র সব কথা—বসিয়া বসিয়া ভাবে, এই রকম জ্যোৎস্না আজ উঠিয়াছে তাদের মনসাপোতার বাড়িতে, নাগপুরের বনে তার সেই খড়ের বাংলোর সান্ধের

মাঠে বালো সেই একটিবার গিয়াছিল লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি, তাদের উঠানের পাশে সেই পুকুর পাড়টাতে, নিশ্চিন্দিপুুরের পোড়ো-ভিটাতে, অপর্ণা ও সে শত্রুর বাড়ির যে ঘরটাতে শুইত—তারই জানালায় গায়ে—চাঁপদানাতে পটেশ্বরীদের বাড়ির উঠানে—দেওয়ানপুরের বোড়িংয়ের কম্পাউণ্ডে, জীবনের সহিত জড়ানো এই সব স্থানের কথা ভাবিতেই জীবনের বিচিত্রতা, প্রাগাচ রহস্য তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল...

এবার কলিকাতা হইতে বাড়ি ফিবিবার সময় মাঝেবপাড়া স্টেশনে নামিয়া অপু আর হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে পালি না—ঝোকাতে আড় দেডমাস দেখে নাই—ছ'ক্রে'শ বাস্তা পায়ে হাঁটিয়া বাড়ি পৌঁছিতে সক্ষা হইয়া খাইবে—ঝোকাব জন্য মন এত অদীব হইয়া উঠিয়াছে যে, এত দেবি ক'ণ একেবারেই অসম্ভব।—বাবার কথা মনে হইল—বাবাও ঠিক তাকে দেখিবার জন্য, দিদিবে দেবিবার জন্য এমনি বাস্ত হইয়া উঠিতেন—প্রবাস হইতে তিনি গিবিবার পথে তাদের বালো। আত্মকাল পিতৃদেয়ের এসব কাহিনী সে শুনিত—কিন্তু তখন তো হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া পড়া ছিল না, এখন আর সেদিন নাই, মোটর-বাগে এক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিন্দিপুুর। যা একটু দেরি সে কেবল বেতবতীর খেয়াঘাটে।

গ্রামে পৌঁছিতে অপু প্রায় বেলা তিনটা বাড়িয়া গেল।

সক্ষার কিছু পূর্বে ম'তব পাতিয়া বাণ দিদের ঘোষাকে ছেলেকে লইয়া বসিল। লীলা আসিল, রাণ আসিল, ও বাড়ির বাতলক্ষী আদিয়া বসিল। রাণুদয় বাড়ির চারিদিকে হেমন্ত অরণ্য ঘনাইয়াছে...নানা লতাগাছ সুগন্ধ উঠিতেছে...

কি অদূত দরনের সোনালা বোদ এই হেমন্ত বৈকালে। আকাশ মন নীল—তার তলে বাণ দিদের বাড়ির দিচনের বাগে ঝাড়ে সোনালা সড়কব মত বাঁশের সূচালো ডগ'য় বাস্তা বোদ মাখানো, কোন-না ম'ব গি-ভে পাখি ব'সিয়া আছে—বাতুডের দল ব'সায় গিগিতেছে...পাঁচিলো পাশের বনে এক একটা অ'মড়া গাছে ধোলো দোলা কাঁচা অ'মড়া।

সক্ষার শাঁখ বাড়িল। জগতো'র ক'ণের ক'ণে... অ'ব'র ম'দ মনে হয় এদের পেছনে কোপায় আর একটা অসম্পারণ জগৎ আছে— শুট বাঁশবনে মাপার উপকায় সি'বে মেঘভা'র আকাশ, বাঁশের সোনালা সূচকি আগু বদা কিঙ-পাখির চুলুপি— দেই ম'ব, অচিন্তা জগৎবা'র সৌম্যায় মনবে লইয়া গিয়া ফেলে। সক্ষার শাঁখ কি তাদের চোখাতিয়ে... কলি ৭... পূজার সময় বাবার খাচ'র খাচি'না, মা কত কট পাঠিত— দাঁদির চিহ্নি'সা হয় নাই। সে সব ক'ণ মনে আসিল কেন এখন?

অন্য সবাই উঠিয়া যায়। কাঙ্কল পড়িবার বই বাহির করে। বাণ, রান্নাঘরে রাঁধে, কুটনো কোটে। অপুকে বলে—এখানে আর বদবি দি'তি পেতে দি—

অপু বলে, তোমার কাছে বেশ থাকি রাণুদি। গায়ের ছেলেদের কথাবার্ত

ভাল লাগে না।

রাণু বলে—তু'টি মুড়ি মেখে দি—খা বসে বসে। দুখটা আল দিয়েই চা করে দিচ্ছি।

—রাণুদি সেই ছেলেবেলাকার ঘটটা তোমাদের--না?

রাণু বলে—আমার ঠাকুরমা জগন্নাথ থেকে এনেছিলেন তাঁর ছেলেবয়সে। আচ্ছা অপু, দুগ্গার মুখ তোব মনে পড়ে?

অপু হাসিয়া বলে—না রাণুদি। একটু যেন আবছায়া—তাও সত্যি কিনা বুঝিনে। রাণু দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—আহা। সব স্বপ্ন হয়ে গেল। অপু ভাবে, আজ যদি সে মাথা যায়, খোকাও বোব হয় তাহার মুখ এমনি ভুলিয়া যাইবে। বাণুর মেয়ে বলিল—ও মামা, আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে আজ এইলোপেলেন্ গিইল।

কাজল বলিল—হাঁ বাবা, আজ হুপুরে। এই তেঁতুল গাছের ও'র দিয়ে গেল। অপু বলিল—সত্যি বাণুদি?

—হাঁ তাই। কি ইংরেজি বুঝিনে—উডো জাহাণ্ড যাকে বলে—কি জাহাণ্ড?—

নিশ্চিন্দি পুঁবের সাত বছরের মেয়ে আজকাল এবোপ্পেনে দেখিতে পায় তা'হা হইলে?

পবদিন সন্ধ্যার ৭৭ জ্যোৎস্না-বাত্রে অভ্যাস মত নদীর ধারে মাঠ বেড়াইতে গেল। কতকাল আগে নদীর ধারের ওইখানটিতে একটা সঁইব'ব্লাতলায় বসিয়া এইরকম বৈকালে সে মাচ ধবিত—আজকাল সেখানে সঁইবাব'লার বন, ছেলেবেলার সে গাছটা আর চিনিয়া লওয়া হইল না।

ইচ্ছামতী এই চঞ্চল জাবনবাবার প্রতীক। ওর দু'পাড ভবিয়া প্রতি চৈত্র বৈশাখের কত বন সুসুম, গাছ পালা, পাখি-পাখালী, গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামে ঘাট—শতাব্দীর পব শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কত পাখির দল আসে যায়, ধাবে ধাবে কত জেলেরা জাল ফেলে, তাঁরবতী গৃহস্থবাড়ীতে হাসি-কান্নায় লীলাখেলা হয়, কত গৃহস্থ আসে, কত গৃহস্থ যায়—কত হাসিমুখ শিশু মায়েব সঙ্গে নাহিতে নামে, আবার রক্তাবস্থায় তা'দেব নন্দর দেহের রেণু কলধনা ইচ্ছামতীর স্রোতোফলে ভাসিয়া যায়—এমন কত মা, কত ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী মহাকালের বৌধিপথে আসে যায়—অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, নিরীহ। ..

আজকাল নিজনে বসিলেই তাহার মনে হয় এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়াব মধ্যে জন্মগ্রহণ করাব দরুন এবং শৈশব হইতে এ'ব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকাব দরুন এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও বোর রহস্যময়, এর প্রত্যেক বর্ণ যে অসাব্য জটিলতায় আচ্ছন্ন—খা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনাব অশীত, এ সত্যটা হুঁচক চোখে পড়ে না। যেমন সাহেব বন্ধুটি বলিত “ভাবতর্ষের একটা রূপ আছে, সে ভোয়ায়া জান না। জোয়রা এখানে জন্মেছে কিনা, অতি পরিচয়ের দৌঁখে

প্রাণবন্ত তাব আশা, সে অমব ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ
 শাখাপত্রের তিক্ত গন্ধ আনে—নীলশূন্যে বালিহাঁসের সাই সাই বাব শোনায়।
 সে জীবনের অধিকার হইতে তাহাকে কাহারও বঞ্চিত করিবাব শক্তি নাই
 তাব মনে হইল সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয়, — শুষ্ক শেষ নয়, এবানে
 অবস্তুও নয়। সে জন্মজন্মান্তবেব পশ্চিম আত্মা, দুব হইতে কোন সুদূরব
 নিতা নূতন পথের মধ্যে তাব গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য
 জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল আণ্ড্রোমিডা নীহারিকা জগৎ,
 বহুদ্র পিতৃলোক—এই শত সহস্র শতাব্দী তাব পায়ের-চলার পথ—তাব ও
 সকলের যত্নদ্বারা অম্পূর্ণ সে বিপুল জীবনটা নিউটনের মহনিয়তির মত
 সকলেই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণভাবে বর্তমান নিঃসাম সময় বাহিয়া যে গতি
 সরি মানবের যুগে যুগে বাহীন হইক...

অপু তাহাদের ঘাটের দায়ে আসিল। ওখানটতে এমন এক সম্ভার
 অন্ধকারে বনদেবী বিশালাক্ষী মনঃচক্রবর্তীকে দেখা দিয়াছিলেন কতকাল
 আগে।

আজ যদি অবার তাহাকে দেখা দেন।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছোঁল। তুমি কি ব'চাও?

—অন্য কিছুই চাই নে, এগ'র যাব বনঝাং নদী মাঠ বাঁশবাগানের উঁচায়
 অঝোদ, উদ্‌গ্রীব, স্বপ্নময় শমক সেটে দশ বৎসর বয়সের শেষবটী—তাকে
 আর একটবার ফিরিয়ে দেব দেবী—

“You enter it by the Ancient way
 Through Ivory Gate and Golden”

টিক হুপ বেল।

রানী কাজলকে আটকাইয়া রাখিতে পাবে না—বেজায় চঞ্চল। ১০ আছে,
 কোথা দিয়া যে কখন বা হয় হইয়া গিয়াছে—কেহ বলিও পারে না। সে
 রোজ জিজ্ঞাসা করে—পি সমা, বাবা কবে আসবে? কতদিন দেখা হবে?—
 অপু মাঠবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—বাগুদি, থোকাঁকে তোমা'র হাতে দিয়ে
 যাক্টি, ওকে খানে রাখবে, ওকে বোলা না আমি কোনো দিচ্ছি। যদি
 আম'র সত্য ঈশ'দ ভুলিয়ে দেবে—তুমি ছাড়া ওকাজ আর কে পারবে না।
 বাগু চোখ মুছিয়া বলিয়াছিল—ওকে এ-একম ফাঁকি দিয়ে তো'র মন সংচে?
 বোকা ছেলে তাই বুঝিয়ে গেলি—এদি চালাক হ'ত?

অপু বলিয়াছিল দেব আর একটা কথা বলি। ওই বাঁশবাগানের গুল্মগাটা
 —তোমা'র চল দেখি'য় পাখি—একটা সোনার কোনো মাটিতে পৌঁছা আছে
 আজ অনেকদিন—মাটি খুঁড়লেই পাবে। শাব'দি না গি'রি আর থোকা যদি
 বাঁচে—বে'ম'কে কোটোটা দিও দি'লে পা'থতে। থোকাও কষ্ট'য়ে মা'নুষ
 হোক—এত তাড়াতাড়ি ফুলে ভর্তি করার দরকার নেই। যেখানে যায় যেতে
 দিও—কেবল যখন ঘাটে যাবে, তুমি নিজে নাটতে নিসে যেও—সীতার জানে

না, ছেলেমানুষ ডুববে যাবে । ও একটু ভীতু আছে, কিন্তু সে ভয় এ নেই তা-
নেই বলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা ক'বো না—কি আছে কি নেই তা বলতে কে
পারে না রাণুদি । কোনোদিকেই গোঁড়ামি ভাল নয়—তা ওর ওপর চাপাতে
যাওয়ারও দরকার নেই । যা বোঝে বুঝুক, সেই ভাল ।

অপু জানিত, কাজল শুধু তার কল্লনা-প্রবণতার জন্য ভীতু । এই কাল্পনিক
ভয় সকল আনন্দ রোমান্স ও অজানা কল্পনার টংস মুখ । যুক্ত প্রকৃতির
তলস্ব খোকার মনের সব বেকাল ও রাগিণী অপু হৃদয়ে রত্নীন হয়ে উঠুক
—মনে প্রাণে এই তাহার আশীর্বাদ ।

ভবপুরে অপু আবার কোথায় চালায় গিয়াছে । হৃদয় লীলাব মুখের শেষ
অনুরোধ রাখিতে কোন পোতা প্রাণে ডুবো ভাষাভের সোনার সন্ধানেই বা
বাহির হইয়াছে । গিয়াছেও প্রায় ছ মাস মাস হইল ।

সতুও অপু ছেলেকে ভালবাসে । সে ছেলেবয়সের সেই চুটু সতু আব নাই,
এখন সংসারের কাছে ঠেকিয়া সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে । এখন সে আবার
হরিভক্ত । গলায় মাল্য, মাথায় লম্বা চুল । দোকান হইতে ফিরাইয়া হাত
মুখ মুগ্ধা বোয়াকে বসিয়া খেল লইয়া কীতর্ন গায় । নীলমণি রায়ের দরুন
জমার বাগান বিক্রয় করিয়া অপু কাছে সের টাকা পাইয়াছিল—তাহা ছাড়া
কাটিয়াও নব্বৈ চালায় আনিবার জন্য অপু নিকট আরও পঞ্চাশটি টাকা
দায় স্বরূপ লইয়াছিল । এটা বানীকে লুকাইয়া—কাবো বানী জানিতে পারিলে
মহা অনর্থ বাশইত—কখনও টাকা লইতে দিত না ।

কাজলের দোকান পারিবার উপর । এত গাখ সে কখনও দেখে নাই—তাহার
মামা বাড়ির দেশে ঘণ্ডি বসতি, এত বড় বন, মাঠ নাই—এখানে আসিয়া
সে অবাচ হইয়া গিয়াছে । বাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় শিঙেনের সমস্ত মাঠ,
বন ও গ্রাম অন্ধকারে মগ্নো দৈত্যদানো, ভূত ও শিয়ালের ভিড়ে ভবিয়া
গিয়াছে—সিমাং কাছে আরও বেঁধিয়া শোয় । কিন্তু দিনমানের আর ভয়
পাকে না, এখন পাখি ডিম ও বাসা খুঁজিয়া বেড়াইবার খুব সুযোগ । রাণু
বাগ করিয়াছে—গাঙের পথের পাখিও গর্তে হাত দিও না কাজল, সাপ
পাকে । শোনে না, সেদিনও গিয়াছিল সিমাংকে লুকাইয়া কিন্তু অন্ধকার
হইয়া গেলেচ মাস ২৩ ভয় ।

সুপুর্বে দিন সিমাংদের বাড়ির গিছনে বাঁশবনে পাখির বাসা খুঁজিতে বাহির
হইয়া ছিল । সবে ১৩কাল শেষ হইয়া রোজ বেজায় চড়িয়াছে, আকাশে
বাতাসে বনে কেমন গন্ধ । বাবা তাহাকে কত বনের গাছ, পাখি চিনাইয়া
দিয়া গিয়াছে, গাই সে জানে কোথায় বনমবিচাব লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ-
ফুল দিয়াছে, কেলেকৌড়ার লতাব কচি ডগা ঝোপের মাথায় মাথায় সাপের
মত ডুলিতেছে ।

কখনও সে ঠাকুরদাদার পোডো ১৩টাটাতে ঢোকে নাই । বাহির হইতে
তাহার বাবা তাহাকে দেখাইয়াছিল, বোধ হয় ঘন বন বলিয়া ভিতরে লইয়া
যায় নাই । একবার ঢুকিয়া দেখিতে কৌতূহল হইল ।

কাজলগাটা খুব উঁচু চিহ্নিত । কাজল এদিক ওদিক চাহিয়া চিহ্নিতার উপরে

উঠিল—তারপর ঘন কুঁচকাঁটা ও জ্যাওড়া বনের বেড়া ঠেলিয়া নিচের উঠানে নামিল। চাষিধাবে ইট, বাঁশের কক্ষি, ঘোপঝাং। পাখি নাই এখানে ? এখানে তো কেউ আসে না—কত পাখি বাসা আছে হয়ত—কে বা খোঁজ বাধে ?

বনপুংখারী যাকে—টুকলি, টুকলি—তাহার ব'বা চিনাইয়াছিল কোথায় বসানি ? না, এমনি ডালে ব'সিয়া কিকিতেছে ?

মুখ উঁচু করিয়া খোকা দিক্‌তে গাছে ঘন ভালপালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল।

এক বলক হাওয়া এনে পাশের পোনে টিবিটাব দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটা মালিক ব্রজ চক্রবর্তী ঠাণ্ডাডে বীণ বাজ ঠাণ্ডাদাদা হবিহব ব'স, ঠাণ্ডামা সব ম্যা, পিসিমা গী জানা অ'নানী সমস্ত পূর্ণ কৃষ দিবসের প্রসন্ন হ'লে অ'ভার্তনা ক'ন্যা ব'লল—এই যে দু'মি আমাদের হয়ে পিবে এসেছে, আমাদের সকলো প্র'তিনিমিত্তে আজ দু'মি আমাদের আশীর্বাদ নাও বংশো উ যুক্ত হও।

আবণ হ'ল। সৈদালি ব'ন'র ছায়া হইতে গল অ'হরণ'ত সহ'দের ঠাণ্ডা ম'দের ব'লতলা হইতে শ'শযাশ'রত ভীষ এ কোমের ও পেব তল হইত বীণ কর্ণ, গাভীবধাবা অ'জুন অভাগিনী ন'দ্যতী, ক'ন্দে নে সাববি প্রকৃষ্ণ প'জিত বাজ ব্রজ'দেব তমস'ভীষা প'নে প'নে পাত-ম'নী ত'দ'সবধ'ব'ল'নী অ'শ্রুত'নী ভগবতা দেবী তানকী কয় ব'সভাষ ব'ম'লা হ'স্তে প্রযামাণী অন্তবদনী সুন্দী দ'ভ'নী ম'শাফে ব'দ'নী ব'ম'ঠ মা'ঠ গোচারণ ত সহ'স সম্পদহীন দ'বিদ্র ব'ল'নী ব্রজ'ব্রীট হ'ত'নি নিয় হ'স মুখে অ'ভার্তনা ক'ন্যা ব'লল এই যে এই যে আবার প'নে এসেছে। চেন না আমাদের ? কত ভ'বে ভাঙা জানলা'র বসে বসে আমাদের সঙ্গে ম'নে মুখি যে কত প'বিচয়। এসো এসো এসো

স'সে স'সে বাণু'র গলা শোনা গেল—ও খোকা, ওরে ঢেঁচু ছেলে, এই এক গলা বনের ম'নে ঢুকে তে মা'র কি হ'চ্ছ জিত্তেস কবি—বেবিখে আয় ব'ল'ছ। খোকা হাসিমুখে বাহির হ'সিয়া অ'শ্লি। সে পিসিমাকে ঘেঁটেই ভয় কবে না। সে জানে পিসিমা তাকে খুব ভালবাসে—দিদিমা পরে এক বাবা ভাড়া তাকে এমন ভাল আর কেউ বাসে নাহ।

হঠাৎ সেই সময় বাণু'র মনে হ'ল অপু'ষ্টিক এমনি ভ'টু মুখে ভ'জি করিত ছেলেবেলায়—ঠিক এমনট।

যুগে যুগে অপ'যাজিত ভাবন-বহস্য কি অ'পূ'ব মহিমাত্তে আবার আত্মপ্রকাশ করে।

খোকা ব'বা একটু তুল করিয়াছিল।

চক্ষিণ ব'ন'রের অ'নুপস্থিতির পর অবোধ ব'লক অ' আবার নিশ্চিন্দীর ফিঙ্গিয়া আনিয়াছে।



অপু

তৃতীয় খণ্ড



কাজল

উপন্যাস লেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যিনি আমার পিছনে মাইল: বাণী নিয়ে এসে লাড়িয়েছে, সেই মা আমাকে সবধৰণে উৎসাহ দিয়েছেন, পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য দিয়েছেন। আমার এবং তাঁর পবিত্র সমান সমান

অনেক বিনিময় বাণীব্যবহার বায় গেল এ বই-এর পেছনে। লিখতে লিখতে মনে হযেছে ঐকদেব কবি, জাফর না ভাবা একে কেমন ভাবে নেবেন তাঁদেব জগাই আমার পবিত্র, নবা নহা ফলে আমি ন্যা হবো।

সমস্ত উপন্যাসটি মূল পাণ্ডুলিপি থেকে কাটা করে দিয়েছেন আমার দুই বন্ধু, শ্রীদিলীপ দত্ত ও মিলন সিংহ। এঁদের প্রাথমিক শ্রম।

॥ আনন্দ্যক ।

বাবাকপুর

গাবদাস বন্দোপাধ্যায়

আষাঢ়/১৩৭৭

বিভূতিভূষণ

ও

কাজলের পশ্চাৎপট

১৯৪০ সনের ৩রা ডিসেম্বর আমার বিয়ে হয়। সে সময়ে উনি ৪১ বছর মিতাপুর জুটের 'প্যাসেডাইস লজ' থাকতেন। আমার বিয়ে প্রায় এক বছর আগে ঐ মেসে বাস তিনি উঠিয়ে দেন।

ঐ মেসে ছিলেন উনি বহুদিন, কাগজ-এ বই-বাতা তিনিসত্ত্বে ডমেছিল শুধানে অপব্যস্ত। মেসের বাস এখন হুলে দেন তখন তার কিছু জিনিস উনি পাঠিয়ে দেন খাতিলায়, কিছু আমাদের দেশের বাড়ী গোপালনগর বাসে।

খাতিলায় যে ঘরে আমি স্ত্রীম তার পায়ে দিকেব দেওয়ালে টাঙানো ছিল 'ভাবী সুন্দর একটি শিশুর ছবি, অদৃব ছবিটি। খয়েরে রংয়ের সঙ্গে সাদা মেসামো বিলিতি ছবি। নাচে ইংরেজিতে ছবিটির নাম লেখা ছিল 'বাবুস্'। ছেলেটির কোলের উর একটি বাগতে কিছু সাবান-গোলা জল। একটি কাঠিতে ফুঁ দিয়ে ছেলেটি বুদবুদ তৈরী করছে।

ওঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, কোনও বিলাতী কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের কালেণ্ডার শুভা। উনি ছবিট আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন ঐ ছবি দেখেই নাকি উনি কাজলের চরিত্র লিখতেন। আমি নিস্পাপ, দেব-চুল্লভ রূপবান, কোমল, সুন্দর ছেলেটি—কাজল নাকি ওঁর কল্পনায় ঐ রূপেই ছিল।

উনি নিজে আমাকে বহুদিন বলেছেন, এক সময়ে নাকি উনি সন্তান-সন্তান করে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বহু লোকের কাছে শুনেছি, অনেককে উনি নাকি বলতেন—আমাকে বাবা ডাকবি?—ডাক না।

আরও শুনেছি, নাকি এই পিতৃ-স্নেহধন শুনবার জন্য নানা প্রকার ঘুসও দিতেন কাউকে কাউকে।

আজ আরও অনেক কথাই মনে পড়ছে। ওঁর ধর্ম্মময়ে, নাম তার রেণু। রেণুর উল্লেখ আছে ওঁর অনেক বইতে, ওঁর দিনপঞ্জিগুলিতে। ওঁর বিচিত্র জগৎ বইখানা, রেণুকে উৎসর্গ করেছিলেন। রেণুর সঙ্গে ওঁর স্নেহের সম্পর্ক গভীর ছিল। রেণুকে নিয়েই ওঁদের পরিবারের সঙ্গে ওঁর গভীর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে ওঁদের সকলের সঙ্গেই ওঁর আত্মীয়তার

বন্ধন দৃঢ় হয়েছিল ।

আমাব বিয়ের পরে বেণু এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে ।

আমাকে ডাকত বেণু মা-মাণি বলে, ওঁকে বলত বাবা । রেণুর সঙ্গে ওঁর মাঝে মাঝে দখা হত কলকাতায় । বেণু তখন কলকাতাতেই ছিল ।

বাবলু তখন এক বছরের, সে সময় একদিন একটি নিবেট-লোহার সুন্দর মোটরগাড়ী এনে বাবলুকে দেন । উনি বলেন, তোর দিদি দিয়েছে—বেণু দিদি ।

কাঙাল সম্পর্কে উনি কি লিখবেন, তার কিছু কিছু আভাস অপরাজিত বইতে পাওয়া যায় । ওতেই বাঁধাকাবে কাঙাল সম্পর্কে সকল কথাই প্রায় বলা আছে । তখনকার যিনি তাঁর কল্পনার কাঙালকে বাস্তবে রূপ দেবেন, প্রতিমার কাঠামোর ওপর খড়-বুলী বেঁধে মাটি দিয়ে রং খুলিব স্পর্শে যিনি সেই প্রথমকে সজীবিত করবেন, সে দায়িত্ব তার । গল্পকে টেনে নিয়ে যাবার, উল্লাসকে এনিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব লেখকের, বিহুতিভ্রমণেব অসমাপ্ত বচন। যিনি সমাপ্ত করবেন তাঁর ।

কাঙাল উল্লাস সম্পর্কে কত নিষ্ঠুর মাপাহুে আকাশের নব নব ছায়াধূপ দেখতে দেখতে দক্ষা বেলায় বিলবিলাস দাবে ঠেস দেবালে হেলান দিয়ে বিদ্রম করতে করতে খালোচনা করেছেন । কাঙাল এখন কত বড় হয়েছে, কি করতে কি ভাবতে এসব আলোচনা করতেন । বাবলু হঠাৎ এক মুহূর্তে মুহূর্তে বাবলুকে দেখা চাই । বাবলু কি কাছে কেমন অশুভঙ্গী করছে—সদা বাঁধার সকলকে ডেকে দেখাতে ভলবাসতেন । সদা বেরুডের সঙ্গে বাবলু যেন ছিল শিশু-বেলুডে । দুহতে পাবগাম, কাঙাল উল্লাসের পারিকল্পনা মাপায় ঘুরছে । কাঙাল উল্লাস সম্পর্কে বহু নোট নিতেন । কিছু কিছু লিখও ছিলেন । ওঁর আকস্মিক মতাব ডগা, এবং উনিশ-কুড়ি বছরের ব্যবসানে বিশেষ-কিছু রক্ষা করতে পারি নি ।

বাবলু তখন একটু বড় হল এবং ক্ষুদ্র লেতে উক করল, তখন বাবলু বাবার কথা শুনে চাইত । তাঁর লেখার বিষয়, তাঁর ভালো-লাগা, তাঁর জীবনযাত্রা ও জানতে চাইত । তন্ময় হয়ে শুনত এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইত সব কিছু । দাদদিন বাবলু সঙ্গে ওঁর স্মৃতিতর্পণ করতে করতে ‘কাঙাল’ উল্লাস সম্পর্কে গুঁটিনাটি আলোচনা করত । বাবলুর তখন থেকেই আগ্রহ ছিল কাঙাল লিখবার । অন্তরে অন্তরে গভীর ইচ্ছা ছিল । তার হৃয়ারসেকেন্দ্রাশী পীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার পরে একেবারে একটানা অবদর কি করে কাটবে এই ভাবনায় তখন অস্তির হয়ে উঠেছিল, তখন নিজেই এক-দিন অমর বলল—মা, কাঙাল লিখব । আমি সেদিন ওকে মুখে উৎসাহ দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, লেখ, চেষ্টা কর । চেষ্টার অসাদ্য কি আছে ।

সেই শুরু, তারপর তিন বছর পার হয়ে চার বছর চলছে । আজ কাঙাল

সত্যিই শেষ হল।

আমার শ্বশুরমশাই-এর অসমাপ্ত কার্যভার তুলে নিয়েছিলেন তাঁর পুত্র অসীম
প্রদার সঙ্গে। আজ তাঁদের পায়ের তলায়, বঙ্গবাণীর পায়ের তলায় বাবলু
কুণ্ঠিত অক্ষম পদক্ষেপে পূজার থালা নিয়ে দাঁড়াল। সামান্য উপচার, অতি-
সামান্য ওর পূজি। কিন্তু পূজায় যার যেটুকু ক্ষমতাদে তাই নিয়েই সাজ
করে, এ-ও তাই। নির্মল পূজার আগ্রহটুকুই ভগবান গ্রহণ করেন।

১৩৫৭ সালের ২৮শে ভাদ্র ঐ বর্ষ জীবিতাবস্থায় শেষ ভ্রম্মদিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল
আমার মামা বাসাবাড়ী সুইনহো স্ট্রিটে। এই অনুষ্ঠানে বড় সাহিত্যিক
বঙ্গুয়া এসেছিলেন ঐ। এদের উপেন-দা, বঙ্গুর মনোজ বসু, ডাঃ নলিনাক্ষ
সান্যাল বগম জাহানারা খান স্বামী সহ, গজেন ঠাকুরপো, সুমথ ঠাকুরপো
ইত্যাদি।

এই ভ্রম্মদিনে গজেন ঠাকুরপো সুমথ ঠাকুরপো ঐর একখানা খাতা উপহার
দেন—তাব ওপর একটি কালো কভার লাগান ছিল। সুন্দর খাঁধানো, তাতে
সোনালী অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা ছিল—‘কাডল’। এ খাতাখানা আজও
আমাব কাছে আছে। সেই সময়েই ঠিক হয়ে যায়, কাডল উনি লিখতে শুরু
করবেন অবিলম্বে এবং তা শাবাবাহিক ভাবে বেরবে কোন পত্রিকায়। আমি
জানতাম কাডল উনি লিখবেন, খেন জানতাম ইচ্ছামতো দ্বিতীয়খণ্ড উনি
লিখবেন। তখন ওলও দ্বিতীয়খণ্ড লিখবার ইচ্ছে ছিল ঐর। ওই কাছে
আবও শুনেছি দেবদান লিখবার ইচ্ছা ছিল ঐর পথের পাঁচালী লিখবারও
আগে। কিন্তু লিখেছেন অনেক পবে। একটা খাতায় উনি দেবদানের
খানিকটা লিখে বেখেছিলেন বহুদিন পদন্ত। এ লেখার বহু পবে উনি দেবদান
শেষ করেন—আমাব বিয়েরও দু-তিন বছর বছর পবে। তখন দেবদানের নাম
ছিল ‘দেবতার বাগা’। ঐর লেখাব প্লট লেখা থাকত ছোট ছোট বইতে।
তাতে উনি কি লিখবেন সামান্য কথায় তার স্কেচ কবে : বতেন। পরে ঐ
স্কেচ দেখলেই ও মনে পড়ত উনি কি লিখবেন। ঐ সব বিভিন্ন চরিত্রের
বহু ঘটনার সম্যক টুকরো ও নানান লেখার খসড়া আজও আমি রেখে দিয়েছি
যত্ন করে আমাব কাছে।

তাতে কত কি লিখবার কত কি জানবার আগ্রহ ছিল ঐর, তার পরিচয়
পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যায়, কত কি পড়েছিলেন উনি তার আভাস।
উনি খেন ছিলেন চিরদিনের ছাত্র—প্রকৃতির এই মহিমময় অনন্ত ঐশ্বর্যভরা
পরিবেশ, এর ভিতরে আত্মহারা ছিলেন তিনি। প্রকৃতিপাগল বিভূতিভূষণ
ঘাটশীলায় ঐর মৃত্যুর পাঁচ-ছ দিন আগে বেলাশেষে আমি বসেছিলাম
আমাদের বারান্দার চওড়া সিঁড়ির ওপর। উনি দাঁড়িয়েছিলেন সামনে।
বাবলু উঠোনের ঘাসের ওপর ওর বাবাকে নিয়ে খেলছিল। আজও বড় বেশী
করে সেই দিনটির কথা, সেই অপরাহ্ন বেলাটির কথা আমার মনে পড়ে।

উনি সে সময়ে আমাকে বললেন—তুমি আমার দিকে একদম নজর দাও

না। আমি কখন কি করি বল তো ? এদিকে আমার কাজল শুরু কবতে হবে। বাবলুকে নিয়ে কি কবি বল তো ? তুমি শুধু শুধু বাবলুকে আমার কাছে দাও।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম : সে কি গো, আমিই বরং ছেলেটাকে কাছে পাই নে, শুধু তুমি ওকে নিয়ে ঘুবছ কোথায় কোথায়। ওব দুবল স্বাস্থ্য—কোথায় আমি ভাবছি, ওব কি স্বাস্থ্য টিকবে।

চট কবে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন উনি।—আব বেডানো নয়, কি বল ? খুবই বেডানো হয়েছে। পূজাব ভেতব অতাস্থ বেডালাম, কি বল ? বেডালাম না ?

আমি চুপ কবে বঠলাম। এমন প্রম-বাত্তিকগ্রস্ত লোক আমি জাবনে দেখি নি। ছেলে লেদব মেন মিষ্টি ও খেলনাব লেও দেবিয়ে বশীত কবা যায়, এই বালক-স্বপ্নাব ওদ্রলোকটিকেও বেডানোব নামে যেখ'নে দেখানে নিয়ে যাওয়া যেত, যদি জানতে প'তেন সেখানে দেখবাব কিছু আছে।

উনি নিজেই আবাব বললেন—এইবাব লেখা শুক কবি কি বল ? পজোত ও বকম সবাই একতু—বুকে না, সব বন্ধুবান্ধব ওক জায়গ'য় হওয়া, আমোদ হয় না, কি বল ? কাল আমাকে খুব ভাবে তুল দেব, জানলে ?

আমি হাসলাম : তোমাব চাইতে শেরা উঠব আমি ? তোমাব চোখে কি ঘুম আছে। আমার তো মনে হয় না।

ওবই ডাকে ঘুম ভাঙল সেদিন আমাব—ওঠো, ওঠো। গেট খুল দাও : আমি 'কাঙাল' ছক তৈরী কব না আত ? মনে নেই ? ওঠো, দেবী হয়ে যাবে।

আমি ঘুম-জড়ানো চোখে বাইবের দিকে তাকালাম : বাত রয়েছে যে, আব একটু পবে যাও। বাবে রনে পাহাড়ে, ওখানে তো সদাই নিজন।

উনি বললেন—না, উপাসনা সেবে নেব না আমাব সেই শিল'সনে। তাবপবে লেখা।

আমি জানতাম, উনি 'ফুলডুবী' পেছনে বনের ভেতব একটি বিশাট পাথবের ওপ'ব বসে লিখতেন। আমাকে নিয়েও তেতন ওখানে মাঝে মাঝে, উপাসনা ক'তেন। সে সব কত কথা, কত স্মৃতি।

তখনও জানি না, কি কবাল মেঘ ঝুলছে আমাব মাপাব ওপ'ব গর্ভে তাব বজ্রাঘ্নি লুকিয়ে নিয়ে। সেই দিনই যে আমার জীবনো চতম দিন, তাব কিছুমাত্র আভাস পাই নি আমি।

সকাল সকাল ফেরা ও'ব হল না। উনি ফিরলেন একেবাবে বেলা সাড়ে-দশটা এগারটায়। আমি তখন রান্নায় ব্যাপৃত। ওকে দোব খুলে দিলাম। উনি বললেন—প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে থামাব।

ও'র খাবার করাই ছিল। বিছানার উপব বসলে ওকে খাবার এনে দিলাম।

উনি সেই খাবারটুকু খেয়ে আবার বললেন—আর কিছু দাও। কি আছে তোমার ?

আমি বললাম—নাবকেল-চিঁড়ে খাও। তুমি ভালবাস।

নাবকেল-চিঁড়ে দিয়ে আমি আবার রান্নায় ফিরে গেলাম।

ওঁ'র ডাক আবার কানে গেল—ভুনে যাও।

আমি বাগ্নাঘর থেকে ছুটে গেলাম ওঁ'র কাছে।

এমন করে তো উনি ডাকেন না আমাকে। আমি যেতেই উনি বললেন—দেখ, আমার বুকে যেন চিঁড়ে খাটকে গেছে।

আমি বললাম, শুকনো চিঁড়ে খেলে এমনই হয়। ভিজিয়ে খেতে চাও না।

খাম কলা না থাকলে। কত ঘবে এসেছ, গলা শুকিয়ে আছে না ?

আমি ওঁ'র গলায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

উনি বললেন, একতু কোবামিন দাও আমাকে। আমার ঘবে কোবামিন থাকত। আমার ঠাকুবপো ডাকার ছিলেন। আমি ওঁকে খবে আছি—আমার ডা যমুনাকে ডেকে বললাম—দশ কোঁটা কোবামিন দে তো।

আমি জীবনে ওঁকে খব সামান্যই ওদুখ খেতে দেখেছি। কোবামিন চাওয়ান্ন আমি ঘাবড়ে গেলাম খব। সেই সূচনা। তখন বুঝি নি আমি। স্বাস্থ্য-বান বেশ ছিলেন। একটু পরেই সামলে উঠলেন একতু। আমিও তখন অনভিজ্ঞ। বুঝতে পারি নি কি কঠোর নিয়তি অপেক্ষা কবছে আমার জন্য।

উনি স্নান কবতে যাবেন বললেন। বাড়ীতে উনি স্নান কবতেন না কখনও। দেশে থাকলে নদীতে, ঘাটশীলায় নানা পুকুরে। আমাকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন সঙ্গে কবে। ইদানীং বাবলুকে নিয়ে যেতেন বোজ আমি না গেলেও।

সেদিন বললেন—আজ আব বাবলুকে নেব না, শবীবটা ভাল নেই।

অনেক বাপ দিলাম। শবীব ভাল নেই, বাইবে স্নান করতে যেও না তুমি। কিছুতেই শুনলেন না।

আমি বললাম—টোঁনেব ধাবে ভল দি তোমায়। বাথকমে নাই বা নাইলে। বাথকমে স্নান কবতে একদম ভালবাসতেন না উনি। আমাদের ঘরের সামনের চওড়া সিঁড়িগুলিতে বসে স্নান কবতে বলেছিলাম আমি।

উনি বললেন—কিছু হবে না। খাব আব আসব।

তখন কিছু হল না।

দুপুবে ভাত খেতে বসেছেন, তখন পলভুমগড বাজবাডি থেকে নিমন্ত্রণ করে গেল টি-পাটির। উনি খুসী হয়ে বললেন—যাও ঠিক, বন্ধিমবাবুকে গিয়ে বল। দু-এক জন কাকে আবও নিমন্ত্রণ কবতে বললেন। তখনও জানি না, কি আছে আমাদের কপালে।

একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ঠাকুবপোর ডাকে ঘুম ভাঙল—দাদা কি

সাজে যাচ্ছেন উঠে দেখ বৌদি।

আমার দুঃস্বপ্ন অভিমান হল। আমার কি একটুও ইচ্ছে করে না উনি একটু সাজুন ?

আমি চুপ কবে রইলাম। উনি হয়তো বুঝলেন আমার অন্তরের অভিমান। তাই বললেন—নাও কি দেবে। কি হবে সাজলে-গুজলে ? দুখানা হাত বেরুবে আমার ?

সেইদিন—আর তারপর তিন দিনের দিন ওঁকে মহাখাতায় সাজিয়ে দিয়ে-
ছিলাম।

আপনাদের আশীর্বাদে বাবলু ‘কাজল’ লিখেছে। আজ সকলের সঙ্গে ওঁর আশীর্বাদও বাবলুব মাথায় ঝড়ে পড়ুক।

বাণভট্টের পুত্র ভূষণভট্ট অসমাপ্ত ‘কাদম্বরী’ শেষ করেছিলেন। বাবলুব হাতে ‘কাজল’ প্রাণময় হয়ে উঠুক এই আমার মঙ্গলময়ের প্রতি প্রার্থনা।

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শীত শেষ হইয়া বসন্তের বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। পুরাতন পাতা করিয়া গিয়া গাছে গাছে নতুন কচি পাতার সমারোহ। এই দিনগুলোতে কাজলের বেনীক্ষণ বাড়িতে মন বসে না—বিশেষতঃ বৈকালের দিকে। সূর্য বাণবনের মত খা ছাড়াইয়া একটু নামিলেই রোদটা কেমন রাঙা আর আগ্রামদায়ক হইয়া আসে। বাণুপিসিদের গাইটা থলস মধ্যাহ্নে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাসলতা খায়। কাজল উত্তরের জানলায় বসিয়া লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণ পরে তাহার আর মন তেঁকে না—বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট করিতে থাকে। ব্যাং লতাপাতার যে বিশেষ ঘ্রাণটা বাতাসে বহিয়া আসে—সেটাই যেন তাহাকে খাও চঞ্চল করিয়া তোলে। গন্ধটার সহিত এই বাহিরে যাইবার ইচ্ছার যে কি সম্পর্ক—তাহা সে বুঝিতে পারে না, কেমন যেন বহস্যময় ভাব হয় মনে।

সম্পর্কে, দন্দভাব ছিল খুলিতে গেলে অসাবধানে আঙুরাজ হয়। বাণু জা'য়া বলে—হেলান বুঝি আবার বেকরনো হচ্ছে?

কাজল একটু অপ্রতিভ হয় বটে, কিন্তু ভয় পায় না। খিলটা হাতে ধরিয়াই দুটামিহ হাসি হাসিতে থাকে।

বাহির হইতে দিতে বাণু অস্বস্তি নাই। শুধু সাবধান করিয়া দেয়—খবরদার নদীতে নামবি নে, নৌকোয় উঠবি নে কিছু—বল, উঠবি নে?

কাজল প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে বাহিরে যাইবার সংমতি পায়।

অপু বলিয়া 'গয়াছিল—দেখো বাণুদি, নদীতে যেন একলা না যায়। চান কববার সময় দুনি সঙ্গে নিয়ে যাবে। ছেলমানুষ, সঁতার চেনে না—ডুবে যেতে পারে। কাজলও বাণুপিসির কথাব আশা হয় না—ইচ্ছামতীর ঘাটে ছেলেদের মাছলবা নৌকাগুলি বাসা পাকে। এপাড়ার ওপাড়ার কিছু ছেলে জমা হইয়া তাহাব উপর উঠিয়া খেলা করে। কাজলের গাড়ে বসিয়া দেখা ছাড়া গতানুগত নাই। পিসি বাণু করিয়াছে যে।

গাড়া হইতে বাহির হইয়া কাজল বাবার নতুন কেনা আমবাগানের দিকে হাঁটিতে থাকে। বাগানের প্রান্তে কাহাদের একটা বাঁশঝাড়। সবুজাকা সেদিন বলিতেছিল বাঁশগাছ নাকি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। রাতারাতি নাকি বাঁশের কোঁড একহাত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। কথাটা শুনিয়া কাজলের মনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিল। তাই এ জায়গাকেই সে উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছে। বাগানের শেষ গাছটার নীচে একখানি বাঁশের কোঁড হইয়াছে। হাত দিয়া মাপিলা আমগাছের ওঁড়িতে সমান উচ্চতায় কাজল ঝামা ধরিয়া একটা দাগ দিয়া রাখে প্রত্যেক দিন।

পরের দিন গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে, গাছ কতখানি বাঁধিল। গাছটার কাছে পৌঁছিয়া কাজল ভাল একটা বামা খুঁজিতে লাগিল। কাছাকাছি পাওয়া গেল না। কাজলকে ঢুকিতে হইল বাঁশবনের মধ্যে। বাঁশবনের ভিতরকার আগাছা কেহ কোনদিন পরিষ্কার কবে না—মালিকের দায় পড়ে নাই। নির্দিষ্ট সময়ে শেষে কয়েক গাড়া বাঁশ কাটিয়া চালান দিয়া সিঁদুকে পরমা তুললেই তাহার কাজ শেষ। বাঁশ তো বিনা যত্নেই বাড়ে। গাহার জন্য আবার কে—

কাজল একবার খামিতেই গায়ে নীচেব শুকনা বাঁশপাতার মচমচ শব্দ শুনিয়া যায়। সংগে সংগে কোথায় লুকানো পাখীটার ঝংঝং ঝংঝং হওয়া ওঠে। বাঁশপাতা হইতে কেমন একটা গন্ধ ওঠে—ক'লেব মন-কেমন-ক'বা ভাবটা বাঁড়িয়া যায়। উঁবে-নীচে কোনদিকেই পাখী টাকে দেখা যায় না। বাগুঁ'সি পাঁকটা চিনাইয়া দিয়া বালয়াছিল—কুণ্ডো পাখী। কাজলের হাসি পাইয়াছিল ন'মটা শুনিয়া। কেমন নাম চাখো—বলে কিনা কুণ্ডো পাখী—

খোকাব মধু-ঝরা হুঁসি দেখিয়া বানী কি—একটা পুংগো কথা মনে পড়ে। এক পলকের জন্য সে অসমন্বিত হইয়া যায়। পব মুহূর্ত হাসিয়া বলে—পাগল একটা, এত হাসব হলো কি নাম শুনে?

কাজলের একবার মনে হয় ডাক বাদিকের ঘোঁরা হাতে শাসিতোছে। সেদিকেই বনটা বেশী ঘন। কিছুদিন আগে এই কাজল হইতে কি একটা জন্তু শিকার কবিয়া লইয়া গিয়াছে। কাজেই একেবা'রোই গাছমচম কবে না এমন নহে। কিন্তু পাখীটাকে দেখবার কোঁচুলও কম নহে। বাগুঁ'সি বাঁলয়াছে লাল লাল চোখ—সে দেখেব কেমন লাল চোখ। কিন্তু বিশেষ সুবিধা ক'রা যায় না। কিছুটা বাদিকে হাটিলে মনে হয় ডানদিক হইতে আওয়ার্ড আনিতেছে। ডানদিকে এল, অগ্রসর হইলেই আওয়ার্ডটা পিছনে ঘুরিয়া যায়। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া তবে কাজল হাল চাড়িয়া দেয়।

ভাবী তো পাখী—“বে দেখা যাউবে। পাণ্ড এক সঙ্গন কাঁদল কি দেখা হইত না—নিশ্চয় হইত। নেহাত কাজ আছে বলিয়া তাকে অন্যত্র খুঁজিতে হইতেছে।

সন্ধ্যায় সুরুকাবার ত'একজন বন্ধুবান্ধব এনাডা ওনা হইতে আসিয়া ছোটো। মোটা কালোমত একজন লোক—গলায় কণ্ঠ, ঠকিয়া ঠকিয়া খোলটাকে ঠিক-সুবে বাঁধে। পবে সবাই মিলিয়া কাতন শুরু কবে। একাদন কাজলের খুব মজা লাগিয়াছিল। গানের মাঝামাঝি—যেখানে ‘কোথা যাও প্রভু নগর চাড়িয়া’ পদটা আছে সেখানে সবাই এমন হাঁ কবিয়া দীর্ঘ টান দিয়াছিল যে কাজল হাসি চাপিতে পারে নাই। এতগুলি বয়স্ক মানুষকে এক সারিতে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে কাহার না হাসি পায়?

কীৰ্তন তাহার খুব ভাল লাগে নাই। গানেব যে স্থানটিতে তাহার আশ্রয় হয়, সে স্থানটিতেই তাহাৰ পবম্পরের গলা জড়াইয়া গিয়া অশ্রুবিসৰ্জন কৰিতে থাকে। বাপাৰ দেখিয়া প্ৰথম দিন সে অৰাক হইয়া গিয়াছিল। বাপী তাহাকে খাওয়াইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া আসাৰ পৰেও এক একদিন অনেক বাত্ৰি পদপু গান হয়। শুনিতে শুনিতেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। কখনো কখনো বিনা কাৰণে মাঝবাত্ৰে ঘুম ভাঙিয়া যায়—দেখে জানলা দিয়া সুন্দৰ জোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িয়াছে। বাহিৰেব আতাগাছটা—ভূত-বোপাই আমগাছটা—ঢ্যানটা অৰু জোৎস্নায় আসিয়া যাইতেছে। ঘুম ঘুম চোখে সেদিকে তাকাইয়া থাকিলে বেশ লাগে। মনে হয়, কেহ ঘেঁৰা ঐ জঙ্গল হইতে ঢ্যানের জোৎস্নায় আসিয়া দাঁড়াইবে। তাহাৰ গানে কু কপাৰ দেশের সন্নিহিত মত চন্দালোকে সে একবাৰ কাঙলৰ দিকে তাকাইয়া হাসিবে—‘বেইশায়’য় থাকিয়া থানিবে সঙ্গদেব। একদল পৰাব দেশের লোকে ঢ্যান ভৰিয়া যাইবে। তাহাৰ ভাষা বোকা যায় না—কিছ তাহা সঙ্গতময়। ঢ্যানের ধূলয় ঢাঁদের আলোয় ছায়া সৃষ্টি কৰিয়া তাহাৰ লীলায়িত ভঙ্গীতে নৃত্য কৰিবে। মাঝে মাঝে কাঙল নিজে অৰাক হইয়া হাসিবে—‘হা’ দিখায় গতি দেখিয়া।

এই সময় বাবাব কৰা মনে পড়ে খুব। বাণ, পিসি পাণে ঘুমাইতেছে। পিসিৰ নিঃশ্বাসে শব্দ শোনা বাহতেছে। জানলাৰ বাহিৰে উঠানে সেই অপৰিহাৰ্য চাঁদের আলোৰ দেখ। এ সময় বাবা থাকিলে বেশ হইত। মনের যে ভাবই হোক না কেন, বাবাকে বুকাইয়া বলিবাৰ দৰকাৰ পড়ে না—বাবা নিজেই কেমন সব বুকায়া লয়। বাবা হয়তো বলিতে পারিত, কেন সে এমন অদ্ভুত চিন্তা কৰে। শুধু এ সব কাৰণেই নহে—অন্য কাৰণও আছে। হাঁ, সে বুকাইবে না—বাবাকে দেখিতে ইচ্ছা কৰে, বাবাব অন্য তাহাৰ মন কেমন কৰিতেছে।

পৰেব দিন পুৰো ললিতমোহন বাবুজোব ছেলে চনু আসিয়া তাহাকে একা-দোকা খেলিতে থাকে। চকতলাৰ মাঠে খেলা ভয়িয়া ওঠে। অবশ্য কাঙল খেলায় খুব স্টু নহে। তাহাৰ তাকও প্ৰশংসাৰ অযোগ্য। তিন নম্বৰ ঘৰ চি কৰিয়া ঘূটি ছুঁড়িলে বেটা পাঁচ নম্বৰ ঘৰে পড়িবেই। অবশ্য প্ৰত্যেক বাই কাঙল এমন ভান কৰিয়া থাকে যেন ওটা পাঁচ নম্বৰ ঘৰেই ফেলিবাৰ চেতা কৰিতেছিল। খেলা সমাপ্ত হইল সন্ধ্যাৰ আবছা আঁধাবে বাডী ফিৰিবাৰ সময় কাঙল চকুকে প্ৰশ্নটা কৰিয়াই ফেলে—তুই জানলাৰ পাশে শুয়ে ঘুমোস ?

চনু বাক্যালেব গতি কোনদিকে বুঝিতে না পাৰিয়া সংক্ষেপে বলে—হঁ।

—রাওবে জাগিস নে কখনো ? চাঁদনী বাত্তিৰে ?

—কত।

—কিছু দেখিস ? মানে, ভাবিস কিছু ?

—ভাবব আবার কি ? দাদা গায়ে পা তুলে দেয় বলেই না ঘুম ভাঙে । পা-
চাঁ নানিয়ে দিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ি । কেন রে ?

—মনে হয় না কিছু ? এই, কোন অঙ্কুত দেশের কথা, কি গল্পে-পড়া কোন
লোকের কথা ?

গল্প বলিতে চনু পড়িয়াছে কথামালাব ‘ব্রাহ্ম ও পার্শ্বত কুণ্ডব’ । তাহা
চাঁদনী বাত্রে স্বপ্ন দেখিবাব জন্য খুব আদর্শ উপাদান নহে । কাজলটা কি
পাগল নাকি ? সন্ধ্যাবেলা যত উদ্ভট কথা । না, চন্দ্রালোকিত বাত্রে অগ্র-
জ্বেব তাড়নায় জাগিয়া তাহাব বিশেষ কিছু মনে হয় না ।

কাজলও যে বিশেষ কিছু দেখিতে পায়, তাহা নহে । কিন্তু এক ফালি
চাঁদেব আলো—একটি পাতা খসিয়া পড়া হইতে সে অনেক কিছু কল্পনা
করিয়া লংতে পাবে । নিজেব বৈশিষ্ট্য বুঝিবাব বয়স তাহাব হয় নাই—
তবুও তাহাব সঙ্গীদেব সহিত একটা চিন্তাগত পাথকা সে অনুভব ক’িতে
পাবে । যেমন দুগা-পিসিব কথা । বাবা ও বাণুপিসিব কাছে গল্প শুনিয়া
সে দুর্গাব চেহারা ও স্বভাব কিছুটা কল্পনা করিয়া লইয়াছে নিজেব বসিয়া
ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে, পিসি সামনে দাড়াইয়া কথা বলিতেছে । এই
একটা ফল বুড়াইয়া লইল কোন গাছতলা হইতে, এই আনন্দানা ভাঙিয়া
তাহাকে দিল বাইতে । অপু ও বাণু দুগা-পিসিবের গল্পই শুনাইছে—এখন
থাকিলে পিসিব যে অনেক বয়স হইত, তাহা কাজলের কণ্ঠে মনে হয় নাই ।

শুধু এইটুকু সে বোঝে, পিসি বাঁচিয়া থা কলে তাহাকে খুব ভালবাসিত ।

নিশ্চিন্দ্রদুবেব সহিত কাজলের একটা নিবড সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল ।
অথচ কোথায় ছিল সে এক বৎসব আগে । দাদামশায়ের ভয়ে দুঃখ হইয়া
থাকিতে হইত । প্রকৃত ভালোবাসাব স্বাদ সে দাদামশায়ের কাছ হইতে পায়
নাই কখনো—তাড়নাই জুটিত বেশী । কেবল দিদিমাব কথা মনে পড়ে ।
বাবা যে তাহাকে মামাবাডী হইতে নিজেব বাড়ীতে লইয়া আসিল—দিদিমা
পাহল না তাহা দেখিতে । দিদিমাই যা-একটু বাবাব গল্প কবিত । আব
কাহাবও জন্য মন খারাপ কবে না তত । এখানে সে ভালই আছে । বাবা
নাই বটে—কিন্তু বাবা তো আসিবে । পিসি তাহাকে ভালবাসে । সবাব
উপর তাহাকে আকর্ষণ কবে গ্রামেব একটা নাবব ভাষা । কেহ সঙ্গে থাকিলে
অনেক সময় ভাল লাগে না । মাঝে মাঝে যখন সে নিজেদেব পুণাতন ভিটার
যায়—অস্তুতঃ তখন তো নয়ই । সম্প্রদেব স্বত্ববোপ তাহাব মধ্যে এখনও জন্মে
নাই । কিন্তু নিজের পিতৃপুরুষের ভিটার বসিয়া চিন্তা করার মধ্যে যে একটা
রোমাঞ্চকর অনুভূতি আছে—তাহা মনকে দোলা দেয় । উপবে গিয়া জঙ্গল
ঠেলিয়া চুপি-চুপি সে উঠানে বসিয়া থাকে । চুপি চুপি বসিবাব বিশেষ কারণ
আছে । এদিকে বিশেষ লোকজন আসে না—আসিবেই বা কি প্রয়োজন ?
একমাত্র আকর্ষণ—সজিনাগাছটাও বুড়া হইয়া গিয়াছে, ফল ভাল হয় না তত ।
কাছেই সে জগ্য মর্তক হইবার প্রয়োজন নাই । আসলে এই জায়গায় উদ্দা-

যত্ন প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না একেবারে। অগ্নি জ্বলিয়া হইলে কাঁচল বটের ঝুরি পরিয়া ঝুলিয়া, এখানে ওখানে লাফাইয়া এক তাণ্ডব বাণাইয়া তুলিত। কিন্তু এ ভিটায় আসিয়া বসিলে কে যেন তাহার ছোট মনটাকে শাস্ত করস্পর্শে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। এখনে তাহার ঠাকুমা রান্না করিয়াছে—পিসি পুতুল খেলিয়াছে—বাবা বাজা সাঁজিয়াছে আরাম সামনে—ঠাকুমা বসিয়া বালিকাগণে পালা দিয়াছে। তাহাদের পুণ্যস্মৃতিমগ্নিত স্থানে কি প্রগলভ হওয়া যায়। কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই। সে আপনি চূপ হইয়া পাকে। চূপ গড়াইয়া বিকাল হইয়া যায়। কেমন একটা অদ্ভুত ছায়া নামিয়া আসিতে থাকে। কাজলের মনে হয়, এই বৃষ্টি কেহ দিচ্চন হইতে কদা বলিয়া উঠিবে। যেন সে আমলটা শেষ হইয়া যায় নাই। সে মিশা বলিবে না—ভুগে হীতে তাহার একটা ভয় আছে। কিন্তু এই সময় যদি তাহার ঠাকুমা কি পিসি আসিয়া তাহার সহিত কদা বলে তবে সে একটুও ভয় পাইবে না। সে তো তাহাদের একান্ত আপনাত, কাহারও নাতি—কাহারও ভাইপো। কত আদর কবিত সবাই বাঁচিয়া থাকিলে। একটু আগে বাজা বাসন্তী বোদটার মধ্যে তাহারা কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় বাজা কবিবাব সময় গায়ে মাথায় সপ্তর্ষি মণ্ডল জল জল কবিতা থাকে। বাব তাহাকে চিনে ইয়া দিয়াছিল সর্ব। কালপুরুষ কুঁকিয়া পাকে পশ্চিম দিগন্তের কাছাকাছি। বাব একবার বলিয়াছিল কালপুরুষে হোটা যে তিনটি নক্ষত্র দিয়া তৈর্যবা—তাহার মধ্যে একটা নক্ষত্র বলিয়া মনে হইলেও আসলে নোহাবিকা। সে একটা ভাবন পাইলে দেখিবার চেষ্টা করিত। যাহা হটক, আপাততঃ আমবাগানটা তাড়াতাড়ি পাব হইয়া যাওয়া ভাল। সন্ধ্যা হইয়া আনিতেছে।

বাজা চুকিলে বাবী বলে—এতক্ষণ ছিল কোথায়, হারে—ও খোকন? এই বাতবিরেতে কি বাইবে বেড়াতে আছে বাবা? কোথায় ছিল? কাজল আবক্ত মুখে আমতা আমতা করিয়া বলে—এই একটু ঐ পূর্বনো ভিটেয়—

বাবী আর প্রশ্ন করে না। তাহার ইচ্ছা সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সুন্দর লাগিতে থাকে। খোকন চিনিয়া লগ্নাছে আপনার সঠিক স্থান। রক্তের ভিতরকার অমোঘ আকর্ষণ, তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে পবিত্র তার্থে। এতিহ্যের দাবায় গতি পীর—কিন্তু অনিবার্য। এ ভিটাকে ফেলিয়া তাহারা কেহ কোথায়, কিতে পাবে নাই। অণু গিয় ছিল চলিয়া—সে-ও কি বেশীদিন পালি লুপে থাকিতে? বংশের সন্ধানের হাত ধবিয়া আবার গো নেই কিবিয়া আশিতে হইল। কি যে টান রহিয়া যায়, তাহা বাবী ব্যাখ্যা কহিতে পারে না। হয়তো এতদিনে মনিকণিকাঘাট হইতে হরিহরের দেহাবশেষ বাতাসে ভাসিয়া অঙ্গসংস্কারে ফিরিয়া আসিয়াছে নিশ্চন্দ্রপুরে। সবজন্মের অদৃশ্য উপস্থিতি হয়তো এখনও ভিতর অণুতে অণুতে, গোবৎস যেন-

জন্মগ্রহণ করিয়াই ঠিক মাতৃসুত খুঁজিয়া লয়—তাহাকে চিনাইয়া দিতে হয় না, কাজলকেও তেমনি কোন নির্দেশ দিতে হয় নাই। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা নিয়মেব শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না—কবাইয়া দিতে হয় না। সব ঠিক ঠিক চলে।

মাস দুই-তিনে কবাইয়া গবম বেশ পড়িয়াছে। আজ আহাব কবিতো একটু বেলা হইয়াছিল। বাণী এখনও কাজলকে বাহিব হইতে দেয় নাই, বিশা-
মোৎসব নিতে ক'ছে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। কাজল কাত হইয়া শুইয়া
পা দুটো মিসি গায়ে তুলিয়া দিয়া গল্প শুনিতেছিল। বাণীর হইয়াছে বিপদ—
—ততক্ষণ চুক, কাজলও ময় না—গ্রাহবও ঘুম হয় না। এমন সময়
বাহিব হতে কে ডাকিল—শ্যামান অমিতাভ গায়, চিঠি আছে—অমিতাভ
বায়। কাজল প্রথমটা বিশাস কবে নাই—নিশ্চয়ই ভুল শুনিয়াছে। গ্রাহকে
চিঠি লবিবে কে।

দৌড়িয়া চিঠিটা নিতে গেল সে। বেশ মোটা কাগজে বড়ান খামের
চিঠি। বাণীও উঠিয়া আসিয়াছিল কাজলের কিছু পিছু। সে বলিল—খোল
তো খোকন, কাব চিঠি—। খাব বুক চিব চিব করিতেছিল। হয়তো
গ্রাহবই চিঠি—কতদিন আর ভুলিয়া থাকিতে পারে। কাজল খাম খুলিয়া
চিঠিটা বাহিব করিয়া প্রথমে যেন চোখে গোয়া দেখিল। কিছু বুঝিতে পারিল
না প্রথমটা। খুব চেনা, খুব পরিচিত হস্তাক্ষর, এ নিশ্চয়ই—। পরক্ষণেই
রাণীব হৃৎস্পন্দনকে দ্রুতায়িত করিয়া দুখ তুলিয়া সে বলিল—বাবা দিয়েচে—
বাবাব চিঠি মিসি। এই ছাখো বাবাব হাতেব লেখা।

উত্তেজনার সে হাঁপাইতেছিল।

একটু পবেই বাণী দেখিল, সে আর কাজল দুজনেই অঝোবধাবে কাঁদিতেছে।

অপু রাণীকে লিখিয়াছে—

‘ফিজি থেকে আফ্রিকায় এসেছি। কখন কোথায় ঘুরছি কিছু ঠিক নেই।
ফিজিতে একটা মিশনারী স্কুলে মাস্টারী কবলাম কিছুদিন। গ্রামবাটন
সাহেবই সব ঠিক করে দিয়েছিল। জীবনটাকে যেমন কবে দেখতে চেয়েছিলাম
—ঠিক তেমনি কবেই দেখছি বাণুদি। কোথাও দাকা পেলাম না। আশ্চর্য
একটা অসীমত্বের সন্ধান পেয়ে গেছি। মনে হয় যেন সময় অফুরন্ত—তা
ফুরিয়ে যাবে না কোনদিন। জীবনও তাই বাঁধনহারা, অসীম। মহাকাল
এত বিশাল—তার আঁচলটুকুই এত বড় যে সেই বিশালতাকে অনুভব করা
বহু দূরের কথা, ধারণাটাকে কল্পনায় আনতেই মানুষের যুগযুগান্ত কেটে যাবে।
এই জীবনকে—ত্রিকালকে বুকের পাঁজরে পাঁজরে ব্যাখ্যায়-বেদনায়, আনন্দে-
শাসে, স্বপ্নে আগরণে প্রতিক্ষেপে অনুভব করছি। আমার আর ভয় কি বাণুদি ?
এখন মনে হচ্ছে, ভক্তিবাবটা শুধু মেয়েদেরই একচেটে নয়—আমার মনেও
কাঁটা ভক্তির ভাব জেগে উঠেছে। এ ঠিক দেখারের ভক্তি নয়। বর্তমানের

ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতে রহস্যের প্রদোষালোকে আলোকিত পবিসরে বিস্তৃত যে মহাজীবন—তার প্রতি ভক্তি। এ যেন কিছুটা নিজেরই প্রতি ভক্তি। নিজেকে, বিশেষ করে নিজের জীবনকে জানবার অদম্য স্পৃহায় খুবে বেড়াচ্ছি। এখন মনে হচ্ছে যেন তা ছাড়িয়ে আরও বেশী কিছু জেনে ফেলেছি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করা যায় না। রাগুদি—সে বোধ ভাষায় অতীত। সে সকল জানাব জানা—এক অনিবার্য পরম-পাওয়া।’

কাজলকে লিখাচ্ছে -

‘তোমার জন্যই হয়তো আমাকে ফিরে আসতে হবে। কতদিন ফিজিতে সময়ের তালু বণে আমার মনস্তত্ত্ব দেখতে তোমার কথা শেবেছি। তুমি আমার প্রাণে অংশ দিয়ে তৈরি দ্বন্দ্ব, বাবা। চেতা ক’হি তাড়াতাড়ি গিরে যেতে। তুমি পানির কথা শুনে চলো নোং বেরা যাতে বেরবে না। নদীর দায়ে বেশী যেও না। আমার যে ফাস্টব্রুকা আছে—সেটা মনোযোগে দিয়ে দেখবে। এখানে অনেক মজার মজার জিনিস দেখছি—ফিরে তোমাকে গল্প বলবো। তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। আমার এলু তোমার মন খারাপ হয় না?’

বাবার জন্য তাহা মন খাবাপ হয় কি না। এমন দিন কবে গিয়াছে যে সকাল হইতে বাত্রি মণ্ডে বাবাব কথা ভাবে নাট? বৎ বাবাই তো তাহাকে ফেলিয়া বেশ থাকিতে পাবিতেছে। বাবা ফিন্সিয়া আসিলে সে বাঁচে।

ধুপুবে অপুৰ রাখিয়া পাওয়া সুটকেশ হইতে ডায়েরীখানা বাহির কবিন্সা সে পাড়তে বসে। ইহা সে মধ্যে মধ্যেই পড়িয়া থাকে। এক বৎসরের ঠাসবু-নোট লেখায় ভর্তি ডায়েরী। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জামগাম তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। কাশীর কথা লেখা আছে কয়েক পাতা। বাবা তাহাকে বাত্রি একবার কাশা গিয়াছিল বটে। কাজল পড়িয়া ফেলে পাতা কয়টা। এ কাহাব কথা লেখা। লীলা কে? তাহার মেয়ের সহিত বাবা তাহার বিবাহেব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে যে! বিবাহ! এ তো বড় মজার কথা হইল। কলিকাতায় থাকিতে গলিব ওপারে একটা বাড়ীতে সে বিবাহেব উৎসব দেখিয়াছিল। বর মোটরগাড়ি করিয়া মালা-চন্দন পরিয়া আসে। পরে গাড়ী হইতে নামিলে একজন মেয়ে কুলোর ওপর কি-সব সাজাইয়া তাহাকে বরণ করে ও অন্যান্যরা জোরে হাতপাখা নাড়িয়া বাতাস করিয়া থাকে। ওপাড়ার চনু বদিবও তো বিবাহের কথা চলিতেছে। চনু বলিতেছিল, দিদি কালো বলিয়া নাকি পাত্রপক্ষ এক হাজার টাকা পণ চাহিয়াছে। বেশ মজা তো। বিবাহ করিলে সেও টাকা পাইবে তাহা হইল। কিন্তু বাবা তো লিখিতেছে লীলার (এ কে?) মেয়ে ফর্সা। ফর্সা মেয়েকে বিবাহ করিলে টাকা দিবে তো? টাকা পাইলে সে সব টাকা বাবাকে দিবে। আচ্ছা, কত বৎসর বয়স হইলে বিবাহ হইয়া থাকে?

সেদিন সকাল হইতে যেঘ কবিস্থাছিল—কিছু বৃষ্টি হয় নাই। সুন্দর একটা চান্নাঘন আমেছে গ্রামটা ঘিরিয়াইতেছিল। পাখার ডাক শোনা যাইতেছিল কম। কেবল বহু উঁচুতে প্রায় মেঘের গায়ে গায়ে কয়েকটা চিল উড়িতেছিল। কাদেব মিঞার ক্ষেতের পাশে কাজল একবার থামিল। কাদেব তাহার শালাব সহিত নিডান দিতেছে ক্ষেত। কাজলকে দেখিয়া কাদেবের শালা বলিল—
 বাডী চলে যাও কতাবাব—বিস্ট হ'ত পারে। কাদেব তা ত্রি কনিয়া বলিল—
 —পানি হবে না মোটে—দুখ হ'ত না চিল উড়ছে ওপরে। পান'শ পানি পাল নামি আসিত নীচপানে। আবহাওয়া তু' সম্বন্ধে ও হাদেব আলাপ কনিতো দিয়া কাজল হাঁটিতে লাগিতে যে ঠান'শ পিয়া। ঐ পথটা গিয়াছে আষাঢ়ু—
 এই পথটা ঘুরিয়া গিয়াছে নদীর দিকে। একটা বড় গাছ, এ হাছে ইটা পথের সম্মুখলে। ভাষগাটা কাজলের বড় ভাল লাগে। গ্রামের বাবতীয় লোক এই পথ দিয়া আষাঢ়ুর হ'তে গিয়া থাকে। ত'না লোকও যায় কত। ভিন গাঁ হইতে মাঙ্গমত্র কাঁপে কনিয়া। আলের পদ মঠের পদ পবিশা এখানে আসে। এখান হ'তে কাটা প'র ধা যা চ'লবা যায় হ'তে। প'রাদি কঁপে হাটমুখা ওনসোত দেখিতে কাজলের বেশ লাগে।

খানিকক্ষণ সেখানে বসিয়া কাজল একবার নদীর পথে কিছুদূর হাঁটিয়া আসিল। কবিয়া অনিতে আনিতে দেখিল একজন লোক আম'তুর পথ হইতে নামিয়া গ্রামের দিকে চলয়া গেল। বুকা তাহার একবার কেমন কবিশা উঠিল। দৌড়াইয়া আগাইয়া গেল সে—এইবার লোকটার পিছনে আসিয়া প'র-িয়াছে। বতদিনের খনভাসের ফলে শব্দটা খেন জিভ দিয়া আব বাহির হ'তেছে না। মাদার মনো কেমন কপিতেছে। পথের পাশে গুজল হইতে বাতাস অচস্র বন্যপুস্পের গন্ধ বহিয়া আনিতেছে। একটা দাকা দিয়া কাজল শব্দটা বাহির কবিল—বাবা।

অপু বিচ্যৎস্পষ্টের ন্যায় নিশিয়া তাকাইল। এই ডাকটার জন্য সে ছুটিয়া আসিতেছে প্রতিবার আর এক প্রান্ত হইতে। সমুদ্রের কেনোচ্ছল উর্মিমাল, বিষুবমণ্ডলীর নেশের তাবক'খচিত তামস্র বাত্রির আকর্ষণ, উন্নত বালুকাময় ভূইয়া উপরে নারিকেল-গাঠন্য বাতাসের মর্মানন্দনি শুনিবার অস্বৃত তু'হুতি—সব সে তাগ করিয়া আসিয়াছে এত ডাকটা শুনিবার লোভেই তো। সে থাকিতে পারে নই।

অপূর হাত হইতে বাগ আঁপ বাস্প প'রিয়া গেল ধলায়। পথের পন্থে হাঁটু গা'ইয়া বসিয়া সে এই হাত সামনে বাড়াইয়া দিয়া চোখ বুজিল। পরক্ষণেই কাজল ঝাঁপাইয়া প'লিল অপূর বাহুবন্ধনে।

চিলঙলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া আসিতেছিল নীচে । এইবার রুষ্টি নামিবে ।

সন্ধ্যায় রাণীর রংমাঘরের দরজায় পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া অপু গল্প করিতেছিল ।

—আর পারলাম না থাকতে রাণুদি ! সে কি টান, তা যদি একবার বুঝতে । যা দেখি যা করি, সবই যেন কেমন কাঁকা আর অর্থহীন লাগে । সেই বাড়ীতে এনে তবে ছাড়ল ।

রাণী হাসিয়া বলে—আর আশা বুঝি কেউ নই ?

—কে বলেছে একথা রাণুদি ? তোমরা সবাই মিলে আমার জীবন সার্থক করে তুলেছ । কোথায় যেত আজ কাজল—তুমি না থাকলে ? তোমার দান কি ভোলবার ? মায়ের স্নেহ দিয়ে আমাদের দুজনকেই ঘিরে রেখেছ তুমি ।

রাণীর গলব কাছে হঠাৎ একটা কি কুণ্ডলী পাকাইয়া ওঠে । এত সুখের দিনও ভগবান তাহার কপালে লিখিয়াছিলেন । তবে সামলাইয়া বলে—এই নে, এ দুটো পবটা আগে খা, তারপর গরম গরম ভেজে দিচ্ছি—

রাত্রে ছেলেকে লইয়া শোয় অপু । অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাহাবও ঘুম আসে না । বৈকালে একবার খুব বড় হইয়া রুষ্টি নামিয়াছিল । তাই গরম নাই তত । জানালাব পাশে শুইয়া আকাশে নক্ষত্রগুলি দেখা যায় স্পষ্ট । মধ্যপ্রদেশ হইতে কিব্বিয়া একই নক্ষত্র কলিকাতাব আকাশে দেখিয়া তাহার কেমন অবাক লাগিয়াছিল । আবার ফিজি ঘুরিয়া আসিয়া এ নক্ষত্রগুলিকে কেমন ঢেনা-ঢেনা অথচ অনেক দূরের বলিয়া মনে হইতেছে । বিদেশে ইহাওই ছিল তাহার সঙ্গী—এই নক্ষত্র, যুক্ত উদার আকাশ প্রান্তরের বৃক্কে উপর দিয়া বহিয়া-যাওয়া ভবঘুবের বাতাস । সেও সুন্দর-জীবন—সে যে জীবন চাহিয়াছিল, সেই জীবন । কিন্তু এখন কাজলের পাশে শুইয়া তাহার উদ্দাম জীবনের গতিবেগ কিছুটা প্রশমিত করিতে ইচ্ছা করিল । কোথায় ফেলিয়া যাইবে একে ? একবার গিয়া তো মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে নাড়ির টান । শৈশবে বাবা অনেকদিন লাড় না আসিলে তাহার রাগ হইত—অভিমান হইত । বাড়ী ফিরিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া হরিহরকে অপূর রাগ ভাঙাইতে হইত । এখন বড় মমতা হয় হরিহরের প্রতি । বাবা কি আর ইচ্ছা করিয়া আসিত না । সংসার চালাইবার দুক্ল প্রয়াণে বাবাকে কোথায় না ঘুরিতে হইয়াছে—কি না করিতে হইয়াছে । বেচারী বাবা—তাহাবও কত ইচ্ছা করিত অপুকে দেখিতে ; আসিতে পারিত না শুধু কাজের চাপে । বই-খাতা বগলে তালি-মায়া ছাতা হাতে স্থান হইতে স্থানান্তরে বেড়াইত কাজের সন্ধানে । আজ অপু লেখক হইয়াছে—বই বাজারে কাটিতেছে মন্দ নয়, তাহার চাইতে বেশী মিলিতেছে প্রশংসা । কত বৎসর

পরে তাহাদের বাড়ীর লোক আজ সজ্জলতার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু বাবাকে দেখানো গেল না এই সব দিন—বাবা বাঁচিয়া থাকিলে বৃদ্ধ হইয়া যাইত, তাহাকে অপু শিশুর মত পরিচয় করিত। থাক—কাঙালের মদ্য দিয়া সে তাহার শৈশবে হাবাইয়া-খাওয়া পিতাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাহাকে মনের মত করিয়া মানুষ করিতে হইবে—ঠিক যেমন করিয়া সে চায়, তেমন করিয়া। ভাবিয়াছিল, গ্রামে না বাথিয়া কাঙালের প্রাত সে এত্নায় করিতেছে। গ্রামে হস্ততো কাঙালের শিশুময় ুণভাবে বকশিত হইয়া উঠিবাব সুযোগ পাইবে। তাই ছেলেকে কলিকাতার অদুন্দব গবিশেষ হইতে আনিয়া একেবারে প্রকৃতিব মদ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন ভাবিল, এইভাবে বাথিলে উহাব পড়াশুনা কিছুই হইবে না। বরং কোন-একটা ছোট শহরে লইয়া যাই। মাঝে মাঝে গ্রামে লইয়া আসিব—মাঝে মাঝে বেড়াইতে লইয়া যাইব দূবে। তাহাতে উহাব চোখ ভাল করিয়া ফুটিবে। সব দিক দিয়াই ছেলেকে চৌকস করিয়া তোলা প্রয়োজন।

পরের দিন সাবংবেলা অত্যন্ত গরম ছিল—কোথাও বাহির হওয়া যায় না। বিকালের দিকে বোদ একেবারে কমিয়া গেলে অপু ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল—বল দেখি কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়? পরে নিজেই স্থানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—চল। আগে বেরুই তো, তাবপব দেখা যাবে। নে, হাত মুখ ধুয়ে জামাটা পবে নে।

নিজের সার্টটা আনিবাব জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া কি মনে করিয়া জোবে ডাকিল—রাণুদি।

রাণী ভিভাবে ছিল, আসিয়া বলিল—কি? আবে, বেরুচ্ছিস বলে মনে হচ্ছে।

—রাণুদি, একটা জিনিস খেতে বড ইচ্ছা করচে, খাওয়াবে?

—ও মা? সে আবার কি কথা। খাওয়াবো না কেন। বল না—

—গরম পড়েছে খুব, একটু আমপোড়া-সরবৎ খাওয়াবে?

—আমপোড়া-সরবৎ। সে আবার কি নে। কখনো শুনি নি।

—আমাদের এদিকে খায় না। বাবা পশ্চিম থেকে শিখে এসেছিলেন। পশ্চিমে খুব খায়। বাবা মাঝে মাঝে মাকে করতে বলতেন। তুমি বানাও রাণুদি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

—করচি। এই সামান্য ব্যাপার, আমি ভাবি কি-না-কি খেতে চাইবি।

এটা কিন্তু সামান্য ব্যাপার নয় রাণুদি। কতদিন খাইনি বলো তো? ছোটবেলার মাঝে মাঝে মা করে দিতেন। আমাদের অবস্থা কি ছিল, সে তো তুমি জানোই। নিজেদের বাগান ছিল না, ঘরে সব সময় চিনিও থাকত না—আমপোড়া-সরবৎ তখন একটা বিরাট বিলাসিতা। কালেভদ্রে হলে খুব ভালো লাগতো। আজ বানাও তো রাণুদি। খেয়ে দেখি, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে কিনা। খোকাকেও একটু দিও—কাঁচা আম আছে

তো ?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। কাল এক বুড়ি আম দিয়ে গিয়েছে তুলসীর মা।

কাজল আসিয়া বলিল—বাবা, তোমার হয়েছে ? আমার এই বোতামটা লাগিয়ে দাও তো, আমি পারছি নে—

অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—দেখেচো কাণ্ড রাগুদি ? উল্টো ঘরে বোতাম লাগিয়ে বসে আছে। ইয়ারে, তোর বুদ্ধিগুদ্ধি কবে হবে ?

একটু পরে বারান্দায় বসিয়া সব্বতে প্রথম চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে-বেলাটা ফিরিয়া আসিল। অপু চোখ বুঁজিয়া আমপোড়ার সৌন্দর্য গন্ধ উপভোগ করিতেছিল। এই গন্ধটা কেমন পুৰাতন দিনগুলিকে মনে পড়াইয়া দেয়। সেই দাওয়ায় চাটাই পাতিয়া বসিয়া তালের বড়া খাওয়া, সেই মাটির দোয়াত হাতে প্রসন্ন গুরুশায়ের কাছে পড়িতে খাওয়া। কত কথা মনে পড়ে। রাত্রে প্রদীপের আলোয় বসিয়া পড়িতে পড়িতে কানে আসিত মায়েব খুশি নাড়িবার শব্দ। বিদেশ হইতে বাবা আসিলে অপূর অভ্যন্ত আনন্দ হইত। রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত শুনিত, বারান্দায় বসিয়া বাবা গান করিতেছে।

আর একজনের কথা মনে পড়ে।

বাংলা দেশ হইতে বহুদূরে তারকাখচিত আকাশের নিচে সমুদ্রবেলায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একসময় তাহার তন্দ্রার ঘোবে মনে হইয়াছে, সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বদলায় নাই বয়স বাড়ে নাই। তাহার চোখের দৃষ্টির পরিবর্তন হয় নাই ? তাহার আঁচলে বাঁধা নাটাকলগুলির সংখ্যা একটিও কমে নাই। সে অপূর সামনে দাঁড়াইয়া হাসিয়াছে।

তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে অপূ অবাধ হইয়া আকাশের দিকে চাহিত। সমস্ত দুঃখের দিনে উদার আকাশ তাহাকে শান্ত করিয়াছে। দেখিত, বাংলার আকাশের সহিত বিদেশের আকাশের কোন প্রভেদ নাই। দেখিত, তাহার দিদির দৃষ্টি যেন ক্রমশঃ আনৌহারিকা-সৌচরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এইমাত্র এইখানে ছিল—তাহার ঘুম ভাঙিতে দেখিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বেড়াতে যাবে না বাবা ?

ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া অপূ বলিল—চলো বাবা, যাই।

পথে বাহির হইয়া বলিল, আমরা যদি এখান থেকে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় থাকি, তবে তোর মন খারাপ হবে—না রে ?

কাজল প্রথমে অবাধ হইয়া গেল। চলিয়া যাইবার কথা উঠিতেছে কেন ? অবশ্য বাবা যেখানে আছে, এমন জায়গায় থাকিতে তাহার খারাপ লাগিবে না, কিন্তু পিসিকে ছাড়িয়া থাকা বড়ো কষ্টের।

—কোথায় যাবো বাবা ?

কোথায় যাওয়া হইবে তাহা অণু কিছু ভাবে নাই। গ্রাম ছাড়িয়া বেশীদূর যাওয়া হইবে না, আবার কলিকাতাও কাছে হইবে—এমন স্থানের সন্ধান সে মনে মনে করিতেছিল। ছেলের প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে বলিল—আমিও তাই ভাবছি রে।

গ্রাম ছাড়িয়া বেশীদূর যাওয়া ঘটিবে না—সে যাইতে পারিবে না। বারবার তাহাকে ভিক্ষুকের মতো ফিবিয়া আসিতে হইয়াছে নিশ্চিন্দপুরে। এ গ্রামের প্রকৃত তাহাব কাছে জীবনধারণের জন্য বাতানের মতো প্রয়োজনীয়। তবুও ছেলের কলাপের জন্য যাইতেই হইবে বাইবে। ভাল স্কুলে না পড়িলে কাজ-লের চোখ কুটিবে না। দেওয়ানপুর স্কুলের মিস্ট্রি দত্ত-বাবু কাছে সে নিজের স্বামী, বৃহত্তর ভাবনে প্রবেশের মুখে তিনি তাহাকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কাজলকে সে নিয়ে তৈয়ারী করিয়া দিবে।

নদীর ধারে যাইবাব পথে আশাবরঙ্গী স্কুলপু এক ভদ্রলোক ডাকিয়া নমস্কার করিলেন—আপনিই তো অণুবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে তো আগে এ গ্রামে দেখি নি বলেই বোধ হচ্ছে। নতুন এসেছেন বুঝি?

নতুনই বটে। তাও ধরুন গিয়ে খুব নতুন আর কি। বহু কয়েক গো হয়ে গেল। আমার নাম সাধাবরণ চাট্টো। বরাবরের নিবাস ঝাড়পুত্রের কাছে গ্রামে, তা সে মশাই এমন ম্যালেরিয়া খেঁকি বলব। দেখ-দেখ কবে একেবারে গ্রাম উঠা—

—ও।

—হ্যাঁ। তাবপর আর সে গ্রামে ভরসা কবে বাস করা—বুঝলেন না? তাও গিন্নী বলেছিলেন, যেখানে যাচ্ছ সেখানে কি আর জরাজীর্ণ নেই? কথাটা অবশ্য মন্দ বলে নি, কি বলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক কথাই বলেছেন উনি।

—মশায় সুনল'ম দেশ বিদেশ অনেক ঘুরেছেন, একদিন গল্প শুনতে যাবো। সেজন্তেই মশায়ের সঙ্গে আলাপ করা।

—দেশ-বিদেশ আর কি, সে এমন কিছু নয়। তবে যাবেন নিশ্চয়ই, তার জন্য আব বলার কি আছে?

এই শুরু হল। রাস্তার মতো আসিলই, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম হইতে অন্যান্য গাঁও একে হুয়ে করিয়া আসিয়া হাজির হইল। ঘরে প্রায়ই নতুন মুখ দেখা যাইতেছে। অনেকেই যাচিয়া আলাপ করিতেছে। অণু যেখানে গিয়াছিল, তাহাব ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান সকলোই প্রায় একপ্রকার। সবাই জানিতে চায় দেশটা কেমন; পৌছাইলেই ধরিয়া তাহারা রেখ করিয়া দেয় শোনা গিয়াছে, এক কথা কতদূর সত্য? একদিন দক্ষাবেলা একজন প্রতিবেশী আসিয়া হাজির হইল, সে কাহার কাছে গিয়াছে বিলাতে অমাবস্যার রাত্রে রামধনু দেখা যায়। অণু সচ্য বিদেশ হইতে আসিয়াছে—অতএব

সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার জন্য সে ছাড়া উপযুক্তের লোক আর কই ? অপু শুনিয়া হাসিয়া বলিল—বিলেত যাকে বলে, ঠিক দেখানে তো আমি যাই নি। আব তাছাড়া রাশিরে রামধনু কি করে দেখা সম্ভব ? রামধনু তৈরি হয় কি ভাবে ? জলকণার ওপর আলো—

একঘণ্টা সময় লাগিল। অনেক পরিশ্রম করিয়া বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেওয়ার পব শ্রোতাবা মাথা নাড়ার ভাব দেখিয়া গত একঘণ্টার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্বন্ধে অপূর্ব কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। বুকু আর নাই বুকু, লে কটা হুঁহাব মিনিট দুই পবে বিদায় লইল।

গ্রাম হইতে বিদায় লইতে হইবে বলিয়া অপু ছেলেকে লইয়া দুইবেলা পথে পথে বেড়ায়। বাস্তব লোকে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার আশ্চর্য ভ্রমণর প্রাপ্ত শুনিতে চায়। অপু কাহাকেও নিবাস কবে না। সে জানে, ইহাদের মধ্যে অনেকই সাবাজীবনে বাংলাদেশের বাহিরে পা দেওয়ার সুযোগ পাইবে না। ভাবিয়া তাহার দুঃখ হয়। এই সহজ মমত্ববোধের বলে সে কয়েক শতাব্দীর কথিত গল্প পুনরায় হাসিমুখে কবিত্তে থাকে।

অপু বলি-বল করিয়াও কথাটা বাণীকে বলিতে পারিতেছিল না। চলিয়া যাইবার কথা শুনিলে বাণী যে আদৌ সুখী হইবে না ইহা অপূর্ব জানা ছিল বলিয়াই কথাটা সে সাহস করিয়া রাণীর নিকট তুলিতে পারিতেছিল না। যাটবার সময় আচমকা না বলিয়া এখন হইতে আভাস দিয়া রাখা ভাল। অথচ সাহসের অভাব। দুই-চার দিন বলি বলি কবিত্তা অপূর্ব বান্নাঘরের সামনে ঘোবাকোণা ক বল, তাবপব একসময় দুর্গানাম কাবিত্তা কথা পাড়িয়া ফেলিল। —একটা কথা ছিল বাণী দি।

বাণী তোবঙ্গ গোছাইতেছিল। অপূর্ব গলাব স্বরে এবং মুখভাবে বিস্মিত হইয়া তাকাইল।

—কি কথা বে ?

অপু একটা ঢোক গিলিল। —এই, মানে, কাজলের পডাশুনাটা এবার ভাল ভাবে শুক কবে দেওয়া দবকাব।

—তাতে কি ?

—না, বলছিলাম কি, শুকে এখন থেকে একটু—মানে একটু ভাল স্কলে তো পডাতে হবে। তাই বাণুদি, ভাবছি কিছুদিনেব জন্ম শহব এলাকায় বাসাভাড়া কবে থাকব। আগামী হুগ্নয় হয়তো বওনা দিতে হবে। বুঝতেই পারছ, ছেলেটাব পডাশুনো তো হওয়া দবকাব।

রাণী কোনো কথা বলিল না, তোবঙ্গের ডাল খোলাই বাখিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল, মুখটা রহিল খোলা জানলাব দিকে। তাহার অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতে পারিত অপূর্ব কথা তাহার কানে যায় নাই, সে অগ্ন-মনস্কভাবে কাইরের কাঁঠালগাছটা দেখিতেছে মাত্র।

অপু ভিজ্ঞাসা করিল—রাগ করলে রাগুদি ? অপু ভাবিরাছিল রাগুদি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে, রাণী মুখ ফিরাইলে দেখিল তাহার চোখে জল নাই।

হাত দিয়া বিছানার চাদবটা মসৃণ করিতে করিতে রাণী বলিল—না বে, রাগ করিনি। রাগ করবো কেন ? তুই কি পাগল হলি অপু ? এতে তো কাজ-লেবই ভালো হবে, ওব লেখাপড়া কি কিছু হবে এখানে থাকলে ?

একটু থামিয়া বলিল—তাছাড়া পরের জিনিস আর কতদিন নিজের কাছে রাখব ? মাথা পড়ে গেলে ছাড়তে যে বড়ো কষ্ট হবে। তাব চাইতে তুই এখনই নিস্নে যা—

এত সহজে ব্যাপাব মিটিয়া যাইবে অপু আশা কবে নাই। যাই হউক, রাগুদি যে চলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বৃথিতে পারিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। অপু বলিল—মাঝে মাঝে এখানে নিস্নে আসবো বাগুদি, প্রত্যেক ছুটিতে আসবো। আমাবই বা কে আছে বলো তুমি ছাড়া ? ববং তখন তুমি বিবক্ল হয়ে উঠবে দেখো—

একটু পরেই হাতপাখা চাহিবাব জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া অপু চৌকাঠেই দাঁড়াইয়া গেল। বিছানাব ওপর উপুড় হইয়া বাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

অনেক ভাবিয়া অপু মালতীনগবে যাওয়া স্থির করিয়াছিল। মালতীনগর জায়গাটা এখনও পুবা শহর হইয়া উঠিতে পাবে নাই, তবে শহবেব সুবিধা মোটামুটি প্রায় সমস্ত পাওয়া যায়। অনেক বাড়ী-ঘর, মানুষ-জন ও হাট-বাজারের মধ্যে গ্রাম হইতে শহরে স্পর্শই বেশী। নিশ্চিন্দ্রপুর হইতে অবশ্য খুব কাছে হইল না। কিন্তু কি আব করা যায়। সব সুবিধা দেখিতে গেলে চলে না। কিছু দিন আগে অপু মালতীনগব ফুলে গিয়া হেডমাস্টাব মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়াছিল। সেখানকার বাবস্তা তাহার পছন্দ হইয়াছে। ভর্তি করাইবার যাবতীয় বাবস্তা কবিয়া ফিবিতে ফিবিতে হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া তাহার খুব অবাক লাগিল। সে আজ ছেলেকে ভর্তি কবাইবাব জন্য ঘূণিতেছে, ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছে। আশ্চর্য, এই কিছুদিন আগে তাহার কথাই তাহার মা-বাবা চিন্তা করিয়াছে। তাই সে অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। অথচ সম্ভানের পিতার যতটা গম্ভীর ও রাশভারী হওয়া উচিত, তাহা সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও হইতে পাবিতেছে না। রাশভারী মুখ করিবাব চেষ্টা করিল, হইল না। খানিক পরে নিজেরই হাসি পাইল। আসলে সে বুদ্ধ হইয়া নাই, তাহার পক্ষে বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে।

বিদায় লইবার পালা বেশ কয়েকদিন ধরিয়া চলিল। রাণী ভালমন্দ রান্না করিতে লাগিল, পাড়ার মানুষ এবং গল্পপিপাসুরা দল বাঁধিয়া আসিয়া বিদায় লইয়া গেল। কড়ার রহিল, অপুকে প্রায়ই আসিতে হইবে। কাজল সকাল-বিকালে একবার করিয়া বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিল।

সবলকে যাইতে দিব না বলিলে সময় অধিকতর ভাড়াভাড়ি চলিয়া যায়। ক্রমশ

যাইবার দিন আসিয়া গেল। অপু মালতীনগরে একখানি বাগা ভাড়া করিয়াছে। সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় আসবাব কিনিয়া সেখানে রাখা আছে। একসঙ্গে সমস্ত কেনা গেল না। দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজন দেখা দিলে ক্রমশঃ কেনা হইবে। বহুকাল বাদে অপু সংসার পাতিতেছে—একা। কি কি জিনিস লাগিবে তাহা রাণীর সহিত পৰামর্শ করিয়া কেনা হইয়াছে। অপু একর উপর ভার থাকিলে হয়তো গুতন বাড়ী গিয়া প্রথম দিন উপবাস করিতে হইত।

যাইবার গোলমাল, বাস্তব গোছানো, নানাবিধ উপদেশ এবং উত্তেজনায় কাজল কিছুটা দিশাহাবা হওয়া পড়িয়াছিল, নতুবা রওনা হইবার সময় সে নিশ্চয় এক-বাদ কাঁদিয়া ফেলিত। পবে তাহার মনে হইয়াছিল—পিসি অত কাঁদলে আর আমি দিবি চলে এলাম। পিসি হয়তো ভাবলে ছেড়ে আসতে আমার মন খাবাপ হয়নি।

মন খাবাপ তাহার অবশ্যই হইয়াছে, কিন্তু সেই গোলমালে তাহার কান্না আসে নাই।

অপু মনটা কেমন ঝিঝিট্টা পড়িয়াছিল। বাণীর কাছে কাজলকে রাখিয়া তাহার যে সহজ নিশ্চিন্ততা ছিল, তাহা সে ফিরিয়া পাইতেছিল না। অনেক প্রতিজ্ঞা, অনেক পত্র লিখিবার প্রতিশ্রুতি, অনেক চোখের ওলেব মধ্য দিয়া তাহা মাঝেরপাড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া গেল।

ট্রেনে উঠিয়া কাজল বলিল—একটা কথা বলব বাবা ?

—কি ?

—আমরা মালতীনগরে যাচ্ছি, না ?

—হ্যাঁ।

—সেখানে থাকতে কেমন লাগবে বাবা ?

কঠিন প্রশ্ন। অপু জানলা দিয়া বাহিবে তাকাইয়া বৌদ্ধদন্ড প্রাপ্তর দেখিতে দেখিতে উত্তর খুঁজিতে লাগিল।

মালতীনগর জামগাটা কাজলেব খুব খাবাপ লাগিল না। ঘনবসতি সে ভালবাসে না, মালতীনগরে তাহা নাই। বাবা যে বাসা ভাড়া লইয়াছে সেটা শহরের অপেক্ষাকৃত কাঁকা জামগাটা। জানলায় দাঁড়াইলে অনেক দূর দেখা যায়, দৃষ্টির কোন প্রতিবন্ধক নাই। একটা জানলা আব মুক্ত আদর্শ কাজলের অভ্যন্ত প্রয়োজন। দুপূর্বের আকাশে চিল ওড়া দেখিয়া সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটা ইচ্ছা দিতে পারে। তাই জানলা একটা অবশ্যই দরকার প্রাপ্তরের দিকে। সে যে শুধু চিল দেখিবার জন্যই দাঁড়াইয়া থাকে এমন নহে। আসলে চিল-ওলা উঠিতে উঠিতে যখন বিন্দুবৎ হইয়া আসে তখন কাজলের মনটা হঠাৎ বিপুল একটা প্রসার লাভ করে। মনে মনে রোজ ভাবে—বাবাঃ, কোথায়

উঠে গিয়েছে চিলঙলো, এই এতটুকু দেখাচ্ছে একেবারে! আচ্ছা, ওখান থেকে না-জানি পৃথিবীটা কেমন দেখায়। সুদূরের কল্পনা তাহার শিশুমনে স্বপ্নের রঙ বুলাইয়া দেয়। আরও কি-একটা মনের মধ্যে হয়, সেটা সে ঠিক বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, সেটা বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা তার আশ্রয়ে নাই। দূরের কথা ভাবিলে হৃপ্তিরে জানলায় বসিয়া মেঘস্পর্শী পান্থী দেখিলে তাহার বকের গভীরে কি একটা কথা গুমরাইরা উঠে, সে তাহা ভাষায় অনুবাদ কবিত্তে পারে না।

একদিন অপু বাহির হইতে আসিয়া কাজলকে জানলায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কি বে, কি দেখছিস হাঁ করে?

কি দেখিতেছিল তাহা সে বাবাকে মোটেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই, প্রকাশের চেষ্টায় তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। চিলঙলি নহে, অগ্নিবর্ষা আকাশটা নহে, মাঠ-প্রান্তর নহে, মেঘ নহে, অথচ এই সবগুলি মিলিয়া যে গভীর একতান সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাহিরে সবদাই বাজিতেছে, তাহা সে কেমন কবিত্তা গুনিয়া ফেলিয়াছে। অপু একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহার নিজের শৈশবের চিন্তা হুবহু কাজলের মনে প্রতিফলিত হইয়াছে—হুবহু। ছোটবেলায় সে-ও বোয়াকে বসিয়া গ্রীষ্মের ঢপুবে অবাক হইয়া আকাশ দেখিত। প্রকৃতির আশ্চর্য নিয়মগুলির কাছে শ্রদ্ধায় তাহার মাথা নত হইয়া আসে। মানুষের মতামত, ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রকৃতি কঠোর হাতে পৃথিবী শাসন কবিত্তেছে। প্রকৃতি স্পষ্ট, জড়তাশূন্য অথচ বহুসময়। প্রকৃতির বহুসময়তাব প্রতি আকর্ষণ কাজলের রক্তেও সঞ্চারিত। আর মুক্তি নাই—সে মুক্তি পায় নাই, কাজলও পাইবে না।

রান্নাবান্না কোন একসময়ে হইতেছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে কাজলের মুখে অপুর বান্না মোটামুটি খাবাপ লাগে না।

কিন্তু এইভাবে বেশীদিন চলিবে না, তাহা অপু বুঝিতে পারিয়া একটি বুড়ীকে রান্নার জন্য ধরিয়া আনিল। খুব বুড়ী নয়, দুইজনর বান্নাব কাজ চালাইয়া লইতে পারে। বুড়ীরও কোথাও আশ্রয় মিলিতে ছিল না, বলিবা-মাত্র পৌটলা হাতে করিয়া আসিয়া গড়িল। তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া অপু মনে মনে ভাবিল—ধাহা, বুড়ী মানুষ, কোথাও কেউ নাই। একে ভাড়াব না, রেখে দেব যতদিন থাকে। মুখে বলিল—তোমাকে কি বলে ডাকব বলো দেখি? তোমার ছেলের নাম তো গোপাল? তাহলে গোপালের মা বলে ডাকব, কেমন?

—আর বাবা ছেলে। সে কি আমায় দেখে, না খেতে দেয়? তবুও কি জালা, তার নাম ধরেই লোকে আমায় ডাকবে। যেখানে যাই, শুধু গোপালের মা আর গোপালের মা—

—তবে অন্য একটা কিছু বলো, সেভাবেই ডাকব’খন।

ভাষাতেও বুড়ীর আপত্তি। দেখা গেল যে, ছেলে খাইতে বা পরিতে দেখে না, মুখে আপত্তি করা সত্ত্বেও বুড়ী তাহারই নামে পরিচিত হইতে চায়। অপূর কেমন মান্না পড়িয়া যাওয়ায় গোপালের মা থাকিয়া গেল।

মালতীনগরে আসিবার পরদিন অপূ কাঁজলকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। পথটা বাজারের মধ্য দিয়া গিয়া রেললাইন পার হইয়াছে, সে পথ ধরিয়া দুজনে কিছুক্ষণ ঈষ্টল। বাজার ছাড়াইবার পর বাঁদিকে একটি দোকান হইতে অপূ একটা সিগারেট কিনিল। লুডি-পরা একজন মানুষ হাত-পা নাড়িয়া বলিতেছে—বেবিয়েছে কি এখন। সেই ছপরের আগে একবার জাবনা খেয়ে বেরিয়েছে। তা কোথাও খুঁজে পাচ্চি নে, কি করি বলো দেখি হরিধন ? দুপেল গাঠ—কোথাও বেঁধে রেখে দুধটু দুয়ে নিচ্ছে না তো ?

হরিধন, দোকানের মালিক, অপূকে পসসা ফেবত দিতে দিতে বলিল—খুঁজে দেখ পাবে'খন, এখনও তো সন্ধ্যা লাগে নি। তুমি বড় বেশী ভাবো কামাল।

কামাল একটা বিন্ডি ধরাইয়া বসিল।

বাজার ছাড়াইয়া কাঁজল বলিল—বাবা, শোনো।

—কি বে।

—আমায় আর একবার কোলকাতায় নিয়ে যাবে ?

—কেন বে ? শহর বুঝি খুব ভাল লাগে ? বায়োফ্লোপ দেখবি ?

—না।

—তবে ?

একটু চুপ করিয়া কাঁজল বলিল—খাছুঘর আবার দেখব।

অপূ অবাক হইল আনন্দিতও হইল।

—নিশ্চয় নিয়ে যাবো। আমারও ৬'চাব দিনের মধ্যে একবার কোলকাতায় যেতে হবে। তোকে সঙ্গে কবে নিয়ে যাবে'খন।

পথটা এখন নির্জন—ফাঁকা। শহরের এদিকে লোকবসিত কম। কাঁজল চাবিদিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছিল। সাবাদিন বোদ্রে পুড়িবার পর সন্ধ্যায় মাটি হইতে কেমন চমৎকাব একটা গন্ধ বাহিব হয়। গন্ধটাব সহিত গবমকালের একটা যোগাযোগ আছে। শীতকালেও তো রৌদ্র ঝেঁ—কিন্তু তখন এমন গন্ধ বাহিব হয় না। এক ভায়গায় পথের ধারে অনেকগুলি বাধাচূড়া গাছ—হলদে ফুল ফুটিয়া আছে। অপূ ছেলেকে চিনাইয়া দিল—ঐ দেখ, ঐ হচ্ছে বাধাচূড়া ফুল। কালকেই নাম কবেছিলাম, মনে আছে ?

বেশ শান্ত সুন্দর সন্ধ্যা। এইবার একটি একটি করিয়া নক্ষত্র উঠিবে। অপূর হঠাৎ মনে হইল—বেশ হতো, যদি বাড়ী গিয়ে দেখতাম অপূ'র জলখাবার তৈরী করে বসে আছে। কাঁজলের হাত-মুখ দুইয়ে খাবার খাইয়ে পডতে বসাতো। আমায় লুচি আর বেগুনভাজা এনে দিয়ে চা চডাতে যেতো। মন্দ হয় না যদি সত্যি—

অনেক দূর আসা হইয়াছে। সামনেই রেললাইন।

ফিরিবার জগু অপু ছেলের হাত ধরিয়া টানিবে, এমন সময় কাজল মুখে একটা শব্দ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

অপু সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, কাজল রেললাইনের ধারে ঢালু জমিটার দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রেললাইনের পাশে একটা গরু পড়িয়া বহিয়াছে—মৃত। ট্রেনের ধাক্কায় নিশ্চয় মারা গিয়াছে। শিং দুইটা ভাঙিয়া কোথায় গিয়াছে কে জানে, মেরুদণ্ড ভাঙিয়া শবীবটাকে প্রায় একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছে। পিঠের কাছে চামড়া ফুটা হইয়া একটুকরা বক্তাক্ত মেরুদণ্ডের হাড় বাহির হইয়া আছে। ঘাড় ভাঙা, মুখের কোণে রক্তমাখা ফেনা।

—বাবা।

কাজল যেন কেমন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উবু হইয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অপু ভয় পাইয়া গেল।

—কি বে? ভয় কি? ওঠো বাবা, মানিক আমার। কোন ভয় নেই।

কাজল রক্তশূন্য মুখে বলিল—সেই লোকটার গরু। একেবারে মবে গেছে বাবা? আমার খারাপ লাগছে।

বাড়ী আসিবাব পথে কাজল কাঁদিয়া অস্থির। জ্বরে কাঁদে নাই, ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। অপু অনুভব করিতেছিল, তাহাব হাতের ভিতর কাজলের হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা। অপু নিজেবও খাবাপ লাগিতেছিল। বীভৎস দৃশ্যটা। কেন যে ওই পথে গেল তাহাবা।

—তুই অত ভয় পেলি কেন? ইঁ। রে।

কাজল ভবাব দিতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে ঝুঁপিতেছিল দিশঃ কঁাক-হওয়া রক্তফেনা-মাখা মুখ, ভাঙা মেরুদণ্ডেব বাহিব হইয়া-থাকা হাড়টা আর মৃত গরুর পড়িয়া থাকিবাব অস্বাভাবিক ভঙ্গি।

অসুন্দর জিনিসের সহিত তাহাব পরিচয় কম, সুন্দর সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইয়া এই প্রথম সবাসরি অসুন্দরেব সহিত পরিচয় হইয়া গেল।

এ দিনটা কাজল ভুলিতে পারে নাই।

মালতীনগরে যে স্কুলে কাজল ভর্তি হইয়াছে, সেটা অপুৰ বাসা হইতে খুব একটা দূর নহে। তবু অপু কাজলকে স্কুলে পৌছাইয়া দিয়া আসে। আবাদ ছুটি হইলে লইয়া আসে। বাদবাকি সময় তাহার একার, নিভঃ। এই সময় সে একটি নূতন উপন্যাস লিখিয়া থাকে। প্রথম উপন্যাসের সাফল্য তাহাকে সাহসী করিয়াছে। এক উপন্যাসেই তাহার বলিষ্ঠ কথ্য শেষ হইয়া যায় নাই। অনেক বাকী রহিয়াছে। এই উপন্যাসে তাহা লিখিবে।

আশেপাশের দুই একজন প্রতিবেশী অপুৰ কাছে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ইহার জনিরা গিন্নাছেন, অপু লেখক। অপুৰ উপন্যাস এঁরা পড়েন নাই,

কিন্তু লেখকের উপর এঁদের অবিলম্বে ভক্তি। ফলে, শহরে সাহিত্যিকের আগমন সংবাদ রটিতে বিশেষ গিল্প হইল না। তাহার বাসায় কয়েকটি ছোকরা খাতায়ত্ত শুরু করিল। ইহাদের রচনা অপুকে মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইত—দবকার হইলে কলম চালাইয়া ঠিক করিয়া দিতে হইত। অপুও উপন্যাস ইহা বা পড়িয়াছে। অপু অর্থাৎ হইয়া লক্ষ্য করিল, তাহার নাম বেশ চড়াইয়াছে। এত দ্রুত খ্যাতি আসিবে, ইহা তাহার কল্পনার বাহিরে ছিল। একদিক দিয়া ভালই হইয়াছে। একা থাকিতে হয়। এ ধরনের কিছু তরুণের সহিত আলাপ পাকা ভালো।

কাজলকে প্রতিবেশীর বাড়িতে বাসিয়া যাবে যাবে সে একদিনের জন্য কলিকাতায় যায়। বই হইতে খায় হইতেছে মন্দ নহে। পাবলিশারের কাছে গিয়া অপু টাকা লইয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মালতীনগরে ফেরে। কাজলকে ছাড়াইয়া সে বেশীক্ষণ থাকিতে পাবে না। আজকাল তাহার এই ভাবিয়া অর্থাৎ লাগে যে কাজলকে ফেলিয়া কি ভাবে এত দিন সে বাহিরে পড়িয়াছিল হেঁচক দিজি সুন্দর স্থান, কাজল সুন্দরতর।

কলিকাতায় একদিন তাহাকে প্রকাশকের দ্বাৰে দ্বাৰে পাণ্ডুলিপি লইয়া ফিবিতে হইয়াছে। নূতন লেখকের উপন্যাস কেউ ছাপিতে বাজী হয় নাই। এখন পরিস্থিতি কিছুটা শ্রান্তকর। প্রকাশক খাতিব কবিতােছে, যত্ন করিতেছে। পূর্বের সে হেনস্থার দিন আর নাই।

একদিন প্রকাশকের দোকানে ঢুকিতেই প্রকাশক হাসিয়া বলিলেন, আসুন অপূর্ণবাবু বহুদিন বাঁচবেন। এইমাত্র আপনার কথাই হইছিল। ইনি হচ্ছেন ‘শব্দী’ কাগজের সম্পাদক। আপনার একটা উপন্যাস চান, তাই ঠিকানা চাইছিলেন। তা আপনার নাম কবিতাে কবিতাে আপনি এসে হাজির।

পরে পার্শ্বস্থ স্থূলকায় ব্যক্তিটির দিকে ফিবিয়া বলিলেন—নিম্ন, আর ঠিকানা দিতে হল না, একেবাবে লেখক মশাইকে খবে দিলাম।

কথাবার্তা ঠিক হইয়া গেল। আগামী সংখ্যা হইতে অপু লিখিবে। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। সম্পাদক ভদ্রলোক অপূর্ণ লেখার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন।

অগ্রিম টাকা পকেটে লইয়া অপু পুর্বাতন দিনের মত খেলাে কিছুক্ষণ বাস্তায় বাস্তায় বেড়াইল। এখন সে হোটলে ঢুকিয়া যাহা ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা খাইতে পাবে, ইচ্ছা কবিলে নোটগুলি একটা একটা বিনিয়া হাওয়ার উড়াইয়া দিতে পাবে। আজ হইতে অনেকদিন আগে, অবশ্য খুব বেশী দিন আর কি, তাহাকে অভুক্ত অবস্থায় বাস্তায় বেড়াইতে হইয়াছে শুকনো মুখে। কেহ ভালবাসিয়া বলে নাই, আহা, তোমার বুঝি খাওয়া হয় নি? এসো, যা হয় দুটো ভাল-ভাত—না, সেরূপ কেহ বলে নাই। বরং তেওয়ারী-বধু বেশ ভাল ছিল, তাহার স্নেহে খাদ ছিল না। জীবনের পথে তেওয়ারী-

বধূর মত কয়েক জনের নিকট হইতে স্নেহস্পর্শ পাইয়াই তো কষ্টের মধ্যেও মানুষ সম্বন্ধে সে হতাশ হইয়া পড়ে নাই। আজ টাকা কয়টা পকেটে করিয়া সে পবিচিত স্থানগুলিতে একবার কবিতা গেল। মনে মনে ভাবিল, মানুষ যেখানে কষ্ট পায়, ভগবান সেইখানেই আবার তাকে সুখ দেন। আমার সেই পুৱানো যেসের সামনেই পকেটে আজ একগাদা টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কথাটা ভাবিয়া তাহার কেমন অদ্ভুত লাগিল। মনে হইল, রাস্তার ওপারের ঐ দোকানে বসিয়া-থাকা ধূমপানরত, মানুষটিকে ডাকিয়া বলে—সুন্ন, আমি ঐ গলিতে থাকতাম অনেকদিন আগে। খেতে পেতাম না, কলেজের মাইনে দিতে পাবতাম না। মা বাড়ীতে কষ্ট পেতেন, টাকা পাঠাতে পারতাম না। আব এখন আমার পকেটে এই দেখুন, অনেক টাকা—অনেক। এ দিয়ে আমি কি করি বলুন তো ?

কিছুদিনের মধ্যেই অপু আবার একটি পত্রিকায় পাবাবাহিক উপন্যাস লিখিতে শুরু করিল। বাজারে তাহার বেশ নাম। বিশেষ কবিতা তবণদেব কাছে তাহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত আদর পাইতেছে। মালতীনগরবে সেই তরুণ বাহিনী বোঝ তাহার দুর্গ আক্রমণ করে, সে মাঝে মাঝে বিবর্ত হইলেও মুখে কিছু বলিতে পারে না। ছেলেগুলোকে সে পছন্দ করে, কিন্তু বড় বেশী বক বক করে তাহারা। অপুও মাঝে মাঝে খায়।

অপু প্রতি মাসে একগাদা পত্রিকা ও বই কিনিয়া থাকে। ছেলের জন্য ভালো শিশুসাহিত্য আনে। এমন বই আনে, যাঁহা কাজলের মনের গভীরে ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগাইয়া তোলে। কুপমণ্ডুক হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার কোন অর্থ হয় নাই, ছেলেকে সে মধ্যবিত্ত মনের অধিকারী কবিতা গডিবে না। অপু নিজে ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন পড়িতে ভালবাসে। সে পড়ে ও ভাল গল্প পড়লে তৎক্ষণাৎ ছেলেকে ডাকিয়া শোনায়। এই ভাবে অপু ছেলের মনে একটা পিপাসা জাগায়। কাজলের বিশেষ বন্ধু কেহ নাই, স্কুলে নাই, পাড়াতেও নাই। সে সমবয়সীদের মত দৌড়ঝাঁপ করিতে পারে না—যে—সব খেলার শারীরিক কসরতের প্রয়োজন, সেগুলি কাজল সভয়ে এড়াইয়া চলে। চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, সে পারে না। এইতো সেদিন বেণু আর শ্রীশ আম পড়িবার জন্য মুখ্যোদের বাগানে পাঁচিল ডিঙাইয়া ঢুকিতেছিল। আম খাইতে কাজলের আপত্তি নাই, কিন্তু মধ্যে প্রাচীররূপী বড় একটা বাঘ বহিয়াছে। অত উঁচু পাঁচিল তাহার পার হইবার সাধ্য নাই। বেণু আর শ্রীশ দস্তত কোঁশলে তর তর করিয়া পাঁচিলের মাধ্যম উঠিয়া গেল। শ্রীশ মিটিমিটি হাসিয়া বলিল—কি রে, পারবি নে ?

তাহাদের উঠিবার কান্দা দেখিয়া কাজলের মনে হইতেছিল, ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি তাহারা এই কার্যের অনুশীলন করিয়াছে। মনে মনে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়া কাজল ভিন্নমান হইয়া বলিল—না ভাই আমার ডান পায়ে বাধা।

একটা কেলে দে না ভাই, খাই।

শ্রীশ এবং বেণুরা দয়া করিয়া একটা দুইটা আম তাহাকে খাইতে দেয়। উপায় কি। নিজে উঠিয়া পাড়িবার সাধ্য তাহার নাই।

বাহিরের দুনিয়ায় লাফালাফি করিয়া বেড়াইবার সামর্থ্য নাই বলিয়া সে ঘরের বাইরে অধিকাংশ সময় কাটায়। মাঝে মাঝে কাজল বাবার ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। গল্পগুলির আকর্ষণ তীব্র। ছবি দেখিয়া তাহার গায়ের লোম কাঁটা দিয়া ওঠে—যে ছবিটায় খুব রহস্যজনক ঘটনার আভাস পাওয়া যায়, বাবাকে বলিয়া গল্পটা কাজল শুনিয়া লয়।

অপু বুঝিতে পাবে, কাজলে মানসিক রক্তি শুরু হইয়াছে। ঠিক এই একই জিনিস সেও কবিতা দেওয়ানপুর্বে ফুলে। কঠিন ইংরেজী বুঝিতে না পারিলে ছবি দেখিয়া কিছুটা আভাস পাইবার চেষ্টা করিত, অনেক সময় রম্যপতিদাকে ধবিয়া গল্পটা বুঝিয়া লইত। সেই একই জিনিস আবার ঘটতেছে। বক্তের ভিতর অদৃশ্য বাতাস বহিয়াছে—তাহাই এ সব সম্ভব করিতেছে।

দাণ্ডাবাহিক ট-ল্যাস ইংলিশ কবিবাব কিছুদিন পরে অপু বিকালে বসিয়া ছেলের সঙ্গে জলখাবার খাইতেছিল। গোপালের মা পরোটা ভাজিয়া দিয়া বাস্তা ও গৈব দোকানে দোস্তা আনিতে গিয়াছে। এমন সময় বসিবার ঘরের দরজার মুখে আনিয়া দাঁড়াইল একটি মেয়ে। কিশোর বলাই অদিক সজ্ঞত মেয়েটির বয়স কোন মতেই পনেরো-ষোল বৎসর নহে। অপু অবশিষ্ট পনেরোখানেক খালাখানা তাড়াতাড়ি খাটের নীচে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

আশ্চর্যের উপর অশ্চর্য। মেয়েটি একা আসে নাই, তাহার পিছনে আবও একটি মেয়ে আসিয়াছে। এ মেয়েটি হয়তো প্রথমটির চেয়ে বৎসর দুই-তিনের বড় হইবে।

অপু উঠিয়া চোঁচা দিয়া খাটটা পরিষ্কার করিয়া মেয়ে দুটিকে বসিতে দিল। কাজল অর্ধক হইয়া বাপাবাটা দেখিতেছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মেয়েটি লজ্জিত সুবে বালক—আপনিই তো অপূর্বকুমার বাবু, লেখক ?

অপু মনে ভাবী আনন্দ হইল। সে লেখক বলিয়া মেয়ে দুটি দেখা করিতে আসিয়াছে। এ অভিজ্ঞতার স্বাদ তাহার নিকট একেবারে নূতন। প্রশংসা সে আগেও পাইয়াছে, কিন্তু মেয়েদের নিকট হইতে তাহা পাওয়ার একটা আলাদা আনন্দ বহিয়াছে।

মেয়ে দুটি মালতীনগবেই থাকে। ছোট মেয়েটির নাম হৈমন্তী, বড়টি তাহার দিদি, নাম—সরযু। হৈমন্তীর সাহিত্যে গভীর অনুরাগ আছে, সে অপূর লেখা পাড়িয়া অর্ধক হইয়াছে তাহার ক্ষমতায়। অপু কি তাহাকে একটা অটোগ্রাফ দিবে ?

অপু সত্যি অর্ধক হইল। মফঃস্বলে মেয়েবা একা বেড়াইতেছে, ইহা বেশ নূতন দৃশ্য। তাহা ব্যতীত কলিকাতায় অটোগ্রাফ চাহিলে ততটা অর্ধক

হইবার কারণ থাকে না, কিন্তু মালতীনগরে অটোগ্রাফ! নাঃ, মেয়ে দুটি দেখা যাইতেছে বেশ আলোকপ্রাপ্ত।

অটোগ্রাফ দেওয়ার পর অপু তাহাদের চা খাইতে অনুরোধ করিল। তাহারা লেখকের সহিত কথা বলিতেই আসিয়াছিল, অতএব বিশেষ আপত্তি করিল না।

কথায় কথায় প্রকাশ পাইল হৈমন্তী গল্প লিখিয়া থাকে! অপু বলিল—সেটা আগে বলেন নি কেন? বাঃ, খুব ভাল কথা। একদিন নিয়ে আসুন, পড়া যাক।

দিদি কথাটা প্রকাশ করিয়াছিল। হৈমন্তী সরযু দিকে কটমট করিয়া তাকাইল, অপু বম্বা লাগিতেছিল। হৈমন্তীর ছেলেমানুষি তাহার মনের আনন্দকে হঠাৎ ডাকিয়া তুলিল। নারীর স্পর্শ না থাকিলে জীবনটা পানসে লাগে, নারীর কল্যাণই জীবনের রূপ পালটাইয়া দেয়।

হৈমন্তী একখানা চাঁপাফুল-রঙের শাড়ী পড়িয়া আসিয়াছিল, শাড়ীর আঁচল হাতে ভড়াইতে ভড়াইতে লজ্জিত মুখে বলিল—দিদির যেমন কাণ্ড! লেখা-টেখা কিছু নয়, ও এমনি—

সরযু বাধা দিয়া বলিল—না অপূর্ববাবু। বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। এই সেদিনও ওর লেখা বেরিয়েছে কাগজে।

সরযু যে পত্রিকার নাম করিল, সেটা শুনিয়া অপু সত্যিই বিস্মিত হইল। বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে যদি এই দুষ্কদোষী বালিকার রচনা ছাপা হইয়া থাকে তবে অবশ্যই একবার পড়িয়া দেখিতে হইতেছে।

অপু বলিল—কোন আপত্তি শুনিছি নে, কবে লেখা আনবেন বলুন। কীকি দিলে চলবে না।

সরযু বলিল—বাবাও শুনেছেন আপনি এখানে থাকেন। উনি বলেছিলেন একদিন আপনাকে ছপুর্বে খাবার কথা বলতে। না, আপনারও কোন আপত্তি শোনা হবে না। কবে যাবেন বলুন—যেদিন যাবেন, সেইদিন হৈমন্তী আপনাকে লেখা শোনাবে।

অপু বিশেষ আপত্তি করিল না। রবিবারে নিমন্ত্রণ রহিল। কাজলও সঙ্গে যাইবে। হৈমন্তী এবং সরযু দুইজনে কাজলকে অনেক আদর করিয়া বিদায় লইল। ঠিকানাটা অপু রাখিয়া দিল।

মেয়ে দুটি বিদায় লইয়ে অপু বিছানার কাছে আগিয়া বসিতে যাইবে, চাদরের উপর নকর পড়িল কয়েকটা বেলফুল। তখনও বেশ তাজা, বেশীক্ষণ তোলা হয় নাই। অপু মনে মনে ভাবিল—এখানটায় হৈমন্তী বসেছিল। ও-ই নিম্নে এসেছিল ফুলগুলো। ভুলে ফেলে গেছে, আচ্ছা, মেয়ে যা হোক—

অপু ফুলগুলি তুলিয়া একবার গভীর স্বাণ লইল।

রবিবারে ছেলেকে লইয়া অপু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। নিজে একটু বিলাসিতা করিতে ছাড়ে নাই, একটা শান্তিপুত্রী ধুতি পরিয়াছে। কিন্তু সেই

তুলনায় জামাটা ভাল হইল না—ময়লা মতো। অথচ এই ধুতিটা পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার তাহার বড় শখ। ফলে বিসদৃশ জামাকাপড় পরিহিত অপু নিমন্ত্রণ খাইতে গেল।

বাড়ীতে পা দিতেই হৈমন্তী বাবা আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। ভদ্রলোক সরকারী কাজ করেন—বদলীর চাকরী। তিনি অপূর উপন্যাসটি পড়িয়াছেন। সম্প্রতি যে পত্রিকা দুইটিতে অপু উপন্যাস লিখিতেছে, সেগুলিও তাঁহার বাড়ীতে রাখা হয়।

অপু অর্থাৎ হইয়া দেখিল, বাড়ায় সাহিত্যের আবহাওয়া। বাবা, ভাই বোন সবাই বেশ শিক্ষিত ও উদার। বসিবাব ঘবে প্রচুর বই রহিয়াছে—অগোছালা ভাবে খাটের উপর ও টেবিলের উপর ছড়ানো। অপু নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছে, যে বাড়ীতে বই সাজানো থাকে, সে বাড়ী পাঠক কম। পড়ম্বাদেব বই কখনো গোছানো থাকিতে পারে না। যাহাবা শখের আসবাবের মতো বই দিয়া ঘর সাজাইয়া সুকৃতির পরিচয় দিতে চায়—তাঁহাদের বই সাজানো থাকিতে পারে। হৈমন্তীদের পবিবার সম্বন্ধে অপূর বেশ একটা শব্দা জন্মিল। তাহার মনে বহুমূল ধারণা আছে—যাহাবা বই পড়িতে ভালবাসে তাহাবা কখনো খাবাপ মানুষ হইতে পারে না। অনেকদিন পরে এই বাড়ীতে আসিয়া অপূর মনে হইল, বেশ সহজ পছন্দসই আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়াছে। কাজল আসিবানাত্রই বই-এর কাছে গিয়া বসিয়াছে, বই পাইলে সে আর কিছু চায় না। অপু কিছুক্ষণ বাদে বলিল—তা এবার লেখাগুলো পড়লে হতো না?

হৈমন্তী কিছুটা সঙ্কোচেব সহিত খান দুই পত্রিকা আনিয়া অপূর হাতে দিল। অপু বাগ্রতার সহিত একটি হইতে সূচীপত্র দেখিয়া গল্প খুঁজিয়া পড়িতে শুরু করিল। ভাবিয়াছিল, মেয়েলী প্রেমের যিকি যিকি গল্প হইবে। একটি মেয়েকে একজন ছেলে দূর হইতে ভাল বাসিল, দুই-একটা চিঠি দিল। বাগানে একবার দেখাও হইল—পরে অভিভাবকগণ জানিতে পারিয়া মেয়েটিকে ঘবে বন্দী করিল। ইহাব পব নায়ক দাঁড়ি কামানো বন্ধ করিল, রোগা হইতে লাগিল এবং স্কুলমাস্টারিতে ঢুকিয়া বড় বড় কবিতা লিখিয়া পরে টি-বি হইয়া সাপ্নোচিত ধামে প্রস্থান করিল। ইহা ব্যতীত মেয়েরা আর লিখিবেই বা কি?

একটু তাচ্ছিল্যেব সহিত পড়িতে শুরু করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় খাকাটা জোরে লাগিল। সাধারণ ন্যাকা-ন্যাকা ভাষায় লেখা নহে—প্রেমের গল্পও নহে। একটি মেয়ে গল্প লিখিতে ভালবাসিত। বিবাহ হইয়া পতিগৃহে অজস্র সাংসারিক কাজের ভিড়ে তাহার লেখিকা-সত্তা গেল চাপা পড়িয়া। একদিন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় মেয়েটি অবসর পাইয়া টিনের তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার লেখার খাতা বাহির করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিজা বাতাসের সহিত তাহার কুমারী-জীবনের স্মৃতিখন হ হ করিয়া ঢুকিয়া পড়িল ঘরের ভিতর। এই গল্প।

ভাষার উপর লেখিকার দখলের কথা সহজেই বোঝা যায়। অপু অবাক হইল।
গল্প পড়িয়া মায়ুলী খবনে কি প্রশংসা করিবে তাহা ঠিক ছিল, এখন গল্পটা সত

সতাই ভাল হইয়া পড়ায় সে কিছু বলিতে পারিল না।
খাইতে বসিয়া অপু বলিল—সত্যিই খুব ভালো লেখা আপনার। এতটা

ভালো, মিথো বলবো না, আমি আশা করিতে পারি নি।

হৈমন্তী বলিল—আমাকে আর আপনি বলছেন কেন, তুমি বলুন।

—তোমার গল্প সত্যিই ভাল লাগল হৈমন্তী। এত সাধারণ গল্পটো নিয়ে এত
চমৎকার করে তা ফুটিয়ে তোলা—না, তোমার মনো শিল্পীমন চুকিয়ে আছে।
হৈমন্তীর বাবা হাসিয়া বলিলেন—এত প্রশংসা করবেন না অপুবাবু, মাথা
বিগড়ে যাবে ও। তবে হ্যাঁ, এ মেয়েটি আমার সত্যিই—পড়াগুলোতেও বড়
ভালো ছিল। বাবার ক্রাসে ফাস্ট হঠাৎ। বড় অসুখ পড়িল বলে বছর-
খানেক পড়া বন্ধ আছে।

খাওয়া হইলে হৈমন্তী অপু জন্ম মশলা আনিла। লম্বা লইতে লইতে
অপু জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, সের্দ্দন তুমি আমার খাটের ওপরে বেলফুল
ফেলে এসেছিলে, না? তুমি খাবার সব দেখি পড়ে আছে। আমার অবস্থা
ভালই হয়েছিল। সাবা সন্ধ্যা গল্প শুঁকে শুঁকে বেশ কবিত্ব করা গেল।

মাথা নিচু করিয়া হৈমন্তী বলিল—বেলে আসি নি, আপনার এন্যেই নিয়ে
গিয়েছিলাম, সেখান থেকে এসেছি। আপনার লেখা পড়ে মনে হয়েছিল ফুল ফেলে
আপনি খুশি হবেন।

—আমার জন্য নিয়ে গিয়েছ তো আমাকেই দিলে না কেন?

উত্তরে হৈমন্তী কিছু বলিল না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া, পরে মাথা তুলিয়া অপু
দিকে তাকাইয়া একদু সলজ্জ হাসি হাদিল।

—কই, বললে না তো দাঁওনি কেন?

—দিয়েই তো এসেছিলাম। আপনি বুঝতে পারেন নি সে কি আমার
দোষ?

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে কাঁড়ল বলিল—বেশ লোক এবা, না বাবা। উত্তর
না পাইয়া অভিযোগেব সুরে বলিল—হঁ বাবা তুমি সেই থেকে স্তন্য না
কিছু।

অপু চমক ভাঙিয়া বলিল—এঁা? ও হ্যাঁ, তা ভাল লোক। বেশ ভাল
লোক—নাও, এখন তাড়া তাড়ি পা চালাও, বাড়ী গিয়ে তোমার ইংবাজি
বানানগুলো—

হৈমন্তী প্রায়ই অপু র বাসায় আসে। অপু সম্প্রতি খ্যাতি পাঠিতেছে—কিন্তু
এই মেয়েটি তাহাকে সত্য করিয়া চিন্মিছে। পুস্তক-সালোচকদের দায়-
সারা ভাসা-ভাসা আলোচনা নহে, হৈমন্তী তাব অন্তরে প্রবেশ করিয়া তার
চোখ দিয়া বিচার করিয়াছে। অপু র লেখক এবং ব্যক্তি-সত্তাকে এমন করিয়া
আর কেহ আদর করে নাই—এক লালা ছাড়া। হৈমন্তী তাহাকে বুঝিতে

পারিস্কাছে, চিনিতে পারিস্কাছে।

অপূর মনে ধীরে ধীরে কেমন একটা বৃদ্ধা জাগিয়া উঠিল। ভালবাসা পাইবার ক্ষুধা। তার মনে হইল, সারা জীবন এইভাবে ভাসিয়া বেডানো সম্ভব নহে, জীবনের মূল মাটির মধ্যে ঢালাইয়া নিজেকে মৃৎকার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিন আসিয়াছে। যতবার সে স্থান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছে, দুর্ভাগোর বডে তাকে ভাসাইয়া লইয়াছে দূরে। এখন গৃহের শান্তি পাইতে ইচ্ছা করে। তবে সে স্থান্য হইয়া পড়িতে চায় না, গৃহকে সে পায়ের বেড়া না ভাবিয়া জীবনানন্দের একটি দিক হিসাবে পাইতে চায়।

একদিন বিকালে হৈমন্তী আসিল। সঙ্গে তহার ভাই। অপূ হাঙ্গিয়া বলিল—থাবে, এস, এস। ভালই হলো। বিকেলটা মোটে কাটছিল না; এখন বেশ গল্প কথা যাবে তোমার সঙ্গে।

—তা তো কবে। কিন্তু আজ আমার একটা গল্প শুনতে হবে আপনাকে। দেখছেন তো, একদিন প্রশ্ন দিয়ে কি কাণ্ড কবেছেন।

—বাবে, সে কি কথা। নিশ্চয় শুনব গল্প। তোমার গল্প আমার সতিাই ভাল লাগে হৈমন্তী, সেদিন তোমায় মিশো বলিনি। মামুলি প্রশংসাও কাব নি। সতিাই তোমার মধ্যে অদ্ভুত গুণ আছে। কোথেকে পেলে বলো তো?

—বাড়িয়ে বলা আপনার অভ্যাস। আমার লেখা এমন-কিছু নয়—

জোর তর্ক শুক হইয়া গেল। অপূ প্রমাণ করিবেই, হৈমন্তী ভাল লিখিয়া থাকে। আশ্চর্য্যটা বাগযুদ্ধের পর হৈমন্তী হার মানিল। অপূ বলিল—চলো, উঠানে মাথুব পেতে বসি, ভেতবে বড্ড গরম।

চাবডনে উঠানে বসিল। কাজলের সহিত হৈমন্তীর আশ্চর্য্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম কাজল তাকে তত পছন্দ করিতে পারে নাই। কিন্তু পরে কি ভাবে যেন কাজলের মতের পরিবর্তন ঘটয়াছে, এখন সে সর্বদা হৈমন্তীর কাছে কাছে ঘোবে। হৈমন্তী প্রথম দিন কাজলকে দেখিয়াই ভালোবাসিয়াছিল। কাজলের উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখের গডন, সবটাই যেন অপূর ধাঁচে গড়া। দেখিলে আদর না করিয়া থাকা যায় না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। কাজল হৈমন্তীর কোলে কাছে ঘেসিয়া বসিয়াছে। প্রতাপ (হৈমন্তীর ভাই) হাঁটু উপরে থুতনি বাখিয়া কি যেন ভাবিতেছে। উঠানের সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ে ঝিকঝিক শব্দ। সমস্ত দিনের তাপের পর এখন চাবিদিকে কেমন শান্ত স্তব্ধতা।

হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য অপূর কেন যেন ফিজির সমুদ্রবেলার কথা মনে পড়িল। এই সময় স্থূল হইতে বাড়ি ফিরিয়া পাঁচুটি ও সামুদ্রিক মাছের বোল দিয়া জলযোগ করিয়া সে বেলাভূমিতে আসিয়া বসিত। সমুদ্রের ওপরেই একটি ছোট শহরে সে মাস্টারি করিত। কোনদিনই তার তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা হইত না। সে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সামনে অবিশ্রান্ত গর্জন

করিতেছে সমুদ্র। মাঝে মাঝে চেউগুলি তাহার কাছ বরাবর আসিয়া পড়িতেছে, চলিয়া যাইবার সময় ফেলিয়া যাইতেছে একটি টানা লম্বা সাদা রেখা আব কয়েকটি ঝিনুক। অপূর্ব অদ্ভুত অনুভূতি হইত—একটা অপার বহুস্রের অনুভূতি। সমুদ্রের প্রকাণ্ডত্বের সহিত নিজেকে একান্ত করিবার মহৎ অনুভূতি। অথচ এই এখন সে মালতীনগরে বসিয়াও তো বেশ আনন্দ পাইতেছে। অত বিশাল দৃশ্যের সন্মুখীন যে হইয়াছে—তাহাব এই ক্ষুদ্রস্থানে আবদ্ধ থাকিয়াও কি আনন্দ পাওয়া সম্ভব?

অপু মনে মনে নিজের আনন্দের কাবুটা অনুভব করিল। উন্মত্তের মতো উল্কাবেগে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া মরিলেই সার্থকতা লাভ হয় না। জীবনের আনন্দ বহিয়াছে অনুভূতির গাঢ়ত্বের ভিতর, জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার ভিতর। ফিজি সমুদ্রতীরে বসিয়া সে যেমন হইতে পারে—মালতীনগরেও হইতে পারে।

সুকতা ভাঙিয়া অপু বলিল - তুমি গান গাইতে পাবো হৈমন্তী?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হৈমন্তী বলিল—পারি।

—একখানা গাও না, শুনি।

সামান্য পবেই হৈমন্তী গাহিল—‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া, ভুলালো বে ভুলালো মোর প্রাণ।’

অপু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া শুনিতেছিল। হৈমন্তীর গলা ভাল। বিশেষ করিয়া গানের কথা এবং উদাস সুবাসপূর্ণ হৃদয় স্পর্শ করিল। পবিত্রের সঙ্গে গানটা যেন কেমন করিয়া মিলায় গেল।

‘ঘবেও নহে পাবেও নহে

যে জন আছে মাঝখানে,

সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়—’

গান শেষ হইয়া গেল। অন্ধকার নামিয়াছে। বেশ বাতাস। অপু ও ‘রে তাকাইল—সব নক্ষত্র এখনও দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু রহস্পতি গ্রহ ঝকঝক করিতেছে। অপু বলিল—রহস্পতি চেন? ঐ দেখ। ঐ যেটা ও-বাড়ীর কার্নিসের ডানদিকে জলজল করছে—দেখছো?

—হ্যাঁ।

—ভাষা দেখি, ওটা পৃথিবীর চেয়ে কত বড়। অন্ধকারের বৃকে দীর্ঘপথে সূর্যকে পরিক্রমা করছে সৃষ্টির উষা থেকে। ও বকম কত গ্রহ কত নীহারিকা ধুমকেতু মহাশূন্যের অকল্পনীয় ব্যাপ্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবনটা বড়ো অদ্ভুত, বড় সুন্দর, না? তুমি অনুভব করো?

—করি। সেজগ্রেই তো আপনার লেখা আমায় ভাল লাগে।

একটা দমকা বাতাস আসিল। সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ে লাগিল দোলা। অনেক শুকনো পাতা খড়খড় শব্দ করিয়া উঠানের উপর দিয়া সরিয়া গেল। কাজল বলিল—সেই যে বাবা তুমি বলেছিলে, এদের দ্বিবে সেই জিনিস—

অপু হাসিয়া বলিল—ওই ঠাণ্ডা, একদম ভুলে বসে আছি। কলকাতা থেকে অরেঞ্জক্রীম-দেওয়া বিস্কুট এনেছি। তাই কাজলকে বলেছিলাম তোমরা এলে দেবার কথা। ভাগ্যিস তুই মনে করিয়ে দিলি থোকা—
অপু উঠিয়া ঘরে বিস্কুট আনিতে গেল।

হৈমন্তীদের বাড়ীতে অপু প্রায়ই যা গম্মাত করে আজকাল। হৈমন্তীর বাবা-মা তাহাকে পাইলে সতাই খুশী হন। সে গিন্না গল্পগুজব করিয়া জলখাবার খাইয়া বাড়ী ফেরে। কাজলও সঙ্গে যায়। মাঝে মাঝে গানের আসর বসে, হৈমন্তী আগে হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অপু পছন্দ করে, ফলে এ বাড়ীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিতে বেশী দেরী হয় নাই।

অপু অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছে, একা সারাজীবন কাটানো তাহার পক্ষে সম্ভব-পর নহে। অপর্ণার কথা ভাবিয়াই সে অন্তর হইতে স্নান পাইতেছিল না। কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া দেখিল, অপর্ণার স্মৃতি তাহার মনের যে গোপন কন্দরে স্থায়ী রঙে আঁকা হইয়া গিয়াছে—সেখানে আর কাহারও স্থান নাই। কিন্তু হৈমন্তীকে সে অস্বীকার করিতে পারিবে ন। সে যদি বলে—আমি হৈমন্তীকে ভাসবাস না, তবে তাহা মিথ্যা কথা হইবে।

অপর্ণার স্মৃতিকে শ্রবণ আলোর বাঁচাইয়া রাখিয়াই সে বর্তমান সত্যকে মর্বাদা দিবে। একমাত্র ভয় ছিল কাজলকে লইয়া। কিন্তু কাজল ও হৈমন্তী পরস্পরকে নিকট-বন্ধনে বাঁধিয়াছে। সেদিক দিয়া চিন্তার আর কারণ নাই।

একদিন অপু কথাটা হৈমন্তীর বাবার কাছে পাড়িল। ভদ্রলোক আপত্তি কবিলেন না। অপু সজ্জন, সুপুরুষ, বাজারে নামডাক হইয়াছে। সম্প্রতি বই লিখিয়া ভাল উপার্জন কবিতেছে। এমন পাত্রের সহিত বিবাহ না দিবার কোনো কারণ নাই। তিনি নিজেও বুদ্ধিমান এবং সাহিত্যরসিক। অপূর ব্যক্তিত্ব এবং রচনা-ক্ষমতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি মত দিলেন। দিনস্থির করিবার জন্য ভিতর-বাড়ী হইতে পঞ্জিকা আনানো হইল।

কাজল

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর মাস তিনেক কাটিয়াছে। রুষ্টি তেমন হইতেছে না। আকাশের রঙ কটা, তামার মত। গরমে দেশসুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। মাটিতে বড় বড় ফাটল, রুষ্টির জন্য আকাশের দিকে মুখবাদান করিয়া রহিয়াছে। গরমে কাকদের স্বরভঙ্গ হইয়াছে, ডাকিলে তীব্র কা-কা শব্দের বদলে একটা ফাস-ফাস শব্দ বাহির হইতেছে মাত্র। লোকে প্রতি দণ্ডে একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া মেঘ আদিল কিনা দেখিতেছে।

অপু স্ত্রীপুত্রকে মালতীনগরে রাখিয়া নিশ্চিন্দপুরে গেল। হৈমন্তীকে সে দেশে রাখিবে। মালতীনগর ভাল জায়গা হইতে পারে, কিন্তু মালতীনগরের

সহিত, তাহার আত্মিক যোগাযোগ নাই। যদি গৃহী হইতে হয়, নিশ্চিন্দিপুরে
সে গৃহী হইবে।

রাধারমণ চাটুজোর কাছে খোঁজ করিতে বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল।
তাহাদের পুরানো ভিটার কাছেই ছোট পাকাবাড়ী, মন্দ নহে। দামও অপূর
কাছে সস্তা বলিয়া বোধ হইল। নিজেদের ভিটার নতুন করিয়া বাড়ী তুলিতে
গেলে যা খরচ পড়ে, তাহা এখন অপূর পক্ষে যোগাড় করা মুশ্কিল। বাড়ী
একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—তাহার উপর বাড়ী তোলা অনেক ঝামেলার
কাজ। মলে অপু এ বাড়ী কেনাই মনস্থ করিল।

রাধারমণ হাসিয়া বলিলেন—আমাদের বাড়ীর কাছে হলো। আমরা দু'ভাই
ও-বাড়ীর একেবারেই পাশেই থাকি কিনা। বেশ গল্প-টল্প করা যাবে।
আপনার মতো পড়শী পাওয়া, বুঝলেন কিনা, রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার।
অপু প্রথমে রাধারমণের গায়ে-পড়া ভাবটা পছন্দ কবে নাই, কিন্তু পরে
লোকটাকে ভাল লাগিয়া গেল। একটু বেশী কথা বলিলেও চাটুজো
লোক মন্দ নয়।

মালতীনগরে ফিরিবার আগে অপু একবার জঙ্গলাবৃত্ত পুরানো ভিটার সামনে
গিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলিল—বৌ নিয়ে আবার আসছি তোমাদের
কাছে ফিরে! দেখলে তো, কোথাও থাকতে পারলুম না। তোমরা আশীর্বাদ
করো, কাজল খেন মানুষ হয়। খেন ওর জীবনে পূর্ণতা আসে।

হৈমন্তীকে লইয়া নিশ্চিন্দিপুরে আসিলে বেশ বড় রকমের হৈ-চৈ হইল। রাণী
আগে হইতেই অপূর কেনা বাড়িতে আসিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিল। আরও
অনেকে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছিল উঠানে। অপূর আসিতেই রাণী সবার
আগে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল, হৈমন্তীর দিঠে হাত দিয়া তাহাকে ঘরের
ভিতর লইয়া গেল।

গোলমাল মিটিলে অপু বলিল—বৌ কেমন লাগল রাণুদি?

—দুন্দর হয়েছে। চমৎকার বৌ হয়েছে। তুই যে বিয়েথাওয়া করে আবার
এসে গ্রামে উঠেছিস, এতে যে কি খুশী হয়েছে, তা আর—এবার মন দিয়ে
সংসারধর্ম কর। বড় বাড়ীগুলো হয়ে গিয়েছিল তুই।

সর্বদেহা খুশি হইয়াছে কাজল। এই কদিন তাহাকে স্কুলে যাইতে
হইতেছে না, পড়া মুখস্থ করিতে হইতেছে না। বাবা বলিয়াছে, গ্রামের
কাছেই স্কুল ভর্তি করিবে। তাহাতে যে দু-একদিন লাগিবে, তাহা বেশ
মডার কাটিয়া যাইবে।

নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিবার সময় অপু ছেলের কথা ভাবিয়াছিল। শেষে ভাবিল—
কি আর হবে, গ্রামের স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিই। বাদবাকি পড়া আমি নিজে
দেখব'খন। আমি নিজেও তো একসময় গ্রাম্য স্কুলে পড়েছি, আমার কি
পড়ানো কিছুই হয় নি?

প্রতিবেশীরা ফিরিয়া গিয়াছে। কাজল রাণীর সহিত তাহাদের বাড়ী গিয়াছে।

দুপুরে অপু ঘরে ঢুকিয়া বলিল—প্রথম দিন আর বেশী কিছু রান্না করতে হবে না। খা-হোক একটা ছোট্ট চকি-টেটাকি কিছু নামিয়ে দেলো। এমনিতেই আসাব কফট গেছে—রাণুদি ভাল আব তবকানী পাঠিয়ে দেবে বলেছে। বলেছে, নতুন বৌ এল, তাকে খাটালে গায়েব নিন্দে হবে বে।

হৈমন্তী মুখ তুলিয়া নতুন ঘরকন্না কবিবার আনন্দে হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে অপু মনে একটা আনন্দের বেশ ছড়াইয়া পড়িল। সে সংসার কান্ডেছে স্ত্রীপুত্র লইয়া। সবাই খুশী। চাবিদিক বেশ কেমন ভরিয়া উঠিয়াছে।

সে হৈমন্তীকে জিজ্ঞাসা কবিল—তুমি অনেক বড় বড় ভায়গায় ঘুরেচো বাবার সঙ্গে। এই খুজ পাড়ারগায়ে থাকতে পারবে তো?

—পারবো মশাই, পারবো। আমি সে একম মেয়ে নই, তা হলে তোমাকে বিয়ে করতাম না। বরং শহরই আমার ভাল লাগে না।

—বিকলে তোমাকে নিয়ে নদীতে যাবো গা বুতে। এই পেছন দিয়েই পথ, কাশঝাড়ের ভেতর দিয়ে। দেখো, খুব ভাল লাগবে।

—তুমি তাভাতাডি খেয়ে নাও, বেলা পড়ে এল খে, কাজল কই?

—সে রাণুদিব ওখানে থাকে। না, না, শুধু আমাকে নয়, তোমারটাও বাডো—এক সঙ্গে নিয়ে বসে খাও।

—তুমি খেয়ে ওঠো তো আগে, তাবপব আমি বসবো।

বিকাল হইয়া আসিতেও অপু হৈমন্তীকে লইয়া পূর্বানো ভিটার কাছে গেল।

—এই আশাব পৈতৃক ভিটে হৈমন্তী। এখানে আমার জন্ম। ঐ যে আকন্দগাছ দেখছ—ওখানে একটা ঘর ছিল, সেই ঘর। আমার বাবা-মার পুণ্যস্মৃতি মণ্ডিত মাটি এখানকাব।

হৈমন্তী ভিটার দিকে মুখ কবিয়া গলায় আঁচল দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া প্রণাম কবিল। বলিল—তাদের তো দেখলাম না। কপাল কবে আসি নি হুস্তব-শাশুড়ী নিয়ে ঘব কববো। তাঁদের আশীর্বাদ যেন পাই। কাজলকে যেন মানুষ কবে তুলতে পাবি।

ব্যাপাবটা আদৌ নাটকায় হইল না। বরং হৈমন্তীর সাক্ষাৎ প্রণাম কবিবার মধ্যে অপু অনেক কিছু দেখিতে পাইল। সকাল হইতেই নানা মিশ্র অনুভূতিতে তাহাব বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। বৌ লইয়া জঙ্গলাকাণ্ড ভিটার সামনে দাঁড়াইয়া তাহাব মনে হইল যারের স্নেহ, বাবাব আশীর্বাদ যেন তাহা-দেব ছইজনকে ঘিরিয়া পরিয়াছে। এতদিন বাদে অতীতের দিনগুলির সহিত যেন একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইল।

রাণুপিসি নানা কাজে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে বলিয়া কাজল বেড়াইতে বাহির হইল। রাণী বলিয়া দিল—বেশী দেরী করিস নে, দূরে যািস নে।

গ্রামের প্রান্তে যে মাঠ আছে, তাহার আল ধরিয়া পডন্ত বেলায় হাঁটিতে কাজলের খুব ভাল লাগে। মাঠের দূরে দূরে লোক থাকে, অধিকাংশ সময়েই মাঠ ফাঁকা। ওয়াইড ওয়ার্ল্ড মাগাজিন হইতে শোনা গল্পগুলির পটভূমি

হিসাবে এই কাঁকা মাঠ ও বগা ঘোপ তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করে। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রচণ্ড গরমে মরুভূমির ভিতর হীরকসন্ধানী দুইটি দলের মধ্যে যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই মাঠে সে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। দক্ষিণ-আফ্রিকার গবমেব সহিত সংগতি রাখিবার জন্য সে হাতেব উলটা পিঠ দিয়া শত্রু আলের উপবকার উত্তাপ অনুভব কবে। মনে মনে ভাবে, আফ্রিকার মরুভূমির বালিও এমন গবম। বাবাব কাছে গল্প শুনিয়া সে লক্ষ্য করিয়াছে, যাবতীয় বোমাধকর ঘটনা আফ্রিকাতেই ঘটিয়া থাকে। আফ্রিকা তাহাব কাছে বহুস্ত্রের দেশ। বড় হইলে সে আফ্রিকায় যাইবে, বাওবাব গাছ (বাবাব কাছে নাম শুনিয়াছে) দেখিবে।

সূর্য দিগন্তবেশা স্পর্শ করিয়াছে। কাজল তাকাইয়া দেখিল মস্ত লাল সূর্যটা আস্তে আস্তে দিগন্তের নিচে নামিয়া পড়িতেছে। ততক্ষণে একটু ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়িয়াছে। আলের পাশে ছোট ছোট ঘোপের মধ্য দিয়া হালকা শব্দ তুলিয়া হাওয়া বহিতেছে। কেহ কোথাও নাই। শুধু দৃষ্টি যায়, উদাব বিশাল মাঠ পড়িয়া আছে। বিকালে কেমন-একটা চায়া-চায়া ভাব নামিতেছে। বাতাসেব অদ্ভুত শব্দ। এব মধ্যে একলা দাঁড়াইয়া থাকিবার যে একটা ভয়মিশ্রিত আনন্দ আছে, তাহা কাজলকে অভিভূত কবে। ঠিক ভয় নহে, একটা অচেনা অনুভূতি। এই সময় দিন ও রাত্রি সন্ধিক্ষণে বাড়ি হইতে দূবে মাঠের ভিতর পৃথিবীটাকে যেন অচেনা বোপ হয়।

ফিরিবে বলিয়া ঘূরিয়া দাঁড়াইতেই কাজলের সেই লোকের সহিত দেখা হইয়া গেল। মানুষটাব হাতে খঞ্জনী, পবনে হাটহাত খাটো মেটা ধুতি। নাকে বসকলি, বগলে ছাতা—তাপ্তি মাঝা, কাঁপে ঝুলি। আপন মনে আসিতে-ছিল, সামনে কাজলকে দেখিয়া খঞ্জনীটা দ্রুতলয়ে একবার বাজাইয়া দিল। কাজল প্রথমে ভয় পাইয়াছিল। পরে লোকটাব চোখের দিকে তাকাইয়া বুঝিল, এ চোখ যাহাব তাহাকে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

লোকটা হাসিয়া বলিল—বেডান বাবাজি? ভালো, বেডানো ভালো। বেডালে মানুষের চোখ ফোটে—তঁার চুনিয়াটার রূপ দেখতে পায় মানুষ—

—কার চুনিয়া?

লোকটা আর একবার দ্রুত খঞ্জনী বাজাইয়া ওপরে আকাশের দিকে দেখাইয়া বলিল—ওই ওখানে যিনি থাকেন, তাঁর। সবই তো তাঁর বাবাজি।

সম্পূর্ণটা না পারিলেও, কাজল লোকটাব কথার খানিকটা অর্থ ধরিতে পারিল। বেশ কথা বলে মানুষটি। কাজল বলিল—তুমি বুঝি অনেক বেড়িয়েচ?

লোকটা মুহূর্ত হাসিল।

—বেডানো আর হলো কোথায়? অকাজেই বড় বেলা হয়ে গেল। হ্যাঁ, কিছু কিছু ঘুরেছি বাবাজি। বেশীর ভাগটাই না-দেখা রইল।

খঞ্জনী বাজাইয়া লোকটা ভাঙে বেসুরো গলায় দু'কলি গান গাহিল—

ও মন তুই পোড়া সুখে রইলি ভুলে
যখন তোর মনের পদ উঠল ভুলে
প্রভুর পদপরশনে—

কাজল লোকটাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। সুন্দর মানুষ! গান গাহিতে পারে—গল্প করিতে পারে, আর কি চাই? বালিল—তোমার কি তাড়াতাড়ি আছে? এইখানটায় বসে আমার সঙ্গে একটু গল্প করে যাও না। লোকটা ছাতাটা আলের গায়ে হেলান দিয়া রাখিয়া বসিল।

—তুমি যদি থাকতে বলো, তবে আমার কোন তাড়া নেই।

অনেক গল্প হইল লোকটার সহিত। লোকটা সুন্দর গল্প করিতে জানে। সাধারণ ঘটনাও তাহার বলিবার গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়া ওঠে। একটি মেয়ের বাপের বাড়ীর গাঁয়ে সে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল—না জানিয়াই। স্বস্তর-বাড়ীতে ভিক্ষা চাহিয়া দাঁড়াইতে বাপের বাড়ীর চেনা বলিয়া মেয়েটি তাকে অনেক কথা লুকাইয়া বলিয়াছে। ইহাতে লোকটা খুব খুশি।

—জগতে কেউ কারুর নয় বাবাজি। আপন মনে করলেই আপন, পর ভাবলেই পর।

গল্প শেষ হইলে সে খুলির ভিতর হইতে একটি পাকা আম বাহির করিল।

—তুমি এটা নাও খোকন। বাড়ি গিয়ে খেয়ো।

—না, তোমার ভিনিস আমি কেন নেবো?

—আমাব খার কই? এটা তোমারই, আমি তোমাকে দিচ্ছি।

—নিশ্চিন্দপুণ এট তো, কাছেই। একদিন যেও না আমাদের বাড়ি।

—যাব, নিশ্চয় যাব।

বজ্রনগরে খাওয়ায় তুলিয়া গুনগুন করিতে করিতে সে বিদায় লইল। দুই পা ঠাট্টিয়াই কাজল তাকে ডাকিল—তোমার নাম তো বলে গেলে না?

সে ফিবিয়া বালিল—আমার নাম রামদাস বোফ্টুম। স্বল্প আলাপেই রামদাস কাজলের মনে গভীর ছাপ রাখিয়া গেল। কেমন সুন্দর জীবন, একা একা বেড়ায় মাঠে-ঘাটে, ঘরবাড়ির ঠিক নাই। কোন বন্ধন নাই—পিছুটান নাই। আবার পিছুটান নাই বলিয়া দুঃখও নাই। খোলা আকাশের নিচে একা বজ্রনী বাড়াইয়া ফেরে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কাজল বাড়ির পথ ধরিল।

বিকালে নদীতে স্নান করিতে খাইবার কথা ছিল। অপু আর হৈমন্তী গল্প করিতে করিতে অনেক দেৱী করিয়া ফেলিল।

হঠাৎ খেল্লাল হইতে অপু ধড়মড় করিয়া মাছরের উপর উঠিয়া বসিল—ঐ যাঃ এ যে প্রায় অন্ধকার হয়ে এল, চল চল, আর কথা নয়। হুঁশানা গামছা, তোমার শাড়ী, আমার ধুতি, আর শিশিতে একটু তেল নাও—ওবেলা মাথান্ন দিতে ভুলে গেছি একেবারে। ঘাটে মেখে নেব।

তাড়াতাড়ি গোছগাছ করিয়া বাহির হইতে আরও পনেরো মিনিট দেৱী

হইল। হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করিল—কাজল এল না যে ?

—রাণুদিব ওখানে আছে, সন্ধ্যা উত্তবে গেলে রাণুদিই দিলে যাবে'খন।

অঙ্ককাব নামিতেছে। নদাব পথে ঝোপে-ঝোপে বেশ অঙ্ককাব ঘনাইয়াছে। বাগান দিয়া যাইবার সময় একটা কি জন্তু ঝরাপাতার উপর দিয়া খড় খড় শব্দ কাবয়া দূবে সবিস্মা গেল। হৈমন্তী বলিল—ও কি গো ?

—ভয় পেন্নেছ ? কিছু না, শেয়াল-টেয়াল হবে হয়তো—কিনা বেজী ?

—সুন্দর লাগছে কিষ্ট, না ? শহবে এ সময় গোলমাল, গাড়ী'ব ভেঁপু, যাত্নুষের ভিড। তা'ব চেয়ে এই ভাল। মনের শান্তি'ব চেয়ে বড় জিনি'স নেই।

—তুমি যে একেবারে নাটকে কথাবার্তা বলতে শুরু করলে।

—না গো, এ আমার মনের কথা। আমি এই চেয়েছিলাম। শহব আমার ভাল লাগে না। এখনই তোমাব লেখা প্রথম পড়েছি। মনে হয়েছে—

—কি মনে হয়েছে ?

হৈমন্তী অপূব দিকে তাকাইল। —না, সে আমার বলতে লজ্জা কবে।

—আহা বলোই না। আদেকটা এখন বললে—

—প্রথম তোমাব লেখা পড়েই মনে হয়েছিল—এ মানুষটার সঙ্গে আমার পূব মিল থাকে। প্রকৃত যে এত ভালবাসে—

তুইওনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া হাঁটিল। বেশ কেমন সন্ধ্যায় নদীতে স্নান করিতে যাওয়া বন্দ্য। এইসব শান্ত ছাড়িয়া সে কিসেব অন্তেষণে ঘুরিতেছিল সমুদ্রপাবে ?

বাঁশবাগানের মধ্যে হৈমন্তী হঠাৎ থামিয়া গেল চাবিদিকে তাকাইয়া বলিল, —শোনো।

—কি ?

—একটা মজার ব্যাপার হয়েছে।

—তোমাব তো দেখি এপু' থেকে খালি মজার ব্যাপারই ঘটছে। কি ব্যাপার ?

—মালতীনগর থেকে আসবার আগে পত্রিকায় একটা গল্প দিমে এসেছি না ? সেই গল্পে বাঁশবাগানের বর্ণনা আছে। মনে মনে একটা বাঁশঝাড়ের কল্পনা করে লিখেছিলাম। হঠাৎ এখানটার দাঁড়িয়ে চাবিদিক দেখে মনে হচ্ছে অস্বিকল যেন আমার কল্পনার সেই বাগানটা। কেমন আশ্চর্য, না ?

অপুর বেশ ভাল লাগিল ঘটনাটা। হৈমন্তী এ গ্রামের বউ হইয়া আসিবে, ইহা যেন ভগবানই স্থি'ব করিয়া বাবিস্মাছেন। নিজের অতীত জীবনটা এই আনন্দের মুহূর্তে গোটা'নো মানচিত্রের মত চোখের সামনে ঝুলিয়া গেল। বহু কষ্ট গিয়াছে, জীবনযুদ্ধে বহু রণক্ষেত্রের সে সৈনিক। এখন পুরস্কারের দিন —সার্থকতার দিন।

অঙ্ককার ঝোপে-ঝোপে কাঁটপতঙ্গের ঐকতান শুরু হইয়াছে। বাতাসে দিন-

শেষের আমেজ আর একটা বস্তু গন্ধ।

অপু বলিল—নাও, তাড়াতাড়ি গা চালিয়ে চল। সন্ধ্যা উত্তরে গেল—

এক-একদিন বাত্মতে চাঁদ থাকিলে মাতুব পাতিয়া তান বারান্দায় শোয়।
বাবার পাশে মাতুরে শুইয়া কাজল চাঁদ-নক্ষত্র আকাশ-পৃথিবী সম্বন্ধীয় অজস্র
বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন কবিত্তে থাকে। অপুকে তাহার উত্তর দিতে হয়। অপু
মাঝে মাঝে কাজলকে বিশ্বসাহিত্যের গল্প শোনায়—কাঙাল মনোযোগ দিয়া
শোনে। বেশী রাত হইলে অপু ভাবে কাজল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে গল্প
থামাইয়া বলে—কি বে ঘুম পেয়েছে ?

অমনি কাজল বলে, বাবা, আমার ঘুম পাশনি। থামলে কেন ? বলো—

অপুকে গল্প চালাইতে হয় এইভাবে কিছুদিনেব মশেই কাঙাল বিশ্ব-
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি গ্রন্থ শুনিয়া ফেলিল। একদিন অপু কাজলকে
পাকিয়া বলিল—নে, চল। কাল আমার সঙ্গে কোলকাতা চল। যাওয়ার
খাবি বলছিলা, কাল যাওয়ার দেখাব খন। আমারও এমনি কাজ আছে
কয়েকটা—সেই সঙ্গে সেরে ফেলব

পবদিন সকালে অপু ছেলেকে লইয়া কলিকাতা রওনা দিল। কাজল
একটা ঘিয়ে-বঙের হাফপ্যান্ট আর সাদা সাট পবিয়াছে। হৈমন্তী চুল
আঁচড়াইয়া দিয়াছে পবিপাটি কবিয়া। খাইবাব সময় অপুকে বলিয়া
দিয়াছে—ওকে ভাল কবে দেখেছনে নিয়ে যাবে। যা দুটু—

কাজল অনেকদিন বাদে কলিকাতা আসিল। আবাব সেই বড বড বাড়ি,
লোকজন, হে চৈ, বাস্তায় গাড়ীর ভেঁপু, ডামেব ঘন্টা। সব মিলিয়া জিনিসটি,
মন্দ লাগে না। বাবা তাহাকে বলিয়াছে বড হইলে তাহাকে কলিকাতার
কলেজে পাড়াইবে। কলিকাতার বড বড কলেজের গল্প বাবা তাহাব নিকট
কবিয়াছে, দেখানে লাইব্রেরীতে কত বই আছে—তাহা নাকি গিয়া শেষ
কবা যায় না। এ সমস্ত বই সে পড়িবে।

অপুৰ কাজ ছিল বিকলে। দুব সকালে রওনা হওয়ায় তাহার বেষী বেলা
হইবাব আগেই কলিকাতা পৌছিয়াছিল। ট্রামে কবিয়া অপু এসপ্লানডে
আসিয়া নামিয়া বলিল—এইটুকু চল হেটে যাই। কেমন দেখতে দেখতে
খাওয়া যাবে।

যাত্রবে চুকিতেই কাজলের সেই অদ্ভুত ভাবটা হইল—যাহা সে কিছুতেই
কাহাকেও বুঝাইয়া উঠিতে পাবে না। মাথার মধ্যে কেমন একটা কিম-ঝিম
ভাব। যাত্রবেব একটা নিভম্ব গন্ধ আছে, তাহা কাজলকে পুরানো দিনের
কথা মনে কবাইয়া দেয়। নিজেব জীবনেব কথা নহে, বাবার কাছে শোনা
ইতিহাসের কথা—মানব-সৃষ্টির আগেকার পৃথিবীর কথা। সমস্ত আবেদনটা
সে ঠিক ধবিত্তে পাবে না। কিন্তু তাহাব মনে হয়, এই জীবনেব বাহিরে
আর একটা রহস্তব জীবন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

সারাদিন ভারী আনন্দে কাটিল। প্রাচীন স্তূপ হইতে ওহামানবের মাথার

খুলি পৰ্যন্ত সব-কিছুই কাজলের কাছে সমান আকর্ষণীয়। প্রাচীন জীবাশ্মের কঙ্কালগুলি যে ঘবে আছে, সে ঘর ছাড়িয়া কাজল আব নড়িতে চায় না। উল্কাপিণ্ডটার সামনে দাঁড়াইয়া উত্তেজনায় তাহাব চোখ কোটব হইতে বাহিব হইয়া পড়ে আর কি। ফসিলেব ঘরে সে অপুকে ডিঙাসা করে—তুমি যে বলেছিলে পলিমাটিতে তাবামাছেব ফসিল আছে, সে কই বাবা ?

এ সমস্ত অত্যন্ত পকতাব লক্ষণ সন্দেহ নাই—অপু কাজলকে এইভাবেই মানুষ কবিস্নাটিল। এই বলসে অন্যবা যাহুঘবে গিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চতুর্দিক একবার দেখিয়া আসে মাত্র। কক্ষ হইতে কক্ষান্তবে ঘুরিয়া পা বাথা বসিয়া বেতেব ঝুড়িতে—আনা ভলখাবাব খাইয়া মা-বাবার সহিত বাড়ী ফিবিস্না যায় কিন্তু কাজল বুরিতে চায়, কাজল অনুভব কবে।

বিকালে যাহুঘব বন্ধ হইবাব সময় অপু বলিল—৩ল, এবাব ডামাং কাজটা মেবে আসি। বই-এব দোকানেব দিকে যেতে হবে।

পাবলিশাবেব কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল। দোকানে ঢুকিতেই মালিক হাসিয়া বলিল—আসুন অনুবাবু, বসুন। এবাব তো অনেক দিন বাদে এলেন। আপনাব ও-বইটার স্টক প্রায় শেষ। নতুন এডিশন সম্বন্ধে একটু কথাবাতা বলে নিতে হয়। এটি কে ? বাঃ, বেশ বেশ।

অপু এ সব আজ ভাল লাগিতেছিল না। সকালে খুব আনন্দ করিয়া বাহিব হইয়াছিল বটে, কিন্তু হুপুবেব পব হইতেই শবীবট। ভাল বোপ হইতেছিল না। বুকেব কাছটায় কেমন একটা বাথা-বাথা ভাব। এখন আবাব নতুন এডিশন সম্বন্ধে বাক্যালাপেব ঝামেলা আসিয়া গুটিল।

সমস্ত কথা মিটিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগিল। অপু মাথা ঘুরিতেছিল। বুকেব যন্ত্রণাটাও বেশ বাড়িয়াছে। কেন যে হঠাৎ এমন হইল, বোঝা যাইতেছে না। শবীর লইয়া পূবে সে কখনো চিন্তায় পড়ে নাই। দোকান হইতে বাহিব হইয়া সে কাজলেব হাত ঘুরিয়া বাস্তা পার হইবাব জন্য ফুটপাথ হইতে পিচের বাস্তায় নামিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুপিবাটা যেন তাহাব পায়ের নিচু হইতে সবিস্না যাইতে লাগিল হ-৩ কবিস্না। সে যতই পা নামাইতেছে, পা আব বাস্তায় ঠেকিতেছে না। ফুটপাথ হইতে বাস্তা এত নিচু ? পরক্ষণেই বুকের বেদনাটা বাড়িয়া উঠিল। মাটিতে পড়িতে পড়িতে সে হাত বাড়াইয়া কাজলকে পরিতে গেল। কাজল যেন অনেক দূবে সরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর খবা যাইতেছে না। সব দূবে সরিয়া গিয়াছে। সে একটা অন্ধকার অস্তল গহবরের মধ্যে পড়িতেছে।

প্রকাশক ভদ্রলোক দোকান হইতে ছুটিয়া আনিলেন, বাস্তায় লোক জমা হইয়া গেল। কাজলেব হাত-পা কেমন ঝিমঝিম কবিতেছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতবুদ্ধি হইয়া সাহায্যকারীদের মুখের দিকে কয়েকবার তাকাইয়া দেখিল মাত্র। বাবা পড়িয়া গিয়াছে—বাপারটা তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না। তাহার কাছে বাবা সর্বশক্তিমান, বাবার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য।

বাবাকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়া কাজলের সমস্ত হৃদয় আতঙ্কে সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। অপূকে উহারা ধরাধরি করিয়া দোকানের ভিতর তুলিয়া আনিল। কাজলকে কেহ ডাকিল না। সে নিজেই আস্তে আস্তে হাঁটিয়া সবার পিছন পিছন দোকানে ঢুকিয়া দেখিল, তাহার বাবাকে একটা বেঞ্চির উপর শোয়াইয়া জলেব ছিটা দিয়া বাতাস করা হইতেছে। কাঠের একটা টেবিলে হেলান দিয়া সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, বাবার কিছুই হয় নাই—ঘটনাটা একটা হৃৎস্পন্দ স্পন্দ ভাঙিয়া গিয়া এখনই দেখিবে সে বাবার পাশে শুইয়া আছে, গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মিনিট কুড়ি বাদে অপু তাকাইলে। সে চিত্ত হইয়া শুইয়া আছে, ওপরে যেন কাণো কড়িকাঠ, চাপাশে লোকের কণ্ঠস্বর। বুকে কাহারো একটা ওজন চাপাইয়া দিয়াছে যেন। এটা কোন জ্ঞানগা? সে এখানে শুইয়া কেন? একটু বাদেই সমস্ত কিছু মনে পড়িতে সে আচ্ছন্নের মতো হাত বাড়াইয়া বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

কলিকাতার সেদিনকার সেই ঘটনার পর্ব হইতেই অপূব শরীর খুব ভাল থাইতেছে না। কলিকাতার ভালো স্পেশালিস্ট দেখাইয়াছে। ডাক্তার বলিতেছে, গ্রাউপ্রেসার আছে, কিডনাও ভাল কাজ করিতেছে না। খাওয়ার ব্যাপারে নজর রাখিতে হইবে। লবণ কম খাইতে বলিয়াছে। অপু হাসিয়া বলিয়াছিল—এই বয়সে প্রেসার হয়? বলিবাঁই তাহার মনে হইয়াছিল, খুব একটা কম বয়স তাহার নয়, দেখিতে দেখিতে বয়স বেশ বাড়িয়াছে।

ডাক্তার বলিলেন—সামান্যতঃ এট বয়সে প্রেসার হয় না। আমার মনে হয়, কিডনাও অন্য একরকম হচ্ছে। কতকগুলো ওষুধ দিলাম, খেয়ে দেখুন কেমন থাকেন।

ঔষধ খাইয়া অপু বিশেষ উপকার বোধ করিল না। মাঝে মাঝে শরীর খাপ খায়ে সে আমল দেয় না। হৈমন্তীর কড়া পাহারার জন্য নিয়মের হেরফের হইতে পাবে না, খাওয়া শোওয়া ইত্যাদি বাঁশ সময়ে করিতে হয়। অপূব স্নাত্ত্যের জন্য হৈমন্তী বড় উরিয়া—সে কোথাও বাহির হইলে না—ফেরা পর্যন্ত হৈমন্তী ঘর-বাহির করে। দেবী হইলে কাজলকে বলে—দেখ তো খোকা একটু এগিয়ে কাঁঠালতলাব কাছে, তোর বাবা এল নাকি—

অপু বেশীক্ষণ ঘবে থাকিতে পাবে না। তাহার ছেলেবেলা যেন আবার ফিবিয়া আদিয়াছে। বিকালে বেঁদ পড়িতে না পড়িতে ছেলেকে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। মাঠে-ঘাটে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা উতবাইয়া যায়। কোনদিন একাই বেড়াইতে যায়। বিকালগুলি তাহার একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত। কোন কারণেই একটা বিকাল সে কাহাকেও দিয়া দিতে পারে না। অসুস্থ হইবার পর্ব হইতেই অপূব কেমন একটা ভাব হইয়াছে। প্রায়ই সে বিষয় মুখে কি যেন ভাবে। প্রকাশকদের নিকট পাওনা, টাকার আগে সে হিসাব রাখিত না, এখন বড় একটা খাতা বানাইয়াছে। তাহাতে টাকাকড়ির

কথা লিখিয়া রাখে। নিশ্চিন্দপুরে হৈমন্তীর নামে কিছু জমি কিনিয়াছে, নূতন উপন্যাসখানি বটাকা দিয়া হৈমন্তীকে গহনা গড়াইয়া দিয়াছে। হৈমন্তী একদিন চটিয়া বলিল—এ সব শুক কবলে কি। নবাব-বাদশা হয়েছে নাকি? বাজার জমি-ডায়া, গয়না-পত্তব—এসব তোমার কাছে আমি কবে চেয়েছিলাম?

—তুমি চাও নি হৈমন্তী, আমি দিচ্ছি।

হৈমন্তী বটোটা কাপিয়া উঠিল। —কেন দিচ্ছ? আমি এ সব চাই না।

—এ সব তোমার প্রয়োজন নেই, আমি জানি। কিন্তু কাকলেব তো ঘৃণ্য আছে। প্রথম জীবনটা যেন ওকে কষ্ট করতে না হয়। তাবপর চাকরি-বাকরি করলে ও-ই তোমার ভাব নেবে। অন্ততঃ ততদিন—

হৈমন্তী চোখে কিসেব একটা বলক খেলিয়া গেল। সে অপূর্ব কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—তোমার ভাব। শুধু আমার ভাব। কেন, তুমি—তোমার ভাব নেবে না? বলো?

অপূ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বহিল। তাহার পর আস্তে বলিল—হাঁ, আমার ভাবও নেবে বই কি।

তারপরই সে হাসিয়া বাপাংটা লঘু করতে গেল বটে, কিন্তু নিজেই বৃক্ষল হাসিবার জন্য তাহাকে চেঁচা কপিতে হইয়েছে।

গন্তী বইয়া থাকে সে। মন তা বলিয়া খুব খাবাপ নহে। কেমন একটা আনন্দে সে বৃন্দ হইয়া অন্তিমতঃ উপভোগ কবে। শতকোটি নক্ষত্র এবং নীহারকাব ভিতর 'নিজেব অন্তিমতঃ উপভোগ করিবার তাঁর আনন্দ অন্য সমস্ত-কিছুকে তুচ্ছ কাবতে শিখাইয়াছে। যত্নকে সে ভয় কবে না। কাবণ যত্নাব আগেই সে জানিতে পারিয়াছে, জীবন কাহাকে বলে। জীবনকে যে জানিতে পারিয়াছে—যত্নকে তাহার ভয় কি?

আকাশটা হুপুরে ধব ধব কবিয়া জলে, বিকালের দিকে দ্বিধ হইয়া আসে। সন্ধ্যায় বাতাসে দিনশেষের সুব বাজে। অন্ধকার ঘন হইলে অপূ নদীর ধারে ঘাসে-ছাওয়া ঢালু জমিতে শুইয়া দেবে, আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার ছোটবেলায় যেমন উঠিত। এ সময়টা সে নোকায় করিয়া নদীর উপর বেড়াইত। ছোটবেলাটা কতদূর চালিয়া গিয়াছে। মনে কোন দঃখ নাই, কেমন উদার আনন্দ। পাড়ের নীচে নদী বহিয়া যাইবার সহজ ভক্তির মত আনন্দ।

নদীর ওপারে দিগন্তের উপর উজ্জ্বল সন্ধ্যা হইল। রূপালী আগুনের তীব্র শিখা সন্ধ্যা-আকাশে একটা উজ্জ্বল সরলরেখা টানিয়া দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অপূর মনে সূর্যের চিন্তা জাগিয়া উঠিল। উজ্জ্বল এক বিশাল বিশ্বের দূত—মহা-ভগতের সংবাদবাহক। তাহার মনটা হঠাৎ বড় হইয়া, ব্যাপ্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে যেন সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া গেল।

অপু ডাক্তার দেখাইতে গিয়াছিল। ডাক্তারবাবু চশমাটা নাকের উপর ঠিক ভাবে ঝাটিয়া লইয়া বলিলেন—আসল কথা এই, বাংলাদেশের হিউমিড আবহাওয়া আপনার সুট করছে না। আপনি কিছুদিন বাংলার থেকে দেখুন তো। মনে হয়, সুস্থ হবেন।

কথাটা অপূর মনে ধাবল। মধ্যপ্রদেশে সে যে কয়েক বৎসর কাটাইয়াছে, সে সময় তাহার অসুখবিসুখ কিছু হয় নাই। প্রচণ্ড উত্তাপে হৈ হৈ করিয়া প্রায় একটা বন্য-জীবনযাপন করিয়াছে। বিহারের দিকে কোথাও গিয়া থাকিলে মন্দ হয় না।

বাত্রে শুইয়া একদিন সে হৈমন্তীর সঙ্গে পরামর্শ করিল। হৈমন্তী কিছুটা অবাক হইয়া বলিল—নিশ্চিন্দপুর ছেড়ে চলে যাবে। অন্য কোথাও ভাল লাগবে তোমার?

—একেবারে যাব না হৈমন্তী। আমাদের গাঁ ছেড়ে পৃথিবীতে কোথাও গিয়ে শাস্তি পাব না। এ বাড়িও রইল, ইচ্ছে হলেই চলে আসব।

আসল কথা, অপূর রক্তে ভবঘূষেমি আবার জাগিয়া উঠিতেছে। স্থবিরতার বিকক্ষে বিদ্রোহ করিতেছে—অসুখের ভণ্ডাই সে বাহতেছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এক জন্মগায় সমস্ত জীবন কাটানো তাহার পক্ষে অসম্ভব। এ তাহার পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাঁহাদের ভবঘুরের রক্ত তাহাকেও স্থিতি থাকিতে দিতেছে না। সে যাইবে, আমৃত্যু সে পৃথিবীর ধূলিতে পা ডুবাইয়া ফাঁটিবে।

সামান্য সময়ের ভিতরই অপু কিছু টাকা খোঁজা কল্পনা ফেলিল। সবাই তাহাকে অগ্রিম টাকা দেয়, তাহার বই পাইবার জন্য ইঁটাতাটিকবে। সকাল দুপুরে বিকালে প্রচুর চাট আসে—পাঠকেবা মুগ্ধ হইয়া লিখিতেছে। অপূ সবাব চিঠির উত্তর দেয়, সামান্য একলাইনে লিখিলেও। প্রত্যেককে দীর্ঘ চিঠি দেওয়া সম্ভব নহে।

জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আর কি প্রত্যাশা করিবার আছে? সে অর্থ পাইতেছে এবং নাম করিয়াছে এটাই বড় কথা নহে—সে দু চোখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া জগৎটা দেখিয়া লইয়াছে। আরও দে ববে। থামিবে না। গার্হস্থ্য তাহার কপালে লেখা নাই।

টাকা আনিতে পাবলিশারের কাছে গিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিল—আপনার সম্মানে কোন ভাল জন্মগা আছে বিহাবেব দিকে? ভাবাছ কিছুদিন ওদিকে থাকবো—

প্রকাশক হাসিয়া বলিল—আপনার ঘোবা বাতিকটা আর গেল না। ইঁা, জন্মগার খোঁজ দিতে পারি। অল্প কয়েকদিন থাকবেন, না—

—ভাবছি একটা ছোটমতো বাড়ি পেলে কিনে নিতাম।

অপুকে তিনি একটি জায়গার কথা বলিলেন, কলিকাতা হইতে খুব দূর মছে, জামসেদপুরের কাছাকাছি। হাওয়া হইতে টেনে মাত্র মাত্র খট্টা পাঁচেক লাগে। পাহাড়ী এলাকা—অপর ভাল লাগিবে, তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন।

—ভাল আছে? প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন?

—খুব ভালো। সে আপনি নিজের চোখে দেখবেন। আপনাকে তো চিনি। ভাল না হলে আমি আপনার কাছে ও-জায়গার নাম করি কখনো। অপ, আবও পঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিল। অনেকে বিশেষ কোন খবর দিতে পারিল না। কেবল দুইজন লোক, যাদের কথার অপু মূলা দেয়, জামগাটার সম্বন্ধে প্রশংসা করিল।

প্রকাশকই খোঁজ করিয়া একটা বাড়ি বাহিব করিলেন এবং অপু বিশেষ দেবী না করিয়া বাড়টা কিনিয়া ফেলিল। কিনিবার জন্য সে নিজে যায় নাই, বাড়াব ছবি দেখিয়াছিল মাত্র। টালিব ছাদওয়ালা ছোট সুন্দর বাড়ী। পাশে দুইটা ইউক্যালিপটাস গাছ পাশাপাশি যমজ ভাইয়ের মতো উঠিয়াছে। বহু চিহ্নে একটা পাহাড় দেখা যায়। ছবিতে বেশ একটা বহুস্তর ভাব ফুটিয়াছিল—বিশেষতঃ চিহ্নের পাহাড়টা অপুকে আকর্ষণ করিল। ছবিটা প্রকাশককে ফেরত দিয়া সে বলিল—আমি আর দেখতে যাবো না। আপনার ওপর ভরসা কবে কিনছি। আপনি লোক পাঠিয়ে দিন টাকা সঙ্গে দিখে। দলিল-পত্রে আমি একেবারে গিয়ে সহী করব।

রাত্রে শুইয়া অপু বলিল—বোকা, তুই তো পাহাড় দেখিস নি? এবার দেখবি'খন।

কাজল পাহাড় দেখে নাই। বাবার কাছে শুনিয়া সে মনে মনে জিনিসটা সম্বন্ধে একটা ধারণা করার চেষ্টা কবে। চডকতলার ভাইনে যে মাটির উঁচু টিবিটা আছে, অনেকটা সেইরূপ কি?

—সেখানে নদী নেই বাবা?

—অছে, কি নাম জানিস?

—কি বাবা?

—সুবর্ণরেখা।

নামটা তাহার পছন্দ হয়। সুবর্ণরেখা। এক-নিশ্বাসে বলিবার মতো নাম। সাঁই করিয়া একবার তলোয়ার ঘুরাইবার মতো। কত নূতন জিনিস সে দেখিবে—পাহাড়, শালবন, সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেখা মিষ্টি নাম, সুন্দর নাম।

সুবর্ণরেখা—সু-ব-র্ণ রেখা—নামটা কাজলকে খুব পাড়াইয়া ফেলে।

কাজল ঘুরাইলে অপু বলিল—ঠিক বুঝতে পারছিনে হৈমন্তী, কাজটা ভাল হল কিনা। তবে এনে নিশ্চিন্দপুরে বসতে না বসতেই আবার রওনা দেওয়া

—অবশ্য ডাক্তার বলল যেতে, তবু—

হৈমন্তী একটু ভাবিয়া বলিল—না, চলো কিছুদিন থেকঁই দেখি তোমার শরীরটা সারে কিনা। এই ভালো, এক জায়গায় না থেকে, বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। ও-রকম শেকড় গেড়ে সংসার গড়তে আমিও ভালবাসিনে।

—আচ্ছা, তোমার পাহাড়ী দেশ ভাল লাগে, না আমাদের এই পাভার্গা ভাল লাগে?

—হুই-ই। এক-এক দেশের এক-একরকম সৌন্দর্য—

একটু চুপ কবিরী থাকিয়া অপু বলিল—তুমি তো সমুদ্র দেখ নি, না?

—না। কি করে দেখবো বল? ববাবর তো বাবার সঙ্গেই ঘুরেছি সমুদ্রের কাছাকাছি বাবা কখনো বদলি হন নি।

—যাবে?

হৈমন্তী বিছানায় উঠিয়া বসিল।—নতি বলছো? কবে নিয়ে যাবে—চলো হুই-একদিনের মধ্যেই। কোথায় যাবে?

হৈমন্তী চিন্তা কবিরী বলিল—তুমি বলো।

—পূবী যাবে?

পূবী এতটুকু ঠিক হইল। কাজলের কিছুদিনই বাদেই পরীক্ষা। সে রাণীর কাছে থাকিবে। অপুবা কাজলের পরীক্ষার আগেই ফিরিবে। রাণীর কাছে থাকিতে কাজলের কোন অসুবিধা নাই। কাজল সঙ্গে যাইবে বলিয়া অবশ্য হাত পা ছুঁড়িয়াছিল এবং অপু বাজাও হইয়াছিল। কিন্তু বাণী আসিয়া বলিল—তোরা থাকিস, যা। এ ছেলেটার সামনে পরীক্ষা। এটাকে আমার দলে ঢানচিস কেন? ও আমার কাছে থাকুক, ছুবেলা পড়াতে বসাব এখন। তোরা একা যা—

কাজল রাণীর কাছে থাকিয়া গেল। অবশ্য অপুকে বাববার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল যে, পরীক্ষার পবেই কাজলকে লইয়া সে পূবী যাইবে।

অপু হাসিয়া হৈমন্তীকে বলিতেছিল—আমাকে কোথাও একদণ্ড তিঠোতে দিচ্চো না, বুকল? হুই জায়গায় তো সংসার পেতে ফেললাম, তাতেও দেখছি খালি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা কবচে। বেশীক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকলে মন কেমন হাঁপিয়ে ওঠে, জানো?

তোমার তো ওই কমই। খালি বেড়ানো, খালি ঘুরে বেড়ানো। এখন তোমার যাযাবর-রুত্তি একটু বন্ধ রাখতে হবে, নইলে ছেলেটার পড়াশুনা আর কিছু হবে ভেবেছ?

—হবে, হবে। সে কি আমি ভাবি নি মনে করচো? কাজল এতে ভাল করে মানুষ হয়ে উঠচে। পড়াশুনায় ওর ঝোঁক বড় বেশী, সবসময় বই মুখে করে বসে আছে। নতুন বাড়ীতে গিয়ে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।

হৈমন্তী বলিল—আচ্ছা, সমুদ্রে স্নান করা যাবে তো? নাকি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঢেউয়ের টানে?

—জা কেন, কত লোক চান করচে দেখব । সবাইকে কি জলে ডাসিয়ে
নিরে যাচ্ছে ? তা ছাড়া মুলিয়া আছে—

মুলিয়া কখনো ডোবে না, না ?

অণু হাসিয়া বলিল—তুমি বড় ছেলেমানুষ হৈমন্তা । একেবারে বাচ্চাদের
মতো প্রশ্ন করছো । এই ভল্লোই তোমাকে এত ভাল লাগে ।

—আব তুমি খুব বড়ো হয়ে গেছ, না ?

—হয়েছিই তো ।

—উঃ একেবারে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—

কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া অণু বলিল—কাণ্ডচোপড গুছিয়ে নাও,
শীগগিরই বওনা দেবো ।

অণু আব হৈমন্তা পূর্বা যাইবাব দিন চারেক পূর্ব নিশ্চিন্দিপূর্বে একদিন
বৃষ্টি নামিল । বাস্তাব ধূলা নিমেষেব মনো কাদায় রূপান্তরিত হইয়া গেল ।
গ্রামেব ভিতবেব সমস্ত বাস্তা কাদায় ভর্তি, বালকের দল সেখানে আছাড
থাইতে লাগিল । বড় বড় আম কাঠাল গাছ হইতে টুপটাপ কবিয়া অবিপ্রান্ত
জল পড়িতেছে নিচেব কুবনের উপর । রষ্টি এক-একবার বদিয়া অসেসে কিছু
উঁচু গাছ হইতে জল পড়া থামে না ।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে কাজলের বড় মন কেমন কবে । কেন করে, তাহা সে বোঝে
না । ঘন মেঘে আকাশ কালো, গুম গুম কবিয়া মেঘ ডাকিতেছে, ঝুপ ঝুপ
কবিয়া অবিবাম বৃষ্টিব শব্দ । কেমন একটা মন-খাখাপ-কবা চাপা আলো
চারিদিকে—এই আলো কাজলকে উদাস কবে ।

বাণু পিসিদের উত্তবেব জানলায় বসিয়া সে দেখে, বাহিরে অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন
হইতেছে, দূরপূর্বা সন্ধ্যাবেলার মত দেখাইতেছে । বাণু রষ্টিতে তাহাকে
বাহিব হইতে দেখে নাই । জানলায় বদিয়া সে দেখিল, চণু একটা পুটিমাছ-
ধরা ছিপ আর একটা চটেব থলে হাতে কোথায় যাইতেছে ।

কাজল তাহাকে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বাচ্চিস বে ?

—মাছ ধরতে ।

—কোথায় ? নদীতে ?

—দূর । নদীৰ পথে বেজায় কাদা । বামনপুকুরে যাবো । যাবি ?

কাজল মাথা নাড়িল ।

—যাবি না ?

—না ।

—কেন রে, আর হয়েছে ?

—না ।

—তবে ?

—ইচ্ছে করছে না যেতে । তুই ধরগে যা মাছ ।

ইচ্ছা খুবই করিতেছে। কিন্তু পিসি ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে—এ কথা বলিলে চতুর কাছে দর কমিয়া যায়। চতুর মা-বাবা চতুকে কেমন ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার বেলা সবার যত কডাকড়ি।

একটু পরে রাণী ঘবে ঢুকিলে সে বলিল—চন্ কেমন মাছ ধরতে গেল এই একটা আগে। ওকে তো বেশ ছেড়ে দিয়েছে, আমাকে তুমি একটু বেরুতে দাও না কোথাও—

—দই না তো বেশ কপি। ও সব হাভাতে ছোঁড়ারা তো ঘুরবেই—

অশ্রুটি মিলিল না। অতঃপর জানলায় বসিয়া শিকে গাল রাখিয়া নির্নিমেহ দুটো বাতাস তাকাইয়া থাকি ছাড়া উঠায় নাই।

বাহিরে মল গমিয়াছে। একটা চড়ুই পাখি হঠাৎ কোথা হঠতে উড়িয়া আসিয়া বাস্তাব পরের কমা ভলে দ্বান করিতে লাগিল। মাথা ডুবাইয়া ডল তুলিয়া গায় দেয়। কখনো সমস্ত শব্দটা ডুবাইয়া দেয় ভলে। রফি হওয়ায় মহাস্কৃতি এদিকে ওদিকে অনেক পক্ষী ঘোরেঝাড়ে কিচমিচ কবিতোছে। ভয়ানক শব্দ পড়িয়াছিল, তাহা হঠতে মুক্তি পাইয়া সবাই ধন্য। একটা শেয়াল সামনে বগলটা পা হঠতে গিয়া একেবারে বাগুনিদের উঠানে আসিয়া পড়িল। কখনো দিনের বেলা এত কাছ হঠতে কখনো শেয়াল দেখে নাই, উৎসাহে সে উঠিয়া লাড়াইল। শেয়াল বচলক—দনমানে মৃত্যু-বসতির নিকটে ঘোরাঘুরো করিতে বসে দান যায় না। কাজলের চোখ বিষ্ময়ে কেঁপে উঠে। বাহিরে হঠিয়া খানিকটা শেয়ালটা মিনিট খানেক স্থাবর দাড়াইয়া হঠাৎ তারবেশে পালের কচুবনে ঢুকাই পড়িল।

বিকালের দিকে কাজলের মনটা খাখা লাগিতেছিল। বাবা বাড়ী নাই—এ সময়গা সে সাধারণতঃ বাবাব সঙ্গে কাটায়। পড়ন্ত বেলাব চাপা আলো তাহার মনে বেদনার একটা সুব ছাড়াইয়া দিল। শুধুই কি বাবাব জন্য মন খাপস ? কাজল অবাক হইয়া অবিকার কবিল, মায়েব জন্যও তাহার মন কেমন কবিতোছে। কদিনই বা হইল, যা তাহাদের দুইজনের সংসাবে আসিয়াছে—তাহাব জন্য মন খাপস হয় তবুও।

জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া ভেঙা গাছপালা দেখিতে দেখিতে কাজলের মনে হইল, মাকে সে সতাই খুব ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

পুণী হৈমন্তীর ভাল লাগিতেছিল। জীবনের প্রথম সমুদ্র-দর্শনে তাহার মন অকস্মাৎ আকাশের মত খোলামেলা হইয়া গেল। সারাদিন বেশ গরম থাকে। বিকালে দুইজনে সমুদ্রেব ধাবে যায়। পায়ে পায়ে হাঁটিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করে শহব অনেকটা পেছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। বাঁ-পাশে উঁচু বালিব ডাঙ্গা—এদিকে বিস্তৃত একখানি নীল আয়নার মত সমুদ্র। প্রথম দিন রেল-স্টেশন হইতে আসিবার সময় পথের বাঁক ফিবিয়াই হঠাৎ সামনে সমুদ্র দেখিয়া হৈমন্তী অবাক হইয়া গিয়াছিল। সমুদ্র সম্বন্ধে মনে তাহার যে ধারণা ছিল, সেটাকে

চুরবার করিয়া আসল সমুদ্র চোখের সামনে একটা অগাধ বিস্তৃতি খুলিয়া দিল।

সেদিন বেড়াইতে বেড়াইতে অনেকদূর গিয়াছিল। অপু বলিল—কেমন লাগছে ?

—ভাল।

—ভুধু ভাল ? আর কিছু না ?

—বিরাট ভালোব বণনা কি কবে দিই বলো তো ? মোটামুটি ভাল লাগলে বেশ বড়ো করে বলা যায়। খুব বেশী ভাল লাগলে তখন আর প্রগলভ হওয়া যায় না।

অপু বলিল—ভালো কবে খুবও কবে দেখো, সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের জীবনের একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য পাবে। বনও সমুদ্রের মত বড়। জীবনেও সমুদ্রের মত ঝড় ওঠে। সমুদ্র যেমন সূর্যের আদিত্য থেকে অবিভ্রাম ভাঁয়ে এসে আঘাত কবছে, ধাকা পেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে—আবার নতুন কবে আসছে, তেমনি জীবনেও একটা লোহার পদায়া বাব বাব আঘাত কবছে নেন। কিছুতেই ভাঙতে পারছে না। কি একটা নেন জানবাব কথা আছে—কিছুতেই জানা যাচ্ছে না—

অপু থামিতেই হৈমন্তীর কানে সমুদ্রের শো শো শব্দটা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা নামিয়াছে। দিগন্ত পদন্ত অন্ধকার—কেবল এখানে-ওখানে সাদা নোনা অন্ধকারেও দেখা যাইতেছে। হৈমন্তী চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—কি জানবাব আছে মানুষের ?

অপু ঘাট ফিরাইয়া চোখ তীব্র করিয়া দূরে তাকাইয়া ছিল। অনেকক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে বলিল—প্রশ্নটা জানা আছে, উত্তরটা কেউ জানি না।

ফিরিবার সময় হৈমন্তীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অপু বলিল কেন চিন্তা করতে শিখলাম বল তো ? জীবনটা তো এমনিতেই বেশ কাটিয়ে দেওয়া যেতো।

পরের দিন সকালে অপু বলিল—সব ঠিক কবে ফেললাম। চল কাল কোনারক থেকে ঘুরে আসি। পরী এসে কোনারক না দেখে ফেরা যায় না। হৈমন্তীর আপত্তির কোন কাবণ ছিল না। আরও একটি পরিবার কোনারক দেখিতে যাইতেছে—অপুও তাহাদের সহিত যাইবে ঠিক করিয়াছে, কথা-বার্তা সব ঠিক।

সারাদিন একটু একটু করিয়া কোনারকের ইতিহাসটা হৈমন্তী অপূর নিকট হইতে শুনিয়া লইল। ইতিহাস জানিবার পর কোনারক দেখিবার ইচ্ছা আরও বাড়িল। পরদিন সূর্যমন্দিরের চূড়াটা উঁচু গাছের পাতার ফাঁক দিয়া একটু একটু করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতেই আনন্দে হৈমন্তীর গলার কাছে কি-একটা পাকাইয়া উঠিল।

বিরাট মন্দির—প্রথম উঠানের অপর প্রান্তে বিশাল প্রধান দ্বার। মন্দিরের

ভিত্তিতে রথচক্রের অনুকরণে বড় বড় পাথরের চক্র খোদাই-করা হ-হ করিয়া বাতাস বহিতেছে। মন্দিরের ওপাশের উঁচু গাছে হাওয়া লাগিয়া একটা মাতামাতি কাণ্ড হইতেছে। চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। এত স্তব্ধ যে, হৈমন্তী নিজের শান্তিপূর্ণা শাড়াব খস-খস শব্দ শুনিতে পাইতেছে স্পষ্ট।

সহযাত্রী পবিবাবটি খাওয়ান ব্যবস্থায় লাগিল। সঙ্গে লুচি-তরকারী ও মিষ্টি আনিয়াছে। সতরঞ্চি বিছাইয়া দেওদিকে পাত্র হইতে বাহির করিয়া পাতায় সাজাইতেছে আবিস্ত করিল। কর্তাটি অপুকে ডাকিয়া বলিলেন—অপুবাবু, খাবেন তো এখন? আমাব মশাই, সত্যি বলতে কি, ভীষণ খিদে পেয়েছে—

—আপনার শুক কখন, আমরা একটু ঘুবে আসি। আমাদেরটা রেখে দিন বরং।

অপু হৈমন্তীকে লহরী মন্দিরটা ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে বৃক্ষ পাথরের মন্দিরটা কেমন উদাসভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মাটি হইতে ক্রমশঃ চূড়ান দিকে উঠিবাব কয়েকটি স্তম্ভ পথ আছে। তাহারই একটা দিয়া অপু হৈমন্তীকে লহরী উঠিতেছিল। একদিকে মন্দিরের পাথর—অপর-দিকে হঠক নিচে মাটি। হঠাৎ তাকাইলে মাথা ঘোবে। হৈমন্তী অপুকে ধরিয়া ডাঠতেছিল। অপু বলিল—ভাল কবে ধরে থেকো। হাওয়া দিচ্ছে বেশ, বেসামাল হয়ে ঝুপ কবে পড়ে যাবে।

অদ্ভুত। অদ্ভুত। শতাব্দীর ইতিহাসবাহী মৌন প্রস্তর, দূরে গাছেব সারি, সুন্দর বাতাস। আকাশের বড় তাহাদেবই মনোলোকের স্বপ্নের মত নীল। দীরে দীরে হৈমন্তী মনের ভিতর কেমন একটা ঘুম-ধুম ভাব ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বড় তান-বিশিষ্ট মনো-রিস-রিস বাজনার মত আবেশ।

কিছু এতো সব ভালো লাগিবার মধ্যে একটা কি চিন্তা যেন হৈমন্তীকে খোঁচা দিতেছে। অনেক আনন্দের মধ্যে একটু কি অতৃপ্তির আভাস। কয়েকদিন হইতেই হৈমন্তী অতৃপ্তির কাব্য অনুসন্ধান করিতে কবিতা এই স্মৃতিমন্দিরের ভগ্নসোপানে দাঁড়াইয়া উত্তবটা গেল। সে অস্বস্ত-কণ্ঠে বলিল—

শুনছো?

—কি?

—এবার চলো বাড়ী কবে যাই।

—সে কি? এই তো সব খলে। ভাল কবে সব দেখাও তো হল না। তোমার জন্যেই তো আসা।

—তা হোক। আর ভাল লাগছে না।

—কেন?

একটু স্তব্ধ থাকিয়া হৈমন্তী বলিল—খাকাকে ছেড়ে থাকতে পারছি নে। ফেরা হইল।

কাজলের যান্ত্রাসিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। অপু ঠিক করিয়াছে।

এখন বিহারের নতুন বাড়ীতে যাইবে না, কাজলের বাৎসরিক পরীক্ষা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। নতুন জামগাম একেবারে নতুন শ্রেণীতে ছেলেকে ভর্তি করিবে। এখন গেলে কাজলের একটা বৎসর নষ্ট হয়।

পরীক্ষার পর কাজল বেশ মজার আছে। পড়ার চাপ কমিয়াছে। সাবাদিন সে ঘুবিয়া কাটাইতেছে। বনজঙ্গল ভাঙিয়া মাঝে মাঝে চলিয়া যায় পাশেব গ্রামে।

একদিন কাজল বেড়াইতে বেড়াইতে একটা বাড়ীর উঠানে গিয়া তাজিব হইল। বেশ সুন্দর ঝকঝকে বাড়ী, উঠানে ধানের গোলা, সিঁহুর দিয়া তাহাতে মণলচিহ্ন আঁকা। কয়েকটা ছেলে ছোটাছুটি কবিত্তেছে। গোয়ালে একটা গরু বাছুবাব গা চাটিতেছে। উঠানে ক্রোড়াবত চাবটি কুকুর-ছানা। সে মুগ্ধনয়নে স্তম্ভপুষ্ট বাচ্চাগুলিব খেলা দেখিতেছিল। এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল।

—কি দেখছ ?

সে আমতা অমতা কবিয়া বলিল—না, এই—মানে—ঐ বাচ্চাগুলো বেশ সুন্দর কিনা, ত, ই—

—তুমি নেবে একটা ?

অপ্রত্যাশিত দোভাগ্যে সংস্থান হইয়া কাজল প্রথমটা কিছু বলিল না। পরে বলিল—একেবারে দিয়ে দেবে ? তোমার বাড়ীর লোক কিছু বলবে না ?

—দুঃখ। খাবও তো তিনটে বইল—তুমি একটা নাও।

প্রথমে কাজল সন্তোষে ভ্রম পাইতেছিল। পরে গায়ে হাত বুলাইয়া বুদিল তাহাণ নিতাইই নিরীহ।

একটা বাচ্চা বগলদাবা কবিয়া দ্রুত সে স্থানত্যাগ করিল। প্রাতঃমুহূর্তে ভ্রম হইতেছিল পেছন হইতে ছেলেটি ডাকিয়া বলিল—না ভাই, বাচ্চা দেবো না। তুমি বেধে যাও।

দ্রুত বড় মাঠটা পার হইয়া কাজল নিশ্চিন্দপূরে ঢুকিল।

হৈমন্ত্য বাগ কবিয়া বলিল—এঃ, এটা আবার কোথেকে ছুটিয়ে আনলি, নেড়ার বাচ্চা—

হাত-পা নাড়িয়া কাজল দুর্বল জীবের পক্ষে অনেক ওকালতি করিল। অবশেষে অনুমতি মিলিল। এবারে বাচ্চাকে শো কিছু খাওয়ানো প্রয়োজন। কুকুরের বাচ্চা কি খায়, এ সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় হৈমন্ত্যব কাছে আবার গিয়া দাঁড়াইতে হইল।

—মা।

—কি রে ?

—ওটাকে কি খেতে দিই এখন ?

রাগ করিতে গিয়া হৈমন্ত্য হাসিয়া ফেলিল। ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া

বলিল—বড় বাচ্চা যে, তুমি ছাড়া কি অন্য কিছু খেতে পারবে? বরং রান্না-ঘবেব কড়া থেকে খানিকটা তুমি নাকোলেব মালায় নিয়ে খাওয়াগে।

খাওবে প্রতি বাচ্চাটার একটা দার্শনিকসুলভ নিস্পৃহতা। কাজল ছোব কবিন্সা তুমি মগো মুখ ডুবাওয়া দিলে নাকেব মগো তুমি ঢুকিয়া হাঁচিয়া সে অস্থির হইল। এক-মালা ন্য খাওয়াইতে বেলা গড়াইয়া অন্ধকার নামিল।

তিন-তিন দিনেব মগো কুতুপছানা নতুন ডায়গায় অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কাজল বাবাকে বলিয়াছে কলকাতা হইতে কুতুবের গলায় চেন আনিয়া দিতে। চেন গলায় দিয়া সকাল বিকাল কাজল তাকে লইয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করিবে। ওয়াইডওয়ার্ড মাগাজিনে কুতুবের বীণায় সম্বন্ধে ভাল ভাল গল্প ছাপা হয়—বাবাব কাছে কাজল অনেক গল্প শুনিয়াছে। সে-ও ইহাকে সুশিক্ষিত কথিয়া বাবাব-অভিযানের সঙ্গী করিবে।

কুতুবের নাম রাখা হইল—কালু। সাতদিনেব মগোই কালু কাজলেব পবম-ভক্ত হইয়া উঠিল। কাজল নিজে আসিয়া খাইতে না দিলে খায় না—সর্বদা কাজলেব পেন পেছন ধোবে। বেশ ভাল চলিতেছিল, কিছু মাসখানেক বাদে হঠাৎ কালুব কি অসুখ কবিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝিমায়, খাওয়াদাওয়া একদম ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রথমে কাজল আমল দেয় নাই, পরে দেখিল কালুব উঠিব পক্ষে মত লুপ্ত হইয়াছে। তিনদিন আগেও লাফালাফি কথিয়া বেড়াইয়াছে, হঠাৎই সবক্ষণ শুইয়া থাকে। কাজলেব সাড়া পাইলে অতিক্রমে একবার মাথা তুলিয়া তাকায়। অশক্ত ঘাডের উপর মাথাটা কাঁপে, কিছুক্ষণ বাদে আবার চট্টের উপর পড়িয়া যায়।

অপু দেখিয়া বলিল—আহা যে। কালু বোকাহয় আর বাঁচবে না।

সাবাটা বিকাল পশিয়া কালু অস্পষ্ট আত্মনাদ কবিল, বাড়ি বাড়িবাঁব সঙ্গে কাতব গোঙানি। কালু মাথা যাইতেছে, কালু ভীষণ কষ্ট পাইতেছে, অথচ কাজলেব কিছুই কবিবার নাই। চা-গোঙানি তাহাকে কিছুতেই ঘুমাইতে দিল না। এত্রে মাঝ বুকেব কাছে তাহাব মনে হইল, তাহাব অসুখ করিলে মা-বাবা বাস্তব হইয়া দেবা কবে—আব বেচারা কালু অন্ধকাবেব ভিতর একা একা কষ্ট পাইয়া মরিতেছে।

কাজল ফুঁশিয়া কাঁদিল উঠিল।

হৈমন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—কাঁদতে নেই মাণিক আমাব। ছিঃ—

আদবেব কথা শুনিয়া কান্নাটা আবও বাড়িল। অশ্রুধ্ব-কণ্ঠে কাজল বলিল—কালু কত কষ্ট পাচ্ছে, অন্ধকাবেব মধ্যে বসেছে—

হৈমন্তী তাহাব মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—একা কোথায় পাগল।

ওব কাছে ঠিক ভগবান এসে বসে আছেন, জানিন। খাণ কষ্ট পেয়ে মারা যায়, তাঁদের আত্মাকে ভগবান নিজের হাতে স্বর্গে নিয়ে যান। ঠিক ওর পাশে ভগবান এসে বসেছেন—

কাজলের দুঃখের বেগটা একটু কমিয়া আসিল। এ ভাবে সে কখনো ভাবিয়া দেখে নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে দুঃখের কিছুই নাই। ভগবান যদি আসিয়া থাকেন—তবে ভালই তো। কাজল স্পষ্ট দেখিল, কালুর পাশে এক জ্যোতির্মসদেহ বিশাল পুরুষ—উন্নতললাট, দীপ্তনয়ন। তাঁর হাতে পৃথিবীর শাসনের স্বর্ণদণ্ড। তিনি আসিয়াছেন ক্রিষ্ট আগ্নাকে সহস্রে স্বর্গে লইয়া যাইবাব জন্য।

কাজল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবর্ণবেশ।

বালিব চব বৃকে কবিতা নদীটা সাবাদিন পড়িয়া থাকে। স্বল্প জল এখানে-ওখানে বালিব মধ্য দিয়া বহিয়া যায়। নদীর মাঝখানে বড় বড় কালো পাথরের চাঁই প্রাগৈতিহাসিক জন্তু মত পড়িয়া আছে। উপরে প্রথম নীল আকাশ ধূসর দিগন্তের সহিত একটা অস্পষ্ট বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। মাটির রঙ লাল। ভূমি সমতল উঁচুনিচু। স্থানটিতে কেমন একটা বৈবাহিক ভাব আছে, মাটির গৈরিক বস্তুর মত।

মৌপাহাড়ীতে লোকজন কম। দিনের বেলায় মনে হয় কিসের উপলক্ষে যেন ছুটি হইয়া গিয়াছে—সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার সময় একটা কালো চাদর ক্রমশঃ সবকিছু ঢাকিয়া ফেলে। ঝাঁঝি এবং অন্যান্য পতঙ্গের ডাকের মধ্য দিয়া বাত্মি মৌপাহাড়ীকে গ্রাস করিয়া লয়।

অপু ইহাব ভিতরে কি-একটা যেন খুঁজিয়া পাইয়াছে। মানুষের সঙ্গ—কেবল কাজল এবং হৈমন্তী ছাড়া—তাহার কাছে ছায়া কাম্য নহে। বইখাতা বগলে দিনের প্রায় সময়টাই সে বাহিরে ঘুরিয়া কাটায়। নদীর পাশে এক-খানি বড় পাথরের উপর বসিয়া সে লেখে। জীবনকে সে অলসভাবে একদিক হইতে দেখে নাই। তাহার দেখা বিচিত্র জীবনের কথা সে খাগামী যুগের জন্য বাখিয়া ফাইবে। লিখিতে লিখিতে কখনো মুখ তুলিয়া দেখে, সামনে সুবর্ণবেশা বিস্তৃত বক্ষে, ওপরে প্রান্তরের গৈরিক প্রসার। পটন্ত সন্মালোকে নদীর বালিব মধ্যে মিশ্রিত অম্লকণা চিক্ চিক্ কবিতাছে। আকাশে-বাগাসে কিসের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত অপুকে বিচলিত করে। কি-একটা এখনই করিতে হইবে, কি-একটা কবিবার আছে—কিন্তু কিছুতেই কণা হইতেছে না। শরীরের মধ্যে একটা বিচলিত ভাব বাড়িয়া ওঠে। মনে হয়, সবটাই বাকি রহিল, নির্দিষ্ট কাজের ভয়াংশও করা হইল না। যাহা জানিবান ছিল, তাহার কণামাত্রের আশ্বাদন হইল মাত্র।

শরীর লইয়া অপু খুবই বিব্রত। নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসার পর মৌপাহাড়ীতে তিন-চার বৎসর কাটিল, কিন্তু স্বাস্থ্যের খুব-একটা উন্নতি হয় নাই। প্রায়ই বুকে একটা যন্ত্রণা হয়। মাথা ভার ঠেকে, অস্থল হয়। এ সব কথা সে কাহাকেও বলে না। অসুখ গা-সহ্য হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ঘনাইলে লেখা

বন্ধ করিয়া নক্ষত্রের আলোয় বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ ছোট টিলাটার গা ঘেঁষিয়া বিশাল রহস্যময় গ্রহটাকে উঠিতে দেখিয়া তাহার অসুখের কথা বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া যায়। সেতাবের জলদের মত জীবনটা কাহার হাতের স্পর্শে যেন বাসিতেছে। কিসের স্পর্শে যেন জীবনের রঙ বদলাইতেছে, সুরের পরিবর্তন ঘটিতেছে।

সুবর্ণরেখার পাবে বসিয়া সময় কাটাইতে কাটাইতে অপু নদীর সঙ্গে নিজের মিল খুঁজিয়া পায়। একা থাকিলেও মনে হয় না, সে একা আছে। কাহার উপস্থিতি যেন বহিরাছে তাশেপাশে, অথুৎত কবা যায় কেহ পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখ ফিরাইলে সরিয়া যায় দূবে।

একদিন একটা কাণ্ড ঘটিল। অপু বসিয়া লিখিতেছে, একটা প্রজাপতি আসিয়া বসিল তাহার খাতার পাতায়। সে হাত বাড়াইয়া দ্বিগুণে গেল সেটা উড়িয়া একটু দূরে একটা পুটুস গাছের উপর বসিল। অপু কেমন মনে হইল, সুন্দর প্রজাপতিটাকে ধরিতেই হবে। এক টুকরা পাথর খাতার উপর চাপা দিয়া উঠিল।

প্রজাপতিটা গা গেল না। গাঢ় লাল মাঝ বাদামি ডানা-ওয়ালা পতঙ্গ তাহাকে দূর হইতে দূরে লইয়া গেল। এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপ করিতে করিতে অপু ছাড়াইয়া মতো দৌড়াইল। বাতাস অপু চুল অবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, তাহার দৃষ্টিতে চোখপাটা লাগিয়া গেল। পাথরে লাগিয়া পায়ের এক জায়গা কাটিয়াও গেল, কিন্তু প্রজাপতি পাওয়া গেল না।

মাইলখানেক দৌড়াইয়াও কাঁচিয়া অপু নিজের বসিবাব ভান্সগায় ফিরিয়া আসিল। পায়ের উপর পাখা খাতার পাতা বাতাসে অল্প অল্প উড়িতেছে, চাপা আছে বলিয়া একেবারে উড়িয়া যায় নাই।

অপু ঝাংঝটাং এককোণে বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সুবর্ণরেখার দিকে তাকাইয়া বহিল।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কাজলের চুফ্চামি কমিয়াছে। আগের মত লাফা-লাফি করিতে পারা ভালবাসে না। মেপাহাড়ীতে তাহার সমবয়সী কম। সমবয়সীদের সঙ্গে কখনই তাহার বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে নাই। বয়সে যাহারা অনেক বয়স তাহাদের সঙ্গেই বন্ধ কাজলের ভয়ে ভাল।

একদিন কয়েকটা ছেলে মিলিয়া মাইল তিনেক দূরে একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। কাজলের মনে হইয়াছিল, ছেলেগুলি এক একটি আস্ত ববর। চিল কুড়াইয়া ভাষণ ছোবে ছুঁড়িতেছে, লাফাইতেছে, চীৎকার করিতেছে, নিজের মতো তুচ্ছ কারণে মাঝামাঝি করিতেছে। অথচ চারিপাশে কেমন সুন্দর পাহাড়ী পরিবেশ। নির্জন স্থানে স্তব্ধতা খাঁ খাঁ করিতেছে। মাঝে মাঝে বাসায় ফেরা কি-এক ধরনের পাখী মাথার উপর দিয়া মধুর সুরে ডাকিয়া যাইতেছে। সব মিলাইয়া বেশ ঘনিষ্ঠ আনন্দময় পরিবেশ।

ছেলেয়া এসব মোটে বুঝিতেছে না। কাজল ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিল। বড় গোলমাল করে ইহারা। তাহার মনের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই। থামাইবার জন্য সে কিছুদিন আগে-পড়া একটা গল্প শুরু করিল, কিন্তু সে গল্পে কেহ উৎসাহ পাইল না।

খীরে ঘরে, তল্ল বয়সেই, কাজলের ভিতর একটা বোধ জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহার সহিত অন্যের মনের মিল হয় না—হইবে না।

সে একা থাকে। অপু প্রচুর বই আনিয়া দিয়াছে। অনেক বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ সে পড়িয়া শেষ করিয়াছে। অপু তাহাকে নিজে ইংরাজী শিখাই-তেছে, যাহাতে কাজল শীঘ্রই বিশ্বসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, কাজলও অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়া ইংরাজী ভাষা-শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা তাহাকে বাবার কাছে বাসিয়া পড়িতে হয়।

চোখের সামনে তাহার এ কি ভগতের দ্বার খুলিয়া যাইতেছে। এ কি আনন্দ আর আলোর ভগৎ! পৃথিবীর সাধারণ অকিঞ্চিৎকর বস্তুও এ আলোর স্পর্শে অসাধারণ হইয়া উঠিতেছে। এমন ভাবে যাহারা তাহাকে পৃথিবীটা দেখিতে শিখাইতেছে, তাহাদের কাছে সে বৃত্তজ থাকিবে।

ফরাসী ছোটগল্পের অনুবাদ পড়িয়া প্রথম তাহার চোখ ফুটিয়াছিল। রোডকার জীবনে দেখা সামান্য ঘটনা লেখকের হাতে এক গভীর তাৎপদ্য লাভ করিয়াছে। এক ভায়গায় একটি বৃদ্ধির বর্ণনা এবং অপর ভায়গায় একটি ছোৎসারারাত্রির বর্ণনা তাহাকে পগল করিয়া দিয়াছিল। এখনও বর্ণার দিনে এবং ছোৎসারাত্রিতে গল্প ছটিকে সে মনে করিয়া থাকে।

একটু বয়স হওয়ায় সে বাবাকে চিনতে পারিতেছে। বাবার কেমন একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে, সে বুঝিতে পারে। সেটা বাবার সাংসারিক অস্তিত্ব নহে—হনা কিছু। সব-কিছুর ভিতরে থাকিয়াও বাবা সব-কিছু হইতে আলাদা। একদিন বাবাকে বড় অদ্ভুত লাগিয়াছিল। বেড়াইতে যাহবে বলিয়া বাহিঃ হইতে গিয়া সে দেখিল, বাবা উঠানের প্রান্তে ইউক্যালিপটাস গাছটার নাচে সতবন্ধি পাতিয়া বসিয়া লিখিতেছে। হয়তো কিছু মনে আসিতেছে না, কোন উপযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তাই বাবা কলমটা হাতে ধরিয়া উদাস ভাবে দূবে তাকাইয়া আছে। ডানদিকের কাঁধটা একটু নীচু দেখাইতেছে। ফর্সা ঋতু দেহ বাবার। হঠাৎ বাবার জন্য ভীষণ মায়্যা হইল, ভীষণ—ভীষণ ইচ্ছা হইল বাবার কোলের কাছে গিয়া মুখ ঝুঁজিয়া থাকে। শরীরের ভিতরের প্রতি শিরার সে পিতার ভালবাসার স্রোত অনুভব করিল। বাবার শরীর মোটে ভাল যাইতেছে না—বাবা কাহাকেও বলে না, কিন্তু কাজল জানে।

হৈমন্তীর বাবা সুরপতিবাবু একদিন মৌপাহাড়ীতে আসিয়া হাঙ্গির হইলেন। কি কাজে জামসেদপুর আসিয়াছিলেন—পথে মৌপাহাড়ী ঘুরিয়া যাইতেছেন।

হৈমন্তী দৌড়াইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। অপু ব্যস্ত হইয়া পড়িল খাওয়াইবার আয়োজনের জন্য। কাজল একটু থতমত খাইয়াছিল, কিন্তু লজ্জা কাটিয়া গেলে দেখিল দাড়া খুব ভালমানুষ। কাজলকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, আজকে সাবাদিন আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব দাড়া—কেমন?

হৈমন্তী বলিল—‘তুমি ত’ একদিন থাকবে তো বাবা?

—না না, সময় নেই হাতে একদম। পণে কাছে আস—

অপুও টিকিল না। দুইদিন ডাকিয়া খাইতে হইল। সাবাদিন কাজল আর দাড়া গল্প চলিত, অপু গোগ দিতে পারিত না। সে একখানি বড় উপন্যাস লিখিতেছে। সন্ধ্যায় উঠানে সতর্ক দাঁতিয়া বসিয়া অপু শ্রুতমহাশয়ের সহিত কথাবার্তা বলিত। দু’পরিবাবু জানা ও অভিজ্ঞ লোক। জীবনের তিক্ত এবং মধুর দুইদিকেই সহিত নিবিড় পরিচয় আছে। পরলোকে অত্যন্ত বিশ্বাসী। সন্ধ্যায় সবলোক লইয়া অপুর সহিত কথা হইল।

দুইদিনের বেশী সুবৃতিবাবু থাকিতে পারিলেন না। খাইবার সময় অপুকে শরীরের সজ্জা বিশেষ যত্ন লইতে বারবার বলিয়া গেলেন। হৈমন্তীকে আডালে ডাকিয়া বলিলেন—তোরা কপাল ভাল হৈম, যে এমন স্বামী পেয়েছিস। জামাই সত্যিই বড়ো ভাল—এমন মানুষ দেখা যায় না। কাজলকে গোপনে দুইটি টাকা দিয়া তিনি ছাতা-বাগ সহ রওয়ানা হইলেন। অপু তাঁহাকে টেনে তুলিয়া দিতে গেল। টেনে তুলিয়া দিয়া ফিবিবার সময় অপু বুক কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ হইল। বাঁদিকে একটা চিনচিনে বাধা ক্রমিতেছে না। বুক হাত দিয়া অপু কিছুক্ষণ বসিল—কিছু হইল না। মাথাটা বেশ ঘুরিতেছে। অপু ঠিক করিল ডাক্তারের কাছে একবার ঘুরিয়া যাইবে।

স্বাম্য ডাক্তার বিশ্বনাথ সোম অপুকে দেখেন—ডিসপেনসারিতে ঢুকিতেই তিনি অপু মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে অপুবাবু? বসুন, এই চেয়ারটাতে—হ্যাঁ—

যন্ত্রণা বাড়িতেছিল। মাথার মধ্যে যেন ঝিমঝিম বাজনা। বিশ্বনাথ বাবু নাড় দেখিয়া কমপাউন্ডারকে ডাকিলেন—সুরেন, মেজারগাসে পনেরো ড্রপ কোরামিন চট কবে নিয়ে এসো।

কোরামিন খাইয়া অপু একটু সুস্থ বোধ করিল। বিশ্বনাথ বাবু প্রেসার লইলেন। খুব হাত।

কিছুদিন বিশ্রাম নিন। এরকম বারবার হওয়াটা তো ভালো নয় রামেশ্বর! খাওয়াদাওয়া নিয়মমত—আমাকে প্রতি হপ্তায় একবার করে দেখিয়ে যাবেন।

অপু বাইরে আসিল। রাস্তায় লোক কম। মাথার ভতরটা এখনও পুরাপুরি পরিষ্কার হয় নাই। একটু হাঁটলেই মনে হইতেছে, আবার মাথা ঘুরিয়া উঠবে। ডাক্তার বিশ্রাম লইতে বলিয়াছে, এইবার তাহাকে বিশ্রাম লইতে হইবে। একটা উপন্যাস সে লিখিতেছে, শেষ হওয়ার পূর্বে বিশ্রাম

নাই। উপন্যাসটা শেষ কবিনা তবে ছুটি।

ক্লান্ত শবীর—সামনে একটি উপন্যাস লিখিবার পরিগ্রহ। হঠাৎ অপর নিকট 'ছুটি' শব্দটা অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক বোধ হইল।

কলিকাতা হইতে প্রকাশকের পত্র আসিল, লেখাটা তাহাদের শীঘ্র প্রযোজন। দেবী কবিলে আর্থিক ক্ষতিব সম্ভাবনা।

সকালে জলখাবার খাইয়া অপুর লেখা শুক কবে, তপুগে খাইবার সময়টা বাদ দিয়া সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ক্রমাগত লেখে। সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে একদা নদী দিকে বেড়াতে যায়। ফিবিয়া অসিয়াই অবার বারি বারিটা পর্যন্ত লেখে। শবীরের উৎসব অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে। উপন্যাসটি অপর দ্বন্দ্ব উজ্জাদ করিয়া লিখিবে। অপরিত্রস্ত বয়সে ভাবাবেগ আর নাট—এখন জীবন সত্য উল্লিখ করিবার সময়।

কোন সময় লিখিতে লিখিতে মাঝ একেবারে কঁকা হইয়া যায়, হাত-পা অবশ হইয়া আসে। কলমটা টেবিল নামাইয়া অপর অধুনা কবে, শবীর ভাঙিয়া আসিতেছে—আচ্ছন্ন মত সে কাজ করিয়া বাইতেছে কিছুটা লোভে লোভ বটে। কাজটা শেষ হইলে আপাতত ছুটি।

হৈমন্তী আসিয়া বকে—বেশে দাও তো। এককম বাটলে শবীর হৃদনে ভেঙে পড়ে। শোবে চলো।

অপর চুলের ভিতর হাত ঢালাইতে চ'লাইতে বলে—আর একটা, চাপটাটা শেষ করে গেলি।

হৈমন্তী বন্ধাইয়া পাবে না

একদিন অপর টেবিলেই ঘুমায়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ হইতে কলম বন্ধিয়া পড়িয়াছিল। বাতাস টান মায় পাখিয়া অপর পল্পনে পড়েছিল মাপদোশ। সেই বন্ধ্যা জীবনটা আবার চিন্মাছে বেতেতা বোড়ায় সওয়া হইয়া আদিগন্ত হাট সমান জঙ্গলে ও বরষা পমন করিতেছে। কাল-কাল পাশ্চম দিগন্ত ছুটি ছুটি কনিয়াছে। বাতানে সেই সজাব ভাবটা।

বাতা দিবার কেহ নাই—মহানন্দ্য বাতাস দিককার ভীম বণে পাবমান উঠা মত জাব আবার চিন্মা। চিন্মা নাই তখন নাই যে নাই—বাতা মনোই সব পাইবার ত্রি ও হাক আচ্ছন্ন করিতেছে। এব জোনে দো। ছুটাইয়াছে সে দে ড—দো—দে ড। সামনে কলোমত কি একটা আসিতেছে, বিশাল পাহাড়ের মত। সে ঘোড়ার পাশে চানিল।

ঘুম ভাঙিয়া সে কলমটা আবার তুলিয়া লইল, কিন্তু আর লিখিবার উৎসাহ নাই। স্বপ্ন এখনও মায়ার মধ্যে ঘুরিতেছে। অর্থটা বোঝা, যাইতেছে না বলিয়া অস্বস্তি হইতেছে। টেবিলের ওপাশে জানলা গেলা হইয়া বাতাস আসিয়া কাগজপত্র এলোমেলো হইতেছে। সবাই ঘুমাইয়া, কেবল বহু দূরের কোন সাঁওতাল বস্তীর ক্লান্ত মাদলের শব্দ এখন

শোনা যায়।

চিঠি লিখিবার পাণ্ডা টানিয়া লইয়া অণু মনে কবিতা কবিতা বহু পুৰাতন বঙ্গ-আশ্রয়কে এক একখানা চিঠি লিখিল। অনেককে লেখা হইল না— তাহাদের ঠিকানা মনে নাহি। লিখিল ভালো আছো? অনেকদিন খবর নিতে পাবি নি, স্বার্থপরের মত নিজে ভেতবে নিজেকে গুটিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু মানুষ একা বাঁচে না—তোমাদের সবাইকে আমার জীবনে বড় দরকার। আমাকে মনে রেখো, একেবারে ভুলে গেও না যেন। মানুষের মধ্যে যেতে আছি—এ বোগটা আমার জীবনে যেমন প্রয়োজন, তোমাদের জীবনেও তেমনি।

চিঠিগুলি লিখতে যাত শেষ হইয়া গেল। পূর্ব দিকের টিলাটার পাশের আকাশের লাল রঙ পলিল। মেনের লগ্না স্তম্ভগুলিকে দেখাইতেছে যেন আঁকা ছবি। আলো দু' দিয়া নিভাইয়া অণু বাবান্দার আসিয়া দাঁড়াইল।

বিকালে অণু ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—খোকা চল, বেকই কোপাও।
উনিচু লাস্কর দে পাণ্ডা পশিয়া উঠানে কিছু হাটল। অন্যতর একটি পাহাড়ের কাছে আসিয়া অণু বলিল—আয়, এখানে বসি।
দেউটা ছোট্ট গায়ে দেউ জন বসিল। কাজল বলিল—বাবা, সেই যে গল্পটা।
নিচের দিকে একলা পাণ্ডুমারী থাকতো, সেটা আজ শেষ কবো—
সে লগ্না কানে না লইয়া অণু ডাকিল—খোকা।

—কি বাবা?

—আমার কাছে উঠে এস তুমি একটু।

কাজল বাবাব কোল বেঁসিয়া দাঁড়াইল।

—খোকা, তুমি আমার ভালবাসিস?

উনিচু না দিয়া কাজল বাবাব বুকে মুখ গুডিয়া বহিল। তাহাব বয়সী ছেলের পক্ষে ইহা বিবদূষণ হইলেও বাবা ও মায়ের আদর পাইলে সে এমন কবিতা থাকে।

অণু ছেলের মা'য় হাত বুলাত ল'খিল। সূর্যাস্তের বগে বজ্রিত প্রান্তরে সে অনেকক্ষণ চেয়েব সহিৎ বসিয়া বহিল। ক্রমে আলো কমিয়া কীটপতঙ্গের গুঞ্জন শুনা হইল। অণু উঠিয়া ছেলের হাত ধরিল।

—চল, বাড়ি চল, তোব মা ভাবে।

বাবাব হাত ধরিয়া কাজল হাটিতেছিল। বাবা আজ এত গন্তীব কেন?

কি একটা লাগী সুদুঃ কবিতা বাস্তা পাব হইল, অন্ধকারে দেখা গেল না।

হয়তো মেঠো ইঁদুর। বাড়ী শিবতেই হৈমন্তী বলিল—তোমাকে বলে আর পারা গেল না। এত দেবী কবে ফিরতে হয়। বাবাব এদিকে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—

অণু কাজলের হাত ছাড়িয়া দিয়া অদ্ভুত ছেলেমানুষির সুরে বলিল—আর

করবো না। হৈমন্তী, সত্যি বলছি—আব কখনো না—
রাত্রে শুইয়া অপু হৈমন্তীকে ডাকিল—হৈমন্তী।

—কি গো ?

—বাইবে কেমন জোৎস্না উঠেছে দেখেছ ?

সুন্দর জোৎস্নায় উঠানটা ভাসিতেছে। অফিসী তিবি, চাঁদ দিগন্তে। দিকে
ঝুঁকিয়ে গিয়েছে। বিষয়, অথচ সুন্দর জোৎস্না।

হৈমন্তী বলিল—সুন্দর।

—চল, এক বাহবে গিয়ে বাস। খেতে ভাল লাগছে না।

ঘুমন্ত কাজলের চাবশাশে মশাশা গুজিয়া দিয়া দুই জনে উঠানে গিয়া বসিল।
শব্দহীন রাত্রি। চাঁদের আলোয় এক বাসিতেই যেমন একটা শাবেশ
জড়াইয়া আসে দেখে-মনে।

—হৈমন্তী, কাল আমার উপন্যাস শেষ হয়ে যাবে। বড় ভাল লাগছে। এ
লিখতে চেয়েছিলাম—ঠিক সেই একমুটি হোল না কিন্তু অনেকখানি স্পেন্ডি
বলে মনে হচ্ছে।

কাছেই কেদাও কিংকি ডাকিতে শুরু করিল।

—ছোট বেলায় দূরে তাকিয়ে ভাবতাম, ও খোঁজেন আকাশ শাব মটি
মিলেছে, তার ও বাবেই আছে ককপাব বাচ্চমা বাচ্চমাব দেশ। তেমনি
আমাব লেখায় একটা নব দিগন্তের ইচ্ছিত হয়ে গেল। সাবাবীবন আমব
এগুলাম স্পেন্ডাও মনীচকাব মত পিচ্চিয়ে গেল।

হৈমন্তী অপু বহীটুতে হাত বাখা বলিল—তোমাব ভাবনে কি কোন দুঃখ
আছে ?

—না, আমি পবিপূর্ণ, আমি শুভ। কারণ আমি বুঝেছি সন্ধানেই আনন্দ,
প্রাপ্তিতে পরিস্রাম্পি। আমি পথ চলতে ভালবাসি হৈমন্তী। আমি খেতর
শেষ চাই না।

দুইজনে কোন কথা না বলিয়া বসিয়া বহিল। কিংকি ডাকেব বিরাম
নাই। চাঁদ ইউক্যালিপটাস গাছ দুইটার মাঝখান দিয়া শোবে শোবে নামিয়া
পড়িতেছে। তাহাদের চান্না ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া আসিল। চাঁদের
আলো স্নান হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া দৃষ্টিয়া উঠিতেছে।
বাতাস একবার গাছের পাতায় হালকা দোলা দিল।

—হৈমন্তী।

—কি ?

—না, থাক—

হৈমন্তী অপু হাত ধরিয়া বলিল—বলো না, কি বলবে।

অপু একবার আকাশের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল—বলা যায় না, বলা
যায় না। ভাষা জানি নে—

পরের দিন সকালে যত পিওন আসিল মনি-অর্ডার দিতে। কিছুদিন আগে

62

করিবার জন্য বানাইয়া বানাইয়া বলিত । মা সরল মনে সব বিশ্বাস করিত ।
হিন্মবেশ-পৰা মায়েৰ হাস্যময়ী চেহাৰা মনে পড়িলা যায় ।

ঘূৰিতে ঘূৰিতে সুবৰ্ণৰেখাৰ তাৰে আসিয়া পড়িয়াছে অপু । বহিলে মন্দ হয়
না । যে পাথৰটোৰ উপৰ বসিয়া সে লিখিত, জুতা ছাডিয়া তাহাৰ উপৰ অপু
বসিল । জ্ঞানপ্ৰাণী নাই কোনদিকে । সুবৰ্ণৰেখাৰ শূন্য বুকটো গুণী-খী বৰি-
তেছে । কয়েকটি বক একপায়ে নদীৰ চৰে গানমগ্ধেৰ মত দাঁড়াইয়া । সু-
য়েন জলিতেছে । অপুৰ মনে হইল সবদিকে কেমন একটা নাই নাই ভাব ।
আকাশ বিজ্ঞ । এতটুকু মেঘ নাই । নদীৰ বুক বিজ্ঞ—জল নাই । দিগন্ত
প্ৰস্তু প্ৰান্তৰ ঠিক, নদীৰ ওপাৰে কেবল একটিমাত্ৰ গাছ—পলাশ গাছ বিপুল
একটি প্ৰাণতীক কৰিতাব যতি-চিহ্নেৰ মত সোজা মাথা তুলিয়া আছে ।
গাছটোৰ সবংশে যেন আগুন । নিঃস্ব প্ৰান্তৰেৰ পটভূমিতে পুষ্পিত পলাশ
গাছটাকে সামান্য এতটুকু সাধুনাৰ মতো দেখাতেছে ।

এমনি একটা দিনে কলিকাতা হইতে মায়েৰ জনা সামান্য কিছু জিনিস কিনিয়া
গ্ৰামেৰ পথে ইটিয়া মনসাপোতায় ফিৰিয়াছিল । দৰজা খুলিয়া তাহাকে
দেখিয়া মা কি পৰীট নাই হইয়াছিল । মাকে জড়াইয়া আদৰ কৰিলে কেমন
সুন্দৰ গন্ধ পাওয়া যাইত মায়েৰ গায়ে ।

মাকে মনে পড়িতেছে । ছোট বেলায় মা তাহাকে পাঠশালায় বাহিবাব জন্ম
খুব সকালে ঘুম হইতে তুলিয়া দিত, নিজেৰ হাতে সাঙাইয়া হাতে বঠি দিয়া
বলিত—যাও বাবা, পাঠশালায় যাও । তুমি লেখপড়া শিখে মানুহ হলে
বংশেৰ নাম উজ্জল হবে ।

সে কি মানুহ হইতে পাবিয়াছে ? অপবা মা কি অন্য কিছু চাহিয়াছিল, বা সে
হইতে পাবে নাই ?

একদিন রাগ কৰিয়া সে মায়েৰ দেওয়া তালৈৰ বড়া ছুঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া
দিয়াছিল—অনেকদিন আগেৰ ঘটনাটো । মায়েৰ কত কণ্ঠে জোগাড় কৰা
জিনিসে ঠৈয়াবী ।

এসব মনে কৰিয়া তাহাৰ চোখে জল আসিতেছে কেন ? আশ্চৰ্য । ইহা কি
কাঁদিবাৰ সময় হইল ? এমন সুন্দৰ পৰিবেশে ? কিছু দূৰে নদীৰ বাকেৰ মুখ-
টায় বালিৰ উপৰ তাজতৰঙ্গ থৰ থৰ কৰিয়া কাঁপিতেছে, আকাশে সূৰ্য, ধূ ধূ
প্ৰান্তৰ—সব মিলাইয়া স্বৰলিপিৰ তীব্ৰ মাধ্যমেৰ মত ।

একটা ঢিল তুলিয়া জোৰে নদীৰ দিকে ছুঁড়িল, বেশ জোৰে । সঙ্গে সঙ্গে
অনুভব কৰিল বৃকেৰ বাঁদিকে যন্ত্ৰণা স্তব্ধ হইয়াছে । সামনে হইতে জোৰে ধাক্কা
মাৰিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবে বৃকে হাত দিয়া কিছুটা ছিটকাইয়া পেছনে
সৰিয়া আসিল । মুহূৰ্তে মাথা কি বকম খালি হইয়া গেল । সূৰ্যটো যেন এক-
বাৰ কাছে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আৰাৰ দূৰে সৰিয়া যাইতেছে ।

অপু অনুভব কৰিল, পা দুইটা তাহাকে আঁৰ দাঁড় কৰাইয়া রাখিতে পাৰিতেছে
না । পাথৰটোৰ গায়ে হেলান দিয়া সে বাটিতে বসিয়া পড়িল । বাঘাটো

বাড়িতেছে—খাস লইতে কষ্ট হইতেছে। খুব গভীর ঘুম আসিবার আগে যেমন হয়, শরীরে ভেমনি অবসাদের ভাব। দেহে-মনে অবসাদ মাকডসার জালের মত জড়াইয়াছে। সে কি এইখানে একটু ঘুমাইবে ? বাবা বাণী আসিয়া বলিতেছে—ওগা কই ? তার জন্তে শাড়ী কিনে এনেছি যে—

বাবা পলির ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির করিতেছে। হঠাৎ অপুর মনে হইল—সত্যিই তো, দিদি কই ? তাহাকে সবাই কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। দিদিকে খুজিও হইবে।

ঘুম-ঘুম-ঘুম। এক বাহিয়া চিনচিনে বাপাটা উপরে উঠিতেছে। যন্ত্রণা ততটা আর বোপ হইতেছে না, তাহার খুব ঘুম পাইয়াছে। কানের কাছে তীক্ষ্ণদ্বরে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল। নিশ্চিন্দপূর্বে সেই পাখীটা যেমন ডাকিত। সামনের দি বাপটির ভিতর কোথায় যেন বাজনা বাজিতেছে : গম্ভীরনাদ বীণাব উদ্যাব তাবে ছালাপের মত। তারের উপর এক-একটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সে একটু একটু ঘুমাইয়া পড়িতেছে। হাত-পায়ের সমস্ত শক্তি চলিয়া গিয়াছে। আর সে চলিতে পারিবে না, সমস্ত জীবনে অনেক ঘোণা হইয়াছে—এইবার সে এক বিশ্রাম করিয়া লইবে। এইখানেই বিশ্রাম করিবে।

এ্যাশবার্টন সাহেব বলিতেছে—East opened my eyes, Roy. It really enthralls me, this call of the mysterious—this mystic span of the river—

এ্যাশবার্টনকে দেখিয়া সে উঠিবার চেষ্টা করিল। সে শুইবে না। সে অনড হইয়া থাকিবে—না, কিছুতেই না। কিন্তু শবীর তাহার কথা মান্য করিতেছে না। তাহাকে কেহ উঠাইয়া দিতেছে না কেন ?

ঐ বড় খবটাব আড়ালে সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে সে চিনিতে পারে নাই। এইবার সে বাহির হইয়া সামনে আসিয়াছে।

লীলা !

—পোর্তোপ্লাতায় যাবে না অর্পূব ? তুমি যে বলেছিলে, সোনা উদ্ধার করে আনবে সমুদ্রের তলা থেকে ?

হ্যাঁ, খাইতে হইবে বৈকি। অতল সমুদ্রের নীচে তাহার জন্য যে রত্ন অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাদের সে সূর্যের আলোয় বাহির করিয়া আনিবে।

থোকা কোথায় গেল, থোকা ? থোকা, আমার পাশে আয়—এইখানটায়।

কোল ঘেসে বোস, উঠে যাসনে কোথাও। আমি তোকে কোলকাতা থেকে সেই বইটা এনে দেবো এবার। উঠে যাস নে বাবা আমার—তাকে না দেখে আমি যে মোটে থাকতে পারি না।

তাহার মা বলিতেছে—ঘুমো অপু, ঘুমো। আহা রে, বড্ড খাটুনি গেছে-তোর—

ঘুমাইয়া পড়িয়ার আগে অপু জোর করিয়া একবার তাকাইল দেখিল, লাল •

ফুল ফুটিয়া-থাকা পলাশ গাছটার পাশ দিয়া একটা পথ সমস্ত শ্রান্তরকে দ্বিধা-
বিভক্ত করিয়া দূরে দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

বৃন্দ সদাঁর আব তাব ছেলে সূৰ্ণবেখাব পাবে কি কাজে আসিয়াছিল।
অপুকে বৃন্দ চিনিত, বেড়াইতে বাহির হইয়া অপু বহুদিন তাহার বাড়ীতে ওল
চাইয়া খাইয়াছে। বৃন্দ দখিল চালু পাডেব উপর একখণ্ড পাথরে হেলান
দিয়া বাবু ঘুমাইয়া বহিয়াছে। পাশেই চটিজোড়া খোলা হইয়াছে—পাথরের
উপর সব কক্ষি।

ছেলেকে দাঁড় কবাইয়া বৃন্দই প্রথম লোক ডাকিয়া আনে।

বাড়ীতে শহবেব লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বিন্দাথ সে মণ্ড
অসিদ্ধ ছেন। তখন আর কিছু করিবার ছিল না। বন্দনার বিষয়দ্বয়ে
বলিলেন—বাস্তবশায়কে এইজনাই বলে ছলান। প্রথম ময় কতে, ওলপেন
না সে কথা—

অপু অনেক ভক্ত আসিষছিল। জোগাড় পক'য়া শহা' দহ কা'বার
বাবুতা করণ। অনেক মানুষ, অনেক গেলমানি—তাহার মতে অপু ন
চুণ বদিয়া শুইয়া থাকে। মুখের খয়া হমন্তো স্পষ্ট পুনিতে। লম্বা
সময়ে তপু বেশী কষ্ট পায় নাই। দুপ একটা পুস্তক ভাব মাথানো।

পাড়াব লোকের হৈমন্ত্য বাপের-বাতা কোলাস করিয়াছে। ঘটনাগুলি
হৈমন্ত্য গোথের সামনে ভাষাবাড়া মত ঘটে গাইতোহল। সে নেন
ইহার সঙ্গে ভাঙতেন, সে শুধু দশ কমাত্র।

দাহ শয়ন করিয়া শেষঘাট্রে সবাতা ফল খাটের পায়ের কাছে হৈমন্ত্য
একভাবে বসিয়া আছে, একুও নড়ে নাই। দিন তাহার চোখে সামনেই
রাত্রি হইয়াছিল, আবার রাত্রিও ভোর হইতে চলিল।

সবাই অবাক হইল কাজলকে দেখিয়া। গাশানে সে মুখাণি করিয়াছে অত্যন্ত
শান্তভাবে। ফিরিয়া সেই যে জানলায় দাঁড়াইল, পবেব দিন ছপুর পর্যন্ত
আর সেখান হইতে নড়িল না। পাশের বাড়ীর ওভারসিয়ার বাবু স্বী আসিয়া
সারারাত হৈমন্ত্যের কাছে বসিয়াছিলেন। তিনি পর্যন্ত কাজলের নিস্পৃহতা
দেখিয়া অবাক হইলেন।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইয়া সব যেন বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। উনানে আগুন
নাই, ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বলা হয় নাই। পরের দিন সন্ধ্যা হইয়া গেল,
তখনও কেহ ঘরে আলো জালিল না। ওভারসিয়ার বাবুর স্বী সমস্ত রাত
জাগিয়া ক্লান্ত ছিলেন, বিশ্রাম করিতে তিনি বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। আবার
সকালে আসিবেন বলিয়াছেন। কিছু ফল ও দুধ আনিয়া তিনি বারবার

খাইতে বসিয়া গিয়াছেন। ফলের থালা এবং তুখের ঘটি এখনও জলচৌকি-টার উপর পড়িয়া আছে—কেহ তাহাতে হাত দেয় নাই।

দুপুরে কাজল অপুর লেখার ঘবে গিয়া বসিল। সমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটা বড় খামের ভিতর টেবিলের উপর রাখা। টেবিলের এককোণে বাবার চুল আঁচড়াইবার খশোবের-চিকনিখানা, তাহাতে বাবার কয়েকটা চুল এখনও জড়াইয়া আছে। ঘাডেব কাছে ময়লা হইয়া-খাওয়া দুইটা জামা দেয়ালের পেন্বেকে ঝুলিতেছে। এসব দেখিতে দেখিতে কাজল জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইল। বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সূর্যটা কেমন করুণাহীন—কাহারও তুখের সমবাধী নহে, সমস্ত দিন কেবল ঘূর্ণিতেছে। একটা মাকড়সা দুই দেয়ালের কোণে ভাল বুনিতেছে অথও মনোযোগে।

অনেক বাত্রি পর্য্যন্ত কাজল টেবিলে এবং হৈমন্তী খাটের পায়ের কাছে বসিয়া বহিল। একরকম শব্দ করিয়া বাঁচী-একপ্রেস জামসেদপুরের দিকে রওনা হইয়া গেল। সমস্ত দিন গবমেব পব একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিতেছে। ঘবে আলো নাই, অন্ধকাবের ভিতর সমস্ত বাড়ীর শব্দতাটা হৈমন্তীর কাছে বেশী কবিয়া ফুটিল।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ। একটা পবিত্রিত গলাব দর শোনা গেল। মানুষটি বাবান্দায় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ওভারসিয়ার বাবুব গলা—বাঁচ একসপ্রেসেই এলেন বুঝি ?

একটা দেশলাইয়ের কাঠি জলিয়া উঠিল অন্ধকাবে। সেই আলোয় কে পথ দেখিয়া আসিতেছে। ঘবের মধ্যে আবাব একটা কাঠি জলিতে হৈমন্তী বিজ-জিব সহিত মুখ ফিরাইল। কে আসিয়া তাহার মাথায় হাত বাখিয়া বলিল—ভয় নেহ মা, আম এসেছি। বাড়ি অন্ধকাব কেন ?

সুপতিবাবু আদিয়াছেন

মালতীনগবে খাইবাব আয়োজন হইতে লাগিল। সুপতিবাবু হৈমন্তী ও কাজলকে মালতীনগবে লইয়া যাইবেন। তিনিমাত্র প্রায় সবই এখানে রাখিয়া যাওয়া হইতেছে, লইয়া যাওয়া খুব কষ্টকর এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। দুই-চাবখানা কাপড সঙ্গে যাইতেছে মাত্র।

সুপতিবাবু দিন পাঁচেক মোপাহাড়ী থাকিলেন। মেয়ে সত্ত শোক পাইয়াছে, একটু সামলইয়া নিক। বিকালের দিকে সতবন্ধি পতিয়া তিনি উঠানে বসেন। অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়া থাকেন কোন একদিকে। কিছু দিন আগে এইখানে বসিয়াই অপূব সহিত গল্প হইয়াছিল। অপূব বলিয়াছিল—আম্মার বিনাশ নেই বাবা। আম্মা একটা শক্তি। একটা ভীষণ শক্তি—শক্তির বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে মাত্র।

পরলোকে বিশ্বাসী সুপতিবাবু চাবদিকে তাকাইয়া দেখেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইতেছে। তাঁহার মনে হয়, এই মাটি-জল-বাতাসের ভিতর, ঐ দূরের নক্ষত্রটার ভিতর অপর আম্মা রূপান্তরিত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

সারাদিন খরিয়া মৌপাহাড়ী ছাডিয়া যাওয়ার ভোড়ভোড়—অথচ সবাই জানে ভোড়ভোড় কবিবার কিছু নাই। সঙ্গে বেশী জিনিসপত্র যাইতেছে না। মৌপাহাড়ীর সহিত এতদিনে সে সম্পর্কটা বহু সুখস্মৃতির সঙ্গে জড়িত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, আসল কষ্ট সেটাকে হিন্ন কবা।

বাত্রি বিমঝিম কবিতে থাকে। তখনও আলোকবিন্দুহীন অন্ধকারেব ভিতর হৈমন্তী কাজলের পাশে শুইয়া চুপ কবিয়া তাকাইয়া থাকে। দূবের ধানায় ঘন্টা বাজিয়া যায়। অনেকক্ষণ পবেও হৈমন্তী বুঝিতে পাবে, কাজল জাগিয়া আছে।

পর পব কয়েক রাত জাগিয়া চতুর্থ দিন শেষ-প্রান্ত্রে হৈমন্তী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমাইয়া সে একটা অস্বপ্ন দেখিল। দেখিল, সে বড় স্টিলের ট্রাকটা খুলিয়া তাব সামনে দাঁড়াইয়া। কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হইতেছে। পাশেই বই-এর আলমারি। অপু হাসিয়া বলিতেছে—শুণু ভামাকাপড় নিলেই কি চলবে? আমি তো বই ছাড়া মোটে থাকতে পারি নে—

অপু তাহাকে বই আগাইয়া দিতেছে, সে সাজাইয়া লইতেছে ট্রাকের ভিতর। মন ভগা বেড়াইতে যাইবার আনন্দ। যেন সব ঠিক আছে। যেন কিছুই বদলায় নাই।

পবেব দিন ঘুম হইতে উঠিয়া হৈমন্তী সুবপতিবাবুৰ কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—বাবা।

—কি মা?

—এখান থেকে আব কিছু নয়—শুণু বইগুলো নিয়ে যাবো।

সুবপতি হৈমন্তীর দিকে তাকালেন। কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া মুখ নিচু করিয়া বলিলেন—তাই হবে মা। একটা বসও ফেলে যাবো না।

কয়েকটা প্যাকিংবাল্লে বইগুলি গুটি কবিয়া সুবপতি মালতীনগরের ঠিকানায বেলে বুক করিয়া দিলেন। খুঁটাবার দিন সকালে কাজল একবার সুবর্ণেশ্বার ধারে গেল। বাবা যে পায়টান উপব বসিয়া লিখিত, সেটা একইভাবে পড়িয়া আছে। কাজলের অবাক লাগিল। যখন কাজলও পৃথিবীতে থাকিবে না, তখনও এটা এইভাবে এখানে পড়িয়া থাকিবে। এই নদী, এই চর, এই প্রান্তর—সবই এক একম থাকিবে। আকাশটা নীল থাকিবে। কেবল সে থাকিবে না। যেমন এখন বাবা নাই।

কি-একটা পায়ী মাথা সামনে-পেছনে নাড়াইতে নাড়াইতে ক্রমশঃ চর বাহিয়া নদীর ভিতরে যাইতেছে। ওপারে বাদিকে টিলার মাথায় সূঁচটা যেন আটকা পড়িয়াছে। বাবা এই সময়ে অনেকদিন এইখানে বসিয়া লিখিত। সে কতদিন আসিয়া বাবাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। একবার তাহার মনে হইল, পেছন করিয়া তাকাইলেই বাবা একটা বোপের আঁড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

—অমন লুকিয়ে ছিলে কেন বাবা ?

অপু হাসিয়া বলিবে—দেখছিলাম, আমায় না দেখতে পেয়ে তুই ভয় পাস কি না।

এমন কতদিন ঘটিয়াছে। বাবা তাহার সহিত ছেলেমানুষের মত খেলা করিত। লুকোচুরি-খেলা শেষ হইলে খাতাপত্র গুটাইয়া তাহার বাড়ির পথ ধরিত।

এবার বাবা বড় কঠিন ভায়গায় লুকাইয়াছে। শাস কেহ তাহাকে পাইতেছে না। আর তাহাকে কোনদিন কেহ খুঁড়িয়া বাহির করিতে পারিবে না। খেলিতে খেলিতে খেলাটা হঠাৎ যেন ভাঙা একমের হইয়া গিয়াছে।

হৈমন্তী জানলা খুলিয়া দিতেই প্রথম পড়িল নজবে ইউক্যালিপটাস গাছ দুইটা। সকালেও বাতাস তাহাদের পাতায় পাতায় সামান্য কাঁপন দবাইয়াছে। এই গাছ দুইটা ফাঁক দিয়াই সেদিন যাত্রা চাঁদ দাবে দারে দিগন্তের দিকে নামিতেছিল।

—এবার চল, আমাব উপন্যাসটা শেষ হলে হরিদ্রাব ঘূবে আসি।

—সত্যি বলছ ?

—এমন ভাবে বলছ যেন কোনদিন কোথাও নিয়ে যাই নি। তৈরী হও, এবাব বেবিয়ে পড়ব।

কথা রাখে নাই। একাই সে লম্বা পাড়ি জমাইয়াছে। বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। বিকালের গাড়িতে চলিয়া যাইতে হইবে। বাড়ীটার, ছোট শহরটার প্রতি ধূলকণায় তাহার স্মৃতি রহিল। সদর-দরজায় তালা বুলাইয়া খাইবাব পথে বাড়ীর ভিতরে সে থাকিবে একা। তখন হৈমন্তী থাকিবে না। সেই পরিচিত গলা শোনা যাইবে না—ভাত নেমেছে ? না খাইয়ে আজ মানবার মতলব কেঁচ নাকি ?

দিন কাটিয়া যাইবে, আমাবাপত্রে ধূলা জমিবে। মাস এবং বৎসর আপন খেলালে কাটিতেই থাকিবে। একটা অর্থহীন অস্তিত্ব হৈমন্তীকে সারা জীবন ক্লান্ত করিতে করিতে এক নিরালস্য অবস্থায় আনিয়া দিবে।

সতাই কি অর্থহীন অস্তিত্ব ?

একটা কাজ অন্ততঃ তাহার এখনও রহিয়াছে। অপু শুরু করিয়াছিল, তাহাকে শেষ করিতে হইবে। অনুচ্চাবিত প্রতিজ্ঞায় সে অপূর কাছে সত্যবদ্ধ।

ঘরের দরজায় শব্দ হইল, কাজল ফিরিয়াছে।

হৈমন্তী বলিল—তোর পড়াভ্রমের বইগুলো বেঁধে নিয়েছিস বুড়ো ?

দরজায় তালা লাগানো হইয়া গেল। সুরপতি তালাটা ভাল করিয়া টানিয়া দেখিলেন, ঠিকমত লাগিয়াছে কিনা। ওভারসিয়ারবাবুকে বলা রহিল, এদিকে একটু নজর রাখিবার জন্য।

কাজল বাবান্দার রেলিংয়ে হাত দিয়া গভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না, এখনই এসব ছাড়িয়া অনেকদিনের জন্য—হয়তো বা চিরদিনের জন্য, চলিয়া যাইতে হইবে। যাইতেই হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদেব টুন এতক্ষণে জামসেদপুর ছাড়াইয়াছে।

হৈমন্তীর বুকেব ভিতবে কি-একটা আবেগ কোন বাশা না মানিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। দবজা বন্ধ না হওয়া অবধি সে বাবান্দার দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে শুইবাব-ঘরের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পটটার দিকে চাহিয়াছিল। দরজার পাশা বন্ধ হইতে দৃশ্যটা আঁড়াল হইয়া গেল। কাজলেব হাত দিয়া চলিতে শুরু কাঁদয়াই হৈমন্তীর চোখেব বাঁধ ভাঙিল, এতক্ষণে বিচ্ছেদটা যেন সম্পূর্ণ হইল। মৌ-পাহাড়ীর মাটি হইতে পা তুলিয়া লইবাব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্পদ মিটিয়া যাইবে।

কয়েকটা স্তকনো পাতা বাবান্দার উপর দিয়া খড় খড় শব্দে সরিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠানে না মতে নামিতে কাজল অবাক হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। ঠিক মনে হইয়াছিল, কাহার পায়ের শব্দ।

উঁচু নিচু লাল মাটির পথে বিজ্ঞা চলিল স্টেশনের দিকে। সেখানে তাহাদেব বিদায় দিবার জন্য অনেকে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহাবা ভিড় কাঁদয়া আসিল। এই কয়েক বৎসরে যাহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, যাহাবা অপূর লেখার ভরু—সবাই আসিয়াছিল। এত কলবের মধ্যেও হৈমন্তী বাব-বাব স্টেশনের লাল বাস্তাটার দিকে তাকাইতেছিল। কি-একটা যেন ফেলিয়া আসিয়াছে।

কাজল

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মামাব ডোতে আসিবার আগে কাজলেব মনে দ্বিধাব ভাব ছিল। কিন্তু কয়েক-মাস কাটিবার পর সে অনুভব করিল, এ বাড়ীর সহিত তাহার মান সক্তা বেশ বাপ খাইয়াছে। মামাবাডোতে সবসময়ই একটা সাহিত্য ও শিল্পের হাওয়া বহিতেছে। সেটাই তাহাকে ক্রমশঃ সুস্থ করিয়া তুলিল। প্রতাপ একটি গ্রন্থকোঠ। তাহার সহিত কাজলেব চমৎকাব সময় কাটে। দিদিমা তাহাকে খুব ভালবাসেন, তাঁব সম্বন্ধে কাজলেব অধিস্ত ২ দিনেই চলিয়া গিয়াছিল। সবাপেক্ষা বেশী গিয়াছে কিন্তু দাখুর সঙ্গে।

সুপপতি কাজলকে ছাড়া একটুও থাকিতে পাবেন না। কাজলেব জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখেন নাই, নিজেই পড়ান। ধার্মিক মানুষ তিনি, কাজলেব চারিত্রিক শিক্ষার জন্য তাহাকে শিষ্য বানাওয়া লইলেন। সন্ধ্যায় ঘরের বাতি নিভাইয়া দাখুর পাশে বসিয়া কাজলকে ধ্যান করিতে হয়। সুপপতি তাহাকে বলিয়াছেন মনঃযোগ ব্যতীত জীবনে সিদ্ধি আসে না, সন্ধ্যায় কাজল তাই মনঃযোগ অভ্যাস করে। দুইগাছা রুদ্ধাক্ষের মালা কেনা হইয়াছে—

তাহার একটা সুবর্ণিত নিজের গলায় দেন, অন্যটা ধ্যান করিবার সময় কাজল পরে।

এই তিন-চাব বৎসরে মালতীনগর আবও অনেক উন্নত হইয়াছে। নতুন দোকানপাট বসিয়াছে, বাস্তাব গাড়ী-ঘোড়াব ভিড় বাড়িয়াছে, বাড়ীঘর অনেক তৈয়ারী হইয়াছে। কলিকাতা খুব দূরে নহে, কাজেই বাবসাপত্রের বেশ প্রসার হইতেছে।

মালতীনগরের গোলমাল ছাড়িয়া মাইল দুয়েক গেলে কয়েকটি সুন্দর গ্রাম আছে। পিচের রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া কিছুটা দূরে চমৎকার বাঁশবন, পুকুর, কলসী-কাঁখে গ্রামবধূ দেখা যায়। ধূলাবালি মানুষজন বিবর্ত হইয়া কাজল মাঝে মাঝে হাঁটিয়া গ্রামের দিকে যায়। নিশ্চিন্দপুরে যাওয়া হইয়া ওঠে না, এটি ভাবেই কাজল প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

এক ভূটন দিনে কাজল দুপুরে বসিয়া পড়িতেছে, এমন সময় দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া দেখে গোঁফদাড়িওয়ালা এক বলিষ্ঠদেহ লোক দাঁড়াইয়া, কাঁধে কাপড়ের ঝুলি, পায়ে সস্তাদামের চটি। কাজল প্রথমে চিনিতে পারে নাই। তারপরে সে অবাক হইয়া বলিল—মামা?

প্রণব ভেলে গিয়াছিল। পুলিশ সন্দেহ করিয়াছিল, বিপ্লবীদের সহিত তাহার যোগাযোগ আছে। তিন বৎসর আগে সে গ্রেপ্তার হয়। ভেলে বসিয়াই সে অপুর মৃত্যু-সংবাদ খবরের কাগজে পড়িয়াছে। সব কাগজেই সাহিত্যিক অপবদমান নামের মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হইয়াছিল। নিশ্চিন্দপুরে গিয়া রাণীর নিকট হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া প্রণব এখানে আসিয়াছে।

দৌড়াইয়া কাজল হৈমন্তীকে ডাকিয়া আনিল। হৈমন্তী প্রণবকে কখনও দেখে নাই। ঝুলিটা নামাইয়া প্রণব বসিতে বসিতে বলিল—এ পৃথিবীতে অপূব অমাব সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল। তা ছাড়া আবও একটা পণ্ডিত আমার আছে—আমি কাজলের মামা।

বিকালে জলখাবার খাইয়া প্রণব কাজলের বইপত্র দেখিতেছিল। কাজলের আলমারীতে বেশ কিছু বই জমিয়াছে। কিছু অপু কিনিয়া দিয়াছিল, কিছু মালতীনগরে আসিবার পূর্বে কাজল প্রতাপকে দিয়া কেনাইয়াছে। কাজল এখন বেশ ইংরাজী পড়িতে পারে।

বইগুলি নাড়িতে নাড়িতে প্রণব বলিল—অনেক পড়ে ফেলেছিস খোকা। তুই আর সেই বাচ্চা খোকন নই।

সত্যিই, অবাক হইয়াছিল সে। বয়সের তুলনায় কাজল বেশী পড়াশুনা করিতেছে। তার বয়সী অন্য ছেলে এসব বইয়ের নামও শোনে নাই।

—তুই বাপের ধারা পেয়েছিস। বাব্বাঃ, অপু তো কলেজ-লাইব্রেরী প্রায় শেষ করে ফেলেছিল।

—আমিও রিপন কলেজে পড়ব, পুলুমামা।

প্রণব নিজের ঘন দাড়িতে একবার আঙুল চালাইল।—বেশ তো, তাতে আপত্তি কি? স্কুলে ভাল রেজাল্ট কর—

—আজকে রাত্তিরে তোমাদেব কলেজেব গল্প বলবে?

প্রণব হাসিল।—আমাকে আজকেই যে চলে যেতে হবে খোকন।

কাজলের মুখ শুকনো হইয়া গেল।—সে কথা বললে শুনচি নে, তোমাকে থাকতেই হবে কদিন।

—আজকেব রাতটা না হয় থাকবো, কিন্তু তাব বেশী তো থাকবার উপায় নেই খোকা।

—কেন?

প্রণব কাপড়ের খুলিটা দেখাইয়া বলিল—কাবণ এইটে।

—কি হচ্ছে ওতে?

—ওতে একটা যাদুকাঠি আছে, মানুষেব দুঃখ দূর কবাব।

কাজল হাবছা ভাবে বাপাবটা বুকিল।—এটা নিয়ে কি কববে তুমি?

—আমি কিছু কবব না। খোলাটা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আমি ছুটি।

সন্ধ্যাবেলা অনেক গল্প শুকব হইল। প্রতাপ, হৈমন্তী, কাজল, সবু সবাই বসিয়া প্রণবেব গল্প শুনিল। জেলের নৃশংসতাপ কথা শুনিয়া সবু আর হৈমন্তী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কাজল প্রণবেব গা ঘেঁসিয়া বসিল।

—পুলুমামা, বলেছিলে তোমাদেব কলেজ-জীবনেব গল্প কববে।

—সে কি একদিনে হয় বে। কি মজাই না ক'লাম হামশ। গোর বাবা আব আমি ছিলাম পটো পাগল। তবে আমি চেষ্টা ও একটু উচ্চ মানেব পাগল ছিল। একবার তো মারবাতে আমাদেব পুলিশে তাড়া করেছিল—

—কেন?

—পার্কের বসে মাতালের অভিনয় করছিলুম থিয়েটার দেখে বেশি। তাড়া কবতেই দুজনে বেলিং টপকে দৌড়।

সবু বলিল—আপনি মানুষটিও দেখছি খুব শাস্তিশিষ্ট নন।

প্রণব কৌতুক বোপ করিয়া দাড়িতে ঘন ঘন আঙুল চালাইল তাবপর বলিল

—শাস্তি যে নই তা ভারত সরকারও জানে। দৌবায়া ক'লাম অভ্যাস একেবারে রক্তের ভেতবে মিশে গেছে।

পরের দিন সকালে প্রণব বিদায় লইল। যাইবার সময় হৈমন্তীকে বলিল

—আপনাকে সান্থনা দেবো না। অপু আমার জীবনে একটা অংশ জুড়ে ছিল। সে চলে যাওয়ার নিজেই অনুভব করছি, এব সান্থনা হয় না। তবে আপনি তার সঙ্গে ছিলেন, ভরসা করি শোক সহ্য করবাব ক্ষমতা আপনি তার কাছ থেকে পেয়েছেন।

খামিয়া বার দুই দাড়িতে হাত বুলাইয়া পরে কাজলকে দেখাইয়া বলিল—ওকে দেখবেন। ওর চোখে ওর বাবার আঙুল রয়েছে।

রাত্রে কাজল ছাদে একটা যাদুর পাতিয়া শোয়, যতক্ষণ-না বীচে হইতে

খাওয়ার ডাক আসে। আকাশে মেঘ না থাকিলে ছায়াপথটা দেখা যায়— আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিরাট সাদা নদীর মত দুই দিগন্তকে যুক্ত করিতেছে। বাবাব জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইগুলি সে প্রায়ই নাড়া-চাড়া করিয়া দেখে, তাই আকাশের আকর্ষণ তার কাছে অসীম। নক্ষত্রে গ্রহে নীহারিকায় একটা বহুশ শূকাইয়া আছে, সে ছাদে শুইয়া বহুশের আমেজটা উপভোগ করে। বই দেখিয়া দেখিয়া সে অনেক রাশি এবং নক্ষত্র মণ্ডলী চিনিয়াছে।

একদিন হঠাৎ তাহার গায়ে কাটা দিয়া উঠিয়াছিল। কোথায় অনন্ত শূণ্যে ধূমকেতু গ্রহ-উগ্রহ বিশাল নীহারিকা অনন্তকাল হইতে ভ্রমণ করিতেছে, আর কোণায় ক্ষুদ্র এক গ্রহ পৃথিবীর অতিদূর শহব মালতীনগরে সে ছাতে শুইয়া তাহাদের কথা ভাবিতেছে। বিশ্বের বিশালত্বের নিকট তাহার তাত্পর্য-হীনতা একেবারে স্পষ্ট হইয়া গেল।

পূবাঞ্জন সেই ক্ষুণ্ণেই সে আবার ভর্তি হইয়াছে। পড়াশুনায় সে সাধারণ ছাত্রদের অংশে অনেক আগাইয়া আছে বলিয়া কয়েকজন শিক্ষক তাহাকে স্নেহ করেন। 'ক' বর্গের ভাগই বিকল্প। পরীক্ষার খাতায় বা হোম-সাস্ট্রের খাতায় কাজে লেখা উত্তর তাহাদের নিকট অকালপক্বতা বলিয়া মনে হয়। ছুটির দিনে পুণে সবাই দুমাইয়া গিলে বাবাব বই যে আলমারিতে রাখা আছে, সেটা খুলিয়া বই নামাইয়া সে পড়ে। অনেক বই-এর বিষয়বস্তু বুঝিতে পারে না, কিন্তু সব বই সে পড়িয়া চাট্টিয়া দেবে। শুধুমাত্র বই নাড়াচাড়া করিয়া নয়, সে এমনহাওয়ায় ইমার্শ্যুয়েল কান্ট, স্পিনোজা প্রভৃতির নাম মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। পূর্ববেলা কোথাও কোনো শব্দ নাট, বাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া চলার শব্দ, বাড়াটা নৈমিত্যগত। সময়টা পড়াশুনা করিবার অত্যন্ত উপযুক্ত। বই খুলিয়া কোলের উপর রাখিয়া পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে। পূর্ববেলায় নিজের মত সহিত তাহার মনটা কোথা হইয়া আসে। বিভিন্ন বিষয়ের বই একটা হুতুত জগৎকে হাতের কাছে আনিয়া দেয়—নীহারিকার জগৎ, প্রাণীজগৎ, বিভিন্ন দেশের বিচিত্র উদ্ভেদের জগৎ। ছোটবেলার বাবা মুখে মুখে তাহাকে বিবর্তনবাদ বোঝাইত, এখন সে আলমারি হইতে বাবাব নাম সহ-কথা অবিজ্ঞান অব দি স্পিদিজ—বইটা নামাইয়া পড়িবার চেষ্টা করে। দাঁত ফুটাইতে পারে না, কিন্তু বইখানা খুব আকর্ষণ করে। চারিদিকে যেন শীতকালের শেষ বেলার রৌদ্রের মত একটা সুদূর হাতছানি—অজানার আহ্বান।

সেদিন আকাশ দেখিয়া মনে হইতেছিল রুষ্টি নামিবে। কিন্তু কাজলের মনটা সকাল হইতেই কি কারণে বেশ প্রসন্ন ছিল। রুষ্টির আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া সে বিকালে বেড়াইতে বাহির হইল।

চারিদিকে যেন সজ্জার ছায়া। মেঘ খুব নিচে নামিয়াছে। যে কোন সময়ে

বুঝি আসিতে পারে। আকাশে একটাও পাখী মাট, রাস্তায় লোক কম।
গাছের ঘন সবুজ পাতা নীল মেঘের পটভূমিতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।
শুষ্ক একবার মেঘ ডাকিয়া উঠিল।

রাস্তার ধারে ঘন ঘাসের মধ্যে অল্প ঘাসফুল ফুটিয়া আছে। কাড়লের ঠোঁট
হইল, ঘাসে একবার হাত লাগাইয়া দেখে। বাগা ছাড়া নিচু হইয়া সে
ঘাসের উপর হাত দিল। সুন্দর কার্পেটের মত পুরু হইয়া ঘাস জড়িয়াছে।
নরম, সবুজ, সজীব। অসংখ্য ঘাসফুল কালো আকাশে নজর দেয় মত হুড়িয়া
ফুটিয়াছে। কাড়ল লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পাতকটি ফুলের তিন পাশে তিনটি
করিয়া ঘাসের শীষ বাহির হইয়াছে। কে বাও নিম্ন ৩৩ হয় নাট। একটা
করিয়া সাদা ফুল, পাশ দিয়া শিউরিয়া করিয়া ঘাসের শীষ।

একটা ঘাসফুল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া কাড়লের মনে হইল কি অত্যন্ত নিয়ম।
কিছুতেই একটু এদিক ওদিক হয় না। এই ছোট সমান্তরালটাও দেই
নিয়মের শিকল দিয়া আঁকিয়া দিয়া। নোভাফিকাময় বিশ্বের কত ক্ষুদ্র
নাগরিক, তবু নিজের দ্বিধা সোপানে বসে একটা স্থান অধিকার করিয়া
আছে। কয়েকটা ঘাসফুল হাতে করিয়া লইল কাড়ল যাকে দওয়ার জন্য।
আর একটু হুড়িয়া সে বাগী গিরিবে।

কয়েক পা হুড়িয়াই সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। সামনে বেললাইন। দাঁত
সেই ঘাস-ছাওয়া ঢালু ভাঙ্গাটা, যেখানে অনেকদিন আগে বাবার সঙ্গে
বেড়াইতে আসিয়া মৃত গুরু পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল।

বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ওয় পাওয়াছিল বলিয়াই বাবা
সেদিন সন্নেহে হাত পড়িয়া বাগী লক্ষ্য গিয়াছিল, আজ কেহ নাই।

একটা ভয়েব ডেউ তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হনহন করিয়া
হুড়িয়া প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে হেমন্তের কাছে পৌঁছিয়া মুঠা খুলিয়া বলিল
—এই ছাখো মা তোমার জন্যে কি এনেছি।

কাড়লের মনের গভীরে চন্দ্রপতনের প্রতি একটা বিরাগ আছে। জিনিসটা
সে সমস্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। যে জিনিসটার যেমন
থাকিবার কথা, যেখানে যে জিনিসটা মানায়, সেখানে তাহা না থাকিলে কাড়ল
ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তিও অদ্ভুত। গ্র্যাকবোডে খড়ি দিচ্ছিল
কি—চ করিয়া তীক্ষ্ণ শব্দ হয়—তাহা শুনিতে যেমন গা ওলাইয়া ওঠে,
অনেকটা তেমন। সুন্দর কিছু মধো সামান্যতম ক্রটি, তাহার মতে, সমস্ত
ব্যাপারটাকে একেবারে মাটি করিয়া দেয়। বাবার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া সুন্দর
বিকালবেলাটার রেললাইনের পাশে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া সে চমকাইয়া
উঠিয়াছিল এই কারণেই। তখন কারণটা বুঝিতে পারে নাই, এখন আবার

ভাবে আশ্রয় করিতে পারে। ভগন্তের সমস্ত দিক ব্যাপিয়া এক অতিমানবিক সজ্জিত বাজিতেছে, তাহাব মধ্যে অসুন্দর কিছু মানায় না। সেতার বাজাইতে বাজাতেই ডুল-তারে হাত পড়িয়া যাইবার মত লাগে।

বাৰা তাহাকে একখানি 'ডেভিড কপারফিল্ড' কিনিয়া দিয়াছিল। বইখানি শিশুদের জন্য সংক্ষিপ্ত-কথা। আজ তাহাব উচ্চা হইল, বইখানি নিজনে কোন ভায়গায় বসিয়া পড়িবে। এ ভিনিসটা তাহাব বাবাকে দেখিয়া শেখা। কোন ভাল বই এখন সাপাবন্তঃ বাড়ীর মধ্যে বসিয়া পড়িত না।

দুপুরে তা'ল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সোভা গ্রামের পথ দিল। হাতে বইখানা, পকেটে খানা এই দুই পয়সা—সকালে সুবর্ণিত নিকট হইতে লইয়াছে। দিচের বাপ্তা খোশনে দুইবে এক মহত্বা শহরের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, কাজল দেখানে বাপ্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিল। মাঠে খান বুনিয়াছে—গাছ এখনও খুব লম্বা হয় নাই, কাজলে কোমর বসাব হইবে। মাঠের মাঝখানে আসিয়া চারিদিকে তাকাইলে বাপ্তাটাকে একটা সবুজ বাপ্তা বলিয়া মনে হয়। সমান্য বাপ্তাসেই মাঠ ৭ ডিয়া সবুজের চেউ শুরু হয়, ভাবী ভালো লাগে দেখিতে। একদিক হইতে চেউ শুরু হয়, একেবারে অপর প্রান্তে গিয়া শেষ হয়।

মাঠ পার হইয়া সামনে একটা বড় বাঁশবন পড়ে। দিনের বেলাতেও তাহার শিখরটা অংশে-ওলকাব থাকে। লম্বা শক বাঁশপাতা বুনিয়া বুনিয়া তলার মাটি একেবারে চাকিয়া গিয়াছে। মাঠের উজ্জল আলোক ছাড়িয়া বাঁশবনে ঢুকিলেই মনে হয়, হঠাৎ সন্ধ্যা নামিল। বেশ ঠাণ্ডা ভায়গাটা। বাতাসে বাঁশ গাছ ডুলিয়া আওয়াত হইতেছে কঁ—কঁ—কঁ—চ।

বাঁশের গা হাতে কতকগুলি খোলা টানিয়া ছিঁড়িয়া ল ল তাহার উপর বসিল। বই পু লয়া পড়িতে পড়িতে সে মগ্ন হইয়া যায়। ডেভিডের দুঃখ, ডেভিডের সংগ্রাম করিতে করিতে বড় হওয়া, সব তাহাব মনে দাগ কাটে। মাগুয়ের জন্য লেখকের সমবেদনাব হস্ত তাহাকে ত্রিকেনসের প্রতি আকৃষ্ট করে। অন্য কে এমনভাবে লিখিতে পারিত? অনাদৃত শুদ্ধমুখ ডেভিডকে সে খেন স্পষ্ট দেখিতে পায়।

একটা কাঞ্চ সামনে বাঁকাভাবে মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর হঠাৎ এক টুনটুনি আসিয়া বসিল। কাজল তাকাইয়া দেখিতেছে, পাখীটা বাসায় আছে—ভয় পাইয়া উড়িয়া যাইতেছে না। কঞ্চটা অল্প অল্প হুলিতেছে।

কাজল অনুভব করিল, মনে তাহাব কোনো দুঃখ নাই, গতকাল বেললাইনের ধারে যে ভয়টা হৃৎপিণ্ড চাপিয়া বুনিয়াছিল, তাহাও অদৃশ্য। চারিদিকে শুধু ছায়া-ছায়া আলো, পাখীর ডাক, ঘন বাঁশবনে নিঃস্বুম হৃৎপুরে বাঁশ হুলিবার শব্দ। আর সব-কিছুব সঙ্গে মিলাইয়া রহিয়াছে—ডেভিডের জীবনচিত্র।

বইটা রাখিয়া কাজল চিত হইয়া গেল। গতকাল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, যাঁটি

সামান্য ভিজা। উপরে বাঁশপাতা জড়াজড়ি করিয়া একটা সবুজ চাঁদোয়া বানাইয়াছে, তাহার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখা যায়। মাটি হইতে সোঁদা গন্ধ আসিতেছে। আবার বোংহন্ন রুটি হইবে—একসাব পিঁণ্ডা বুখে ডিম লইয়া ছুটিতেছে। রুটি হইবাব আগে পিঁণ্ডা নিবাপদ আত্রয়ের সন্ধানে যাবে। একটা বাছুর গলায় দাঁড়ি এবং দাঁড়ির প্রান্তে আটকানো খোঁটাসুন্ম তাহার সামনে আসিয়া পড়িল। ছোট্ট বাছুরটা, কাহাদের কে জানে—খোঁটা উপড়াইয়া এখানে হাজির হইয়াছে। বাছুরের গোথের শাস্ত দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিল। সে হাত বাড়াইয়া ডাকিল—আয়, আয়।

নাক উঁচু করিয়া বাতাসে কি শুকিয়া বাছুরটা উল্টা পথ ধাঁড়াল।

কেমন আদামে তাহার সময় কাটিতেছে। কাঙালের একবার দেবশের কথা মনে পড়িল। সে এখনও যৌ হাঠাতে তেমনই বন্ধুদের সহিত অকাণ্ণে হৈ হৈ করিয়া কাটাইতেছে। একটা বই পড়া নাই, দু'দণ্ড একলা বসিয়া চিন্তা করা নাই। এ ছাত্রায় বসিয়া বই হাতে সে চিন্তা করিয়া যে আনন্দ পাইতেছে, সে আনন্দের সন্ধন কি সাব জীবনেও উহা পাইবে।

বিকাল হইয়া আসায় সে বৈশ্বাণ্মন ছাত্রিয়া গ্রামে ভিতরে চলিল। এক জায়গায় একটা পানাপূরব নোপান নাম গাছের হইয়া আছে। পানী সরাইয়া এক কাকশোরা থালা মাটিতেছিল। কাঙালকে দেখিয়া হুবিতপদে তালগাছেব গুঁড়িব তৈয়াবী ঘাট বাহিয়া উপরে, উঠিয়া দৌড়াইল। একটা কুঁড়, বেশ স্বাস্থ্যবান, তাহার দিকে পু পের গুপার হইতে তাকাইয়া আছে। কাঙালের মনে হইল—আমার কান্ধা পেচ দাকলে ঠিক অত বহোত।

কালুব কথা মনে পড়িতে তাহার মন খার হওয়া গেল। কান্ধা মাশা বাইবার পরেও তাহার গলার চেনতা উঠানের কাঠটা বা এলে নুলিত।

সামনে একটা খোড়োচালের বাড়ী। কাঙাল উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—
শুনছেন?

খাটো মুতি পরা একজন বাহির হইয়া আসিল।—কে? কি চাহ?

একট, খাবাব ভাল দেবেন?

লোকটা কালকে আপদ মন্তক দেখিয়া বলিল—আমরা কিছু মুসলমান।

কাঙাল বলিল—হোক গে, আপনি দিন এল।

—ওখানে কেন? এই দাওয়ার এসে বেসো খোকা।

—এই গ্রামে বুনি সবাই মুসলমান?

লোকটা হাসিয়া বলিল—না, না। সবাই নয়, আমরা কয়েক ঘর এটি আর কি?

তাহার পর যেন একটা খুব গোপনীয় কথা হইতেছে, এমনভাবে মুখটা কাঙালের কাছে আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—মুড়ি খাবে দুটো?

ভাব কমিয়া গেল।

একটু পরেই কাঙাল দাওয়ার বসিয়া মুড়ি খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে, নাক

দিয়া সর্দি-ঝরা একটা বাচ্চা পাশে-রাখা ডেভিড কপারফিল্ড খানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে ।

লোকটা বলিল—আব দেবে মুড়ি ?

—না, এই অনেক । তোমাব নাম কি ?

লোকটা নাম বলিবার আগে গামছায় একবার মুখ মুচিয়া লইল, যেন তাহার বিবাহের সঙ্গ হইতেছে ।—আমাব নাম আশেব ছালি ।

ভিতর হইতে একটা বৌ আসিয়া তাহার সামনে একটা বাটি নামাইয়া রাখিল ।

কাঙাল শব্দক হইয়া বলিল—একি । তুমি কে থাকে ?

বৌটি বলিল—খেয়ে নাও । আমাদের গরব তুমি, ছিটোফোঁটাও পানি নেই ।

চিনি দেওয়া আছে, মুড়ি দিয়ে পাও । শুধু-মুখে মুড়ি খেতে নেই ।

কাঙাল আশেবকে বিজ্ঞাসা করিল—এ কে ?

—আমাব বৌ । ওর নাম বাবেষা ।

—এত দশ খেতে হবে ?

আশেব আলি বলিল—উপায় নেই, বাবেষা বিবি যখন দবেছে, তখন আব
—আমাকেই কেবল মোটে আদবযত্ন কবে না ।

বাবেষা অচ্যুত কর্তৃক বলিল—আঃ ।

কাঙাল ভাবিল, বড় হইয়া সে দেখা-মানুষ লইয়া—ইহাদের জীবন লইয়া উপ-
ন্যাস লিখিবে দিকেন্দ্রের মতো ।

এমন সময় গলায়-খোঁটা সেই বাচ্চবটা গুটিগুটি ছাখোবের উঠানে আসিয়া
টুকিল । আশেব বলিল—এ একক্ষণে এসেছে । সাবাদিন ঘুবেবিবে এখন
আসি হলো । আমি গিয়ে দেখি, বুঝলে, খোঁটা উপড়ে কোথায় হাওয়া
হয়েছে । তাৎক্ষণিক আসছে-আসছে কবে এই এলো—

কাঙাল এক চমকে কিছটা দশ খাইয়া বলিল—তোমাদের বাচ্চব ?

বাবেষা হইলে ছাখো কাঙালকে লইয়া তাহার পোষা হাঁস মুবগী ইত্যাদি
দেখাইল । বলিল—কিছুদিন বাদে এসো, তোমাকে একটা হাঁসের বাচ্চা
দেবো ।

বইখানি বগলদ্বারা করিয়া কাঙাল আবাব সেই বাঁশবন পাব হইয়া মাঠে
পড়িল । সুখ দুবিষা গিয়াছে । বাঁশবাগানে ঘন ছায়া । সে যেখানটায়
জুইয়াছিল, সেখানে বাঁশেব খোলাগুলি এখনও পড়িয়া আছে । ছোটবেলায়
নিশ্চিন্দ্রপূর্বে এই সময়টায় অন্ধকার বনের মধ্য দিয়া যাইতে ভয় করিত,
ভাবিলে এখন হাসি পায় । গা-ছমছমে অনুভূতি একটা হয় ঠিকই, তবে তাহা
ভুভব ভয় নহে ।

বাঁশবনটার মাঝখানে সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল । ঘনায়মান অন্ধকারে সে
একা । জনপ্রাণী নাই কোথাও কোনোদিকে । সন্ধ্যা শব্দহীনতায় বাঁশ
জলিবার শব্দটা আরও স্পষ্ট লাগে ।

মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে কাজল দেখিল, দিগন্তে মেঘ জমিয়া
 বিজ্ঞান চমকাইতেছে। মনে অদ্ভুত আনন্দ। আবেগের সহিত সন্ধ্যাটা খুব
 ভালো কাটিয়াছে। অচেনা অজানা মানুষ কত তাড়াতাড়ি আপন হইয়া যায়।
 আবার সে এখানে আসিবে।

মাঠের উপরে সেই সন্ধ্যায় তাহার এক অপূর্ব অশ্রুভূতি হইল। বুঝিল, তাহার
 জীবন অগ্গদের বাঁচবার প্রণালী হইতে একেবারে ভিন্ন রকম। অথবা সে
 পৃথিবীতে আসে নাই, তাহার একটা-কিছু কবিবার আছে। দিগন্তের ঐ
 বিহীনমন্দের মধ্যে সে জীবনের একথেকে আকাশে চমক দিয়া যাইবে।
 উত্তেজনার প্রাবল্যে গোরে গোরে হাঁটিয়া বাড়ী পৌঁছিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই সুবর্ণিত ডাকিয়া বলিলেন—কোথায় ছিলি দাদু ?

—বেড়াতে গিয়েছিলাম দাদু, ঐ গ্রামের দিকে।

—রাত-বিশেষে মাঠে ঘাটে বেশী থাকিস্ নে, সাপ-খোপ বেরোয়।

কাজল হাসিয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া মুখ ধুইতে গেল। সুবর্ণিত ডাকিয়া
 বলিলেন—চট করে হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আজ একটু আলো নিভিয়ে বোস
 তো। বড় চঞ্চল হয়েছিস, তোব মনঃসংযোগ হবে না ইয়ে হবে—

মেঘ আকাশের অনেকখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বাতাস একদম বহিতেছে
 না। ঝড় আসিতে পারে।

আঃ! মনে কোনো ভাব নাই, মালিন্য নাই। দুপুরের দেখা সেই মাঠের
 মত দিগন্তবিস্তৃত সবুজ জীবন।

ঘরে ফিরিয়া ইহনতীকে, ছড়াইয়া ধরিয়া কাজল বলিল—বড় ভাল লাগছে
 মা, আজ বড় ভাল লাগছে।

হৈমন্তীর ঘরের দেওয়ালে দরজার মাথায় অপূর্ব একখানা ছবি টাঙানো
 হইয়াছে। সারাজীবনে অপূ ছবি তুলিয়াছে খুব কম। বিবাহের পূর্বে
 পরেই হঠাৎ নিঃশেষে কলিকাতার এক স্টুডিও হইতে ছবিটা তুলিয়াছিল
 রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় কাজল বাবার ছবিকে প্রণাম করিয়া বাহির হয়।
 ছবিটা উঠিয়াছিল সুন্দর, মনে হয় অপূ হাসি-হাসি মুখে ক্ষেত্রের ভিতর হইতে
 তাকাইয়া আছে। পারতপক্ষে হৈমন্তী ছবির দিকে তাকায় না, তাকাইলে
 বুকটা কেমন করিয়া ওঠে।

স্কুলে যাবে যাবে সাপ্তাহিক পরীক্ষা লওয়া হয়। এক পরীক্ষায় কাজল
 বাংলা রচনা লিখিতে গিয়া বিদেশী উপন্যাস হইতে একটা উপমা দিয়াছিল,
 পরদিন তাহা লইয়া খুব হৈ-চৈ। বাংলার শিক্ষক অবিলম্বে ক্লাসে তাহার
 ব্যাখ্যান লইয়া আসিলেন। প্রথমেই কাজলের খোঁজ করিলেন।

—অযিত্যন্ত এসেছে ? কোথায় সে ?

কাজল ভীতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল ।

—এসেটা তোমার নিজের লেখা ?

—হ্যাঁ সার ।

অখিলবাবু চোখ লাল করিলেন ।—আবোল-এবোল এসব কি লিখেছ ?

আবোল-ভাবে ল কোনখানটা কাজল ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না ।

—কি সার ?

—যে বইটাব কথা খুঁজি লিখছি, সেটা পড়া আছে তোমার ? না জেনে লেখো কেন ? অন্য কারুর লেখা মুখস্থ করে লিখেছো ? সত্যি কথা বলো । কাজল লেখার মতো ডুমার গাধা মাসকেটিয়াস'-এর ডল্লেক করিয়াছিল । ইংরাজীতে বহুটির শিশুপাঠ্য সংস্করণ সে পড়িয়াছে ।

—বইটা আমি পড়েছি সার ।

—আবার তু ? মিছে কথা বলছো কেন ? এহ বই পড়েছো তুমি ?

—মিছে কথা নয় সার, গল্পটা আপনাকে আগাগোড়া বলতে পারি ।

কাজলের বয়সী কোনো ছেলে 'ধুমু মাসকেটিয়াস' পড়িয়া থাকিতে পারে, এ কথা আবোলবুবি বিশ্বাস করিলেন না । তাহার দৃঢ় ধারণা, কাজল মিথ্যা-কথা বলিয়াছে, এবং একবার বলিয়া ফেলিয়া এখন আর কথা ঘুরাইতে পারিতেছে না ।

অল্প বয়সে বাহা হয়—সে যে অনেক পড়িয়াছে, ইহা লোককে না জানাইয়া কাজল শাস্ত পাইতেছিল না । বহুবার দেখাইবার জন্য সে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বহুবার কথা ডল্লেক করিয়াছিল । অখিলবাবু চট্টিয়া হেডমাস্টার মাস্টারের কাছে গিয়া নালিশ করিলেন ললিতবাবু হেডমাস্টার, তিনি কাজলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । অন্য ছেলেবা ওয় দেখাইল—এও না, মজা দেবে । কিবে এনে দিঠে মলম ল'গাতে হবে ।

ললিতবাবু বালিলেন—অখিলবাবু বললেন, তুমি তাঁর সঙ্গে উদ্ধৃত ব্যবহার করেছ । সত্যি ?

—না সার । উনি বললেন আমি মিথ্যা কথা বলছি, আমি নাকি বইটা পড়িনি । আমি বললাম যে গল্পটা শুঁকে শোনাতে পারি ।

—সত্যি পড়েছো তুমি ?

—সত্যি সার ।

—ইংরাজীতে ?

—হ্যাঁ সার । বাবা আমাকে বইটা উপহার দিয়ছিলেন । আমি এখন অনেক বই পড়েছি সার । কেন আমি শুধু শুধু অখিলবাবুর কাছে মিথ্যা কথা বলবো ?

—আর কি কি বই পড়েছো তুমি ?

—'ডেভিড কপারফিল্ড' পড়েছি 'গালিভার্স ট্রাভেলস্', 'রবিনসন ক্রুসো'

‘টলস্টয়ের গল্প’—

—‘ববিনসন্ ক্রুসো’ কার লেখা ?

—ডানিয়েল ডিফো-ব।

ললিতবাবু টেবিলের ওপরে বাধা পেপারওয়াইটটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন—তোমাকে ইংরাজী কে পড়ান বাড়ীতে ?

—আমার বাবা পড়াতেন সামান্য। বাবা মারা যাওয়ার পরে দাদু পড়ান।

—বেশ। পড়াভীনা করা ভালো তবে মাসব্যবমশাইদেব মুখের ওপর তর্ক কোবো না। বিছা দদাতি বিনয়ম্। পড়ে যাও—পড়া ভালো।

কাজল চ’লিয়া গেলে অবিলম্বে ডাকাইলেন। ছেলেটি মিথোকাথা বলেছে বলে তো মনে হলো না অবিলম্বে।

—বাচ্চা ছেলে ঐসব বই পড়েছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন ? তা ছাড়া এই বয়সে ঐসব পাকামির বই পড়া কি ভালো ?

—জানিসটা ও ভাবে দেখবেন না অবিলম্বে। বই তো খাবান নয়। বিষয়বস্তুর কথা মনে বলেন, তবে বলতে হয়—

অবিলম্বে আলোচনা চাপ দিয়া দিলেন। বইটি তাঁহারও পড়া নাহি।

বিকাল চাবটার স্কুলের ছুটি হয়। মসজিদেব পাশেব বাস্তা দিয়া কাজল রোজ বাড়ী বেরে। আজ ছুটির পরে বেশ ফ্রাশ অণ্ডেব হওয়ায় অন্যদিন হইতে বেশি ভোবে হাঁটিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল। পথে স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক আদিনাথবাবু ডাকিয়া বলিলেন—মিঃ ভাণ্ড, শোন।

আদিনাথবাবু কাজলকে খুব ভালবাসেন। ক্লাসের ছেলেদের উৎসাহ দেন তাহাকে অনুসরণ করিতে। পড়িতে পড়িতে কাজলের নিজস্ব একটা ইংরাজী লেখার ভঙ্গী তৈয়ারী হইয়াছে তাহা আদিনাথবাবু ভালো লাগে।

কাজল আগাইয়া গেল —‘ক সাব ?

—আজ তোকে নিয়ে কি গোলমাল হয়েছে রে স্কুলে ?

কাজল খানিকটা বলিতে তিনি বলিলেন—যে যা বলে বলুক। কারো কথায় আমল দিবি নে। পড়াভীনার অভ্যাস করনো ছাড়বি নে, জীবনে উন্নতি হবে, দেখিস্।

হৈমন্তী বসিয়া কি-একটা বই পড়িতেছিল। কাজলকে চুকিতে দেখিয়া বলিল—আয়। আজ এত দেরী হল যে আসতে ? হাত-পা ধুয়ে আয়, খেতে দিই।

স্কুল হইতে ফিরিয়া কাজল ভাত খায়। হৈমন্তী আসন পাতিতে পাতিতে বলিল—আজকে রাত্রির শুয়ে সেই গল্পটা বলবি কিন্তু—

রাত্রে যানের কাছে শুইয়া কাজল যাকে গল্প শুনাইয়া থাকে। অপূর্ণ একটা ইংরাজী বইতে সে একটা জুতের গল্প পড়িয়াছিল—সেই গল্পটা সম্প্রতি হৈমন্তীকে বলিতেছে।

হাতির কাছে পড়া লাগ হইলে হারিকেন লইয়া সে সমুদ্রের উপর বসিয়া গেলের বই পড়ে। ভূতের গল্প হইলে পরিবেশটা অদ্ভুত জমিয়া ওঠে। হারিকেনের আলোর পরিধির বাহিরে যেন অজানা রাজ্য—আলোকরশ্মির সামান্য পরিসরের ভিতরেই তাহার দাক্ষিণ্যে ইচ্ছা করে। গল্প খুব জমিলে কাঙাল কল পুরাইয়া পলতে আর একটু বাড়াইয়া দেয়।

খাওয়ার পর কাঙাল বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। হৈমন্তী বলিল—
আবার বেকবি নাকি? তোব মোটে দেখা পাওয়া যায় না সাংগাদিন। এখন আবার টই-টই কবে বেকবার কি দশকান? থাক, বাড়িতে থাক—

বোম্বাইয় খুব একটা ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই কাঙাল এক-কদম রাজী হইয়া গেল। বলিল তুমি যাতে শৌণ্ড মা। আমি পাশে শুয়ে গল্প করি।

হৈমন্তী প্রায়শ্চলেকে নিজের ছোটবেলায় গল্প শোনায়। যে দিনগুলি কাঙাল দেখে নাই, কাঙালের ধারণা সেগুলি বর্তমানের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। অতীতের প্রতি তাহার যে স্নেহময় কল্পনা রহিয়াছে, তাহাই হৈমন্তীর গল্পকে তাহার নিকট বাস্তব করিয়া তোলে। সেই দুর্গাপূজার আগে শিউলি ফুল তলিফ খাওয়া, শিউলি ফুলের বোঁটা দিয়া কাপড় রঙীন করা। দল বাঁধিয়া হে হে কপিয়া ঠাকুর দেখিতে বাঁধন হওয়া। কাঙালের ধারণা সে দিনগুলি অনেক ভালো ছিল—অনেক, অনেক ভালো। মাকে বলে—মা, সেই গল্পটা বলো—সেই ঢাকায় যা হয়েছিল।

ঢাকায় থাকার সময়, হৈমন্তী তখন খুব ছোট, কাঙালের দিদিমা একবার গভীর বায়ে উঠিয়া দুমের মতোই দোতলা হইতে একতলায় আসিয়া গিয়াছিলেন। গভীর বাত, কেহ কোথাও নাই, হঠাৎ দিদিমা বিচানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, বাবা এসেছেন—আমি দরজা খুলে দিই গে যাই। সুরপতি উঠিয়া দেখে দেখে গেলেন। দরজা খুলিয়া দেখা গেল, কিছুই নাই। তখনও দিদিমার দম ভালো করিয়া ভাঙে নাই।

গল্প শুক হইল। এক গল্প হইতে অন্য গল্পে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তানলার বাহিরে দিনের আলো শেষ হইয়া আসিতেছে, ঘরের ভিতর এখনই আবছা অন্ধকার। হৈমন্তী গল্প থামাওয়া বলিল—যাই, সন্ধ্যাটা দেখিয়া আসি। দিদি বোম্বাই চা কবে ফেলল এতক্ষণে।

কাঙাল চুপ করিয়া ছিল। পুরাতন দিনের গল্প, সন্ধ্যার বিষন্ন অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। উঠিতে গিয়া হৈমন্তী কি-একটা মনে পড়িয়া যাইবার ভঙ্গীতে বলিল—একটা ব্যাপার হয়েছে, জানিস।

—কি?

—আজ ক'দিন ধরে দেখছি, খার কথা খুব ভাবি সে এসে হাজির হয়। বিষয়ের আগে বকুলের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, থাকে বলে গলাগ-গলায়। তার বিষয়ে হয়েছে কোমলগরে। আজ দুপুরে বকুলের কথা খুব মনে পড়েছিল। ওমা হঠাৎ কথা নেই বাত। নেই, দুপুরেই বকুল এসে হাজির। বললে—

বেড়াতে এসেছি, ভোবানের এখান থেকে ঘুরে গেলাম। হৃদিম আগে এল
উমা, তার কথ ও ভাবছিলাম সেদিন।

কাজল হৈমন্তীর দিকে তাকাইল।

—যাকে দেখতে ইচ্ছে ক'রে, সেই এসে হাঁজির হচ্ছে ?

হৈমন্তী মাথা নাড়িল।

কাজল দবজার উপরে বাবার ছবিটার দিকে তাকাইল। যদিও ঘর অন্ধকার,
তবুও বাবার মুখ হাসি ঠিক সগা য'ায়।

কাজল	একাদশ পরিচ্ছেদ -
------	------------------

কাজলের স্কুল হইতে ফিরবার পরে একটা দোকান খোলে। ছাত্রেরা দোকান
হইতে চকোলেট-বিস্কুট কিনিয়া খায়। সেদিন কাজল দোকানে ঢুকিল।
উদ্দেশ্য, বিশেষ করি এক ধরণের লেজেন্স ক্রয় করা। একদিন খাইয়া ভাল
লাগিয়াছিল, খাবার কিনিবার জন্য সুবর্ণচিত্র নিকট হইতে পয়সা লইয়া
আসিয়াছে। দোকানদারকে সবাই আন্টি বলিয়া ডাকে। ওষ্টদেশে প্রচলিত
গুফ-যুক্ত একজন দশাসই পুরুষের উদ্দেশ্যে কেন যে উক্ত বিনেশী স্থাপিত
শব্দটি প্রযুক্ত হয়, বোঝা মুশকিল। তবে মানুষটি ঐ ডাকে সাড়া দিয়া থাকে
কোনো উত্তরা প্রকাশ না করিয়াই।

আন্টি কাজলকে লেজেন্স খুঁজিয়া দিতেছে, এমন সময় দোকানের পিছন হইতে
বেশ ভাল গলায়-গাওয়া গান ভাঙিয়া আসিল। কাজল ভিজ্ঞাসা করিল—কে
গান গাইছে আন্টি ?

আন্টি বলিল—আপনাদের ইঙ্কুলেবই ছেলে, এখানে এসে বসে ম'ঝে মাঝে।
আন্টি তখনই আর মধ্যমা একত্রে ঠোঁড়ের ক'ছে খুঁজিয়া গুন-গুন করিয়া ব্যাংকট
বুঝাইয়া দিল।

কেতুহলা কাজল দোকানের পিছন দিকে ঢুকিল।

জাম্বগাটা আন্টির ভট্টবার স্থান। দ'মাব বেড়া দিয়া ঘেবা, উপরে চিনেপ
চাল। মেকেয় কালি-পড়া মেটে-হাড়ি, এনামেলের সানাকি, তোলা-উনান
এবং ঘরের কোণে-রাখা একটা প্যাকিংব্যাগে তেল-তণ্ডুলাদি। একপ্রান্তে
দড়ির ঝাড়িয়ায় ময়লা—কুটকুটে বিজানা, তাহার উপর বসিয়া একটি কসমত
ছেলে চোখ বুজিয়া হাত সামনে বাড়াইয়া রীতিমত শুভ্রাদি চণ্ডে গান গাই-
তেছে। কোনো যষ্টেল্লিয় ঘারা কাজলের উপস্থিতি বুঝিয়া সে গান থামাওল
এবং চোখ খুলিয়া তাকাইল ?

কাজল এবং কসমত ছেলেটি কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল।
নীরবতা অযত্নিকর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া কাজল বলিল—গাও না, বেশ তো
গাইছিলে

ছেলেটি হাসিল। এবং ময়লা বিজানার এক প্রান্ত হাত দিয়া ঝাড়িয়া বলিল
—এখানে বসো।

এতক্ষণে কাজলো মনে পড়িয়াছে, ছেলেটি ভাহাদেরই ক্লাসে অন্য সেকশনে পড়ে। খালি প হয় নাই—দুই হইতে বার কয়েক দেখিয়াছে। কাজল জিজ্ঞাসা করিল—তুমি তো বি-সেকশনে পড়ো, না? তোমার নাম কি? ছেলেটি মাথা পেছনে ছেলাইয়া চোখ অর্ধনিম্নলিত করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল—আমার নাম বোমকেশ চৌধুরী। তাহাব ভঙ্গী দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারিত, সে বলিতেছে—আমার নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

কাজল বুঝিল একটি অদ্ভুত চরিত্রের সহিত পরিচয় হইতে চলিয়াছে। সে আঙিটা বিচানায় বলিল।

—তুমি কি গাইছিলে? পুন্দর সুব।

—মালকোয় গাইছিল ম বেশ মেজাজ আসে গাইলে।

কাজল অবাক হইল। এ অঞ্চলে ববৌদ্রসংগাওই কেহ গায় না, তার উপর রাগদগ্ধও।

—তুমি গান শোখো?

—ছোড়দা শেখে। ছোড়দা ওস্তাদের কাছে শেখে, আমি ছোড়দার কাছে শিখি। কয়েক আমিও শিখি বলতে পারো। তুমি দিগবেটে যাও?

বাংলা দু'এক কদা, কাজল কখনও কবিতা পড়ে না।

—আমিও পাই তবে।

সকল হইতে একটা দিগবেটে বাহির করিয়া আঙিটা বিছানার নীচে হইতে বোমকেশ দেখল ই বাহির করিল। দিগবেটের গোঁয়া ছাড়াইয়া বলিল—

আমাদের দেশ বঙলায় বঙলায় নাম শুনেছো? বঙলায় কাছেই কুমারী-বামনগর গ্রামে আমাদের বাড়ী। বাবা ডাক্তার। তোমার বাড়ী কোথায়?

—আমাদের দেশ নিশ্চিন্দপুরে, সেও গ্রাম। বাবা মাঝা মাঝার পর এখানে মাঝা বাড়ীতে থাকি।

—বাঁচাটুরের কবিতা কেমন লাগে?

কাজল বিদেখিল। বাঁচাটুরের কবিতা তাহাব খুব বেশী পড়া নাই, দুই একটা যাহা শুনেছে, সম্পূর্ণ মনে বোধে নাই। বলিল—বেশী তো পাড়িনি, যা পড়েছি বেশ লেগেছে।

অনেক কথাবার্তা হইল। কাজল দেখিল, বোমকেশ একটু ছিটগ্রস্ত। মনের খুশীতে ঘেঁষে, গান গায়, বই পড়ে। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া গাছপালা চিনিয়া বেড়ায়। এমন সব গাছপালাই নাম করিল, যাহা কাজল চিনিলেও অনেক শহরে ছেলে নামও শোনে নাই। উঠবার সময়ে আডামোডা ভাঙিয়া বলিল—তা ও কতকিছু খুলে যেতে বসে'ছ। গ্রামে থাকতে অনেক কিছু জানতাম—গ্রাম হেঁটে এলে কেন?

—ছোড়দা এখানে চাকরী করে। ছোড়দার কাছে থেকে পড়ি। বাবার একার আরে চলে না। নতুন পাস-করা ভালো ভালো সব ডাক্তার গিয়ে বাবার পসার মাটি করেছে। বাবা খুব তেজী লোক ছিলেন, জানো?

অনেকদিন আগে সেটেলমেণ্টের লোক জমি জরিপের করতে গিয়েছিল—সঙ্গে ছিল, এক সায়েব। সায়েব কঠিন শুধু পড়লে বাবা চাকিৎসা কবে তাকে সারিয়ে তোলেন। সায়েব বলেছিল বাবাকে বিলেতে নিয়ে যাবে। এক রাত্তিরে বাবা তে পালিয়ে যাওয়া মতলব কবলেন। বাবার বয়স তখন সাতাশ-আটাশ, বড় গদম। কথা ছিল মাইল দশেক দূরে এক জায়গায় দেখা কবাব, সেখান থেকে সায়েব বাবাকে নিয়ে চলে যাবে। ঠান্ডা কি কবে জানতে পেরে আগে থেকে বাস্তব গিয়ে দাঁড়ালেন। বাবা খোঁজায় চেপে বাতায় পাশে বড় আমবাগানটা পায় হচ্ছেন, ঠান্ডা এসে পড়লেন তাকে বাবে ঘোড়ার দামনে। বললেন—হ্যাঁ, তেতে হয় আমার উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যা। বাবার আব বিলেত যাওয়া হোলো না।

পরের দিন আবার দেখা হইবে বলিয়া কাজল বিনায় লইল।

বোমকেশব সহিত কাজলের ঘনিষ্ঠতা বেশ বাড়িয়া উঠিল। দুইজনে শহর ছাড়াইয়া প্রায় দিকে বেড়াইতে যায়, কাটালিয়া নামের আখের আলি ব বাড়ী যায়। বোমকেশ মাঠের মধ্যে ছাত্র-পাড়া ডিয়া গান করিতে করিতে হাঁটে। কখনো রুমি আসিলে দুজনে দৌড়াইয়া চাষীদের দান পাহারা-দেওয়া চালাব নিচে আসয় নেন। রুমি দেখিতে দেখিতে বোমকেশ একটা সিগারেট ধরাইয়া বলে—চমৎকার রুমি, গাহতে হচ্ছে কবছে। দেশ আর মজাব—এ দুটো কম-কম রুমিতে ভালো জমে, বুলে ?

কোথায় একটা পাগী ডাকিয়া ওঠে—কুট-কুট কুট-কুট। সবটা বাদ হইতে আরম্ভ হইয়া চড়ায় গিয়া শেষ হয়। বোমকেশ বলে—বাকোকিল ডাকছে, শুনছো ?

কাজল ডাকটা আগেও শুনিয়াছে, কিন্তু নামটা যে বাকোকিল তাহা জানিত না—বর্গাব কোকিল আছে নাকি আবাব ?

—নেই তো ওটা কি ডাকছে ?

চারিদিকে বৃক-সমান শব্দগাছ দেখাইয়া বোমকেশ বলে—বামনগাছ এইরকম শব্দক্ষেতে বন্যার দিনে আমাকে একবার সাপে ভাড়া কবেছিল। টিপ টিপ রুমি হচ্ছে, আলের ওপর দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় পানগাছের ভেতর থেকে বিরানি কেউটে এসে আলের ওপর উঠল। কি তার ফোঁস-ফোঁসান, কি তার কুলোপানী-চকর। নেহাৎ আমার কাছে বেদের-দেওয়া সাপের শুধু ছিল, তাই বেঁচে গেলাম।

—কি করলে শুধু দিয়ে ?

—শুধু একরকম শেকড়। সাপের ভয়ে তাই সবসময় পকেটে নিয়ে ঘুরতাম—আমাদের ওদিকে ভীষণ সাপের উপদ্রব কিনা। চোবল মাংসে বলে সাপটা যেই ফণা ভুলেছে, অমনি শেকড়টা সামনে বাড়িয়ে দিলাম। সাপ বাধা নিচু করে চলে গেল—না কাষডে।

ভুল-ভীষনে বোমকেশ কাজলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল—একমাত্র বন্ধু। পরে

‘অবশ্য যোগাযোগ ক্রীণ হইয়া আসিয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিন দিন পরীক্ষা দিবার পর বোমকেশ আর আসিল না। কে আসিয়া বলিল—কুলে আসিবার সময়ে সে দেবিয়াছে, বোমকেশ মাঠের ধারে বসিয়া গান গাহিতেছে, পাশে খাণ্ডা-কলম-দোয়াত।

পরীক্ষা হইয়া দিবার পর কাজল বোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি পরীক্ষা দিলি না কেন?

বোমকেশ হাসিল। পরীক্ষা দিবে বলিয়াই খাতা-কলম লইয়া বাহির সে হইয়াছিল—পথে মাঠের দুখুটা এমন ভাল লাগিয়া গেল যে বসিয়া একটা গান না গাহিয়া সে পারে নাই। গানটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়ায় দেউড়ী সমস্ত পার হইয়া গিয়াছিল।

বোমকেশ কোনদিনই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করিতে পারে নাই। বৎসর চারেক বাদে একদিন কাজলের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল—তখন বোমকেশের পুত্র ঐ সময় যাইতেছে। পড়াশুনা হয় নাই, চাকরী পায় নাই। বাবা মরণ গিয়াছেন, দাদার সংসারে অনটন—সেখানে বসিয়া বসিয়া খাওয়া ভাল দেখায় না। শুধু মুখে চাকরীর সন্ধানে ঘুরিতেছে। আর গান গায় না, আগের সে প্রাণেচ্ছল গা নাই। কাজলের পুত্র খারাপ লাগিতেছিল, কিন্তু কবিরাজ কিছু ছিল না।

প্রথম খালপেপে মাসখানেক বাদে এক বিকালে বোমকেশ কাজলের বাড়ীতে আসিল। কাজল ধরে বসিয়া পড়িতেছে (পাঠা নহে—অপাঠা বই), হৈমন্তী আসিয়া বলিল—বুড়ো, তাকে কে ডাকছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে আসতে বললাম, এলো না।

কাজল বাহির হইতেই বোমকেশ বলিল—পুত্র বেশী হলে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া যেতে পারে। চট করে একটা জামা গলিমে বেরিয়ে পড়বি। দেয়ী কবিস না, যা—

—কিন্তু যাবোটা কোথায়?

—সে সব পরে। আগে বেরিয়ে আস।

বাহির হইয়া বোমকেশ বলিল—বিপুলগড়ের শিবমন্দিরে যাবো, চল। যাবো-যাবো কবচিলাম, আজকে মনস্থির করে ফেলেছি।

—বিপুলগড়ে যাবি এখন? তবে কি মাথা খারাপ?

—মেলা বকিস না। পুত্র মজা হবে, দেখবি।

বিপুলগড় কাঁঠালিয়া ছাড়াইয়া অনেক দূর। গ্রামের বাহিরে জঙ্গলের ভিতরে একটা পোড়ো-শিবমন্দির আছে। দিনের বেলাও কেহ সেখানে যায় না। কারণ প্রথমতঃ ঘন জঙ্গল, দ্বিতীয়তঃ মন্দিরে আকর্ষণীয় কিছু নাই। বডলোক জমিদার শব্দ করিয়া মন্দির বানাইয়াছিল—তাহারা সপরিবারে কলিকাতায় উঠিয়া গিয়াছে। সে প্রায় সমস্ত বৎসর আগের কথা। তাহাদের বড়বাড়ীর

ভয়াবশেষ পাশেই পড়িয়া আছে—জঙ্গলারত অবস্থায় ।

কাঙাল একটু আপত্তি করিয়া বলিল—বৃষ্টি আসতে পারে, দেখছিস না আকাশে মেঘ । অমন ভায়গায় খাওয়াটা উচিত হবে এখন ?

—তবে থাক তুই ।

বোমকেশ সতাই চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কাঙাল দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিল ।—বাগ কবছিস কেন ? চল, আয়িও যাবো ।

আকাশে মেঘ ঢল—আবও মেঘ চাওয়া অস্বস্তিকার হইয়া আসিল । বোমকেশ বলিল—আড়ভেঁকাবেব পরিবেশ তো এই । মেঘলা দিন, জঙ্গলের ভেতরে পোড়ো মন্দির, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া । একেবারে পাঁচকড়িদে-ব গল্প, এঁা ? ততক্ষণে কাঙালেরও ভাল লাগিতে শুরু করিয়াছে । ওয়াইডওয়ার্ল্ড মাগাজিনের মতো বহুদূর দেশে আড়ভেঁকাবে কবিস্থানে সে মনে মনে । ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়িপথে তাহারা ঢুকিল । বেলা আছে, কিছু মনে হইতেছে সন্ধ্যা নামিল বলিয়া । শিবমন্দিরের চাতালে উঠিয়া দুই জনে দাঁড়াইল । মাথায় বটগাছ গাইয়াছে, ভাবী কণ্ঠেব দরজা ভাঙিয়া কঙ্কাল আটকাইয়া ঝুলিতেছে । চাতাল চৌকা-টালি বসাইয়া তেলারী, এতদিন বাদেও বেশ মসৃণ । একটুও শব্দ নাই কোন দিকে, বাতাসে একটা বগ্ন গন্ধ ।

কাঙাল চাতালের উপর বসিয়া পড়িল । কয়েকটা কালো পেশোঁপড়া এখানে-ওখানে ঘুরিতেছে । ঠিক নিচেই কতকগুলি বনদুলসার গাছ ডাড়াডা করিয়া আছে । দূরে ভাঙা নান্দমন্দির দেখা যাইতেছে । কাঙাল ভাবিতেছিল, এই ভায়গাটা না-জানি কত ভাঁকভমক পূর্ণ ছিল । দেল-দগোৎসবে দুলবধূরা ভিড় করিয়া পূজা দেবিত, কাঙালঠনের আলো প্রতিমার মুখে পড়িয়া দাখতেল চকচক করিত । সঙ্কায় শাঁক বজিত, রক্তাব মলাভপ কবিতেন । কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কেহ নাই, কিছু নাই । তাহাদের চিহ্ন পুড়িবী হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, সাক্ষি হিসাবে রহিয়াছে কেবল এই ভাঙা নাটমন্দির ।

বোমকেশ ডাকিল—অমিতাভ ।

—কি ?

—কি রকম একটা লাগছে না ?

কাঙাল বোমকেশের দিকে তাকাইল । বোমকেশের মুখ গম্ভীর, যেন একটা ভয়ানক-কিছু ভয় অপেক্ষা করিতেছে ।

—কি রকম লাগছে মানে ?

—চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব, তাই না ? এমনি ভায়গাতেই তো বহুদিনের মৃত আত্মারা নেবে আসে । •

কাঙাল সমর্থন করিল । আসিয়াই জিনিসটা সে অনুভব করিয়াছে । বাতাসে রহস্যের গন্ধ—সাধারণত জীবনে যাহা ঘটে না, তাহা যেন এখানে এখনই

ঘটিবে। কিছুদিন আগেই সে 'রিপ ভ্যান উইকল' পড়িয়াছে। ঐ সু'ডিপথ-
টির দাঁক হইতে এখন হানমুন জাহাজের কোনো যত নাবিক বাহির হইয়া
আসিলে সে বিন্দুমাত্র অবাক হইবে না।

বোমকেশ বলিল—মন্দিরের ভিতরে ঢুকে দেখি চল—

ভিতর বেশ অন্ধকার। বোমকেশ পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া
আলিল। কাঠি পুড়িতে ৩৩৩ সময় লাগে তা'র মপোই দেখা গেল, মন্দিরের
ভিতরে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ—তা'হার মাথায় কয়েকটি ফুল। ঘরের
মিত্রে আগাকতু নাই—দেওয়ালে একটা কলুজি ছাড়া।

বা'হিরে আসিয়া একটা সিগারেট দগাইয়া বোমকেশ বলিল—একটু ভূপালী
গাই।

কাঙাল ইঁটুর উপর পুতনি পাখিয়া শুনিতে লাগিল। ভূপালী রাগ বোমকেশ
ভালই শায়ণ করিয়াছে। দগাজ গলায় ষড়জ লাগাইয়া আলাপ শুরু করিল।
এমন সময় কয়েক দোঁতা রক্ট পড়িল। গান থামাইয়া বোমকেশ উপর দিকে
তাকাইয়া বলিল—রক্ট এলো বলে মনে হচ্ছে।

কশা'র হইতে না হইতে কম কম কবিতা রক্ট নামিল। বোমকেশ লাখাইয়া
উঠিয়া বলিল—টোক মন্দিরে।

হুডমুড কবিতা মন্দিরে ঢুকিল। রক্টের তোড় প্রতি মুহূর্তে বাড়িতেছে। সাবশনে
শিবলিঙ্গের স্পর্শ বাঁচাইয়া টুইডনে এক কোণে চূপ করিয়া দাঁড়াইল। দরজার
ফেমে আটকানো বা'হিরের বনজঙ্গল মন্দিরের চাতালের কিয়দংশ প্রচণ্ড
রক্টিতে অড়ুত দেখাইতেছে। কাঙাল বলিল—মুশকিল হোলো, এখন কিরবো
কি করে?

—নেমবার তা'ড়া কিসের? বেশ তো লাগছে। বোমকেশের গলা স্বপ্নালু।
রক্ট কমিল না। জোলো হাওয়া এক একবার ভীষ দাঁটে দরজার ভাঙা
পা'ত'কে খটখট কবিতা নাড়িতেছে। বাতাসের ভাব বুঝ বাড়িয়াছে,
তনু পা'র পা'র নাড়িতেছে এখন মন্দিরে মন্দিরে রক্টের ছা'ট আসিয়া
পড়িতেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ৫৩৫৩ কবিতা লাগিল।

ঘরের ভিতর কিছু দেখা যায় না, বন অন্ধকার। বোমকেশ বলিল যখন
আলো আললাম, তা'র মনিষ ফুল দেপেলি অমিতাভ?

—হা।

তা'র মানে, গোল কে-লতা করে যায়। কলুজিতে কি আছে দেখি
দাড়া, মা'র এখানে আসে যখন—

একু মপোই অন্ধকারে ভিতর আবাব বোমকেশের গলায় ঘর—কি
পেলাম বল তো?

—কি?

—মোমবাতি। দাড়া আলি। মোমবাতির সঙ্গে আবও এক জিনিষ
আছে। গাঁজার কলকে।

বন্ধিবে অভাব শিবভক্তদের আনাগোনা প্রমাণিত হইল। কাজলের হাসি পাইতেছিল। মোমবাতি জ্বলাইয়া সেটাকে কোণের দিকে রাখিয়া বোম-কেশ গান ধরিল—দেশ বাগে।

বাহিবে হাওয়াব মাতামাতি—অন্ধকার, ভিতরে মোমবাতিব কাপা স্বল্প আলো, তাহাব সহিত বোমকেশের গান। কাজল ভুলিয়া গেল বাতী ফিবিতে আজ অনেক দেবী হইবে, মা ভাবনা করিবে। ভুলিয়া গেল যে স্থানে তাহাবা বাসিয়া আছে, তাহা অদৌ নিবাপদ নহে। রোমাঞ্চকর পবিবেশ তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল।

দবজাব কাছে দাঁড়াইয়া কাজল বাহিবে তাকাইল। ভাঙা নাট্যমন্দিরের দিকটা একেবারে ভূতের দেশ বলিয়া মনে হইতেছে। বিহ্বল চমকাইলে চারিদিক একেবারে জনা আলোকিত হইয়া দঠিয়াই আবার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। দবজাব দুইদিকে হাত গাতিয়া সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

এক নাগালে পায় চার ঘণ্টা বসি হইয়া প্রায় পাঁচ মিল বোমকেশ ছাড়া কাজল পাশাপাশি হাতিয়া বাতী ফিবিতেছিল। কাছাকাছি মুখে কথা নাহি। এই চার ঘণ্টার অভিজ্ঞতা তাহাদের পাশাপাশি করিয়া দিয়াছে, যেখা উমিয়া আছে, তবে রকি নামিবাব অস্বাভাবিক আশঙ্কা নাহি।

রাত্রে কাজল চোবের মত বসিতে পা দিল, তাহাকে গুণিবার জন লোক বাহির হইয়া গিয়াছে।

একদিন কানে আসিল স্বপ্নবীৰ বাবুনা—কেমন স্বপ্নবী বাজাইয়া গাহিতেছে। মধ্যরাতে কাজলের ঘুম ল'গল, তাহা হইলে তাহা লোকটির কাছে গিয়া কিল পদদ্বন্দ্ব কাকা।

রামদাস পথের কাঁলকে চিনিতে পারে নাহি। কেমন সেই পদদ্বন্দ্ব ও স্তোত্র তাহাব মন ভগ্নিয়া গেল। পুণ্যতন দিনের অভ্যাসমত স্বপ্নবী একবার ও তাহাইয়া বলিল—কেমন বাবা নাহি? আমি স্বপ্নবী কো'র? কে যাকে মাগবপুত্রের মাঠে দেখিলি'ম—

কাজল তাহাকে সমস্ত ঘণ্টা বলিল, ভুলিয়া গিয়া রামদাস অনেকক্ষণ কথা দাঁড়াইয়া বাসিল। একটা বেলার সময় কথা বলিল—বাবু'ম, দেখা হলো না, আমি স্ট্রিট দোখ প্রোমকে কথা দিয়াছিলাম, মন ভাঙে, বাবো—গিয়ে চুইতে পারি নি।

কাজল দেখিল রামদাস একই একম আছে বিশেষ বদল'য় নাহি। কথায় কথায় হুসে, কথায় কথায় স্বপ্নবী বাজিয়া। অপর দিনে কাজল ভুলিয়া সে একটুখানি গভীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরমুহুর্তেই হাসিয়া বলিল—আমারই বা আর কদিন পোকন বাবা? হাব নামেই জীবন, হাব নামেই মৃত্যু—নিজের নামে কিছু রাখলেই যত বখেড়া এসে জোটে। বেশ তো আচ্চি তাঁর নাম করে—

আমাকে তেন কখনো টাকা পরসাদা না দেন—সে আমি সহ্য করতে পারবো না, মরে যাবো।

কাজলের বামদাসের প্রতি শ্রদ্ধা হইল। সে বলিল—কিন্তু সাপাজীবন এই ভাবে ছন্নছাড়া মতো খুব বেড়াতে তোমার ভালো লাগবে? শেষ জীবনে একটা আশ্রয় তো দাকার—

রামদাস মুহু মুহু খজনি বাজাইতে বাজাইতে বলিল—ছন্নছাড়া। আমাকে ছন্নছাড়া বলে ১. তোমার সাহস তো কম নয় বাবাজী। আমাকে তিনি যেমন বেখেছেন, তেমনি আছি। তিনি যেমনভাবে খে'নে খেলা শেষ করে তে বলবেন, সেখানে তেমনিভাবে খেলা শেষ করে দেবো। তার হাতে আঁঠি—
তাব মতো আবার খাপ খালো কি?

কাজলের পক্ষে যদিও বামদাসের দর্শনের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়, তবুও তাহার কথা কাজলো ভালো লাগিতেছিল। মহা বিশ্বাসের সুখটি তাহার হৃদয় অধিকার করিতে বেশী সময় নেয় নাই।

কাজল বলিল—এর মধ্যে অনেক ঘুরেছ তুমি, না? গল্প বলো না শুনি।
হাঁ, এই চার বৎসরে রামদাস অনেক ঘুরিয়াছে—অনেক নৃতন জায়গা দেখিয়াছে। একস্থানে সে বেশীদিন থাকিতে পারে না, পাশ পালাই-পালাই করে। জুনিয়রী যদি ঘুরিয়াই না দেখিবে, তবে ঈশ্বর তাহাকে চোখ বন্ধী দিয়াছেন কি প্রয়োজনে?

একবার তাহার এক সাক্ষেদ উঠিয়াছিল। সে ভোগ'ড করে নাষ্ট, লোক'লা জুটিয়া গিয়াছিল। ভক্তিভাবে কথা বলে, গদগদ কর্তব্যর। দিন সাংকে ছিল সঙ্গে। এক স্থানে কোন এক বড়লোকের বাড়ী গান কবিতা লিখিয়া রামদাস। তাহার খুশি হইয়া রামদাসকে একখানা নতুন কাপড় দিয়াছিল। রাত্রে সমান্য অহার করিয়া উঠি ভনে একটা হু-চালয় উঠিয়াছিল। পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে সাক্ষেদটি উঠে—নৃতন কাপড়ের ও নেই।

কাজল বলিল—তুমি কি করলে এখন?

—কি আবার কোরবো? ভাবী দুঃখ হইল মনে। কাপড়টা চেয়ে নিতে পারতো আমার কাজ থেকে, আমি দিয়ে দিতাম। অনর্থক চুরি করে সে পাপের ভাগী হলো।

—তোমার বাগ হলো না?

—না বাবাজী। তার নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশী দয়াকর ছিল, নইলে সে নেবে কেন? তবে আমাকে বললেই পারতো। যাত্রিদের অসুখের দোষে বড় কষ্ট পাই মনে। কি লাভ অসুখতায়। সেই তো একদিন সবাকিছু ভেঙে ছুড়ে বেগিয়ে পড়তে হবে চিরদিনের জন্য, তবে আর কেন পেঁচনে কুকীর্তি রেখে যাবো?

রামদাস বিদায় লইবার আগে কাজল তাহাকে বলিল—তুমি মাঝে মাঝে

আসবে তো রামদাস কাকা ? আমাদের বাড়ী তো চেনা হচ্ছে গেল ।

—বলতে যদি না বাবাজী । কখন কোথায় থাকি তার তো ঠিক নেই । আজ খোঁজ খাচ্ছি, কল থাকবে আর এক জায়গায় । দেখো না, সেই মাথব-পুণ্ড্র মাঠের পর আবার কতদিন বাদে আমাদের দেখা হলো ।

— তুমি বোঝছ কাকাকে বেনী ভালবাসে না রামদাস কাকা, তাহলে কি না দেখে থাকতে পারবে ? খালি দুবে ঘুরে বেড়ালে কি আর একজনকে ভালো বাসায় ?

পদ্মা ! অনিয়া রামদাস কেমন অনমনস্ক হয়ে গেল, তানমনে স্বপ্নমীতে টিন-টিন অওয়াজ তুলিতে লাগিল । কাঙাল বলিল—সত্যি কথা বলি নি, কাকা ? মুখ । দেখে কি গেলো রামদাস বলিল—একজনকে ভালোবাসার জন্য তো জীবনটা নয় বাবাজী, আমি চেয়েছিলুম সবাইকে ভালোবাসতে । তা আর হেলো কই ? একজনকে ভালোবাসলে জীবনটা বড় চোট হয়ে যায় । কিম্ব সবাইকে ভালোবাসার মত চরমও তো প্রগবন আমাকে দেন নি, কি কবি তুমিই বলো ?

‘ক’ দুই কথিয়া রামদাস বলিল—এখন মনে হয় গাছ নদী ফুল ফল সবকিছু ভেতরেই আল দা করে দেখবার মত রূপ আছে, এমন কি পাথরের মতো মাটির মধ্যে ভালদা সত্তা—আমি তাই দেখি, কি পেলো চাওয়া আমার পন হয় এ আমি এখনও জানি না—তাইই সন্ধানে ঘুরে বেড়াই ।

অপুর শেষ পদ্যসাতটা পাঠকমহলে হালোচন আনিয়ািল । জীবনকে এত বিচিত্রভাবে অন্য কোনো লেখক দেবেন নাই—এই বলিয়া বড় বড় কাকাজে সমালোচনা বাহর হইল । পদ্যসাতখানির কটীতি অত্যন্ত বর্ণনা, অন্যান্য বইও ভাল চলিতে অপুর মতো পদ্যপাঠকেরা হঠাৎ যেন তাহাকে লইয়া ক্ষোভের পটয়া ।

বইয়ের হাতে অর্থাৎ ‘ইসাব এবং টাকাকড়ি অদ্বয় ইত্যাদি এখন সুবসতি ও পতন কথিয়া থাকে । হেমন্তের ভাড়া সমাপনের হাল সুবসতি এখন শক্ত হাতে নিষাধের মেয়েকে অল্প দিয়া বলিয়াছেন—তোব কোনো ভয় নেই হেম, কাঙালো ভাবতে ভাব আমার হাতে ফল

গ্রীষ্মে প্রথম পৌষ দ্বিবীটাকে তাড়িয়া থাকবে, বহুস্বয়ং-স্বয়ং কবিতা রকি পড়ে অদ্বয় হস্তাভ্যন্তর শান্তিবারির মত । হেমন্তের শিশির পড়ে, শান্তে কুয়াশা পাক যায়—সমস্ত হেমন্তী জানালায় বাসিয়া দেখে । যে দেখিতে শিখাইয়াছিল, সে নাহ ।

কলিকাতা হইতে প্রথম প্রথম এখন প্রকাশকদের নিকট হইতে অপুর লেখাব জগ্য মনি-ভাণ্ডার আসিত এবং হেমন্তীকে সহ কবিতা টাকা লইতে হইত, তখন হেমন্তীর চোখে ভাল আসিত । সে খেন খালি টাকা চাহিয়াছিল ! এ

সব লইয়া সে কি করিবে ? শেষ বইটা এত নাম করিল, মল্লু দখিয়া গেল
না। স্বাধীন এত সুনাম এত যশ লইয়া সে এখন কি করে ?

সুরপতির দৃঢ় বিশ্বাস কাজল বড় একমেব একটা-কিছু হইবে। ভক্ত মাজিস্ট্রেট
কবিবার দিকে তাঁহাও তেমন ইচ্ছা নাই, তিনি তাঁন অপূৰণ ক'জলও একটা
স্বাধীন কিছু করুক। সন্ধ্যায় পড়াইতে পড়াইতে তিনি শাক দেন—তম,

• নবার শুনে যা এদিকে।

হৈমন্তী আসিয়া বলে—কি বাবা ?

—দেখ কাজল এই ইংরেজী এসেটা কি সুন্দর লেখেছে। বাবান হুল
বাকশণে হুল একটাও নেই। আমি বলে দিচ্ছি তম, এ জেল বাশে নাম
উজ্জল কবে

—আমি যদি কয়েক বাবা, তাই এমন হয়।

হৈমন্তী নিজেই ঘরে গিয়া জানলার কাছে দাঁড়ায় বাহিরে ঘন
অন্ধকার ও অন্ধকারের চিত্র স্মৃতি আলোর পশ্চিম চিত্র দিয়া চেন
কাজল মনুষ্য হইতে, স্মৃতি ব'লয় চেন কাজল বড় হইবে

হেলেবেলা হইতে তমই ব'লক ব'ল বিবাস করে।

কাজল

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কাজল হইতে ব'হা হইয়া কাজল তাঁন ব'লেছে তাঁত কাজল প'ব'কা
পল্লীকায় সে খুব ভাল ক'র ব'লে—ব'শেষঃ ইংরেজীতে . . . ক'র
অতিক্রম অতিক্রম কাজল হইতেছে সে তাঁত হইতেছে তাঁত ক'র ক'র ক'র
জিদ ক'র ইংলিশে তাঁত হইলে কাজল একদিন আদিনাধব ব'লেছে তাঁত
গেল। আদিনাধব ব'লেছে তাঁত ক'র ক'র ক'র তাঁত ল'লেন . . . ল'লেন
কাজল বলিল—আমি যদি ক'র . . . ম'লয় হ'লে . . . সুব'ত
বলতে শিনে তাঁত না হইলে প'সিয়ে . . . বা . . . ক'র . . . ওয়া . . . তাঁত
হিল।

আদিনাধব তাঁত মা পূর্ণা . . . তাঁত ক'র ক'র ক'র ক'র
বলিলেন—ম'লয় তাঁত হইতে ক'র . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত
দিন প'লে শিনে ক'র . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত
ম'লয় হ'লে তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত

চশমা মুখিবার প'ল . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত
অন্যদিকে তিনি তাঁত হইয়া . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত
দেখাইতে ল'লিল। কাজল বলিল—ব'ল . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত
বয়সেই হুলন'য়। . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত . . . তাঁত
আর খাটবেন।

যুব কিরাইয়া আদিনাধব বলিলেন—কত আশা ছিল বড় হবো, নাম

লিষ্ট করিয়া ফেলিল সে, এক এক করিয়া পড়িবে। এই ব্যাপারে তাহার কিছু সুবিধা ছিল, এমন সব বইয়ের সে শ্লিপ দিত, যাঁহা সাধারণতঃ কেহ নেয় না। দপ্তরী তাক হইতে বই পাড়িয়া তাহা হাতে আনিয়া দিলে সে খুঁ দিতে দিতে বলে, বাব্বাঃ! বেজায় মূল্য জমে গেছে দেখছি।

দপ্তরী হাসিয়া বলিত—বড়ক ল ব'দে বেঁকলো তো বাবু!

কাঁজল অবাক হইয়া যায়। এত ভালো বই কেহ ডেনা কেন? তাকে যদি লাইব্রেরীতে থাকিতে দিত, দিনরাত সে মাতা-পাঠিয়া বাসিয়া বই নামাইয়া নামাইয়া পড়িত। চাকরী হইলে সে টাকার এমাইয়া ভাল লাইব্রেরী করিবে—বাড়ীতে। মোটামুটিতে গিয়া থাকিবে তখন, সেখানকার স্কুলে মাতারী করিবে। কলিকাতা হইতে বই কিনিয়া একটা ঘর সে ভাড়া করিয়া গেলিবে। দেওয়াল দেখা যাইবে না, শুধু আলমারী। সাপারদিন বইয়ের মধ্যে কাটানো—উঃ! এত বেশী আনন্দ আর কিসে পাওয়া যাইতে পারে?

কাঁজলো উর্ শিখিবাব শয় হইল। কি-একটা বই পড়িতে পড়িতে সে মিঞা গালিবের দুইটা লাইন পড়িয়া ছিল। লাইন দুইটা তাহা এত ভাল লাগিল যে ক্রমশঃ উর্ কবিতা সংগ্রহ করা তাহা ব্যতিক্রম দাঁড়াইয়া গেল। কলেজে এক সহপাঠিকে সে উর্ কবিতা অর্পণ করিয়া শেখানোর লে ছেলটি তাহাকে উর্ শিখিবাব উপদেশ দেয় কখনো মনে পলিল। অনেক সন্ধানের পর এক রক্ত মুসলমান ভালে ককে 'ওয়াগেল, তিনি সম্ভ্রাহে তিন দিন সন্ধ্যায় কাঁজলকে উর্ পাঠ দিতে বাজী হইলেন। সন্ধ্যা বেলা খাওয়া হইতে কাঁজল তাঁর কাছে গিয়া হাজির হয়। মলতীনগরের পাথে এক মসজিদে তিনি থাকেন, সবাই মৌলবী সাহেব বলিয়া থাকে। কাঁজল গেলে মৌলবী সাহেব হাসিয়া বলেন—দেল ম আলেকম। ইহা পড়াও কাঁজল তাহা নিকট হইতে শিখিয়া লয়—সে মাথা ঝুঁকাইয়া বলে, ও আলেকম সেলম। মৌলবী সাহেব বুঝাইয়া বলিলেন এটা হচ্ছে শুভেচ্ছা জান'নো, ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা। একজন বলছে—তোমার ওপাও ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসুক, অন্যজন বলছে—তোমার ওপাও ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসুক।

মৌলবীসাহেবের চোটা ঘরে মোমবাতি জ্বলে, মাগের উপর বসিয়া কাঁজল মনোযোগ দিয়া আপাত বেসদৃশহীন উর্ অক্ষরের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টা করে। মৌলবীসাহেব ঠাঁ-ঠাঁ করিয়া বলেন--নেহি, নেহি এয়াসা করকে লিখো—এয়ে হমতা নেহি ওয়া।

কখনো কখনো তিনি মূল ফারসী হইতে কাঁজলকে ওমর খৈয়াম পড়িয়া শোনান। বলেন—এই কবিতা অনেক গোঁড়া মুসলমান অদৃষ্ট করে। এতে নাকি অধর্মের কথা, ভোগবিলাসের কথা লেখা আছে। আমি কিন্তু তা মানি না—যা ভালো কবিতা, তা না পড়ে আমি থাকতে পারি না।

ওমর খৈয়াম শুনিয়া এত ভাল লাগিল যে সে একখানা ফিটজেরাল্ড অনুদিত

কুবাষ্টয়াত-ই-ওমর খৈয়াম কিনিয়া কেলিল, কেননা ফারসী বুঝিবার
ক্ষমতা তাহার নাই। ওমর খৈয়ামের জীবনরহস্য মধ্যপ্রাচ্যের অতীত
দিনগুলির বোমাটিক অশ্রুহুতি কাজলকে মুগ্ধ করিল। কি সুন্দর এক
একটি ছোট কবিতা—

They say the Lion and Lizard keep
The courts where Jamshyd gloried and drank deep
And Bahram, that great hunter—he Wild Ass
Stamps o'er his Head, but cannot break his sleep.

অনিবার্যভাবে যুহা আসিয়া দাস্তিক নৃপতি এবং বলদপী শিকারাকে চিরকালের
মত খুম পাড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের সমাধির উপরে বাড়িয়া-ওঠা ভজলের
বগা গদাধর মাতামাতিও আর তাহাদের খুম ভাঙাইতে পারে না।

মেলবোসাহেব বলেন—তাড়াতাড়ি শেখা চেষ্টা করো, উর্দু সাহিত্যে ঢুকলে
মুগ্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া উর্দু হয়ে গেলে ফারসী শেখাও বিশেষ আর
কঠিন হবে না।

মোহাম্মদ আলো দাকিলে গিণি বলেন—অ'ছ' ডা থাক—এসো। তোমাকে
কিছু শেখ শোনাও। সম্রাট বাহাউর শাহেব লেখা কবিতা শুনবে? একে-
বারে শেষ দীঘনে লেপা, শোনো—

উম্মে দরাজ-ম'ডুকব লায়ে বে টয়ে চাব বোজ।

দে আ'দুমে কা'গয়ে, দো হু'জাবেসে ॥

*

*

*

কিনো স্থায় বদনসীব নাকি দখ'নেকে লিয়ে।

দো গ'জ জমিন না মিল মকি ইস্ কুয়েয়ার যে ॥

কিছুদিন খাতায়াত কবিতা কাজলের উর্দু শিখিবাব উৎসাহ গেল। জটিল
ব্যাকরণ এবং নৈতিক ৩টি লিখন-প্রণালী সে কিছুতেই আয়ত্ত করিয়া
উঠিতে পারিতোছিল না। অবশ্য উর্দু সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ তাহার
থাকিয়াই গেল।

কলেজ হইতে ফিবিবাব সমস্ত একদিন কাজল কি কাছে কলেজ স্ট্রীটে
গিয়াছিল। একটা পুঁতন বইয়ের দোকানে নজরে পড়িল, ডক্টরেড্ডির
বাদার্স কারামাভুখানা। কাজল নগদ দেড় টাকা মূল্যে বইখানি হস্তগত
করিয়া বাড়ি ফিরিল। খুব নাম শুনিয়াছে বইখানার—কিন্তু পড়িয়া ওঠা
হয় নাই। বাড়ি ফিরিয়া সন্ধ্যা অগাধিনের মত বেড়াইতে বাহির না হইয়া
সে বিছানায় শুইয়া হাবিকেন কাছে টানিয়া পড়া শুরু করিল।

পে ভাবিয়াছিল নাম-কবা উপন্যাস যখন, প্রথম পাতা হইতেই গল্প খুব
জমিবে। তাহা হইল না। পাতার পর পাতা পড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু রস
যাহাকে বলে, তাহা ঠিক জমিতেছে না। শতখানেক পৃষ্ঠা পড়িয়া সে

বিরক্ত হইয়া বই মুড়িয়া তুলিয়া রাখিয়া দিল। মাস আটকের মধ্যে আর সে হাত দেয় নাই। একদিন কি খেয়াল হওয়ায় তাক হইতে নামাইয়া নুতন করিয়া পড়িতে শুরু করিল।

ভমিমা গেল।

কষ্ট করিয়া, তেতো ভুখুণ বাইবার মত করিয়া দুইশত পৃষ্ঠা পড়িবার পর বই আর হাত হইতে নামাইতে পারিল না। এবং পঠনমতে জীবনকে এমনভাবে অঙ্কন করিতে যে অন্য কোনো শিল্পীকে দেখে নাই। বিশেষতঃ দিমিত্রির চারিত্র্য তাহার কাছে অসাধারণ সৃষ্টি বলিয়া মনে হইল।

দিমিত্রির উন্মত্ততা, জীবনকে আঁকল হইয়া ওড়াইয়া পড়িবার চেতনা—এ সব সম্বন্ধে দিমিত্রির পরিচিতিতে কাজল কেমন মুগ্ধমান হইয়া পড়িল। মনে হইল, জীবনটা এক অদৃশ্য শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাহা ঈশ্বর না, মানবক কিছু নহে—বরং মানবিকতা বিবোধী।

জীবনকে ভালবাসিবার পাবনতা যদি এই হয়, তবে বাঁচিয়া লাভ কি? ব্রাদার্স কারামাভু জীবনকে নুতন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে শিখাইল।

শীত আসিতেছে। সকালে ঘাসে আলগা শিশির লাগিয়া থাকে, শেষ রাতের দিকে চাদব গায়ে টানিয়া দিতে হয়। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে উনানে আঁচ পড়িলে দোয়া ভমিমা যায়, বাতাস না পাকায় দোয়া সরে না। রায়ে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হওয়া যায়, মেঘ আসিয়া নক্ষত্রদের চাকিয়া দেয় না। পাড়ায় পাড়ায় পুতুলীদের হাঁক শোনা যায়—লেগ বানাবে নাকি মাঠাকরন, বাছাই করা ভালো তুলো ছিলো—

তখনই শীত আসিয়া গেল। কাজল ভালবেসে শীত পড়িলে ওত ও মনের ভিতরে একটা বড় স্নেহের ওলটপলট হয়। যে মন লঠিয়া স্নেহে গাঁথ উপভোগ করে, তাহা লঠিয়া কখনই শীতের শিকার হইলকি করা যায় না। শীত আসিবেন আগে হইতেই সে মনে মনে পশ্চিতি চালিয়ে থাকে, মনের জানলা হইতে পুরাতন পর্দা খুলিয়া নুতন পর্দা লাগায়, সে মন হাতে ছবি খুলিয়া দেয় দেখানে নুতন ছবি লাগাইবে বলিয়া। হেমন্তের মাঠে মাঠে হাঁটিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শীতের জন্য মন তৈয়ারী হইয়া ওঠে। বাইতে বসিয়া বায়ন মনেপাতন গন্ধ পাইলেই বোঝা যায় আব দেবী নাই।

ঠাণ্ডার মধ্যে মাঠে ঘুরিতে আলাদা আমেজ। মুড় রোদে পিঠ দিয়া দূরে তাকাইয়া থাকিলে ক্রমশঃ মনটা উদাস হইয়া যায়। কলিকাতার কলরবের ভিতর সে নিজেকে ঠিক মেসিয়া ধরিতে পারে না—নিজের মনে বসিয়া

চিন্তা কন্দিবান অবকাশও সেখানে নাই। সমস্ত সপ্তাহ নগর-জীবন কোলাহলের মধ্যে কাটাইয়া দেওয়া দিন শাওন বাঠে কাটাইতে ভাল লাগে। আল জাভাইয়া মঠে ন গিয়া ঠাটিতে ঠাটিতে ব্যবহার নিজে মাটিন ডেলা গুঁড়াইয়া খায়, দৌদ্দুদক মট ঠঠিতে কেমন গন্ধ আসিতে থাকে—এ গন্ধ নিশ্চিন্দ্রপুরে চোপেলেন য. স. - ঠা.।

একদিন ওয়াশিংটন স্টেটের লাইব্রেরি কলেজের লাইব্রেরি মাঠে বেড়াইতে গেল। সেখানে ওয়াশিংটন স্টেটের লাইব্রেরি কলেজের লাইব্রেরি মাঠে বেড়াইতে গেল।

কঠিন। ১৯৩১ সালে ৩০ দিনের মধ্যে শুধু সে মেনে ফেলেন না ছাড়া অন্যি
 পিছিয়ে। ১৯৩১ সালে ৩০ দিনের মধ্যে শুধু সে মেনে ফেলেন না ছাড়া অন্যি
 বিপ্লবের ৩০ দিনের মধ্যে শুধু সে মেনে ফেলেন না ছাড়া অন্যি
 নথি। ১৯৩১ সালে ৩০ দিনের মধ্যে শুধু সে মেনে ফেলেন না ছাড়া অন্যি
 বর্তমান সময়ের ৩০ দিনের মধ্যে শুধু সে মেনে ফেলেন না ছাড়া অন্যি
 সেখানে ১৯৩১ সালে ৩০ দিনের মধ্যে শুধু সে মেনে ফেলেন না ছাড়া অন্যি
 করে প্রত্যেক দিন সে ৩০ দিনের মধ্যে শুধু সে মেনে ফেলেন না ছাড়া অন্যি
 বসে ৩০ দিনের মধ্যে শুধু সে মেনে ফেলেন না ছাড়া অন্যি

কিন্তু সে কী! অমন ছোট্ট একটা মূর্খকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সপ্তাহ বেলাই নাটক লিখে কখনো বাস্তব হইয়া আসেন ও ইংকে একটা নড়বড়ে কাঠের ঘরে বসিয়ে দিলে। কাজল বসিয়া বলিল কেমন আছে অশোক ভাই।

আমি লে অর্থাৎ থাকি না থাকি, আমি কেমন হ'ল সেইটেই বড় কথা।
কুটি লে এখন কলোজ হ'ল না ?

— ୫୩, ୫୪ " ୫୫

—ক'ব'দ' ম'ন' এ'ন' ১৫৩

— ১৩৭। গাংগা শ কাল এবাব ছবহ লগে বি-এ পড়তে।

—এ পাঃ। তেমা'দব'দযতি স'স্টাবন'ববে'পড়া'অব'পড়া। পড়া শেষ
হতে হতে গো'বো'হ'য'ব'ব'।

— “ডাঙনো না শিপলে চলবে না অথেষ্ট্রাই, চাকরী তো কবতে হবে।

অথো একটা বড় একমো নিঃশাস ফেলিয়া বলিল—তা তো বটেই।
আমার মতো নয়, মাথাটা ঘোঁরন এখানেই কটল—কিছুই শিখতে
পারলাম না।

—কতদিন আছে তে'মার এখনে ।

— অনেক দিন হয়ে গেল, আমাব ঠাকুবদাব বাবা প্রথমে এই জায়গায় এসে বসতি করেন। আমাব সাবাজীবন এই গ্রামে কাটল—বাবকন্সকে কোলকাতায় গিয়েছি কটে, কিন্তু দেশ বেডানো যাকে বলে তা কিছুই হয় নি আমার

কপালে ।

এব পৰ আবেব তাহাকে খাওয়াইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল । কাজল খাটবে না, সেও ছাড়িবে না । দে কানের টিন হইতে একটা চোঙায় করিয়া মুড়কি তাহা হাতে দিয়া বলিল—খাও, ভাল মুড়কি । নিজেদের খাবার জন্য রষেছে বিক্রয় নয় ।

আবেবের দে কান হইতে উঠিতে সক্ষম হইয়া গেল । কিছুতেই সে ছাড়িতে চায় না । ঈশ্রুই আদিবর প্রতিশ্রুতি দিয়া কাজল ম'ঠের দিকে গুণা দিল । ঠাণ্ডা আৰু সফা কথা খায় না, সোয়েটার গায়ে দিতে দিতে কাজল দেখিল গোমুলি শেষ আলো কচ্ছট'ও আকাশের ও হইতে মিলিয়া গিয়াছে ।

অন্ধকার ম'ঠের মধ্যে দিয়া বোমাঙ্কন খাতা । আকাশে চুমকি মত অজস্র নক্ষত্রের ভিড় । জীবন-পানে হঠাৎ শরীরের সঙ্কীর্ণ পিসি হইতে বাহ্য হইয়া দিব্বীন মহাশূন্যে মিশিয়া গিয়াছে তাহাতে । কালো মনে হল, জীবন পৃথিবীর গভীর মনে আবদ্ধ নহে—এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর শেষ কথা হইতে পড়ে না । অস্তিত্ব সে মহা বিদেশ একপাশ হইতে অন্তিম পশ্চিম বিস্তৃত বলিয়া অনুভব করিতেছে—তাহা কি মিয়া ?

কাজল অতীতকাল বৃষ্টিতে প'ড়িতে প'ড়িতে ব'ব'র সহিত তত্পর মনসিকতা কোটা আশ্রয় মিল আছে । ব'ব'র উল্লসিত স্তন্য স্তন্য পড়িতে পড়িতে সে অবক হইয়া ভাবে, এমন নিভুল ভাবে তাহা মনের কাঁপিলে কি ক'রিয়া ? চোটে-বেল যসে তাহা ভবিষ্যৎ আকাশের দিকে তাকালে ওহা মনে ভাবে হইত, সব ব'ব'র ওষুধ লিখিয়াছে

কালে জানে, জীবন সংগ্রামে বৈকি ক'রিয়াছে । ব'ব'র দাঁড়িদোর সহিত যুদ্ধ ক'রিয়া প্রতিপদে সংগ্রাম ক'রিয়া ওবে মা'ম হইয়াছিল । সে কিছু ভুলেও পরে খুব একটা অসচ্ছলতা দেখে নাই, দাঁড়িদোর ভিতর । কলাপম্পর্শ আছে তাহা সে কখনও অনুভব করে নাই । মাঝে মাঝে কাজলো মনে হয়, কিছুই তাহা বলিবার নাই । ইট-কাঠ-পাণ্ডে ভিতর বাস ক'রিয়া কিছু বলিবার থাকিতে পারে না । তবু এক গুণ মিয়া ন্যয়ে তাহা তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাহাকে অনেক সহস্রা সম্মুখীন ক'রিয়াছে ; জীবনের ভিতরও আব একটা গভীরতর জীবন আছে, তাহা সে বুঝিতে পারে । কি ক'রিয়া সে এ সব কথা না বলিয়া পারবে ?

একটা খাতায় ঠিকিট গল্প লিখিয়া সে বন্ধুদের পড়াইয়াছিল । কলেজের বন্ধুদের (মনের মিল বেশী না পাকা সড়েও দুই-একটি বন্ধু তাহা হইয়াছে) মধ্যে অনেকেই তাহা বাবার ভক্ত । তাহা গল্প দুইটা আছে । পশু শুনিয়া বলিল—ভালই হয়েছে, মন্দ কি । তবে বাবার কি জানো, লেখা মতো তোমার বাবার প্রণব বড় বেশী ।

কাজল মহা হাল্লাময় পড়িয়াছে । সে ইচ্ছা ক'রিয়া বাবার বই দেখিয়া নকল

করিতেছে না। তাহার চিন্তাধারার সহিত বাবার চিন্তাধারা মিলিয়া গেলে, সে কি করিতে পারে ?

প্রকাণ্ড মাঠের অপেক্ষে পার হইয়াছে—এমন সময় কাজল দেখিল, কিছুদূরে মাঠের ভিতর বসিয়া কাহাণী আগুন পোহাইতেছে। বেশ দৃশ্যটাই। চারিদিকে শূন্যমাঠ, উপরে খোলা আকাশ, তাহার নীচে বসিয়া বড়-বিচালি জ্বালাইয়া কেমন আগুন পোহাইতেছে লোকগুলি। কিসের আকর্ষণে সে পায়ে পায়ে আগাইয়া গিয়া অধিকৃতের সামনে দাঁড়াইল।

লোকগুলি দর্শিত। এই প্রয়ানক শীতে গায়ে একটা কবিতা সুতির জামা। তাহাণী গায়ে গায়ে বেঁধিয়া হাত আগুনের উপর ছড়াইয়া নিজেদের মধ্যে কি গল্প করিতেছিল। কাজল হাসিয়া দাঁড়াইতে লোকগুলি অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। কোঁহুলা দৃষ্টির সামনে কাজল অপ্রস্তুতবোধ করিয়া বলিল—আগুন পোহাচ্ছেন বুঝি ?

অবাস্থব পদ্ম। শীতের বাত আগুন জ্বালাইয়া তাহার উপর হাত ছড়াইয়া এতগুলি লোক আগুন পোহানো ছাড়া অন্য কি করিতে পারে ?

একজন বলিল—ইঁা বাবু, আপনি বুঝি শহরে থাকেন ? এই বুধো, সবে যা শুদিকে। বন্য বাবু ওইখেনেচায়, আগুনের কাছে এসে বসুন।

বুধো গতাকের সম্মান দেখ ইয়া সন্ধ্যা বসিল, কিন্তু বাকি কয়জন কেমন আড্ডাভাংবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের চোখে শুধু বিষ্ময় নহে, একটু মেন আতঙ্কও নির্মিত আছে।

প্রথম লোকটি বলিল—এই বুধো গল্প বলছিল বাবু। স্বস্তববাড়ী থেকে কেবাব সময় মাঠের মধ্যে ওকে এলে-ভুতে যেছিল। এলে-ভূত জানেন তো ? মাঠের মধ্যে পদ্ম ভুলিয়ে লোককে দূরে বেজায়গায় টেনে নিয়ে যায়, তাবন্দ মেয়ে ফেলে। তা বুধো সন্ধ্যাবেলা বেয়িয়েছে স্বস্তব বাড়ী থেকে, আর ভূত লেগেছে তার পেছনে—

একজন অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—নাম ক'নিস না বাবুবে—

গল্পটা দীর্ঘ। কাজলকে সবটা শুনিতে হইল—কি কবিতা কাপড়টা বাড়িয়া উল্টাইয়া পড়িয়া তবে বুধো ভূতের হাত হইতে রক্ষা পায়। শুনিতে শুনিতে অনেকে পিঠের উপর দিয়া নিছনের মাঠের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। এবং ক্রমাগত আগুনের কাছে ছগ্রসগ্র হইতেছিল। ইহাদের আতঙ্কের কারণ এইভাবে কাজল বুঝিল। অন্ধকার মাঠে বসিয়া প্রত্যাশান্বিত গল্প হইতেছিল—রীতিমত গা শিশির-কণা পানিবেশ। এমন সময় মাঠের ভিতর হইতে আচমকা কাজলের নিঃশব্দ আবির্ভাব। প্রথমটা তাহাণী বেজায় চমকাইয়া ছিল, আগুনের আলোয় কাজলের ছায়া পড়িতেছে ইহা না দেখা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারে নাই।

ঠাণ্ডা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। তাহাণী আবার কাঠকুটা আনিয়া আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিল। শুকনা ডালপালা পুড়িবার পটপট শব্দ উঠিতেছে, বাতাসে

পোড়া পাতার গন্ধ। হাত বাড়াইয়া আঙনের উত্তাপ উপভোগ করিতে করিতে কাজলেব মনে হইল, এই লোকগুলি তাহার ভারি আপন।

(কাজলের ভারেরীথেকে)

আমাব ভায়েবী লেখাব অভ্যাস মোটেই পুর্বানো নয়। ছোটবেলায় কিছুদিন লিখেছিলাম বটে, কিন্তু সে বাবাকে দেখে শথ কবে। আত্র হঠাৎ মনে হচ্ছে আমাব এ বয়সটাব একটা বেকড' বাখা দবকাব—যাতে সববর্তী সময়ে এব থেকে মানসিক প্রগতিব হাবটা দবতে পাবি।

কিছুদিন আগে কয়েকজন বন্ধু মিলে পূবী বেকে ঘুবে এলাম। কলেজে প্রথমে খুব খাপাপ লাগছিল। পবে তিন-চারজন ছেলো সঙ্গে আলাপ হলো, যাদেব সঙ্গে এখন বেশ জ্ঞাতা গড়ে উঠেছে। তাবাই উচ্চাণ করে বেডাতে খাবাব হায়োজন কবলে আমি তাদেব সঙ্গী হয়ে পডলাম।

মার এখনও দাবণা, আমি সেই ছেলোমানুষই আছি। দুমোলে আমাব গায়ো চাদর টেনে দেন—সকালে উঠে টের পাই। তাছাড়া আমাব বইপত্র গুছিয়ে রাখা, কলেজে বেকনোব সময়ে কলম-পেন্সিল খুঁজে দেওয়া, এসব তাঁকেই করতে হয়। কাজেই স্ব-নির্ভরতাৰ পথে খুব-একটা এগিয়ে গেছি—এমন বলা চলে না। মার চোখে ছোট্টই রয়ে গেছি।

আমি পরমেশ, অমল আর রমানাথ একদিন সন্ধ্যাবেলা ট্রেনে চেপে বসলাম। সারা রাত্রির ভেগে বসেছিলাম। ছোট স্টেশনে গাড়ী থামছে না, ও ও করে প্লাটফর্ম বেরিয়ে যাচ্ছে। কখনো নদীৰ ওপর দিয়ে গুম গুম করে ব্রীজ পার হচ্ছে—কখনো নীরজ, অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে দেখছি এঞ্জিন থেকে ভেসেআসা অলস্ত কয়লাৰ কুচি।

সকালে কটক। আমাব চোখ রাত্রি-জাগরণ দ্রাপ্ত। তাকিয়ে দেখলাম অদৃত পোশাক পরা রেলওয়-পুলিশ প্লাটফর্মে টহল দিয়ে বেডাচ্ছে। পরমেশ চা খাওয়ালে সবাইকে। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চায়ের ভাঁড় নিয়ে হুক দিতে দিতে মনে হলো, সত্যিই একা বেডাতে চলেছি তা হলে। জাবনে কখনো কোথাও একা বেরুই নি।

দুদিন আগে রাত্রিরে স্বপ্নে সমুদ্র দেখেছিলাম। তখন পূবী খাওয়ার কথা চলছে দেখলাম, সমুদ্রের ধারে বালির উপর পাশচারা করছি। হলুদ বালির বেলা দু'ম তার ওপর শ্রেণীবদ্ধ নারকেলগাছ অশ্রান্ত হাওয়ার থর-থর করে কা ছে। মাথার ওপরে দীপ্ত সূর্য। ভাল করে দেখতে পাই নি, কারণ সমুদ্র সম্বন্ধে আমাব কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

কটক ছাড়িয়া কেরাঝোপ দেখতে দেখতে চললাম। লাইনের দু-দিক কেরা-ঝোপে সবুজ হয়ে আছে। মনের মধ্যে উচ্চগ্রামে মাদল বাজছে যেন, একটু পরেই জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখবো।

ট্রেন মালতীপাতপুর ছাড়াল, সামনে পুরী। কি সুন্দর নামটা—মালতী-পাতপুর!

হাত পেছনে রেখে সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল বাবার কথা। অনেকদিন আগে, আমি তখন ছোট, বাবা এসেছিল পুরীতে মাকে নিয়ে। বেলাভূমিতে বাবার পায়ের ছাপ কবে মুছে গেছে ঢেউ-এর অক্লান্ত তাড়নার কিঙ্কতণু মনে হচ্ছে, পূর্বীর বাতাসে যেন বাবার গায়ের গন্ধ—ছোটবেলার বাবার বুকে মুখ গুঁজে থাকলে যেমন পেতাম।

মোহাডীতে বিস্তৃত প্রাস্তর দেখেছি, কিন্তু বিস্তৃতি যে কতদূর প্রসার লাভ করতে পাবে তা আজ বুঝলাম। ভালো লাগছে বলার চেয়ে কষ্ট হচ্ছে বলাই বেশী সঙ্গত, কারণ সমস্ত সমুদ্রটা আমি একসঙ্গে বুকের ভেতর পুনে নিতে পারছি না। এত বিশালকে একই সঙ্গে সমস্ত দিক দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। ভীষণ চটফট করছি, কিছুতেই এক জায়গায় মন বসাতে পারছি না। সমুদ্র যেন ক্রমশঃ রক্তের মতো মিশে যাচ্ছে। প্রাণের স্পন্দন প্রথম জেগেছিল জলে। সূর্যের অণুকূল উগ্রপে প্রথম এককোষী-প্রাণীর সৃষ্টি সমুদ্রের বুকে। সমুদ্র জীবনের ধাত্রী। জীবন-সৃষ্টির কোটি কোটি বছর আগেও এই সমুদ্র এই রকম অশান্ত হয়ে ঝাপাঝাপি করত বেলাভূমিতে। অন্য সব-কিছু থেকে সমুদ্র অনেক বেশী অভিজ্ঞ—বহুদর্শী। অন্ধকার ঢেউ-এর মাগায় মাঝে মাঝে স্বতঃপ্রভ ঝালো। দিনরাত ভীষণ শব্দ করে সমুদ্র যেন কি-একটা জানাতে চাইছে, আমি তাব ভাষা বুঝতে পারছি না। বাবা হয়তো বুঝতে পেরেছিল। এখন বৈচে থাকলে বাবার কাছ থেকে জেনে নিতাম।

মানুষ বড় অসহায়, তার বলবার কথা সে কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারে না। সামনে এ elemental fury দেখে মনে একটা আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সমস্ত বিশ্বটার মধ্যে যে একটা master plan আছে সেটা সমুদ্রের মতোই বিশাল, অতিমানবিক। কি বহুগুণে থাকে আকাশে-মাটিতে-জলে-জীবনে। দর্শন-গ্রন্থের সামনে সচ-অক্ষরপরিচয়প্রাপ্ত শিঙা মত আমাকে এই বিশালত্বের সামনে চূপ কবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

একটা জিনিস আমি বুঝেছি, আমার জীবনটা অন্যান্য মানুষের চেয়ে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে যেদিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছি, সেদিন থেকে আমার ভেতরে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের বীজ একই সঙ্গে উগ্ৰ হয়েছে। চিন্তা দিয়ে আমার নিজের জন্য একটা ভিন্নতর জগৎ আমি তৈরী করে নিয়েছি। কিন্তু চিন্তা আমাকে আলোর পথ দেখাতে পারছে না, শুধুমাত্র একটা রক্তের মতো ঘুরিয়ে রাস্তা করছে। মুক্তি চাইলেও পাবো না—যে চিন্তাশীল, তার মুক্তি নেই। বন্ধুরা আমার সান্নিধ্য থেকে আর যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছে না। তারা যে-ভাবে আনন্দ ভোগ করতে চায়, তা আমার আনন্দের ধারণা থেকে আলাদা। ফলে আমি অনেক মানুষের মধ্যেও একা বোধ করি। চেনা-মুখের ভিড়ে একলা থাকা বড়ো কষ্টের। আমি প্রাণপণে চাইছি ওদের সবার সঙ্গে ওদের মত হয়ে মিশে যেতে, ওদের মত ভাবতে, কথা বলতে। প্রত্যেকবারই কে পেছন থেকে টানছে, বলছে—হবে না, আর তা হয় না।

বাঁধার সহজ আনন্দটা আমার মধ্যে কবে আসছে, আমি তখন চিন্তার কঠিন
ঝাটিতে খালি-পায়ে হাঁটছি।

কোনারক।

বন্ধুরা ঘরে বেড়াচ্ছে এদিকে-ওদিকে, আমি চুপ করে বসে আছি। সমুদ্রের
দিক থেকে হাওয়া এসে প্রাঙ্গণের ধুলো ওড়াচ্ছে। নোনা বাতাসে মন্দিরের
গায়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য দিন দিন ক্ষয়ে আসছে। বন্ধুদের গলায় শব্দ শুনতে
পাচ্ছি, দূর থেকে ভেসে আসছে কানে। কি নিম্নে যেন ওরা খুব হাসাহাসি
করছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরের চাতালে একটা কোণায় বসে আছি। এখানটা
বেশ চায়াচ্ছন্ন, কাছেপিঠে লোকজন নেই। মনে হয়, শব্দের জগৎ থেকে
আমি নিবাসিত। বন্ধুরাও হাসি ধামিয়েছে।

আমার পান দিকে পাথবে উৎকীর্ণ একটা পদ্ম। তাতে কনুই রেখে ওপরে
তাকিয়ে দেখলাম মন্দিরের চূড়াব কাছে দুই পাথরের দেওয়ালের ফাঁকে নীল
আকাশ ঝকঝক করছে। ফাঁকটা দিয়ে একটুকরো সাদা মেঘ ছুরিতগতিতে
ভেসে গেল।

হঠাৎ দেখলাম, আমার মনে সেই বিশেষ ভাষটা জাগছে—বিপ্লবগেডের শিব-
মন্দিরে যেমন হয়েছিল। ইতিহাস যেন চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।
বহু শতাব্দী আগে যখন বোজ পূজা হতো, পুনোহিতের উদাস্তকণ্ঠের মন্তো-
চ্চারণ শোনা যেতো, সেই আগেকার দিনগুলোকে বড় ফিবে পেতে ইচ্ছে
করছে। আমার কাছে বর্তমান যেমন সত্য, উঠোনের ঐ ধুলোর ঘূর্ণী যেমন
সত্য—সেইসব অতীতের মানুষদের কাছেও তাদের বর্তমান তেমনই সত্য
ছিল। কিছুই আমার চিরদিন আঁকড়ে থাকতে পানি না। সমুদ্রের ঢেউ,
সূর্যাস্তের রং সব-কিছু একদিন আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

পরবেশ ফিরে আসছে। কি রে অযিতাভ, আমাদের সঙ্গে না থেকে বড় যে
এখানে একলা বসে আছিস?

কি-ই বা উত্তর আমি দিই? উঠে বললাম—চল, তাদের সঙ্গে যাই।

যেতে যেতে ওপরে তাকিয়ে চোখ-ধাঁধানো সূর্যটা দেখে মনে হলো, বছরের
পর বছর ধরে সূর্য কর্কটক্রান্তি থেকে মকরক্রান্তি পর্যন্ত এইরকম ভাবে পরিক্রমা
করবে, সমুদ্রে একবার জোয়ার একবার ভাঁটা আসবে। আমাদের স্মৃতি-
টুকুও উত্তরপুরুষদের মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে—কেবল মাথা তুলে সূর্য-
মন্দিরটা দাঁড়িয়ে থাকবে আরও অনেক শতাব্দী।

শীতের শেষে সুরপতি অসুখে পড়িলেন। শরীর খুবই বজবুজ ছিল, বাগানের
খির গাছগুলিতে নিকের হাতে পাম্প করিয়া জল তুলিয়া দিতেন। প্রত্যহ

কয়েক মাইল হাঁটাঘাট চাকরী-জীবনের অভ্যাসের মধ্যেই ছিল। তবুও কোন এক রক্তপথে দেহে অসুখ ঢুকিয়া পড়িল। অসুখ সুরপতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে ন।, অরজারি হইলে তিনি আরও বেশী ঘোরাঘুরি করিতেন। মনে ভয় ছিল, শুইলেই অসুখ তাঁহাকে কাণ্ড করিয়া ফেলিবে। কাজল দাত্তকে কখনো কোন কারণে শুইয়া থাকিতে দেখে নাই। একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলা সুরপতিকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অশ্রু হইল। পাশে সরযু বসিয়া হাওয়া করিতেছে, বাড়িতে প্রথমতঃ আবহাওয়া।

হৈমন্তী বলিল—অরটা হঠাৎ বেড়েছে বুড়ো। দুপুরের দিকে আশ্রয় ডেকে বললেন গায়ের উপর চাদরটা এনে দিতে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, বুকে খুব সর্দি। তুই খেয়ে নে, কি দরকার পড়ে কখন—

কাজল খাইতেছে, দিদিমা আসিয়া বলিলেন—খোকা, তুই খেয়ে সুরেশ-ডাক্তারকে একটা খবর দিয়ে আসিস তো, তোর দাত্তকে ঘেন দেখে যায়।

অসুখটা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাড়ীর সবাই সে' কথা বঝিতে পারিয়াছে। সুরেশবাবুও অনেকদিন হইতে সাবধান করিতেছিলেন, সিগারেট ছাড়িবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সুরপতি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

সুরেশডাক্তার সুরপতিকে দেখিয়া গেলেন। প্রতাপ তাঁহাকে আগাইয়া দিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভয়ের কিছু আছে নাকি ডাক্তারবাবু?

—ভয়ের তো বটেই। অনেক দিনের পোষা রোগ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি নে। দেখি হুঁদিন—

সকালে খবরের-কাগজ আসিলে সুরপতি আগে পড়িতেন। গ্লাস-পাওয়ারের চশমা চোখে লাগাইয়া কাগজটা আছোপান্ত পড়িয়া শেষ করিতেন। আজ কয়েক দিন কাগজ আসিয়া তাহার টেবিলে পড়িয়া থাকে, প্রতাপ সময় পাইলে বিকালের দিকে একবার দেখে। কলিকাতায় সে ভাল কাজ করিতেছে কোন একটা সুশ্রুতগরী অফিসে, বুঝ সকালে বাহির হইয়া যায়।

রান্নাবান্নার দিকটা হৈমন্তী দেখে। কাজলের দিদিমা এবং সরযু সুরপতিকে দেখাশুনা করে। খাওয়াদাওয়ার হাজিমা মিটিয়া গেলে হৈমন্তী আসিয়া বাবার কাছে বসে। সুরপতির শরীরের শক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছে—মাসিক কাল শয্যাগত থাকিয়া বঝিতে পারিয়াছে, রোগ কঠিন। হৈমন্তী আসলে জিজ্ঞাসা করেন—ডাক্তার কি বললে রে?

—ভয় কি বাবা? বলে গেছেন, কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বলেছে এই কথা?

—নয় তো আমি কি মিথ্যা বলছি?

অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল, কমিবার লক্ষণ নাই। বুকে যেন কে হুই মণ পাথর চাপাটুয়া রাখিয়াছে, নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। সুরেশডাক্তার নানা-ভাবে পরীক্ষা করিয়া বুকে ঢোকা হারিয়া বলিলেন—জল হয়েছে বুকে,

টোপ করতে পারলে ভালো হোত। কিন্তু এত দুর্বল রোগী।

সবাই এখন স্পষ্ট বুঝিয়েছে, সুরপতির আঁব বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার আশা নাই। বোঝেন নাই কেবল সুরপতি নিজে। কঠিন অসুখ হইয়াছে ইহা অনুভব করেন, কিন্তু অসুখটা যে তাঁহাকে পরপার-গামী খেয়াল তুলিয়া দিয়াছে ইহা বুঝিতে পারেন নাই। দুর্বল গলায় প্রত্যেককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন অবস্থার কিছু উন্নতি দেখিতেছে কিনা।

শেষের দিকে বাঁচিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্য কাহারও কথা বিশ্বাস হইত না। দুপুরবেলা হৈমন্তী আসিয়া বসিলে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি-
ডেন—হৈম, সত্যি বল। আমার কাছে লুকোস নে—আমি বাঁচবো তো ?
কাজলের খেন কেমন লাগিল। দাঙু ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, পরলোকে বিশ্বাস
কবেন, পুনর্জন্মের স্বপ্নে অনেক কথা কাজলকে বলিয়াছেন—অথচ পৃথিবী
ছাড়িয়া যাইতে তিনি এত কাতর কেন ?

বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন সুবপতি—হুইমাস আগে যাঁহা দেখিয়াছে,
এখন দেখিলে তাঁহা চিনিতে পারিবে না। চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে,
হাড়ের উপর চামড়াটা কোন্‌মতে লাগিয়া আছে মাত্র। নিঃশ্বাস লইবার সময়
পাঁজরাগুলি প্রকট হইয়া ওঠে।

দিদিমা সমস্ত জীবন দাঙুর দেখাশোনা করিয়াছেন। বাইতে বসিলে পাশে
বসিয়া হাওয়া করিয়াছেন। শীতকালে আদা-চা এবং গরমকালে বেলের পানী
করিয়া দিয়াছেন। বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে লাগাইয়া দিয়াছেন। কাজল বোঝে
এখন দিদিমা অস্তির হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ তাঁহাকে পরিস্রাব করিয়া কেহ
কিছু বলে না। সকলের মুখের দিকে তিনি শঙ্কিতভাবে তাকান—
কেটা তাঁহারা গোপন করিতেছে, মুখভাব হইতে সেটা বুঝিবার চেষ্টা
কবেন।

ডাক্তার একদিন বলিলেন—আর ভরসা দিতে পারিনি, আশা। প্রস্তুত
থাকুন।

প্রস্তুত সকলেই। সুরপতি মানুষ চিনিতে পারিতেন না। কট করিয়া
শ্বাস লইবার সময় মুখ দিয়া তাঁহা শব্দ হইতেছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে,
অর্থহীন। দুপুরে সবাইকে বিশ্রাম করিতে পাঠানিয়া হৈমন্তী বাবার কাছে
বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অপূর যন্ত্রার পর সুরপতি বিশ্রী মহাচেষ্টার নিচে
তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সে আশ্রয় এতবার নষ্ট হইতে চলিল।

সুরপতি তাকাইয়া চিনিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—কে ? হৈম ?

—হ্যাঁ বাবা, আমি।

সুরপতির কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল, অস্বাভাবিক স্বরে বলিলেন—কাঁদিস
নে, তোদের কান্না দেখলে আমি মনে জোর পাই নে।

কান্নার বেগটা হৈমন্তী জোর করিয়া দমন করিল।

—তোবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো বাবা ?

মাথা বাড়িয়া সুরপতি সম্মতি দিলেন। হৈমন্তী মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে, এমন সময় সুরপতি হঠাৎ বলিলেন—দাড়া কই ?

—কাঙাল কলেজে গিয়েছে বাবা।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সুরপতি বলিলেন—হৈম, দাড়া খুব বড় হবে, দেখে নিস।
ও অন্য একম—

—তুমি ঘুমোও বাবা, কথা বোলো না—

—আমি বলে গেলাম হৈম, তুই মিলিয়ে নিস।

একটু পরে সুরপতি বলিলেন—গায়ে চাদর দিয়ে দে, আমার শীত করছে।

একদিন মাথায় ত্রে খুম বাড়িয়া কাঙাল শুনি লপাশের ঘর হঠাতে দাড়র ক্ষীণ গলার স্বর শাসিয়া আশিতেছে। দাড়া কি বলিতেছেন, কেহ উত্তর দিতেছে না।

মশারী তুলিয়া কাঙাল সুরপতির ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। প্রথম-প্রান্ত্রে সরস্বতীর জাগিয়া থাকার কথা, অতিবিক্রান্তিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পর পর কয়েকবার জাগিয়া দিদিমাও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কোথাও কেহ নাই, সমস্ত বাড়ীতে অগাধ নিদ্রাবত্তা খাঁ-খাঁ করিতেছে।

সুরপতির মাথা বালিশ হইতে নিচে বিছানার চাদরে গড়াইয়া পড়িয়াছে। মাথা তুলিবাদ বন্দবান চেঁচা কহিয়াও পারিতেছেন না। কাঙালকে দেখিয়া বলিলেন—মাথাটা খুঁচি বালিশে তুলে দিবে না দাড়া, কেউ তো আসছে না। কাঙালের বড় খারাপ লাগিল। জীবনের পরিণতি যদি এমন হয়, তবে মাতৃশ্রম বাঁচে কিসের আশা? দেবন অতিক্রান্ত হইবার আগেই তো আস-হুতা কবা উচিত পন্থতী তর্দশাব হাত হইতে বেহাই পাইবাব জন্য।

পরের দিন সকালে সুরেশভক্তার বলিলেন, দিন ও টে. কিনা সন্দেহ। কাঙাল কলেজ এবং প্রতাপ অফিস কামাই করিয়া বাড়ীতে থাকিয়া গেল। তদুপরে অনেক মাছ বাসা হইয়াছিল—সংস্কৃত আর হৈমন্তী পরামর্শ করিয়া কাঙাল কাঁসিয়াছিল। অন্য দিন হঠাতে বেশী মাছ দেখিয়া দিদিমা বলিলেন—এত মাছ কেন গো?

সংস্কৃত বলিল—শাও না মা। সস্তা খেয়ে প্রতাপ নিয়ে এসেছে।

দিদিমা হঠাৎ গুপব মাথা বাড়িয়া কাদিতে লাগিলেন। বলিলেন—আমাকে তোরা সবাই কেন ঠকাচ্ছিস, খাঙ্গল কথাটা কেন বলছিস নে?

কিছুতে ঠাঁহাকে খাওয়া নো গেল না।

তদুপবেলা সুরপতির শাসকট ভীষণ বাড়িল। এক একবার দম লইবার সময় মনে হইতেছিল, প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

হৈমন্তী কাঙালকে বলিল—একবার তুই চট করে সুরেশবাবুর কাছে যা, সঙ্গে নিয়ে আসবি অবস্থাটা বলে—

গায়ে একটা জামা গলাইয়া কাঙাল সুরপতির কাছে আসিয়া দাঁড়াই-

সুৰপতি তাকাইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন কিনা কাজল বলিল না। সে বুঁকিয়া বলিল—দাঃ, আমি কাজল।

সুৰপতি কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন। বুকটা হাপরের মতো সমানে ওঠা-পড়া করিতেছে। গোষ্ঠানির মরে সুৰপতি বলিলেন—দাঃ, বৃকে বড কষ্ট—

আতম্বর কাজলের ভীষণ খাবাপ লাগিল, সে দৌড়াইল সুৰেশবাবুর বাড়ীতে। রিক্সা করিয়া সুৰেশবাবুর সঙ্গে যিহবার সময় দেখিল, প্রতাপ খালিপায়ে বাহির হইতেছে। বলিল—বাবা মারা গেছেন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবুর ঘড়িতে তখন তিনটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট। কুড়ি মিনিট আগেও কাজল দাঃর সহিত কথা বলিয়াছে।

সুৰপতির সঙ্গে দেওয়াব জন্য কাজল পাঞ্জাবি কিনিতে গিয়াছে। একটা নামাবলীও কিনিতে হইবে। পাড়ার ছেলেখা ফুলের মালা ধূপকাঠি ইত্যাদির কোগাড করিয়া ফেলিয়াছে। দোকানী রেডিমেড পাঞ্জাবির সূপ সামনে আনিয়া বলিল, কি মাপের চাই?

কাজলের স্তনিয়া অসুস্থ লাগিল। গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল—মাপের দরকার নেই, মাঝারি দেখে দিন। খাব জন্মে থাকে, তিনি মারা গেছেন।

দোকানীর এই মাপ জানিতে চাওয়ার কথা কাজলের বহুদিন মনে ছিল।

ছাই অস্ত্রে লোহা এবং আগুন স্পর্শ করিবার জন্য শ্মশানবন্ধুরা বাড়ীতে ঢুকিতেই দিদিমা অনেকদিন বাদে কাদিয়া উঠিলেন—ওরে তোর কোথায় শীতের মধ্যে রেখে এলি বুড়াকে—ও ঘে মোটে একলা থাকতে পারে না—

(কাজলের ভারেরী থেকে)

এখন অনেক রাত। সবাই ঘুমুচ্ছে, আমার পোষা বিড়ালটাও গুঁড়িসুড়ি বেয়ে মার ট্রাকের ওপর শুয়ে আছে। বহু দূরের রেলওয়ে-স্টেডিং থেকে শানটিং-এর শব্দ শুনতে পারছি। পাশের বাড়ীর মুকুলবাবুর পোষা কুকুরটা ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখে গরগর করে উঠছে।

আমার কেন ভাল লাগছে না, জানি না। দাঃ মারা যাবার পর থেকেই কেমন একটা চিন্তার পোকা মাথার ভেতরের সুস্থ কোষগুলি কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পর আমার চিন্তাশক্তি বেশ কিছুদিন অবশ হইয়াছিল, তা ছাড়া আমার বয়সও তখন ছিল কম। কিন্তু দাঃর মৃত্যু আমি খুব কাছ থেকে দেখলাম, মৃত্যুর কালো পোশাকপরা অতিদৌরিক শরীরটা একেবারে আমার গা ছুঁয়ে গেল। সে চলে গেল বটে, কিন্তু তার কণিক উপস্থিতির বিদ্যাক্ষণ মুহূর্ত্তলো আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

পালের ঘরের দরজা খোলা। এ ঘরে এই একমাস আগেও দাহু স্তরে থাকতেন। আলো পছন্দ করতেন না। বিশ্রামের সময়, আলো নেভানো থাকতো। অন্ধকারে দাঁড় সিগারেটের আগুন দেখতে পেতাম। গরমকালে দাহু হাত-পা নাড়তে নাড়তে আপনমনে গাইতেন—দীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।

মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী এ কথা জানবার জন্য সন্ন্যাসী হওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু মৃত্যু এসে একদিন সব কেড়ে নিয়ে বিষণ্ণ বাজাতে বাজাতে চলে যাবে—এটা সহ্য করতে হলে দৃঢ় মন দরকার। আমি বিশ্বাসের সঙ্গে দেখছি, আমার সে শক্তি নেই। মৃত্যু এসে অলক্ষ্যে আমার ঘরে দাঁড়াবে, তক্তানী তুলে ইঙ্গিত করে কঠিন আদেশ উচ্চারণ করবে—এমো : আমাকে চলে যেতে হবে। আমি পৃথিবীকে ভালবাসি, জীবনকে শীতের রোদুয়ের মত ভালবাসি। রুষ্টির দিনে জানলায় বসে ক্রমঘনায়মান অন্ধকারে অবিশ্রাম রুষ্টি দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে হয়, মাটির পৃথিবী ছয় ঋতু সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত বর্ষাকাল আকাশের ময়ূরকণ্ঠি রঙ—এসব ছেড়ে কখনো আমি যেতে পারবো না। কবিতা লিখি না—কিন্তু আমি কবি, আমি রসিক। মাটির সঙ্গে যে নাদীর বন্ধন, তাকে ছিঁড়ে যেতে আমি পারবো না। অথচ সে আমার কথা শুনেবে না, সে আমার ছেড়ে যাবে না, প্রতিজ্ঞা শুনে নিঃশব্দ অটহাস্য করে দিক-চিহ্নহীন অন্ধকারে আমাকে চিরকালের জন্য ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

বৈচে থাকার ভবে অর্থ কি? সমস্ত পৃথিবীটার সৃষ্টি না হলেও কৃতি ছিল না। আমি তো চিরদিনের জন্য তাকে নিজের কাছে রাখতে পারবো না, তবে সামান্য সময়ের জন্য পরে রাখার কি অর্থ?

অথচ ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবনের কি-যেন গূঢ় অর্থ আছে। জীবনের সার্থকতা কোথায়, কে যেন আমাকে কানে কানে বলে যায়। আধো-ঘুমের মতো আমি হাতড়ে বিছানায় খুঁজি—যেন সার্থকতার চাবিকাঠি কেউ আমায় কাছেই রেখে গেছে। পাই না, হাতে ঠেকে যায়ের গা। শেষ রাত্রে তরল অন্ধকারে হঠাৎ ভেগে-বাওয়া চোখে মাকে আঁকড়ে স্তরে থাকি। যেন মাকে ছেড়ে দিলেই আঁধার সমুদ্রের ঢেউ আমাকে ভাঙা-পানসীর মত ভাসিয়া নিয়ে যাবে কোথায়।

আমার স্বভাব বড় রুক্ষ হয়ে উঠেছে। হয়তো মানসিক অসুস্থিই এর কারণ। আমি বুঝতে পারি না, সবাই কি করে একে অস্বীকার করে হাসিমুখে বৈচে আছে। হয় তারা সবাই একযোগে বোকা, নয়তো আমার থেকে অনেক জানী। আজকাল বেড়াতে গিয়ে মাঠে মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে সব জঙ্গলায় অতীত অনুভব করি। কালো গোপাক-পরাক—একজন আমার পেছন পেছন আসে—তাকে আমি দেখতে পাই না, তাকে অনুভব করি। জানি দিন যত কাটবে, তার আব আমায় বাবধান ততই কমে আসতে থাকবে।

পরমেশ্বর বোনের স্বস্তরবাড়ী ব্যারাকপুরে। বোনকে স্বস্তরবাড়ী পৌঁছে দিতে সে গিয়েছিল, আমার সঙ্গে নিজেছিল। ছপুরবেলা তাব শুধীপতির বাড়ী খাওয়ারাওয়া সেবে গঙ্গার ধাবে গিয়ে বসলাম। এখানে লে'কজন কম, কাছেই মিনিটারী ব্যারাক। গঙ্গার পাড়ে বাবলার বন, দূর থেকেই দেখা যায় বাবলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে নদীর জল চিকচিক করছে।

উঁচু পাড়ে বসে ওপারে শ্রীরামপুরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছি, এমনি সময় নজরে পড়ল পাড়ের নিচেই কাদাব ও'ব পড়ে আছে একটা ছোট কাগজের বাড়িল—নীলসূতো দিয়ে বাঁধা। কি রকম মনের ভাব হলো—ছুতো খুলে টপ করে নিচে নামলাম জলের কাছাকাছি। তখন ভাঁটা চলছে, জল এসে কাগজগুলোকে স্পর্শ করে নি। যে ফেলেছে, কিছুক্ষণ আগেই সে এখানে ছিল।

সূতোটা না খুলে ভাববার চেড়া করলাম, এগুলো কি হতে পারে। বাজে কাগজ? দ'লল? বাড়ীভাড়া পুরোনো রসিদ? প্রেমপত্র?

খুলে দেখি প্রেমপত্রই বটে। ঘটনাটা উল্ল্যাসেব মত খোলাচ্ছে—ডায়েরী'ব ছেঁড়া-পাতায় কাঁচা হ'বে লেখায় ভুল-বানানে প্রায় পনেরো-এড়িটি প্রেমপত্র নীলসূতো দিয়ে বাঁধা। যাকে লেখা, তাব জীবনে হয়তো এগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এতদিন সত্যে রাখা ছিল বাস্তব কোণে, বের কবে আজ গঙ্গার বুকে সেলে দিয়ে গেছে।

চিঠিগুলি তখন ১৬ নি। বাড়ী এসে প'বার-ঘবে টেবিল ল্যাম্প জেলে এক একখানা করে পড়ে ফেললাম। নাম দেওয়া নেই। তবে একটা বোঝা যায়, কোনো মেয়ে তার প্রেমিককে ভেদে'ব করে চিঠিগুলি লিখেছিল। চিঠির নীচে লেখা—'ইতি'তোমা' মিতা'। স'দা'নেও 'পাণে' মিতা'। কাছেই মিতা; তার নাম নয়। এদেশ ভালোবাসা পরিণতি লাভ করে নি, চিঠি ফেলে দেওয়া থেকে তা বোঝা যায়। ওকট'ত লেখা—তোমাকে অনেক দন পর দেখলাম। মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। সত্যি, তার সকাল থেকে দিনটা খুব ভালো লাগে। তোমার কা' থেকে যা আশা করে'হলাম তা'ব থেকে অনেক বেশী পেলাম। 'গব'নের কা'ছ প্রার্থনা কর, তোমাকে সাবা-ভাবন এখন এমন করেই পাই। ২১ত—তোমা' মিতা। তা'ব এক'ভেত--তুমি চলে গেলে, কল্প একবারও গো বললে না—যাচ্ছ। হয়তো ভুল হয়ে গেছে, হয়তো তুমি দেখো নি দশভার পাশে আমি ঠাঙিয়ে'লাম গোমার পছন্দসই সেই ডুরে শাড়ীটা পরে। আমার এক বন্ধু বলে'ছিল, ভালো বাসলে ত'ব পেতে হয়। আমার ভাগ্যে তাই আছে। সা'ভাবন হয়তো কেবল তুমিই পাবো। কেন যে এমন ভুল করলাম। টিহি—তোমা'র খুব মিতা।

অল্প কেউ পড়লে হয়তো মনে মনে বিরাট এক গল্প তৈরী করে নান্নিকার হুখে সন্ধ্যাটা বৃষ্টিবান হয়ে কাটাতো। এক বছর আগে চিঠিগুলি পড়লে

আমিই অচেনা মেয়েটির কথা ভেবে বঁটী দুই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু আজ আমার মনে এক উল্টো প্রতিক্রিয়া হলো। বাইরে থেকে বাতাস এসে বার বার টেবিল-ল্যাম্পের আলো কাঁপিয়ে দিয়ে দেওয়ালের কালেক্টরের পাতা নিয়ে খেলা করছে, বাড়ির সামনে শম্ভুপাগলা এসে প্রতিদিনের মত খোঁচা খোঁচা দাডিওয়াল মূখ তুলে টানা-সুরে বলে যাচ্ছে—ভাত খাবো ভাত খাবো, ভাত—ভাত—ভাত। পাশের বাড়ীর ছাদে কে ডমডম করে কমলা ভাঙছে। এর মধ্যে আমার মনে বিচিত্র অসন্তোষের ঝড়। চিঠিগুলো ব প্রেরক এবং প্রাপককে যেমন আমি কোনোদিনই ভানতে পারবো না, তেমনি আমার প্রেমের উদরও আমি কোনদিন পাবো না। আমার অস্তিত্বতান সঙ্গে চিঠি বাপারটা হঠাৎ মিলেমিশে এক হয়ে গেল। বাতি নিভিয়ে দিতেই তারাদের ছায়া নিয়ে একবাশ জোৎস্না লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপরে। বাতাস বাইরে গাছ-গুলোকে মরে পুঁজ করে এক একবার ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল। বাতিটা থেকে পোড়া সলতেব কেমন একটা গন্ধ আসছে, নামিয়ে রাখতে গিয়ে নতুন পড়লো মেঝের জোৎস্নার ফালি। আমার মাথা ভেতরে চেতনাটা অতীতকে ভাল-বাসে, নাম না-ভানা ফুলের গন্ধে ভাবাক্রান্ত অতীতের স্নেহগুলোর ফিরে যেতে চায়—সেই চেতনা শেকল ছিঁড়ে হঠাৎ লাকালাকি শুরু করে দিল। চাঁদের আলোড়িত দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম একশো বছর আগেকার ঐতিহাসিক সবল সুন্দর জীবনের কথা, যেমনটি পড়েছি বই-এ। সে-জীবনের সঙ্গে তুলনা করে বর্তমানের ওপর আমার বিতর্ক হল, অসংস্কৃতি বেড়ে উঠে মনে হতে লাগলো—পাই নি, পাবো না।

তখনও শম্ভুপাগলা সমানে চিংকার করে চলেছে—ভাত—ভাত—ভাত।

একদিন মিউজিয়ামে গেলাম। বহুদিন আগে ব'বাব সঙ্গে গিয়েছিলাম, আর এই। সময়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দু'বেশী দিন নয়—কিন্তু আমিই পালটে গেছি।

মিউজিয়ামের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঘুম-ঘুম ভাবটা আমার ভালো লাগে। কবিভ্রো-বের সারি সারি পানীমূর্তি, কল্ল আলোয় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীক কঙ্কাল, মরিকাভাস্বর থেকে অ'না বিচিত্র ব'বাব—এসবের মধ্যে, আমার মনে হয়, কি যেন লুকিয়ে আছে। বহুদিন আগের হাবিয়ে-নাওয়া ম'নুষ্যের উপস্থিতি আমার চোখের সামনে আমার মনের ভেতরে অপ্রভব করতে পারি।

লক্ষ্য বস্তুগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকিয়ে মন বাধাবদ্ধ মানতে চান না—টুকে কবে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ফেটে পড়ি। ভূ-বিজ্ঞান প্রত্নতত্ত্ব-জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যে লুকানো আছে মানুষের জন্মের ইতিহাস—সবকিছু একসঙ্গে না জানতে পেরে বালি মকে হয়, ঠকে গেলাম—বাক্য রয়ে গেলাম। একটি ঘরে বৌদ্ধযুগের মূর্তিশিল্প সংগৃহীত। "আমি ইক্বনোগ্রাফির ধার ধারি না, অথচ কি-এক আকর্ষণে আজ

চুকেছিল। ভালোই করেছিল। তার ফলে আমার এক চমৎকার অভিজ্ঞতা হলো।

পাথরের এক নারীমূর্তি আমার বড় ভালো লেগে গেল। মূর্তিকারের নাম নেই। শুধু লেখা : মূর্তিটি খ্রীষ্ট-জন্মের আগে তৈরী, সম্ভবত শিল্পীর প্রেমসীর প্রতিকৃতি। ঘরের আরও অনেক তুলনায় আলো যথেষ্ট নয়। ফলে সব সময়ই কেমন আধো-আলো আধো-অন্ধকার পরিবেশ। সেই মুহূর্তে আলোকিত যন্ত্র-যন্ত্র পরিবেশে মূর্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

স্পষ্ট দেখলাম, মেরুটি হাসছে।

তখন কাছাকাছি কোনো মানুষ ছিল না, খুব কাছে গিয়ে আমি মুখের দিকে তাকলাম। হাসি পাথরে উৎকীর্ণ বটে, কিন্তু আমার মনে হলো সে যেন এইমাত্র আমাকে দেখে হেসে উঠেছে।

আমার সে সমস্তকাব মনেব অবস্থা বোঝানো যায় না বলেই তেমন চেষ্টা করছি না। দরকারই বা কি, এ ডায়েরী আমি ছাড়া খবর অগা-কেউ পড়বে না। বালি মনে হতে লাগল, কবে যেন এর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বহুদিন আগে উপহার পাওয়া আস্তরের শিশি বাস্তু থেকে বার করে শুকলে তার গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পুবে, দিনটা আমার ফিরে আসে, তেমনই ওখানে দাঁড়িয়ে মনে হোল অতীত আমার সবাই জড়িয়ে আছে। বাতাসে ধূপের মুহূর্ত গন্ধ পেলাম, প্রাচীন যুগের মহিলারা ধূপের ধোঁয়ায় ঢুল শুকোতে বসলে যেমনটি পাওয়া যেতো। অনুভূতি এত তীব্র ও স্পষ্ট যে, আমি নিজেকে সরাসরি সে-যুগটার সঙ্গে জড়িত বলে বোধ করলাম।

বাড়ী আসতে আসতে মনে হলো, আমি এবং সে-অস্তিত্ব একই সময়ে অবস্থিত নই—দেশকালের বিভিন্ন স্তরে কবে থেকে আমরা পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই কোনো এক ফ্রন্টলেন্ড এসে মিলিত হতে পারছি না। শুধু খুঁজছি, শুধু খুঁজছি।

কবে যেন সে আমার জন্য কুটিরমাগে দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে থাকত। সবসময় মনে কি-যেন হারানোর যন্ত্রণা, খুঁজে না-পাওয়ার অতৃপ্তি।

কাঞ্চল

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কলেজে যাঠবে বলিয়া কাঞ্চল বইপত্র গোছাইতেছে, হৈমন্তী ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁ রে, কোলকাতার অবস্থা কেমন? শুনলাম লোকজন নাকি খুব পালাচ্ছে? ভট্টাচার্যপাড়ার বকুলের বাবার যে-বাড়ীটা বালি পড়েছিল, সেটার এক পরিবার এসে উঠেছে। এখানে থাকবে না বলছে, আরও গাঁয়ের দিকে চলে যাবে।

কাঞ্চল বলিল—আমি তো এখন পর্যন্ত ভয়ের কিছু দেখলাম না। লোকজন কিছু গাঁয়ের দিকে পালায়ছে ঠিকই, রাজ্যবাট একটু ঝাঁক। ঠেকে আগের

চেয়ে। তবে অফিস-কচারী ঠিকই চলছে—

কিছুই বুঝতে

—আমাদের এদিকে ভয়ের কিছু নেই, না ?

—দূর ! কোথায় রইল যুদ্ধ, কোথায় আমরা ! যারা পালিয়েছে তারাও ফিরলো বলে, দেখ না।

একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় কাজল দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার খবর পায়। শেরশালদহের মোড়ে হকার ইঁাকিতেছে টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম ! বহুলোক ভিড় করিয়া পড়িতেছে এবং সব আলোচনা করিতেছে। একবারা কিনিয়া কাজল পড়িয়া দেখিল। পোলিশ-করিডর দাবী করিয়া হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছেন, যুদ্ধ শুরু হইয়াছে।

ক্রমে কলিকাতার চেহারা পাল্টাইল। ল্যাম্প-পোস্টের আলোয় কালো ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হইল। এ. আর. পি. বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নাম-নাম লিখিয়া লইতে লাগিল, প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে লাগিল। অন্ধকার রাস্তা ইঁটিতে ইঁটিতে কাঃলেব মনে একটা বিশ্রী ভাব যেন চাপিয়া বসিত। শীতকালে সন্ধ্যা হয় বিকাল শেষ হইতে না হইতেই—কলেজ হইতে বাহিব হইয়া কাজল দেখিত, বিশাল শহরের উপরে অন্ধকার দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া আসিতেছে। মালভৌনগরে বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কাঠালিয়ার কাছে একটা বিরাট মাঠ সৈন্য বা কাটাভাবে ঘিঘিয়া সেখানে বাইফেল প্রাকটিস করে। সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

সকালে উঠিয়া শোনা যায়, দুব হইতে বাইফেলের আগুন্ড আসিতেছে। সুন্দর সকাল। জানলার পাশে ঠগবগাছটার সকালের বোদ্ধর আসিয়া পড়িয়াছে, একটা টুনটুনি পাখী বাববার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাব ডালে আসিয়া বসিতেছে। মিস্ট্র আমেজেব ভিতর বাইফেলের শব্দে কাজলের মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। তাহাব জীবনের সহিত বন্দুকের শব্দ মোটেই খাপ খায় না। একদিন রাস্তায় আদিনাথবাবু সহিত দেখা হইয়া গেল। সে প্রশ্ন করিয়া বলিল—ভালো আছেন সাব ?

আদিনাথবাবু কাজলকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—তুই কেমন আছিস অমিতাভ ? তোর চেহারা বড় খাবাপ হয়ে গেছে, অসুখবিসুখ করেছিল নাকি ?

—না সার।

—তবে এমন চেহারা কেন ?

কাজলের মনে হইল আদিনাথবাবু তাহার মনের কথা বুঝিবেন, তিনি তাহাকে সমাধানের পথ বলিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল, জিনিসটা সে সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। জীবনের কোন অর্থ নাই, একথা ভাবিয়া তাহার বয়সী একটি ছেলের রাত্রে ঘুম হইতেছে না, ইহা রীতিমত হাস্যকর। এই কথা ভাবিয়া শরীর খারাপ হওয়া নিঃসন্দেহে অন্তরের কাছে অবিস্মৃত। সে বলিল—আমি ঠিক শুদ্ধি বলাতে পারছি না

বল

—সার, ঐ দুই দিন ধরে বেঁচে থাকার মানে কি ? এত কষ্ট করে পড়াশুনা করা, জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, জীবনকে ভালবাসা—এব কি অর্থ ? যত্নের পর তো একটা ভয়ানক অঙ্ককার আমাদের গ্রাস করে নেবেই ।

মালতীনগর স্টেশনের লোকের ভীড়ে বাগ হস্তে আদিনাথবাবুর সামনে দাঁড়াইয়া কথাটা ভীষণ নাটকীয় শোনাইল । কাজল বুঝিতে পারিল, বিষয়টা সে পরিষ্কার করিতে পারে নাই—কিছুটা ফাঁকা আওয়াজ হইয়াছে ।

কিন্তু আদিনাথবাবু মুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হইল । কাজলেব কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—চল, কোনো জরগায় বসে কথা বলি ।

স্টেশন ছাড়িয়া নিজের পথে পড়িয়া একটা বাধানো কালভার্টের উপর আদিনাথ বাবু বসিলেন । বলিলেন—বোস আমার পাশে ।

কাজল বসিল ।

কিছুক্ষণ আদিনাথবাবু কথা বলিলেন না, বাগটা পায়ের কাছে নামাইয়া চূপ-চাপ বসিয়া রহিলেন । কাজলও পাশে বসিয়া রহিল । সময় কাটিতেছে, কাহারও খেন কথা বলিবার চাও নাই ।

আদিনাথবাবু হঠাৎ কাজলেব দিকে তাকাইয়া গম্ভীর স্বরে মথ পড়িবার মত করিয়া বলিলেন—তোমার জীবনের সুখ একেবারে চলে গেছে অমিতাভ, আর কখনও আসবে না ।

কাজল চমকাইয়া উঠিল । কথাগুলি তাহার গভীরে খেন তীক্ষ্ণমুখ শলাকার মত ঝিঝিয়া গেল । মাস্টারমশাই ঠিকই বলিয়াছেন—তাঁহার মত করিয়া আর কে বুঝিয়াছে যে সুখ আর কখনও আসিবে না ? সঙ্গে সঙ্গে কাজলের মেরদও বাহিয়া একটা ভয়ংগু শ্রোত নিচে নামিয়া গেল । যে অসুখ শুরু হইয়াছে, তাহা কখনও সারে না ।

—অমিতাভ ।

—স্মার ?

আদিনাথ বলিলেন—যে চিন্তা করে, তার জীবনে কখনো সুখ আসে না । তুই জীবনের একেবারে আসল জাম্বগায় ঘা দিয়েছিস । ভাবতে অবাক লাগছে, এত অল্প বয়সে তুই এ চিন্তা পেলি কোথা থেকে ।

—একটা কথা বলব স্মার ?

—বল ?

—কি মনে হয় আপনার জীবন সম্বন্ধে ? আপনি কি বিশ্বাস করেন যত্নভাতেই জীবনের শেষ ?

—মতি উত্তর দেবো ?

—তা নইলে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো কেন ?

—আবার কিছুই মনে হয় না। অনেক দিন আছি পৃথিবীতে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই আমার চিন্তাশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। এখন আমি দেনার্স জর্জিট—ভবিষ্যৎহীন বুদ্ধ। আমার এই বর্তমানের চেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর আর কি হতে পারে? তবুও অমিতাভ আমার মন চায়, একটা-কিছু অর্থ থাকুক এ-সবেব। কিন্তু আমি জানি, সমস্ত জিনিসটা signifies nothing—কেবল sound অমিতাভ, কেবল fury, আর কিছু নয়।

অকস্মাৎ আদিনাথবাবু হো-হো কান্না হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ওদব চিন্তা একদম বাদ দিয়ে দিয়েছি। এককালে খুব ভাবতাম, বুঝলাম? এখন গোদের জগৎ বেঁচে আছি বলতে পারিস। তোর মানুষ হবি বড় হবি—বিশ্বাস কর, আমার খুব ভাল লাগবে দেখতে।

—আপনি পুনরায় বিশ্বাস করেন সার?

—তুই বিশ্বাস করিস?

—করতে ইচ্ছা হয়, পাবি না।

—কেন?

—বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখলে কোনো মানে হয় না বলে।

—বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না, তা মিথ্যে?

—তাকে হৃদয় দিয়ে মেনে নেওয়া যায়, বাস্তবে স্বীকার করা যায় না।

—স্বীকার না কবায় বাহ্যিক কি অমিতাভ? তাতে তো শুধু কষ্ট—

—কষ্ট তো বটেই মাস্টারমশাই। স্বাকার না করায় কিছু বাহ্যিক নেই, আমি বিশ্বাস কবার জগৎ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু বুদ্ধিতে বাধা দেয় যে।

—অমিতাভ, আমি তোকে আশীর্বাদ কবি, তোর জীবনে খেন বিশ্বাস আসে, তুই খেন কখনো পরাজিত না হোস।

—শুধু বিশ্বাস দিয়ে কি হবে স্যার, যদি আসলে কোনো অর্থ না থাকে? শূন্যতায় বিশ্বাস কবা কি নিজেকে ঠকানো নয়?

আদিনাথবাবু কাজলের কানে হাত দিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেন, তারপর বলিলেন—তবু সে নিছক sound আর fury থেকে ভালো। বড় হয়েছে তোর মনে হবে, বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে। মনে হবেই দেখিস।

আদিনাথবাবুর সঙ্গে কাজলের এই শেষ দেখা। এর কিছুদিন বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। বোম্বেকেশ হঠাৎ আসিয়া খবরটা দিয়াই আবার চলিয়া গিয়াছিল।

সাত্রে বিছানায় শুইয়া পরদিন আদিনাথবাবু আর ঘুম হইতে ওঠেন নাই। ঘুমের ভিতরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সংসারের জগৎ একপন্থসাপ্ত রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু দেবা পাই-পন্থা পর্যন্ত মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের শুরু। ৩রা সেপ্টেম্বর

ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যুদ্ধে বায়ল। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ভিতর পোলাণ্ডের পতন হইল। ওয়ারশ-তে নাজী-বাহিনীর এম্বিশন-বুটের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

প্রথম দিকে কাজল কলিকাতার বিশেষ-কিছু অস্বাভাবিকতা দেখে নাই। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, মানুষ ততই দিশেহারা হইয়া পড়িল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জাপান হঠাৎ পার্শ্বহারবার আক্রমণ করায় আমেরিকা যুদ্ধে নামিল। ইহার কিছুদিন বাদে ব্রহ্মদেশের পতন হওয়ার ভারতবর্ষ অনুভব করিল, বিপদ একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শুরু হইল বায়ল-বিছানা ঘাড়ে গ্রামের দিকে সদলে পলায়ন। তাড়া-বাওয়া প্রাণীর মত অবস্থা।

অনেক সময় কাজলের ক্লাস করিতে ভাল লাগিত না। পরমেশ্বরের সঙ্গে রাত্তার ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হইত, মানুষ বায়ল যুদ্ধ করে মরছে কেন? এমনিই তো মরবে ক'দিন বাদে।

সে বলিত—পরমেশ, যুদ্ধ বড় বৌভৎস খার অর্থহীন, না?

—হয়তো তাই, কিন্তু যুদ্ধেরও অনেক সৃষ্টিশীল দিক আছে। কল-কারখানা বাড়ছে, নতুন-নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। কত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হবে হয়তো পরে। প্রথম মহাযুদ্ধেও ফসল যেমন রেমার্ক, রুপার্ট ব্রুক—

—ভালো সাহিত্যের জন্ম, নতুন আবিষ্কারের জন্ম কি মানুষ মারতে হবে?

পরমেশ হাসিল। বলিল—তুমি নিজেই বলে থাকো জীবনের কোন অর্থ হয় না, জীবনটা দীর্ঘ দিন ধরে ক্লান্ত হবার একটা পন্থা মাত্র। মানুষের জীবন থাকলো কি গেল, তাতে তোমার দুঃখিত হবার কারণ নেই।

কাজল ভাবিয়া-দেখিল, পরমেশ ঠিকই বলিয়াছে। তাহার দর্শন অনুযায়ী যুদ্ধে মনমরা হইবার কারণ নাই।

অথচ এ কথাও ঠিক যে, সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার আলোকহীন নিম্প্রাণ সন্ধ্যা, লোকজনের পলায়ন, প্রতিদিন যুদ্ধের নূতন নূতন নারকীয় সংবাদ তাহার মনে এত অবসাদ আনিয়াছে যে আই-এ পরীক্ষায় যেমন করা উচিত ছিল, তাহা সে পাবে নাই। পরীক্ষার হলে বসিয়া অনেকবার কাগজ জমা দিয়া উঠিয়া আসিবার কথা ভাবিয়াছে, কিন্তু মায়ের কথা ভাবিয়া পারে নাই।

মায়ের আশা সে বড় হইবে। টাকার দিক দিয়া নহে, যশের দিক দিয়া। রাত্রে শুইয়া সে বাচ্চাছেলের মত মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া থাকে। সারাদিনের চিন্তায় পরিশ্রমে ক্লান্ত মস্তিষ্ক তাহাতে বিশ্রাম পায়। পৃথিবীর বড় বড় কাকির ভিতরে মায়ের ভালোবাসাই তাহার কাছে একটুকু সার-পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। প্রায় রাত্রে হুইজনে নিশ্চিন্দপুরের গল্প করে, যৌনাহাড়ীর গল্প করে। গল্প কিছুকণ চলিবার পর কাজল টের পায়, মা কাঁদিতেছে। তখন সে বলে—মা, তোমার ছোটবেলার গল্প বলো।

হেমন্তী কাজলকে বুকের কাছে লইয়া বাথার হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার গঙীন শৈশবের গল্প করে ।

ভারী সুন্দর ছিল সে-সমস্ত দিন । কত ভায়গায় ঘুরিয়াছে বাবার সঙ্গে । এক ভায়গায় সংসার পুণাতন হইতে না হইতেই সব-কিছু গুটাইয়া আবার নূতন স্থানে যাত্রা শুরু হইত । জামালপুরে তাহাদের পানের বাড়ীর সেই সুমিত্রাদি কি ভালোই না বাসিত তাহাকে । স্বামী রাত্রে মদ খাইয়া বাড়া ফিড়িত, তাঁস থাকিত না । সুমিত্রাদি জামাকাপড় ছাড়াইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া বাতাস করিয়া ঘুম পাড়াইত । একদিন অভিযোগ করিতে গিয়া কি মারটাই না খাইয়াছিল স্বামীর হাতে । হেমন্তীকে ডাকিয়া সে একদিন গহনার দোখাইয়াছিল । শপ করিয়া কত কিছু গড়াইয়াছিল সুমিত্রাদি, খুব লখ ছিল ভালো করিয়া সংসার করিবে । হয় নাই । মাতাল অপদার্থ স্বামী কোথা হইতে আর একজনকে বিবাহ করিয়া আনিল । কতকদিন বাদে সুমিত্রাদি গেল পাগল হইয়া । তাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল । সুমিত্রাদি আর সাবিয়া গুঠে নাই, তাহার সংসার করিবার সামর্থ্য হয় নাই ।

—তখন ভাবি টক বেতে ভালোবাসতাম, জানিস বুড়ো । আমি আর দ্বিদি সাবাদিন এ-বাগানে ও-বাগানে ঘুরতাম চালাতে কবচচার খোঁজে । এক বুড়ো বাগানে লুকিয়ে ঢুকেছিলাম । বুড়ো দেখতে পেলে আমাদের ডেকে বলল—লুকিয়ে নিচ্ছ কেন থুকাশ, যত ইচ্ছে নিয়ে যাও, কেউ কিছু বলবে না । কোপায় থাকো মা তোমরা ?

কাজলো মায়ের জন্য ভাং হয় । মা জীবনে কিছু পায় নাই । কত অল্প বয়সে বিয়া হইয়াছে, এখন পুণাতন স্মৃতিমন্তন করিয়া দিন কাটায় । বাবা মায়া খাইবার সব হইতে কি-ই বা বহিয়াছে । একটা বড় রকমের কিছু করিয়া মাকে থুশী করিতে হইবে । সে বলে—একটা গল্প শুনে মা ?

—কি গল্প ব বোকন ?

সে ফিরোদব সেলোগাব-এব 'দি ছপ' গল্পটা মাকে বলে । সেলোগাব এমন-কিছু বড় সাহিত্যিক নন । কিন্তু গল্পটা তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল । আশি বছরের এক বৃদ্ধের গল্প । মায়ের সহিত বাস'কে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া বৃদ্ধের শিশু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল । বাচ্চাটি বেশী দূরে গিয়া পড়িলেই মা ডাকিয়া বলিতেছে—ওদিকে যাস নে, পড়ে যাবি । পরের দিন বৃদ্ধ কাণ্ড কামাই করিয়া সাবাদিন বালকের মত নির্জন পাহাডের ধারে খেলিয়া বেড়াইল । বৃদ্ধের কেহ ছিল না । শৈশবে সে মায়ের স্নেহ পায় নাই । অশক্ত শরীরে পাহাডের পথে দৌড়াইতে দৌড়াইতে কেবল তাহার মনে হইতেছিল, মা পিছন হইতে সাবধান করিয়া দিতেছে—ওদিকে যাস নে, পড়ে যাবি ।

সবলহীন আত্মীয়হীন বৃদ্ধের গল্পটা কাজলের মনে দাগ কাটিয়াছিল । বলিতে

বলিতে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। শেষ দিকটার তাহার গলার কাছটার একটা কান্না আটকাইয়া যাইতেছিল। অথাক হইয়া সে লক্ষ্য করিল, জীবনের অর্থহীনতা আবিষ্কারের পরেও সে জীবনকে কত ভালবাসে। অশ্রুতরু কণ্ঠে বলিল—কত লোক জীবনে কিছু না পেয়েই মরে যায় মা।

হৈমন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—ওমা, বুড়ো তুই কাঁদচিস? তুই না বি. এ. পড়িস? বই পড়ে কান্না।

—আমি মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য একটা কিছু করবো, দেখে নিও। সারা জীবন যাগ কষ্ট পাম, চোখের জলে ডুবে থাকে, আমি তাদের নতুন-পৃথিবী তৈরী করে দেবো।

—আমি জানি বাবা তুই, পারবি।

—বি. এ.-টা দিয়ে আমি চাকরী নিয়ে চলে যাবো কোন নিজ ন জায়গায়। যোপাহাড়ীর স্কুলে মাস্টারী করবো হয়তো। তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো মা?

—তোকে ছেড়ে কোথায় থাকব বুড়ো? তুই তো আমার সব।

—আমি বেশী টাকাপয়সা দিতে পারবো না মা, কিন্তু তোমাকে শান্তি দিতে পারবো। তাতে তুমি হুপ্তি পাবে না?

—আমার কিছু চাই নে। কীর্তিমান স্বামী পেয়েছি, পুত্র যদি বিদ্বান হয়, তবেই আমার সমস্ত পাওয়া হবে।

কাজল আবার শুইল বটে, কিন্তু খুম আসিল না। বলিল—মা আমার একদম ভাল লাগছে না এই জীবন। পড়াশুনা হয়ে গেলেই বোডিয়ে পড়ব যেখানে হোক। এই তো আর কাঁদন পর থেকে মাঠে শিশির পড়তে শুরু করবে। রাস্তার পরিষ্কার আকাশে ঝকঝক করবে নক্ষত্র। পৃথিবীটা আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—আমি বাইরে বেরুব মা, আমি কিছুতেই ঘরের কোণে সারা জীবন কাটাতে না।

—তোর বাবার রক্ত রয়েছে যে তোর শরীরে, কে তোকে আটকাবে বোকন?

—বাঁচতে গেলে যে বিশ্বাস লাগে, তা কেন পাই না?

—ঈশ্বরে বিশ্বাস?

—তুই ঈশ্বরের নয়, জীবনের বিশ্বাস।

—বিশ্বাস আসবে, দেখতে পারি। মনটা খুব উদার খুব বড় করে রাখিস, যাতে সুখ-দুঃখ সবই সেখানে ধরে। দেখাবি, দুঃখ আর সুখ তুলামূল্য হয়ে গেছে—দুঃখের জন্য আর কষ্ট নেই।

কাজলের মনে হইল, মা এইভাবে দুঃখকে জয় করিয়াছে। সুখ আর দুঃখের বিরাত তার মনের ভিতর ধরা করিয়া দুইটাকে এক করিয়া দেখিতে সক্ষম হইয়াছে মা! এইটাই বাস্তব নৈশ্বের মূল কথা।

পরশেশ বলিল—কি অবিন্যাস, চূপ করে আছে যে?

কাঞ্চল যুথ ভূমি জাহাজের নিকে ভাকাইতে সে অবাক হইল। পূর্বের সে আশাহত পাখী ভাবটা কাটিয়া গিয়া গুতন একটা উত্তমের আলো কাঞ্চলের যুখে প্রতিফলিত হইয়াছে। চোখচোখ চকচক করিতেছে।

—ভোমাকে বেশ উগ্রীভ হইলে মনে হচ্ছে।

—পরমেশ, আমি বোম্ব হুপ করছিলাম। জীবনের অর্থ হয়তো সত্যিই নষ্ট—আমার এক মান্দারমণি বলতেন, জীবন শুধুই sound আর fury, আর কিছু নয়। শেকসপিয়ারের হয়তো ঠিক তবু, বেঁচে থাকার মানে একটা গুণ্ডে বের করবোই পরমেশ। লোক দুলানো দর্শন নয়, বাস্তব একটা-কিছু দিয়ে যাবো—

পরমেশ কাঞ্চলের হাত চাপিয়া ধরিল —আমি বিশ্বাস করি অমিতাভ, তা তুমি যাবে—

—আমাকে দূরে চলে যেতে হবে মানুষের থেকে, আবণ্ড বেশী করে মানুষের ভেতর দিয়ে আসার জন্য। আমি পেছনে ফাঁটবো পরমেশ।

হইতেন কাটিয়া মিউজিয়ামে গেল। পরমেশ জানে, কাঞ্চল সঙ্গে থাকিলে মিউজিয়াম দেখান ভালো আনন্দ। বেলা গড়াইয়া বিকালের দিকে যুঁকিয়াছে। মিউজিয়ামে লোক প্রায় নাহ বলিলেই হয়। বড বড মূর্তি এবং দুপ্রাপ্য অনেক বস্তু বোমার ভয়ে মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘর-গুলি কেমন ল্যাঁড়া-ল্যাঁড়া লাগে।

পরমেশ বলিল—অনেক কিছু নেই—‘রিপ্লেসড’-লেখা টিকিট পড়ে আছে।

—ইউনিভার্সিটিও বহুবমপুবে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে, জান না?

বহুদিন বাদে কাঞ্চলের মনে আবার পুরাতন আনন্দটা ফিরিয়াছে। মিউজিয়াম হইতে বাহির হইয়া দেখিল বৌদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে, শীতকালের বেলা নাহ বলিলেই চলে। গেটের সামনে ফুটপাথের উপর ইটের বেড়া দিয়ে ঘেরা কক্ষচূড়া গাছ। তাহার ডালগুলি অশুভিগন্তের পটে আঁকা বলিয়া মনে হইতেছে। বাতাস নাই, সব নিরুন্ম। সন্ধ্যার কেমন একটা বিষয়তা—তাহাদের দিকে ভাকাইয়া বৃষ্টি ওঠে তজ্জনী বাষ্পিয়া চুপ করিতে সঙ্কেত করিতেছে।

পাতলা জামা গায়ে কাঞ্চলের শীত কবিতোছিল। ফিরিতে এত দেবী হইবে, তাহা সে বৃষ্টিতে পাবে নাই। পরমেশকে বলিল—চলো বাত হয়ে এলো।

ধর্মতলার মোড়ে একটা বাচ্চা মেয়ে, নোংরা জামা-পরা, কাঞ্চলের গায়ে ধাক্কা খাইল। কাঞ্চলের হাত হইতে বইখাতা ধুলান্ন পড়িয়া গেল। পালায় নাই মেয়েটি, ভয়ে পালাইতে পাবে নাই। আতঙ্কে কেমন-যেন হইয়া গিয়া তাহার দিকে ভাকাইয়া আছে। বয়স বেশী নহে, নয় কি দশ হইবে—হৃদয়দ্রব চোখা, কিন্তু চোখদুটি উজ্জ্বল। কাঞ্চলের হঠাৎ ‘ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ’ এর ডিক সইসেজারের ছোট্ট বাজবোটির কথা মনে পড়িল। কাঞ্চল ভাবিল—ও ভেবেছে, আমি ওকে বকবো। কি সুন্দর চোখ দুটো ওর।

মেয়েটির হাতে একখানা দামের পাউরুটি, এটা কিনতেই সে আসিগ্লাছিল, যান্তা পার হইয়া ফিরিবার সময় থাক্কা ল গিয়াছে। পাউরুটি শক্ত করিয়া খরিয়া মেয়েটি কাঠ হইয়া আছে। মেয়েটির চোখ, পাউরুটি আঁকড়াইয়া খরিবাব ভজি, সন্ধ্যাবেলার বিষয়তা—সব মিলাইয়া কাজলেব মনে একটা ঢেউ ফুলিল—মেয়েটির চোখে চোখ রাখিয়া সে হাসিল। মেয়েটি হাসিল না।

কাজল বলিল—তোমার নাম কি খুঁকী? কোথায় থাকো?

উত্তর না দিয়ে মেয়েটি বাস্তার ওপারে তাকাইল, সেখানে এক অন্ধ ভিখারী ঘোড়ার ডল খাংখাব চৌবাচ্চার পানিতে বসিয়া আছে। কাজল বলিল—ও কে হয় তোমার—বাবা?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল। কাজল পকেট হইতে একটা আনি বাঁহির করিয়া বলিল—এটা তুমি নাও। 'কছুতেই লইবে না। অনেক সানাসানান পর হাত হইতে আনিটা লইয়া সে সঙ্কচিত ভাবে হা'সল, তাৎপর্য হঠাৎ ফিরায়া লোহার চৌবাচ্চাটা লক্ষ্য করিয়া দৌড় দল।

ট্রেনে জানলার পাশে বাসমা কাল সমস্ত বাস্তা ভাবিতে ভাবিতে চলল। ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ের ভিতরে কাঁপন ধরে। গলা ব্যাড়াহলে দেখা যায় কাল পুরুষ-মণ্ডলীর বেটেলজিয় সনাক্ততা ল'লে আভাষ একমক কাঁতেছে।

কাহারো গোপন-ছাউনির নিচে আঙন করিয়া হাত-পা সঁকিতেছে। হাঙ্গরায় শীতের ঘ্রাণ, পোড়া ডালাপালা ঘ্রাণ, বামারবিমানের ভয়ে পক্ষ্মী স্থানে আঙন জাল য় নাই।

ট্রেনেব এঞ্জিন হইতে বাব প্রয়েক উইসুলের শব্দ ভাসিয়া আসিল।

(কাজলের ডায়েরী হইতে)

গতকাল আমাদের একজন অন্যাক না এসয় একটা পিয়ার্স-স্ক্রুটি পাওয়া গেল। প্ৰমোদ লাট্‌বেরীতে বসে পড়ছিল, তাক না-কে আম একাই একটু ইন্টেলিগেন্ট বাস্তায়।

অন্যমনস্ত ভাবে চলতে চলতে ভেবে দেখলাম, আমার ভেতরে যে দ্বন্দ্বতা চলছে সেটা মোটেই আকস্মিক নয়। ছোটবেলা থেকেই গীতের গীতের পারদর্শী হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ একদিন বেঁচেয়ে পড়েছে। আমার সমস্তা অন্তর কাছে অবাস্তব, কিন্তু আমার কাছে অন্ধকারের ভেতর প্রজ্বলন্ত আঙনের মত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। চিন্তার একটা বিশেষ দাপ খ্যস্ত এসে থাকে গে'ছ, আমি যত্নকে অতিক্রম করতে পারছি না। হয়তো কেউই তা পারে না।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, চলা বন্ধ করে আমি সামনের তেতলা বাড়ির ছাদের ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছি। চোখ নামিয়ে নিলে ইটতে গুরু করবে, দেবি রাস্তার ওপারে মিষ্টির দোকানে গোলমাল—গোগা মত একটা লোকের ঘাড় ধরে বিশালদেহ দোকানদার কাঁকিয়ে দিচ্ছে, আর একজন তার কাণড়চোপড়ের ভেতর হাতড়ে কি খুঁজছে। রোগা লোকটি

হাতছোড় করে কি বলতে গেল—মারল তাকে এক রদ্দা, ছিটকে সে ফুট-পাথে গিয়ে পড়ল।

ভারি খারাপ লাগল ব্যাপারটা। হাতছোর করে লোকটা কি বলতে চাইছে, কেউ শুনছে না। রাত্তা পেরিয়ে ওপরে গেলাম—ভতমুণে সে একহাতে ভর দিয়ে উঠে বসেছে। দমকে গেলাম আমি। লোকটি রামদাস বৈষ্ণব। রামদাস বৈষ্ণবকে এণী মাংচে। রামদাস-কাকা।

রামদাস চমকে আমার দিকে তাকাল। কি চেহারা হয়ে গিয়েছে তার। চোখের নিচে গভীর কাল, চুল লালচে উদ্ভোদুদ্ভো। শরীর শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। মারের চোটে এখনও সে অল্প অল্প কাঁপছে।

রামদাস আমায় চিনতে পেরেছে। পুরনো দিনের মতই খুশী-খুশী গলায় বলে উঠলো—বাবাজী, তুমি।

দোকানদার এবং তার দুই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে? আপনারা মারছেন কেন একে?

দোকানদার খিঁচিয়ে উঠল—মারবে না তো কি সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করবে? চারআনা বজিলি খেয়ে এখন বলেছে, পয়সা নেই। শালা হলের বাচ্চা—

ইতর কথা এবং তাদের মুখ-চোখের ইতর ভাব দেখে আমার খারাপ লাগলো। বললাম—বৈষ্ণবকে মারতে হাত উঠলো আপনার। আবাব গালাগালও দিচ্ছেন—

—দান দান মশাই, এমন অনেক বোষ্টম দেখেছি। ভেক নিলেই বোষ্টম হয় না, ওসব লোক ঠকাবাব ফান্দ—

রামদাসকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে রামদাস-কাকা?

রামদাস তখন দাড়িয়ে উঠেছে। বলল—গেছে। পয়সা রেখেছিলাম। কখন পড়ে গেছে বুঝতে পারি নি। সারাদিন ঘুরছি তো রাস্তায় রাস্তায়। তুমি তো জানো বাবাজী, পয়সা নেই জানলে আমি একদানাও মুখে দিতাম না এখানে—

দোকানদারের লোক বলল—ওবে আমার সামিক খুশিতির বে।

তাকে খামিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কত পয়সা আপনার? চার আনা? এই নন, ছেড়ে দিন একে। চলো রামদাস-কাকা—

রামদাস বলল—আমার একটা ধলে ওবা বেখে দিয়েছে। একটা দোতারা ছিল সঙ্গে, সেটা ভেঙে দিয়েছে—

দোকানদার ভেতর থেকে দোতারা এবং ছেঁড়া কাপড়সের ধলে এনে দিল। খানিক দূর এসে দোতারায় হাত বুলিয়ে রামদাস বললো—এটা একদম ভেঙে দিয়েছে বাবাজী। তাবগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে, আর বাজানো যাবে না—

ধলের ভেতর হাতড়ে খজ্ঞনীটা বের করল সে, হেসে বলল—এটা নেয় নি। যাক, একটা ভবু রইলো—

খঞ্জরী বাড়িরে সে তার অভোদয়তো হাসলো। বলল—জয় গুরু, জয় গুরু !
—তুমি হাসছ রামদাস কাকা ! তোমাকে ওরা অপমান ক'ল, মারল—
তার পরেও হাসছ ?

—হাসবো না কেন ? দুঃখ করাব সময় কোথা আমার ?

—ওদের ওপর রাগ হচ্ছে না ?

—না বাবাজী, সত্যি বলছি—ওরা যদি বুঝতো বাগ্যাপ কাজ, তা হলে কি
আর মারত আমাকে ? না বুঝে যা করেছে, তা'ব জন্য ওদের আমি দোষ
দেব না। গুরু ওদের ভালো করুন।

—তুমি বড় ভালোমানুষ রামদাস-কাকা ! আমরা হলে অপমান সহিতে পারতাম
না।

মার খাওয়াটা খেন ভারি একটা মজার ব্যাপার, রামদাস এমনি ভাবে মুচকি
মুচকি হাসতে লাগল। হঠাৎ হ'সি থামিয়ে বলল—একটা কথা তো তোমায়
বলা হয় নি বাবাজী, আমার যক্ষ্মা হয়েছে।

যক্ষ্মা রামদাসের। সে-কথা এতক্ষণ না বলে দি'বা হাসা'ছিল সে।

—কি বলছো রামদাস-কাকা। যক্ষ্মা ?

—হ্যাঁ বাবাজী। ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম কোলকাতায়। গাঁয়ের ডাক্তার
বললো শহরে গিয়ে দেখাতে। হাসপাতালে হাঁ করে বসেছিলাম সারাদিন,
আমার ডাক আমার আগেই ডাক্তারের রুগী দেখার সময় পেরিয়ে গেল।
চাপরাসী বলেছে, কাল যেতে। কাল যাব আবার—

—রাত্রিরে থাকবে কোথায় ?

—শুয়ে পড়ব রাস্তার ধারে কোথাও কাপড় মুড়ি দিয়ে। রাস্তায় শুলে তো
মারবে না।

এই হিমঝরী রাতে রামদাস অচেনা শহরের ফুটপাথে শুয়ে থাকবে, খাওয়া
মিলবে কিনা ঠিক নেই। তা সত্ত্বেও সে হাসছে।

—তুমি আমার সঙ্গে চলো রামদাস-কাকা, আমাদের বাড়ী চলো। আমি
তোমায় ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা কবে দেবো।

খঞ্জরী বাড়িতে বাড়িতে রামদাস বললো—তা হয় না। কালবা'দি হয়েছে,
বড় ছোঁয়াচে। এ রোগ আমি তোমার বাড়ীতে ছডাতে পারবো না। এই
জল দোকানেও আজকাল শালপাতায় খেয়ে গাঁজলা ভরে ডল খাই। এঁটো
গেলাসে-খালায় খেয়ে অন্য লোকের যদি অসুখ করে।

কিছুতেই সে যেতে রাজী হলো না। পকেট থেকে তিন টাকা (এ চাড়া
আমার কাছে আর ছিল না) বের কবে বললাম—টাকা ক'টা তোমাকে নিতে
হবে। কোনো আপত্তি শুনবো না—তোমার এখন টাকার দরকার।

আমার দিকে তাকিয়ে রামদাস একটুখানি ভেবে তার পর বলল—দাঁও।

—খেলের ভেতরে কিছুতে বেঁধে রাখো, আবার না হারায়।

কাপড়ের থুটে সে শক্ত করে বেঁধে নিল। বাঁধবার সময় ফাঁস করে একটু

ছিঁড়ে গেল কাপড়টা। রামদাস মুখ তুলে অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলল—বড্ড পুরোনো কিনা।

—আবার দেখা কোরো, আমাদের বাড়ীতে যেও কাকা।

—যদি গুরু টেনে না নেন, নিশ্চয়ই যাবো থোকন।

—আমাকে থোকন বলছো, আমি কিন্তু আর ছোট নই।

রামদাস হেসে মেহপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল। একটা হাত আমার কাঁধে রেখে কি বলতে গিয়ে হাট্টা সবিলে নিল। বলল—তোমাকে না ছোঁয়াই ভালো। যদি তোমার যক্ষ্মা হয়।

তাকিয়ে দেখলাম, ভবঘুরে রামদাস গুনগুন করতে করতে ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। জানি না, আর দেখা হবে কি না।

কাজল

যৌতুক পরিচ্ছেদ

(কাজলের ডায়েরী হইতে)

আজ রাত্রির অপূর্ণ জ্যোৎস্না উঠেছে। বাস্তাব পাশের গাছে বাসা বেঁধে-থাকা পাখিগুলো ডাকছে সকাল হয়ে গেছে মনে করে। চাঁদের আলোয় একবার বাইবে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘাসের ওপর হালকা শিশির চক্-চক্ করছিল।

এনেকদিন আগে আমার পোষা কুণ্ডুর কালু যখন মারা যায়, মা বলেছিলেন—দেবিস বুড়ো, গগবান ঠিক এসে বসে আছেন ওর কাছে। সেদিন আমি মাব কথা বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম, আজ হয়তো আর পারবো না। তবে এক নতুন বিশ্বাসে আমার মন ভরে উঠেছে। ধমতলার মোড় সেদিনকার সেই খুঁকটা যে পাউরুটি শঙ করে ধরে দাঁড়িয়েছিল, সোলোগাৰ-এর গল্পের সেই আশী বছরের ডঃখী বুড়ো—সবাইকে আমার কত আপন বলে মনে হচ্ছে। এদের প্রতি ভালবাসায় আমার এককাব ঘরে একটা নতুন জানলা খুলে দিয়েছে।

ক'দিন খুব নিশ্চিন্দিপুরে যেতে ইচ্ছে করছে। এখন সেখানে শুকনো বাঁশ-পাতা ঝরে বাঁশবাগানের পথ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সোঁদা গন্ধ উঠছে বাঁশতলা থেকে। হুমরঙের সজনেফুল ঘননীর আকাশের পটে থোকা থোকা ফুটে আছে। আমাদের পুরনো গিটের সজনেগাছটা—যেটা ঠেলে উঠেছে আকাশে মাথা তুলে অনেকখানি। নদীতে নৌকোয় বসে-থাকা মাঝি হঠাৎ বোঝে, জলে জোয়ারের টান লেগেছে। একটু একটু করে কদময়র ভৌর ঢেকে গিয়ে জল বাড়তে থাকে।

আমাদের পুরনো ভিটে কি চিরকালই অমনি পড়ে থাকবে—সাময়িক আর বাহুড় বাসা বানাবে কেবল? বাবার স্মৃতি কি একেবারে মুছে যাবে

আবাবের সুন্দর গাঁ বিশিষ্টপুর থেকে ? আমি তা হতে দেবো না । আমি
মাকে নিয়ে আবার ফিরে যাবো গাঁয়ে । শহর আমার থেকে খা কেড়ে
নিরেছে, আবাব গ্রাম আমাকে তা ফিরিয়ে দেবে ।

বেচারা রামদাসের কথা বড় মনে পড়ছে এ-সময় । এবাব দেখা হলে বলবে—
হুঃখ কোরো না রামদাস-কাকা, আমি তোমাকে একটা নতুন দোতারা
বানিয়ে দেবো ।

॥ সমাপ্ত ॥

